কুরআন হাদিসের আলোকে

নবী রাসূলগণের জীবনী

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি

লেখক পরিচিতি

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি(১৯৬৬) নীতির প্রশ্নে অনড়, অতি সাধারণ ও সাদামাটা জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। চট্টগ্রামের রাঙ্গুনীয়া উপজেলাধীন রাজানগর গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁর পিতা মরহুম আহমদ জরিফ ও মাতা মরহুমা আলহাজ্বা আনোয়ারা বেগম। এ অকুতোভয়-দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্বের শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি ছিল চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার 'হিফজুল কোরআন বিভাগ'। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন 'হিফজ' সমাপনান্তে(১৯৮৫) আউলাদে রাসূল, হযরতুলহাজ্ব আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)'র পবিত্র হাতে দস্তারে ফজিলত অর্জন ও কাদেরীয়া ত্বরীকায় ছবক গ্রহণ করেন(১৯৮৬)। দাখিল ৬ষ্ঠ(১৯৮৬) শ্রেণীতে জামেয়ায় ভর্তি হয়ে দাখিল(১৯৯১), আলিম(১৯৯৩), ফাযিল(১৯৯৫), কামিল হাদিস(১৯৯৭) ও কামিল ফিক্হ(১৯৯৯) কৃতিত্বের সাথে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। মাদ্‌রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে অত্র জামেয়ায় তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ শিক্ষা জীবন শেষ হয়। তাছাড়া তিনি গ্রেজুয়েশন ডিগ্রী অর্জন করেন। ছাত্র জীবনে বরাবরই ক্লাশেপ্রথম স্থান লাভ এবং সকল সহপাঠির কাছে শিক্ষকের মর্যাদা পাওয়ার বিষয়টি তার শিক্ষা জীবনের অনন্য কৃতিত্ব। যার ফলে অগ্রজ-অনুজ ছাত্রসহ সম্মানিত শিক্ষকগণের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয়। শিক্ষা জীবন শেষে পবিত্র হাদিস বর্ণনাকারীগণের জীবনবৃত্তান্ত সম্বলিত গ্রন্থ 'ছিহাহ্ ছিত্তাহ্'র রাবী পরিচিতি' (১৯৯৮) ও 'বিষয়ভিত্তিক কারামাতে আউলিয়া' (২০১২) বিষয় ভিত্তিক মু'জিযাতুর রাসূল দ., শরহে মুসনাদে ইমাম আ'যম আবুহানিফা র. এবং বার মাসের আমল ও ফযিলত রচনা ও প্রকাশ করে গুণীজন এবং পাঠক সমাজে সমাদৃত ও প্রশংসিত হন। তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ায় ২০০০খৃ. থেকে অদ্যাবধি শিক্ষকতায় নিয়োজিত। তাঁর শিক্ষকতা জীবন স্বনামধন্য। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি মাসিক তরজুমানসহ বিভিন্ন ম্যাগাজিন, স্মারক গ্রন্থ ও সাময়িকীতে ভাল লিখার জন্য সম্মাননা অর্জন করেন। তাছাড়া সামাজিক সংগঠনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে ইসলামী তাহযিব-তামাদ্দুন চর্চায় সমাজে বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। ১৯৯৯ ও ২০০৮ খৃ. আজমীর(ভারত) সফর করে খাজা মুঈনুদ্দীন(র.) ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারাত যিয়ারত করেন। ২০০৪খৃ. হজ্বে বাইতুল্লাহ ও যিয়ারতে মদীনা মনোওয়ারা পালন করেন। ২০০৯খৃ. (রমযান) এবং ২০১৩ খৃ. সপরিবারে পবিত্র ওমরা পালন করেন।১১ ডিসেম্বর ১৯৯৮ খৃ. চট্টগ্রাম বালুচরা নিবাসী আলহাজ্ব সৈয়দ গোলাম মহিউদ্দিন সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা সৈয়দা জিনাত আরা'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি এক মেয়ে ও দুই ছেলের জনক। ভবিষ্যতে কোরআন-সুন্নাহ্র সঠিক জ্ঞান-চর্চা ও ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে অসামান্য অবদান রাখবেন-প্রত্যাশা করি।

– প্রকাশক

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

কুরআন-হাদিসের আলোকে

নবী-রাসূলগণের জীবনী

محمد عبد القادر

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি

আরবি প্রভাষক
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮১৭-২৩২৩৬৪

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

কুরআন-হাদিসের আলোকে
নবী-রাসূলগণের জীবনী
হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি

প্রকাশক : গাজী মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ
গ্রন্থস্বত্ব : সংকলক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশ : ডিসেম্বর ০১, ২০১৬ ঈসায়ী
চিশ্‌তি প্রকাশনী, বালুচরা, বায়েজীদ, চট্টগ্রাম।
সহযোগিতায়: আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ মুরশেদুল হক
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
আলহাজ্ব রশিদ আহমদ
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগী, হিলভিউ, চট্টগ্রাম।
কম্পোজ : এম. সাইফুল আলম, ০১৯৭৯-৩৩৪১৮০
প্রচ্ছদ : এটাচ এ্যাড, আন্দরকিল্লা।
মূল্য : (৪৫০/-) চারশত পঞ্চাশ টাকা

Quran Hadiser Aloke Nabi Rasulgoner Jiboni
by Hafez Mawlana Mohammad Osman Gani
Published by Chishty Prokashoni, Baluchara, Bayzid
Chittagong, Bangladesh. Price: 450/- only, US$ 13

সংকলকের কথা

মহান আল্লাহ্'র জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি সর্বপ্রথম তাঁর নূর থেকে নূরে মুহাম্মদী ﷺ'কে সৃজন করে সৃষ্টির সূচনা করেন। দুরূদ-সালাম অবতীর্ণ হোক ইমামুল আম্বিয়া, খাতেমুল আম্বিয়া, সায়্যেদুল মুরসালীন, রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ'র উপর যাঁর উসিলায় সমগ্র সৃষ্টি জগত সৃজিত হয়েছে এবং সকল নবী-রাসূলগণের উপর যাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিবেদিত ছিল কেবল উম্মতের কল্যাণে।

আল্লাহ্ তায়ালা মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূলগণ প্রেরণ করেন। যাঁদের সঠিক সংখ্যা নিরূপন করা কঠিন। হযরত আবু যর গিফারী রা. বলেন, একবার জিজ্ঞাসা করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নবীগণের সংখ্যা কত? উত্তরে তিনি বললেন, একলক্ষ চব্বিশ হাজার। তন্মধ্যে তিনশত তের অপর বর্ণনায় তিনশত পনের জন ছিলেন স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী রাসূল।[1]

প্রামাণ্য ঐশীগ্রন্থ আল কুরআনে সরাসরি কেবল পঁচিশ-ছাব্বিশ জন নবীর কথা বিস্তারিত কিংবা সংক্ষিপ্তাকারে প্রয়োজনানুসারে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ "হে প্রিয় হাবীব! বহু রাসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি এবং আরো এমন বহু রাসূল পাঠিয়েছি- যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাইনি।[2]

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এঁদের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করার কারণ হল- এসব ঘটনাবলীর মধ্যে রয়েছে মানবজাতির জন্য শিক্ষনীয় উপদেশ, নসীহত, হেদায়ত ও সংশোধনের উপকরণ। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ "তাদের (নবী-রাসূলগণের) কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে পূর্বেকার কিতাবের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হেদায়েত।[3]

---

১. মুল্লা আলী কারী র., মিরকাত, শরহে মিশকাত, খণ্ড-১, পৃ. ৫৭
২. সূরা নিসা, আয়াতঃ ১৬৪
৩. সূরা ইউসুফ, আয়াতঃ ১১১

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে- وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ "আর আমি রাসূলগণের সব বৃত্তান্তই আপনাকে বলেছি, যদ্বারা আপনার অন্তরকে মজবুত করেছি। আর এভাবে আপনার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে।"[৪]

আম্বিয়া কিরামগণের জীবন-কাহিনী নিয়ে পৃথিবীতে বহু ভাষায় বিভিন্ন নামে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে বিশেষত আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় এ বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচিত কিংবা অনুদিত হলেও আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি তবে দু'একটি গ্রন্থ অনুবাদ হয়েছে মাত্র। তাই নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য আরবী, উর্দু নবী-রাসূলগণের জীবনী গ্রন্থ থেকে বিশেষ করে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনামতে সর্বজন সমাদৃত একখানা নবী-কাহিনী সংকলন করার প্রয়োজন অনুভব করেছি। অনেক শুভাকাঙ্খীরাও এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন যাবৎ অনুরোধ করে আসছেন। তাই আল্লাহর উপর ভরসা করে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের ভালবাসাকে পুঁজি করে এই মহান কাজের সাহস করেছি।

গ্রন্থখানার নাম দিয়েছি 'কুরআন-হাদিসের আলোকে নবী-রাসূলগণের জীবনী'। গ্রন্থখানিতে নির্ভুল তথ্য-উপাত্ত দেয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি এতে পাঠক মহল উপকৃত হবেন বেশী। তছাড়া ইসলামী গবেষকগণের গবেষণায় এবং বক্তা ও খতীবগণের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হবে।

নির্ভুল একটি গ্রন্থ সচেতন পাঠক মহলের কাছে উপহার দিতে চেষ্টায় কার্পণ্য ছিল না। তবুও কোন ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি কাম্য। আর অবহিত করলে কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করব; ইনশাআল্লাহ!

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সে সব উদারমনা আপনজনদের যাঁরা তাদের মূল্যবান কিতাব-পত্র দিয়ে আমাকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন এবং বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। বিশেষ করে বইটির প্রকাশক এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী জনাব গাজী মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

প্রার্থনা করি- যেন গ্রন্থখানি মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয় এবং পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন, বিযাতি খাতামিন নাবিয়্যিন।

–হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি

---

৪. সূরা হুদ, আয়াত: ১২০

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম!

সকল গুণকর্তীন মহান স্রষ্টার জন্য, যিনি তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ'কে স্বীয় নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। দুরূদ-সালাম অবতীর্ণ হোক সৃষ্টির প্রথম হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহবীর উপর। স্মরণ করি সকল নবী-রাসূলগণকে যাঁদের জীবন কাহিনীতে রয়েছে উপদেশ, হেদায়ত ও উত্তম চরিত্রের বাস্তবরূপ।

পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয় সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হল 'কাসাস' তথা অতীত কাহিনী। আল্লাহর দোস্ত-দুশমনদের এসব কাহিনীতে বিজ্ঞজনদের জন্য বহু উপদেশ ও শিক্ষনীয় বিষয় বিদ্যমান। ওগুলো থেকে শিক্ষাগ্রহণ করলে হক-বাতিল চিনতে সহজ ও সহায়ক হয়। এদিক বিবেচনায় কাসাসুল আম্বিয়া বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া একজন মুসলমান হিসাবে নবী-রাসূলগণের জীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রত্যেক সচেতন মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যক।

আমাদের মাতৃভাষা বাঙলায় এ বিষয়ের উপর কুরআন-হাদিসের সঠিক তথ্য ভিত্তিক প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে জাতি দীর্ঘদিন থেকে। বর্তমান পাঠক সমাজ অত্যন্ত সচেতন ও রুচিশীল। তারা তথ্য ও তত্ত্ব ছাড়া কোন কথা মানতে এবং গ্রহণ করতে চায়না। অবশ্য এটা বর্তমান সময়ের দাবীও বটে। কারণ অসংখ্য বাতিল ফের্কা বিভিন্ন ভাবে ছদ্মবেশে মুসলমানকে গোমরাহ্ করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক শ্রদ্ধাভাজন হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি পবিত্র কুরআন, হাদিস, তাফসীর এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ও সর্বজন স্বীকৃত প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের রেফারেন্স সহ এই বিষয়ের উপর 'কুরআন-হাদিসের আলোকে নবী-রাসূলগণের জীবনী' নামক একখানা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে জাতির প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। গ্রন্থখানার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিজ্ঞ পাঠক মহলের হাতে উপহার দেয়ার জন্য প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করি। আশা করি গ্রন্থখানা পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। গ্রন্থখানা প্রকাশের অন্তরালে যাদের অবদান রয়েছে- সকলের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

বইখানা পাঠান্তে পাঠক মহলের কাছে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু'র জন্য দোয়া কামনা করছি।

গ্রন্থখানার গুণগতমান বৃদ্ধিতে বিজ্ঞ পাঠক ও সুধীজনের যে কোন গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

– গাজী মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
পরিচালক
সনেট টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, [illegible]।

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা নং

১. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

- হযরত মুহাম্মদ ﷺ স্রষ্টার প্রথম সৃষ্টি — ১৫
- হযরত মুহাম্মদ ﷺ সকল সৃষ্টির উৎস ও উসিলা — ১৭
- নূরে মুহাম্মদী ﷺ সর্বদা পবিত্র পাত্রে আমানত ছিল — ১৯
- রাসূল ﷺ আমেনার গর্ভে আগমন ও দুনিয়াতে শুভাগমন — ২০
- রাসূল ﷺ'র শুভাগমণের তারিখ — ২৫
- নাম ও বংশ পরিচয় — ২৫
- মায়ের বংশ পরম্পরা — ২৫
- মায়ের ইন্তেকাল — ২৬
- যৌবনকাল — ২৬
- হিলফুল ফুযূল গঠন — ২৭
- হযরত খদীজা রা.'র সাথে বিবাহ — ২৭
- হাজরে আসওয়াদ স্থাপন — ২৮
- হেরা পর্বত ও ওহী — ২৮
- প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার ও নির্যাতনের শিকার — ২৯
- চন্দ্র বিদারণ — ৩০
- সামাজিক বয়কট — ৩১
- আমুল হুযন তথা দুঃখের বছর — ৩২
- তায়েফ গমন — ৩২
- মি'রাজ — ৩৩
- হিজরত ও হিজরী সন — ৩৪
- দারুন নাদওয়া'র বৈঠক — ৩৫
- মদীনার পথে — ৩৭
- মদীনাবাসীর অভ্যর্থনা — ৩৭
- মদনী জীবন — ৩৯
- মসজিদে নববী নির্মাণ — ৪০
- আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন — ৪১
- মদীনার সনদ — ৪২
- যুদ্ধ ও এর কারণ — ৪৫
- রাসূল ﷺ'র অংশগ্রহণকৃত যুদ্ধ সমূহ — ৪৬
- বদর যুদ্ধ — [illegible]

- উহুদের যুদ্ধ — ৬০
- গযওয়ায়ে বনু নযীর — ৬৮
- খন্দকের যুদ্ধ — ৬৯
- হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বাইয়াতে রিদওয়ান — ৭৬
- খায়বারের যুদ্ধ — ৮৫
- উমরাতুল কাযা — ৮৮
- মুতার যুদ্ধ — ৮৯
- মক্কা বিজয় — ৯২
- হুনাইনের যুদ্ধ — ১০৩
- গাযওয়ায়ে তায়েফ — ১০৬
- ওমরায়ে জি'রানা — ১০৯
- তাবুকের যুদ্ধ — ১০৯
- বিদায় হজ্ব ১০ম হিজরি — ১২৪
- মদিনায় উপস্থিতি ও বিদায়ের প্রস্তুতি — ১৩০
- আখেরী চাহার শোম্বা — ১৩৩
- ওফাত — ১৪৩
- গোসল ও কাফন-দাফন — ১৪৬
- জানাযার ধরণ — ১৪৯
- হায়াতুন্নবী ﷺ — ১৫৫
- উম্মুহাতুল মু'মিনীন — ১৫৬
- রাসূল ﷺ'র আওলাদগণ — ১৫৭

২. হযরত আদম আ.

- হযরত আদম আ.'র সৃষ্টি — ১৬০
- হযরত হাওয়া আ.'র সৃষ্টি — ১৬২
- হযরত আদম ও হাওয়া আ. জান্নাত থেকে অবতরণের ঘটনা — ১৬৩
- হযরত আযরাঈল আ.কে মৃত্যুদূতের দায়িত্ব অর্পণ — ১৬৭
- আদম আ.'র তাওবা কবুল — ১৬৯
- ফেরেশতা কর্তৃক হযরত আদম আ.কে সিজদা — ১৭৩
- ইবলিস শয়তান সিজদা না করার কারণ — ১৭৫
- হাবিল-কাবিলের দ্বন্দ্ব — ১৭৯
- আদম আ.'র ইন্তিকাল — ১৮৪
- ইবলিস — [illegible]

৩. হযরত শীষ আ.

- পরিচিতি — [illegible]

৪. হযরত ইদ্রিস আ.

- পরিচিতি — [illegible]

- তাঁর আবিষ্কৃত বস্তু সমূহ ১৯৮
- হযরত ইদ্রিস আ.'র আকাশারোহণের ঘটনা ১৯৯

৫. হযরত নূহ আ.

- নাম ও বংশ পরিচয় ২০১
- নবুয়ত লাভের সময় ২০৫
- হযরত নূহ আ.'র দাওয়াত ২০৫
- নৌকা নির্মাণের নির্দেশ ২১৪
- মহা প্লাবনের আগমন ২১৮
- নৌকায় আরোহণকারীর সংখ্যা ২২১
- নৌকায় আরোহণের তারিখ ২২৪
- মহা প্লাবনের তাণ্ডব ২২৫
- কেনানের পরিণতি ২২৬
- হযরত নূহ আ.'র স্ত্রী ২২৭
- এক মু'মিন বৃদ্ধা ২২৮
- মহা প্লাবনের সমাপ্তি ২২৯
- পরবর্তী প্রজন্ম হযরত নূহ আ.'র বংশধর ২৩০
- দীর্ঘ জীবন অতঃপর মৃত্যু ২৩২

৬. হযরত হুদ আ.

- দৈহিক গঠন ২৩৩
- আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসকারী তুফানের ধরণ ২৩৩
- আদ সম্প্রদায় ও হযরত হুদ আ. ২৩৪
- আ'দ সম্প্রদায়ের কাহিনী ২৪২

৭. হযরত সালেহ আ. ও ছামুদ জাতি

- ছামুদ সম্প্রদায়ের কাহিনী ২৪৭

৮. হযরত ইব্রাহীম আ.

- নাম ও বংশ ২৬২
- হযরত ইব্রাহীম আ.'র জন্ম কাহিনী ২৬২
- নবুয়ত ও দাওয়াত ২৬৩
- পিতা-পুত্রের বিতর্ক ২৬৫
- ইব্রাহীম আ. মুশরিক ছিলেন না ২৬৭
- হযরত ইব্রাহীম আ. কতৃক মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ২৭০
- অগ্নিকুণ্ড শীতল হওয়া ২৭৪
- নমরুদের সাথে বিতর্ক ২৭৬
- হযরত ইব্রাহীম আ.'র তিন জায়গায় মিথ্যা বলা মূলতঃ মিথ্যা নয় ২৭৮

কুরআন-হাদিসের আলোকে নবী-রাসূলগণের জীবনী # ৯

- হযরত ইব্রাহীম আ.'র শ্রেষ্ঠত্ব ২৮১
- ইব্রাহীম আ.'র পরীক্ষা ২৮২
- মাতৃগর্ভ থেকে খত্না করা অবস্থায় জন্মগ্রহণকারী নবীগণের তালিকা ২৮৪
- মক্কা মুকাররমা'র আবাদ ২৮৪
- বায়তুল্লাহ'র ইতিহাস ৩০২
- মকামে ইব্রাহীম'র ইতিহাস ৩০৬
- বায়তুল্লাহ নির্মাণ ও সংস্কার সংখ্যা ৩০৯
- খলীলুল্লাহ উপাধি লাভের কারণ ৩০৯
- হযরত জিব্রাঈল আ.'র দ্রুতগামীতা ৩১১
- হযরত ইব্রাহীম আ. আগুনে অবস্থান করার সময় ৩১২
- হযরত ইব্রাহীম আ.'র মা আগুনে অক্ষত ছিলেন ৩১২
- নমরূদ কতৃক আল্লাহর জন্য কোরবানী ৩১২

৯. হযরত ইসমাঈল আ.

- কুরবানীর ইতিহাস ৩১৪
- যবিহুল্লাহ কে ছিলেন? ৩১৮
- হযরত ইসমাঈল আ.'র সন্তান সন্ততি ৩২০
- ইন্তেকাল ৩২১

১০. হযরত ইসহাক আ.

- পরিচিতি ৩২১
- হযরত ইসহাক আ.'র বিবাহ ৩২৪
- ইসহাক আ.'র মৃত্যু ৩২৪

১১. হযরত ইয়াকুব আ.

- পরিচিতি ৩২৫
- হযরত ইয়াকুব আ.'র ১২ সন্তানের তালিকা ৩৩০

১২. হযরত লূত আ.

- পরিচিতি ও কওমে লূতের ঘটনা ৩৩০

১৩. হযরত ইউসুফ আ.

- নাম ও বংশ ৩৪০
- হযরত ইউসুফ আ.'র স্বপ্ন ৩৪২
- বৈমাত্রীয় ভাইদের হিংসা ও নির্যাতনের কাহিনী ৩৪৩
- কূপে নিক্ষেপ করার কাহিনী ৩৪৬
- হযরত ইউসুফ আ. গোলাম হওয়ার কারণ ৩৪৯
- হযরত ইউসুফ আ. মিশরের বাজারে ৩৫১
- হযরত ইউসুফ আ. যুলায়খার তত্ত্বাবধানে ৩৫৪
- হযরত ইউসুফ আ. কে দেখে মিশরের নারীদের অঙ্গুলি কর্তন [illegible]

- কারাগারে হযরত ইউসুফ আ. ৩৬৩
- কারাগারে সংঘটিত ঘটনা ৩৬৪
- কারাগার থেকে মুক্তিলাভ ৩৬৮
- হযরত ইউসুফ আ. মিশরের সম্রাট ৩৭৩
- সম্রাট হযরত ইউসুফ আ.'র দরবারে ভাইদের আগমণ ৩৭৮
- বিনইয়ামিন সহ দ্বিতীয়বার মিশর সফর ৩৮৪
- বিনইয়ামিনকে মিশরে রেখে দেয়ার কৌশল ৩৮৬
- শোকাহত হযরত ইয়াকুব আ. ৩৯৩
- হযরত ইউসুফ আ.'র ভাইয়েরা তৃতীয়বার মিশর গমণ ৩৯৫
- হযরত ইয়াকুব আ. ও হযরত ইউসুফ আ.'র সাক্ষাত ৩৯৮
- হযরত ইউসুফ আ.'র ইন্তেকাল ৪০৪

১৪. হযরত আইয়ুব আ.

- হযরত আইয়ুব আ.'র পরিচয় ৪০৭
- হযরত আইয়ুব আ.'র ধৈর্য ৪০৯
- স্ত্রীর সেবা ৪১১
- হযরত আইয়্যুব আ.'র দোয়া ধৈর্য্যের পরিপন্থী ছিল না ৪১৪
- হযরত আইয়্যুব আ.'র দোয়া করার কারণ ৪১৫
- হযরত আইয়্যুব আ.'র আরোগ্য লাভ ৪১৬
- দুঃখ কষ্টের কাল ও প্রার্থনার সময় ৪২৮
- মৃত পরিবার পরিজনবর্গের পূর্নজীবন লাভ ৪৩৫

১৫. হযরত যুলকিফল আ.

- পরিচিতি ৪৩৬
- যুলকিফল নবী ছিলেন না ওলী ছিলেন? ৪৩৯
- নবুয়ত লাভ ও সময়কাল ৪৪০
- মৃত্যু ৪৪০
- একটি সন্দেহের অপনোদন ৪৪০

১৬. হযরত ইউনুস আ.

- নাম ও বংশ ৪৪১
- হযরত ইউনুস আ.'র ঘটনা ৪৪২
- মাছের পেট থেকে মুক্তিলাভ ৪৪৪
- হাদিস শরীফে হযরত ইউনুস আ.'র আলোচনা ৪৪৯
- সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাওয়া ৪৫৫

১৭. হযরত শোয়াইব আ.

- নাম ও বংশ ৪৫৬

- আইকা অথবা মাদয়ানবাসীর চরিত্র ৪৫৮
- সম্প্রদায়ের সর্দারদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান ৪৬০
- কাফের কর্তৃক আযাব আসার দাবী ৪৬২
- মাদয়ানবাসী কাফিরদের উপর আযাব ৪৬২
- হযরত শোয়াইব আ.'র ইন্তেকাল ও কবর শরীফ ৪৬৩
- বনী ইস্রাঈলের পরিচয় ৪৬৪
- ফেরাউনের পরিচয় ৪৬৬

১৮ ও ১৯ হযরত মুসা আ. ও হযরত হারুন আ.

- হযরত মুসা আ.'র জন্ম ৪৭০
- ফেরাউনের ঘরে মুসা আ.'র লালন-পালন ৪৭২
- মুসা আ.'র মিশর ত্যাগ ৪৭৬
- মাদায়নে হযরত শুয়াইব আ.'র সাক্ষাত ৪৭৮
- হযরত মুসা আ.'র নবুয়ত লাভ ৪৮১
- ফেরাউনের দরবারে তাওহীদের দাওয়াত ৪৮৭
- মিশরে প্রবেশ ৪৯০
- ফেরাউনের উঁচু প্রাসাদ ৪৯৩
- ফেরাউনের বোকামি ৪৯৪
- ফেরাউনের দরবারে মুসা আ.'র মু'জিযা ৪৯৪
- হযরত মুসা আ. ও যাদুকরদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনা ৪৯৮
- ঈমানদারগণের প্রতি মুসা আ.'র উপদেশবাণী ৫০৪
- ফেরাউন কর্তৃক হযরত মুসা আ.কে হত্যার হুমকি ৫০৫
- ফেরাউনের খোদা দাবী ৫০৮
- কিবতিদের উপর আযাব ৫০৮
- ইস্রাঈলীদের নিয়ে মুসা আ.'র মিশর ত্যাগ ৫১৩
- হযরত ইউসুফ আ.'র লাশ মোবারক ৫১৪
- ফেরাউনের ধ্বংসের ঘটনা ৫১৬
- বনী ইস্রাঈলের আবেদন ও গোবৎস পূজা ৫২১
- চল্লিশ সংখ্যার তাৎপর্য ৫২৫
- সামেরীর পরিচয় ৫২৫
- গো বৎস পূজার শাস্তি ৫২৬
- তূর পর্বত উত্তোলন ৫৩২
- ইস্রাঈলী প্রতিনিধিদের মৃত্যু ও জীবিত হওয়ার ঘটনা ৫৩৪
- মান্না ও সালওয়া অবতরণ ৫৩৬
- হযরত মুসা আ.'র পাথর ৫৪০

- হযরত মুসা আ.'র কাপড় নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ৫৪০
- গরু যবেহের ঘটনা ৫৪২
- বনী ইস্রাঈলের নির্বুদ্ধিতা ৫৪৩
- কারূন ৫৪৫
- কারূনের ধ্বংসের ঘটনা ৫৪৬
- হযরত মুসা আ. ও খিযির আ. ৫৫০
- হযরত খিযির আ.'র পরিচয় ৫৫৮
- হযরত হারুন আ.'র মৃত্যু ৫৬০
- হযরত মুসা আ.'র ইন্তেকাল ৫৬৩
- বলআম বাউর ঘটনা ৫৬৫

২০. হযরত ইউশা' ইবনে নূন আ.

- পরিচিতি ৫৬৯

২১. হযরত ইলিয়াছ আ.

- বংশনামা ৫৭১
- নবুয়ত লাভের সময় ও স্থান ৫৭২
- দ্বীনি দাওয়াত ৫৭২
- হযরত ইলিয়াস আ. বর্তমান জীবিত না মৃত্যু ৫৮৪

২২. হযরত আল ইয়াসা আ.

- পরিচিতি ৫৮৬

২৩. হযরত শামুঈল আ.

- নাম ও বংশ ৫৮৭
- হযরত শামুঈল আ.'র ঘটনা ৫৮৭
- নবুয়ত লাভ ৫৮৯
- তালুত বনী ইস্রাঈলের বাদশা নির্বাচিত হলেন ৫৮৯
- তাবুতে সকীনা তথা প্রশান্তিলাভের সিন্ধুক ৫৯৩
- তালুত ও জালুতের মধ্যে যুদ্ধ ও বনী ইস্রাঈলের পরীক্ষা ৫৯৬
- দাউদ আ. কর্তৃক জালুতকে হত্যা ৫৯৮
- হযরত শামুঈল আ. মৃত্যু ও দাফন ৬০২
- তালুতের মৃত্যু ৬০২
- ঘটনার বিবরণ ৬০২
- উপরোক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষানীয় বিষয় ৬০৪

২৪. হযরত দাউদ আ.

- বংশনামা ৬০৬
- হুকুমত ও নবুয়ত ৬০৭
- হযরত দাউদ আ.'র বৈশিষ্ট্য ও [illegible]

- হযরত দাউদ আ.'র চারটি বিচার তাঁর পুত্র সোলায়মান আ. কর্তৃক পুনঃবিচার ৬১৯
- হযরত দাউদ আ.'র পরীক্ষা ৬২৫
- বনী ইস্রাঈল বানরে রূপান্তরিত ৬৩০
- হাশরের দিনের বিচার কার্যের নমুনা প্রদর্শন ৬৩২
- হযরত দাউদ আ.'র ইন্তেকাল ৬৩৮

২৫. হযরত সোলায়মান আ.

- সিংহাসন ও নবুয়ত লাভ ৬৪১
- হযরত সোলায়মান আ.'র প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত ৬৪২
- বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণ ৬৫০
- হযরত সোলায়মান আ.'র ঘোড়ার ঘটনা ৬৫১
- ডুবন্ত সূর্য পুনঃ উদিত হওয়া ৬৫২
- হযরত সোলায়মান আ.'র পরীক্ষা ৬৫২
- হযরত সোলায়মান আ. মক্কা-মদীনা যিয়ারত ৬৬০
- হযরত সোলায়মান আ. ও পিপিলিকা ৬৬১
- হুদ হুদ পাখির ঘটনা ৬৬৩
- সাবা রাজ্য ও বিলকীসের পরিচয় ৬৬৭
- পত্র লেখার নিয়ম বা আদব ৬৭৫
- বিলকীসের সুবিশাল সিংহাসন চোখের পলকে নিয়ে আসা ৬৭৭
- বিলকীসের বিরুদ্ধে জিনদের অপবাদ ৬৭৯
- ইসলাম গ্রহণের পর বিলকীসের অবস্থা ৬৮১
- হযরত সোলায়মান আ.'র মৃত্যু ৬৮২
- হযরত সোলায়মান আ.'র বৈশিষ্ট্য ৬৮৪

২৬. হযরত দানিয়াল আ.

- তাঁর জন্ম ও মু'জিযা ৬৮৫
- হযরত দানিয়াল আ. ও বখতনসর ৬৮৬
- হযরত দানিয়াল আ.'র উসিলায় বাঘের আক্রমণ থেকে নিরাপদ লাভ ৬৮৮
- হযরত আবু মুসা আশআরী রা. কর্তৃক দানিয়াল আ.'র লাশ দাফন ৬৮৯

২৭. হযরত যাকারিয়া আ.

- পবিত্র কুরআনে যাকারিয়া আ.'র নাম ও আলোচনা ৬৯১
- হযরত যাকারিয়া আ.'র জীবনী ৬৯১
- হযরত যাকারিয়া আ.'র পেশা ৬৯২
- হযরত যাকারিয়া আ.'র ইন্তেকাল ৬৯৩

২৮. হযরত ইয়াহিয়া আ.

- হযরত ইয়াহিয়া আ.'র জন্মকাহিনী ৬৯৫
- হযরত যাকারিয়া আ.'র বিস্ময় প্রকাশ ৬৯৬

- সন্তান লাভের নিদর্শন অন্বেষণ ৬৯৯
- হযরত ইয়াহিয়া আ 'র বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী ৭০০
- ইয়াহিয়া আ.'র নবুয়ত ও নবুয়তী কর্মধারা ৭০৪
- হযরত ইয়াহিয়া আ.'র মৃত্যু ৭০৫
- হযরত ইয়াহিয়া আ.'র শাহাদাতের স্থান ও কবর শরীফ ৭০৭

২৯. হযরত উযায়ের আ.

- ইহুদীরা উযায়ের আ.কে আল্লাহর পুত্র বলার কারণ ৭০৮
- হযরত উযায়ের আ. মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা ৭১০
- আগুনে অক্ষত থাকা ৭১৩
- মৃত্যু ৭১৪

৩০. হযরত হিযকীল আ.

- উক্ত আয়াতের শানে নুযুল ৭১৫
- আয়াতে বর্ণিত ঘটনা ৭১৬
- শিক্ষা ৭১৭

৩১. হযরত শাইয়া আ.

- পরিচিতি ৭১৮

৩২. হযরত আরমিয়া আ.

- বায়তুল মোকাদ্দাস ধ্বংসকাহিনী ৭২৬
- হযরত আরমিয়া আ. মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার ঘটনা ৭৪০

হযরত মরিয়ম আ.

- হযরত মরিয়মের তত্ত্বাবধান, লালন-পালন ও জীবন গঠন ৭৪৪
- হযরত মরিয়মের সাথে ফেরেশতাদের কথোপকথন ৭৪৭
- সন্তান জন্মের ঘটনাবলি ৭৪৮

৩৩. হযরত ঈসা আ.

- হযরত মরিয়মের বিহ্বলতা ও হযরত ঈসা আ.'র জন্মগ্রহণ ৭৫৩
- হযরত ঈসা আ.'র কর্মজীবন ৭৫৬
- হযরত ঈসা আ. কর্তৃক হযরত নূহ আ.'র মৃত পুত্র শামের নির্জীবন লাভ- এবং নষ্টীবীন শহরের বাদশাহর ঈমান গ্রহণ ৭৬২
- হযরত মরিয়মের মৃত্যুবরণ ৭৬৬
- হযরত ঈসা আ. কে চতুর্থ আসমানে তুলে নেবার ঘটনা ৭৬৮
- হযরত ঈসা আ.কে সৃষ্টিকর্তা বলার অযৌক্তিকতা ৭৭২
- হযরত ঈসা আ.'র মু'জিযা সমূহ ৭৭৪
- এক লোভীর কাহিনী ৭৭৭
- গ্রন্থপঞ্জি ৭৮০

১. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত মুহাম্মদ ﷺ স্রষ্টার প্রথম সৃষ্টি:

অনাদি অনন্ত স্বত্তা আল্লাহ্ তায়ালা একা ও অপ্রকাশিত ছিলেন। যখন তাঁর আত্মপ্রকাশের ইচ্ছে হল তখন তিনি একক ও প্রথম সৃষ্টি হিসাবে নবী মুহাম্মদ ﷺ'র নূর মোবারক স্বীয় নূর হতে সৃষ্টি করলেন এবং নাম রাখলেন মুহাম্মদ। সেই নূরে মুহাম্মদীর সৃষ্টি রহস্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে স্বয়ং নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন–

عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِى اَنْتَ وَاُمِّى اَخْبِرْنِى عَنْ اَوَّلِ شَئٍ خَلَقَهُ الله تَعَالٰى قَبْلَ الاشياءِ قَالَ يَا جَابِرُ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى خَلَقَ قَبل الاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهِ فَجَعَلَ ذَالِكَ النُّوْرُ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى وَلَمْ يَكُنْ فِى ذَالِكَ الوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَانَارٌ وَلَامَلَكٌ وَلَاسَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلا قَمَرٌ وَلَا جِنِّىٌّ وَلَا اِنْسِىٌّ فَلَمَّا اَرَادَ اللهُ تَعَالٰى اَنْ يَخْلُقَ الخَلَقَ قَسَّمَ ذَالِكَ النُّوْرَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنْ الجُزْءِ الاَوَّلِ اَلْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِى اَللَّوْحَ وَمِنَ الثَّالِثِ العَرْشَ ثُمَّ قَسَّمَ الجُزْءَ الرَابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الجُزْءِ الاَوَّلِ حَمَلَةَ العَرْشِ وَمِنَ الثَّانِى الْكُرْسِىَّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِىَ المَلَائِكَةِ ثُمَّ قَسَّمَ الجُزْءَ الرَابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الاَوَّلِ السَّمٰوَاتِ وَمِنَ الثَّانِى اَلْاَرْضَ وَمِنَ الثَّالِثِ الجَنَّةَ وَالنَّارَ ثُمَّ قَسَّمَ القِسْمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الاَوَّلِ نُوْرَ اَبْصَارِ المُؤْمِنِيْنَ وَمِنَ الثَّانِى نُوْرَ قُلُوْبِهِمْ وَهِىَ المَعْرِفَةُ بِاللهِ تَعَالٰى وَمِنَ الثَّالِثِ نُوْرَ اُنْسِهِمْ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ–

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি আরয করলেন- হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত, আল্লাহ্ তায়ালা সর্বপ্রথম কোন বস্তুটি সৃষ্টি করেছেন? তদুত্তরে নবী করিম ﷺ বললেন, হে জাবের! আল্লাহ্ তায়ালা সর্বপ্রথম সমস্ত বস্তুর পূর্বে স্বীয় নূর হতে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। তারপর আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছানুযায়ী ঐ নূর পরিভ্রমণ করতে লাগল। ঐ সময় না ছিল লাওহে-মাহফুয, না ছিল কলম, না ছিল বেহেশত, না ছিল দোযখ, না ছিল ফেরেশতা, না ছিল আকাশ, না ছিল পৃথিবী, না ছিল সূর্য, না ছিল চন্দ্র, না ছিল জ্বীন জাতি, না ছিল মানবজাতি। অতঃপর

যখন আল্লাহ্ তায়ালা অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করার মনস্থ করলেন, তখন ঐ নূরকে চারভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে কলম, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে লাওহে মাহফুয এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে আরশ সৃষ্টি করলেন। অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে আরশ বহনকারী ফেরেশতা, দ্বিতীয় অংশ দিয়ে কুরসি এবং তৃতীয়াংশ দিয়ে অন্যান্য ফেরেশতা সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় চার ভাগের অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে আকাশ, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে যমিন (পৃথিবী) এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি করলেন। অবশিষ্ট একভাগকে পুনরায় চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে মু'মীনদের নয়নের দৃষ্টি-নূর, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে ক্বলবের নূর তথা আল্লাহর মারেফত এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে তাদের মহব্বতের নূর তথা তাওহীদী কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সৃষ্টি করলেন। (বাকী অংশ থেকে অন্যান্য সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন)[১]

অন্য এক হাদিসে হযরত আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী রা. তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন– নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- كُنْتُ نُوْرًا بَيْنَ يَدَى رَبِّي قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفِ عَامٍ আমি আদম সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আমার প্রতিপালকের নিকট নূর হিসাবে বিদ্যমান ছিলাম।

উল্লেখ্য যে, ঐ জগতের একদিন পৃথিবীর এক হাজার বছরের সমান। এ হিসাবে পৃথিবীর পাঁচ শত চার কোটি বছর হয়।[২]

হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত-

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا جِبْرِيْلُ كَمْ عُمُرَكَ مِنَ السِّنِيْنَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَسْتُ اَعْلَمُ غَيْرَ اَنَّ فِى الْحِجَابِ الرَّابِعِ نَجْمًا يَطْلَعُ فِى كُلِّ سَبْعِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مَرَّةً رَأَيْتُهُ اِثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ اَلْفَ مَرَّةً فَقَالَ يَا جِبْرِيْلُ وَعِزَّةِ رَبِّي اَنَا ذَالِكَ الْكَوْكَبُ একদা রাসূল ﷺ হযরত জিব্রাঈল আ.কে তার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তদুত্তরে জিব্রাঈল আ. বললেন, আমি শুধু এতটুকু জানি যে, চতুর্থ

১. আল্লামা কাসতুল্লানী র., মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যা, খণ্ড-১, পৃ. ৭১, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক র., (ইমাম বুখারী র.'র ওস্তাদ) মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক'র বরাতে বর্ণিত। যুরকানী, শরহে মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড-১, পৃ. ৮৯-৯১, হালভী, সীরাতে হালভীয়্যাহ, খণ্ড-১, পৃ. ৫০, আজলূনী, কাশফুল খেফা, খণ্ড-১, পৃ. ৩১১, আশরাফ আলী থানভী, নসরুত তীব, পৃ. ১৩।

২. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ও আনোয়ারে মুহাম্মদীয়া, সূত্র. নূর নবী কৃত অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল

আকাশে একটি উজ্জল তারকা সত্তর হাজার বছর পর পর একবার উদিত হত। অর্থাৎ সত্তর হাজার বছর উদিত অবস্থায় এবং সত্তর হাজার বছর অস্তমিত অবস্থায় ঐ তারকাটি বিরাজমান ছিল। আমি এভাবে ঐ তারকাটিকে বাহাত্তর হাজার বার উদয় হতে দেখেছি। তখনি নবী করিম ﷺ এরশাদ করলেন, খোদার শপথ! আমিই ছিলাম ঐ তারকা।[৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নবুয়ত কখন থেকে নির্ধারিত ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, যখন আদম আ. রূহ ও শরীরের মধ্যবর্তীতে ছিলেন তখন থেকে।[৪]

(এ সম্পর্কে বহু বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত আছে। বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন, 'বার মাসের আমল ও ফযিলত, পৃ. ১৩৪-১৩৮)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ সকল সৃষ্টির উৎস ও উসিলা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ দু'টির মধ্যবর্তী অবস্থিত সবকিছু রাসূল ﷺ'র উসীলায় সৃষ্টি করছি।[৫]

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ هَبَطَ جِبْرِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اِنْ كُنْتُ اِتَّخَذْتُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا فَقَدْ اِتَّخَذْتُكَ حَبِيْبًا وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَكْرَمَ عَلَّى مِنْكَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَاَهْلَهَا لِاَعْرِفَنَّهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِى وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا-

হযরত সালমান রা. থেকে বর্ণিত, হযরত জিব্রাইল আ. রাসূল ﷺ'র খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রভু বলছেন– আমি ইব্রাহিমকে স্বীয় খলীল বানিয়েছি আর আপনাকে আমার হাবীব বানালাম। আমার নিকট আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন বস্তু আমি সৃষ্টি করিনি। নিশ্চয়

৩. ইমাম মুসলিম র., ২৭১হি., সহীহ মুসলিম শরীফ, সূত্রঃ নূর-নবী, কৃতঃ অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, পৃ. ৪, আলী ইবনে বুরহান উদ্দিন হালভী র., ১৪০৪হি., সীরাতে হালভীয়্যা, খণ্ড-১, পৃ.৩০, আশরাফ আলী থানভী, ১৩৬২হি., নশরুত্তীব, পৃ. ৯১৭।

৪. ইমাম তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ. ৫১৩

৫. আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী র., (১০৫২ হি), মাদারেজুন নবুয়্যাত, খণ্ড-১, পৃ-৩০৯। সূত্রঃ মাওয়ায়েযুর রেজবীয়্যাহ, খণ্ড-৩, পৃ-৬

আমি পৃথিবী এবং এর অধিবাসীকে সৃষ্টি করেছি, আপনার যে সম্মান আমার নিকট রয়েছে তা তাদের নিকট প্রকাশ করার জন্য। যদি আপনি না হতেন তবে আমি পৃথিবী সৃষ্টি করতাম না।[৬]

عَنْ عَلِيٍّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِمَّ خُلِقْتَ؟ قَالَ لَمَّا اَوْحَى اَلَى رَبِّي مَا اَوْحَى قُلْتُ يَارَبِّ مِمَّا خَلَقْتَنِي قَالَ تَعَالَى وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ اَرْضِي وَلَاسَمَائِي قُلْتُ يَا رَبِّ مِمَّا خَلَقْتَنِي قَالَ تَعَالَى وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ جَنَّتِي وَنَارِيْ

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ'র নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন, যখন আমার কাছে ওহী নাযিল হল তখন আমি আরয করলাম, হে আমার প্রভূ! আপনি আমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার ইজ্জত ও জালালিয়্যতের শপথ! যদি আপনি না হতেন তাহলে আমি আমার আসমান ও যমিন সৃষ্টি করতামনা। আমি পুনরায় এ প্রশ্ন করলে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার ইজ্জতের ও জালালিয়্যতের শপথ! আপনি না হলে আমি আমার জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করতামনা।[৭]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا اِقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ يَارَبِّ اَسْئَالُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرت لِى فَقَالَ اللهُ يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرِفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ اُخْلِقْهُ قَالَ يَارَبِّ لِاَنَّكَ لَمَا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوْحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ فَعَلِمْتُ اَنَّكَ لَمْ تَضُفَّ اِلَى اَسْمَائِكَ اِلَّا اَحَبَّ الْخَلْقِ فَقَالَ اللهُ صَدَقْتَ يَا آدَمُ اِنَّهُ لَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَيَّ اُدْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ -

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যখন আদম আ. থেকে ভুল সংঘঠিত হয়েছিল, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, হে পরওয়ারদিগার! আমি আপনার নিকট হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র উসিলায় প্রার্থনা করছি যে, আমাকে ক্ষমা করে দিন।

[৭]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী র., ১৩৫০হি., আনোয়ারে মুহাম্মদিয়া, পৃ.১৪, আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী র., ১০৫২হি., মাদারেজুন নবুয়্যাত, খণ্ড-২, পৃ-৪

আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মদকে কিভাবে চিনলে? অথচ তাঁকে এখনো (পৃথিবীতে) সৃষ্টি করা হয় নি। তখন আদম আ. বললেন, হে প্রভূ! আমি তাঁকে এভাবে চিনেছি যে, যখন আপনি আমাকে স্বীয় কুদরতী হাত দ্বারা সৃষ্টি করে আপনার পক্ষ হতে আমার ভিতরে রূহ ফুঁক দিয়েছেন তখন আমি মাথা তুললে আরশের পায়াতে লিখা দেখলাম لا اله الا الله محمد رسول الله তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে, আপনি আপনার পবিত্র নামের সাথে এমন ব্যক্তির নাম মিলালেন যিনি আপনার নিকট সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, হে আদম! তুমি সত্য বলেছ, বাস্তবই মুহাম্মদ আমার নিকট সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে অধিক প্রিয়। যখন তুমি তাঁর উসিলা নিয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করেছ, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আর যদি মুহাম্মদ না হতেন, তবে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।[৮]

নূরে মুহাম্মদী ﷺ সর্বদা পবিত্র পাত্রে আমানত ছিল:

হযরত আদম আ. থেকে হযরত আব্দুল্লাহ রা. এবং হযরত হাওয়া আ. থেকে হযরত আমেনা রা. পর্যন্ত যে সব ভাগ্যবান ব্যক্তিরা নূরে মুহাম্মদীকে ধারন-বাহন করেছিলেন সকলেই মুসলমান ও পূতপবিত্র ছিলেন। শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী র. বলেন, কুরআনের আয়াত وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন– নবী করিম ﷺ বলেছেন, আমি নবী থেকে নবীর মধ্যে স্থানান্তর হয়েছি। নবী করিম ﷺ সর্বদা নবীগণের পৃষ্ঠের মাধ্যমে স্থানান্তর হয়েছিলেন।[৯]

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَيْنَ كُنْتَ وَآدَمَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ كُنْتُ فِي صُلْبِهِ وَاَهَبَطَ اِلَى الْاَرْضِ وَاَنَا فِي صُلْبِهِ وَرُكِبْتُ السَّفِيْنَةَ فِي صُلْبِ اَبِي نُوْحٍ وَقُذِفْتُ فِي النَّارِ فِي صُلْبِ اَبِي اِبْرَاهِيْمَ لَمْ يَلْتَقِ لِي اَبَوَانِ قَطُّ عَلَى سَفَّاحٍ لَمْ يَزَلْ يَنْقُلُنِي مِنَ الْاَصْلَابِ الطَّاهِرَةِ اِلَى الْاَرْحَامِ النَّقِيَّةِ مُهَذَّبًا-

[৮]. হাকেম ৪০৫হি. আল মুস্তাদরাক, খণ্ড-২, পৃ. ৪৮৬। তিবরানী ৩৬০ হি., আল মু'জামুল আওসাত খণ্ড-৬, পৃ.-৩১৩। হায়ছামী র., ৮০৭হি., মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-৮, পৃ-২৫৩। ইবনে আসাকের র., ৫৭১ হি., তারীখে দামেস্ক আল কুবরা, খণ্ড-১ পৃ. ৮১, জালাল উদ্দিন সুয়ুত্বী র., ৯১১ হি., আল খাসায়েসুল কুবরা, খণ্ড-১, পৃ.১২, আলী ইবনে বুরহান উদ্দীন হালবী র., ১৪০৪ হি., আস সিরাতুল হালবীয়াহ, খণ্ড-১, পৃ.৩৫৫, ইমাম আহমদ কাস্তুল্লানী র., ৯২৩ হি., আল মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ, খণ্ড-১, পৃ. ৮, জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী র., ৯১১ হি., আদ দারুল মনসূর খণ্ড-১, পৃ-১৪২।

[৯]. শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী র., ১০৫২ হি., মাদারেজুন নবুয়্যাত, [illegible]

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আদম আ. যখন জান্নাতে ছিলেন, তখন আপনি কোথায় ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁর পিঠে ছিলাম। যখন তাঁকে পৃথিবীতে অবতরণ করা হলো তখনো তাঁর পিঠে ছিলাম। আমাকে আমার পূর্বপুরুষ হযরত নূহ আ.'র পিঠের মাধ্যমে কিশ্‌তিতে আরোহন করা হয়েছিল এবং পিতা হযরত ইব্রাহিম আ.'র পিঠের মাধ্যমে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আমার পিতা-মাতা কখনো মন্দ কাজে লিপ্ত হন নি। আমি পাক পবিত্র নসলের এবং পবিত্র রেহেমের মাধ্যমে স্থানান্তর হয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছি।[১০]

অপর এক হাদিসে আছে, لم يَزَلْ يَنْقُلُنِي مِنَ الأَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ اِلَى الاَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ আল্লাহ তা'আলা সর্বদা আমাকে পবিত্র পৃষ্ঠ থেকে পবিত্র রেহেমে স্থানান্তরিত করেন।[১১]

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী র. (৬০৬ হি.) বলেন, اِنَّ جَمِيْعَ اَبَاءِ مُحَمَّدٍ كَانُوا مُسْلِمِيْنَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَالِكَ قَوْلُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اَزَلْ اَنْقَلُ مِنْ اَصْلَابِ الطَّاهِرِيْنَ اِلَى اَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَوَجَبَ اَنْ لَا يَكُوْنَ اَحَدٌ مِنْ اَجْدَادِهِ مُشْرِكًا- রাসূল ﷺ'র সকল পূর্বপুরুষ মুসলমান ছিলেন। এর উপর স্বয়ং রাসূল ﷺ'র হাদিস রয়েছে। তিনি বলেন- আমি সর্বদা পবিত্র পুশ্‌ত থেকে পবিত্র রেহেমের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছি। অথচ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই মুশরিকগণ নাপাক। এর দ্বারা আবশ্যক হয় যে, রাসূল ﷺ 'র পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ মুশরিক ছিলেন না।[১২]

রাসূল ﷺ আমেনার গর্ভে আগমন ও দুনিয়াতে শুভাগমন

اخرج ابو نعيم عن ابن عباس قال كان من دلالات حمل رسول الله ﷺ ان كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة وقبلت حمل برسول الله ﷺ ورب الكعبة وهو امان الدنيا وسراج اهلها ولم تبق كاهنة فى قريش ولافى قبيلة من قبائل العرب الاحجت عن صاحبتها وانتزع علم الكهنة منها ولم يبق ملك من ملوك الدنيا الا

[১০]. ইবনে জওযী র., ৫৭৯হি., আল ওয়াফা বি আহ ওয়ালীল মুস্তফা, খণ্ড-১, পৃ. ২৮

[১১]. শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী র., ১০৫২হি., মাদারেজুন নবুয়্যাত, উর্দু, খণ্ড-২, পৃ.৬, আল্লামা ইউসুফ নাবহানী র., ১৩৫০হি, আনওয়ারে মুহাম্মদীয়া, পৃ. ১৫।

اصبح منكوسًا والملك مخر سالا ينطق يومه ذالك ومرت وحشى المشرق الى وح شئ المغرب بالبشارات وكذالك اهل البحار يبشر بعضهم بعضًا له فى كل شهر من شهوره نداءٌ فى الارض ونداء فى السماء ان ابشروا فقد أن لابى القاسم ان يخرج الى الارض ميمونًا مباركًا قال وبقى فى بطن امه تسعة اشهركما لا تشكو وجعًا ولا ريحًا ولا مغصا ولا ما يعرض للنساء ذوات الحمل وهلك ابوه عبد الله وهو فى بطن امه فقالت الملائكة الهنا وسيدنا بقى نبيك هذا يتيمًا فقال الله اناله ولى وحافظ وَنَصِيْرٌ وتبركوا بمولده فمولده ميمون مبارك وفتح الله لمولده ابواب السماء وجنانه فكانت أمنة تحدث عن نفسها وتقِول اتانى ات حين مرّبى من حمله ستة اشهر فركزنى برجله فى المنام وقال لى يا امنة انك قد حملت بخير العالمين طرّا فاذا ولدتيه فسميه محمدًا فكانت تحدث عن نفسها وتقول لقد اخذنى مايأخذ النساء ولم يعلم لى احد من القوم فسمعت وجبة شديدة وامرًا عظيمًا فها لنى ذالك فرأيت كان جناح طير ابيض قد مسح على فوادى فذهب عنى كل رعب وكل وجع كنت اجد ثم التفت فاذا انا بشربة بيضاء لبنًا وكنت عطشى فتنا ولتها فشربتها فأضاء منى نور عال ثم رايت نسوة كالنخل الطوال كانّهن من بنات عبد مناف يحدقن بى فبينا انا اعجب واذا بديباج ابيض قد مَدَّبين السماء والارض واذا بقائل يقول خذوه من اعين الناس قالت ورأيت رجلاً قد وقفوا فى الهواء بأيديهم اباريق فضة ورايت قطعة من الطيرِ قد اقبلت حتى غطت حجرى مناقيرها من الزمرد واجنحتها من اليوا قيت فكشف الله عن بصرى وابصرت تلك الساعة مشارق الارض ومغاربها ورَأيت ثلاثة اعلام مضروبات علما فى المشرق وعلما فى المغرب وعلما فى ظهر الكعبة فاخذنى المخاض فولدتُ محمدًا ﷺ فلما خرج من بطنى نظرت اليه فاذا انابه ساجدًا قد رفع اصبعيه كالمتضرع المبتهل ثم رأيت سحابة بيضاء قد اقبلت من السماء حتى غشيته فغيب عن وجهى وسمعت مناديًا ينادى طوفوا بمحمد شرق الارض وغربها وادخلوه ... انه سُمّى فيها الماحى لا يبقى شئ من

الشرك الامحى فى زمنه ثم تجلت عنه فى السرع وقت فاذا انابه مدرج فى ثوب صوف ابيض وتحته حريرة حضراء وقد قبض على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطب واذا قائل يقول قبض محمد على مفاتيح النصرة ومفاتيح الريح ومفاتيح النبوة ثم اقبلت سحابة اخري يسمع منها صهيل الخيل وخفقان الاجنحة حتى غشية فغيب عن عينى فسمعت مناديا ينادى وطوفوا بمحمدٍ الشرق والغرب وعلى مواليد النبيني واعرضوه علي كل روحانى من الجن والانس والطير والسباع واعطوه صفاء آدم ورقة نوح وخلة ابراهيم ولسان اسماعيل وبشرى يعقوب وجمال يوسف وصوت داؤاد وصبر ايوب وزهد يحى وكرم عيسى واعمروه فى اخلاق الانبياء ثم تجلت عنه فاذا انابه قد قبض على حريرة حضراء مطوية واذا قائل يقول بخَ بخَ قبض محمد على الدنيا كلها لم يبق خلق من اهلها الا دخل فى قبضة واذا انا بثلاثة نفرفى يد احدهم ابريق من فِضَّةٍ وفى يد الثانى طست من زمرد اخضر وفى يد الثالث حريرة بيضاء فنشرها فاخرج منها خاتمًا تحار ابصار الناظرين دونه فغسله من ذالك الابريق سبع مرات ثم ختم بين كتفيه بالخاتم ولفه فى الحريرة ثم حمله فادخله بين اجنحته ساعته ثم ردّه الىّ .

আবু নুয়াইম র. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আমেনা রা.'র গর্ভে পবিত্র নূরে মুহাম্মদী ﷺ'র আগমন সম্পর্কে অবগতি হলো এভাবে যে, সে রাতে কুরাইশদের প্রত্যেক জন্তুর বাকশক্তি এসে গিয়েছিল। ঐগুলো বলতে লাগল আল্লাহর ঘরের শপথ! রাসূল ﷺ স্বীয় মায়ের পবিত্র গর্ভে শুভাগমন করেছেন। তিনি পৃথিবীর জন্য আমানত এবং পৃথিবীবাসির জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। আরব গোত্রে যেসব যাদুকর মহিলা ছিল তাদের বাধ্যগত জ্বিনরা ঐ রাতে তাদের নিকট আসতে অক্ষম হয়ে গিয়েছিল। ভবিষ্যতদ্রষ্টাদের যাবতীয় জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। সমগ্র পৃথিবীর প্রভাবশালী রাজা-বাদশাদের সিংহাসন উল্টে দেওয়া হয়েছিল এবং তারা বোবা হয়ে গিয়েছিল। সে রাতে তারা কথা পর্যন্ত বলতে পারেনি। সুসংবাদ প্রচারের জন্য পূর্ব প্রান্তের জীব-জন্তু পশ্চিম প্রান্তের দিকে ছুটে গিয়েছিল। এভাবে সমুদ্রের সমস্ত জীব-জন্তুও একে অপরকে সুসংবাদ প্রদান করেছিল।

ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে গায়েবী আওয়ায দেয়া হয়েছিল যে, সন্তুষ্ট হয়ে যাও, রহমত ও বরকতমণ্ডিত আবুল কাসেম নবী মুহাম্মদ ﷺ'র শুভাগমনের সময় সন্নিকট হয়েছে।

নবী করিম ﷺ মাতৃগর্ভে নয় মাস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। এ সময় হযরত আমেনা রা. কোন প্রকারের কষ্ট, বমি, অস্থিরতা ইত্যাদি যা সাধারণত মহিলাদের হয়ে থাকে সব কিছু থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা ইতিপূর্বে ইন্তি কাল করেছেন। ফেরেশ্তাগণ আল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহ! আপনার নবী ইয়াতিম জন্মগ্রহণ করবেন? আল্লাহ বলেন, আমিই তাঁর সংরক্ষণকারী, প্রতিপালনকারী এবং সাহায্যকারী। রাসূল ﷺ'র মাওলদ দ্বারা সকলেই বরকত অর্জন করেছিল। এই খুশিতে আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

হযরত আমেনা রা. বলেন– যখন তাঁকে গর্ভধারণের ছয় মাস পূর্ণ হলো তখন স্বপ্নে একজন সুদর্শন ব্যক্তিকে দেখলাম যে, তিনি তার পা ছুঁয়ে বললেন, হে আমেনা! পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি তোমার গর্ভে বিদ্যমান। যখন তিনি ভূমিষ্ট হবেন তখন তাঁর নাম রাখবেন মুহাম্মদ। যখন ভূমিষ্ট হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসল তখন অন্যান্য গর্ভবতীদের ন্যায় আমারও প্রসবকালীন অবস্থা আরম্ভ হলো। এ সময় আমার পাশে কেউ ছিল না। হঠাৎ আমি উচ্চস্বরে আওয়ায শুনলাম যাতে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তারপর দেখলাম যে, কে যেন শুভ্র পাখির পালকের ন্যায় কিছু একটা আমার বক্ষে মালিশ করে দিলেন। এতে আমার ভয় কেটে গেল এবং যাবতীয় ব্যথা বেদনাও দূরীভূত হয়ে গেল। তখন আমি পিপাসা অনুভব করলাম। হঠাৎ দুধের ন্যায় শুভ্র পানীয় আমার সম্মুখে পেশ করা হলো যা আমি পান করেছি। এতে সবকিছু আলোকিত হয়ে গেল এবং আমার থেকে নূরের আলো বিকশিত হতে লাগল। অতঃপর আমি খেজুর বৃক্ষের ন্যায় লম্বা লম্বা কিছু মহিলা দেখলাম যারা আমাকে ঘিরে রেখেছে। তাদেরকে দেখতে আবদে মুনাফের কন্যাদের মত লাগে। এদেরকে দেখে আমি সীমাহীন অবাক হলাম। হঠাৎ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এর মধ্যবর্তী স্থানে রেশমী পোশাক দেখলাম। কেউ বলল, এই নবজাতক শিশুকে নাও এবং লোকদের দৃষ্টি থেকে গোপন রাখ। অতঃপর এমন কিছু লোক দেখলাম যারা পবিত্র পাত্র নিয়ে বাতাসে দণ্ডায়মান। এক ঝাঁক পাখি দেখলাম এগুলো আমার ঘর আচ্ছাদিত করে দিল। এই আশ্চর্যজনক দুর্লভ পাখিগুলোর ঠোঁট ছিল যমরদ এবং পালক ছিল ইয়াকুতের। আল্লাহ তায়ালা আমার চোখের পর্দা উঠিয়ে নিলেন। আমি পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত দেখলাম। আমি তিনটি পতাকা দেখলাম। একটি

পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে, দ্বিতীয়টি পশ্চিম প্রান্তে এবং তৃতীয়টি কাবা ঘরের ছাদের উপর ছিল। যখন রাসূল ﷺ ভূমিষ্ট হলেন তখন আমি দৃষ্টান্তহীন এই নবজাতককে দেখলাম। তিনি সিজদারত অবস্থায় হাতের আঙ্গুলসমূহ উপরের দিকে রেখে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দোয়া করছেন। তারপর এক টুকরা শুভ্র মেঘ দেখলাম যা নিচে এসে এই নবজাতককে আচ্ছাদিত করে ফেলল এবং আমার চক্ষুর অন্তরাল হয়ে গেলেন। আমি কারো আওয়ায শুনলাম, বলছে– মুহাম্মদকে মাগরিব ও মাশরিক ভ্রমণ করাও এবং সমুদ্রে নিয়ে যাও, যাতে সকলেই তাঁর সত্তা, গুণাবলি সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। আর এটাও যেন জেনে নেয় যে, তাঁর একটি নাম হলো মাহী তথা দূরীভূতকারী। তিনি স্বীয় সমকালে শিরকের নিশানা পর্যন্ত দূরীভূত করবেন। এরপর হঠাৎ তিনি আমার চোখের সামনে দৃষ্টিগোচর হলেন। এসময় তিনি শুভ্র পশমের পোশাক পরিহিত ছিলেন এবং নিচে সবুজ রেশম বিছানো ছিল। মুতি দ্বারা তৈরি তিনটি চাবি তাঁর হাতের মুষ্ঠিতে ছিল। কেউ বলছিল, মুহাম্মদ বিজয়, নবুয়্যত এবং আবহাওয়ার চাবি গ্রহণ করেছেন। তারপর আর এক টুকরা মেঘ প্রকাশিত হলো এবং এর থেকে ঘোড়ার আওয়াযের ন্যায় ও পাখির পালকের ন্যায় শব্দ হচ্ছিল। এই মেঘের টুকরা তাঁকে ডেকে ফেলল এবং তিনি আমার দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেলেন। কাউকে বলতে শুনেছি, মুহাম্মদকে মাশরিক ও মাগরিব এবং আম্বিয়ায়ে কিরামগণের জন্মস্থানে নিয়ে যাও আর জ্বিন, ইনসান, জীব-জন্তু, পশু-পাখি ও প্রত্যেক প্রকারের রূহানী মাখলুককে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দাও। তাঁকে হযরত আদম আ.'র সফুয়্যত (স্বচ্ছতা), হযরত নূহ আ.'র রিক্বত (নরম অন্তর) ও কান্নাকাটি, হযরত ইব্রাহিম আ.'র খিল্লত (বন্ধুত্ব), ইসমাঈল আ.'র যবান, হযরত ইয়াকুব আ.'র সুসংবাদ, হযরত ইউসুফ আ.'র সৌন্দর্য, হযরত দাউদ আ.র আওয়ায, হযরত আইয়ুব আ.'র ধৈর্য, হযরত ইয়াহিয়া আ.'র যুহদ এবং ঈসা আ.'র সাখাওয়াত তথা দানশীলতা প্রদান কর আর সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের আখলাক প্রদান কর। তিনি দ্বিতীয়বার আমার চোখের সামনে দৃশ্যমান হলেন। এসময় তাঁর হাতের মুষ্ঠিতে একখানা সবুজ রঙের কাপড়ের টুকরা ছিল। কেউ বলল, মোবারক হোক– হযরত মুহাম্মদ ﷺ সমগ্র পৃথিবীকে অধিনস্থ করে নিয়েছেন এবং সকল সৃষ্টি তাঁর আনুগত্যে এসে গেল। তারপর আমি তিনজন ব্যক্তি দেখলাম। একজনের হাতে রূপার পানির পাত্র এবং দ্বিতীয়জনের হাতে ছিল রেশমের টুকরা। সে তা খুলে সেখান থেকে একটি মহর বের করেন, যেটির চাকচিক্যে দর্শনকারীদের দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার উপক্রম হয়। ঐ পাত্রের পানি দিয়ে মহরটিকে সাতবার ধুয়ে রাসূল ﷺ'র উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে লাগিয়ে [illegible]

নিয়ে কিছুক্ষণ তাদের পালকের মধ্যে গোপন করে রাখেন তারপর তারা তাঁকে আমাকে সোপর্দ করলেন।[১৩]

রাসূল ﷺ'র শুভাগমণের তারিখঃ

অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমত অভিমত হল- রাসূল ﷺ আমুল ফিল তথা হস্তিবাহিনীর বছর ১২ রবিউল আউয়াল, ২০ আগষ্ট ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে সোমবার সুবহি সাদিকের সময় পৃথিবীতে শুভাগমণ করে ধরণীকে ধন্য করেছেন। তিনি পৃথিবীর বুকে পদার্পন করামাত্র স্পষ্টভাবে তাওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

ইমাম দিয়ারে বকরী র. বলেন– انّهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَا وَقَـعَ عَلَى الارض رَفَعَ رَأْسَهٗ وَقَـالَ بِلِسَانٍ فَـصِيْحٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَانى رَسُـوْلُ الله . নবী করিম ﷺ যখন পৃথিবীতে পদার্পন করলেন তখন তাঁর মস্তক মোবারক উত্তোলন করে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন– আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই আর আমি হলাম আল্লাহ্র রাসূল।[১৪]

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

রাসূল ﷺ'র পৃথিবীতে মূল নাম হল- মুহাম্মদ আর আসমানে আহমদ। এছাড়া তাঁর অসংখ্য গুণবাচক নাম রয়েছে। উপনাম- আবুল কাশেম, পিতার নাম আব্দুল্লাহ, মাতার নাম আমেনা রা.। চাচা আবু তালেব, দাদা আব্দুল মোত্তালিব। বিশুদ্ধ মতানুসারে তাঁর বংশপরম্পরা হল- আবুল কাশেম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মোত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মোনাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কা'ব ইবনে লুই ইবনে গালিব ইবনে ফাহর ইবনে মালিক ইবনে নদ্বর ইবনে কিনানাহ ইবনে খোযাইমাহ ইবনে মুদরাক ইবনে ইলিয়াছ ইবনে মুদ্বর ইবনে নায্যার ইবনে মা'দ ইবনে আদনান। এই পর্যন্ত রাসূল ﷺ'র বংশ পরম্পরা বিশুদ্ধভাবে সাব্যস্ত। এর পরের বংশ তালিকা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

মায়ের বংশ পরম্পরা :

আমেনা বিনতে ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহরা ইবনে কিলাব ইবনে মুর্রাহ ইবনে কা'ব ইবনে কুসাই ইবনে লুই।

---

১৩. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী র., ৯১১হি., আল খাসায়েসুল কুবরা, খণ্ড-১, পৃ. ৮১-৮২, ইবনে কাসির র., [illegible] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড- ৬, পৃ. ২৯৮, ইউসুফ নাবহানী র., ১৩৫০হি., আনওয়ারে মুহাম্মদিয়াহ, পৃ. ২২-২৪, সূত্রঃ ড. তাহের আল কাদেরী, মিলাদুন্নবী স., উর্দু, পৃ.২০৭

১৪ ইমাম হোসাইন ইবনে [illegible]

রাসূল ﷺ'র জন্মের পূর্বেই পিতা আব্দুল্লাহ রা. পঁচিশ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। ইয়াতীম মুহাম্মদ ﷺ দাদা আব্দুল মোত্তালিবের তত্ত্বাবধানে প্রথমে লালিত-পালিত হন। অত:পর আরবের প্রথা অনুযায়ী হযরত হালিমা সা'দিয়া রা. তাঁকে দুধপান করান। হযরত হালিমা রা. ছিলেন তাঁর দুধমা। হালিমা রা. ছিলেন অত্যন্ত গরীব। রাসূল ﷺ'র বরকতে তিনি অভাবমুক্ত জীবন লাভ করেন।

শিশুকালে দোলনায় শুয়ে শুয়ে তিনি চাঁদের সাথে খেলতেন। তাঁর আঙ্গুল মোবারকের ইশারায় চাঁদ হেলে যেত। তিনি চলার পথে মেঘে ছায়া দান করত। শিশু কালেই পাহাড়ের পাদদেশে প্রথম বারের মত তাঁর বক্ষ বিদারণ হয়। চার বছর যাবৎ বিবি হালিমা রা.'র নিকট উত্তমভাবে লালিত-পালিত হওয়ার পর তিনি আপন মায়ের কোলে ফিরে আসেন।

মায়ের ইন্তেকাল :

রাসূল ﷺ'র বয়স যখন ছয় বছর হল- তখন হযরত আমেনা রা. নিজ দাসী উম্মে আয়মান ও নিজ পুত্র মুহাম্মদ ﷺ'কে নিয়ে মদীনায় গমণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল স্বামীর কবর যিয়ারত করা ও নিজ পুত্রকে মাতুলালয়ে পরিচিত করানো। মদীনার বনী আদী ইবনে নাজ্জার ছিল নবী করিম ﷺ'র মাতুলালয় এবং আবু আইয়ুব আনসারী রা. ছিলেন সে বংশের লোক। 'দারুন নাবেগা' নামক স্থানে, যেখানে হযরত আব্দুল্লাহ রা.'র কবর সেখানে তাঁরা একমাস অবস্থান করেন। মদীনা থেকে ফেরৎ পথে 'আবওয়া' নামক গ্রামে পৌছলে হঠাৎ হযরত আমেনা রা. অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। মাকে 'আবওয়া' গ্রামে দাফন করে উম্মে আয়মন কিশোর নবীকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। দুই বছর যাবৎ তিনি দাদা আব্দুল মোত্তালিবের স্নেহে লালিত-পালিত হন। আট বছর বয়সে দাদার ইন্তেকাল হলে তিনি দাদার স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল আট বছর দুইমাস দশ দিন।

যৌবনকাল :

দাদা আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকালের পর তিনি চাচা আবু তালেবের তত্ত্বাবধানে ছিলেন দীর্ঘ পঁচিশ বছর বয়সকাল পর্যন্ত। হযরত আবু তালেব নিজের সন্তান-সন্ততির চেয়ে তাঁকে অধিক ভালবাসতেন ও স্নেহ করতেন। বার বছর দুই মাস বয়সকালে তিনি চাচা আবু তালেবের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমণ করেন। সেখানে বাহিরা/বুহাইরা রাহেবের পক্ষ থেকে নবুয়ত প্রাপ্তির সুসংবাদ প্রাপ্ত হন। তেইশ অথবা চব্বিশ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার হযরত

খদীজাতুল কোবরা রা.'র পক্ষে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করেন। উক্ত সফরে তাঁর বহু মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছিল।

হিলফুল ফুযূল গঠন :

ইবনে হিশামের বর্ণনা মতে চৌদ্দ এবং ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে বিশ বছর বয়সে আপন চাচাদের সাথে ফিজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা পর্যবেক্ষণ করে মযলুমের সাহায্যার্থে সেবামূলক সংগঠন 'হিলফুল ফুযূল' গঠন করেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি মানব ও সমাজ সেবার এক মহৎ আদর্শ স্থাপন করেন।

হযরত খদীজা রা.'র সাথে বিবাহ :

হযরত খদীজা রা. ছিলেন আরবের ধণাঢ্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন একে একে দুই স্বামীহারা বিধবা চল্লিশ বছর বয়স্কা মহিলা। চরিত্র মাধুর্যে লোকে তাঁকে তাহেরা উপাধিতে ভূষিত করেছিল। রাসূল ﷺ সিরিয়া যাতায়াতের পথে সংঘটিত বিভিন্ন আশ্চর্যজনক মু'জিযা দেখে খদীজা রা.'র বিশ্বস্ত গোলাম মাইছারা মুগ্ধ হল। তারপর ওই সব আশ্চার্যের বিষয় সম্পর্কে খদীজা রা.কে অবহিত করলে খদীজা রা. মাইছারার মাধ্যমে তাঁর নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। তিনি চাচাদের সাথে পরামর্শ করে এতে সম্মতি প্রকাশ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচিশ বছর। উভয় পক্ষের সম্মতিতে শুভ বিবাহ কার্য সম্পন্ন হল। তাদের দাম্পত্য জীবন কেটেছিল পঁচিশ বছর। খদীজা রা. তাঁর যাবতীয় ধন-সম্পদ রাসূল ﷺ'র চরণতলে উৎসর্গ করে দিলেন। তাঁদের পবিত্র সংসারে হযরত কাসেম, হযরত জয়নব, হযরত আব্দুল্লাহ, হযরত রোকাইয়্যা, হযরত উম্মে কুলসুম ও হযরত ফাতেমা রা. জন্মগ্রহণ করেন। অন্য রেওয়ায়েত মতে ইবনে হিশাম হযরত তৈয়্যব ও হযরত তাহের নামে আরও দু'জন সাহেবজাদার নাম উল্লেখ করেছেন। এ হিসাবে হযরত খদীজা রা.'র ঘরে নবী করিম ﷺ'র চার ছেলে ও চার মেয়ে মোট আটজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। চারজন ছেলেই শৈশবে ইন্তেকাল করেন। কন্যাদের সকলেই নবুয়ত যুগ পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন ও বিবাহিতা জীবন-যাপন করেন। প্রথম তিন কন্যা রাসূল ﷺ'র জীবদ্দশাই ইন্তেকাল করেন। ছোট ও প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা রা.'র সাথে হযরত আলী রা.'র সাথে বিবাহ হয়।

হযরত খদীজা রা. নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে পনের বছর এবং নবুয়ত প্রকাশের পরে দশ বছর মোট পঁচিশ বছর রাসূল ﷺ'র ঘর সংসার করেন। হযরত খদীজা রা.'র জীবদ্দশায় রাসূল ﷺ দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেন নি।[১৪]

---

১৪. অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল র., নূর-নবী, পৃ. ৪৩-৪৭।

হাজরে আসওয়াদ স্থাপনঃ

পবিত্র বায়তুল্লাহ্ শরীফ পৃথিবীর সর্বপ্রথম মসজিদ। এটি সর্বপ্রথম ফেরেশতারা সপ্ত আসমানে অবস্থিত বায়তুল মা'মুরের সোজা নিচে নির্মাণ করেন। এরপরে মোট নয়বার কাবা গৃহ পুন:নির্মিত হয়। তন্মধ্যে অষ্টমবার কোরাইশগণ কতৃক পুন:নির্মাণ করা হয়। হালাল অর্থ সংকটের কারণে কা'বার কিয়দংশ বাদ দিয়ে বায়তুল্লাহ পুন:নির্মাণ করা হয়। বাদ পড়া অংশটুকুকে বলা হয় হাতীমে কা'বা। তখন নবী করিম ﷺ'র বয়স হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর। তিনি নিজেই এ কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কা'বা ঘরের নির্ধারিত স্থানে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে কোরাইশ সরদারদের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকই এই মর্যাদপূর্ণ কাজ নিজেই করতে দাবী করে বসল। এমনকি দাঙ্গা-হাঙ্গামারও উপক্রম হল। অত:পর তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত হল যে, আগামীকাল ভোরে যিনিই কা'বা গৃহে সর্বাগ্রে আগমণ করবেন তাঁর ফায়সালা সকলেই মেনে নেবে। আল্লাহর ইচ্ছায় পরদিন ভোরে সকলের আগে রাসূল ﷺ'ই কা'বাগৃহে আগমণ করলেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত সমস্যা সমাধান করেন। তিনি একখানা চাদরের উপর হাজরে আসওয়াদ রেখে সকল সরদারদেরকে চাদরের কোণা ধরতে বললেন। সকলেই মিলে পাথরখানা নিয়ে আসলে তিনি নিজ হাতে তা যথাস্থানে স্থাপন করে দেন। এতে সকলেই সন্তুষ্ট হল এবং একটি সম্ভাব্য যুদ্ধ থেকে মুক্তি লাভ করল।

হেরা পর্বত ও ওহীঃ

রাসূল ﷺ'র বয়স যখন পঁয়ত্রিশ অতিক্রম করল তখন থেকেই তিনি নির্জনতা পছন্দ করতেন বেশী। কয়েক দিনের খাবার নিয়ে মক্কার তিন মাইল দূরে অবস্থিত হেরা পর্বতে চলে যেতেন। পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ায় গীরি গুহায় একাকী বসে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। হযরত খদীজা রা. তাঁকে এ কাজে সহযোগিতা করতেন। তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হওয়া মাত্রই ১২ই রবিউল আউয়াল থেকে ওহীর সাতটি স্তরের প্রথম স্তর শুরু হল- অর্থাৎ সত্য স্বপ্ন দর্শন। বুখারী শরীফের প্রারম্ভে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে- রাসূল ﷺ'র উপর ওহীর সূচনা হয় সত্য ও সুন্দর স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে কোন স্বপ্ন দেখতেন, তা এমন হত যে, যেন তা প্রকাশ্য দিবালোকে দেখেছেন। এটা হযরত জিব্রাঈল আ.'র মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে হত। নবীগণের স্বপ্নও ওহী।

এভাবে ছয় মাস অতিক্রম হওয়ার পর নবী করিম ﷺ'র বয়স যখন চল্লিশ বছর ছয় মাস শেষ হয়ে সপ্তম মাসে উপস্থিত হল

সোমবার রাতে প্রথম প্রত্যক্ষ ওহী তথা কুরআন মজীদ নাযিলের ধারা সূচিত হয়। হেরা পর্বতে ওই পবিত্র রজনীতে গভীর অন্ধকারে হযরত জিব্রাঈল আ. সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত ওহী মারেফত নিয়ে এসে তাঁকে পাঠ করে শুনান।

হেরা পর্বত থেকে নেমে তিনি হযরত খদীজা রা.'র নিকট চলে আসলেন এবং বললেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও'। খদীজা রা.কে তিনি হেরা গুহার সব ঘটনা খুলে বললেন। খদীজা রা. বিগত পনের বছরের নবী করিম ﷺ'র চরিত্র মাধুর্য ও বিভিন্ন গুণাবলী উল্লেখপূর্বক তাঁকে শান্তনা ও নির্ভয় দান করেন। তারপর খদীজা রা. তাঁকে নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই ওরাকা ইবনে নওফলের কাছে গেলেন। ওরাকা ছিলেন আসমানী কিতাবের অভিজ্ঞ আলেম। তিনি বয়োবৃদ্ধ ও অন্ধ ছিলেন। রাসূল ﷺ'র মুখে হেরা গুহার বর্ণনা শুনে ওরাকা বললেন, এ হচ্ছে সেই নামুস (উর্ধ আকাশ থেকে ওহী আনয়নকারী ফেরেশতা) যাকে হযরত মুসা আ.'র প্রতি পাঠানো হয়েছিল। ওরাকা নিশ্চিত ভাবে বলে দিলেন যে, আপনি আখেরী যামানার নবী হবেন। আপনাকে আপনার জাতি দেশ থেকে বহিস্কার করে দিবে। আমি যদি শক্ত ও জীবিত থাকতাম তবে আপনাকে মনেপ্রাণে সহযোগিতা করতাম।

ওরাকার মুখে এ সংবাদ শুনে হযরত খদীজা রা. রাসূল ﷺ'র উপর ঈমান আনলেন। নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হলেন হযরত খদীজা রা. বালকদের মধ্যে হযরত আলী রা., প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষগণের মধ্যে হযরত আবু বকর রা., ক্রীতদাসদের মধ্যে হযরত বেলাল রা. আর অশ্রিত লোকদের মধ্যে পালকপুত্র হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রা. হলেন প্রথম মু'মিন।[১৬]

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার ও নির্যাতনের শিকারঃ

রাসূল ﷺ নবুয়ত প্রাপ্তির পর গোপনে ইসলাম প্রচার করেন। তিন বছর পর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতি প্রাপ্ত হন। আল্লাহ্ তায়ালা আদেশ করলেন- وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ 'আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন। তারপর বলা হয়েছে- فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 'আপনাকে যা নির্দেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ করুন এবং এ কাজে মুশরিকদের বাধা উপেক্ষা করে কাজে ঝাপিয়ে পড়ুন।'

আল্লাহ্র নির্দেশে রাসূল ﷺ প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ আরম্ভ করলে কাফির-মুশরিকদের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত ও অপদস্ত হয়েছিলেন।

[১৬]. অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল র., নূর-নবী, পৃ. ৫০-৫৪।

বিশেষ করে নিজ পরিবার থেকে আবু লাহাব, তার স্ত্রী উম্মে জামিল এবং আবু জেহেল প্রচণ্ডভাবে অত্যাচার শুরু করল। উম্মে জামিল রাসূল ﷺ'র যাতায়াতের পথে কাটা বিছিয়ে দিত। আবু লাহাবের দুই ছেলে ওতবা ও ওতাইবা'র সাথে রাসূল ﷺ'র দুই কন্যা রোকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুমের বিবাহ হয়েছিল ছোটকালে। সূরা লাহাব অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা পিতার নির্দেশে দু'বোনকে বিবাহ বাসরের পূর্বেই তালাক প্রদান করে। ওতাইবা রাসূল ﷺ'র জামা মোবারক ছিড়ে ফেলে এবং প্রচণ্ডভাবে বিয়াদবী করে। তিনি তার জন্য বদ দোয়া করলে এক সফরে একটি বাঘ এসে বহু লোকের মধ্যখান থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় ওতাইবার ঘাড় মটকে রক্ত চুষে খেয়ে চলে গেল।

কোরাইশদের অত্যাচার এক পর্যায়ে চরমে পৌঁছে। অলীদ ইবনে মুগীরা নবীজীকে যাদুকর বলে, অন্যরা পাগল ও কবি বলে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে থাকে। ওকবা নামক এক দুষ্টলোক নবীজীর গলা চেপে ধরে, যখন তিনি বায়তুল্লাহয় নামাযের সিজদায় রত ছিলেন। বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী আবু জেহেলের নির্দেশে একদল দুষ্টমতি লোক সিজদারত অবস্থায় নবীজীর পিঠে পশুর নাড়িভূড়ি এনে চাপিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত। একমাত্র চাচা হযরত আবু তালেবই তাঁকে স্নেহ করতেন এবং তাঁর কাজে নিরবে সমর্থন করতেন।

চন্দ্র বিদারণঃ

রাসূল ﷺকে আবু জেহেল অনেক পরীক্ষা করেছিল। আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতে নবী করিম ﷺ আবু জেহেলের হাতের মুঠোয় লুকায়িত পাথর-কংকর থেকে কালেমা শাহাদাত পাঠ করায়েছিলেন এবং দূরের পাথরকে তার দাবীতে পানিতে ভাসিয়ে নিজের কাছে এনেছিলেন। আবু জেহেল এত মু'জিযা দেখেও এগুলোকে যাদু বলে উড়িয়ে দিল। অবশেষে ইয়েমেন দেশের শাসক হাবীব ইবনে মালেকের সাহায্য প্রার্থনা করল। হাবীব দলবল সহ মক্কায় এসে উপস্থিত হলে আবু জেহেল নবী করিম ﷺ কে তলব করল। হযরত আবু বকর রা. সহ তিনি উপস্থিত হলেন। আবু জেহেলের ইঙ্গিতে হাবীব বলল, আপনি সত্য নবী হলে আকাশের চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখান। নবী করিম ﷺ দু'রাকাত নামায আদায় করে আঙ্গুল মোবারক দিয়ে ইশারা করা মাত্র চাঁদ দু'টুকরো হয়ে আবু কোবাইস নামক পর্বতের দু'দিকে অবস্থান করল। হাবীব পুনরায় বলল, আমি দেশ থেকে আসার সময় মনে মনে একটি নিয়ত করে এসেছি। আপনি আমার মনের গোপন কথাটি বলতে পারলে বুঝে নেব- আপনি সত্য নবী। নবী করিম ﷺ বললেন, তোমার একমাত্র মেয়ে আজন্ম পঙ্গু। তুমি মনে মনে নিয়ত করেছ- আমি সত্য নবী প্রমাণিত হলে তুমি আমার কাছে তোমার মেয়ের

রোগমুক্তির জন্য দোয়া চাইবে। যাও! তোমার মেয়ে আরোগ্য লাভ করেছে এবং সে মুসলমানও হয়ে গেছে। একথা শুনে হাবীব কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু আবু জেহেল আবু জেহেলই রয়ে গেল। হাবীব ইয়েমেনে ফিরে গিয়ে রাতের বেলায় ঘরে পৌছে দেখল- মেয়ে সুস্থ হয়ে পিতার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।[১৭]

সামাজিক বয়কটঃ

ইতিমধ্যে হযরত হামযা রা. ও হযরত ওমর রা.'র মত দুই বীর পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করায় ইসলাম কিছুটা শক্তিশালী হয়ে উঠল। কুরাইশরা চাচা আবু তালেবের নিকট একাধিকবার এসে মুহাম্মদ ﷺ'র বিরুদ্ধে নালিশ করল। বলল, যে কোন মূল্যে তাঁকে নতুন দ্বীন প্রচার থেকে বিরত রাখতে হবে। নতুবা তাঁকে হত্যা করার জন্য কুরাইশদের হাতে সোপর্দ করতে হবে। কিন্তু আবু তালেব রাসূল ﷺ'র পক্ষে শক্ত অবস্থান নেয়ায় কুরাইশরা ব্যর্থ হল। অবশেষে তারা সম্মিলিতভাবে ছয় বছর যাবৎ বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও ইসলামের প্রচার-প্রসার বন্ধ করতে ব্যর্থ হল, তখন তারা মহানবী ﷺ'কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এতদ্দর্শনে আবু তালেব সহ বনী হাশেম ও বনী আব্দুল মোত্তালেব'র লোকজন নিয়ে নবী করিম ﷺও মুসলমানগণ মক্কার অদূরে শিয়াবে আবি তালেব নামক গিরিকন্দরে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু চাচা আবু লাহাব কোরাইশদের সাথেই রয়ে গেল। তারা এক চুক্তিনামা তৈরী করল। তাতে লেখা ছিল- সামাজিক লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-শাদী, বেচা-কেনাসহ যাবতীয় সামাজিক বিষয়ে বনী হাশেম ও বনী আব্দুল মোত্তালেবের সাথে বয়কট করা হল। কোরাইশদের সব সর্দার এতে স্বাক্ষর করল। উক্ত চুক্তিনামা বাক্সে তালাবদ্ধ ও সীলগালা করে বায়তুল্লাহয় সংরক্ষিত করল। একাধারে তিন বছর নির্বাসন জীবনে খাদ্যের অভাবে মুসলমান ও নবী পরিবারের দুর্দশা চরম সীমায় পৌছেছিল।

একদিন নবী করিম ﷺ চাচা আবু তালেবকে বললেন, চাচাজান! কোরাইশদের চুক্তিনামার কার্যকরিতা আর নেই। কেননা, উঁই পোকা চুক্তিনামায় আল্লাহর নাম ছাড়া আর সব কিছু খেয়ে ফেলেছে। আবু তালেব আবু জেহেলের নিকট গিয়ে বললেন, আমার ভাতিজা একটি গায়েবী সংবাদ দিয়েছেন। তোমাদের চুক্তিনামার সব শর্তাবলী নাকি উঁই পোকায় খেয়ে ফেলেছে। কেবলমাত্র আল্লাহর নামটুকুই নাকি অক্ষত রয়েছে। যদি আমার ভাতিজার কথা সত্য না হয়, তাহলে আমি নিজে তাঁকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করে দেব।

---

১৭. অধ্যক্ষ এম এ জলিল র., নূর-নবী, পৃ. ৫৮-৬০।

আর যদি সত্য হয় তবে খামাকা তাঁকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? একথা শুনে আবু জেহেল আনন্দে লাফিয়ে উঠল: এই তো সুযোগ। সকল সর্দারকে ডেকে এনে আবু জেহেল বাক্স খুলে ফেলল। দেখল নবীজীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তখনই তাদের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হয়ে গেল। ফলে নবুয়তের সপ্তম বছর থেকে তিন বছর পর দশম বৎসরে নির্বাসন থেকে মুক্তি পেয়ে নবীজী মক্কায় ফিরে আসলেন। এরূপ অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও তিনি আল্লাহর একত্ব ও মহত্ব প্রচারে কুণ্ঠিত হননি।

আমুল হুযন তথা দুঃখের বছর:

নবী করিম ﷺ'র বয়স যখন উনপঞ্চাশ বছর আট মাস এগার দিন, তখন ছিল রমযান মাসের তেইশ তারিখ। ঐ তারিখেই নবী করিম ﷺ'র প্রতিপালনকারী চাচা আবু তালেব ইন্তেকাল করেন। এর পাঁচ দিন পর ২৮ রমযান নবীজীর দুঃসময়ের জীবন সঙ্গিনী হযরত খদীজা রা.ও জান্নাতবাসী হন। (অন্য মতানুযায়ী ১০ রমযান তাঁর ওফাত দিবস।) সবচেয়ে আপন জনের মৃত্যুতে তিনি এতই শোকাভিভুত হয়ে পড়েন যে, ঐ বছরকে (নবুয়তের দশম বছর) তিনি শোকের বছর বলে ঘোষণা করেন।

তায়েফ গমন:

হযরত খদীজা রা. ও হযরত আবু তালেবের ইন্তেকালের পর কোরাইশদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায় দুধুমা হযরত হালিমা সা'দিয়া রা.'র দেশ তায়েফে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নবী করিম ﷺ গমণ করেন। সাথে ছিলেন পালকপুত্র হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রা.। উদ্দেশ্য ছিল- তায়েফ যেহেতু দুধুমা'র দেশ, হয়ত তারা নবীজীর প্রতি কিছুটা নমনীয় হবে। কিন্তু তাদের অমানুষিক ও অমানবিক ব্যবহার ও অত্যাচার কোরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তারা হেদায়েত গ্রহণ তো দূরের কথা বরং তাদের দুষ্ট ছেলের দলকে নবীজীর পিছনে লেলিয়ে দিল। তারা নবীজীকে পাগল সাব্যস্ত করে পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর দেহ মোবারক ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল। দেহ মোবারক থেকে রক্ত মোবারক প্রবাহিত হয়ে জুতা মোবারকে ঢুকে কদম মোবারকের সাথে রক্ত মোবারক জমাট বেধে গিয়েছিল। জুতা খুলার সময় কদম মোবারকের নিম্নাংশের চামড়া মোবারক সহ উঠে গিয়েছিল। বসন্ত রোগীর শরীরের ন্যায় মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর শরীরে ক্ষত চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

এ সময় হযরত জিব্রাঈল আ. আল্লাহর আদেশে এসে সমগ্র তায়েফবাসীকে ধ্বংস করার অনুমতি চাইলে তিনি ধ্বংসের অনুমতির পরিবর্তে আল্লাহর দরবারে তাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করলেন। বললেন, আমি তো ধ্বংস করার জন্য

আসিনি বরং ধ্বংস থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছি। এদের থেকে একজনও যদি ঈমান গ্রহণ করে মুসলমান হয় তবেই আমার কষ্ট সার্থক হবে।

দশদিন পর তায়েফ থেকে আসার পথে আদ্দাছ নামক এক খ্রিষ্টান গোলাম এবং নাখালা নামক স্থানে নাসিবাঈনের সাতজন জ্বিন রাতের বেলায় নামাযের মধ্যে নবী করিম ﷺ'র কুরআন তিলাওয়াত শুনে মুসলমান হয়।

মি'রাজ:

সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ'র অন্যতম বিস্ময়কর মু'জিযা হল মি'রাজ, যা অন্য কোন নবী-রাসূলের ভাগ্যে জুটেনি। মি'রাজ অর্থ উর্ধ্ব গমনের সিঁড়ি। ২৭ রজব রজনীতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর স্বীয় প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ কে রাত্রিকালীন মুহূর্তের মধ্যে তাঁর দীদার লাভে ধন্য করার জন্য বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস হয়ে সপ্ত আসমান অতিক্রম করে লা মকানে বিশেষভাবে নিয়ে যাওয়াকে মি'রাজ বলা হয়।

মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল রাসূল ﷺ'র একান্ন বছর পাঁচ মাস পনের দিন এবং নবুয়তের এগার বছর পাঁচ মাস পনের দিনের মাথায়। রজব মাসের ছাব্বিশ তারিখ দিবাগত সাতাশ তারিখ রাতের শেষাংশে সোমবার এই বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয়।

মি'রাজকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ক. মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণকে বলা হয় আসরা, যা পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। এটাকে বিশ্বাস করা আবশ্যক এবং অস্বীকার করা কুফরী আর অস্বীকারকারী হবে কাফের। খ. মসজিদে আকসা হতে সপ্ত আসমান তথা সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত ভ্রমণকে বলা হয় মি'রাজ। এটি মুতাওয়াতির কিংবা মশহুর হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত বিধায় এটার অস্বীকারকারী হবে বিদআতী ও ফাসিক। গ. সিদারাতুল মুন্তাহা থেকে লা-মকান পর্যন্ত ভ্রমণকে বলা হয় ইরাজ। এ পর্যায়ের ভ্রমণ কাহিনী ও মি'রাজের বিভিন্ন আশ্চর্যজনক ঘটনা সমূহ খবরে ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তাই ঐগুলোর অস্বীকারকারী মূর্খ, বঞ্চিত ও হতভাগা হিসাবে বিবেচিত হবে।

মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ সম্পর্কে সূরা বনী ইস্রাঈলের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। আসমান ও লা-মকান পর্যন্ত ভ্রমণ কাহিনী এমন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যেগুলোর বর্ণনাকারী একত্রিশ জন সাহাবী। তাছাড়া সহীহ বুখারী-মুসলিম সহ বহু বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থে এসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল ﷺ'র মি'রাজ হয়েছিল চৌত্রিশ বার। তন্মধ্যে একবার সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় আর বাকীগুলো স্বপ্নে রূহানীভাবে। তাফসীরে রূহুল বয়ান গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, قال الشيخ الاكبر قدس سِرُّهُ اَنَّ معراجه عليه السلام اربع وثلاثون مـرّةً واحـدةً بجسـده والبـاق بروحـه শেখে আকবর কুদ্দিসা সিররূহু বলেন, রাসূল ﷺ'র মি'রাজ হয়েছিল ৩৪ বার। তন্মধ্যে একবার হয়েছিল সশরীরে বাকীগুলো হয়েছিল রূহানীভাবে। এই মি'রাজের মাধ্যমে নবী করিম ﷺ একদিকে স্বয়ং স্রষ্টার দীদার লাভের মাধ্যমে প্রিয়জন হারানো ও তায়েফ বাসীর দেয়া দুঃখ-কষ্ট ভুলে আত্মার প্রশান্তি লাভ করলেন অপরদিকে বহু মর্যাদার অধীকারী হলেন। যেমন- বাইতুল মোকাদ্দাসে সকল নবীগণের ইমামতির মাধ্যমে ইমামুল আম্বিয়া উপাধি লাভ, প্রত্যেক আসমানে বিভিন্ন নবী-রাসূলগণের সাক্ষাত লাভ, জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন, নেকী-বদীর পরিণাম, যমিনে বশরী, আসমানে মলকী, তদূর্ধে নূরানী ছুরতের প্রকাশ, নিরাকার আল্লাহর দীদার, তাঁর সাথে কথোপকথন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য উপহার স্বরূপ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায লাভ করেছেন।

হিজরত ও হিজরী সনঃ

৬২০ খ্রিষ্টাব্দে মদীনা থেকে হজ্ব পা .নের জন্য ছয়জন খাযরাজ গোত্রের লোক মক্কায় আসলে রাসূল ﷺ'র প্রচারিত বাণীতে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেন যে, এক আল্লাহর ইবাদত ছাড়া কোন মূর্তিপূজা, চুরি, পরনিন্দা, শিশু হত্যা অথবা যে কোন ঘৃণ্য কাজ করবে না। মদীনায় গিয়ে তারা মহানবীর আবির্ভাব এবং তাঁর সত্যের বাণী প্রচার সম্পর্কে মদীনাবাসীকে অবহিত করলেন। পরবর্তী বছর ৬২১ খ্রিষ্টাব্দে বারজন মদীনাবাসী হজ্ব মৌসুমে রাসূলুল্লাহ ﷺ'র সাথে সাক্ষাত করেন। এদের মধ্যে দশজন ছিল খাযরাজ ও দুইজন ছিল আউস গোত্রের। মক্কা ও মিনা ময়দানের মধ্যবর্তী আকাবা নামক স্থানে হযরতের সাথে সাক্ষাত করে তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় প্রত্যবর্তন করে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করার অঙ্গীকার করেন। ইহাই ইসলামের ইতিহাসে 'আকাবার প্রথম শপথ' নামে পরিচিত।

পরবর্তী বছর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মোট ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা মদীনাবাসী রাসূল ﷺ'র সাথে আকাবায় গোপনে রাতে মিলিত হয়। তাঁরাও প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তাঁরা আল্লাহর একত্ববাদ ও দ্বীন ইসলামের যাবতীয় নীতি মেনে চলবেন এবং জান-মাল দিয়ে হযরতকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন। ইহাই 'আকাবার দ্বিতীয় শপথ' নামে পরিচিত। এই প্রতিজ্ঞার ফলে মহানবী ﷺ ধর্ম

প্রচারের নিমিত্তে মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদীনায় হিজরত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

কুরাইশদের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে নবী করিম ﷺ সাহাবাগণকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। সাহাবাগণ একা একা ও দলে দলে মদীনায় হিজরত করতে লাগলেন। যিলহজ্ব মাসের শেষ তারিখে নবী করিম ﷺ হযরত আবু বকর রা.কে ইঙ্গিতে বললেন, হে আবু বকর! তুমি প্রস্তুত থেকো। যে কোন সময় আল্লাহর পক্ষ হতে মক্কা ভূমি ত্যাগ করার নির্দেশ আসতে পারে। আবু বকর রা. খুশীতে বলে উঠলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আপনার সঙ্গী হব? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি আমার জীবনের সাথী, হিজরতের সাথী, কবরের সাথী, হাশরের সাথী এবং বেহেশতেরও সাথী। আমি প্রথম, তুমি দ্বিতীয়। এই গোপন ইঙ্গিত শুনে হযরত আবু বকর রা. পরদিন পহেলা মহররম তারিখে বাজার থেকে আটশত দেরহাম দিয়ে দু'টি উট ক্রয় করে নবী করিম ﷺ'র খেদমতে পেশ করলেন। একটির নাম রাখা হল 'কাসওয়া' এবং অপরটির নাম রাখা হল আদ্‌বা। হিজরতের প্রাথমিক প্রস্তুতি পহেলা মহররম দু'টি উট খরিদের মাধ্যমে শুরু হয় বলে মহররমের পহেলা তারিখ থেকে হিজরি সন গণনা করা হয়। যদিও হিজরি সন প্রবর্তন করেন সতের বছর পরে হযরত উমর রা.।

দারুন নাদওয়া'র বৈঠক :

মহররম ও সফর মাসে কোরাইশ সর্দারগণ নানা চিন্তা-ভাবনা করে অবশেষে সফর মাসের শেষ শনিবারে দারুন নাদ্‌ওয়া নামক মিলনায়তনে এক পরামর্শ সভা আহ্বান করল। পরামর্শ সভায় মক্কার বিভিন্ন গোত্রের সর্দারগণ সমবেত হল। এতে তিনটি প্রস্তাব উত্থাপিত হল। ক. রাসূল ﷺ কে বন্দী করে রাখা, খ. দেশ থেকে বহিষ্কার করা এবং গ. হত্যা করা। শয়তান নজদ দেশের এক বৃদ্ধের আকৃতি ধারণ করে উক্ত সভায় উপস্থিত হয়ে শেষ প্রস্তাবটির প্রতি সমর্থন জানাল এবং এটিই অধিক মঙ্গলজনক ও বুদ্ধিমানের কাজ বলে উল্লেখ করে। সে আরো বলল, প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা সম্মিলিত ভাবে এ কাজে অংশ নেবে। অতএব সভায় শেষ প্রস্তাবটিই গৃহীত হল।

ওদিকে আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাঈল আ.'র মাধ্যমে কোরাইশদের দূরভিসন্ধি ও প্রস্তুতির সংবাদ নবী করিম ﷺ কে জানিয়ে দিলেন এবং আজ রাতেই হিজরত করার আদেশ দেন। আদেশ পেয়ে রাসূল ﷺ হযরত আলী রা.কে নিজের বিছানায় শোয়ায়ে চাদর আবৃত করে দিলেন আর বললেন, আমার কাছে মানুষের গচ্ছিত আমানতের মাল ফেরৎ দিয়ে তুমি মদীনায় চলে যেয়ো।

ইতিমধ্যে দারুন নাদওয়ার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সত্তর কিংবা একশত কাফের যুবক রাসূল ﷺ'র ঘর ঘেরাও করে রেখেছে। তিনি এক মুষ্টি ধূলা হাতে নিয়ে সূরা ইয়াসীনের নয় নম্বর আয়াত পাঠ করে ফুঁক দিয়ে ঘর থেকে শত্রুদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক শত্রুর মাথায় ও চোখে সে ধূলা পৌছিয়ে দিলেন। তারা অন্ধের ন্যায় হয়ে গেল। এ সুযোগে তাদের সামনে দিয়েই তিনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। অথচ তাদের কেউ তাঁকে দেখতে পেল না। রাতের বেলায় তিনি হযরত আবু বকর রা.'র বাড়ীতে গিয়ে ঘরের দরজায় আস্তে করে কড়া নাড়া দিলেন। হযরত আবু বকর রা. সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে দরজা খুললেন। রাতের বেলায়ই প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র নিয়ে আবু বকর রা. সহ মক্কার দক্ষিণে অবস্থিত সাওর পর্বতের দিকে রওয়ানা দিলেন। নবী করিম ﷺ পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে পথ চলছিলেন যেন পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞরা চিনে না ফেলে। তিনি দুর্বল হয়ে পড়লে আবু বকর রা. তাঁকে নিজ কাঁধে করে সাওর পর্বতের চূড়ায় উঠলেন। সেখানে দেখতে পেলেন একটি পুরাতন গুহা। প্রথমে গুহায় হযরত আবু বকর রা. নামলেন। তারপর গুহার ছিদ্রগুলো কাপড় ছিঁড়ে তা দিয়ে বন্ধ করলেন। একটি ছিদ্র বন্ধ করার মত কিছুই ছিল না। তাই তিনি নিজ পা দিয়ে সে ছিদ্রটি বন্ধ করলেন যেন কোন সাপ-বিচ্ছু রাসূল ﷺ কে কষ্ট না দেয়। নবী করিম ﷺ ক্লান্ত হয়ে আবু বকর রা.'র কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে উম্মে গায়লান নামক এক বৃক্ষ অন্য স্থান থেকে এসে গুহার মুখ ঢেকে ফেলল। মাকড়সা এসে জাল বুনল এবং এক জোড়া কবুতর এসে বাসা বাঁধল। যে গর্তের মুখে হযরত আবু বকর রা. পা রেখেছিলেন সে গর্তের ভিতর ছিল একটি বিষাক্ত সাপ। সাপটি তাঁর পায়ে দংশন করল। সর্প বিষ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। সাপের বিষের প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক বিষক্রিয়া তিনি সহ্য করলেন নবীর আরামের ব্যাঘাত ঘটবে বলে। হঠাৎ দু' ফোটা তপ্ত অশ্রু নবী করিম ﷺ'র পবিত্র চেহারায় ঝড়ে পড়লে নবী করিম ﷺ এর কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন আবু বকর রা.কে সাপে দংশন করেছে। তিনি একটু থু থু মোবারক দংশিত স্থানে মালিশ করে দিলে সাথে সাথে বিষক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

ওদিকে বিছানায় নবী করিম ﷺ কে না পেয়ে কোরাইশ যুবকরা চর্তুদিকে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিল। পদরেখা বিশেষজ্ঞ দল নিয়ে উমাইয়্যা ইবনে খলফ পদচিহ্ন ধরে সাওর পর্বতে এসে উপস্থিত হয়। এখানে এসে পদচিহ্ন আর দেখতে পেল না। উমাইয়্যা বলল, নিশ্চয়ই এই গুহাতেই তিনি লুকিয়ে আছেন। অন্যরা বলল, গুহার মুখে বৃক্ষ, মাকড়সার জাল আর কবুতরের বাসা। সুতরাং

এখানে অনেক দিন যাবৎ কারো প্রবেশ হয়নি- এ বলে দলবল অন্য দিকে ছুটে গেল। এভাবে আল্লাহ তায়ালা আপন হাবীবকে রক্ষা করলেন। সাওর পর্বতের গুহায় রাসূল ﷺ ও হযরত আবু বকর রা. তিন রাত অবস্থান করেন। এ সময় গুহায় তাঁর অনেক মু'জিযা প্রকাশিত হয়। গুহায় অবস্থানকালে হযরত আবু বকর রা.'র পুত্র আব্দুল্লাহ এবং কন্যা আসমা রা. তাঁদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করতেন।

মদীনার পথেঃ

তিন দিন পর রাসূল ﷺ হযরত আবু বকর রা.কে নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হন। নবী করিম ﷺ 'কাসওয়া' নামক উটে এবং আবু বকর রা. আদবা নামক উটে আরোহণ করলেন। পথ পদর্শক হিসাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আরিকত নামক জনৈক অমুসলিম ব্যক্তিকে সাথে নিলেন। সাগরের উপকূল ধরে মদীনার পথে চলল এই কাফেলা। পথিমধ্যে উম্মে মা'বাদ নামক জনৈক বেদুইন মহিলার ঘরে কাফেলা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন এবং দুধ বিহীন ছাগী থেকে প্রচুর পরিমাণ দুধ দোহন করে নবী করিম ﷺ সবাইকে পান করালেন। সুরাকা ইবনে মালেক নামক জনৈক ব্যক্তি একশত উটের পুরস্কারের লোভে নবী করিম ﷺ'কে ধরতে গেলে নবীজীর নির্দেশে জমিন তাকে সাতবার গ্রাস করেছিল এবং কাকুতি-মিনতি করে ক্ষমা চাইলে প্রতিবার জমিন তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। পরিশেষে সে তাওবা করে অন্যান্য অনুসন্ধানকারীকে নবী করিম ﷺ থেকে ফিরিয়ে রাখার শর্তে মুক্তি লাভ করে মক্কায় ফিরে গেল।

মদীনাবাসীর অভ্যর্থনাঃ

নবী করিম ﷺ মদীনার পথে রওয়ানা দেয়ার খবর মদীনা শরীফে দ্রুত ছড়িয়ে গেল। মদীনাবাসীরা মহানবীকে অভ্যর্থনা দেয়ার জন্যে প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে বের হয়ে মদীনার দক্ষিণে অবস্থিত হাররা নামক স্থানে প্রতীক্ষায় থাকত, দুপুরে মদীনায় ফিরে যেত। নবীর আগমণ বার্তা শুনে তারা আনন্দে মেতে উঠল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে তাদের সৌভাগ্যের রবি উদিত হল। একজন ইহুদী ঘরের ছাদের উপর থেকে দূরে নবী করিম ﷺ'র কাফেলা দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল- হে আউস ও খাযরাজ গোত্র! তোমাদের প্রতীক্ষার মেহেমান এসে গেছেন। মদীনা বাসীগণ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে দৌড়ে এসে নবী করিম ﷺ কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। তিনি ১২দিন সফর করার পর ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার দুপুরে মদীনার দক্ষিণে কোবা নামক শহরে এসে পৌছলেন। বনী আমর গোত্রে তিনি সাময়িকভাবে অবস্থান করেন এবং সেখানে প্রথম মসজিদ মসজিদে কোবা নির্মাণ করলেন। সেখানে মতান্তরে

৫, ১২, ২২ দিন অবস্থান করার পর তিনি জুমার দিন মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে বনী সালেম মহল্লায় পৌছে জুমার নামাযের সময় হলে একশত জন সাহাবী মুসল্লি নিয়ে তিনি জুমার নামায আদায় করেন। তারপর কাসওয়া নামক উটে আরোহণ করে তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন। সে দিন মদীনায় আনন্দের মিছিল বের হয়েছিল। যুবক কিশোরের দল মদীনার অলিতে-গলিতে মিছিল বের করে আনন্দ প্রকাশ করেছিল। মুহাম্মদ এসেছেন, আল্লাহ্‌র রাসূল এসেছেন এসব বলে শ্লোগান দিয়েছিল। গৃহিনীরা ঘরের ছাদে চড়ে গাইছিল– طلع البدر علينا - من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا - ما داع لله داع

অর্থ: "ছানিয়াতুল বেদা পর্বতমালা হতে আমাদের উপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে। যতদিন আল্লাহর বান্দারা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকবে ততদিন নবী করিম ﷺ'র আগমণের শুকরিয়া আদায় করা আমাদের উপর ফরয হয়ে গেল।"

নবী করিম ﷺ'র আগমনে ইয়াসরিব হয়ে গেল মদীনাতুন নবী তথা নবীর শহর। রুগ্ন আবহাওয়া হয়ে গেল আরোগ্য দানকারী, মাটি হয়ে গেল রোগ মুক্তির গ্যারান্টি। যাবতীয় অকল্যাণ, অশান্তি দূরীভূত হয়ে কল্যাণ ও শান্তির শহর হল মদীনা।

কবি গোলাম মোস্তফা কত না সুন্দর বলেছেন– "এক আকাশের সূর্য আসিয়া আজ আরেক আকাশে উদিত হইল। উদয়গিরির শিখরে শিখরে এতদিন ছিল শুধু ঝঞ্ঝা মেঘের তুমুল গর্জন আর সূর্যের পথ রোধের নিষ্ফল প্রয়াস। কিন্তু সূর্যের তাতে কতটুকু ক্ষতি হইল? মেঘ লোকের বহু উর্ধ্বপদ দিয়া গোপনে গোপনে সূর্য আরেক দিগন্তে আসিয়া কখন যে হাসিয়া দাড়াইল, ঝঞ্ঝা ও বজ্র-বাদল তাহা জানিতেও পারিল না। ফল হইল এই যে, উদয়-অচলকে সে খানিকটা দরিদ্র করিয়া আসিল।"[১৮]

মহানবী ﷺ'র মক্কা ত্যাগ করে মদীনা হিজরত ইসলামের নবযুগের সূচনা হয়। স্বদেশ ত্যাগকারীরা মুহাজির এবং মদীনাবাসীগণ আনসার (সাহায্যকারী) নামে পরিচিত হলেন। নিঃসন্দেহে হিজরত ইসলামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৮. কবি গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, পৃ. ১৩৭।

বাহ্যত: কোরাইশদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেলেও আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী রাসূল ﷺ'র হিজরত ছিল বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান। হিজরতের ঘটনায় রাসূল ﷺ'র অসংখ্য মু'জিযা প্রকাশিত হয়।

খোদার কী মহিমা! ক'দিন আগে যিনি ছিলেন নিজ দেশে নির্যাতিত, নীপীড়িত, বিতাড়িত আজ তিনি পরদেশে সমাদৃত ও মহা সম্মানিত। আজ হতে মদীনা তাঁর স্বদেশ হল। মদীনাবাসীরা তাঁর ভাই হওয়ার গৌরব লাভ করল। মদীনার মাটি ও আবহাওয়া শেফা তথা আরোগ্য দানকারী মহা ঔষধে পরিণত হল, ইয়াসরিব পরিবর্তন হয়ে মদীনাতুন নবী, মদীনা মুনাওয়ারা, মদীনায়ে তায়্যেবা, মদীনা শরীফ ইত্যাদি পবিত্র নামে খ্যাত হল। সর্বোপরি রাসূল ﷺ'র বাসস্থান ও রওযা মোবারকের অধিকারী হয়ে মদীনা শরীফ পৃথিবীতে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছে।

রাসূল ﷺ নবুয়তের তের সালে মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল তিপ্পান্ন বছর। নবী করীম ﷺ যে বছর হিজরত করেছিলেন, সে বছরের মহররম মাস থেকেই হিজরি সন গণনা করা হয়। কারণ হযরত আবু বকর রা. হিজরতকালে ব্যবহারের জন্য আটশত দিরহাম দিয়ে দু'টি উট কিনে রাসূল ﷺ'র খেদমতে পেশ করেছিলেন। হিজরতের সতের বছর পর ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রা. হিজরি সন প্রবর্তন করেন।

মদনী জীবন:

রাসূল ﷺ মদীনায় প্রবেশ করলে পথিমধ্যে মদীনার সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা অতি উৎসাহিত হয়ে রাসূল ﷺ'র উটের রশি ধরে নিজেদের ঘরে তাশরীফ নেওয়ার জন্য নিবেদন করতে লাগল। তখন তিনি এরশাদ করলেন- তোমরা উটের রশি ছেড়ে দাও, উট আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত। যে জায়গায় অবস্থান করা আল্লাহর ইচ্ছা উট আপনা আপনিই সে স্থানে বসে পড়বে। উট চলতে চলতে নবী নাজ্জার গোত্রের দুই ইয়াতিম শিশু সাহল ও সোহায়েল-এর খেজুরের আড়তে পৌছে বসে পড়ল- যেখানে বর্তমান মসজিদে নববী অবস্থিত। পাশেই ছিল হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর ঘর। উট পুনরায় উঠে চলে গেল আবু আইয়ুব আনসারী রা.'র গৃহে। সেখানে উট বসে পড়ল। নবী করিম ﷺ এরশাদ করলেন- এখানেই আমার অবস্থান নির্ধারিত হয়েছে। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. মাল-সামান নিজ গৃহে তুলে নিলেন। তিনি নবী করিম ﷺ'র নানার বংশ বনু নাজ্জারের লোক। এই গৃহ সম্পর্কে আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে আল্লামা ইবনে কাসির র. বলেন, চৌদ্দশত বছর পূর্বে ইয়েমেনের বাদশা আবু কোবাব তিব্বা ইয়াসরিব শহর ধ্বংস করার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়।

ইহুদী আলেমগণ তাকে বলেছিল- আপনি এই শহর ধ্বংস করতে পারবেন না। কারণ, এখানে শেষ যুগের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ হিজরত করে স্থায়ী বাসস্থান বানাবেন। একথা শুনে তিব্বা বাদশা সাথে সাথে নবীজীর উপর গায়েবী ঈমান আনেন। তার এই অগ্রীম ঈমান গ্রহণ আল্লাহ তায়ালার দরবারে গৃহীত হয়। তিব্বা বাদশা নবী করিম ﷺ'র শানে একটি কবিতা লিখে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা.'র পূর্ব পুরুষগণের কাছে হস্তান্তর করে বলেন- আমার এই কবিতা বা পত্রখানা তোমরা শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ'র খেদমতে পৌছিয়ে দিও। ঐ কাব্যপত্র খানা আবু আইয়ুব আনসারী রা.'র পূর্ব পুরুষগণ সযত্নে সংরক্ষণ করতে থাকেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ কাব্যপত্রের মালিক হন। নবী করিম ﷺ আবু আইয়ুব আনসারী রা.'র কাছ থেকে ঐ কাব্যপত্রটি তলব করেন। আবু আইয়ুব আনসারী রা. ঐ পত্র সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না। নবী করিম ﷺ নিজে পুরাতন কাগজ-পত্রের মধ্য থেকে উক্ত পত্রখানা বের করলেন। পত্রটিতে লেখা ছিল–

شَهِدْتُ عَلَى اَحْمَدَ اَنَّهُ + رَسُوْلٌ مِنَ اللهِ بَارِئُ النَّسَمِ

فَلَوْ مُدَّ عُمْرِهِ + لَكُنْتُ وَزِيْرًا لَهُ وَابْنُ عَمِّ

وَجَا هَدْتُ بِالسَّيْفِ اَعْدَائَهُ + وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ هَمِّ

অর্থ: "আমি (তিব্বা) সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং ঈমান আনছি যে, আহমদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত রাসূল এবং মানব সন্তানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আমার বয়স যদি তাঁর যুগ পর্যন্ত দীর্ঘ হত, তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর পরামর্শক (উযির) হতাম এবং চাচত ভাইয়ের ন্যায় তাঁর সাহায্যকারী হতাম। আমি তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করতাম এবং তাঁর মনের ব্যথা দূর করে দিতে চেষ্টা করতাম।"[১৯]

মসজিদে নববী নির্মাণ:

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. তাঁর দোতলায় রাসূল ﷺ'কে থাকতে অনুরোধ জানালেও তিনি নীচ তলায় থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কারণ এতে লোকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাত ও সামাজিক কাজের জন্য সুবিধাজনক ছিল। প্রায় সাত মাস পর্যন্ত তিনি আবু আইয়ুব আনসারী রা.'র ঘরের নীচ তলায় অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। দশ দীনার দিয়ে মসজিদের জায়গাটুকু খরিদ করা হয়। হযরত আবু বকর রা. এই জায়গার মূল্য পরিশোধ করেন। মসজিদের কিবলা ছিল বায়তুল

[১৯]. আল্লামা ইবনে কাসীর, ৭৭৪হি., আল বিদায়া ওয়ান্নিহায়া, খণ্ড-২, পৃ. ১৬।

মোকাদ্দাসের দিকে। দরজা ছিল তিনটি। বাবুর রহমত, বাবুন নবী এবং অপর দরজাটি ছিল পিছনের দিকে। মসজিদটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ একশত হাত ছিল। দেওয়াল ছিল কাঁচা ইটের, খুঁটি খেজুর গাছের এবং ছাদ ছিল খেজুর পাতার ছাউনি। সতের মাস পর্যন্ত কিবলা ছিল উত্তর-পশ্চিমে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে। কিবলা পরিবর্তনের পর মেহরাব দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ মুখী করা হয়। মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিণ পূর্ব কোণে কয়েকটি হুজরা নির্মাণ করা হয়, হযরত আয়েশা রা.ও হযরত সওদা রা. প্রমুখ উম্মুল মু'মিনগণের জন্য।

আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন:

নবী করিম ﷺ মদীনা শরীফ হিজরত করার পর মক্কার মুসলমানগণ দলে দলে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে মদীনা শরীফে আসতে লাগলেন। মক্কায় বায়তুল্লাহ্ থাকা সত্ত্বেও এক রাকাত নামাযে এক লক্ষ রাকাত নামাযের সাওয়াব হওয়া সত্ত্বেও নবীর প্রেমে মুসলমানেরা মদীনায় ভীড় জমাতে লাগল। যারা মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেছেন তাদেরকে বলা হয় মুহাজির। আর যারা মুহাজির ভাইদেরকে মদীনায় সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছিলেন তাদেরকে বলা হয় আনসার তথা সাহায্যকারী। এমনিতে মদীনাবাসী আনসারগণ ছিলেন গরীব। মুহাজিরগণের আগমণে আর্থিক সমস্যা আরো প্রকোট হয়ে দাড়াল। মুহাজিরগণ নিজ দেশে বিত্তবান হলেও মদীনায় তারা নিঃস্ব। হিজরতের পঞ্চম মাসে নবী করিম ﷺ আনসারদের সাথে মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দেন। মুহাজিরগণকে আনসারদের মধ্যে বন্টন করে বিভিন্ন স্থানে পুনর্বাসিত করলেন। আনসারগণ আনন্দ চিত্তে এই বন্টন মেনে নিলেন। তারা মুহাজির ভাইগণকে আপন ভাইয়ের মর্যাদা দিয়ে সম্পত্তিতে সম অংশীদার করে নিলেন। এমনকি দুই জন স্ত্রী থাকলে একজনকে তালাক দিয়ে মুহাজির ভাইয়ের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। অভাব অনটন সত্ত্বেও তারা নিজেরা উপবাস থেকে কৌশলে মুহাজির ভাইকে খাবার খাওয়ায়ে দিতেন। আনসারগণের এই ত্যাগ ও উদারতা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসা করে বলেন–

وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ "আনসারগণ নিজেরা অভাব গ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও মুহাজির ভাইদেরকে অগ্রাধিকার দান করে।"[২০]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ

[২০]. বুখারী, পৃ. ৭২৫, হাদিস নং ৪৭০০, অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল র., নূরনবী, পৃ. ১০৮।

مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ অর্থ: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি তাদের বন্ধুত্ব তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী-চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুত তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ সে সবই দেখেন।[২১]

উক্ত আয়াতে দেশ ত্যাগকারী দ্বারা মুহাজির আর সাহায্যকারী দ্বারা আনসারদেরকে বুঝানো হয়েছে। মূলত নবী করিম ﷺ মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করার পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত মক্কার মুসলমানদের উপর হিজরত করা ফরয ছিল।

মদীনার সনদ:

হিজরতের পর হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র প্রধান কর্তব্য ছিল কলহ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত মদীনাবাসীদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃ-সংঘ গঠন করে হিংসা, বিদ্বেষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চিরতরে উচ্ছেদ করা। 'বুয়াস' এর যুদ্ধে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় জড়িত হয়ে পড়ে। বানু কুরাইযা ও বানু নযীর আউস এবং বানু কাইনুকা খাযরাজের পক্ষ সমর্থন করে। এর ফলে মদীনার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি জটিল ও শোচনীয় হয়ে পড়ে। মদীনাবাসীগণ সংশয়, উদ্বেগ ও অস্থিরতার মধ্যে কালাতিপাত করতে থাকে। ধর্মীয় অধঃপতন ও হতাশা, সামাজিক অসন্তোষ ও কুসংস্কার এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মদীনাবাসীগণ একজন মহাপুরুষ ও ত্রাণকর্তা রূপে হযরত মুহাম্মদ ﷺ'কে সাদরে সসম্মানের সাথে মদীনায় আমন্ত্রণ জানায়। তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে মদীনায় এসে হয়েছিলেন সম্মানিত অতিথি, নব জাগরণের অগ্র নায়ক, ভবিষ্যৎ ইসলামী কমনওয়েলথের প্রতিষ্ঠাতা, মিলনের ও শান্তির দূত, আশার আলো ও বিশ্ব মানবের ত্রাণকর্তা।

মদীনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে হযরত মুহাম্মদ ﷺ একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র স্থাপনের সংকল্প করেন। আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়কে একতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ও অমুসলমান

[২১]. সূরা আনফাল, আয়াত: ৭২।

সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তুলার জন্য তিনি ৪৭টি শর্ত সম্বলিত একটি সনদ প্রণয়ন করেন। ইসলামের ইতিহাসে ইহা 'মদীনার সনদ' (Charter of Madina) নামে পরিচিত।

মদীনা সনদের প্রধান শর্তাবলী নিম্নে প্রদত্ত হল:

১. মদীনা সনদে স্বাক্ষরকারী ইহুদী, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমান সম্প্রদায় সমূহ সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং তারা একটি সাধারণ জাতি (কমনওয়েলথ) গঠন করবে।

২. নব-গঠিত প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হবেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং পদাধিকার বলে তিনি মদীনার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্বময় কর্তা হবেন।

৩. পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে, মুসলমান ও অমুসলমান বিনা দ্বিধায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

৪. কেউ কোরাইশদের সাথে কোন প্রকার সন্ধি স্থাপন করতে পারবে না, কিংবা মদীনাবাসীগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কুরাইশদেরকে সাহায্য করতে পারবে না।

৫. স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায়কে বহি:শত্রু আক্রমণ করলে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্মিলিত ভাবে বহি:শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করবে।

৬. বহি:শত্রুর আক্রমণে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায় সমূহ স্ব স্ব যুদ্ধ ব্যয়ভার বহন করবে।

৭. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে। এর জন্য অপরাধীর সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

৮. মদীনা শহরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হল এবং রক্তপাত, হত্যা, বলৎকার ও অপরাপর অপরাধমূলক কার্যকলাপ একেবারেই নিষিদ্ধ করা হল।

৯. অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং সর্বপ্রকার পাপী ও অপরাধীকে ঘৃণার চোখে দেখতে হবে।

১০. ইহুদীদের মিত্ররাও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।

১১. দূর্বল ও অসহায়কে সর্বতোভাবে সাহায্য ও রক্ষা করতে হবে।

১২. রাসূল ﷺ'র পূর্ব অনুমতি ব্যতিত মদীনাবাসীগণ কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

১৩. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এর মীমাংসা করবেন।

১৪. সনদের শর্ত ভঙ্গকারীর উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সনদের প্রয়োজনীয়তা:

'মদীনার সনদ' প্রণয়নে হযরত মুহাম্মদ ﷺ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। এই সনদের প্রয়োজনীয়তা ছিল বিবিধ। প্রথমত: শতধা বিভক্ত মদীনাবাসীদের গৃহ যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়ত: জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মুসলমান ও ইহুদী নাগরিকদের সমান অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা। তৃতীয়ত: স্বদেশ ত্যাগী মুহাজেরীনদের মদীনায় বাসস্থান ও জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করা। চতুর্থত: মুসলমান এবং অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী, সদ্ভাব ও পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা। পঞ্চমত: মদীনায় ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সার্বজনীন ধর্ম প্রচার ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

সনদের গুরুত্ব:

প্রথম লিখিত সংবিধান: রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মদীনার সনদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত মদীনা-সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। (First Written Constitution of the World)। আইনের শাসন সর্বপ্রথম মহানবী ﷺ জনগণের মঙ্গলার্থে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃত পক্ষে এটাকে মহাসনদ বা Magna Carta বলা যেতে পারে। মূইর বলেন, "ইহা হযরতের অসামান্য মাহাত্ম্য ও অপূর্ব মননশীলতা শুধু তৎকালীন যুগেই নহে, বরং সর্বযুগে ও সর্বকালের মহামানবের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।"

ভ্রতৃসংঘ ঐক্য: মদীনা-সনদ মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে হিংসা, দ্বেষ ও কলহের অবসান ঘটায়। বিপদে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য, ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংরক্ষণে স্ব স্ব গোত্র যুদ্ধ ব্যয়ভার বহন করার ব্যবস্থা হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতার পরিচায়ক।

রাজনৈতিক ঐক্য: মদীনায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে মদীনা সনদ এক অতুলনীয় রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। রক্তের বদলে রক্তের স্থলে ভ্রতৃত্বের বন্ধনে মদীনাবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়।

ইসলামী গণতন্ত্র: মদীনা-সনদ গোত্র প্রথার বিলোপ সাধন করে। ইসলামী ভ্রতৃত্ববোধের ভিত্তিতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র উপর সমাজ ও ধর্মীয় অনুশীলন

পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হল। স্বৈরচারী শাসন অথবা শেখ তন্ত্র এর পরিবর্তে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রে স্বীকৃতি লাভ করল। ধর্ম ও রাষ্ট্রের সহ-অবস্থানে ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম ও সাম্রাজ্যে পরিণত হল। ঐশী তন্ত্রের আবির্ভাবও হয় একই কারণে।

হিট্টি বলেন, "মদীনা প্রজাতন্ত্রই পরবর্তীকালে বৃহত্তম ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল স্থাপন করে।"

ধর্মীয় উদারতা:

মদীনা-সনদ মুসলমান ও অমুসলমানদের ধর্মে পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিশ্চয়তা বিধান করে। মদীনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা একে অপরের ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এই শর্ত দ্বারা হযরত যে মহানুভবতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন তা বিশ্বের ইতিহাসে সত্যই বিরল। সর্বগুণান্বিত, সর্বশ্রেষ্ঠ যুগান্ত কারী এই মহাপুরুষ তৎকালীন বিশ্বে ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয়ে যে ইসলামী উম্মাহ বা ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা উত্তরকালে ইহা বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করে। এস. এ. কিউ হোসাইনী বলেন, "ইসলামী বিপ্লব গোত্র ভিত্তিক আরববাসীদের নূতন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে ধাবিত করে। অনিশ্চিত জীবিকা সম্বলিত আরব যাযাবরগণ আল্লাহর পথে নিয়মিত সৈনিকরূপে আত্মপ্রকাশ করল।" সুতরাং মদীনা-সনদ হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সমাজ সংস্কারের এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে। বর্ণার্ড লুইস বলেন, এই দ্বৈত মতবাদ (ধর্ম ও রাজনীতি) ইসলামী সমাজে মজ্জাগত ছিল এবং মুহাম্মদ ﷺ'র উম্মা বা প্রজাতন্ত্র ছিল এর ভিত্তি। সময় ও কাল বিচারে ইহা ছিল অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন আরব সম্প্রদায়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থার মাধ্যম ছাড়া ধর্ম প্রকাশিত ও সংগঠিত হওয়ার অন্য কোন উপায় ছিল না। অপর দিকে রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারণা হতে বঞ্চিত আরবদের কেবলমাত্র ধর্মই রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হতে পারে।"

যুদ্ধ ও এর কারণ:

মদীনার অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জড়বাদী পৌত্তলিকগণ ছিল অন্যতম। এদের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। স্বার্থান্বেষী মূর্তিপূজক দল রাসূল ﷺ'র এই ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সহ্য করতে পারেনি। সুযোগ ও সুবিধা লাভের জন্য তারা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে সত্য কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তে তারা গোপনে মহানবীর বিরুদ্ধাচরণ করত। এ জন্যে তাদের 'মোনাফিক' বা প্রতারক বলা হয়। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে মোনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও বহু কু-কর্মের কথা উল্লেখ আছে। এরা ভিতরে ভিতরে মক্কার কুরাইশদের গোপনে অত্যন্ত করে

ইসলাম, মুসলমান ও মহানবী ﷺ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করে। তারা কুরাইশদেরকে বলেছিল- তোমরা বাহির থেকে আক্রমণ করবে আর আমরা ভিতরে থেকে আক্রমণ করব। এভাবে ভিতরে বাইরে উভয় দিক থেকে আক্রমণ করলে মুসলমানরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাদের এরূপ প্রতিশ্রুতি পেয়ে মক্কার কুরাইশরা বারংবার মদীনা আক্রমণ করার সাহস করে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

উল্লেখ্য যে, যুদ্ধ ইসলামের লক্ষ্য নয়। বরং যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফিতনা-ফাসাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন করার জন্য মহানবী ﷺ'র আবির্ভাব হয়। ইসলাম শব্দের অর্থই হল শান্তি, নিরাপত্তা। ইসলাম, মুসলমান এবং ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে বিধর্মীরা সময়-সুযোগ বুঝে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করত। অনিশ্চা সত্ত্বেও মুসলমানরা কেবল আত্মরক্ষা মূলক ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসে অবিচল থাকার কারণে এবং মহানবী ﷺ'র দোয়ার বরকতে এসব যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয় লাভে সক্ষম হন। এ সব যুদ্ধের মধ্যে বদর যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

রাসূল ﷺ'র অংশগ্রহণকৃত যুদ্ধ সমূহঃ

মুসলমানদের উপর যুদ্ধ ফরয হয় হিজরতের পরে। সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হয় হিজরতের পর থেকে। রাসূল ﷺ মদীনা হিজরতের পর দশ বছরকালে মতান্তরে ২৭/২৯/২৫টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে নয়টিতে তিনি স্বয়ং নিজেই যুদ্ধ করেছিলেন। সেগুলো হল- ১. বদর, ২. উহুদ, ৩. খন্দক, ৪. বনু কোরাইযা, ৫. বনী মুস্তালাক, ৬. খায়বর, ৭. মক্কা বিজয়, ৮. হুনায়ন এবং ৯. তায়েফ। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু ইসহাক বলেন, আমি হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা.কে জিজ্ঞাসা করলাম-আপনি রাসূল ﷺ'র সাথে কয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? তিনি বলেন- ১৭টি যুদ্ধে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূল ﷺ মোট কয়টি যুদ্ধ করেছিলেন? তিনি বললেন- উনিশটি।[২২]

ইসলামে বড় বড় যুদ্ধ সমূহ হল সাতটি। যথা- ১. বদর, ২. উহুদ, ৩. খন্দক, ৪. খায়বর, ৫. মক্কা বিজয়, ৬. হুনায়ন এবং ৭. তাবুক। পবিত্র কুরআনে এসব যুদ্ধের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত আকারে কিংবা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূরা আনফাল প্রায় পুরোটাই বদর যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে এটাকে সূরা বদরও বলা হয়। সূরা আলে ইমরানের শেষের দিকে উহুদ যুদ্ধের আলোচনা এসেছে। সূরা

[২২]. বুখারী, পৃ. ৬৪৬, হাদিস নং- ৪২৮৬।

আহযাবের শুরুর দিকে খন্দক, কুরাইযা এবং খায়বর সম্পর্কে আলোচনা বিদ্যমান। সূরা হাশরে বনু নদ্বীরের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতাহ এ হুদাইবিয়া এবং খায়বর সম্পর্কে, সূরা তাওবাতে হুনায়ন ও তাবুক সম্পর্কে, সূরা ফাতাহ ও সূরা নসরে মক্কা বিজয় সম্পর্কে আলোচনা বিদ্যমান।[২৩]

বদর যুদ্ধঃ

বদর যুদ্ধ ইসলামের প্রথম সবচেয়ে বড় সামারিক যুদ্ধ। মদীনা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর নামক স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে এটাকে বদর যুদ্ধ বলা হয়। ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে ১১/১৩ মার্চ মোতাবেক হিজরি দ্বিতীয় সনে ১৭ রমযান জুমাবারে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূল ﷺ ১২ রমযান রবিবারে মদীনা থেকে সাহাবাগণকে নিয়ে বের হন এবং ১৭ রমযান জুমা'র দিন যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ১৯ রমযান রবিবার যুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হন।

এ যুদ্ধে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তন্মধ্যে ৭৭ জন ছিলেন মুহাজির আর ২৩৬ জন ছিলেন আনসার। মুহাজিরগণের পতাকা ছিল হযরত আলী রা.'র হাতে আর আনসারদের পতাকা ছিল হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ রা.'র হাতে। মুসলমানদের ছিল মাত্র দু'টি ঘোড়া, সত্তরটি উট, ছয়টি লৌহবর্ম বা লৌহ পোশাক, আটখানা তলোয়ার। আর এই ছোট্ট কাফেলার প্রধান সিপাহসালার ছিলেন দু'জাহানের সর্দার হযরত মুহাম্মদ ﷺ। অপরদিকে কুরাইশ বাহিনীতে ছিল ১০০০ সৈন্য, ৭০০ উট এবং একশত ঘোড়া ও প্রচুর রসদ। তাছাড়া বহু মদের পাত্র, বহু গায়িকা এবং আনন্দ-উল্লাসের আরো অনেক সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের পরাজিত করে সেখানে কিছুদিন উল্লাস করে ফিরে আসবে। এ যুদ্ধে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ট হলেও সত্যের পক্ষে, আল্লাহর পক্ষে, রাসূল ﷺ'র পক্ষে সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর নির্ভর করে জীবন-মরণ যুদ্ধ করাতে ফেরেশতা দ্বারা আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানরাই বিজয় লাভ করেন।

বদর যুদ্ধের কারণঃ

কুরাইশদের ঈর্ষা ও শত্রুতাঃ বদরের যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল- মদীনায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র প্রভাব ও প্রতিপত্তি ও ইসলামের ক্ষমতা বৃদ্ধি। মাত্র দু'বছরের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ কলহে লিপ্ত মদীনাবাসীকে একটি শান্তি প্রিয় ও সুসংবদ্ধ জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন। এতে কুরাইশরা ঈর্ষান্বিত হয়ে মহানবী ﷺ কে এবং নব-প্রতিষ্ঠিত ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগল।

[২৩]. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ কাদেরী, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৩৪১-৩৪২।

মুনাফিক ও ইহুদীদের বিশ্বাস ঘাতকতা: রাসূল ﷺ মদীনায় হিজরত করার পূর্বে বনী খাযরাজ বংশীয় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মদীনার শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু রাসূল ﷺ'র কারণে তা সম্ভব হয়নি। ফলে সে মক্কার বিধর্মীদের সাথে দূরভীসন্ধিমূলক কার্যকলাপে নিয়োজিত ছিল। সে হযরতের বিরুদ্ধে গোপনে একটি মোনাফিক দল গঠন করে।

পাপিষ্ঠ মোনাফিক দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক ইহুদীরা সংঘবদ্ধ হয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও ইসলামের ধ্বংস সাধনের জন্য তীব্র ষড়যন্ত্র শুরু করে। মদীনার বিশ্বাসঘাতক ইহুদী ও মুনাফিকরা একত্রিত হয়ে মক্কার কুরাইশদেরকে মদীনা আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে।

নাখলার যুদ্ধ:

কুরাইশদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণ ও লুণ্ঠতরাজ বন্ধ করার জন্য রাসূল ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে ১২ জনের একটি দলকে নাখালা প্রেরণ করেন। আব্দুল্লাহ রা.কে একখানা বন্ধ পত্র দিয়ে রাসূল ﷺ বলেছিলেন, দু'দিনের পথ অতিক্রম করে এই পত্রখানা খুলে পড়বে এবং সে মতে আমল করবে। তিনি আদেশ মতে পত্র খুলে পড়লেন এবং এতে আদেশ ছিল যে, "তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী 'নাখলা' স্থানে গিয়ে কুরাইশদের আচরণবিধি লক্ষ্য রাখ। এদের মতি-গতি সম্পর্কে আমাদেরকে অভিহিত কর।"

এরা যখন নাখালায় পৌছলেন তখন রজব মাসের শেষ তারিখ ছিল। সন্ধ্যা বেলায় তারা চারজনের একটি কুরাইশ কাফেলা দেখতে পান। যাদের মধ্যে একজন ছিল আমর ইবনে হাদ্বরামী, দুইজন ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে মুগীরা'র দুই পুত্র ওসমান ও নওফল এবং চতুর্থ জন ছিল হেকম ইবনে কায়সান। সাহাবীর দল পরামর্শ করলেন, যদি এই কাফেলাকে যেতে দেওয়া হয় তাহলে তারা মক্কায় গিয়ে আমাদের সংবাদ জানিয়ে দেবে। আর যদি যুদ্ধ করি তাহলে সম্মানিত মাসের অবমাননা হবে। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হল যুদ্ধ করে শংকামুক্ত থাকাই শ্রেয়। একজনে তীর নিক্ষেপ করলে আমর ইবনে হাদ্বরামীর মৃত্যু হয়। ওসমান ও হেকম বন্দী হয় আর নওফল পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

এ সংবাদ শুনে রাসূল ﷺ ব্যথিত হন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা.'র উপর অসন্তুষ্ট হন। ওদিকে কুরাইশরা চতুর্দিকে এই সংবাদ ছড়িয়ে দিল যে, মুসলমানরা সম্মানিত মাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে। ভুলক্রমে 'পবিত্র মাসে' খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় বলে একটি আয়াতও নাযিল হয়েছিল। নাখালার খণ্ড যুদ্ধকে বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

উল্লেখ্য যে, আমর ইবনে হাদ্বরামী প্রথম কাফের যে সর্বপ্রথম মুসলমানের হাতে মারা যায়। আর মুসলমানের মধ্যে প্রথম কাফির হত্যাকারী হলেন হযরত ওয়াকেদ ইবনে আব্দুল্লাহ তামীমী। কারণ তিনিই তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। ওসমান ও হেকম ছিল ইসলামে প্রথম বন্দী।[২৪]

ঐশী বাণী: কুরাইশদের যুদ্ধাভিযানে রাসূল ﷺ খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় তিনি একটি ঐশীবাণী লাভ করে অনুপ্রাণিত হলেন। وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ "আল্লাহ্‌র পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করুন যারা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করে। তবে সীমালঙ্ঘন করো না, কারণ, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[২৫] এই ঐশী বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কুরাইশ বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য মুসলিম বাহিনী প্রস্তুতি গ্রহণ করল।

শয়তানের প্ররোচনা:

পথিমধ্যে শয়তান সুরাকা ইবনে মালেক কেনানীর রূপ ধারণ করে আবু জেহেলকে বলল, আমি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী কেনানী গোত্রের লোক। আমার এলাকা দিয়ে আপনার বাহিনীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে এবং আমার গোত্রের লোকজন দিয়েও সাহায্য করা হবে। শয়তানের প্ররোচনা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ "হে রাসূল! স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা, যখন শয়তান আবু জেহেলের বাহিনীকে এই বলে উৎসাহিত করেছিল যে, এই যুদ্ধে তোমাদের বিরুদ্ধে কেউ জয়লাভ করতে পারবে না বরং তোমরাই বিজয়ী হবে আর আমি তোমাদের সাথেই থাকব।" এভাবে প্ররোচনা দিয়ে আবু জেহেলকে তার বাহিনী সহ বদর ময়দানে পৌছাতে শয়তান সাহায্য করেছিল। কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হল এবং আসমান থেকে পাঁচ হাজার ফেরেশতা-সৈন্য এসে মুসলমান যুদ্ধ বাহিনীর সাথে যোগ দিলেন, তখন শয়তান পিছু হটতে আরম্ভ করল। এ সময় শয়তানের হাত এক কোরাইশী যুবক হারেছ ইবনে হাশামের হাতে ধরা ছিল। শয়তান নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। হারেছ তিরস্কার করে বলল, এ কি করছ! তুমি আমাদেরকে সাহায্য করবে বলে বলেছ না? এখন পালাচ্ছ কেন? তখন শয়তান হারেছের বুকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পালিয়ে

---

[২৪]. আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৮৩-৮৪ ও তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-৩, পৃ. ৩৩৭।
[২৫]. সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯০।

গেল আর বলল- إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ "আমি তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ালাম। কারণ, আমি যা দেখতে পাচ্ছি (ফেরেশতা) তোমরা তা দেখতে পাচ্ছ না। আমার অন্তরে রয়েছে খোদার ভয়, আর আল্লাহর শাস্তি খুবই কঠিন।"[২৬]

আবু সুফিয়ানের প্ররোচনা:

ইসলামের চির শত্রু আবু সুফিয়ান মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বাণিজ্যের অজুহাতে এক কাফেলা নিয়ে সিরিয়া গমণ করেছিল। সে যুদ্ধাস্ত্র খরিদ করে মক্কার দিকে রওয়ানা দিল। এই কাফেলায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার দিনার মূল্যের ধনরত্মাদি ছিল। উক্ত কাফেলার নিরাপত্তার জন্য চল্লিশ জন সসস্ত্র অশ্বারোহী সাথে রাখল। তারা মদীনার কাছাকাছি পৌছলে জিব্রাঈল আ. উক্ত কাফেলাকে আটক করতে অনুরোধ করেন। তখন রাসূল ﷺ ৩১৩ জন মুজাহিদকে নিয়ে আবু সুফিয়ানের কাফেলার গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। সাওয়ারী কম হওয়াতে একটি সাওয়ারীর উপর কয়েকজন মুজাহিদ পালা করে করে আরোহণ করতেন। হযরত আলী রা. ও হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রা. রাসূল ﷺ'র সাথে ছিলেন। রাসূল ﷺ'র পায়ে হাটার পালা যখন আসল তখন এ দু'জন সাহাবী আরজ করলেন, হুযূর! আপনি আরোহণ করুন, আমরা আপনার পরিবর্তে পায়ে হাটব। রাসূল ﷺ বললেন, আমি তোমাদের অপেক্ষা অক্ষম নই এবং আমি সাওয়াবেরও অমুখাপেক্ষী নই। সুতরাং আমাকেও হাটতে দাও।[২৭]

ওদিকে আবু সুফিয়ান বিভিন্ন আলামত দ্বারা বুঝে গেল যে, মুসলিম বাহিনী আমাদেরকে আক্রমণ করবে। তাই সে দমদম ইবনে আমর গিফারীকে পাঠিয়ে আবু জেহেলের নিকট আশংকার কথা জানিয়ে সাহায্য চাইল। দমদম ইবনে আমর গিফারী নিজের জামা ছিড়ে উটের নাক-কান কেটে হাওদাজকে উল্টো করে রেখে চিৎকার করে মক্কার কুরাইশদেরকে বলে উত্তেজিত করে দিল। আবু জেহেল এ বিপদ সংবাদ শুনে মক্কার সকল লোককে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করল। আবু লাহাব নিজের পরিবর্তে খাস ইবনে হিশামকে পাঠাল। উমাইয়্যা ইবনে খলফ আত্মগোপন করল। তার স্ত্রী কারীমা বিনতে মুয়াম্মর বলল, তুমি তো বড় বাহাদুর ছিলে। আজ কি হল যে, মুসলমানদের মোকাবেলায় ভীত হয়ে গেলে যে? উত্তরে সে বলল, আমার বন্ধু মুয়ায আমাকে সংবাদ দিল যে, মুহাম্মদ

২৬. সূরা আনফাল, আয়াত: ৪৮।
২৭. মাদারেজুন নবুয়্যত, খণ্ড-২, পৃ. ১৪৬

ﷺ বলেছেন যে, উমাইয়্যা আমাদের হাতে মারা যাবে আর মুহাম্মদ ﷺ'র কথা মিথ্যা হয়না। সুতরাং আমি ঐ যুদ্ধে যাব না। কিন্তু আবু জেহেল তাকে ছাড়ল না বরং সঙ্গে নিয়ে গেল।

ওদিকে আবু সুফিয়ান চর মারফত মুসলিম বাহিনীর সংবাদ পেয়ে লোহিত সাগরের উপকূল ধরে অন্য পথে দ্রুতগতিতে মক্কায় পৌছে গিয়েছে। রাসূল ﷺ রাওহা নামক স্থানে পৌছে খবর পেলেন যে, আবু সুফিয়ানের অস্ত্র কাফেলা নিরাপদে মক্কায় পৌছে গেল। এ সময় আল্লাহ তায়ালা নবী করিম ﷺকে জানিয়ে দিলেন যে, আবু জেহেল বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের আক্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়ল। তার বাহিনীর মোকাবেলা করার নির্দেশ দিলেন এবং বিজয়ের সু-সংবাদও প্রদান করলেন।

আবু সুফিয়ান মক্কায় পৌছার পূর্বেই আবু জেহেল তার বাহিনী নিয়ে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। আবু সুফিয়ান কায়েস ইবনে ইমরুল কায়েসের মাধ্যমে আবু জেহেলের নিকট সংবাদ পাঠাল যে, আমরা নিরাপদে এসে গেছি, তোমরা ফিরে এসো। কিন্তু আবু জেহেল সংবাদ পাঠাল যে, বীর পুরুষরা যে কাজে বের হয় তার শেষ পরিণাম না দেখে ক্ষান্ত হয়না। আবু সুফিয়ান তুমিও তোমার কাফেলা নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হও। মুসলমানরা আমাদের মোকাবেলা করার সাহস করল কেন? তাদেরকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দেব। অত:পর আবু সুফিয়ানের কাফেলাও এসে তাদের সাথে যোগ দিল।

রাসূল ﷺ'র পরামর্শ:

রাসূল ﷺ বের হয়েছিলেন আবু সুফিয়ানের অস্ত্র সংগ্রহকারী বাণিজ্যিক কাফেলাকে গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এখন অবস্থা পাল্টে গেল। কুরাইশদের অস্ত্র সজ্জিত এক হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে হবে। তাই তিনি সঙ্গী সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এই বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কিনা। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী মত দিলেন যে, তাদের মোকাবেলা করার শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা তেমন কোন উদ্দেশ্য নিয়েও আসিনি। তখন পর পর হযরত আবু বকর ও ওমর রা. উঠে রাসূল ﷺ'র নির্দেশ পালনের জন্য নিজেকে নিবেদন করলেন। অত:পর হযরত মেকদাদ রা. উঠে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, তা জারি করে দিন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে এমন উত্তর দেব না, যা বনী ইস্রাঈলরা দিয়েছিল মুসা আ.কে। তারা বলেছিল- فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ "যান, আপনি ও আপনার পালনকর্তা গিয়ে লড়াই করুন, আমরা এখানেই বসে থাকবো।" সে সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের আবিসিনিয়ার 'বার্কুলগিমাদ' নামক স্থানে নিয়ে যান, তবুও আমরা জিহাদ করার জন্য আপনার সাথে যাব।

মহানবী ﷺ হযরত মেকদাদ রা. কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হন এবং দোয়া করেন। কিন্তু তখনও আনসারগণের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। আর এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল যে, হুযুর ﷺ'র সাথে আনসারগণের যে সহযোগিতা চুক্তি মদীনা সনদে সম্পাদিত হয়েছিল তা ছিল মদীনার অভ্যন্তরের জন্য। তারা মদীনার বাইরে সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারে বাধ্য ছিল না। সুতরাং মহানবী ﷺ সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেন, বন্ধুগণ! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যে, মদীনার বাইরে গিয়ে আমরা মোকাবেলা করব কিনা? এই সম্বোধনের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসারগণ। হযরত সা'দ ইবনে মোয়ায আনসারী রা. হুযূর ﷺ'র উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদিগকে জিজ্ঞেস করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তখন সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি সাক্ষ্য দান করেছি যে, আপনি যা কিছু বলেন সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, যে কোন অবস্থায় আপনার আনুগত্য করব। অতএব, আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারি করে দিন। খোদার কসম! আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা আপনার সাথে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্য থেকে একজন লোকও আপনার কাছ থেকে সরে যাবে না। আপনি আমাদেরকে কালই শত্রু সম্মুখীন করে দেন, তবুও আমাদের মনে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করাবেন, যা দেখে আনপার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহ্র নামে আমাদিগকে যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যান।

এ বক্তব্য শুনে রাসূল ﷺ অত্যন্ত খুশী হলেন এবং আল্লাহর নামে মোকাবেলার জন্য এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে সুসংবাদ শুনালেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা ওয়াদা করেছেন যে, এ দু'টি দলের (একটি আবু সুফিয়ানের দল অপরটি আবু জেহেলের) মধ্যে একটির উপর আমাদের বিজয় হবে। তিনি আরো বললেন, আল্লাহর কসম, আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখছি। এই কথা বলে তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে এক একটি জায়গা চিহ্নিত করে বলতে লাগলেন- এটি আবু জেহেলের ভূলুণ্ঠিত হওয়ার স্থান। এটি ওতবার, ঐটি অলীদের, অমুক জায়গা শায়বার ইত্যাদি। যুদ্ধের পরে সাহাবায়ে

কেরাম দেখতে পেলেন যে, রাসূল ﷺ যেখানে যার নাম ধরে জায়গা চিহ্নিত করেছিলেন, ঠিক সেই জায়গায়ই তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল।

যুদ্ধের স্থান নির্ণয়:

কুরাইশরা উদওয়াতুল কাসওয়া নামক নিম্নভূমি ও কাদা মাটি যুক্ত স্থানে অবস্থান নেয়। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ উদওয়াতুত দুনিয়া নামক উঁচু ভূমি ও বালুময় স্থানে অবস্থান নেন যেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। স্থানটি যুদ্ধের জন্য অনুপযুক্ত। সে স্থানের সাথে পরিচিত হযরত হোবাব ইবনে মুনযির রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে স্থানটি আপনি গ্রহণ করেছেন তা কি আল্লাহর নির্দেশে? যদি তাই হয় তাহলে বলার কিছুই নেই, নাকি নিজের মত ও যুদ্ধ কৌশল হিসাবে বেছে নিয়েছেন? রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর নির্দেশে নয়; এতে পরিবর্তন করা যেতে পারে। হোবাবের অনুরোধে একটু সামনের দিকে এগিয়ে পানিপূর্ণ স্থানে পৌছে পানির কূপগুলো কব্জা করে নেন। আল্লাহর হুকুমে রাতে বৃষ্টি হল। ফলে কুরাইশদের অবস্থান স্থলটি কর্দমাক্ত হয়ে চলার অনুপযুক্ত হয়ে গেল। পক্ষান্তরে মুসলমানদের বালুময় অবস্থান স্থলটি শক্ত হয়ে যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত হয়ে গেল। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ অর্থ: আর যখন তোমরা ছিলে সমরাঙ্গনের নিকট প্রান্তে আর তারা ছিল দুর প্রান্তে অথচ কাফেলা ছিল তোমাদের চেয়ে নিম্ন ভূমিতে।[২৮]

রাসূল ﷺ'র সুরক্ষা:

হযরত সা'দ ইবনে মোয়ায রা. নিবেদন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার জন্য একটি সুরক্ষিত স্থানে একটি সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে দিতে চাই। সেখানে আপনি অবস্থান করবেন এবং আপনার সাওয়ারী গুলোও সেখানে থাকবে। আল্লাহ না করুক, যদি যুদ্ধে অনাকাঙ্খিত কিছু হয় তবে আপনি দ্রুত মদীনায় অবস্থিত সাহাবীগণের নিকট চলে যাবেন। তারা আপনার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করবেন। রাসূল ﷺ তার এই বীরোচিত প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে দোয়া করলেন। তাঁর জন্য একটু উঁচু ভূমিতে সামিয়ানার ব্যবস্থা করা হল যেখান থেকে তিনি যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করতে পারতেন। তাতে তিনি ও আবু বকর রা. ছিলেন। হযরত সা'দ ইবনে মোয়ায রা. তাঁদের হেফাযতের জন্য তরবারি হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

---

[২৮]. সূরা আনফাল, আয়াত: ৪২।

রাসূল ﷺ'র দোয়া ও সুসংবাদঃ

রাসূল ﷺ উক্ত সামিয়ানায় সিজদায় পড়ে দোয়া করলেন এবং সারা রাত তাহাজ্জুদের নামাযে মশগুল ছিলেন। শয়তান কিছু মুজাহিদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়ে দূর্বল ও ভীত করার চেষ্টা চালায়। এ সময় আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের উপর এক বিশেষ ধরণের তন্দ্রা চাপিয়ে দিলেন। রাসূল ﷺ'র চোখেও সামান্য তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠে বলেন, হে আবু বকর! সুসংবাদ শুন; এই যে জিব্রাঈল আ. টিলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। একথা বলতে বলতে তিনি سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ আয়াতটি পড়তে পড়তে সামিয়ানার বাইরে বেরিয়ে এলেন। আয়াতের অর্থ হল- শীঘ্রই শত্রুপক্ষ পরাজিত হবে এবং পশ্চাদপসরণ পালিয়ে যাবে।

কুরাইশদের ইতস্ততাঃ

যখন উভয় পক্ষের যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন হল তখন কুরাইশরা মুসলমানদের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্যে উমাইর ইবনে ওয়াহাবকে প্রেরণ করল। সে তার ঘোড়া নিয়ে মুসলমানদের চর্তুদিকে ঘুরে এসে বলল, তাদের সংখ্যা প্রায় তিন শতের মত হবে। তবে সে বলল, আমি এমন সম্প্রদায়কে দেখে এসেছি যাদের হাতে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য কেবল তলোয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই। খোদার শপথ! তাদের কেউ অতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কাউকে মারবে না। এটা বাস্তব সত্য কথা, বাকী সিদ্ধান্ত তোমাদের ব্যাপার।

একথা শুনে হাকিম ইবনে হেযাম উতবা ইবনে রবীয়্যাহর নিকট গিয়ে বলল, আপনি কুরাইশদের সর্দার এবং বয়সেও বড়। আমর ইবনে হাদ্বরামীর রক্তের প্রতিশোধ ত্যাগ করুন। এই যুদ্ধ বন্ধ করুন। উতবা সম্মতি প্রকাশ করল এবং কুরাইশদের সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করল– মুহাম্মদ ﷺ'র সাথে যুদ্ধ করে কোন লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না। যদিও আমাদের বিজয় হয় তাহলে দেখা যাবে, কারো ভাই, কারো চাচা, কারো ছেলে, কারো মামা আমাদের হাতেই মৃত্যু হবে। এমন যুদ্ধ কে পছন্দ করবে?

আবু জেহেল এ বক্তব্য শুনে রেগে গেল এবং উতবাকে বকা দিল। আমর ইবনে হাদ্বরামী'র ভাই আমের ইবনে হাদ্বরামীকে ডেকে ভাইয়ের রক্তের প্রতিশোধ নিতে উত্তেজিত করে দিল। ফলে হাকিম ইবনে হেযাম ও উতবা ইবনে রবীয়্যাহ'র সকল প্রচেষ্টা বিফল হল এবং কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হল।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

এক আশেকে রাসূল ﷺ'র বাহানাঃ

একদিকে আবু জেহেল, উতবা নিজেদের সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধ করছে। অন্যদিকে উভয় জাহানের মালিক স্বয়ং রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কিরামগণকে সুশৃখলভাবে সারিবদ্ধ করে যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা দিচ্ছেন। তাঁর হাত মোবারকে ছিল একটি লাঠি। যা দিয়ে তিনি সাহাবীগণকে সোজাভাবে কাতারবন্দী করাচ্ছেন। হযরত সাওয়াদ ইবনে গারবাহ রা. ইচ্ছাকৃত ভাবে কাতারের আগে চলে গেল। রাসূল ﷺ তার বক্ষে লাঠি লাগিয়ে বললেন- সোজা হয়ে সারিবদ্ধ হয়ে যাও। সাওয়াদ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার দরবার হল ইনসাফপূর্ণ। আপনি আমাকে প্রহার করেছেন। আমি এর বদলা নিতে চাই। রাসূল ﷺ তাঁর হাতের লাঠি মোবারক সাওয়াদকে দিয়ে স্বীয় বক্ষ উন্মুক্ত করে দিলেন আর বললেন, বদলা নাও। সাওয়াদ লাঠি ফেলে রাসূল ﷺ'র শরীর মোবারক জড়িয়ে ধরলেন এবং বক্ষ মোবারক চুমু খেতে লাগলেন। রাসূল ﷺ বললেন, সাওয়াদ! একি করছ? উত্তরে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আমার জীবনের অন্তীমকাল। সবার আগে আমিই শহীদ হব। আমার ইচ্ছে হল যে, জীবনের শেষ সময়ে স্বীয় শরীর আপনার শরীর মোবারকের সাথে লাগিয়ে ধন্য হব। তাই বাহানা বানিয়ে ইচ্ছে পুরণ করেছি।

মল্ল যুদ্ধঃ

তৎকালে যুদ্ধের নিয়ম ছিল প্রথমতঃ সামনাসামনি তথা মুখোমুখি যুদ্ধ হত। তাই কুরাইশদের পক্ষ থেকে প্রথমে রবীয়্যাহ'র দুই সন্তান উতবা, শায়বা এবং উতবার ছেলে অলীদ যুদ্ধের ময়দানে অগ্রসর হল এবং প্রতিপক্ষকে যুদ্ধের আহ্বান জানাল। মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত আউফ, মুয়ায ইবনে হারেছ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. অগ্রসর হলেন। ওরা সবাই ছিলেন আনসার। তাই কাফেররা বলল, আমরা তোমাদেরকে চিনিনা। মুহাজেরীনদের থেকে কাউকে পাঠাও। অত:পর রাসূল ﷺ তাদেরকে ফিরে আসতে বললেন এবং উবাইদাহ ইবনে হারেছ, হযরত হামযাহ ও হযরত আলী রা.কে পাঠালেন। উবাইদাহ রা. যার বয়স আশি বছরের বেশী। তিনি উতবার সাথে, হামযা রা. শায়বার এবং আলী রা. অলীদের মোকাবেলায় যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। হযরত আলী রা. অলীদকে, হযরত হামযা রা. শায়বাকে প্রথমবারেই হত্যা করে ফেললেন। কিন্তু উবাইদাহ রা. ও উতবা একে অপরকে আঘাত করল। উবাইদা রা.'র পা কেটে গেল এবং যুদ্ধ বিজয়ের পর ফেরার পথে 'সাফরা নামক স্থানে শহীদ হন। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। হযরত আলী ও হামযা রা. সম্মিলিত ভাবে ওতবাকে হত্যা করলেন।

রাসূল ﷺ কর্তৃক কংকর নিক্ষেপঃ

মল্ল যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সমর যুদ্ধ আরম্ভ হল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলছিল। রাসূল ﷺ সিজদায় পড়ে কান্নাকাটি করে দোয়া করছিলেন। চাদর মোবারক পড়ে গেল। আবু বকর রা. তা তুলে দিয়ে শান্তনা দিচ্ছেন। এমন সময় তিনি এক মুষ্টি কংকর নিয়ে তাতে 'শাহাতিল ওজুহ' পাঠ করে ফুঁক দিয়ে কুরাইশদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। ঐ কংকর প্রত্যেক কাফেরের চোখে গিয়ে পড়ল। তারা দৃষ্টি বিভ্রাট হয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ল এবং তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার হল।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى আর আপনি মাটির মুষ্টি নিক্ষেপ করেন নি যখন তা নিক্ষেপ করেছিলেন, বরং তা আল্লাহ্ স্বয়ং নিক্ষেপ করেছিলেন।[২৯]

ফেরেশতা কর্তৃক সাহায্যঃ

আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানের মনোবল অটুট রাখার জন্য বদর যুদ্ধে ফেরেশতা নাযিল করে সাহায্য করেছেন। সূরা আনফালে এক হাজার ফেরেশতা নাযিলের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ যখন তোমরা স্বীয় পালন কর্তার সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করেন যে, আমি এক হাজার অনুসরণকারী ফেরেশতার দ্বারা তোমাদের সাহায্য করব।

সূরা আলে ইমরানে তিন ও পাঁচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ . بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ . وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ . অর্থ: বস্তুত: আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। আপনি যখন বলতে লাগলেন

২৯. সূরা আনফাল, আয়াত:১৭।

মুমিনগণকে– তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন। অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন। বস্তুত: এটা তো আল্লাহ্ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে।[৩০]

কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার। তাই সূরা আনফালে এক হাজার ফেরেশতা পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। বদরের মুসলমানদের কাছে সংবাদ পৌছেছিল যে, কুরয ইবনে জাবের মুহারেবী স্বীয় গোত্রের বাহিনী নিয়ে কুরাইশদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে। এ সংবাদ শুনে মুসলমানরা কিছুটা অস্থির হয়ে পড়লে তিন হাজার ফেরেশতা পাঠানোর ঘোষণা দেয়া হয়। পরে বলা হয়েছে মুসলমানগণ ধৈর্য্য ও খোদাভীতির উচ্চস্তরে পৌছলে এবং শত্রুরা আকস্মিক আক্রমণ করলে ফেরেশতার সংখ্যা বাড়িয়ে পাঁচ হাজার পাঠানোর ওয়াদা করা হয়েছে।

মূলত সাহায্যের জন্য একজন ফেরেশতাই যথেষ্ট। তবে এখানে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি, আত্মার প্রশান্তি এবং মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এত সংখ্যক ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল। তারা সাদাপাগড়ি পরিহিত অবস্থায় অশ্বারোহী হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম মুজাহিদগণ বলেন, আমরা তরবারী দ্বারা আঘাত করার পূর্বেই কাফেরদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে যেত। কোন কোন রেওয়াতে আছে ফেরেশতারা কোন কাফেরকে আক্রমণ করার ইচ্ছে করতেই আপনা-আপনি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

আবু জেহেলের মৃত্যুঃ

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য মোয়ায ও মোয়াওয়ায নামক দু'জন বালক আগ্রহ প্রকাশ করলে নবী করিম ﷺ বয়সে ছোট বলে তাদের পরবর্তীতে কোন যুদ্ধে নেয়া হবে বলে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের একজন পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে লম্বা দেখায়ে যুদ্ধের উপযুক্ত প্রমাণের চেষ্টা করল। রাসূল ﷺ তার আগ্রহ দেখে অভিভূত হয়ে তাকে সৈন্য দলে ভর্তি করে নিলেন। এ অবস্থা দেখে অপর সাথী বলল, সে

৩০. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১২৩-১২৬।

লম্বা হলে কী হবে? মল্ল যুদ্ধে সে আমার সাথে পারবে না। সে মল্ল যুদ্ধে তার সাথীকে হারিয়ে দিলে নবী করিম ﷺ তাকেও সৈন্য বাহিনীতে নিয়ে নিলেন। তারা দু'জন যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আবু জেহেলকে খুঁজতে লাগল। আব্দুর রহমান ইবনে আউফের কাছে জিজ্ঞেস করল- আবু জেহেল কোথায়? এমতাবস্থায় আবু জেহেল নিকটে ঘোড়ায় চড়ে টহল দিচ্ছিল। আর যুদ্ধের তদারকী করছিল। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. আবু জেহেলের দিকে ইশারা করে বালকদ্বয়কে দেখিয়ে দিলেন। বালকদ্বয় বাজপাখীর মত দ্রুত গিয়ে মুয়াওয়ায আবু জেহেলকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিলে আর মুয়ায তাকে আঘাত করে ক্ষত-বিক্ষত করল আর ইবনে মাসউদ রা. এসে আবু জেহেলের শিরচ্ছেদ করলেন। পরে ইকরামা ইবনে আবু জেহেল এসে মুয়াযের কাঁধে তরবারী দিয়ে আঘাত করলে তার হাত শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেল। তবে সামান্য চামড়ার দ্বারা লটকে রইল। সাথে সাথে সে তলোয়ার বাম হাতে নিয়ে ইকরামাকে ধাওয়া করতে লাগল। তার কর্তিত হাত পায়ের সাথে লাগছিল। সে হাতকে পায়ের নীচে রেখে টান দিয়ে চামড়া ছিড়ে হাতকে পৃথক করল। ইত্যবসরে ইকরামা পালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অত:পর কর্তিত হাত নিয়ে সে রাসূল ﷺ'র কাছে উপস্থিত হলে তিনি হাতকে যথাস্থানে রেখে স্বীয় থুথু মোবারক লাগিয়ে দিলে হাত পরিপূর্ণভাবে জোড়া লেগে গেল। সে হযরত ওসমান রা.'র খেলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিল এবং ঐ হাতটি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল।

বদরের যুদ্ধের ফলাফল:

বদর যুদ্ধে ১৪জন মুসলমান শহীদ হন। তন্মধ্যে ৬ জন মুহাজির এবং আটজন আনসার। অপর পক্ষে কুরাইশ বাহিনীর মধ্যে ৭০ জন নেতৃস্থানীয় লোক নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। বদর যুদ্ধে কোরাইশরা পর্যুদস্ত হয়ে যায়। ধন-সম্পদ, অস্ত্র-সস্ত্র ফেলে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে। তাদের মান-মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান ধূলায় ভূলুণ্ঠিত হল। তাদের শোচনীয় পরাজয়ে ইসলামের বিজয় ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম একটি নূতন শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

বদরের যুদ্ধ ইসলামের প্রথম সামরিক বিজয়। ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগসন্ধিক্ষণকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বদর যুদ্ধে মুসলিম বিজয় ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সম্প্রসারণের সূচনা করে এবং পরবর্তী একশত বছরের মধ্যে (৬২৪–৭২৪ খ্রিষ্টাব্দে) ইসলাম পশ্চিমে আফ্রিকা হতে পূর্বে ভারত বর্ষ ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় না হলে ইসলাম শুধু রাষ্ট্র হিসাবেই নয় বরং মূলত ধর্ম হিসাবে ধরণীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

মহানবী ﷺ যে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক সুপ্তিতেই অর্বচেতন নন বরং পার্থিব ঘটনাবলীর বিচারে তিনি যে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, পরাক্রমশালী যোদ্ধা, সুদক্ষ সমরনায়ক, সুবিচেতি শাসক প্রমাণিত হলেন।

হিট্টির মতে "বদরের যুদ্ধ সামরিক অভিযানের দিক দিয়ে তুচ্ছ হলেও ইহা মুহাম্মদ ﷺ'র পার্থিব শক্তির ভিত্তি স্থাপন করল। ইসলাম তার প্রথম ও চূড়ান্ত সামরিক বিজয় লাভ করল। বদরের যুদ্ধে হস্তগত ধন-সম্পদের এক-পঞ্চামাংশ হযরত ও তাঁর পরিবার-পরিজন, দুঃস্থ ও অনাথদের জন্য রেখে অবশিষ্ট গণিমতের মাল সৈন্যদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ আল্লাহর নিকট হতে লাভ করেন।[৩১]

যুদ্ধ বন্দীদের সাথে মধুর ও ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করা হয়। সুতরাং বদরের যুদ্ধকে ইসলামের ইতিহাসে একটি আলোড়নকারী ঘটনা বলা যেতে পারে।

বদর যুদ্ধে প্রকাশিত কতিপয় মু'জিযা:

হযরত ওকাশা রা. যুদ্ধকালে তাঁর তলোয়ার ভেঙ্গে গেলে রাসূল ﷺ তাঁকে একটি খেজুরের ডাল দিয়ে বলল- এটা দিয়ে যুদ্ধ কর। খেজুরের ডালটি তলোয়ারে পরিণত হল। এই তলোয়ারের নাম রাখা হয় আউন বা খোদার সাহায্য। তিনি আজীবন উক্ত তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন।

হযরত মুয়ায এর খণ্ডিত হাত পুনরায় জোড়া লাগিয়ে দেয়ার কথা পূর্বে উল্লেখ করাহয়েছে।

হযরত কাতাদাহ ইবনে নোমান রা.'র চোখ আঘাত প্রাপ্ত হয়ে বের হয়ে পড়েছিল। রাসূল ﷺ তাঁকে ডেকে এনে চোখের মণি স্বীয় হাত দ্বারা যথাস্থানে রেখে দিলেন। কাতাদাহ বুঝতেও পারেন নি যে তাঁর চোখে আঘাত লেগেছিল।[৩২]

যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ:

বদরের যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে এসে যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। এতে হযরত ওমর ও সা'দ রা. যুদ্ধ বন্দীদেরকে আপন আপন আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক হত্যা করার পক্ষে মত দিয়েছেন। কিন্তু আবু

---

[৩১]. সূরা আনফাল, আয়াত: ৪১।
[৩২]. আল্লামা যুলফিকার আলী সাকী, জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৮৬৬।

বকর রা. বললেন, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক। এতে মানবিক উদারতা ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় উভয় দিকই রক্ষা পাবে। দয়াল নবী হযরত আবু বকর রা.'র মত গ্রহণ করলেন এবং ক্ষতিপূরণে অক্ষম যুদ্ধবন্দীদেরকে মুসলমানদের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করেন। যদিও পরবর্তীতে ওহী নাযিল করে আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমর রা.'র মতের পক্ষে সমর্থন করেছেন।

নবী করিম ﷺ প্রথমে আপন চাচা হযরত আব্বাস রা., জামাতা আবুল আস, চাচাত ভাই আকিল ও নওফল এই চারজন থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ইচ্ছে করলেন। নবী কন্যা যয়নাব রা. স্বীয় স্বামী আবুল আসের মুক্তির জন্য হযরত খদীজা রা. কর্তৃক প্রদত্ত গলার হারখানা পাঠিয়ে দিলেন, নবী করিম ﷺ অশ্রু-স্বজল নেত্রে হারখানা দেখে হযরত খদীজা রা.'র কথা স্মরণ করছিলেন। সাহাবাগণ হযরত খদীজা রা.'র সম্মানে বিনা পণে আবুল আসকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করলেন। হযরত যয়নব রা.কে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়ার শর্তে জামাতাকে ছেড়ে দেন। অপর তিনজন এবং ওতবা ইবনে ওমর এই চারজনের জন্য মাথাপিছু বিশ উকিয়া করে মোট ৮০ উকিয়া স্বর্ণ-মুদ্রা জরিমানা ধার্য করেন এবং হযরত আব্বাসের উপর এই পণ আদায়ের নির্দেশ দেন। আব্বাস বললেন, আমি যুদ্ধে যাত্রাকালে বিশ উকিয়া স্বর্ণ যুদ্ধে চাঁদা হিসাবে আবু জেহেলকে দিয়েছিলাম যা গণিমতের মাল হিসাবে বর্তমানে আপনার অধিকারে। এ ছাড়া আমার আর কোন সম্পদ নেই। রাসূল ﷺ বললেন, আপনি মক্কা থেকে আসার সময় আপনি আপনার স্ত্রী উম্মুল ফজল মিলে ঘরে গোপন কুঠরিতে লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেগুলো কোথায়? আর বলেছিলেন, আমি যদি যুদ্ধে মারা যাই তাহলে এগুলো আমার সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করবে। আব্বাস বললেন, وَاللهِ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ هٰذَا شَيْئٌ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ غَيْرِىْ وَغَيْرُ اُمِّ الْفَضْلِ اِلَّااللهَ عَزَّوَجَلَّ. খোদার শপথ, হে আল্লাহর রাসূল! এই ঘটনা আমি এবং উম্মুল ফজল ও আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, আপনি কিভাবে জানলেন? এই বলে তিনি ঈমান গ্রহণ করলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে মক্কা বিজয় পর্যন্ত তাঁর ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ না করার অনুমতি প্রদান করা হয়।[৩৩]

উহুদের যুদ্ধ:

উহুদ যুদ্ধের কারণ: বদরের যুদ্ধের ১৩ মাস পর তৃতীয় হিজরি শাওয়াল মাসের ১১ বা ১৪ তারিখ শনিবার উহুদের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। বদরের যুদ্ধের পরাজয়েরগ্লানি মুছে ফেলার জন্য কুরাইশরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। বদর যুদ্ধের পূর্বে

৩৩. হাফেজ এম এ জলিল র., নূর নবী ও তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-৩, পৃ. ৩৪১-৩৪২।

আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে বাণিজ্য করে প্রচুর ধন-সম্পদ এনেছিল। ওগুলো দারুন নদওয়ায় রেখে বদর যুদ্ধে চলে গিয়েছিল। যার পরিমাণ ছিল এক হাজার উট ও সত্তর হাজার মিসকাল স্বর্ণ-রৌপ্য। বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তারা বলল, আমাদের ঐ সম্পদ ব্যয় করে বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হোক। মহিলারা পুরুষদেরকে ধিক্কার দিতে লাগল। আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করল যে, প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে নারী ও তৈল স্পর্শ করবে না। আবু সুফিয়ান ৪০০ সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মদীনার সীমান্তে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলায় মত্ত হয় কিন্তু মুসলিম বাহিনী ধাওয়া করলে তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে।

ওদিকে মদীনার ইহুদী ও মুনাফিকরা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে গোপনে মক্কায় এসে আবু সুফিয়ানকে উত্তেজিত করে তুলল। মদীনার মহিলারা অশ্লীল গান গেয়ে পুরুষদেরকে ক্ষেপাতে লাগল। হিন্দা ঘোষণা করল মুসলমান নিধন করতে পারলে যুদ্ধা পুরুষদের সাথে আলিঙ্গন করবে এবং পুরস্কৃত করবে। ইহুদী কা'ব বিন আশরাফ মক্কায় গমণ করে কাব্য ও কবিতা রচনা করে কুরাইশদের উত্তেজিত করতে থাকে। বদর যুদ্ধে নিহতদের পক্ষে শোকগাথা কবিতা রচনা করে মহিলাদেরকে মুখস্থ করানো হয়েছে। তারপর মক্কার অলিতে-গলিতে তাদের মাধ্যমে ঐসব শোকগাথা কবিতা পাঠ করানো হয়। এভাবে মক্কায় বদর যুদ্ধের প্রতিশোধের আগুন প্রচণ্ডভাবে প্রজ্জলিত হয়ে উহুদ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

কুরাইশরা তিন হাজার সশস্ত্র সৈন্য, তিনশত উষ্টারোহী ও দুইশত অশ্বারোহী সহ মদীনার তিন চার মাইল পশ্চিমে উহুদ উপত্যকায় উপস্থিত হল। হিন্দার নেতৃত্বে একদল মহিলা গায়িকা বাদ্য-বাজনা সহ এ যুদ্ধে উপস্থিত ছিল।

রাসূল ﷺ'র পরামর্শ:

হযরত আব্বাস রা. মক্কার কুরাইশদের যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ গোপনে মদীনায় নবী করিম ﷺ'র নিকট পৌছিয়ে দিলেন। নবী করিম ﷺ সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিল। বয়োজেষ্ট সাহাবায়ে কিরামগণ মত দিলেন যে, আমরা মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থান করে যুদ্ধ করব। রাসূল ﷺও এমতের পক্ষে ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইও এ মত পোষণ করেছে। কিন্তু হযরত হামযা, সা'দ ইবনে উবাদা, মালেক ইবনে সিনান সহ কিছু সংখ্য উৎসাহী তরুণ সাহাবীগণ মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্টের অভিমতে এ প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

ইতিমধ্যে রাসূল ﷺ গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং লৌহবর্ম পরিধান করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে এলেন। হযরত আবু বকর ও ওমর রা. রাসূল ﷺ'র মাথায় পাগড়ী বেঁধে দেন, লৌহবর্ম পরিধান করালেন। তিনি তলোয়ার নিলেন, হাতে তীর নিলেন দু'টি যুদ্ধ পোশাক পরিধান করেন, কোমরে চামড়ার বেল্ট বাঁধলেন। একেবারে বীর সেনানীর বেশে তিনি বেরিয়ে আসলেন। সাহাবায়ে কিরাম তাঁর জন্য বাইরে অপেক্ষমান ছিলেন। তারা তাঁকে এ পোশাকে দেখে অবাক হলেন। হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায ও উসাইদ ইবনে হুদ্বাইর রা. সকল সাহাবীদের পক্ষে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের বেয়াদবী হয়েছে, ক্ষমা করবেন, আমরা আপনার মতের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছি। এখন আমাদের সকলের মত হল মদীনার অভ্যন্তরে থেকেই আমরা প্রতিহত করব। রাসূল ﷺ মুচকি হেসে বললেন, একবার লৌহবর্ম পরিধান করে এবং অস্ত্রধারণ করার পর যুদ্ধ ব্যতিরেকে তা আবার খুলে ফেলা নবীর জন্য শোভন নয়। চল, আল্লাহর উপর ভরসা কর। যদি তোমরা দৃঢ় থাক তবে ইনশাআল্লাহ বিজয় তোমাদেরই হবে। এসব ঘটনা জুমার দিন জুমার নামাযের পর হয়েছিল।[৩৪]

যুদ্ধের জন্য রওয়ানাঃ

জুমার নামাজের পর একজন আনসারী সাহাবীর জানাযার নামায পড়ে এক হাজার সৈন্য বাহিনী নিয়ে উহুদের দিকে রওয়ানা হলেন। এদের মধ্যে একশত জন বর্মধারী এবং প্রায় পঞ্চাশ জন তীরন্দাজ ছিলেন। মদীনায় ইমামতি করার জন্য অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মকতুম রা.কে নিযুক্ত করে যান। মুসলিম বাহিনী 'শওত' নামক স্থানে পৌছলে মোনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার তিনশত জন অনুচর নিয়ে পলায়ন করল আর বলল, আমাদের পরামর্শ না ধরে নবী করিম ﷺ এত বড় ঝুঁকিপূর্ণ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং আমরা এর সাথে নেই। তাদের এই শঠতা ও হটকারিতা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে দূর্বল করা এবং শত্রুকে উৎসাহিত করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হেযাম রা. তাদেরকে অনেক বুঝিয়েছেন কিন্তু কোন কাজে আসলনা। এ ঘটনায় আনসারদের দুই দল অর্থাৎ বনু সালমা ও বনু হারেসা কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারাও ফিরে যাওয়ার মনস্থ করল। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাদের মনোবল অটুট রাখেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ "যখন তোমাদের

৩৪. তাফসীরে কবীর, সূত্রঃ তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-৪, পৃ. ১৫২।

দু'টি দল সাহস হারাবার উপক্রম হল, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহর উপরই ভরসা করা মু'মিনদের উচিত।"[৩৫]

অত:পর মাত্র সাতশত যোদ্ধা নিয়ে রাসূল ﷺ উহুদ পৌছেন এবং উহুদ পর্বতকে পিছনে রেখে মদীনার সম্মুখ হয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন আর হুকুম করলেন, আমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন কেউ যুদ্ধ আরম্ভ না করে।

রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে শনিবারে ফজরের নামায আদায় করে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। 'আইনাইন' পাহাড়ে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.'র নেতৃত্বে পঞ্চাশজন অভিজ্ঞ তীরন্দাজকে মোতায়েন করা হল। রাসূল ﷺ তাঁদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "জয়-পরাজয় কোন অবস্থাতেই তোমরা আপন স্থান ত্যাগ করবে না- যে পর্যন্ত না আমি নির্দেশ দেই। এমন কি আমাদেরকে শহীদ হতে দেখলেও সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবেনা। বিজয়ের পর গণিমতের মাল সংগ্রহ করতে দেখলেও তোমরা আপন স্থান ত্যাগ করবে না।"

এরপর তিনি অল্প বয়স্ক যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনুল খাত্তাব রা., উসামা ইবনে যায়েদ রা., উসাইদ ইবনে যুহাইর রা., আমর ইবনে হেযাম রা., বারা ইবনে আযেব রা., যায়েদ ইবনে আরকাম রা., যায়েদ ইবনে সাবেত রা., আরাবাহ ইবনে আউস রা., সামুরা ইবনে জুনদব রা. এবং রাফে ইবনে খাদীজ রা.কে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দিলেন। তবে পরের দু'জন সামুরা ইবনে জুনদব ও রাফে ইবনে খাদীজ রা. সম্পর্কে অন্যরা অভিজ্ঞ তীরন্দাজ বলে সাক্ষ্য ও সুপারিশ করলে তাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়। হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রা.কে পতাকা দান করলেন। যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা.কে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। হযরত হামযা রা.'র হাতে বর্মহীন সৈন্যদের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করেন। স্বীয় তরবারী আবু দুজানাহ রা.কে প্রদান করলেন যিনি বড় সাহসী ও বাহাদুর ছিলেন।

কুরাইশরা ছিল সংখ্যায় তিন হাজার। ঘোড়া ছিল দুইশত, তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ও ইকরামা ইবনে আবি জেহেল। পদচারণকারী যোদ্ধাদের প্রধান ছিল সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ। তীরন্দাজদের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আবি রবীয়াহ। তালহা ইবনে আবি তালহার হাতে ছিল তাদের পতাকা। উভয় পক্ষ যখন মুখোমুখি হতে যাচ্ছিল তখন হিন্দ বিনতে উতবা গায়িকা মহিলাদেরকে নিয়ে বের হয়ে দফ বাজিয়ে গান গেয়ে কাফেরদের যুদ্ধের প্রতি উত্তেজিত করতে লাগল।

৩৫. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১২২।

যুদ্ধ আরম্ভ:

সর্বপ্রথম কাফেরদের পক্ষে আবু আমের ফাসেক পঞ্চাশ জনের একটি দল নিয়ে ময়দানে এসে মুসলমানদের গালি-গালাজ করে পাথর নিক্ষেপ করলে মুসলমানরাও পাথর নিক্ষেপ শুরু করল। তার ছেলে হানযালা রা. পিতার বিরুদ্ধে মোকাবেলার জন্য অনুমতি চাইলেও রাসূল ﷺ অনুমতি দেন নি। তারপর মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রথমে কাফেরদের পতাকাধারী তালহা ইবনে আবু তালহা ময়দানে এসে প্রতিপক্ষ খুঁজছে। হযরত আলী রা. গিয়ে তাকে এক আঘাতেই ধরাশায়ী করলেন। তারপর ওসমান ইবনে তালহাকে হযরত হামযা রা., আবু সাঈদ ইবনে তালহাকে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা., অত:পর মুসাফে ইবনে তালহা ও হারেস ইবনে তালহাকে হযরত আসেম ইবনে সাবিত রা. জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন।

যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন:

কুরাইশ দল মল্লযুদ্ধে পরাজিত হয়ে সম্মিলিত যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ল। মুসলমানরা কাফেরদের ২৩ জনকে নিহত করলেন। আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানগণ প্রথমে বিজয়ী হল। কাফের দল পলায়ন করতে লাগল। কুরাইশ মহিলা গান করা দূরের কথা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। মুসলমানরা কাফেরদেরকে পশ্চাদধাবন করলেন। বিজয় সমাপ্ত হয়েছে মনে করে মুসলমান সৈন্যরা গণীমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হয়ে গেল। চূড়ান্ত বিজয় দেখে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়োজিত তীরন্দাজ বাহিনী স্থান ত্যাগ করে গণিমতের মাল সংগ্রহ করতে লাগলেন। অধিনায়ক আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. রাসূল ﷺ'র কঠোর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের স্থান ত্যাগ করতে বারণ করলেন। কিন্তু কয়েকজন ছাড়া সবাই বলল, হুযূরের নির্দেশটি ছিল সাময়িক। তাঁর সাথে মাত্র সাত জন ছাড়া বাকীরা সবাই গণিমতের মাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করলেন। দূর থেকে সু-চতুর খালিদ বিন ওয়ালিদ এ অবস্থা দেখে পাহাড়ের পিছন দিক দিয়ে ঘুরে এসে গিরিপথে আক্রমণ করে বসল এবং ৮ জন তীরন্দাজকে শহীদ করে ফেলল। তারপর খালেদের বাহিনী পলায়নপর সৈন্যরাও এসে যুক্ত হল। এ আকস্মিক আক্রমণে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুসলমানের একটি বৃহৎ অংশ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল। এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক সাহাবী অমিত তেজে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। রাসূল ﷺ'র সাথে মাত্র ৮ জন মুহাজির ও ৭ জন আনসার ছিলেন। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম, তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ ও আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রা.। আর আনসারদের মধ্যে ছিলেন- খাব্বাব ইবনে মুনযির, আবু দুজানাহ, আসেম ইবনে

সাবিত, সাহল ইবনে হানীফ, উসাইদ ইবনে হুদ্বাইর, সা'দ ইবনে মুয়ায ও হারেস ইবনে সাম্মাহ।

মুসলমানরা চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল যুদ্ধে অটুট ছিলেন এবং শহীদ হলেন। কিছু সংখ্যক পাহাড়ে, গর্তে আত্মগোপন করলেন। কিছু মুসলমান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে মদীনায় চলে গিয়েছিলেন। হযরত ওসমান রা. তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। স্বল্প সংখ্যক আশেক রাসূল ﷺ'র হেফাযতে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত আবু বকর, ওমর ও আলী রা. এ দলে ছিলেন।

হতভাগা উতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাসূল ﷺ'র দিকে চারটি পাথর নিক্ষেপ করলে তাঁর চারখানা দাঁত মোবারক শহীদ হল এবং ঠোঁট মোবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। মাথা মোবারকও আহত হয়ে রক্তাক্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। আবু সাঈদ খুদুরী রা.'র পিতা মালেক ইবনে সিনান রা. জখমী স্থানে মুখ লাগিয়ে রক্ত মোবারক চুষে খেয়ে ফেললেন। তার এই ভালবাসা দেখে নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- مَنْ مَسَّ دَمِى دَمَهُ لَمْ تَصِبْهُ النَّارُ। 'আমার রক্ত যার রক্তের সাথে মিশবে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।' উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে একটি পাহাড়ের নিম্নদেশে নিয়ে গিয়ে পানি পান করালেন। ওদিকে কাফেররা ঘোষণা করে দিল মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছেন। মদীনা শরীফে এই সংবাদ দ্রুত পৌঁছে গেল। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রা. শহীদ হলে গুজব রটিল যে, মুহাম্মদ ﷺ শহীদ হন। কারণ মুসআব রা.'র সহিত রাসূল ﷺ'র শারিরীক দিক দিয়ে সাদৃশ্য ছিল।

এ যুদ্ধে রাসূল ﷺ'র চাচা বীরকেশরী হযরত হামযা রা. সহ ৭০ জন মুসলমান শহীদ হন। অপর পক্ষে মাত্র ২৩ জন শত্রু সৈন্য নিহত হয়। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হযরত হামযা রা.'র হৃদপিণ্ড চর্বন করে। হযরত আবু বকর, ওমর, আলী রা. সহ মোট ১১ জন সাহাবী আহত হন।

হযরত হামযা রা.'র শাহাদত:

বদর যুদ্ধে হযরত হামযা রা. তাঈমা ইবনে আদি ও উতবা (হিন্দার পিতা)কে হত্যা করেছিলেন। জুবাইর ইবনে মুতআম (তাঈমার ভাতিজা) তার গোলাম ওয়াহশীকে বলল, যদি তুমি হামযাকে হত্যা করে আমার চাচার বদলা নিতে পার তবে তুমি মুক্ত। আর হিন্দা বলল, যদি তুমি আমার পিতা উতবার বদলা নিতে পার তবে আমি তোমাকে অনেক স্বর্ণ-রৌপ্য পুরস্কার দেব। ওয়াহশী আযাদ ও পুরস্কারের লোভে গোপনে হযরত হামযা রা.কে শহীদ করে

নির্মমভাবে বক্ষ কেটে হৃদপিণ্ড বের করে এনে হিন্দাকে দিল। হিন্দা কাচা কলিজা দাঁত দিয়ে চাবিয়ে খেয়েছে এবং হামযা রা.'র নিকট গিয়ে গুর্দা, নাক, কান ও পুরুষাঙ্গ কেটে নিয়ে সুতায় গেথে গলার হার বানিয়ে পরিধান করেছিল আর নিজের মূল্যবান গলার হারটি ওয়াহশীকে উপহার দিল।

এই হিন্দা হল আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, আমীরে মুয়াবিয়া রা.'র মা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রাসূল ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। ওয়াহশীও পরবর্তীতে মুসলমান হলেন। সিদ্দীকে আকবরের আমলে ভণ্ড নবী মুসায়লামাতুল কায্যাবকে হত্যা করে হযরত হামযা রা.কে হত্যার কাফ্ফারা আদায় করেন।

কুরাইশদের প্রত্যাবর্তন:

যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান উহুদ পর্বতে উঠে মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, এটি বদর যুদ্ধের বদলা। আজ হুবল মূর্তির বিজয় হয়েছে। রাসূল ﷺ'র অনুমতিতে হযরত ওমর রা. উত্তর দিলেন, না, আজ আল্লাহর বিজয় হয়েছে, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। আজ বরাবর বদলা হয়নি। কারণ আমাদের শহীদগণ আছেন জান্নাতে আর তোমাদের মৃতগণ আছে জাহান্নামে।

আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করল, হে ওমর! মুহাম্মদ কি সত্যিই নিহত হয়েছেন? ওমর রা. বললেন, না। তিনি তোমার কথা শুনতেছেন। তখন আবু সুফিয়ান ব্যর্থমন নিয়ে সদলবলে মক্কায় ফিরে যায়। মদীনা নগরী আক্রমণ করার মত মানসিক ও শারিরীক সামর্থ তাদের ছিলনা। কোন মুসলমানকে বন্দী অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতে সক্ষম হয়নি তারা।

উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১২১-১২২ এবং ১৩৯-১৪৪নং আয়াত সমূহে বিস্তাতির আলোচনা এসেছে।

শহীদগণের দাফন:

রাসূল ﷺ'র আদেশে শহীদগণের শরীর থেকে যুদ্ধাস্ত্র খুলে তাদের রক্তে রঞ্জিত পোশাক সহ বড় আকারের কবর খনন করে জানাযা নামায পড়ে একেক কবরে দুই তিন জন করে দাফন করা হয়।

উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ:

রাসূল ﷺ'র আদেশ অমান্য : মুসলিম বাহিনী উহুদ যুদ্ধে বিজয়ী হয়েও পরাজয় বরণ করতে হয়। এর প্রধান কারণ হল নবী করিম ﷺ'র আদেশ অমান্য করা। আইনাইন পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথ রক্ষায় নিয়োজিত পঞ্চাশ

জন তীরন্দাজ নবীর আদেশ অমান্য করে স্থান ত্যাগ করার কারণে উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত হয়।

মিথ্যা গুজব প্রচার : যুদ্ধকালে নবী করিম ﷺ শহীদ হয়েছেন বলে মিথ্যা গুজব রটানো হয়। এই সংবাদ শুনে মুসলমানদের অন্তর ভেঙ্গে পড়ে। মুসলমানদের কেউ বলেছেন, হযরত যদি শহীদ হন তাহলে আমি বেঁচে থেকে লাভ কি- এই বলে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। আবার দুর্বল মুসলমানরা পূর্বের ধর্মে ফিরে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করতে লাগল। তাদের সান্ত্বনার্থে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ "হযরত মুহাম্মদ একজন রাসূল। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা শহীদ হন, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে?"[৩৬]

কুরাইশ মহিলাদের প্ররোচনা: কুরাইশদের সাথে হিন্দার নেতৃত্বে পুরনারী মহিলারা উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সৈন্যদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। হিন্দা বলত- "তোমরা যদি অভিযান কর তাহলে আমরা তোমাদের সাদরে আলিঙ্গন করব এবং তোমাদের সঙ্গে যৌনাচারের ব্যবস্থা করব। আর যদি পশ্চাদগমণ কর আমরা আনন্দ দানের পরিবর্তে তোমাদের পরিত্যাগ করব।"

উহুদ যুদ্ধে প্রকাশিত মু'জিযা:

মূলত রাসূল ﷺ'র আপদমস্তক মু'জিযা। উহুদ যুদ্ধেও বিস্ময়কর বহু মু'জিযা প্রকাশ হয়। এক. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা. যুদ্ধ করতে করতে তরবারী ভেঙ্গে যায়। রাসূল ﷺ বিকল্প কোন তরবারী না পেয়ে একটি শুকনা খেজুরের ডাল তাঁর হাতে দিয়ে তা দিয়ে যুদ্ধ করতে বললেন। খেজুর ডালটি তীক্ষ্ণ তরবারী হয়ে গেল। ঐ তরবারীর নাম রাখা হয় 'উরজুন'। এটি পরবর্তীতে তাবাররুক হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়। বাগদাদের আব্বাসীয় ৮ম খলীফা মোতাসিম বিল্লাহ জনৈক বেগাতুর্কী আমীর উক্ত তরবারীটি হযরত আব্দুল্লাহর উত্তারিধারীগণের নিকট থেকে দুইশত দীনার দিয়ে ক্রয় করে সংরক্ষণ করেন।

দুই. হযরত কাতাদাহ ইবনে নোমান রা.'র একটি চক্ষু শত্রুর তীরের আঘাতে খসে পড়ে মুখের উপর লটকাতে থাকে। তিনি চোখটি হাতে নিয়ে নবী

[৩৬]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪৪

করিম ﷺ'র খেদমতে এসে আরয করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী রয়েছে। আমার চোখটির খুবই প্রয়োজন, আপনি আমার চোখটি ভাল করে দিন। নবী করিম ﷺ এরশাদ করলেন, 'তুমি চোখ চাও না, বেহেশত চাও'? হযরত কাতাদাহ রা. আরয করলেন, চোখও চাই, বেহেশতও চাই। রাসূল ﷺ সামান্য থুথু মোবারক লাগিয়ে চোখটি যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন আর দোয়া করলেন- اَللّٰهُمَّ اَكْسِبْهُ جَمَالًا 'হে আল্লাহ্! তার চোখটি সুন্দর করে ফিট করে দিন।' সাথে সাথে চোখটি জোড়া লেগে গেল। তার উভয় চোখের মধ্যে এই চোখটিই উত্তম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন ছিল।[৩৭]

গযওয়ায়ে বনু নদ্বীরঃ

উহুদ যুদ্ধের পর গাযওয়ায়ে বনু নদ্বীর সংঘটিত হয়। মদীনায় অবস্থিত বনী কায়নুকা, বনী নদ্বীর ও বনী কোরায়যার সাথে নবী করিম ﷺ'র সাথে চুক্তি হয়েছিল যে, মুসলমান বা ইহুদীদের মধ্যে কেউ যদি অন্য গোত্রের কোন লোককে হত্যা করে, তবে উভয় মিলে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। মুসলমানদের মধ্যে আমর ইবনে উমাইয়্যা দ্বামীরী রা. বনী কিলাবের দুইজন ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে। বনী নদ্বীর বনী কিলাবের বন্ধু ছিল। তাই রাসূল ﷺ ঐ নিহত ব্যক্তিদের রক্তপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে চতুর্থ হিজরি সনে রবিউল আউয়াল মাসে হযরত আবু বকর, ওমর, আলী রা. সহ দশজন সাহাবী নিয়ে বনু নদ্বীর পল্লীতে গমন করেন এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ে তাদের সহযোগিতা চান। তারা তাঁদেরকে একটি প্রাসাদের ছায়ায় বসতে দিয়ে রাসূল ﷺ কে এ সুযোগে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। ঘরের ছাদ থেকে বড় পাথর নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত হল। আমর ইবনে জাহাশ এ কাজের জন্য প্রস্তুত হল এবং ছাদের উপর চলে গেল। তাদের মধ্যে সালাম ইবনে মিশকাম নামক জনৈক ইহুদী তাদেরকে চুক্তির কথা স্মরণ করে দিয়ে এ কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়ে বলল, তোমাদের দূরভীসন্ধি সম্পর্কে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁকে গোপনে সংবাদ দিয়ে দেবেন। এমন সময় ওহী মারফত অবগত হয়ে রাসূল ﷺ দ্রুত স্থান ত্যাগ করে মদীনায় চলে আসেন। সাহাবীগণও সাথে সাথে চলে গেলেন।

এই ঘটনার পর রাসূল ﷺ বনী নদ্বীরের কাছে সংবাদ পাঠান যে, আগামী দশ দিনের মধ্যে তোমরা মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। এরপর তোমাদের কাউকে দেখলে হত্যা করা হবে। কারণ তোমরা চুক্তি ভঙ্গ করেছ। তারা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করল। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক সংবাদ পাঠাল যে, তোমরা

৩৭. অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল র., নূর নবী, পৃ. ১২৩-১২৪।

স্থান ত্যাগ কর না। আমার দুই হাজার বাহিনী তোমাদেরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তাছাড়া বনু কোরাইজা ও বনু গাতফান তোমাদেরকে সাহায্য করবে। তার কথায় আশ্বস্থ হয়ে বনু নদ্বীর সংবাদ পাঠাল যে, আমরা স্থান ত্যাগ করব না।

এই সংবাদের পর নবী করিম ﷺ তাদেরকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং মদীনায় ইবনে উম্মে মাকতুম রা.কে খলীফা নিযুক্ত করে রেখে হযরত আলী রা.কে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করে পতাকা দিয়ে বনী নদ্বীর পল্লী অভিমুখে রওয়ানা হন মুসলিম বাহিনী। নবী করিম ﷺ আসরের নামায বনী নদ্বীরের উন্মুক্ত ময়দানে আদায় করেন। তারা মুসলিম বাহিনীকে দেখে কপাট বন্ধ করে কিল্লায় আশ্রয় নিল। বনু কোরায়যা, বনু গাতফান ও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসল না। মুসলিম বাহিনী তাদেরকে দূর্গার ভিতরে ছয় দিন যাবৎ অবরোধ করে রাখলেন। অবশেষে তারা স্বেচ্ছায় নির্বাসনের প্রস্তাব দেয়। রহমতের নবী তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাদের অস্থাবর সম্পত্তি ও ধন-দৌলত সহ খায়বরে আশ্রয় গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। তারা ছয়শত উট বোঝাই করে ধন-দৌলত সরিয়ে নেয় এবং সংসারের প্রতি অসাধারণ মোহের কারণে তারা নিজ গৃহের কাঠ-কড়ি ও কপাট পর্যন্ত উপড়িয়ে নিলে গেল। তবে কোন যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। পবিত্র কুরআনের সূরা হাশর পুরোটাই ইহুদী বনু নদ্বীর গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. এই সূরার নামই সূরা 'বনী নদ্বীর' বলতেন। এই নদ্বীর গোত্র বারংবার ইসলাম ও ইসলামের নবী মুহাম্মদ ﷺ'র বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। তাদের মধ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল অন্যতম।

উহুদ যুদ্ধের পর এই কা'ব চল্লিশ জন ইহুদী নিয়ে মক্কায় গিয়ে তাদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চুক্তি করে। উভয় পক্ষের চল্লিশজন করে মোট আশি জন আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কাবা গৃহে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহর গিলাফ ধরে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অঙ্গীকার করে। চুক্তি সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে জিব্রাঈল আ. ওহীর মাধ্যমে আদ্যপান্ত ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ রাসূলল্লাহ ﷺকে বলে দেন। তারপর রাসূল ﷺ কা'বকে হত্যার আদেশ জারি করেন এবং মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. কৌশলে তাকে হত্যা করেন।

খন্দকের যুদ্ধঃ

যুদ্ধের সময়কাল ও নামকরণঃ কুরাইশদের পক্ষ থেকে সর্বশেষ আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ছিল খন্দকের যুদ্ধ। খন্দক বা গর্ত পরিখা খনন করে শত্রু সৈন্যকে প্রতিহত করা হয়েছিল বলে এটাকে খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। খন্দকের যুদ্ধকে আহযাবের

যুদ্ধও বলা হয়। কারণ আহযাব শব্দটি হিযবুন এর বহুবচন। আর হিযবুন অর্থ দল। মুসলিম বিরোধী সমস্ত দল একত্রিত হয়ে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল বলে এটাকে আহযাবের যুদ্ধ বলা হয়।

সম্মিলিত বাহিনী ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে ৩১ মার্চ, ৫ম হিজরী যিলক্বদ মাসে মদীনা আক্রমণ করে। কিন্তু হযরত সালমান ফার্সী রা.'র পরামর্শে অবিনব পদ্ধতিতে পরিখা খনন কৌশল এবং মহানবী ﷺ'র দোয়ায় আল্লাহ্'র বিশেষ সাহায্যে তীব্র হিমেল বায়ু প্রবাহ ও প্রচণ্ড ঝড়ের কারণে আবু সুফিয়ানের অভিযানকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

যুদ্ধের কারণ: মদীনার ইহুদীরা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে মক্কার কুরাইশদেরকে মদীনা আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায়। এ উদ্দেশ্যে ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মক্কায় গমণ করে মক্কাবাসীকে মদীনা আক্রমণের প্রতি উৎসাহিত করে। তারপর তারা বনু গাতফানে গিয়ে তাদেরকেও কুরাইশদের সাথে যোগ দিয়ে মুসলমানদেরকে সমূলে উৎপাটিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। কুরাইশ বাহিনীর সর্দার ও গাতফান বাহিনীর দুই উপ গোত্রের দুই সর্দার উরাইনা ও হারিস দশ হাজার বহু জাতিক বাহিনীর সৈন্যদল প্রস্তুত করে।

এ সংবাদ মদীনায় পৌছলে নবী করিম পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। নব মুসলিম বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ সাহাবী হযরত সালমান ফার্সী রা.'র পরামর্শে এক অভিনব যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করলেন। মদীনার চতুর্দিকে অরক্ষিত স্থানে মতান্তরে ১৫, ২০, ২৪, ৩০ দিনে তিন হাজার নিবেদিত সৈন্যদল স্বয়ং রাসূল ﷺ সহ কঠোর পরিশ্রমে পাঁচ গজ গভীর ও পাঁচ গজ প্রশস্ত এক পরিখা খনন করেন।

পরিখা খনন: কুরাইশদের বিশাল বাহিনীর সংবাদ পেয়ে নবী করিম ﷺ সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সা'দ ইবনে মুয়ায, সা'দ ইবনে উবাদা, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, আওয়্যাত ইবনে জুবাইর এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. প্রমুখ সাহাবীগণকে এই বলে পাঠালেন যে, যদি সংবাদ সত্য হয় তবে আমাকে গোপনে সংবাদ দিও আর ঘটনা প্রকাশ করিও না। না হয় মুসলমানগণ ভীত হয়ে পড়বে। তারা বনু কোরাইযায় গিয়ে দেখলেন যে, ঘটনা যা শুনেছিলেন বাস্তব অবস্থা তার চেয়েও মারাত্মক। তারা এসে আবেগ আপ্লুত হয়ে দু:সংবাদটি প্রচার করে দিলে মুসলিম বাহিনী চিন্তায় পড়ে গেল। একদিকে কুরাইশদের সম্মিলিত বাহিনী অপর দিকে মদীনায় নারী, শিশু ও ধন-সম্পদ অরক্ষিত। তাছাড়া বনু কোরাইযার আক্রমণের ভয়। মোটকথা ঘরের ও বাইরের শত্রুর ভয়ে দুর্বল মুসলমানগণ বিভিন্ন বাহানা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে মদীনায়

নিজ পরিবারে চলে যেতে লাগলেন। রাসূল ﷺ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এক রেওয়ায়েতে আছে মদীনার হেফাযতের জন্য যায়েদ ইবনে হারেসা রা.কে তিনশত সৈন্য দিয়ে মদীনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

নঈম ইবনে মাসউদ রা.'র কৌশল:

এই মহা বিপদের সময় বনু গাতফানের নঈম ইবনে মাসউদ নামক এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ'র খেদমতে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই মাত্র মুসলমান হলাম। আমার মুসলমান হওয়ার খবর কেউ জানে না। আপনি আমাকে কৌশল অবলম্বন করার অনুমতি দিন। অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে তিনি প্রথমে বনু কোরাইযায় গিয়ে তাদের আপনজন ও হিতকাঙ্খী প্রকাশ করে বলেন, তোমরা তো যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গিয়েছ। শেষ পরিণাম কি হবে ভেবে দেখেছ? যুদ্ধে জয়লাভ হলে তো ভাল। পরাজয় হলে তো কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের লোকেরা মক্কায় পালিয়ে যাবে। তখন তোমাদের কি হবে? মুসলমানগণ তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। বনু কোরাইযার লোকেরা বলল, এখন কি করা যায় বল। নঈম বললেন, পরাজয় হলেও যে তারা তোমাদের সাথে থাকবে তা নিশ্চিত করতে হবে। কুরাইশ ও গাতফানের কিছু লোককে তোমরা বন্ধক রাখ। এতে যদি তারা সম্মতি হয় তবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর। সবাই বলে উঠল কথা ঠিক।

নঈম ইবনে মাসউদ রা. তারপর কুরাইশদের নিকট গিয়ে বললেন- একটি কথা শুনেছি। তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য মনে করেছি। শুনেছি- ইহুদীরা মুহাম্মদ ﷺ'র সাথে চুক্তি করেছে যে, তারা কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের কিছু লোককে গ্রেফতার করে মুহাম্মদ ﷺ'র হাতে অর্পন করবে। ইহুদীরা সিদ্ধান্ত করেছে যে, তারা তোমাদের কাছ থেকে কিছু লোককে বন্ধক হিসাবে দাবী করবে তারপর তাদেরকে মুহাম্মদ ﷺ কে সোপর্দ করবে। তিনি এই কথা গাতফান গোত্রের লোকদেরকেও বলে আসলেন।

এরপর কুরাইশ ও গাতফান ইকরামা ইবনে আবি জেহেল সহ কয়েকজনকে বনু কোরাইযায় পাঠিয়ে সংবাদের সত্যতা যাচাই করল। তারা গিয়ে বলল, অনেক দিন হয়ে গেল। এখন যুদ্ধ শেষ হওয়া উচিত। তোমরা বেরিয়ে এসো আমাদের সাথে। এক সাথে আক্রমণ করব। বনু কোরাইযা জবাব দিল- আগামীকাল শনিবার। শনিবারে আমরা কোন কাজ করিনা। তাছাড়া তোমরা আমাদেরকে বিপদে ফেলে চলে যাবে না এটা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি না। এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের কিছু লোককে আমাদের কাছে বন্ধক হিসাবে

রাখতে হবে। যাতে তাদের কারণে হলেও যেন তোমরা আমাদেরকে ছেড়ে না যাও। এই প্রস্তাব শুনে কুরাইশ ও গাতফান বুঝে গেল যে, নঈম ইবনে মাসউদ যা বলেছিল তা সম্পূর্ণ সত্য। তারা সংবাদ পাঠাল যে, আমরা কোন লোককে তোমাদের নিকট বন্ধক রাখতে পারব না। তোমরা যুদ্ধ কর বা না কর, তোমাদের ইচ্ছা। এতে বনু কুরাইযাও নিশ্চিত হল যে, নঈম যা বলেছে সত্য বলেছে। এভাবে মিত্র বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দিল। ফলে মদীনার ইহুদীরা মক্কার কাফের সৈন্যদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।

রাসূল ﷺ'র দোয়া :

মিত্রবাহিনী মদীনা প্রবেশ পথে পরিখা দেখে হতভম্ভ হয়ে পড়ল। ইতিপূর্বে এই নব রণ কৌশলের সাথে তারা পরিচিত ছিল না। শত্রু সৈন্য এসে পরিখার নিকট অবস্থান করল। উভয় পক্ষ থেকে তীর বিনিময় হত। একবার কাফের দল পরিখার একটি সংকীর্ণ স্থান দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে লাফ দিয়ে পরিখা পার হয়ে আসে। অমনি হযরত আলী ও যোবায়ের রা. অগ্রসর হয়ে আমর ও নওফেল নামের দুই কাফেরকে হত্যা করেন। এই তীর বিনিময়ের সময় হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রা. আহত হন এবং আহত স্থান থেকে রক্ত ক্ষরণের ফলে পরবর্তীতে শাহাদত বরণ করেন। ২৭দিন পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে। নবী করিম ﷺ আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। ফলে রাতের বেলায় আল্লাহ্ তায়ালা তীব্র হিমেল বায়ু প্রবাহিত করে দেন। কুরাইশদের তাবু উড়িয়ে নিয়ে গেল। বৃষ্টি আর শীতে তারা দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। খাদ্য-রসদ ঝড়-বাতাসে উড়ে গেল, চুলার আগুন নিভে গেল। কুরাইশ বাহিনী অসহ্য হয়ে মাল-পত্র ফেলে পালিয়ে গেল। রাসূল ﷺ হোযাইফা ইবনে ইয়ামান রা.কে পাঠিয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের আদেশ দেন। যিলক্বদ মাসের ৭দিন বাকী থাকতে তিনি খন্দক থেকে মদীনায় প্রত্যবর্তন করলেন এবং ভবিষ্যৎ বাণী করলেন- এ বৎসরের পর হতে কুরাইশরা তোমাদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করতে সাহস পাবে না। ৬ষ্ঠ হিজরী সন থেকে মুসলমানগণই কাফের- মুশরিকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছেন। কোন কাফের পক্ষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আর সাহস করেনি।

খন্দক যুদ্ধের সময় প্রকাশিত মু'জিযা সমূহ :

এক. এই যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জীবন-মরণ যুদ্ধ। পানাহার পরিত্যাগ করে রাসূল ﷺ সহ সাহাবায়ে কিরাম পরিখা খনন কাজে লিপ্ত ছিলেন। এমন কি ফরয নামায পর্যন্ত কাযা হয়েছিল তাঁদের। রাসূল ﷺ ক্ষুধা নিবারণের জন্য পেটে পাথর বেঁধেছিলেন এসময়। মাটি বহনের কারণে তাঁর বক্ষ মোবারক ধূলা মিশ্রিত হয়ে

পড়েছিল। পরিখা খননের সময় মাটির নীচে একটি প্রখাণ্ড পাথর আবিষ্কার হয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম কোদাল দ্বারা অনেক চেষ্টা করেও তা ভাঙ্গতে পারেন নি। নবী করিম ﷺ কোদাল হাতে নিয়ে বিসমিল্লাহ্ বলে আঘাত করা মাত্র তা এক তৃতীয়াংশ খণ্ডিত হয়ে গেল। এভাবে তিন আঘাতে পুরো পাথর খানা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেল। তিনবার আঘাতের সময় তিনি সিরিয়ার, পারস্যের এবং ইয়েমেনের সমস্ত রাজ-প্রাসাদ অবলোকন করেছেন। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তিনি সাহাবাদের সুসংবাদ দেন যে, অচিরেই এসব দেশ মুসলমানদের হস্তগত হবে। রাসূল ﷺ'র এই ভবিষ্যৎবাণী পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।[৩৮]

দুই. এই যুদ্ধে রাসূল ﷺ কে ক্ষুধার্ত দেখে হযরত জাবের রা. একটি ছাগল ছানা যবেহ করে ৭/৮ জনের খাবার তৈরী করলেন। তিনি গিয়ে নবী করিম ﷺ কে চুপে চুপে বললেন যেন বিশেষ কয়েকজনকে নিয়ে খাবার গ্রহণ করে আসনে। কিন্তু তিনি উচ্চস্বরে খন্দকবাসী সবাইকে দাওয়াত দিয়ে খাবার গ্রহণ করতে চলে গেলেন। তিনি জাবের রা.কে বলে দিলেন- আমি না আসা পর্যন্ত চুলা থেকে গোস্ত নামাবে না এবং খামির দিয়ে রুটিও পাকাবে না।

নবী করিম ﷺ গিয়ে আটার খামিরে সামান্য থুথু মিশালেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন তারপর বললেন রুটি বানাতে থাক আর ডেকচি উনুন থেকে নামাবে না এবং ডেকচির মুখ ঢেকে রাখবে। তিনি ডেকচি থেকে দিতে লাগলেন আর সাহাবীগণ গোস্ত-রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে গেলেন। এভাবে ৭/৮ জনের খাবার এক হাজার লোকে খাওয়ার পরও চুলার উপর ডেকচিতে গোস্ত টগবগ করছিল আর রুটিও অনুরূপ রয়ে গেল।

তিন. খন্দক বাহিনীকে খাওয়ানোর জন্য হযরত জাবের রা. একটি ছাগল যবেহ করেছিলেন, তা দেখে তাঁর দুই ছেলে যবেহের নকল করতে গিয়ে একজন অপরজনকে যবেহ করল। অপর জন মায়ের ভয়ে পালাতে গিয়ে ঘরের ছাদ থেকে পড়ে শহীদ হন। মা উভয়কে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখেন। এমনকি স্বামীকেও এ সংবাদ দেননি। নবী করিম ﷺ খাবার খেতে বসে হঠাৎ করে বললেন, তোমার ছেলেরা কোথায়? তাদেরকে নিয়ে এস। হযরত জাবের ঘরের ভিতর গি[illegible] সব দেখলেন এবং বললেন, তারা ঘুমাচ্ছে। রাসূল ﷺ'র খাবার খাওয়ার জন্য ডেকে আনতে বলেছেন। এবার জাবের রা. কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং সব ঘটনা খুলে বললেন। নবী করিম ﷺ ছেলেদের শিয়রে বসে ডাক দিতেই তারা জীবিত হয়ে নবীজীকে সালাম করলেন এবং নবীজীর সাথে খাবার খেলেন।

[৩৮]. বিষয় ভিত্তিক মু'জিযাতুর রাসূল স., পৃ. ১৮০

চার. খাবার শেষে নবী করিম ﷺ জাবের রা.কে বললেন, হে জাবের! ডেকচিতে কি আছে। উত্তর দিলেন গোস্ত ও হাড্ডি। তিনি হাড্ডিগুলোকে নামিয়ে এক জায়গায় রাখতে বলেন এবং তাতে ফুঁক দিলেন। সাথে সাথে একটি ছাগল জীবিত হয়ে কান ঝাড়তে লাগল। নবী করিম ﷺ বললেন, হে জাবের! তোমার ছাগল ও আটা তুমি নিয়ে যাও।[৩৯]

বনু কোরাইযা গোত্রের শাস্তি :

খন্দক যুদ্ধ থেকে রাসূল ﷺ বিজয় লাভ করে সাহাবীদেরকে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসলেন। সকাল বেলায় মদীনা পৌছে যুদ্ধাস্ত্র খুলে হযরত উম্মে সালমা রা.'র ঘরে গোসল করছিলেন। এখনো শরীরের এক দিক ধৌত করেছেন এমন সময় জিব্রাঈল আ. এসে আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি যুদ্ধাস্ত্র খুলে ফেলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিব্রাঈল আ. বললেন, কিন্তু আমি তো এখনো যুদ্ধাস্ত্র খুলিনি। আমি এক্ষুনি মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করে আসছি। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে হুকুম দিচ্ছেন যে, আপনি বনু কোরাইযা আক্রমণ করুন। আমি সেখানে ভূমি কম্পন সৃষ্টি করব।

নবী করিম ﷺ সাথে সাথে ঘোষণা করে দিলেন খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলেই যেন বনু কোরাইযার পল্লীতে গিয়ে আসরের নামায আদায় করে। তিন হাজার মুজাহিদ ও তেষট্টিটি ঘোড়া নিয়ে বনু কোরাইযা অবরোধ করলেন। মুসলমানরা কেউ পথেই আসরের নামায আদায় করেছিলেন আর কেউ রাসূল ﷺ'র আদেশ মতে বনু কোরাইযায় পৌছে এশার পর আসরের নামায আদায় করেছেন। ২৫দিন পর্যন্ত বনু কোরাইযাকে অবরোধ করে রাখা হল। তারা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

অত:পর তাদের সর্দার কা'ব ইবনে আসাদ তাদের কাছে তিনটি প্রস্তাব রাখে। যথা– ১. বনু কোরাইযার নারী-পুরুষ সবাই মুসলমান হয়ে যাও। কেননা, তোমরা জান যে, ইনি সত্য নবী। ২. যদি তা না কর তবে প্রত্যেকেই নিজেদের বিবি-বাচ্চাদেরকে নিজেই হত্যা কর তারপর তলোয়ার নিয়ে সম্মিলিত ভাবে মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়। হয়তো বিজয়ী হবে নয়ত প্রাণে মরবে। ৩. যদি এটাও না কর তবে শনিবার পবিত্র দিন। মুসলমানরা এই দিনে অলস ও অসজাগ থাকে। কারণ এই দিনে আমরা কোন আক্রমণ করি না। তাই এ সুযোগে একযোগে তাদের উপর আক্রমণ কর। কিন্তু দূর্গাবাসী কেউ তার প্রস্তাবে সাড়া দিল না।

[৩৯]. অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল র., নূর নবী, পৃ. ১২৮-১৩০, বিষয় ভিত্তিক মু'জিযাতুর রাসূল স., পৃ. ১২৭, ১৪১-১৪২।

হযরত আবু লুবাবা রা.'র ঘটনা :

তারপর বনু কোরাইযা রাসূল ﷺ'র নিকট প্রস্তাব পাঠাল যে, হযরত আবু লুবাবা রা.কে আমাদের কাছে প্রেরণ করুন। আমরা তার সাথে পরামর্শ করব। রাসূল ﷺ আবু লুবাবাকে প্রেরণ করলেন। ইহুদীরা তাকে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তাদের অসহায়ত্ব দেখে তার অন্তরে দয়া আসল। ইহুদীরা বলল, হে আবু লুবাবা। তোমার মতামত কি? আমরা কি মুহাম্মদ ﷺ'র ফায়সালা মেনে নেব? তিনি বললেন হ্যাঁ, সাথে তিনি হাত দ্বারা গলার দিকে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমাদের গর্দান যাবে। ইশারা তো করে দিলেন সাথে সাথে অনুতপ্ত হলেন। কারণ তিনি অগ্রীম শাস্তির সংবাদ দিয়ে আমানতের খিয়ানত করেছেন। তিনি লজ্জিত হলেন এবং বনু কোরাইযায় আর যাবেনা বলে শপথ করে মদীনায় চলে যান। মসজিদে নববীর এক খুঁটিতে নিজেকে বেঁধে রেখে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত খুলবেন না ততদিন পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকবে। এভাবে ছয়দিন ছিলেন। নামাযের সময় হলে তার স্ত্রী এসে হাত খুলে দিতেন আবার নামাযের পরে বেঁধে দিতেন। ছয়দিন পর কুরআনের আয়াত নাযিল হল এবং তার ক্ষমা ঘোষিত হলে রাসূল ﷺ এসে নিজ হাতে আবু লুবাবাকে মুক্ত করেন।

হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রা.'র ফায়সালা:

অবশেষে তারা আনসার সর্দার হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রা.'র উপর ফায়সালার ভার ন্যাস্ত করল। পূর্ব আত্মীয়তার সূত্রে তারা মনে করেছিল হয়ত তিনি নমনীয় ফায়সালা দিবেন। নবী করিম ﷺও তাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। হযরত সা'দ রা. খন্দক যুদ্ধে তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি রাফিয়া রা.'র তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তাকে নিয়ে আসা হল। তার সম্মানার্থে রাসূল ﷺ আনসারদেরকে দাড়িয়ে যেতে নির্দেশ দেন। তিনি তাওরাতের বিধান মতে নিম্নোক্ত ফায়সালা করলেন– ১. বনু কোরাইযা গোত্রের সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে, ২. তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হবে এবং ৩. তাদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। এই ফায়সালা ছিল তাওরাত কিতাব মতে চুক্তি ভঙ্গের শাস্তির বিধান। নবী করিম ﷺ বললেন, হে সা'দ! তুমি ঐ ফায়সালাই করেছ যা আল্লাহ সপ্ত আকাশের উপর থেকে করে রেখেছেন। অত:পর এই ফায়সালা মতে তাদের প্রায় সাতশত পুরুষকে হত্যা করা হয়। তাদের প্রচুর সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ রেখে অবশিষ্ট সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হল। নারী ও শিশুদের

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

মুসলমানদের দাস-দাসী বানানো হল। এভাবে ইহুদীদের তিনটি বড় বড় গোত্র মদীনা থেকে বিতাড়িত হল।[৪০]

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বাইয়াতে রিদওয়ান:

হুদায়বিয়া মক্কার ৯ মাইল দূরে অবস্থিত একটি কূপের নাম। এই স্থানে নবী করিম ﷺ ও কুরাইশদের মধ্যে একটি সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ৬ষ্ঠ হিজরী সনে যিলক্বদ মাসে। এটাকে হুদায়বিয়ার সন্ধি বলা হয়। এই অসম চুক্তিটি ছিল নবী করিম ﷺ এবং মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক মহা বিজয় এবং মক্কা বিজয়ের পটভূমিকা স্বরূপ। সুতরাং ইসলামের ইতিহাসে এই সন্ধি চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘটনা:

রাসূল ﷺ স্বপ্ন দেখলেন যে, সাহাবীগণকে নিয়ে তিনি হজ্ব করছেন এবং খানায়ে কাবা'র চাবি নিজের আয়ত্বে এনেছেন। সাহাবীদের মধ্যে কেউ মাথা মুণ্ডন করেছেন আর কেউ চুল ছাঁটছেন। কুরআনে এই স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে এভাবে- لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا "আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তক মুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়, তোমরা কাউকে ভয় করবে না। আর তিনি জানেন যা তোমরা জাননা। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়।[৪১] স্বপ্নের কথা তিনি সাহাবীদেরকে বললেন। মূলত এই স্বপ্ন ছিল ভবিষ্যৎ বিজয়ের ইঙ্গিতবহ। এই স্বপ্ন শুনে মুহাজিরগণ জন্মভূমি এবং খোদার ঘর তাওয়াফ করার জন্য উতলা হয়ে উঠলেন।

নবী করিম ﷺ চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে যাদের অধিকাংশই ছিলেন মুহাজির, ওমরা করার নিয়তে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন যিলহজ্ব মাসের পহেলা তারিখ সোমবারে। সাথে নিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা রা.কে। আত্মরক্ষা মূলক খাপযুক্ত তরবারী ছাড়া যুদ্ধের কোন অস্ত্র সাথে ছিল না। মদীনার সামান্য দূরে 'যুলহুলাইফা' নামক স্থানে পৌছে তিনি ওমরার ইহরাম

---

৪০. মাওলানা আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস্ সিয়ার, পৃ. ৭৬, অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল র., নূর নবী, পৃ. ১৩২, জামে কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪৮৪।

৪১. সূরা ফাতাহ, আয়াত: ২৭।

পরিধান করে তালবিয়া পড়ে মক্কার অভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার সন্নিকটে খুজাহ গোত্রের বুদাইল ইবনে ওয়াকার নিকট কুরাইশ কর্তৃক কাফেলাকে প্রতিরোধ করবে এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করবে– এই সংবাদ পেয়ে নবী করিম ﷺ সাহাবীদের নিয়ে পথ পরিবর্তন করে মক্কার নয় মাইল অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন।

কোরাইশদের দূরভিসন্ধি জানতে পেরে হযরত বুদাইলকে দূতরূপ পাঠিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুরাইশদের জানালেন যে, তাঁরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। যুদ্ধ করতে আসে নি। শুধু ওমরা করার উদ্দেশ্যে এসেছেন। কুরাইশরা উরওয়া ইবনে মাসউদকে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে মহানবী ﷺ'র নিকট পাঠায়। সাহাবীদের বিশ্বস্ততা ও সদিচ্ছার প্রতি কটাক্ষ করে উরওয়া কটূক্তি করলে এবং মহানবী ﷺ'র সাথে কথা বলার সময় বেয়াদবীমূলক আচরণ করার ফলে চুক্তির প্রাথমিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

হযরত ওসমান রা.'র হত্যার গুজব ও বাইয়াতে রিদওয়ান:

রাসূল ﷺ প্রথমে হযরত খারাশ বিন উমায়্যা আল খোযাঈকে এবং পরে হযরত ওসমান রা.কে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করেন। আবু সুফিয়ান হযরত ওসমান রা.কে সাদরে গ্রহণ করল, আর বলল, প্রথমে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ কর তারপর কথা হবে। কিন্তু হযরত ওসমান রা. প্রিয় নবীর অনুমতি ব্যতিরেকে এবং তাঁকে বাদ দিয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে সম্মতি হলেন না। কুরাইশরা হযরত ওসমান রা.কে আটক করে। হুদায়বিয়ায় মুসলমানদের শিবিরে গুজব সংবাদ পৌছানো হল যে, হযরত ওসমান রা.কে কুরাইশরা হত্যা করেছে। সাহাবীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল ওসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য। এসময় রাসূল ﷺ বাবেল বৃক্ষের নিচে বসা ছিলেন। তিনি সাহাবীদেরকে ডেকে এনে তাদের মতামত চাইলেন। সবাই এক বাক্যে কথিত ওসমান হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে ফিরে যাবে না বলে মত প্রকাশ করলেন। ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং বীর মুসলিম যুদ্ধাগণ নিরস্ত্র হলেও দীপ্তকণ্ঠে শপথ গ্রহণ করলেন যে, তারা হযরত ওসমান রা.'র হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আল্লাহ ও রাসূল ﷺ'র সন্তুষ্টির জন্য এই বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয় বলে এটাকে বাইয়াতে রিদ্ওয়ান বলা হয়। আর বৃক্ষের নিচে বসে রাসূল ﷺ বাইয়াত নিয়েছিলেন বলে এটাকে বাইয়াত আশ্‌শাজরা বলে অভিহিত করা হয়।

রাসূল ﷺ সকল সাহাবীকে একত্রিত করে নিজের ডান হাত মোবারক সাহাবীগণের ডান হাতের উপরে স্থাপন করে প্রতিশোধ গ্রহণের বাইয়াত তথা শপথ বা অঙ্গীকার করেন। তিনি নিজ পবিত্র বাম হাত ডান হাতের নিচে স্থাপন

করে ইঙ্গিতে বললেন, আমি ওসমানের পক্ষে এই বাইয়াত গ্রহণ করছি, একথা বলার সাথে সাথে সবাই বুঝে গেলেন যে, ওসমান রা. জীবিত আছেন। কারণ, মৃত লোকের পক্ষে কোন বাইয়াত হয় না।

মুসলমানদের দৃঢ় শপথে শঙ্কিত হয়ে কুরাইশরা হযরত ওসমান রা.কে মুক্তি দিয়ে সুহাইল বিন আমেরকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে পাঠায়। এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে কুরাইশদের পক্ষ থেকে দূত হিসাবে আগত উরওয়া ইবনে মাসউদ কুরাইশদেরকে রিপোর্ট দিয়েছিল যে, হে কুরাইশগণ! আমি ইতিপূর্বে অনেক বড় বড় রাজা-বাদশাহ'র দরবারে গিয়েছি এবং তাদের প্রতি জনসাধারণের আদব-কায়দাও দেখেছি। কিন্তু খোদার কসম! আমি কোন বাদশাহকে দেখিনি যে, তার প্রজাগণ তাকে এভাবে সম্মান করতে, যেভাবে মুহাম্মদ ﷺ'র সাহাবীগণ তাঁকে সম্মান করেন।

যদি তাঁর থুথু সঙ্গীদের হাতে পড়ে তবে তা তারা স্বীয় মুখমণ্ডলে ও শরীরে মালিশ করে নেন। কোন কথা তাঁর মুখ থেকে বের হলে তা পালন করার জন্য তারা ঝাপিয়ে পড়েন। তিনি উযূ করার সময় তাঁর ব্যবহৃত পানি সংগ্রহের জন্য ভীড় জমায় এবং ঐ পানি দিয়ে নিজেদের মুখে-বুকে মালিশ করে নেন। তারা কথা বলার সময় তাঁর সম্মানার্থে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকায় না। সুতরাং তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। নিজেদের দূতের নিকট এসব কথা শুনে কুরাইশ নেতারা ঘাবড়িয়ে যায়। তারপর তারা হযরত ওসমান রা.কে ছেড়ে দিয়ে সোহাইলকে সন্ধি করার জন্য প্রেরণ করে। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর নবী করিম ﷺও কুরাইশদের মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল। ইসলামে এটাই হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। হুদায়বিয়া নামক একটি কূপের নামানুসারে অঞ্চলটি হুদায়বিয়া নামে পরিচিত।[৪২]

হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রধান শর্তাবলী:

১. এই বছর (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে) মুসলমানগণ ওমরা সম্পাদন না করে মদীনা প্রত্যাবর্তন করবে।

২. মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে আগামী দশ বছর পর্যন্ত যে কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকবে।

৩. মুসলমানগণ ইচ্ছা করলে আগামী বছর (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে) তিন দিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করে ওমরা করতে পারবে। মুসলমানদের অবস্থানকালে কুরাইশরা মক্কা নগরী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেবে।

[৪২]. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৬৯, হাফেয এম এ জলিল র., নূর নবী, পৃ. ১৩৪-১৩৭।

৪. আগমণকালে মুসলমানগণ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য কোষবদ্ধ তরবারী ব্যতিত অন্য কোন মরণাস্ত্র আনতে পারবে না।

৫. ওমরা পালনের সময় মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা হবে এবং মক্কার বণিকগণ নির্বিঘ্নে মদীনার পথ ধরে সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে পারবে।

৬. চুক্তির মেয়াদকালে জনসাধারণের পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষিত হবে এবং একে অপরের ক্ষতি সাধন করবে না। কোন প্রকার লুণ্ঠন বা আক্রমণ চালাবে না।

৭. আরবের যে কোন গোত্রের লোক মুহাম্মদ ﷺ অথবা কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে।

৮. কোন মক্কাবাসী মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করলে কুরাইশরা চাইলে মদীনার মুসলমানগণ তাকে ফেরত দিবে পক্ষান্তরে কোন মুসলিম মদীনা হতে মক্কায় আগমণ করলে মক্কাবাসী তাকে প্রত্যার্পনে বাধ্য থাকবে না।

৯. মক্কার কোন নাবালক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিত মুসলমানদের দলে যোগদান করতে পারবে না, করলে তাকে ফেরত দিতে হবে।

১০. সন্ধির শর্তাবলী উভয় পক্ষকে পরিপূর্ণ ভাবে পালন করতে হবে।[৪৩]

চুক্তি লিপিবদ্ধ করার সময় সংঘটিত ঘটনা:

হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি লিখতে গিয়ে প্রথমে উভয় পক্ষের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ সংঘটিত হয়। কিন্তু রাসূল ﷺ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এবং ভবিষ্যত চিন্তা করে আপাতত দৃষ্টিতে এই চুক্তি মুসলমানের বিরুদ্ধে মনে হলেও চুক্তি সম্পাদিত করেন।

রাসূল ﷺ হযরত আলী রা.কে ডেকে চুক্তিপত্র লিখতে বললেন। বললেন, প্রথমে লিখ- 'বিছমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম'। কুরাইশ পক্ষের প্রতিনিধি সোহাইল বলল, আমরা এ বাক্য সম্পর্কে অভিহিত নই, তাই এটা লেখা যাবে না। বরং আমাদের চিরচারিত নিয়ম অনুযায়ী বিইসমিকা আল্লাহুম্মা লিখুন। রাসূল ﷺ বললেন, ঠিক আছে তাই লিখ। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, লিখ- এই চুক্তিনামা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ'র সাথে সোহাইলের মধ্যে সংঘটিত। সোহাইল আপত্তি জানিয়ে বলল, আমরা যদি আপনাকে রাসূলুল্লাহ মনে করতাম তাহলে তো বিরোধ হত না। রাসূলুল্লাহ বাদ দিয়ে নিজের ও পিতার নাম লিখতে হবে। হযরত ওমর রা. রাগে গর্জে উঠলেন আর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!

[৪৩]. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, পৃ. ...[illegible], ১১৬।

এমন অপমানজনক শর্ত কিভাবে মেনে নেয়া যায়? রাসূল ﷺ শান্তস্বরে বললেন, আমি তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাসূল, এটা লিখা না লিখার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। ঠিক আছে- মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখ। আর রাসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে ফেল। হযরত আলী রা. আদবের সাথে বললেন, আমি কখনো একাজ করতে পারব না। রাগান্বিত হয়ে হযরত আলী রা. তরবারী নিতে চাইলে রাসূল ﷺ তাঁকে শান্ত করলেন আর বললেন, হে আলী! তুমিও এক সময় এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে- এই বলে চুক্তিপত্র নিয়ে নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে তদস্থলে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখে দেন।

এখনো সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ হচ্ছে। উভয় পক্ষের স্বাক্ষর হয়নি। এমতাবস্থায় সোহাইলের পুত্র আবু জন্দল বন্দী শিকল সহ কুরাইশদের থেকে পালিয়ে হুদায়বিয়ায় মুসলমানদের নিকট চলে এসেছেন। তিনি ছিলেন মুসলমান। তাই মক্কার কাফেররা তাকে মার-ধর করে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। তাকে দেখা মাত্র পিতা সোহাইল বলল, হে মুহাম্মদ! আমাদের মধ্যে কৃত শর্ত মতে আবু জন্দলকে ফেরত দিন। রাসূল ﷺ বললেন, এখনও তো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। সোহাইল বলল, তাহলে তো কোন চুক্তিই হবে না। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর আবু জন্দলকে ফেরত দিতে সম্মত হলেন। আবু জন্দল মুসলমানদের নিকট প্রার্থনা করে এবং তার উপর নির্যাতন ও অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরে ফেরত না দিতে আবেদন করলেন। রাসূল ﷺ তাকে ধৈর্য্যধারণ করতে উপদেশ দিলেন।

হযরত ওমর রা. বলেন, ঐ সময় আমার যে অবস্থা হয়েছিল, ইসলাম গ্রহণের পর এরূপ কখনো হয়নি। আমি রাসূল ﷺ'র নিকট গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সত্য নবী নন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই? আমাদের শত্রুরা কি মিথ্যার উপর নয়? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি বললাম, তবে কেন আমাদের এই অক্ষমতা প্রকাশ? আপনি কি আমাদেরকে বলেননি- আমরা বাইতুল্লাহ যাব এবং তাওয়াফ করব। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, বলেছি, তবে এ বছর যাব বলে তো বলিনি। একটু অপেক্ষা কর। আমরা সবাই বাইতুল্লাহ যাব এবং তাওয়াফ করব। ওমর রা. বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটাতেও রাজী হলেন- আমাদের লোককে তারা ফেরত দেবে না অথচ আমরা তাদের লোককে ফেরত দিতে বাধ্য? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমাদের থেকে যারা মক্কায় চলে যাবে তারা অবশ্যই মোনাফিক। এরূপ লোক চলে যাওয়াই উত্তম। মুসলমানদের জন্য আল্লাহ নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা করবেন।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

চুক্তিপত্র সম্পাদন সমাপ্ত হওয়ার পর রাসূল ﷺ সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা কুরবানীর উটগুলোকে যবেহ কর এবং মাথা মুণ্ডাও এভাবে ইহরাম খুলে ফেল এবং তাওয়াফকে মুলতবী রাখার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সন্ধি চুক্তিতে মুসলমানদের বিপক্ষে শর্তযুক্ত করায় তারা মনক্ষুন্ন ছিলেন। রাসূল ﷺ একে একে তিনবার আদেশ দেওয়ার পরও কেউ উঠেন নি। সবাই ভারাক্রান্ত মনে বসে আছেন। রাসূল ﷺ হযরত উম্মে সালমা রা.'র কাছে গিয়ে সাহাবীদের এরূপ আচরণের ব্যাপারে আলোচনা করলে উম্মে সালমা রা. বললেন, তারা ব্যথিত ও মর্মাহত। আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনি নিজেই গিয়ে আপনার উট যবহে ও হলক করুন। আপনাকে দেখে তারা এমনিই আপনার অনুসরণ করবেন। বাস্তবে তাই হল।[৮৮]

মহা বিজয়:

রাসূল ﷺ হুদায়বিয়ায় ১৯দিন অবস্থান করে সন্ধি সমাপ্তে মদীনার পথে রওয়ানা দিলেন তখন পথের মধ্যে সূরা ফাতাহ অবতীর্ণ হয়। পবিত্র কুরআনে এই সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা প্রকাশ্য বিজয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই সন্ধি নিশ্চয় মুহাম্মদ ﷺ'র রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রতিভার পরিচায়ক। আলোচ্য সন্ধি আপাতত মুসলমানদের সার্থের পরিপন্থি এবং অপমানজনক বলে প্রতীয়মান হলেও এটা ছিল ইসলামের নিরঙ্কুশ বিজয়ের সংকেত স্বরূপ। বাস্তবিক এই সন্ধি ছিল কৌশলপূর্ণ পশ্চাৎপদ কিন্তু রণচাতুর্যপূর্ণ বিজয়।

হুদায়বিয়ায় প্রকাশিত মু'জিযা:

১. হযরত বারা ইবনে আযেব রা. ও হযরত সালমা ইবনে আকওয়া রা. বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়ায় একদা মুসলমানগণ পানির অভাবে অতীষ্ট হয়ে রাসূল ﷺ'র খেদমতে এসে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি হুদায়বিয়ার শুষ্ক কূপের পাড়ে বসে উযূ করলেন এবং কুলির পানি কূপে নিক্ষেপ করলেন। সাথে সাথে কূপের পানি উপচে পড়তে লাগল। সকল সাহাবী ও তাদের পশুগুলো পরিতৃপ্ত হয়ে পানি পান করল।

২. একদা তিনি পানির পাত্র আনালেন এবং উযূ করে মুখের পানি পাত্রে নিক্ষেপ করে আদেশ দিলেন তা কূপে ঢেলে দিতে। তারপর একটি তীর দিয়ে বললেন, এটিকেও নিক্ষেপ কর। এরপর তিনি দোয়া করলেন। ফলে কূপে এমন পানি হল যে, লোকেরা কূপের উপরে বসে কূপ থেকে পানি পান করে নিতেন।

---

৮৮. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, ১৭৪-১৭৮।

৩. একদা রাসূল ﷺ উযূ করছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম এসে সমবেত হলেন। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কাছে না পান করার পানি আছে, না উযূ করার পানি আছে। কেবল আপনার পেয়ালায় যা আছে তা ব্যতিত কোন পানি নেই। তিনি পেয়ালায় হাত মোবারক রাখলেন। সাথে সাথে তাঁর অঙ্গুলি সমূহ থেকে এমন ভাবে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হল যেন পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। পনের শত লোক সকলেই পানি পান করে তৃপ্ত হয়েছিলেন।[৪৫]

সন্ধির গুরুত্ব:

সন্ধিতে উল্লেখিত ৭নং শর্তটির ফলে রাসূল ﷺ'র পক্ষে গত আঠার বছরে যা করতে সম্ভব হয়নি মাত্র দেড় বছরে তা করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। ইবনে হিশাম বলেন, "এই চুক্তির ফলাফল হয়েছিল এরূপ যে, মুহাম্মদ ﷺ চৌদ্দশত লোক নিয়ে হুদায়বিয়ায় গমণ করবার মাত্র দুই বছর পরে দশ হাজার অনুসারী নিয়ে মক্কা বিজয় করেন।" উনিশ বছর কঠোর ত্যাগ ও পরিশ্রমের ফলে উম্মতের সংখ্যা হয়েছিল মাত্র চৌদ্দশত। কিন্তু এই চুক্তির ফলে মাত্র দুই বছরে (৬২৯-৬৩০) মুসলমানদের সংখ্যা হয়েছিল দশ হাজার।

দূত প্রেরণ:

হুদায়বিয়ার সন্ধির দ্বিতীয় শর্ত মতে দশ বছরের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকার ফলে মহানবী ﷺ ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন দূতদেরকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণের নিকট ধর্ম প্রচারার্থে প্রেরণ করেন। যেমন–

১. হযরত দাহিয়া ইবনে খলিফা কালবী রা.কে রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট।
২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হোযায়ফা রা.কে ইরানের সম্রাট কিসরার নিকট।
৩. হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যামরী রা.কে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট।
৪. হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা রা.কে মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাওকিসের নিকট।
৫. হযরত সালীত ইবনে আস্ সাহমী রা.কে ওমানের বাদশা জায়করের নিকট।
৬. হযরত সালীত ইবনে আমর রা.কে ইয়ামামার সর্দার হাইজা ইবনে আলীর নিকট।
৭. হযরত আলা ইবনে হাদ্বরামী রা.কে বাহরাইনের শাসক মনজির ইবনে সাবীর নিকট।

[৪৫]. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৭৮, বুখারী, পৃ. ৫০৫, হাদিস নং-৩৩২৪

৮. হযরত শুজা ইবনে ওয়াহাব আসাদী রা.কে গাস্সানের শাসক হারেছ গাসসানীর নিকট।
৯. হযরত মুহাজির ইবনে উমাইয়া মাখযূমী রা.কে ইয়ামেনের শাসক হারেছ হিমাইয়ারীর নিকট প্রেরণ করেন।

আবিসিনিয়ার নৃপতি নাজ্জাশী ইসলাম কবুল করেন। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস রাজনৈতিক কারণে ইসলাম গ্রহণে অপারগতার কথা জানান। অগ্নি উপাসক পারস্য সম্রাট রাজা দ্বিতীয় খসরু রাসূলুল্লাহর পত্র ছিড়ে ফেলে। ইহা শ্রবণ করে রাসূল ﷺ বলেন, আমার পত্রকে যেমন সে ছিড়ে ফেলেছে ঠিক তেমনি মুসলমানদের হাতে তার রাজ্যও ছিন্ন ভিন্ন হবে। পরবর্তীতে হযরত ওমর রা.'র শাসনামলে সমগ্র ইরান মুসলমানদের দখলে আসে। রাজনৈতিক কারণে আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা মুকাওকিস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। গাস্সানের শাসনকর্তা হারেছ এবং ইয়ামামার শাসনকর্তা হাইজা মুসলিম দূতকে জঘন্যভাবে অপমানিত করে। রোমান সামন্তরাজ সুরাহবিল মুসলিম দূতকে হত্যা করে, এর ফলে খ্রিষ্টান জগতের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।[৪৬]

উপরোল্লিখিত দূতগণের মাধ্যমে দাওয়াতী পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নবী করিম ﷺ বিশ্বের দরবারে নিজেকে নবী হিসাবে পেশ করলেন। এভাবে তাঁর ইসলামী দাওয়াত বিশ্বব্যাপী সে সময়েই পৌছে গিয়েছিল।

বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের ফযিলত:

বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের ফযিলত সম্পর্কে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا "যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব যে শপথ ভঙ্গ করে; অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ সত্বরই তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।"[৪৭]

[৪৬]. ইসলামের ইতিহাস, বা. মা.শি. বোর্ড, ২০০৯ সালের দাখিল নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক।
[৪৭]. সূরা ফাতাহ, আয়াত: ১০।

উক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ্'র হাতকে আল্লাহর হাত এবং রাসূলুল্লাহ্'র সাথে কৃত অঙ্গীকারকে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের উপর সন্তুষ্ট আছেন বলে ঘোষণা দিলেন যা একজন মু'মিনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন–

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا . وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا . وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا . وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا .

আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অত:পর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্ধ করে দিয়েছেন- যাতে এটা মু'মিনদের জন্যে এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। আরও একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি। আল্লাহ তা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।[৪৮]

উক্ত আয়াতসমূহে খায়বার বিজয় ও মক্কা বিজয় সহ পরবর্তীতে বহু বিজয় ও গণিমতের মালের সুসংবাদ প্রদান করা হয়।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত আছে, হুদায়বিয়ার দিনে আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন- أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ অর্থাৎ তোমরাই ভূ-পৃষ্ঠের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সহীহ মুসলিমে উম্মে বাশার থেকে বর্ণিত আছে– مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ لَا يَدْخُلُ النَّارَ অর্থ: যারা বৃক্ষের নীচে শপথ করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।[৪৯]

[৪৮]. সূরা ফাতাহ, আয়াত: ১৮-২১।
[৪৯]. তাফসীর মাযহারী।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, বারা ইবনে আযেব, হযরত জাবের রা. প্রমূখ সাহাবীগণের মতে হুদায়বিয়ার সন্ধিই হল মহা বিজয়। তাঁরা বলেন, তোমরা মক্কা বিজয়কে মহা বিজয় মনে কর কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে এবং বাইয়াতে রিদওয়ানকে আসল বিজয় মনে করি।[৫০]

খায়বারের যুদ্ধ:

খায়বর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৭ম হিজরি মহররম ও সফর মাসে। ১৯ কিংবা ২০দিন খায়বরে ইহুদী দূর্গ অবরোধের পর হযরত আলী রা.'র হাতে দূর্গের পতন হয়। মদীনা হতে বিতাড়িত বনু নজীর ও বনু কাইনুকা ইহুদী গোত্রদ্বয় খায়বরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এবং মদীনা শরীফ আক্রমণের ষড়যন্ত্র করতেছিল। মুনাফিক দলনেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং গাতফান ও অন্যান্য বেদুঈন গোত্রের সঙ্গে একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চার হাজার সৈন্যের একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে। এ সংবাদ শুনে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মে মাসে ৭ম হিজরির মহররম মাসে রাসূল ﷺ দুইশত অশ্বারোহী হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী চৌদ্দশত মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে খায়বরের দিকে যাত্রা করেন। বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে যে, নবী করিম ﷺ রাতের বেলায় খায়বরে উপস্থিত হন। কিন্তু রাতে আক্রমণ থেকে বিরত থাকেন। ভোরে ইহুদীরা দূর্গ হতে বের হয়ে মুসলিম বাহিনী দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ে। তারা চিৎকার করে বলে উঠে- আশ্চার্য্য! মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর বাহিনী এসে গেছে। তিনি 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করে বলেন, আমরা যে ময়দানেই অবতরণ করি, সেখানকার বাসিন্দাদের প্রাত:কাল ভয়াবহ হয়ে থাকে। একথা বলেই তিনি সেনা বাহিনীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দূর্গ অবরোধ করার নির্দেশ দেন। আল কামুস দূর্গ সহ ইহুদীদের সকল দূর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়। হযরত আলী রা. বীর বিক্রমে এ যুদ্ধ করেন বলে রাসূল ﷺ তাঁকে আসাদুল্লাহ (আল্লাহ্র সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁকে বিখ্যাত যুলফিকার তরবারী প্রদান করেন।

এই যুদ্ধে ইহুদী সম্প্রদায় আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। মহানবী ﷺ তাদেরকে ক্ষমা করে নির্বিঘ্নে তথায় বসবাস করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু বিশ্বাস ঘাতক ইহুদীগণ হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। হারেছের কন্যা যয়নব খায়বারের যুদ্ধে পিতা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বিষ প্রয়োগে হযরতকে হত্যার চেষ্টা করে। খাদ্যে বিষ প্রয়োগের ফলে বিশর ইবনে বারা রা. নামক এক সাহাবী ইন্তেকাল করেন। সত্য নবীর মু'জিযা হিসাবে নবী করিম ﷺ রক্ষা পায়। সাহাবীর মৃত্যুর জন্য যয়নবকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। তবে

[৫০]. আল্লামা ইবনে কাসীর।

সমগ্র ইহুদীদের উপর কোন অত্যাচার করা হয়নি। কোন কোন বর্ণনা মতে যয়নবকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। ইহুদীদেরকে কর প্রদানের শর্তে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ এবং জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করা হয়।

এই যুদ্ধে ইহুদীদের ৯৩ জন নিহত হয় এবং ১৫ জন মুসলমান সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। অসংখ্য গণিমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হয়। বিজিত অঞ্চল কতিপয় শর্তের মাধ্যমে তাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়। শুধু ফিদাক নামক অঞ্চলটি রাসূল ﷺ নিজ অধিকারে নিয়ে আসেন। ঐ যুদ্ধে ইহুদী কন্যা হযরত হারূন আ.'র বংশধর হযরত সফিয়া রা.কে আযাদ করে মুসলমান বানিয়ে নবী করিম ﷺ বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন।[৫১]

এ যুদ্ধকালে প্রকাশিত মু'জিযা:

১. বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে যে, আসওয়াদ রাঈ (কাল রাখাল) নামক খায়বর বাসীদের একজন হাবশী রাখাল ছিল। ইহুদীরা যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল তখন সে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল কার সাথে যুদ্ধ করছ? তারা বলল, যে নবুয়তের দাবী করতেছে তাঁর সাথে। এ কথা শুনে সে ছাগলপাল সহ নবী করিম ﷺ'র নিকট চলে আসল। সে রাসূল ﷺ'র মুখে ইসলামে বাণী শুনে বলল, যদি আমি ঈমান গ্রহণ করি তাহলে আমার কি লাভ হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি জান্নাত পাবে। সে বলল, এই ছাগলপাল আমার কাছে আমানত স্বরূপ। এগুলো কি করব? রাসূল ﷺ বললেন, তুমি এইগুলো দূর্গের দিকে নিয়ে যাও এবং এক মুষ্টি কংকর নিক্ষেপ কর, দেখবে প্রত্যেক ছাগল নিজ মালিকের কাছে চলে যাবে। তারপর সে ঈমান আনল এবং রাসূলের কথা মতে ছাগলপালকে কংকর নিক্ষেপ করলে প্রত্যেক ছাগল আপন মালিকের কাছে চলে গেল।[৫২]

২. কামুস দূর্গা অবরোধকালে রাসূল ﷺ'র মাথা ব্যথা হওয়ায় তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে পারেন নি। মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে একেক দিন একেক জনকে পতাকা দিয়ে সেনাপতি নিযুক্ত করতেন। এই দূর্গাটি অত্যন্ত মজবুত। এ কারণে এটি জয় করতে সময় লেগেছিল বেশী। একদিন সিদ্দিকে আকবর রা. গেলেন। আরেক দিন ওমর রা. গেলেন। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও দূর্গা জয়ে সক্ষম হননি। রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন- আগামীকাল এমন

[৫১]. ইসলামে ইতিহাস, নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক, ২০০৯, পৃ. ৬২, অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল র., নূর নবী, পৃ. ১৪১-১৪২।

[৫২]. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৮৮, বিষয় ভিত্তিক মু'জিযাতুর রাসূল স., পৃ. ১২১

ব্যক্তিকে পতাকা দেব যে আল্লাহ্ ও রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও রাসূলও তাকে ভালবাসেন। তার হাতেই আল্লাহ্ তায়ালা দূর্গের বিজয় দান করবেন।

রাতের বেলায় সাহাবীগণ বলাবলি করতে লাগলেন এই ভাগ্যবান ব্যক্তি কে হবেন? অনেকেই ভেবেছিলেন হয়ত এই পতাকা আমাকেই দেয়া হবে। পরের দিন সকালে রাসূল ﷺ'র দরবারে সাহাবায়ে কিরামগণ উপস্থিত হলেন। কিন্তু আলী রা.কে দেখলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন আলী কোথায়? উপস্থিত সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, তিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত। তাই আসতে পারেন নি। বললেন; তাকে ডেকে আন, তিনি আসলে তার চোখে রাসূল ﷺ স্বীয় লালা মোবারক লাগিয়ে দোয়া করেন। সাথে সাথে তার চোখ এমনভাবে আরোগ্য লাভ করল যে, যেন কোন রোগই হয়নি। তারপর তার হাতে পতাকা দিয়ে যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তারই হাতে খায়বর বিজয় হয় বলে, তাকে 'ফাতেহে খায়বর' বলা হয়। এই যুদ্ধে তিনি শেরে খোদা (আল্লাহর সিংহ) উপাধি লাভ করেন।[৫৩]

৩. খায়বর যুদ্ধে বিজয় লাভের পর ইহুদী কন্যা যয়নব বিনতে হারেছ একটি ছাগল ভুনা করে রাসূল ﷺকে হাদিয়া দিল। তাতে বিষ মিশ্রণ ছিল। তিনি গোশত মুখে দেওয়া মাত্র বুঝতে পারলেন যে, তাতে বিষ মিশ্রিত আছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে গোশতই বলে দিয়েছিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মধ্যে বিষ মিশ্রিত আছে। সাথে সাথে তিনি মুখ থেকে গোশত ফেলে দিলেন। কিন্তু বিশর ইবনে বারা রা. বিষ মিশ্রণ অনুভব করা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ'র সামনে থুথু ফেলা আদবের খেলাফ হবে মনে করে গিলে ফেললেন। ফলে তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। রাসূল ﷺ মহিলাকে ডেকে এনে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে মহিলা বলল, আমার উদ্দেশ্য ছিল- যদি আপনি সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে আপনি বিষের কথা নিশ্চয়ই জানতে পারবেন এবং বিষের ক্রিয়া আপনার মধ্যে নিশ্চয়ই হবে না। আর যদি মিথ্যা নবী হন তবে বিষপানে আপনি শহীদ হলে আমরা মুক্তি পাব।

ইমাম যুহরীর মতে উক্ত মহিলা মুসলমান হয়েছিল। রাসূল ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তবে আবু সালমা বলেন, সাহাবীর ইন্তেকালের পর তাকে ডেকে এনে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন।

উক্ত বিষে তাৎক্ষনিক কোন ক্রিয়া হয়নি বটে তবে তিন বছর পর ইন্তেকালের পূর্বে রাসূল ﷺ বলেছিলেন খায়বরের বিষ আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া করেছে। এ কারণে ইমাম যুহরী বলেন, রাসূল ﷺ শহীদ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন।[৫৪]

[৫৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০, বিষয় ভিত্তিক মু'জিযাতুর স., পৃ. ৮৬

[৫৪]. আবু বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২০২ ও বিষয় ভিত্তিক মু'জিযাতুর রাসূল স., পৃ. [illegible]

৪. কাযী আয়ায, ইমাম তাহাভী প্রমূখ মোহাদ্দিসগণ হযরত আসমা বিনতে ওমায়েস রা., হযরত আবু সাঈদ খুদূরী রা., হযরত আবু হোরায়রা রা. প্রমূখ সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণনা করেন, খায়বর থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে 'সাহ্বা' নামক স্থানে নবী করিম ﷺ তাঁবু ফেললেন। সকলে মিলে আসরের নামায আদায় করেন, কিন্তু হযরত আলী রা. তখনও আসরের নামায আদায় করেননি। এমন সময় নবী করিম ﷺ'র উপর ওহী নাযিল হল। তিনি হযরত আলী রা.কে ডেকে তার কোলে শুয়ে পড়লেন। ওহী নাযিল মাগরীব পর্যন্ত চলতে লাগল। সূর্য ডুবে গেল। এমন সময় জিব্রাঈল আ. চলে গেলেন। নবী করিম ﷺ হযরত আলী রা.কে জিজ্ঞাসা করলেন– তুমি কি আসর নামায পড়েছ? হযরত আলী রা. বললেন, জ্বী-না। নবী প্রেমে আলী রা. আসর নামায ক্বাযা করে ফেললেন। নবী করিম ﷺ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আলী তোমার এবং তোমার রাসূলের খেদমতে ও আনুগত্যে নিয়োজিত ছিল। তাই আসর ক্বাযা হয়ে গেছে। হে আল্লাহ্! তুমি সূর্যকে ফিরিয়ে দাও। আসমা বিনতে ওমায়েস রা. বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে, অস্তমিত সূর্য পুনরায় উদিত হল পশ্চিম গগনে এবং অনেকটুকু উপরে উঠে এল। ইত্যবসরে হযরত আলী রা. আসর পড়ে নিলেন। এরপর দেখলাম সূর্য ডুবে গেল। আসমা রা.'র বর্ণনা নিম্নরূপ- فَرَأَيْتُ غَرَبَتْ ثُمَّ طَلَعَتْ بَعْدَ اَنْ غَرَبَتْ অর্থ: প্রথমে দেখলাম সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। এরপর দেখলাম অস্তমিত সূর্য পুনরায় উদিত হল।

হযরত আবু হোরায়রা রা.'র বর্ণনা নিম্নরূপ–

نَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَرَأْسَهُ فِي حِجْرِ عَلِي وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى العَصْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ
فَلَمَا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَعَالَهُ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ حَتَّى صَلَّى ثُمَّ غَابَتْ ثَانِيَةً.[৫৫]

উমরাতুল কাযাঃ

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুযায়ী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে ৭ম হিজরি যিলক্বদ মাসে বিগত বছর বাধাপ্রাপ্ত সাহাবীগণ সহ দুই হাজার সাহাবী নিয়ে কাযা উমরা পালনের জন্য মক্কার অভিমুখে যাত্রা করেন। মদীনায় উয়াইফ ইবনে আযবত কিংবা আবু রুহাম গিফারী রা.কে খলিফা নিযুক্ত করেন। এই কাফেলায় একশত ঘোড়া এবং ষাট কিংবা আশিটি হাদী তথা কুরবানীর জন্তু ছিল। যুল হুলাইফা নামক স্থানে পৌছে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা.কে ঘোড়ার

[৫৫]. আল্লামা ইবনে কাসীর র., আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৬, পৃ. ৭৯, সূত্রঃ নূর নবী, পৃ. ১৪৪-১৪৫ ও বিষয় ভিত্তিক মু'জিযাতুর রাসূল স., পৃ. ৩৫

এবং বশীর ইবনে সা'দ রা.কে অস্ত্র-শস্ত্রের দায়িত্ব অর্পন করে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন এবং তালবিয়া পাঠ করলেন। পরদিন সকালে বতনে ইয়াজজ নামক স্থানে পৌছে অবস্থান করলেন। রাসূল ﷺ হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব রা.কে মক্কায় মাইমুনা বিনতে হারেসের নিকট পাঠালেন। তিনি রাসূল ﷺ'র পক্ষে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে মাইমুনা এই দায়িত্ব আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিবের উপর ছেড়ে দিলেন। কারণ মাইমুনার বোন উম্মুল ফজল ছিলেন হযরত আব্বাস রা.'র স্ত্রী। আব্বাস রা. তার বিবাহ রাসূল ﷺ'র সাথে করে দিলেন।

রাসূল ﷺ কাসওয়া উটের উপর আরোহণ করলেন। সকলে তরবারী গিলাফে রেখে দিলেন। তালবিয়া পাঠ করে করে সকলে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি বায়তুল্লাহয় পৌছে তাওয়াফ করেন। মুসলমানদের বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রথম তিন তাওয়াফকালে রমন তথা বীর বাহাদুরের ন্যায় দ্রুত চলার নির্দেশ দেন। এ সময় মক্কা বাসীরা দারুননাদওয়া কিংবা জাবলে কুয়াইকিয়ান থেকে মুসলমানদের ওমরা পালন পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। যারা এই সব দৃশ্য সহ্য করতে পারছে না, তারা তিন দিনের জন্য অন্যত্র চলে গেল। মুহাজিরগণ বহুদিন পর জন্মভূমিতে আসেন। শৈশবের বেলাভূমি পরিদর্শন করলেন। মক্কা বাসীরা মুসলমানদের ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার অপূর্ব দৃষ্টান্ত দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৫৬]

মুতার যুদ্ধঃ

হুদায়বিয়ার সন্ধি (মার্চ, ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ) হতে মক্কা বিজয় (জানুয়ারী, ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত সময়ে মুসলমাগণ ১৭টি অভিযান পরিচালিত করেন। তন্মধ্যে অন্যতম ছিল মুতা অভিযান। রোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সিরিয়ার সামন্তরাজ সোরাহবিল ইবনে আমর গাস্‌সানী রাসূল ﷺ'র প্রেরিত দূত হারিস ইবনে উমাইয়্যাকে মুতায় নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইতিপূর্বে রাসূল ﷺ কর্তৃক প্রেরিত কোন দূত নিহত হননি। দূত হত্যা সকলের নিকট মহা অপরাধ বলে বিবেচিত হত। এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক হত্যার উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের ৬২৯ ৮ম হিজরি জমাদিউল আউয়াল মাসে রাসূল ﷺ তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী গঠন করেন। তাঁর পালক পুত্র হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রা.কে এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে মুতার অভিযানে প্রেরণ করেন। এ সময় তিনি বলেছিলেন, যদি তোমাদের আমীর যায়েদ শহীদ হয়, তাহলে তোমাদের পরবর্তী আমীর হবে

[৫৬]. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২২২, ড. মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, পৃ. ১২১-১২২।

জাফর ইবনে আবু তালেব। সেও যদি শহীদ হয়ে যায় তবে তোমাদের আমীর হবে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। সেও শহীদ হলে তোমাদের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে সর্বসম্মতিক্রমে আমীর বানিয়ে নেবে।[৫৭] এই বলে তিনি সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করলেন এবং নিজে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তাদেরকে বিদায় দিয়ে বললেন, প্রথমে মুতাবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। কবুল না করলে যুদ্ধ করবে।

এই সংবাদ পেয়ে সুরাহবিল এক লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করল। হিরাক্লিয়াস এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে বালকা নামক স্থানে সুরাহবিলের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসল। মুসলমানগণ মায়ান নামক স্থানে পৌছে এই বিশাল বাহিনী সম্পর্কে অবগত হলে তাদের মধ্যে দ্বিধা বিভক্তি আরম্ভ হল। সেখানে দু'দিন অবস্থান করলেন। তারা কি করবে চিন্তায় পড়ে গেল। সিদ্ধান্ত হল যে, এ সংবাদ রাসূল ﷺ'র নিকট পৌছাতে হবে। তিনি যদি সাহাযার্থে আরো সৈন্য পাঠান তবে ভাল, না হয় যা আদেশ দেবেন তা পালিত হবে।

মুসলমানদের দূরাবস্থা দেখে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. বললেন, হে মুসলিম সৈনিকগণ! যেই শাহাদতকে তোমরা এতদিন যাবত অন্বেষণ করেছিলে আজ তোমরা সেটা অপছন্দ করছ। আমরা তো শক্তি ও সংখ্যার উপর ভরসা করে যুদ্ধ করিনা বরং দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করি। দু'টি নেকী থেকে একটি আমাদের কাম্য। হয়ত বিজয় লাভ করব নয়ত শাহাদত লাভ করব। তাঁর বক্তব্য শুনে মুসলমানদের মধ্যে সাহস ও শক্তি ফিরে আসল এবং যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হল। মুসলমানরা মুতা নামক স্থানে অবস্থান করলেন এবং সেখানেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথমে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রা.'র হাতে পতাকা ছিল। তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তারপর পতাকা নিলেন হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব রা.। প্রথমে তাঁর ডান হাত শহীদ হল। বাম হাতে পতাকা তুলে ধরলেন। এবার তাঁর বাম হাতও শত্রুর তরবারীর আঘাতে শহীদ হল। এরপর তিনি পতাকা মুখে কামড়ে ধরে বুকের উপর স্থাপন করলেন, কিন্তু পতাকা ভূলুণ্ঠিত হতে দেননি। এ অবস্থায় শত্রুরা তাঁকে শহীদ করে ফেলল। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছর। তাঁর শরীরের সম্মুখ ভাগে নব্বইটি/ বাহাত্তরটি/ পঞ্চাশটি বর্শা ও তীরের আঘাত লেগেছিল। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. পতাকা গ্রহণ করে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনিও যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। অত:পর মুসলমানগণ সর্বসম্মতিক্রমে মাত্র দুই মাস পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ রা.কে সেনাপতি নিযুক্ত

[৫৭]. বুখারী, হাদিস নং-৩৯৩৫।

করলেন। তিনি বীর বিক্রমে যুদ্ধ করলেন এবং বিশাল শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করে মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত করলেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন- মুতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তরবারী ভেঙ্গে ছিল আর মাত্র একটি ইয়ামানী তরবারী অবশিষ্ট ছিল।[৫৮]

এ যুদ্ধে প্রকাশিত মু'জিযা:

রাসূল ﷺ মদীনায় বসে মুতার যুদ্ধাবস্থার সংবাদ প্রদান: হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ মুতার যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে খবর এসে পৌছার পূর্বেই তিনি উপস্থিত মুসলমানদের যায়েদ, জাফর ও ইবনে রাওয়াহা রা.'র শাহাদতের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যায়েদ পতাকা হাতে নিয়ে অগ্রসর হলে তাঁকে শহীদ করা হয়। তখন জাফর পতাকা হাতে অগ্রসর হলে তাঁকেও শহীদ করা হয়। তারপর ইবনে রাওয়াহা পতাকা হাতে নিল। এবার তাঁকেও শহীদ করে দেয়া হল। এ সময়ে তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। (তারপর তিনি বললেন) অবশেষে সাইফুল্লাহদের (আল্লাহর তরবারীদের) মধ্যে এক তরবারী (খালিদ বিন ওয়ালীদ) হাতে পতাকা ধারণ করল। ফলে আল্লাহ্ তাদের উপর (মুসলমানদেরকে) বিজয় দান করেছেন।[৫৯]

অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান:

হযরত মুসা ইবনে উকবা রা. বলেন, মুতার যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে সর্বপ্রথম মদীনায় নবী করিম ﷺ'র দরবারে আসেন ইউলা ইবনে উমাইয়্যা। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, মুতার সংবাদ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে দিতে পার আর যদি চাও তোমরা আমার থেকে শুনতে পার। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিই আমাদেরকে বলুন। তখন রাসূল ﷺ মুতার যুদ্ধের আদ্যপান্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা করেন। তখন ইউলা রা. বললেন, সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, আপনি তো একটি বিষয়ও বাদ দেননি।[৬০]

দূর থেকে শোনা ও জবাব দেয়া :

হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব যখন মুতার যুদ্ধে শহীদ হলেন তখন নবী করিম ﷺ মদীনা শরীফে মসজিদে নববীতে বসে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি হঠাৎ করে গায়েবী সালামের জবাব দিয়ে বললেন, ওয়া

[৫৮]. বুখারী, হাদিস নং-৩৯৩৮, ৩৯৪০

[৫৯]. সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৩৯৩৬।

[৬০]. আবু বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৩৭।

আলাইকুমুস সালাম। উপস্থিত সাহাবাগণ কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। নবী করিম ﷺ এরশাদ করলেন– اِنِّىۡ اَسۡمَعُ مَالَا تَسۡمَعُوۡنَ وَاِنِّىۡ اَرٰى مَالَا تَرَوۡنَ অর্থ: আমি শুনি যা তোমরা শুননা এবং আমি দেখি যা তোমরা দেখতে পাও না।[৬১]

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা জাফরকে দু'টি পাখা দান করেছেন, যা দিয়ে জান্নাতের যে কোন স্থানে ইচ্ছা করলে যেতে পারে। এ কারণেই হযরত জাফর রা.কে যিল জানাহাইন তথা দু'ডানা বিশিষ্ট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বুখারী শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর রা.'র নিয়ম ছিল যে, যখনই তিনি জাফর রা.'র পুত্র (আব্দুল্লাহ)কে সালাম দিতেন তখনই তিনি বলতেন- তোমার উপর সালাম, হে দু'ডানা ওয়ালার পুত্র![৬২]

মক্কা বিজয়:

৮ম হিজরি সনের পবিত্র রমযান মাসে ২০ রমযান মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়। এই চূড়ান্ত বিজয়ের পটভূমিকা নবী করিম ﷺ'র হিজরতের পর থেকে ধাপে ধাপে সূচিত হয়েছিল। বিনা যুদ্ধে অত্যন্ত সহজভাবে এই মহা মক্কা বিজয় ইসলামের ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা।

মক্কা বিজয়ের কারণ:

মক্কা বিজয়ের প্রধান কারণ হল কুরাইশদের চুক্তি ভঙ্গ। হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত মতে বনু বকর কুরাইশদের সাথে আর বনু খোযা রাসূল ﷺ'র সাথে মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ হল। পূর্ব থেকেই এই দুই গোত্রের মধ্যে চরম শত্রুতা ছিল। কুরাইশরা বনু বকরকে বনু খোযার বিরুদ্ধে সহযোগিতা করে তাদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালায়। এভাবে হুদায়বিয়ায় কৃত চুক্তি কুরাইশরা ভঙ্গ করে। বনু খোযা গোত্রের আমর ইবনে সালেম মদীনায় এসে নবী করিম ﷺ'র সাহায্য কামনা করলেন। রাসূল ﷺ সন্ধির শর্তানুযায়ী বনু খোযাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

এরপর বুদাইল ইবনে ওরাকা বনু খোযার কতিপয় লোক নিয়ে মদীনা এসে রাসূল ﷺ'কে কুরাইশদের চুক্তি ভঙ্গের কথা এবং কিভাবে তাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল- এই সব ব্যাপারে অভিহিত করে মক্কায় ফিরে গেলেন। অত:পর রাসূল ﷺ বললেন, এবার আবু সুফিয়ানের আসার পালা। বুদাইল প্রতিনিধি দলের সাথে উসফান নামক স্থানে আবু সুফিয়ানের সাথে দেখা হল।

[৬১]. বুখারী শরীফ।
[৬২]. সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৩৯৩৮।

সে জিজ্ঞাসা করল– কোথা থেকে আসছ? বুদাইল বললেন, আমরা এই উপত্যাকা পর্যন্ত গিয়েছি। জিজ্ঞাসা করল, তোমরা মুহাম্মদের কাছে যাওনি তো? তারা বলল, না। কিন্তু আবু সুফিয়ানের সন্দেহ হল। সে তার সঙ্গীদেরকে বলল, উটের পায়খানা দেখ। যদি বুদাইল মদীনায় গিয়ে থাকে তবে উটের মলে খেজুরের বিচি পাওয়া যাবে। মল দেখার পর আবু সুফিয়ান বলল, খোদার শপথ! বুদাইল মুহাম্মদের কাছে গিয়েছিল।[৬৩]

রাসূল ﷺ'র প্রস্তাব:

রাসূল ﷺ যুদ্ধ এড়াইবার জন্য কুরাইশদের নিকট তিনটি প্রস্তাব সম্বলিত একটি পত্র সহ শান্তি দূত প্রেরণ করেন। প্রস্তাবগুলি ছিল-১. অন্যায়ভাবে নিহত বনু খোযা গোত্রের লোকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ২. অথবা বনু বকর সম্প্রদায়কে সকল প্রকার সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে। ৩. অথবা হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলী বাতিল ঘোষিত হবে। রাসূল ﷺ'র দূত মক্কা হতে মদীনায় ফিরে এসে জানাল যে, কুরাইশগণ তৃতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছে। এর ফলে বহু আকাঙ্খিত মক্কা অভিযানের সমস্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন রাসূল ﷺ।

আবু সুফিয়ানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা:

মক্কা বাসীদের বিভেদ-বৈষম্য এবং মহানবী ﷺ'র নিকট বনু খোযা কর্তৃক সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারটি উপলব্ধি করে আবু সুফিয়ান স্বয়ং মদীনায় গিয়ে শান্তির প্রস্তাব দেয়। সে প্রথমে তার কন্যা রাসূল ﷺ'র স্ত্রী হযরত উম্মে হাবীবা রা.'র কাছে গেল। তাকে দেখে উম্মে হাবীবা রা. বিছানার চাদর তুলে ফেললেন। সে বলল, প্রিয় কন্যা! তুমি চাদরখানা আমার অনুপযুক্ত মনে করে তুলেছ না কি আমি চাদরের অনুপযুক্ত বলে তুলেছ? উত্তরে উম্মে হাবীবা রা. বললেন, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ'র বিছানা। তুমি মুশরিক-নাপাক। তাই আমি পছন্দ করিনি যে, তুমি রাসূলুল্লাহ'র বিছানায় বস। একথা শুনে নৈরাশ ও অপদস্থ হয়ে চলে গেল। এরপর রাসূল ﷺ'র কাছে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে তার আগমণের উদ্দেশ্য বললে তিনি কোন উত্তর দেননি। এভাবে সে আবু বকর, ওমর, আলী, ফাতেমা রা. প্রমূখগণের নিকট গিয়ে ব্যর্থ হয়ে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে অসহায় অবস্থায় মক্কায় ফিরে গেল।

হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতা রা.'র পত্র প্রেরণ:

রাসূল ﷺ যুদ্ধ প্রস্তুতির আদেশ দিলেন। কিন্তু কখন এবং কোথায়-কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন তা গোপন রাখলেন। বদরী সাহাবী হযরত

[৬৩]. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৪৬-২৪৭।

হাতেব ইবনে আবি বালতা রা. অনুমানের ভিত্তিতে কুরাইশদের নিকট তাদের বিরুদ্ধে রাসূল ﷺ'র যুদ্ধ প্রস্তুতি সংবাদ দিয়ে গোপনে একখানা পত্র প্রেরণ করেন। এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে- তিনি বলেন, আমাকে এবং যুবায়ের ও মিকদাদ রা.কে রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা বলে পাঠালেন যে, তোমরা রওয়ানা হয়ে রওযায়ে খাখ নামক স্থানে চলে যাও। সেখানে সাওয়ারীর পিঠে হাওদায় আরোহণী জনৈক মহিলার কাছে একখানা পত্র আছে। তোমরা ঐ পত্রটি সেই মহিলা থেকে কেড়ে আনবে। আলী রা. বলেন, আমরা রওয়ানা হলাম। আমাদের অশ্বগুলো আমাদেরকে নিয়ে দ্রুত ছুটে চলল। অবশেষে আমরা রওযায়ে খাখ পর্যন্ত পৌছে গেলাম। আমরা হাওদার আরোহণী মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম, পত্রটি বের কর। সে উত্তর দিল, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, অবশ্যই তোমাকে পত্রটি বের করতে হবে, অন্যথায় আমরা তোমার কাপড়-চোপড় খুলে তালাশ করব। রাবী বলেন, মহিলাটি তখন তার চুলের খোপা থেকে পত্রটি বের করল। আমরা পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ'র কাছে আসলাম। দেখা গেল এটি হাতেব ইবনে আবি বালতা রা.'র পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকের কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি এতে মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ'র গৃহীত কিছু গোপন তৎপরতার সংবাদ ফাঁস করে দিয়েছেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, হে হাতেব! একি কাজ করেছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (অনুগ্রহ পূর্বক) আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আমি কুরাইশদের স্বগোত্রীয় কেউ ছিলাম না বরং তাদের মিত্র গোত্রের একজন ছিলাম। আপনার সঙ্গে যেসব মুহাজির আছেন কুরাইশ গোত্রে তাঁদের অনেক আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন। যারা এদের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদের হেফাযত করছে। আর কুরাইশ গোত্রে যখন আমার বংশগত কোন সম্পর্ক নেই তাই আমি ভাবলাম যদি আমি তাদের উপকার করে দেই তাহলে তারা আমার পরিবার-পরিজনের হেফাযতে এগিয়ে আসবে। কখনো আমি আমার দ্বীন পরিত্যাগ করা কিংবা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরকে গ্রহণ করার জন্য এ কাজ করিনি। রাসূল ﷺ তখন (উপস্থিত সাহাবীদের উদ্দেশ্যে) বললেন, সে সত্য কথাই বলছে। ওমর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেব। রাসূল ﷺ বললেন দেখ, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি তো জাননা, আল্লাহ্ তায়ালা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে বলে দিয়েছেন, তোমরা যা খুশী করতে

থাক, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। (اِعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ) তখন আল্লাহ তায়ালা সূরা মুমতাহিনার প্রথম কয়েকটি আয়াত নাযিল করেন।[৬৪]

উল্লেখ্য যে, পত্র বাহক মহিলাটি হল মক্কার গায়িকা সারা। সে সাহায্যের জন্য মদীনায় এসেছিল। সে চলে যাওয়ার সময় হযরত হাতেব রা. তার মাধ্যমে গোপনে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ ওহীর মাধ্যমে এ গোপন বিষয় জানতে পেরেছিলেন এবং তিনি যে স্থানে গিয়ে মহিলাকে পাবে বলেছেন ঠিক সেই স্থানে গিয়েই তাকে পাওয়া গেল।

মদীনা থেকে রওয়ানা:

বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ রমযান মাসে (১০ রমযান) মদীনা থেকে (মক্কা অভিযানে) রওয়ানা হন। তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার সাহাবী। তখন (মক্কা থেকে) হিজরত করে মদীনায় চলে আসার সাড়ে আট বছর অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল। তিনি ও তাঁর সঙ্গী মুসলমানগণ রোযা অবস্থায়ই মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। অবশেষে তিনি যখন উসফান ও কুদায়দ স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী কাদীদ নামক জায়গার ঝরণার নিকট পৌছলেন তখন তিনি ও সঙ্গী মুসলমানগণ রোযা ভঙ্গ করলেন।[৬৫]

আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের ইসলাম গ্রহণ:

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনী নিয়ে যখন 'মররুয্যাহরান' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন আদেশ দিলেন যে, প্রত্যেকে যেন পৃথক ভাবে তাদের অগ্নি প্রজ্জলিত করে। এই সংবাদ পেয়ে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হাকীম ইবনে হিযাম এবং বুদায়ল ইবনে ওয়ারাকা রাসূলুল্লাহ ﷺ'র গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য বেরিয়ে এল। তারা রাতের বেলায় এখানে এসে অসংখ্য প্রজ্জলিত আগুন দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ল।

হযরত আব্বাস রা. আবু সুফিয়ানকে চিনে ফেললেন আর বললেন, হে আবু সুফিয়ান! সাহাবীগণ তোমাদের দেখলে হত্যা করবে। তুমি আমার পিছে সাওয়ারীতে বসে যাও। হযরত ওমর রা. তাকে দেখে চিনে ফেললেন এবং হত্যার অনুমতির জন্য দ্রুত রাসূল ﷺ'র কাছে চলে গেলেন। আব্বাস রা. বলেন, আমিও দ্রুত চলে গেলাম। ওমর রা. অনুমতি চাইলেন আবু সুফিয়ানকে

---

[৬৪]. সহীহ বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ৩৯৪৭, অনুচ্ছেদ নং ২২১০।
[৬৫]. সহীহ বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ৩৯৪৯।

হত্যা করতে। আব্বাস রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আবু সুফিয়ানকে আশ্রয় দিয়েছি কিন্তু ওমর রা. তার বিরুদ্ধে বলা আরম্ভ করে দিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, আচ্ছা, এখন তাকে নিয়ে যাও, সকালে আমার কাছে নিয়ে এস। পরের দিন সকালে আব্বাস রা.'র কথায় আবু সুফিয়ান কালেমা পড়ে মুসলমান হল। আব্বাস রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান কালেমা পড়ে মুসলমান হল। আব্বাস রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান অহংকার প্রিয় লোক। তার সম্মান বজায় থাকে এমন কিছু বলুন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আজকে মক্কার যেসব কাফের আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে তারা নিরাপদ, যারা স্বীয় ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে তারা নিরাপদ এবং যারা মসজিদে হেরেমে প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ।

অত:পর রাসূল ﷺ আব্বাস রা.কে আদেশ দিলেন, আবু সুফিয়ানকে পথের একটি সংকীর্ণ জায়গায় দাঁড় করাবে, যেন সে মুসলমানদের সমগ্র সেনা দলটিকে দেখতে পায়। একেকটি দল যেতে দেখে আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে গেল। অবশেষে সে বলতে বাধ্য হল- এসব বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার কারো ক্ষমতা নেই। হে আব্বাস! তোমার ভাতিজার রাজত্ব বড় শক্তিশালী হয়ে উঠল। আব্বাস রা. বললেন, হে আবু সুফিয়ান! এটি নবুয়তী শক্তি। সে বলল হ্যাঁ, সত্য।

এরপর আবু সুফিয়ান মক্কায় গিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, আজ মুহাম্মদ ﷺ'র সাথে মোকাবিলা করার শক্তি কারো নেই। হে কুরাইশ! মুহাম্মদ ﷺ এসে গেছেন। যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। তার স্ত্রী হিন্দা এসে তার মুখ চেপে ধরল এবং চর্তুদিক থেকে লোক সমাগম হল। তারা বলল, তোমার ঘরে কয়জন লোক আশ্রয় নিতে পারবে? তখন সে বলল, যারা বায়তুল্লাহয় আশ্রয় নেবে এবং যারা নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে তারা সকলেই নিরাপদ থাকবে। তখন লোকেরা দৌড়ে কেউ মসজিদে হারামে, কেউ নিজেদের ঘরে চলে যেতে লাগল।[৬৬]

মক্কা প্রবেশ:

হযরত উরওয়া রা. বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ খালেদ বিন ওয়ালিদ রা.কে মক্কার উঁচু এলাকা কাদার দিক থেকে প্রবেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর নবী করিম ﷺ (নিম্ন এলাকা) কুদার দিক থেকে প্রবেশ করেছিলেন। এ সময় ইকরামার নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক কুরাইশ বিক্ষিপ্তভাবে মক্কার দক্ষিণ ফটকে বাধা দান করে কিন্তু খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. বীর বিক্রমে

৬৬. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৫৫।

সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করেন। এ সময় হুবায়শ ইবনে আশআর ও করয ইবনে জাবির ফিহ্‌রী রা. এ দু'জন শহীদ হন।[৬৭]

বুখারী শরীফের ৩৯৬০ ও ৩৯৬১নং হাদিসে আছে রাসূলাল্লাহ ﷺ মক্কার উঁচু এলাকা কাদা এর দিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন।

মক্কা বিজয়ে মাত্র ১২জন কাফের নিহত হয় এবং দু'জন মুসলমান শহীদ হন। এ ছাড়া আর বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। তাই বলা যায় যে, মুসলমানগণ ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে ৬ জানুয়ারী ৮ম হিজরি ১০ রমযান বিনা রক্তপাতে এবং বিনা বাঁধায় মক্কা জয় করেন।

কবি গোলাম মোস্তফা কত সুন্দর করে বলেছেন– "প্রত্যূষেই বীর-নবী নগর প্রবেশের আয়োজন করিলেন। বিভিন্ন দলপতিগণকে বিভিন্ন দিক দিয়া মক্কা প্রবেশের আদেশ দিলেন, কিন্তু কাহাকেও আজ আক্রমণ করিতে নিষেধ করিলেন। নিশান উড়াইয়া কাতারে কাতারে সেনাদল বীর পদভারে চলিতে লাগিল। সকলের শেষে ক্রীতদাস যায়েদের পুত্র ওসামার সহিত হযরত একই উটের পিঠে চড়িয়া নীরবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কী মোহনীয় এই দৃশ্য! ক্রীতদাসের সম আসনে আজ এই সম্রাট! অন্য কোন সেনাপতি হইলে আজ কী আড়ম্বরেই না নগর প্রবেশ উৎসব সম্পন্ন হইত। চর্তুদোলায় চড়িয়া নিশ্চয়ই তিনি বিজয়মত্ত সেনাদলের পুরো ভাগে থাকিতেন। কিন্তু হযরত চলিয়াছেন আর সবার পিছনে সামান্য একটি উটে চড়িয়া। তাও আবার একজন ক্রীতদাসকে পার্শ্বে বসাইয়া। নত মস্তকে বিনীতভাবে সকলের আড়াল দিয়া বিজয়ী বীর আজ মুখ লুকাইয়া চলিয়াছেন। ইহা শুধু তাঁহার পক্ষেই সম্ভব- মানুষকে যিনি অকপটে ভালবাসেন- মানুষের জ্ঞানকৃত অপরাধকে যিনি ক্ষমার চক্ষে দেখেন- সকল বিজয়ের মাঝখানে যিনি একমাত্র আল্লাহর করুণা স্পর্শ অনুভব করেন।

হযরতের হৃদয় বাস্তবিকই আজ ভাবের আবেগে বিহ্বল। দীর্ঘ একুশ বৎসর ধরিয়া শত অত্যাচার ও নিগ্রহ ভোগ করিয়া বন্ধুর কন্টকাকীর্ণ পথ বহিয়া আজ তিনি সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করিতেছেন। সকল কাঁটা আজ ফুল হইয়া ফুটিয়া উড়িতেছে। অতীতের কোন আঘাত বা বেদনার কথা আজ তাঁহার মনে নাই। আজ শুধু সার্থকতার আনন্দ– আজ শুধু বিজয়ের গৌরব। আজ বারে বারে তাঁহার মস্তক কৃতজ্ঞতায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর উদ্দেশ্যে নত হইয়া পড়িতেছে।

কত সুন্দর কত অদ্ভুত এই বিজয়! রক্তপাত নাই, ধ্বংস-বিভীষিকা নাই। প্রেম দিয়া, পূণ্য দিয়া, ক্ষমা দিয়া এই বিজয়! পৃথিবীর ইতিহাসে বহু চমকপ্রদ বিজয়

৬৭. বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৩৯৫২।

কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া আছে, বহু বীর-সেনাপতি বহু দেশ জয় করিয়া অমর হইয়াছেন। কিন্তু এত বড় রক্ত বিহীন মহা বিজয় কোথাও কেহ দেখিয়াছে কি? এ বিজয় নূতন নূতন যুগের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছে, ইহার মধ্য দিয়া জগতে নবজাতি, নবরাষ্ট্র ও নব সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্ধ কুসংস্কারের চাপে পড়িয়া ধরনী এতদিন আড়ষ্ট হইয়াছিল, পাপ-পঙ্কে তাহার প্রগতি পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, বিকৃত নৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে মনুষ্য-বসতি একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এই বিজয়ের পর হইতে ধরণী আবার নববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। মহা সাগরের ঢেউ আসিয়া ইহার সকল জঞ্জাল ভাসাইয়া লইয়া গেল; মহা সূর্যের জ্যোতি আসিয়া ইহাকে আলোকে-পুলকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল, মানুষ আবার নূতন জীবন লাভ করিল। কণ্ঠে ফুটিল নূতন ভাষা, বক্ষে জাগিল নূতন আশা, চক্ষে লাগিল অনন্ত সম্ভাবনার স্বপ্ন। জগতের ইতিহাসে তাইত এ এক মহা স্মরণীয় দিন।

মক্কা বিজয় তাই কোন বিশেষ একটা দেশ বিজয় নয়, ইহা একটা আদর্শের বিজয়! এ বিজয় কোরেশদের উপর নয় মিথ্যার উপর সত্যের বিজয়, অন্ধকারের উপর ইহা আলোকের বিজয়! নিপীড়িত ধরনী যুগ যুগ ধরিয়া এই মুক্তি ফৌজের স্বপ্ন দেখিতেছিল– এই দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষেরই প্রতীক্ষা করতেছিল।[৬৮]

বায়তুল্লাহয় প্রবেশঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করিম ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন বায়তুল্লাহর চারপাশ ঘিরে তিনশত ষাটটি প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি হাতে একটি লাঠি নিয়ে (বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং) প্রতিমাগুলোকে আঘাত করতে থাকলেন আর মুখে বলতে লাগলেন, হক এসেছে, বাতিল অপসৃত হয়েছে। হক এসেছে, বাতিলের আর উদ্ভব পুনরুদ্ভব ঘটবে না।[৬৯]

রাসূল ﷺ লাঠি মোবারক দিয়ে প্রতিমাগুলোর দিকে ইশারা করা মাত্র মুখ তোপড়ে পড়ে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেত। কা'বার দেয়ালে উঁচু স্থানে স্থাপিত প্রতিমাগুলো পর্যন্ত লাঠি না পৌছার কারণে রাসূল ﷺ হযরত আলী রা.কে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এবং আলী রা. ঐ প্রতিমাগুলো ভেঙ্গেছিলেন।[৭০]

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আগমণ করার পর তৎক্ষণাৎ বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা থেকে বিরত রইলেন, কারণ সে

[৬৮]. কবি গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী পৃ. ২৩৮–২৪০।
[৬৯]. সহীহ বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ৩৯৫৮।
[৭০]. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, উর্দু, পৃ. ২৫৯।

সময় তথায় অনেক প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি এগুলোকে বের করে ফেলার আদেশ দিলেন। প্রতিমাগুলো বের করা হল। তখন (ঐগুলোর সাথে) ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আ.'র মূর্তিও বেরিয়ে আসল। তাদের উভয়ের হাতে ছিল মুশরিকদের ভাগ্য নির্ণয়ের কয়েকটি তীর। তখন নবী করিম ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুক। তারা অবশ্যই জানত যে, ইব্রাহীম আ. ও ইসমাঈল আ. কখনো তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয়ের কাজ করেননি। এর পর তিনি বায়তুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করলেন। আর প্রত্যেক কোণায় কোণায় গিয়ে আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি দিলেন এবং বেরিয়ে আসলেন। আর সেখানে নামায আদায় করেন নি।[৭১]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল ﷺ তাঁর সাওয়ারীতে আরোহণ করে উসামা বিন যায়েদকে নিজের পেছনে বসিয়ে মক্কা নগরীর উঁচু এলাকা দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল এবং বায়তুল্লাহ্‌র চাবি রক্ষক ওসমান ইবনে তালহা। অবশেষে তিনি মসজিদে হারামের সামনে সাওয়ারী থামালেন এবং (কা'বার অভ্যন্তরে) প্রবেশ করলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা ইবনে যায়েদ, বিলাল এবং ওসমান ইবনে তালহা রা.। সেখানে তিনি দিবসের দীর্ঘ সময় অবস্থান করে (নামায, তাকবীর ও অন্যান্য দোয়া করার পর) বের হয়ে এলেন। তখন অন্যান্য লোক (কা'বার ভিতরে প্রবেশের জন্য) দ্রুত ছুটে এল। তন্মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা. প্রথমেই প্রবেশ করলেন এবং বিলাল রা.কে দরজার পাশে দাঁড়ানো পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন জায়গায় নামায আদায় করেছেন? তখন বিলাল রা. তাকে তাঁর নামাযের জায়গাটি ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কত রাকাত নামায আদায় করেছিলেন বিলালকে আমি একথাটি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম।[৭২]

রাসূল ﷺ বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করে সম্মুখভাগের দেয়ালের তিন গজ দূরে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন। তারপর বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরের চর্তুদিকে ঘুরে-ফিরে তাকবীর-তাওহীদের বাণী উচ্চ স্বরে পাঠ করলেন। ইত্যবসরে কুরাইশরা মসজিদে কাতার বন্দি হয়ে সমবেত হয়ে রাসূল ﷺ'র অপেক্ষায় রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দরজায় দাঁড়িয়ে দরজার উভয় কপাট ধরে বললেন– لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ এরপর ভাষণ দিলেন এবং কতিপয় জাহেলী প্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করলেন। অতঃপর সমবেত

[৭১]. সহীহ বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ৩৯৫৯।
[৭২]. সহীহ বুখারী শরীফ, বাবু দুখুলুন নবী স., অনুচ্ছেদ নং-২২১৩।

জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন- তোমরা কি মনে কর? আজ তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ তোমরা আমার কাছ থেকে আশা কর? তারা একবাক্যে বলল, আপনি মহান, দয়াবান, তাই আমরা দয়ার আচরণ এবং আত্মীয়তার আচরণ আশা করি। তিনি বললেন, তোমাদেরকে সে কথাই বলছি যা ইউসুফ আ. তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন-لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ যাও, তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম- তোমরা সব মুক্ত। তোমাদের বিরুদ্ধে আজ কোন অভিযোগ নেই। এই ঘোষণা শুনে সবাই চিৎকার করে বলে উঠল– আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম।[৭৩]

বায়তুল্লাহর চাবি প্রদানঃ

ইতিপূর্বে বায়তুল্লাহর দরজার চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল ওসমান ইবনে তালহা নামক জনৈক কুরাইশের উপর। সে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার দরজা খুলত। নবী করিম ﷺ মক্কী জীবনে একদিন লোকদের নিয়ে বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করার জন্য ওসমানকে দরজা খুলতে চাবী দিতে বললে চাবী দেয়নি এবং কা'বায় প্রবেশে বাঁধা দিয়েছিল। তখন রাসূল ﷺ ধৈর্য্য অবলম্বন করলেন আর বললেন, "হে ওসমান! আজ তুমি চাবি দিচ্ছ না, তবে এমন একদিন আসবে- যখন তোমার হাতের চাবিখানা আমার হাতে আসবে এবং আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে দেব।" তখন ওসমান বলেছিল, এমন হলে তা কেবল কুরাইশদের ধ্বংস ও অপমানের মাধ্যমেই হতে পারে। তখন তিনি বললেন, "না, বরং কুরাইশগণ সে সময় নতুন জীবন লাভ করবে এবং সম্মানীত হবে।"

মক্কা বিজয়ের পর নবী করিম ﷺ সেই ওসমানকে ডেকে এনে চাবি হস্তান্তর করার জন্য বললেন। ওসমান নীরবে ঘর থেকে চাবি এনে নবী করিম ﷺ'র হাতে তুলে দিলেন। অনেকের মনে এই চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব নেয়ার ইচ্ছা পোষণ ও দাবী করা সত্ত্বেও তিনি চাবিখানা ওসমানের হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, "নাও, এ চাবি তোমার ও তোমার বংশের লোকদের হাতে চিরদিন থাকবে- যদি না কোন যালিম তা ছিনিয়ে নেয়।" ওসমান চাবি নিয়ে যখন চলে যাচ্ছিল তখন রাসূল ﷺ তাকে ডেকে পূর্বের ভবিষ্যত বাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে ওসমান বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল এই বলে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন অথবা মুসলমান মক্কা বিজয়ের দিন হয়েছিল তবে প্রকাশ করেননি বরং এ সময় প্রকাশ করেছেন।[৭৪]

---

[৭৩]. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, উর্দু, পৃ. ২৬০ ও অধ্যক্ষ এম এ জলিল র., নূর নবী, পৃ. ১৫৩।

[৭৪]. অধ্যক্ষ এম এ জলিল র., নূরনবী, পৃ. ১৫৪, আসাহহুস সিয়ার, উর্দু, পৃ. ২৬১-২৬২।

কা'বায় সর্বপ্রথম আযানঃ

এরপর রাসূল ﷺ হযরত বেলাল রা.কে কা'বায় উঠে আযান দেয়ার আদেশ দিলেন। তিনি আযান দিচ্ছিলেন। এ সময় কুরাইশদের নেতৃত্বস্থানীয় লোক আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, আততাব ইবনে আসীদ, হারেস ইবনে হিশাম প্রমুখ পৃথকভাবে কা'বার প্রাঙ্গনে বসা ছিল। আযান ধ্বনি শুনে আততাব বলল, ভালই হয়েছে, আল্লাহ্ আসীদকে তুলে নিলেন এবং এই সব শুনার জন্য জীবিত রাখেননি। তিনি এসব শুনতে পারতেন না। হারেস বলল, আমরা যদি বুঝতাম যে, এগুলো সত্য তবে তাঁর অনুসরণ করতাম। আবু সুফিয়ান বলল, খোদার কসম! আমি কিছুই বলব না। কারণ, আমরা কিছু বললে এই কংকর সমূহ গিয়ে মুহাম্মদ ﷺকে অভিহিত করে দেবে।

এর একটু পরেই রাসূল ﷺ সেখানে তাশরিফ নিলেন আর তাদেরকে বললেন, তোমরা যা কিছু বলেছ তা আমি জেনে ফেলেছি। তারপর প্রত্যেকের কৃত উক্তি তিনি তাদের সামনে বলে শুনালেন। অবাক হয়ে তখনই আততাব ও হারেস মুসলমান হয়ে গেল আর বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কথা সম্পর্কে কেউ অবগত ছিল না যাকে আমরা সন্দেহ করব। নিশ্চয়ই আপনার এই জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে।

এরপর রাসূল ﷺ উম্মে হানী রা.'র ঘরে গিয়ে গোসল করে আট রাকাত নামায পড়লেন, খুব দ্রুততার সহিত। কেউ মনে করেছেন– এটা সালাতুদ দোহা কেউ মনে করেছেন বিজয়ের শুকরিয়ার নামায।[৭৫]

সাধারণ ক্ষমার বর্হিভূত ব্যক্তিগণের তালিকা ও অবস্থাঃ

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ﷺ মক্কা বাসীদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও নিম্নোক্ত হতভাগা ব্যক্তিগণ এই ক্ষমার বর্হিভূত ছিল। কারণ তাদের অপরাধ ছিল মারাত্মক।

১. আব্দুল উয্যা। সে কা'বার পর্দায় লুকিয়ে ছিল। রাসূল ﷺ আদেশ করলেন– তাকে সেখানেই হত্যা কর। সাঈদ ইবনে হারিস ও আবু বারযাহ আসলামী রা. মিলে তাকে হত্যা করেছেন।

২. সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ। সে পালিয়ে জিদ্দা চলে গিয়েছিল। উমাইর ইবনে ওহাব রা. তার জন্য রাসূল ﷺ থেকে নিরাপত্তা চেয়ে নিলেন। তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি মাথার পাগড়ী মোবারক দিয়েছিলেন। সে দুই মাসের অবকাশ

---

[৭৫]. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, উর্দু, পৃ. ২৬২।

চাইলে রাসূল ﷺ তাকে চার মাসের অবকাশ দেন। অবশেষে হুনাইনের যুদ্ধের সময় মুসলমান হয় সে।

৩. ইকরামা ইবনে আবু জেহেল। সে পালিয়ে ইয়েমন চলে গিয়েছিল। তার স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতে হারেস মুসলমান হয়ে স্বামী ইকরামার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল নবী করিম ﷺ'র কাছে। তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। স্ত্রী ইয়েমন গিয়ে ক্ষমার সংবাদ দিলে মুসলমান হয়ে যায়।

৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনে সা'দ ইবনে আবি সারাহ। সে প্রথমে মুসলমান হয়েছিল এবং ওহী লিখক ছিল। কিন্তু পরে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং জঘন্য মিথ্যা কথা বানিয়ে রাসূল ﷺও মুসলমানদেরকে কষ্ট দিত। হযরত ওসমান রা.'র দুধুভাই ছিল বলে তিনি রাসূল ﷺ'র নিকট তার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করলেন। রাসূল ﷺ তাকেও ক্ষমা করে দেন এবং মুসলমান হয়ে গেল।

৫. হুউয়াইরাছ ইবনে নুকাঈদ, সে কবি ছিল। নবী করিম ﷺ'কে তিরস্কার করে কবিতা লিখত। হযরত আলী রা. তাকে হত্যা করেন।

৬. মিকয়াস ইবনে সুবাবাহ। তাকে নামীলা ইবনে আব্দুল্লাহ্ হত্যা করেছেন।

৭. হাব্বার ইবনে আসওয়াদ। সে হিজরতের সময় হযরত যয়নাব রা.কে চরম ভাবে কষ্ট দিয়েছিল যার ফলে তাঁর গর্ভপাত ঘটেছিল। সে লজ্জিত হয়ে কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করলে রাসূল ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

৮. হারেস ইবনে তুলাতিলাহ। হযরত আলী রা. তাকে হত্যা করেন।

৯. কা'ব ইবনে যুহাইর। নবম হিজরিতে তার ভাইয়ের সাথে এসে মুসলমান হয়েছে। সে রাসূল ﷺ'র প্রশংসায় কবিতা আবৃতি করলে খুশী হয়ে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং স্বীয় চাদর মোবারক উপহার দেন।

১০. ওয়াহশী। সে হযরত হামযা রা.'র হত্যাকারী। সে মুসলমান হলে তাকে ক্ষমা করে দেন তবে কখনো নবী করিম ﷺ'র সামনে আসতে নিষেধ করেছেন।

১১. আব্দুল্লাহ ইবনে যিবআর। কবি ছিল। পরে রাসূল ﷺ'র দরবারে এসে মুসলমান হয়েছিল এবং তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।

মহিলাদের মধ্যে–

১২. হিন্দাহ বিনতে ওতবাহ। ইসলামের বড় শত্রু ছিল। হযরত হামযা রা.'র লাশ পর্যন্ত ছিন্ন করে কলিজা বের করে চাবিয়ে ছিল কিন্তু গিলতে পারেনি। সে চেহারা ডেকে চুপে চুপে অন্যান্য মহিলাদের সাথে এসে রাসূল ﷺ'র হাতে

বাইয়াত গ্রহণ করেছিল। তারপর নিজের পরিচয় প্রকাশ করেছিল। মুসলমান হওয়ায় রাসূল ﷺ তাকেও ক্ষমা করে দিলেন।

১৩-১৪. কুরাইবা ও কারতানা। এরা আব্দুল উযযার দাসী ছিল এবং গায়িকা ছিল। রাসূল ﷺ'র বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করত, কুরাইবাকে হত্যা করা হয়েছিল তবে কারতানা পালিয়ে গিয়েছিল। পরে এসে মুসলমান হয়েছিল।

১৫. আযবত। সেও আব্দুল উয্যার দাসী ছিল এবং নিহত হয়েছিল।

১৬. সারা। এ সেই মহিলা যার মাধ্যমে হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতা রা. কুরাইশদের নিকট গোপন পত্র পাঠিয়ে ছিলেন। কেউ বলেন, সে হযরত আলী রা.'র হাতে নিহত হয়েছিল। আবার কেউ বলেন, মুসলমান হয়েছিল।

১৭. উম্মে সা'দ। সেও নিহত হয়েছিল।[৭৬]

হুনাইনের যুদ্ধ :

যুদ্ধের কারণ: মক্কা বিজয়ে পৌত্তলিকতার অবসান ঘটল। কিন্তু মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী অঞ্চলে হাওয়াযিন ও সকীফ গোত্রদ্বয় ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বেদুঈনদের সহযোগিতায় এই দুই গোত্র মক্কার তিন মাইল দূরবর্তী হুনাইন উপত্যকায় বিশ হাজার সৈন্য সমাবেশ করে।

রাসূল ﷺ এই সংবাদ শুনে আবু হাদরাদ আসলামী রা.কে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি এসে ঘটনার সত্যায়ন করলে রাসূল ﷺ সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা, আব্দুল্লাহ ইবনে রবীয়া এবং হুয়াইতাব ইবনে আব্দুল উয্যা থেকে দিরহাম এবং যুদ্ধাস্ত্র কর্য হিসাবে নিয়ে দশ হাজার মদীনা থেকে আগমণকারী এবং দুই হাজার মক্কাবাসী নওমুসলমান সহ মোট বার হাজার সৈন্য নিয়ে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে ২৭ জানুয়ারী, ৬ শাওয়াল ৮ম হিজরি সনে শনিবারে হুনাইনের প্রান্তরে শত্রুর মোকাবিলা করেন। মক্কা বিজয়ের পর মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে হযরতকে এই বিশাল শত্রুবাহিনীর সম্মুখীন হতে হয়। হযরত আত্তাব ইবনে আসীদ রা.কে মক্কায় আমীর নিযুক্ত করেন। এ যুদ্ধে মক্কার কিছু নও মুসলিম এবং মুনাফিকও ছিল, যারা গণিমতের মালের লোভে যুদ্ধে গিয়েছিল।

যুদ্ধ আরম্ভ:

ইবনে ইসহাক হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেন, আমরা যখন হুনাইনের উপত্যকার দিকে যাচ্ছিলাম তখন সকাল বেলা সরু পথের একটি ঘাটিতে শত্রু পক্ষ আগে থেকে অবস্থান করছিল। আমরা নির্বিঘ্নে

[৭৬]. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, উর্দু, পৃ. ২৬৩-২৬৬।

যাচ্ছিলাম। এ সময় হঠাৎ করে আমাদের উপর এক সঙ্গে আক্রমণ করলে মুসলমানরা দিশেহারা হয়ে মানুষের উপর মানুষ, উটের উপর উট পতিত হতে লাগল এবং পালাতে লাগল। রাসূল ﷺ ডান দিকে ফিরে চিৎকার করে বললেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? আমার দিকেই এসো। আমি আল্লাহর রাসূল। আমি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্। কিন্তু অবস্থা এতই বেগতিক হল যে, কতিপয় মুহাজির ও আহলে বাইয়াত এ দু:সময়ে রাসূল ﷺ'র সাথে সুদৃঢ় ছিলেন। আর তারা হলেন- আবু বকর, ওমর, আলী, আব্বাস, আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস, ফজল ইবনে আব্বাস, রবীয়া ইবনে হারেস, উসামা বিন যায়েদ, আইমান ইবনে উম্মে আইমান- ইনি এই দিন শহীদ হয়েছিলেন, কুসম ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ্ বিনে যুবায়ের, আকীল ইবনে আবি তালেব, ইবনে মসউদ রা. প্রমুখ।

হযরত আব্বাস রা. বলেন, লোকেরা পলায়ন করছে কিন্তু আমি রাসূল ﷺ'র খচ্চরের লেগাম ধরে আছি। আমি সুস্বাস্থ্যবান ছিলাম এবং আমার আওয়ায বড় ছিল। তিনি আমাকে ডাক দিতে বললে– আমি এই বলে ডাক দিলাম- হে আনসার গোত্র! হে ছামুরা বৃক্ষের নীচে বাইয়াত গ্রহণকারী দল! তোমরা এগিয়ে এসো। এই আওয়ায শুনে চর্তুদিক থেকে মুসলমানরা লাব্বায়েক বলে বলে ছুটে আসল। রাসূল ﷺ বললেন, আমাকে এক মুষ্টি বালি দাও। সাথে সাথে খচ্চর মাটিতে বসে গেল। তিনি এক মুষ্টি বালি নিয়ে 'শাহাতিল উজূহ' পাঠ করে শত্রু পক্ষের দিকে নিক্ষেপ করলে তা সমগ্র শত্রুপক্ষের সৈন্যদের চোখে গিয়ে পড়ল। তারপর মুসলমানরা বীর-বিক্রমের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। রাসূল ﷺ তা দেখে খুশী হয়ে বললেন, এখন চুলা গরম হয়েছে। আর বললেন, أنا النبي لا كذب : وانا ابن عبد المطلب অর্থ: আমি আল্লাহর নবী, এতে কোন মিথ্যা নেই আর আমি আব্দুল মোত্তালেবের বংশধর। অত:পর কাফের বাহিনী পালাতে লাগল এবং মুসলিম বাহিনী বিজয় হল। তাদের একাংশ পালিয়ে তায়েফ চলে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে মালেক ইবনে আউফও ছিল। একাংশ চলে গিয়েছিল আউতাসে আর বাকীরা চলে গিয়েছিল নাখলায়। ৭০ জন কাফের নেতা নিহত হয়। প্রায় ছয় হাজার শত্রু সৈন্য বন্দী হল এবং চব্বিশ হাজার ভেড়া, আটাশ হাজার উট, একচল্লিশ হাজার তোলা রৌপ্য সহ অন্যান্য সমর উপকরণ মুসলমানদের হস্তগত হল। তবে মুসলমানদের মধ্যে চারজন শহীদ হন। এরা হলেন– ১. হযরত আইমন, ২. হযরত ইয়াযিদ ইবনে যামআ, ৩. হযরত সুরাকা ইবনে হারেস এবং ৪. হযরত আবু আমের আশআরী রা.।[৭৭]

[৭৭]. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, উর্দু, পৃ. ২৭৭-২৮৪, ড. মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, পৃ. ১২৭, আমে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৯০৪-৯০৭।

এ যুদ্ধে প্রকাশিত মু'জিযা:

গায়েবী ভাবে সুরক্ষা: ইবনে ইসহাক ও ইবসে সা'দ বর্ণনা করেন, শায়বা ইবনে ওসমান ইবনে আবি তালহা বলেন, আমি হুনাইনের যুদ্ধে গিয়েছিলাম সুযোগ বুঝে মুহাম্মদ ﷺ কে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে। আর মনে মনে ভাবছিলাম- যদি সমগ্র আরব জাতিও মুহাম্মদ ﷺ'র অনুসারী হয়ে যায় তবুও আমি অনুসারী হব না।

মুসলমানদের যখন পদস্খলন হল তখন আমি স্বীয় উদ্দেশ্যে তলোয়ার উন্মুক্ত করে মুহাম্মদ ﷺ'র দিকে অগ্রসর হলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম আগুনের একটি টুকরা বিজলীর ন্যায় আমার ও রাসূল ﷺ'র মধ্যখানে প্রকাশিত হল। তা দেখে আমি ভীত হয়ে গেলাম এবং স্বীয় উভয় হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রাখলাম। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ আমাকে ডাক দিলেন। আমি নিকটে গেলাম। তিনি বললেন, আরো কাছে এসো। আমি আরো কাছে গেলে তিনি তাঁর হাত মোবারক আমার বক্ষে রাখলেন। সাথে সাথে আমার উদ্দেশ্যে পরিবর্তন আসল। আমি অনুভব করলাম যে, রাসূল ﷺ'র মহব্বত আমার অন্তরে আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়ে উঠল। রাসূল ﷺ বললেন, যাও, শত্রুদের সাথে যুদ্ধ কর। তখন আমি তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলাম। তখন আমার মনে চাইল যে, আমি আমার প্রাণ ও সবকিছু উৎসর্গ করে রাসূল ﷺ'কে রক্ষা করব। আমার পিতাও যদি জীবিত থেকে আমার মোকাবেলায় আসতেন, তবে আমি রাসূল ﷺ'র পক্ষে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম।

যুদ্ধ শেষে আমার ইচ্ছা হল রাসূল ﷺ'র সাথে দেখা করব। আমি তাঁর তাবুতে গেলাম। তখন তিনি একাকী ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, হে শায়বা! তুমি যা চাও, খোদা তার চেয়ে আরো অধিক উত্তম কিছু তোমার জন্য পছন্দ করে রেখেছেন। তিনি আমার মনের গোপন সব তথ্য বলে দিলেন। সাথে সাথে কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যাই আর আমার মাগফিরাতের আবেদন করি। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৭৮]

এভাবে নযর ইবনে হারেসও একই উদ্দেশ্যে হোনাইন গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে আল্লাহ্ তার অন্তরে রাসূল ﷺ'র ভালবাসা প্রবিষ্ট করে দেন। ফলে একজন একনিষ্ট মুসলিম যুদ্ধারূপে কাফেরদের মোকাবেলা করেন।

তেমনি ঘটনা ঘটে আবু বুরদা ইবনে নায়ার রা.'র সাথে। তিনি 'আওতাস' নামক স্থানে পৌছে দেখেন যে, রাসূল ﷺ এক বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট। তাঁর

[৭৮]. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, উর্দু, পৃ. ২৮২ ও মাদারেজুন নবুয়াত, খণ্ড-২, পৃ. ৫০৪-৫০৫

পাশে অন্য একজন লোক। ঘটনার বিবরণ দিয়ে নবী করিম ﷺ বলেন, এক সময় আমার তন্দ্রা এসে যায়। এ সুযোগে লোকটি আমার তরবারীটি হাতে নিয়ে আমার শির পাশে এসে বলে, হে মুহাম্মদ ! এবার বল, আমার হাত থেকে তোমায় কে রক্ষা করবে? বললাম, আল্লাহ্ আমার হেফাযতকারী। একথা শুনে তরবারীটি তার হাত থেকে খসে পড়ে। আবু বুরদা রা. বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অনুমতি দিন, আল্লাহর এই শত্রুর গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিই। একে শত্রুদের গোয়েন্দা মনে হচ্ছে। রাসূল ﷺ বলেন, তুমি থাম। আল্লাহর দ্বীন অপারপর দ্বীনকে পরাজিত না করা অবধি আল্লাহ্ আমার হেফাযত করে যাবেন। এ বলে লোকটিকে বিনা তিরস্কারে মুক্তি দিলেন।

ক্ষতস্থান ভাল হওয়া:

হযরত আয়েয ইবনে আমর রা. বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে আমার কপালে আঘাত লাগার কারণে আমার চেহারা ও বক্ষে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। রাসূল ﷺ স্বীয় হাত মোবারক দিয়ে আমার চেহারা ও বক্ষে রক্ত মুছে দিলেন। অত:পর আমার জন্য দোয়া করলেন। যে স্থানে তিনি হাত মোবারক বুলিয়েছেন সেখানে ঘোড়ার কপালের চিহ্নের ন্যায় একটি চিহ্ন পরিস্ফুটিত হয়েছিল।

হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ রা. ও এই যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। রাসূল ﷺ সংবাদ পেয়ে তার নিকট গিয়ে ক্ষতস্থানে থুথু মোবারক মালিশ করে দিলে তৎক্ষণাত ক্ষত ভাল হয়ে গেল।[৭৯]

গাযওয়ায়ে তায়েফ:

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, হুনাইন থেকে পলায়ন করে সাকীফ ও হাওয়াযেন গোত্রের কিছু লোক তায়েফ গিয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রাসূল ﷺ সেনাবাহিনী নিয়ে ৮ হিজরি শাওয়াল মাসে তায়েফ যাত্রা করেন। তিনি তায়েফে পৌছে কাফেরদের দূর্গাকে মতান্তরে বিশ, আঠার, সতের ও চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন। এ সময় সাকীফ গোত্রের তীরের আঘাতে বেশ কয়েকজন মুসলমান আহত ও শহীদ হন। রাসূল ﷺ এই মুহূর্তে তায়েফ বিজয় না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত সম্বলিত একটি স্বপ্ন দেখেছেন এবং অভিজ্ঞ সাহাবীগণের সহিত পরামর্শ করে তায়েক ছাড়তে আদেশ দেন। সাহাবীগণকে নিয়ে জি'রানায় চলে গেলেন।

ইবনে ইসহাকের মতে তায়েফে ১২ জন মুসলিম শহীদ হন। তন্মধ্যে সাতজন কুরাইশ, চারজন আনসার এবং বনী লাইস গোত্রের ছিলেন একজন।

৭৯. জামে কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৬০৭।

জি'রানায় হাওয়াযেন গোত্রের প্রতিনিধি দল:

রাসূল ﷺ জি'রানায় আসলে হাওয়াযেন গোত্রের ১২ জনের একটি প্রতিনিধি দল এসে মুসলমান হল এবং রাসূল ﷺ'র নিকট কাকুতি-মিনতি করে তাদের বন্দী ও ধন-সম্পদ ফেরত চাইলেন এবং দয়ার ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন। রাসূল ﷺ বললেন, দেখ, এগুলো এখন মুসলমানের হক হয়ে গিয়েছে। ধন ও বন্দী উভয় তো ফেরত দেওয়া যাবে না। তবে তোমরা দু'টো থেকে কোন একটি নিতে পার। তারা বলল, তাহলে আমাদের বন্দী সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে ফেরত দিন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, যে সব বন্দী আমার এবং বনী আব্দুল মোত্তালিবের নিকট আছে তা আমি ফেরত দিলাম। তবে অন্যদের ব্যাপারে আমি শুধু সুপারিশ করতে পারব। তোমরা জোহরের নামাযের পর দাঁড়িয়ে তোমাদের আবেদন-নিবেদন করবে। শিখানো মতে নামাযের পর তাদের আবেদন উল্লেখ করলে রাসূল ﷺ তাঁর ও তাঁর বংশের ভাগে রক্ষিত বন্দীদেরকে ফেরৎ দেওয়ার ঘোষণা করলেন এবং তাঁর দেখা-দেখিতে অনেকেই তাদের কাছে রক্ষিত বন্দীদেরকে ফেরত দিলেন। যারা দিতে সম্মতি হয়নি তাদেরকে ভবিষ্যতে এদের দ্বিগুণ দাস-দাসী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাসূল ﷺ মুক্ত করে নিয়ে ফেরৎ দেন।

রাসূল ﷺ প্রতিনিধি দলকে বললেন, তোমাদের সর্দার মালেক ইবনে আউফকে খবর দাও যে, সে যদি মুসলমান হয় তবে তার পরিবার-পরিজন সহ সমস্ত সম্পদ তাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং এ ছাড়াও আরো একশত উট অতিরিক্ত দেব। সে গোপনে তার গোত্র থেকে বেরিয়ে জি'রানায় এসে মুসলমান হয়ে গেল এবং রাসূল ﷺ'র শানে কবিতা রচনা করল।[৮০]

গণিমতের মাল বন্টন:

রাসূল ﷺ আদেশ করলেন সমস্ত গণিমতের মাল এক জায়গায় একত্রিত করা হোক। কেউ যেন বন্টনের পূর্বে একটি সূঁই-সূতাও নিজের কাছে না রাখে। আমিও এক পঞ্চমাংশের বেশী বিন্দু পরিমাণও নেব না। তাও আবার তোমাদের জন্য। অত:পর রাসূল ﷺ তা বন্টন করলেন। প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে চারটি উট, চল্লিশটি ছাগল এবং প্রত্যেক ঘোড়া সাওয়ারকে বারটি করে উট এবং একশত বিশটি করে ছাগল পড়েছিল।

এইদিন রাসূল ﷺ মুয়াল্লাফাতুল কুলূবদেরকে এত বেশী দিয়ে ছিলেন যে, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ও মালেক ইবনে আউফ

৮০. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, উর্দু, পৃ. ২৯২-২৯৪।

বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, নবী ছাড়া কেউ এরূপ প্রদান করা সম্ভব নয়। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা গণিমতের মাল পেয়ে এসময় মুসলমান হয়েছিল।

আবু সুফিয়ানকে চল্লিশ তোলা রৌপ্য, একশত উট, তার ছেলে ইয়াযিদ ও মুয়াবিয়াকেও একশত করে উট এবং চল্লিশ আউকিয়া রৌপ্য প্রদান করেন। হাকীম ইবনে হিযামকে দুইশত উট, হারেস ইবনে হেশামকে একশত, সুহাইল ইবনে আমরকে একশত, হুয়াইতাব ইবনে আব্দুল উযযাকে একশত, আলা ইবনে হারেসকে একশত, উয়াইনা ইবনে হিসনকে একশত, আকরা ইবনে হাবেসকে একশত, মালেক ইবনে আউফকে একশত এবং সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাকে একশত উট প্রদান করেন।

রাসূল ﷺ জি'রানায় গণিমতের মাল কুরাইশদেরকে অতিরিক্ত দিতে দেখে রাসূল ﷺ'র মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত না হয়ে কেউ কেউ বিশেষ করে কতিপয় আনসারী সাহাবী অসন্তুষ্ট হলেন। কেউ কেউ নবীর শানের বিরুদ্ধে কথাও বলেছেন।

যুল খোয়াইসারাহ নামক এক মুনাফিক বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি ন্যায় করেননি। রাসূল ﷺ'র চেহারা মোবারক রাগে লাল হয়ে গিয়েছিল। আর বললেন, আদল আমি প্রতিষ্ঠা না করলে আর কোথায় কার কাছে আশা করবে? হযরত ওমর রা. তাকে হত্যার অনুমতি চাইলে রাসূল ﷺ বললেন না, তার বংশ থেকে সত্যিকারের মুসলমান জন্ম হবে।

আনসারী সাহাবীরা বলেছিলেন হুনাইনের যুদ্ধে যখন রাসূল ﷺ বিপদে পড়েছিলেন তখন আনসারীদের ডেকে সাহায্য চেয়েছেন আর যখন গণিমত বন্টন করা হয় তখন স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ভাগ করে দেন। তখন হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রা. নবী করিম ﷺ'র নিকট গিয়ে আনসারীদের অসন্তুষ্টির কথা জানালেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সা'দ! তোমার মত কি? সা'দ বললেন, আমিও তো নিজ সম্প্রদায়ের একজন।

রাসূল ﷺ আনসারী সাহাবীদের অসন্তুষ্টির কথা জানতে পেরে হযরত সা'দ রা.কে বললেন, তুমি আনসারীদের সকলকে একত্রিত কর। অন্য কেউ যেন না থাকে। রাসূল ﷺ আনসার সমাবেশে গিয়ে বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা ভাগে কম পাওয়ার কারণে আমার বিরুদ্ধে অহেতুক অভিযোগ তুলছ। আমি তো কেবল নওমুসলিমগণকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তাদেরকে বেশী দিয়েছি। আমার পরিবার-পরিজনের কাউকে তো দেইনি। তোমরা কি এতে খুশী নও? সবাই ধন-দৌলত, উট-ছাগল নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা আল্লাহর

রাসূলকে নিয়ে যাবে। খোদার কসম! যেই যে পথেই চলুক না কেন আমি চলব আনসারদের পথে। আমি সর্বদা তোমাদের সাথেই থাকব, আমার জীবন-মরণ তোমাদেরই সাথে। তিনি আরো কিছু হৃদয়বিদারক বক্তব্য রাখলেন। আনসারগণের অশ্রুজলে দাঁড়ি ও মুখ ভিজে গেল এবং তারা সমস্বরে বলে উঠল আমরা সন্তুষ্ট আছি।[৮১]

উল্লেখ্য যে, রাসূল ﷺ যাদেরকে অতিরিক্ত দিয়েছিলেন তা গণিমতের মাল থেকে দেন নি বরং এক পঞ্চমাংশ থেকে দিয়েছেন যার মধ্যে মুজাহিদগণের কোন অধিকার নেই। তাছাড়া রাসূল ﷺ সব কিছু ওহীর মাধ্যমে করে থাকেন। সুতরাং তিনি যা করেন তাই আদল বা ইনসাফ। যে আল্লাহ গণিমতের মালকে মুসলমানের জন্য জায়েয করেছেন তিনি তা অন্য কোন খ্যাতে ব্যয় করার অধিকার রাখেন এবং তা ইনসাফের বিপরীতও হবে না এবং উপকারের বিপরীতও হবে না। মক্কার গণিমত থেকে কাউকে রাসূল ﷺ দেন নি। সেটি ছিল মূল ইনসাফ। মক্কার যমিনকে আল্লাহ হেরেম বানিয়েছেন সেটিও হল ইনসাফ। একদিন রাসূল ﷺ হেরেমে রক্ত প্রবাহিত বৈধ করে দিয়েছিলেন সেটিও ছিল ইনসাফ। অত:পর পুনরায় হেরেম ঘোষণা করেছেন সেটিও ছিল ইনসাফ। ইনসাফ তো মূলত সেটিই, যেটি আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল ﷺ'র আদেশ মতে করা হয়।[৮২]

ওমরায়ে জি'রানা:

রাসূল ﷺ জি'রানা থেকে এশার নামায পড়ে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং ফজরের নামায মক্কায় আদায় করেন। তিনি যিলক্বদ মাসে এই ওমরা করেছিলেন। মক্কায় আত্তাব ইবনে আসীদ রা.কে খলিফা নিযুক্ত করেন এবং মুয়ায ইবনে জাবল রা.কে মুয়াল্লিম নিযুক্ত করে মদীনার পথে যাত্রা করেন।

এই বছর ৮ হিজরিতে কাফেররা তাদের রীতি অনুযায়ী হজ্ব আদায় করে আর মুসলমানরা আত্তাব ইবনে আসীদ রা.'র সাথে ইসলামী পন্থায় হজ্ব আদায় করেন।[৮৩]

তাবুকের যুদ্ধ:

রজব মাসে ৯ম হিজরি সনে মদীনা থেকে চৌদ্দ মারহালা দূরে মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী তাবুক নামক স্থানে এই অভিযান পরিচালিত হয়। তাই এটাকে

---

[৮১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮-৩০০।
[৮২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২-৩০৩।
[৮৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩-৩০৪।

তাবুকের যুদ্ধ বলা হয়। এই অভিযান প্রচণ্ড গরমকালে খাদ্য ভাণ্ডার শেষে ফসল কাটার সময় হয়েছিল। একেবারে অপরিচিত দূর দেশে অভিযান। আবহাওয়া গরম, সাওয়ারী কম, খাদ্যাভাব এবং সৈন্যবাহিনী বিরাট। এই অভিযানে মুসলমানদের খুবই কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে বলে এটাকে কষ্টের যুদ্ধও বলা হয়।

সাধারণত রাসূল ﷺ কোন যুদ্ধে যাত্রাকালে সঠিক গন্তব্য খুব কমই বলতেন। কিন্তু তাবুক অভিযান যেহেতু দূরের পথ, কঠিন সময় এবং শত্রুসেনার আধিক্য বিবেচনা করে গন্তব্যস্থল উল্লেখ করেছেন এবং লোক ও রসদ সংগ্রহ করেছেন।

যুদ্ধের কারণ:

মক্কা বিজয়ের পর আরব উপদ্বীপ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে আসার পর খ্রিষ্টানদের মধ্যে মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেতে থাকে। তদুপরি মুতার যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের পরাজয় এবং ইহুদীদের প্ররোচনা বায়জানটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে উত্তেজিত করে তুলে। ঘাস্সানীদের সহযোগিতায় ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে লক্ষাধিক সৈন্য সহ বায়জানটাইন বাহিনী মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এই সংবাদ শুনে রাসূল ﷺ তাদের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ আরম্ভ করেন।

সৈন্য প্রস্তুতি:

রাসূল ﷺ মুসলমানদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দিলেন। ধনীদেরকে সাহায্য করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। সকল সাহাবা সাধ্যমতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। আবু বকর রা. সমস্ত সম্পদ নিয়ে আসলেন। হযরত ওমর রা. তাঁর সম্পদের অর্ধেক আনলেন। হযরত ওসমান রা. এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নগদ দিলেন এবং একা দশ হাজার সৈন্যের যাবতীয় খরচ বহন করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অভাবী সাহাবীগণ কাজ করে পারিশ্রমিক হিসাবে যা পেয়েছে তা নিয়ে উপস্থিত হলেন। নারীরা নিজের অলংকার নিয়ে হাযির হলেন। এভাবে মুসলিম বাহিনীর ত্রিশ হাজার সৈন্য এবং দশ হাজার ঘোড়া নিয়ে রাসূল ﷺ রওয়ানা হলেন। মদীনায় মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা.কে খলীফা নিযুক্ত করেন এবং হযরত আলী রা.কে আহলে বাইতের দেখা-শুনা করার জন্য রেখে যান।[৮৪]

তাবুক অভিযান থেকে বিরত থাকার অযুহাত:

নিষ্ঠাবান অভাবী সাহাবীগণ যুদ্ধ সরঞ্জামের অভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার ভয়ে কান্নাকাটি করতে লাগলেন এবং সাওয়ারীর জন্য রাসূল ﷺ'র খেদমতে নিবেদন করেছেন। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন–

[৮৪]. আবুল বারাকাত আব্দুর রঊফ, আসাহহুস সিয়ার, উর্দু, পৃ. ৩১৮।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. "দূর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অক্ষম লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ নেই। আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, দয়ালু।"[৮৫]

প্রতি আঠার জন গরীব সাহাবী মাত্র একটি উটের উপর পালাক্রমে আরোহণ করে যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু কতিপয় মুনাফিক বিভিন্ন মিথ্যা অযুহাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রইল। তবে নিষ্ঠাবান সাহাবীদের মধ্যে কয়েকজন মুনাফিকদের প্ররোচনায় বিরত রইলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন- কা'ব ইবনে মালেক, হেলাল ইবনে উমাইয়্যা, মুরারাহ ইবনে রবীঈ, আবু খায়সামা ও আবু যর গিফারী রা.। এদের মধ্যে আবু খায়সামা ও আবু যর গিফরী রা. পরে গিয়ে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন।

মুনাফিকরা বিভিন্ন বাহানা দিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত রইল। জাদ্দ ইবনে কায়েস নামক এক মুনাফিককে রাসূল ﷺ যুদ্ধে যাবে কিনা জানতে চাইলে সে বলে, আমি নারী প্রিয় লোক। আমি ভয় করছি যে, বনী আসফারের সুন্দরী মহিলাদের দেখলে ফেৎনায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই যুদ্ধে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তখন وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي আয়াত নাযিল হয়।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এসব ছলনাকারীদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন– وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. "আর ছলনাকারী বেদুঈন লোকেরা এলো, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তাদেরই যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল। এবার তাদের উপর শীঘ্রই আসবে বেদনাদায়ক আযাব যারা কাফের।"[৮৬]

হযরত আলী রা.'র আবেদন:

রাসূল ﷺ'র হযরত আলী রা.কে আহলে বাইতের হেফাযতের জন্য মদীনায় রেখে গেলে মুনাফিকরা বলতে লাগল- রাসূল ﷺ আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে রেখে যান। একথা শুনে আলী রা. যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে দ্রুত রওয়ানা হয়ে জুরফ নামক স্থানে পৌছে রাসূল ﷺ'র সাক্ষাত করলেন। বললেন, ইয়া

[৮৫]. সূরা তাওবা, আয়াত: ৯১।
[৮৬]. সূরা তাওবা, আয়াত: ৯০।

রাসূলাল্লাহ! মুনাফিকরা এরূপ বলাবলি করতেছে। এটা কি সত্য? রাসূল ﷺ বললেন, তারা মিথ্যুক। তুমি চলে যাও, তোমার এবং আমার পরিবার-পরিজনের কাছে আমার স্থলাভিষিক্ত হও। হে আলী! তুমি এতে সন্তুষ্ট নও? তুমি আমার জন্য এমন হও যেমন হারুন আ. মুসা আ.'র জন্য হয়েছিলেন। তবে আমার পর কোন নবী আসবেন না। আলী রা. সন্তুষ্ট হয়ে মদীনায় ফিরে গেলেন।[৮৭]

সামুদ জাতির ধ্বংসস্থল:

রাসূল ﷺ হিজর নামক স্থানে পৌছে বললেন, এটা সামুদ জাতির ধ্বংসস্থল। তোমরা কেউ এখানকার পানি পান করনা এবং উযূও করিও না। যারা এই পানি দিয়ে আটার খামীর মেখেছ তোমরা তা ফেলে দাও কিংবা উটকে খাবাও নিজেরা খেয়ো না। তিনি আরো বললেন, এই আযাব নাযিলকৃত স্থান দিয়ে গমণকালে কেঁদে কেঁদে গমণ করিও, নতুবা তোমাদের উপর ঐ রূপ আযাব আসতে পারে। তবে শুধু 'নাকা' নামক কূপ থেকে পানি পান করবে।

তাবুকে অবস্থান:

রাসূল ﷺ তাবুকে পৌছে ১৯দিন অবস্থান করেন। কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি বরং বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা এসে জিযিয়া কর আদায়ের শর্তে চুক্তি করে শান্তিতে বসবাস করার অধিকার গ্রহণ করে।[৮৮]

তাবুক অভিযানে প্রকাশিত মু'জিযা:

রাসূল ﷺ তাবুক পৌছে সঙ্গীদেরকে বললেন, আজ রাতে কেউ একাকী বের হইও না। কিন্তু বনী সায়েদা গোত্রের দুইজন লোক বের হল। একজন কোন প্রয়োজনে আর একজন উট অন্বেষণের জন্য বের হয়েছিলেন। প্রথম ব্যক্তি বেঁহুশ হয়ে পড়ে গিয়েছিল অপর জনকে প্রচণ্ড বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে জবলে তাই-এ নিক্ষেপ করেছিল। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাবুকে পৌছে বললেন, আজ রাতে প্রচণ্ড তুফান হবে। তোমরা কেউ দাঁড়াবে না। আর যাদের উট আছে তারা উট গুলোকে শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে রাখবে। অবশেষে প্রচণ্ড বেগে তুফান হল। এক ব্যক্তি দাঁড়ালে বাতাস তাকে তাই পাহাড়ে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছে।[৮৯]

হারিয়ে যাওয়া উটের সন্ধান দেয়া:

হিজর নামক স্থানে রাসূল ﷺ'র নির্দেশে সকলে পানি ফেলে দিয়েছিলেন। সকাল বেলা কারো নিকট পানি ছিল না। সাহাবীগণ তাঁর নিকট পানির অভাবের

[৮৭]. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার, উর্দু, পৃ. ৩২২।
[৮৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮।
[৮৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩-৩২৪।

কথা জানালে তিনি পানির জন্য দোয়া করলেন। সাথে সাথে বৃষ্টি হল এবং সকলের প্রয়োজন পূর্ণ হল। সেখান থেকে যাত্রা করলে এক স্থানে পৌছে রাসূল ﷺ'র উট হারিয়ে যায়। যায়েদ ইবনে নুসাইব মুনাফিক বলল, মুহাম্মদ ﷺ নবী বলে দাবী করেন, আসমানের সংবাদ দেন অথচ তাঁর উট কোথায় তা জানেন না। রাসূল ﷺ বললেন, জনৈক ব্যক্তি এরূপ এরূপ মন্তব্য করছে, অথচ আমার আল্লাহ্ আমাকে যা অবগত করেন আমি তাই বলি। উট উপত্যকার অমুখ পাহাড়ে রশিতে আটকে আছে। যাও, নিয়ে এসো। তিনি যেখানে যেভাবে বলেছেন ঠিক সেখানে সেভাবে উটকে পাওয়া গিয়েছিল।[৯০]

হযরত আবু যর গিফারী রা.'র জন্য ভবিষ্যত বাণী:

হযরত আবু যর গিফারী রা.'র সাওয়ারী পথের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি সমস্ত জিনিসপত্র নিজের কাঁধে করে রাসূল ﷺ'র কাফেলার খোঁজে পিছে পিছে যেতে লাগলেন। কেউ গিয়ে রাসূল ﷺ কে বললেন, আমাদের পিছনে পিছনে কেউ যেন আসতেছেন। তিনি বললেন, সে হল আবু যর। লোকেরা ভাল করে দেখে বলল, খোদার শপথ। ইনি আবু যর রা.। তখন রাসূল ﷺ বললেন, খোদা আবু যরের প্রতি রহম করুন। সে একাকী চলবে, একাকী মৃত্যুবরণ করবে এবং একাকী উঠানো হবে।

হযরত ওসমান রা. আবু যর গিফারী রা.কে 'রবযাহ' নামক নির্জন এলাকায় দেশান্তর করেন। সাথে কেবল তাঁর স্ত্রী ও একজন গোলাম ছিল। মৃত্যুর সময় তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা উভয়ে আমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে রাস্তায় রেখে দিও। এই রাস্তা দিয়ে প্রথমে যারা আগমণ করবে তাদেরকে বলিও- ইনি রাসূলের সাহাবী আবু যর। তাঁকে দাফন কাজে আমাদের সাহায্য করুন।

এই পথ দিয়ে সর্বপ্রথম আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ রা. স্বীয় দল নিয়ে যাওয়ার পথে আদ্যপান্ত ঘটনা শুনে সাওয়ারী থেকে অবতরণ করে তাঁর জানাযা পড়ে দাফন কাজে সহযোগিতা করেন।[৯১]

কূপের পানি বৃদ্ধি:

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাবুক পৌছার পূর্বে বলেছিলেন যে, ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল সূর্য উঠার পর তোমরা তাবুকের কূপে পৌছে যাবে। তবে কেউ যেন আমি না আসা পর্যন্ত কূপের পানিতে হাত না

[৯০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪-৩২৫, বিষয় ভিত্তিক মু'জিযাতুর রাসূল স., পৃ. ৪৭-৪৮
[৯১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫।

দেয়। দু'জন ব্যক্তি সেখানে আগে পৌছে গিয়েছিল। রাসূল ﷺ সেখানে পৌছে দেখেন পানির সামান্য স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। এ দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি পানিতে হাত লাগিয়েছ? তারা হ্যাঁ বাচক উত্তর দিলে তিনি রাগান্বিত হলেন। অত:পর তিনি সামান্য সামান্য পানিকে একত্রিত করে তাতে হাত-মুখ ধুয়ে পুনরায় পানি কূপে ফেলে দিলেন। সাথে সাথে কূপ থেকে প্রবল স্রোতে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। সকলে পানি পান করল। অত:পর তিনি বললেন, হে মুয়ায! তুমি যদি দীর্ঘজীবি হও তবে দেখবে এর পানি দ্বারা এখানকার সকল বাগান ভরে যাবে।[৯২]

বৃষ্টি বর্ষণ:

হযরত ওমর রা. বলেন, আমরা তাবুক যাত্রায় তিনটি কষ্টে পতিত হয়েছিলাম। ক. পানির কষ্ট, খ. খাদ্যের কষ্ট এবং গ. গরমের কষ্ট। এই তিন কষ্টের কারণে এই সফরকে 'কষ্টের সফর' বলা হত। পানির অভাবে আমরা এতই কাতর ও কাহিল হয়ে পড়েছিলাম যে, মনে হচ্ছিল যেন আমাদের প্রাণ এখনই বের হয়ে যাবে। আমাদের মধ্যে কেউ নিজেদের যানবাহন হিসাবে ব্যবহৃত উট যবেহ করে তার পানির থলে বের করে ঐ পানিটুকু পান করে পিপাসা কিছুটা নিবৃত করত। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. নবী করিম ﷺ'র খেদমতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের পানির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। নবী করিম ﷺ আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দোয়া করলেন। হাত নামানোর পূর্বেই আকাশ গর্জন করে উঠল এবং বর্ষণ শুরু হয়ে গেল, সাহাবীগণ আপন আপন পাত্র পানিতে পূর্ণ করে নিলেন। আমাদের প্রয়োজন শেষ বর্ষণও বন্ধ হয়ে গেল।[৯৩]

খেজুরে বরকত:

তাবুকের যুদ্ধে খাদ্যাভাব ছিল প্রকট। সাহাবীগণ খাদ্যের অভাবের কথা নবী করিম ﷺ কে জানালে তিনি হযরত আবু হোরায়রা রা.কে ডেকে কিছু খেজুর সংগ্রহ করতে বলেন। আবু হোরায়রা রা. অনুসন্ধান করে মাত্র ২১টি খেজুর থলেতে করে নবী করিম ﷺ'র খেদমতে পেশ করলেন। প্রিয়নবী ﷺ ঐগুলোর উপর হাত রেখে দোয়া করলেন এবং লোকদের ডেকে আনলেন। সকলে খেয়ে তৃপ্ত হলেন। এভাবে পুরো বাহিনী উক্ত খেজুর খেয়ে তৃপ্ত হলেন। তাবুক বাহিনীতে ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। এরপর থলে খুলে দেখা গেল ২১টি

[৯২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮।

[৯৩]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সূত্র: হাফেয এম এ জলিল র., নূর নবী, পৃ. ১৬০, বিষয় ভিত্তিক মু'জিযাতুর রাসূল স., পৃ. ৭৬

খেজুরই অবশিষ্ট রইল। তিনি বললেন, হে আবু হোরায়রা! তুমি খেজুরের থলেটি নিয়ে যাও। যখনই প্রয়োজন হবে, থলের মুখে হাত প্রবেশ করিয়ে খেজুর বের করে আনবে। কিন্তু থলের মুখ একেবারে খুলবে না। হযরত আবু হোরায়রা রা. বলেন, হযরত ওসমান রা.'র খেলাফতের যুগ পর্যন্ত মোট ২৬ বৎসর যাবৎ আমি উক্ত থলে থেকে নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে খেজুর খেয়েছি এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছি। যেদিন হযরত ওসমান রা. শহীদ হলেন (৩৫ হিজরী) সেদিন আমার অন্যান্য আসবাবপত্র সহ উক্ত থলেটিও লুট হয়ে যায়। আমি খেয়েছি দুই শত ওয়াসাক এবং দান করেছি পঞ্চাশ ওয়াসাক।[৯৪]

মসজিদে দ্বেরার:

মদীনায় আবু আমের নামের এক ব্যক্তি খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে আবু আমের পাদ্রী নামে খ্যাত হল। তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত হানযালা রা.। যার মরদেহ ফেরেশতারা গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা খ্রিষ্টবাদের উপর অটল রইল এই বিভিন্ন সময় নানাভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। সুবৃহৎ শক্তিশালী হাওয়াযেন গোত্রও যখন মুসলমানদের হাতে পরাজয় হল, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ায় চলে গেল। কারণ, তখন এটি ছিল খ্রিষ্টানদের কেন্দ্রস্থল। সে মদীনার মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখল যে, তোমরা মদীনায় মসজিদের নাম দিয়ে একটি দূর্গ নির্মাণ কর এবং সেখানে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

তার পত্রের ভিত্তিতে বারজন মুনাফিক মদীনার কোবা মহল্লায়, যেখানে রাসূল ﷺ হিজরত করে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন- আরেকটি মসজিদ ভিত্তি করল। অত:পর তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নিল যে, স্বয়ং রাসূল ﷺ দ্বারা এক ওয়াক্ত নামায সেখানে পড়াবে। এতে মুসলমানগণ নিশ্চিত হবে যে, এটিও একটি মসজিদ।

এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল ﷺ'র দরবারে এসে আরয করল যে, কোবার বর্তমান মসজিদটি অনেক দূরে হয়ে গিয়েছে। দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুষ্কর। মসজিদটি এত প্রশস্তও নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে পারে। তাই আমরা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করেন তবে আমরা বরকত লাভে ধন্য হব।

[৯৪]. বায়হাকী, সূত্র: হাফেয এম এ জলিল র. নূর নবী, পৃ. ১৬২, বিষয় ভিত্তিক মু'জিযাতুর রাসূল স., পৃ. ১০৪

রাসূল ﷺ তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্থ ছিলেন। তিনি বললেন, এখন ব্যস্ত আছি। ফিরার পথে নামায আদায় করব-ইনশাআল্লাহ। কিন্তু তাবুক থেকে ফেরার পথে যীআওয়ান নামক স্থানে পৌছলে যা থেকে মদীনা এক ঘণ্টার পথ- আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁকে জানিয়ে দেন। তখন রাসূল ﷺ মালেক ইবনে দুখসাম ও মা'ন ইবনে আদী রা.'র নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে পাঠিয়ে মসজিদটি জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। আদেশ মতে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে মসজিদটি ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.

অর্থ: আর যারা নির্মাণ করেছিল মসজিদ জিদের বশে এবং কুফুরীর তাড়নায় মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাটি স্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক।[৯৫]

তাফসীরে মাযহারীতে ইউসুফ বিন সালেহীর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, নবী করিম ﷺ মদীনায় পৌছে মসজিদের স্থানটি ফাঁকা পড়ে আছে দেখে আসেম বিন আদীকে সেখানে গৃহ নির্মাণের অনুমতি দান করেন। আসেম রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে জায়গা সম্পর্কে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে, সেই অভিশপ্ত স্থানে আমি গৃহ নির্মাণ করা পছন্দ করিনা। তবে সাবেত বিন আকরামের ভোগ দখলে জায়গাটি দিয়ে দিন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, সে ঘরে তারও কোন সন্তান-সন্ততি হয়নি কিংবা জীবিত থাকেনি।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সে জায়গায় মানুষ তো দূরের কথা, পাখীকূল পর্যন্ত ডিম ও বাচ্চা দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাই আজ পর্যন্ত সে জায়গাটি বিরান পড়ে আছে।

তাবুক যুদ্ধে অনুপস্থিত লোকদের অবস্থা:

রাসূল ﷺ তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে মসজিদে নববীতে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। এরপর তাবুক যুদ্ধে অনুপস্থিত লোকেরা এসে অনুপস্থিতির কারণ পেশ করতে লাগলেন। তাদের সংখ্যা ছিল আশির অধিক।

[৯৫]. সূরা তাওবা, আয়াত: ১০৭।

রাসূল ﷺ তাদের বাহ্যিক অযুহাত গ্রহণ করে তাদের বিষয়টি আল্লাহর উপর সোপর্দ করে সকলের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করেন। কিন্তু কা'ব ইবনে মালেক, হেলাল ইবনে উমাইয়্যা এবং মরারাহ ইবনে রবীঈ মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অকপটে সত্য কথাটি বলে সত্য, নিষ্টা এবং ধৈর্য্যের নযীর স্থাপন করেছিলেন। সত্যের জন্য সাময়িক কষ্ট ভোগ করলেও দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল করে তাঁদের তাওবা কবুল ও মাগফিরাতের ঘোষণা দেন।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক রা. তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার কারণ প্রসঙ্গে বলেন- আমার অবস্থার বিবরণ এই যে, তাবুক যুদ্ধ থেকে যখন আমি পেছনে থাকি তখন আমি এত অধিক সুস্থ, শক্তিশালী ও স্বচ্ছল ছিলাম যে, আল্লাহর কসম, আমার কাছে কখনো ইতোপূর্বে কোন যুদ্ধে একই সাথে দু'টো যানবাহন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, যা আমি এ যুদ্ধের সময় সংগ্রহ করেছিলাম। আর রাসূল ﷺ যে অভিযান পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করতেন, দৃশ্যত তার বিপরীত ভাব দেখাতেন। এ যুদ্ধ ছিল ভীষণ উত্তাপের সময়, অতি দূরের সফর, বিশাল মরু ভূমি এবং অধিক সংখ্যক শত্রুসেনার মোকাবিলা করার। কাজেই রাসূল ﷺ এ অভিযানের অবস্থা মুসলমানদের কাছে প্রকাশ করে দেন যেন তারা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সম্বল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। রাসূল ﷺ'র সঙ্গী লোকসংখ্যা ছিল অধিক যাদের হিসাব কোন রেজিষ্ট্রারে লিখিত ছিল না। কা'ব বলেন, যার ফলে যে কোন লোক যুদ্ধাভিযান থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছা করলে তা সহজেই করতে পারত এবং ওহী মারফত এ খবর পরিজ্ঞাত না করা পর্যন্ত তা সংগোপন থাকবে বলে সে ধারণা করত। রাসূল ﷺ এ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এমন সময় যখন ফল-ফলাদি পাকার ও গাছের ছায়ায় আরাম উপভোগের সময় ছিল। রাসূল ﷺ স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গী মুসলিম বাহিনী অভিযানে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেললেন। আমিও প্রতি সকালে তাদের সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। মনে মনে ধারণা করতে থাকি, আমি তো যখন ইচ্ছা যেতে সক্ষম। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমার সময় কেটে যেতে লাগল।

এদিকে অন্য লোকেরা পুরাপুরি প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাথী মুসলিমগণ রওয়ানা করলেন অথচ আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। আমি মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, এক দু'দিনের মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে পরে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হব। এভাবে আমি প্রতিদিন বাড়ি হতে প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করার মানসে বের হই, কিন্তু কিছু না

করেই ফিরে আসি। আবার বের হই, আবার কিছু না করে ঘরে ফিরে আসি। ইত্যবসরে বাহিনী অগ্রসর হয়ে অনেক দূর চলে গেল। আর আমি রওয়ানা করে তাদের সাথে পথে মিলে যাবার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকলাম। আফসোস যদি আমি তাই করতাম! কিন্তু তা আমার ভাগ্যে জোটেনি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রওয়ানা হওয়ার পর আমি লোকদের মধ্যে বের হয়ে তাদের মাঝে বিচরণ করতাম। একথা আমার মনকে পীড়া দিত যে, আমি তখন (মদীনায়) মুনাফিক এবং দুর্বল ও অক্ষম লোক ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পেতাম না। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাবুক পৌছার পূর্ব পর্যন্ত আমার কথা আলোচনা করেননি। অনন্তর তাবুকে একথা তিনি জনতার মধ্যে উপবিষ্টাবস্থায় জিজ্ঞাসা করে বসলেন, কাআব কি করল? বনী সালমা গোত্রের এক লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ তার ধন-সম্পদ ও আত্মগরিমা তাকে আসতে দেয়নি। একথা শুনে মুআয ইবন জাবাল রা. বললেন, তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আল্লাহর কসম, আমরা তাঁকে উত্তম ব্যক্তি বলে জানি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব রইলেন। কাআব ইবন মালিক রা. বলেন, আমি যখন অবগত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা মুনওয়ারার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন আমি চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম। এবং মিথ্যার বাহানা খুঁজতে থাকলাম। মনে স্থির করলাম, আগামীকাল এমন কথা বলব যাতে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ'র ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারি। আর এ সম্পর্কে আমার পরিবারস্থ জ্ঞানীগুণীদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকি। এরপর যখন প্রচারিত হল যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় এসে পৌছে যাচ্ছেন, তখন আমার অন্তর থেকে মিথ্যা তিরোহিত হয়ে গেল। আর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, এমন কোন পন্থা অবলম্বন করে আমি তাঁকে কখনো ক্রোধমুক্ত করতে সক্ষম হব না, যাতে মিথ্যার নামগন্ধ থাকে। অতএব আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, আমি সত্যই বলব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রাতে মদীনায় পদার্পণ করলেন। তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করতেন, তারপর লোকদের সামনে বসতেন। যখন নবী ﷺ এরূপ করলেন, তখন যারা পশ্চাদপদ ছিলেন তারা তাঁর কাছে এসে শপথ করে অক্ষমতা ও আপত্তি পেশ করতে লাগল। এরা সংখ্যায় আশির অধিক ছিল। অনন্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহ্যিকভাবে তাদের ওযর-আপত্তি গ্রহণ করলেন, তাদের বায়আত করলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত অবস্থা আল্লাহর হাওয়ালা করে দিলেন। [কাআব রা. বলেন] আমিও এরপর নবী ﷺ'র খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম তখন তিনি রাগান্বিত চেহারায় মুচকি হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, এস। আমি সে অনুসারে অগ্রসর হয়ে একেবারে তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম। তখন তিনি

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কারণে তুমি অংশগ্রহণ করলে না? তুমি কি যানবাহন ক্রয় করনি? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, করেছি। আল্লাহ্র কসম এ কথা সুনিশ্চিত যে, আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কোন দুনিয়াদার ব্যক্তির সামনে বসতাম তাহলে আমি তার অসন্তুষ্টিকে ওযর-আপত্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রশমিত করার প্রয়াস চালাতাম। আর আমি তর্কে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আল্লাহ্র কসম আমি পরিজ্ঞাত যে, আজ যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে আমার প্রতি আপনাকে রাযী করার চেষ্টা করি তাহলে অচিরেই আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিতে পারেন। আর যদি আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করি যাতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবুও আমি এতে আল্লাহ্র ক্ষমা পাওয়ার নির্ঘাত আশা রাখি। না, আল্লাহ্র কসম, আমার কোন ওযর ছিল না। আল্লাহ্র কসম, সেই অভিযানে আপনার সাথে না যাওয়াকালীন সময় আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে। তুমি এখন চলে যাও, যতদিনে না তোমার সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা ফায়সালা করে দেন। তাই আমি উঠে চলে গেলাম। তখন বনী সালিমার কতিপয় লোক আমার অনুসরণ করল। তারা আমাকে বলল, আল্লাহ্র কসম তুমি ইতিপূর্বে কোন গুনাহ্ করেছ বলে আমাদের জানা নেই। তুমি কি অন্যান্য পশ্চাদগামীর মত তোমার অক্ষমতার একটি ওযর রাসূলুল্লাহ ﷺ'র কাছে পেশ করে দিতে পারতে না? আর তোমার এ অপরাধের কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ'র তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই তো যথেষ্ট ছিল। আল্লাহর কসম তারা আমাকে অনবরত কঠিনভাবে ভর্ৎসনা করতে থাকে। ফলে আমি পূর্ব স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করে মিথ্যা বলার বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করতে থাকি। এরপর আমি তাদের বললাম, আমার মত এ কাজ আর কেউ করেছে কি? তারা জওয়াব দিল, হ্যাঁ, আরও দু'জন তোমার মত বলেছে। এবং তাদের ক্ষেত্রেও তোমার মত একই রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কে কে? তারা বলল, একজন মুরারা ইবন রবী আমরী এবং অপরজন হলেন হিলাল ইবন উমায়্যা ওয়াকিফী। এরপর তারা আমাকে অবহিত করল যে, তারা উভয়ে উত্তম মানুষ এবং তারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সেজন্য উভয়ে আদর্শবান। যখন তারা তাদের নাম উল্লেখ করল, তখন আমি পূর্ব মতের উপর অটল রইলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্যকার যে তিনজন তাবুকে অংশগ্রহণ হতে বিরত ছিল তাদের সাথে কথা বলতে মুসলমানদের নিষেধ করে দিলেন। তদনুসারে মুসলমানরা আমাদের পরিহার করে চললো। আমাদের প্রতি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে নিল। এমনকি এদেশ যেন আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল। এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করলাম।

আমার অপর দু'জন সাথী তো সংকট ও শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হলেন। তারা নিজেদের ঘরে বসে বসে কাঁদতে থাকেন। আর আমি যেহেতু অধিকতর যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম তাই বাইরে বের হয়ে আসতাম, মুসলমানদের জামাআতে নামায আদায় করতাম। এবং বাজারে চলাফেরা করতাম কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ'র খেদমতে হাযির হয়ে তাঁকে সালাম দিতাম। যখন তিনি নামায শেষে মজলিসে বসতেন তখন আমি মনে মনে বলতাম ও লক্ষ্য করতাম, তিনি আমার সালামের জবাবে তার ঠোঁটদ্বয় নেড়েছেন কি না। তারপর আমি তাঁর নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় করতাম এবং গোপন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে দেখতাম যে, আমি যখন নামাযে মগ্ন হতাম তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, আর যখন আমি তাঁর দিকে তাকাতাম তখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে আমার প্রতি লোকদের কঠোরতা ও এড়িয়ে চলার আচরণ দীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান থাকে। একদা আমি আমার চাচাত ভাই ও প্রিয় বন্ধু আবু কাতাদা রা.'র বাগানের প্রাচীর টপকে প্রবেশ করে তাঁকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহর কসম তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন না। আমি তখন বললাম, হে আবু কাতাদা, আপনাকে আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জানেন যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ কে ভালবাসি? তখন তিনি নীরবতা পালন করলেন। আমি পুনরায় তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি এবারও কোন জবাব দিলেন না। আমি পুন: (তৃতীয়বারও) তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ'ই ভাল জানেন। তখন আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। অগত্যা আমি পুনরায় প্রাচীর টপকে ফিরে এলাম। কাআব রা. বলেন, একদা আমি মদীনার বাজারে বিচরণ করছিলাম। এমতাবস্থায় সিরিয়ার এক কৃষক বণিক যে মদীনার বাজারে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল, সে বলছে, আমাকে কাআব ইবন মালিককে কেউ পরিচয় করে দিতে পারে কি? তখন লোকেরা তাকে আমার প্রতি ইশারায় দেখাচ্ছিল। তখন সে এসে গাস্সানি বাদশার একটি পত্র আমার কাছে হস্তান্তর করল। তাতে লেখা ছিল, পর সমাচার এই, আমি জানতে পারলাম যে, আপনার সাথী আপনার প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহ্ আপনাকে মর্যাদাহীন ও আশ্রয়হীন করে সৃষ্টি করেননি। আপনি আমাদের দেশে চলে আসুন, আমরা আপনার সাহায্য-সহানুভূতি করব। আমি যখন এ পত্র পড়লাম তখন আমি বললাম, এটাও আর একটি পরীক্ষা। তখন আমি চুলা খোঁজ করে তার মধ্যে পত্রটি নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিলাম। এ সময় পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ'র পক্ষ থেকে এক সংবাদবাহক আমার কাছে এসে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ

দিয়েছেন যে, আপনি আপনার স্ত্রী হতে পৃথক থাকবেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিব, না অন্য কিছু করব? তিনি উত্তর দিলেন, তালাক দিতে হবে না বরং তার থেকে পৃথক থাকুন এবং তার নিকটবর্তী হবেন না। আমার অপর দু'জন সঙ্গীর প্রতি একই আদেশ পৌছালেন। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। আমার এ ব্যাপারে আল্লাহ্র ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত তুমি তথায় অবস্থান কর। কাআব রা. বলেন, আমার সঙ্গী হিলাল ইব্ন উমায়্যার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ'র খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হিলাল ইবন উমায়্যা অতি বৃদ্ধ, এমন বৃদ্ধ যে, তাঁর কোন খাদিম নেই। আমি তাঁর খেদমত করি, এটা কি আপনি অপছন্দ করেন? নবী ﷺ বললেন, না, তবে সে তোমার বিছানায় আসতে পারবে না। সে বলল, আল্লাহ্র কসম, এ সম্পর্কে তার কোন অনুভূতিই নেই। আল্লাহ্র কসম, তিনি এ নির্দেশ পাওয়া অবধি সর্বদা কান্নাকাটি করছেন। [কাআব রা. বলেন] আমার পরিবারের কেউ আমাকে পরামর্শ দিল যে, আপনিও যদি আপনার স্ত্রী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ'র কাছে অনুমতি চাইতেন যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হিলাল ইব্ন উমায়্যার স্ত্রীকে তার (স্বামীর) খেদমত করার অনুমতি দিয়েছেন। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমি কখনো তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ'র কাছে অনুমতি চাইব না। আমি যদি তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ'র অনুমতি চাই তবে তিনি কি বলেন, তা আমার জানা নেই। আমি তো নিজেই আমার খেদমতে সক্ষম। এরপর আরও দশরাত অতিবাহিত করলাম। এভাবে নবী ﷺ যখন থেকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন তখন থেকে পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হল। এরপর আমি পঞ্চাশতম রাত শেষে ফজরের নামায আদায় করলাম এবং আমাদের এক ঘরের ছাদে এমন অবস্থায় বসে ছিলাম যা আল্লাহ্ তায়ালা (কুরআনে) বর্ণনা করেছেন। আমার জান-প্রাণ দুর্বিষহ এবং গোটা জগতটা যেন আমার জন্য প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় শুনতে পেলাম এক চীৎকারকারীর চীৎকার। সে সালা পাহাড়ের উপর চড়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করছে, হে কাআব ইবন মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কাআব রা. বলেন, এ শব্দ আমার কানে পৌছামাত্র আমি সিজদায় লুটে পড়লাম। আর আমি অনুভব করলাম যে, আমার সুদিন ও খুশীর খবর এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের নামায আদায়ের পর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে আমাদের তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ প্রকাশ করেন। তখন লোকেরা আমার এবং আমার সঙ্গীদ্বয়ের কাছে সুসংবাদ পরিবেশন করতে থাকে। এবং তড়িঘড়ি একজন অশ্বারোহী লোক আমার কাছে আসে এবং আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তি দ্রুত আগমন করে পাহাড়ের উপর আরোহণ করত চীৎকার দিতে থাকে।

তার চীৎকারের শব্দ ঘোড়া অপেক্ষাও দ্রুত পৌছল। যার শব্দ আমি শুনেছিলাম সে যখন আমার কাছে সুসংবাদ প্রদান করতে আসল, আমি তখন আমার নিজের পরিধেয় দুটো কাপড় তাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য দান করলাম। আর আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, ঐ সময় সেই দুটো কাপড় ছাড়া আমার কাছে আর কোন কাপড় ছিল না। আমি দুটো কাপড় ধার করে পরিধান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ'র কাছে রওয়ানা হলাম। লোকেরা দলে দলে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসতে লাগল। তারা তওবা কবুলের মুবারকবাদ জানাচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমাকে মুবারকবাদ যে আল্লাহ্ তায়ালা তোমার তওবা কবুল করেছেন। কাআব রা. বলেন, অবশেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে বসা ছিলেন এবং তাঁর চতুষ্পার্শ্বে জনতার সমাবেশ ছিল। তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ রা. দ্রুত উঠে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন ও মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহ্‌র কসম তিনি ব্যতীত আর কোন মুহাজির আমার জন্য দাঁড়াননি। আমি তালহার ব্যবহার ভুলতে পারব না। কাআব রা. বলেন, এরপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ'কে সালাম জানালাম, তখন তাঁর চেহারা আনন্দের আতিশয্যে ঝকঝক করছিল। তিনি আমাকে বললেন, তোমার মাতা তোমাকে জন্মদানের দিন হতে যত দিন তোমার উপর অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর। কাআব বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! এটা কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, আমার পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা এত উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল হত যেন পূর্ণিমার চাঁদের ফালি। এতে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি বুঝতে পারতাম। আমি যখন তাঁর সম্মুখে বসলাম তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমার তওবা কবুলের শুকরিয়া স্বরূপ আমার ধন-সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ'র পথে দান করতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার কিছু মাল তোমার কাছে রেখে দাও। তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, খায়বরে অবস্থিত আমার অংশটি আমার জন্য রাখলাম। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আল্লাহ্ তাআলা সত্য বলার কারণে আমাকে রক্ষা করেছেন, তাই আমার তওবা কবুলের নিদর্শন অক্ষুণ্ন রাখতে আমার অবশিষ্ট জীবনে সত্যই বলব। আল্লাহ্‌র কসম! যখন থেকে আমি এ সত্য বলার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ'র কাছে জানিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমার জানামতে কোন মুসলিমকে সত্য কথার বিনিময়ে এরূপ নিয়ামত আল্লাহ্ দান করেননি যে নিয়ামত আমাকে দান করেছেন। [কাআব রা. বলেন] যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ'র সম্মুখে সত্য কথা বলেছি সেদিন হতে আজ পর্যন্ত অন্তরে

মিথ্যা বলার ইচ্ছাও করিনি। আমি আশাপোষণ করি যে, বাকী জীবনও আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে মিথ্যা থেকে হেফাযত করবেন। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা রাসূল ﷺ'র উপর সূরা তাওবার ১১৭ থেকে ১১৯ পর্যন্ত আয়াত সমূহ নাযিল করেন।

لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. অর্থ: আল্লাহ্ নবীর উপর দয়াশীল এবং মুহাজির ও আনসারদের উপর, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল। যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অত:পর তিনি দয়া পরবশ হন তাদের প্রতি। নি:সন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়। এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল; আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ব্যতিত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই- অত:পর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নি:সন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।[৯৬]

হযরত কা'ব রা. বলেন, আল্লাহর শপথ, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো আমার উপর এত উৎকৃষ্ট নিয়ামত আল্লাহ প্রদান করেন নি যা আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর, তা হল রাসূলুল্লাহর কাছে আমার সত্য বলা ও তাঁর সাথে মিথ্যা না বলা। যদি মিথ্যা বলতাম তবে মিথ্যাবাদীদের মত আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। সেই মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে যখন ওহী নাযিল হয়েছে তখন জঘন্য অন্তরের সেই লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. অর্থ: আপনি যখন

[৯৬]. সূরা তাওবা, আয়াত: ১১৭-১১৯।

তাদের কাছে ফিরে আসবেন, তখন তারা আপনার নিকট ছল-ছুতা নিয়ে উপস্থিত হবে; আপনি বলুন, ছল কর না, আমি কখনো তোমাদের কথা শুনব না; আমাকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহই দেখবেন এবং তাঁর রাসূল। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই গোপন ও অগোপন বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট। তিনিই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। এখন তারা আপনার সামনে আল্লাহর কসম খাবে, যখন আপনি তাদের কাছে ফিরে যাবেন, যেন আপনি তাদের ক্ষমা করে দেন। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন, নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হল দোযখ। তারা আপনার সামনে কসম খাবে, যাতে আপনি তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। অতএব, আপনি যদি সন্তুষ্ট হয়ে যান তাদের উপর তবু আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন না- এ নাফরমান লোকদের উপর।[৯৭]

বিদায় হজ্ব ১০ম হিজরি:

মক্কাবাসীগণ পূর্ব হতেই হজ্বের মৌসুমে (শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্ব) আরাফাত ও মিনায় অবস্থান করতো এবং শিরিকী পন্থায় আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতো। নবী করিম ﷺও নিয়মিতভাবে ঐ সময় আরাফাত এবং মিনায় যেতেন এবং আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। হিজরতের পূর্বে তিনি মিনায় মদিনাবাসীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতেন। একাধারে তিন বৎসর তিনি হজ্বের মৌসুমে আগত মদিনাবাসী নারী-পুরুষদের সাথে মিনার আকাবায় মিলিত হয়ে হিজরতের কথা পাকাপোক্ত করেছিলেন। তখন মদিনাবাসী মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র নব্বই জন।

হিজরতের পর তিনি ৪ বার ওমরাহ্ ও একবার হজ্ব আদায় করেন। প্রথমবার ৬ষ্ঠ হিজরিতে ওমরাহ্ করতে এসে হোদায়বিয়া হতে ফেরত যান। এটাও ওমরার মধ্যে গণ্য হয়। পরের বৎসর ৭ম হিজরিতে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ওমরাতুল ক্বাযা পালন করেন। ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পর হোনাইন ও তায়েফ যুদ্ধ শেষে জি'রানা নামক স্থান থেকে এহরাম বেঁধে ওমরাহ আদায় করেন। ৪র্থ ওমরাহ্ আদায় করেন বিদায় হজ্বের সাথে।

নবম হিজরিতে নবী করিম ﷺ নিজে হজ্ব না করে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.কে আমীর বানিয়ে তিনশত লোক পাঠিয়ে প্রথম হজ্ব পালন করান। এ বছর মুশরিকরাও তাওয়াফ করতে এসেছিলো। তাই হযরত আবু বকর রা.-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের হজ্ব ছিল মুসলমান ও মুশরিকদের মিশ্রিত হজ্ব।

---

[৯৭]. সূরা তাওবা, আয়াত: ৯৪-৯৬ ও সহীহ বুখারী শরীফ, হাদিস নং-৪০৭৬।

মুশরিকগণ তাদের শিরিকী প্রথা অনুযায়ী হজ্ব বা তাওয়াফ করেছিল এবং মুসলমানগণ ইসলামী কায়দায় হজ্ব আদায় করেন। এই বৎসরই ছিল মুশরিকদের শেষ সুযোগ। হযরত আলী রা.কে পাঠিয়ে নবী করিম ﷺ আরাফাতে ও মিনায় আল্লাহর ঘোষণা প্রচারের ব্যবস্থা করেন এই বলে যে, "দশম হিজরী থেকে মুশরিকদের জন্য হজ্ব ও ওমরায় আগমন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো"। এভাবে মক্কা, আরাফাত, মোজদালেফা ও মিনাকে মুশরিকমুক্ত করে নবী করিম ﷺ দশম হিজরিতে নিজে হজ্ব আদায় করার ব্যবস্থা করেন। বিলম্বের ইহাই মূল কারণ।

সংস্কার কাজ করা যে কত কঠিন ও সময় সাপেক্ষ-হজ্বের এ ঘটনার মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরিবেশ সৃষ্টি না করে প্রথম থেকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলে তা বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একটি হজ্বের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরী করতে দুই বৎসর লেগেছিল।

হজ্বের প্রস্তুতি:

নবী করিম ﷺ দশম হিজরির হজ্ব মৌসুমের পূর্বেই ঘোষণা করে দেন যে, তিনি এ বৎসর হজ্ব আদায় করবেন। সাহাবীগণ যেন সমবেতভাবে নবী করিম ﷺ'র সাথে হজ্বে গমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। সারা আরবে সাজসাজ রব পড়ে গেল। আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো। সকলের মনে বিগত একুশ বৎসরের যুলুম-অত্যাচার, দেশত্যাগ, যুদ্ধ বিগ্রহ, অবশেষে মক্কা বিজয়, কোরাইশদের চরম পরাজয় ও অপমান- সব কিছুর ছবি চোখের সামনে একে একে ভেসে উঠতে লাগলো। মহানবী ﷺ'র মহান হজ্ব যেন একই সাথে মহা বিজয় মিছিলে পরিণত হতে লাগলো। চতুর্দিকে প্রস্তুতির ধুম পড়ে গেল।

কিন্তু এতসব আনন্দ আয়োজনের মধ্যেও যেন বিদায়ের একটি করুণ সুর বেজে উঠলো। মহানবী ﷺ'র উপর অর্পিত দায়িত্ব যেন চূড়ান্ত সমাপ্তি পথে দ্রুত এগিয়ে চলছে। হজ্বের প্রস্তুতির সাথে সাথে মহানবী ﷺ মহাপ্রয়াণের প্রস্তুতিও মনে মনে গ্রহণ করতে লাগলেন।

দশম হিজরির যিলক্বদ মাসের ৫ দিন বাকী থাকতে নবী করিম ﷺ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার-মতান্তরে একলক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবীর হজ্ব কাফেলা নিয়ে হজ্বে রওনা দিলেন এবং যিলহজ্ব মাসের ৪ তারিখে মক্কা মোয়ায্যামায় উপস্থিত হলেন। মক্কা মোয়ায্যামা নবী করিম ﷺ'র আগমনে যেন পুনঃজীবন লাভ করলো। নবী করিম ﷺ'র পদধূলিতে মক্কা ভূমি পুনরায় গৌরবান্বিত হলো। একলক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে মক্কাভূমি জান্নাতে রূপান্তরিত হলো। সে বৎসরই মক্কার হাজুন কবরস্থানটি "জান্নাতুল

মায়াল্লা" উপাধীতে ভূষিত হলো। মক্কার এই দৃশ্য কেয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আর দেখা যাবেনা। এই জান্নাতী দৃশ্য কল্পনা করেই রাসূল-প্রেমিকদের হৃদয় হজ্বে গমণে আকুল হয়ে উঠে।

মদিনা শরীফের মসজিদে নববীতে যোহর নামায আদায় করে তিনি রওনা দেন এবং যুল-হোলায়ফা নামক স্থানে গিয়ে আসরের নামায দু'রাকাত অর্থাৎ কসর আদায় করেন। সেখান থেকেই তিনি ইহ্রাম পরিধান করে তাল্‌বিয়া বা লাব্বাইকা দোয়া পাঠ করেন। মদিনা শরীফের ৬ মাইল দূরে যুল-হোলায়ফা মদিনাবাসীদের ইহ্রামের মীকাত। মক্কা মোয়ায্‌যমার পথে তিনি নয় দিন সফর করেন। যেখানে যেখানে তিনি অবতরণ করে নামায আদায় করতেন– ঐ স্থানগুলোতে পরবর্তীতে মসজিদ তৈরী হয়। সাহাবাগণের যুগে অবশ্য সব মসজিদ তৈরী হয়নি। তবুও তাঁরা যখনই এ পথে মক্কায় গমনাগমন করতেন, তখন ঐ পবিত্র স্থানসমূহে বরকতের আশায় নামায আদায় করতেন এবং নবী করিম ﷺ'র স্মৃতি বিজড়িত পবিত্রস্থান হিসাবে ঐ স্থানের তাযীম করতেন। ইবনে কাছির (৭৭৪ হিজরী) তাঁর অমরগ্রন্থ আলবেদায়া ওয়ান্ নেহায়া'তে এই স্থানগুলোর উল্লেখ করে কোন্ কোন্ সাহাবী এসব স্থানে নামায আদায় করতেন– তাঁদের নামও উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, পরবর্তী যুগের জাহেল ও মূর্খ লোকদের অবহেলায় ঐসব স্থানের অনেক স্মৃতি চিহ্নই বিনষ্ট হয়ে যায়।[৯৮]

মক্কায় উপস্থিতি ও তাওয়াফ:

নবী করিম ﷺ যিলহজ্ব চাঁদের ৪ তারিখ রোববার সকালে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মক্কা-মোয়ায্‌যমায় প্রবেশ করে খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করেন এবং সাফা মারওয়ার সাঈ সমাপ্ত করেন– যারা প্রথমে শুধু ওমরাহ্ করার নিয়তে এহ্রাম বেঁধেছিলেন, তাঁদেরকে এহ্রাম খুলে ফেল্‌তে নির্দেশ দিলেন। ইহাকে হজ্বে তামাত্তু বলা হয়। ঐ দিনই তিনি মক্কা-মোয়ায্‌যমার পূর্বপ্রান্তে বাত্‌হা বা আব্‌তাহ্ নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। এ জন্য হুযূর ﷺ'কে আব্‌তাহীও বলা হয়। ৭ তারিখ বুধবার পর্যন্ত তিনি ঐ স্থানেই অবস্থান করেন। এই সময় বিবি ফাতেমা রা. ও উম্মুল মোমেনীনগণ হুযুর ﷺ'র সাথে ছিলেন।

হযরত আলী রা. ছিলেন ইয়ামেন দেশে গভর্ণর হিসাবে। নবী করিম ﷺ'র নির্দেশে হযরত আলী রা. ইয়ামেন থেকে এসে তাঁর সাথে আবতাহ্ নামক স্থানে মিলিত হন। যিলহজ্ব মাসের ৮ তারিখ বৃহস্পতিবার হজ্বের উদ্দেশ্যে তিনি মীনায় গমন করেন এবং যোহর থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায সেখানে আদায় করেন।[৯৯]

---

[৯৮]. অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল র., নূর নবী, পৃ. ১৬৮-১৭০।

[৯৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১।

আরাফায় গমন ও উকুফ পালন, হজ্বের ভাষণ প্রদান:

নবী করিম ﷺ মক্কার হিসাব মতে ৯ই যিল্‌হজ্ব শুক্রবার সকালবেলা মীনা থেকে পূর্বদিকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সাথে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরামও মীনা থেকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। লক্ষ কণ্ঠের গগনবিদারী লাব্বাইক ধ্বনীতে দু'পাশের পর্বতমালা কেঁপে উঠলো। নবী করিম ﷺ আরাফাতে পৌছে মসজিদে নামিরার স্থানে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের ভাষণ (খুতবা) প্রদান করেন। উক্ত ভাষণে তিনি ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব, আরব-আজমের ভেদাভেদহীন সমাজব্যবস্থা, সুদ হারাম, পরস্পর খুনখারাবীর উপর নিষেধাজ্ঞা, নারীদের ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষা, জীবনের নিরাপত্তা, সম্পদের নিরাপত্তা- ইত্যাদি বিষয়ে এক নীতি-নির্ধারনী সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণকেই হজ্বের খুতবা বা বিদায়ী ভাষণ বলা হয়। যোহর নামাযের পূর্বে এই খুতবা দেয়া হয়। অত:পর তিনি জাবালে রহমতের পাদদেশে দোয়া মুনাজাতে মশ্‌গুল হয়ে পড়েন।

সেদিন তিনি মুসাফির হিসাবে যোহর ও আছর নামায একসাথে পরপর আদায় করেন-জুমা পড়েননি। এই ব্যবস্থাকে 'জময়ে তাকদীম' বলা হয়। কিয়ামত পর্যন্ত আরাফাতের দিন শুধু মসজিদে নামিরার জমাতে এই নিয়ম চালু থাকবে। কিন্তু তাঁবুতে পড়লে যোহর ও আছর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পড়তে হবে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই কুরআন মজিদের ঐতিহাসিক আয়াতটি নাযিল হয়। উক্ত আয়াতে আল্লাহপাক এরশাদ করেন–

"আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করলাম। আর আমার নেয়ামতও তোমাদের উপর পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।"[১০০] আয়াত হিসাবে এই আয়াতটিই সর্বশেষ নাযিল হয়। এরপর মীনাতে নাযিল হয় সর্বশেষ পরিপূর্ণ সূরা আন্-নাস্‌র।

আরাফাতে উক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার সাথে সাথে সাহাবীগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা., হযরত ওমর রা. ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. নীরবে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা বললেন– এই আয়াতে নবী করিম ﷺ'র বিদায়ের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও রয়েছে। সুতরাং আমরা নবী করিম ﷺ'র বিদায়-আশংকায় কাঁদছি।

---

[১০০]. সূরা মায়েদাহ।

উক্ত আয়াতে নবুয়তধারার পরিসমাপ্তি এবং দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতা সম্বন্ধে আল্লাহপাক যে শুভ সংবাদ দিয়েছেন– তা কত গুরুত্বপূর্ণ, জনৈক ইয়াহুদী পাদ্রীর উক্তিতে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

হযরত ওমর রা.'র খেলাফতকালে উক্ত ইয়াহুদী পাদ্রী তাঁর দরবারে এসে বললো– "হে আমিরুল মোমেনীন! আপনারা আপনাদের কুরআনে এমন একটি আয়াত পাঠ করেন- যদি সেই আয়াতটি আমরা ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ হতো- তাহলে আমরা ঐ দিনটিকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করতাম।" হযরত ওমর রা. জিজ্ঞাসা করলেন- "সে আয়াতটি কি? ইয়াহুদী বললো- 'আল্ ইয়াওমা আকমাল্তু লাকুম'... আয়াত। হযরত ওমর রা. বললেন- উক্ত আয়াতটি যে দিনে, যে তারিখে ও যে সময়ে নাযিল হয়েছিল- তা আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে- দুই ঈদের দিনে অর্থাৎ- আরাফাতের দিনে ও জুমার দিনে বিকাল বেলায় নবী করিম ﷺ'র উপর উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল।[১০১] অর্থাৎ হজ্ব ও জুমার দিন আমাদের নিকট ঈদের দিন। পবিত্র তারিখে, পবিত্র দিনে, পবিত্র স্থানে ও পবিত্র ক্ষণেই উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে।"

বি:দ্র: কিছু জাহেল লোক বলে- দুই ঈদ ছাড়া শরীয়তে তৃতীয় কোন ঈদ নেই। তাদের জানা উচিৎ-জুমা এবং আরাফাতের দিনও ঈদের দিন। এভাবে মিলাদুন্নবীর দিনও ঈদের দিন। ঈদের দিন ৯টি– ১. ঈদে রামাদ্বান, ২. ঈদে কোরবান, ৩. ঈদে জুমুয়া, ৪. ঈদে আরাফাহ্, ৫. ঈদে লাইলাতুর বারাআত, ৬. ঈদে লাইলাতুল ক্বদর, ৭. ঈদে আশুরা, ৮. ঈদে নুযুলে মায়েদাহ, ৯. ঈদে মিলাদুন্নবী বা ঈদে ইয়াওমে বেলাদাত।[১০২]

মোজদালেফায় রাত্রি যাপন:

আরাফাতের ময়দানে নবী করিম ﷺ সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করেন। দিনের মধ্যাহ্ন হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আরাফাত ময়দানে হাজীগণের অবস্থান করাকে 'উকুফ' বলা হয়। এই কাজটি হজ্বের ফরয। এই সামান্য সময় অবস্থানের ফলে আল্লাহ তায়ালা জীবনের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। সূর্য ডুবে হলুদ রং অপসারিত হওয়ার পর নবী করিম ﷺ কাস্ওয়া নামক উটে আরোহণ করেন এবং পিছনে পালিত পুত্রের সন্তান উসামা ইবনে যায়েদ রা.কে বসান। এই কাস্ওয়া উটটি হযরত আবু বকর রা. হিজরতের সময় ক্রয় করে নবী করিম ﷺকে দান করেছিলেন। এই উটে সওয়ার হয়েই নবী করিম ﷺ হাশরের ময়দানে উপস্থিত

[১০১]. মুসলিম শরীফ।

[১০২]. ওনিয়াতুত্বালেবীন, মাওয়াহিব, মাদারিজ- ইত্যাদি, সূত্রঃ নূর নবী স., পৃ. ২৩৪-২৩৫

হবেন বলে এক হাদীসে এসেছে। হযরত আবু বকর রা. কর্তৃক ক্রয়কৃত অন্য উটটির নাম ছিল আদ্‌বা। এটিতে চড়ে হাশরে যাবেন বিবি ফাতেমা রা.। হযরত আবু বকর রা.'র অবদানকে রাসূলে মকবুল ﷺ এভাবেই সম্মানিত করেছেন।

নবী করিম ﷺ সকল সাহাবীকে মোযদালিফার দিকে রওনা দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং পথিমধ্যে মাগরিব নামায না পড়ার কথা বলে দিলেন। কেননা, আরাফাত ও মোযদালিফার মধ্যখানে আব্রাহার হস্তি বাহিনীর উপর আল্লাহ্ তায়ালা গযব নাযিল করেছিলেন। মোযদালিফায় এসে নবী করিম ﷺ ঐ স্থানে অবস্থান করলেন- যেখানে হযরত আদম আ. ও বিবি হাওয়া আ. প্রথম বাসররাত্রি যাপন করেছিলেন–খোলা আকাশের নীচে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আরাফাহ্ ও মোযদালিফা-এই দুটি স্থান আদি পিতা-মাতার স্মৃতিবিজড়িত স্থান। হাজীগণ আরাফাত ও মোযদালিফায় গমন করে আদি পিতা-মাতার স্মৃতি স্মরণ করে এবং কিছুক্ষণ পিতৃস্থানে অবস্থান করে। তদ্রুপ মীনা হলো হযরত ইব্রাহীম আ. ও হযরত ইসমাঈল আ.'র কঠিন পরীক্ষাস্থল। এখানে এসে হাজীগণ আল্লাহ্র পথে আত্মত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ করেন। মূলত: পূর্ণ হজ্ব ক্রিয়াটিই নবীগণের সম্পাদিত ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান ও অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়– এটাই ইবাদত বলে গণ্য। এখানে তিনি এক আযানেই মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পর পর আদায় করেন। ইহাকে 'জময়ে তাখীর' বলে। হজ্বের দিন আরাফাহ্ ও মোযদালেফা ছাড়া অন্য কোন স্থানে দুই নামায একসাথে পড়ার বিধান নেই। ইহাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত।

মীনায় গমন ও ৪ দিন অবস্থান:

মোযদালিফায় রাত্রি যাপন করে ৭০টি করে কংকর সংগ্রহ করে ১০ তারিখ প্রত্যুষে ফজর নামায আদায় করে নবী করিম ﷺ সাহাবায়ে কেরাম সমভিব্যাহারে মিনার দিকে রওনা হন। এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সঙ্গী। তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনীত হচ্ছে– 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক'! হে আল্লাহ্! আমরা তোমার ডাকে হাযির! কি আবেগময় দৃশ্য! এভাবে কাফেলা মিনায় গিয়ে পৌছলো। এ সফরে নবী করিম ﷺ উটের পিঠে তুলে নিলেন ফযল ইবনে আব্বাস রা.কে।

মিনায় পৌছেই তিনি জামরাতুল উলা বা বড় শয়তানকে ৭টি কংকর মেরে তাঁবুতে ফিরে আসেন। হযরত ইসমাঈল আ.কে যে জায়গায় কোরবানীর জন্য শোয়ানো হয়েছিল– সে স্থানটির নাম মায্বাহ্। সেখানে নবী করিম ﷺ সাহাবীগণকে নিজেদের কোরবানী করার নির্দেশ দেন। সাহাবীগণ কোরবানী কাজ সমাধা করে ইহরাম খুলে ফেলেন। হযরত ইব্রাহীম আ. ও হযরত

ইসমাঈল আ.'র কোরবানী অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন নিজেদের কোরবানী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ঐ দিনেই তিনি সাহাবীগণসহ মক্কায় গমন করে তাওয়াফে যিয়ারত শেষ করে পুনঃ মিনায় এসে রাত্রি যাপন করেন। এটাই প্রকৃত সুন্নাত। ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্ব তিনদিন তিনটি জামারায় পাথর নিক্ষেপ করলেন– প্রতিটিতে পর পর ৭টি করে ২১টি। এভাবে ১ম দিনে ৭টি, দ্বিতীয় দিনে ২১টি, তৃতীয় দিনে ২১টি এবং চতুর্থ দিনে ২১টি মোট ৭০টি পাথর নিক্ষেপ করলেন শয়তানের উদ্দেশ্যে। কেয়ামত পর্যন্ত এই পাথর নিক্ষেপ একটি ওয়াজিব ইবাদতে পরিণত হয়ে গেল। নবীগণের অনুকরণের নামই ইবাদাত। হাজীগণকে ১২ তারিখ পর্যন্ত ৩দিনে ৪৯টি কংকর মারতে হয়। ঐ দিন কোন কারণে সন্ধ্যার পূর্বে মিনা হতে বের হতে না পারলে ১৩ তারিখে আরো ২১টি মারতে হবে।

মাযবাহে গিয়ে কোরবানীর কাজ শেষ করে মাথা হলক করে ইহরাম খুলে নবী করিম ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ঐ দিনই ১০ই যিলহজ্ব তারিখে বাইতুল্লাহ যিয়ারত করতে গেলেন এবং তাওয়াফে যিয়ারত শেষে পুনরায় মিনায় ফিরে আসেন। এই তাওয়াফকে তাওয়াফে যিয়ারত বলা হয় এবং এটি হজ্বের শেষ ফরয। হজ্বের ফরয তিনটি। যথা- ১. ইহরাম, ২. উকুফে আরাফাহ, ৩. তাওয়াফে যিয়ারত। নবী করিম ﷺ হজ্বের সম্পূর্ণ বিধান নিজের আমলের মাধ্যমে উম্মতের সামনে পেশ করেছেন। এ জন্য হজ্ব এত মর্যাদাপূর্ণ।

মিনাতে অবস্থানকালেই সূরা 'নাসর' অবতীর্ণ হয়। এতে নবী করিম ﷺ'র ইন্তিকালের পূর্বাভাস বিদ্যমান। উক্ত সূরা নাযিলের পর মিনার খুতবায় নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– "সম্ভবতঃ এ বৎসরের পর তোমাদের সাথে আর হজ্ব করতে পারবো না।" এখানে পরিষ্কারভাবে নবীজীর ইলমে গায়বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তেরই যিলহজ্ব তারিখে ২১টি পাথর নিক্ষেপ শেষে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন।[১০৩]

মদিনায় উপস্থিতি ও বিদায়ের প্রস্তুতি:

মদিনায় ১১ হিজরির প্রথম দিন ছিল ১লা মুহররম রোববার। এদিনে নবী করিম ﷺ হজ্ব সমাপন করে মদিনা শরীফ এসে পৌঁছেন। এরপর ২ মাস ১২ দিন অর্থাৎ ৭২দিন পর ইন্তিকাল করেন। বিদায় হজ্বের সময়ই নবী করিম ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, হয়তো আগামী বৎসর আর তোমাদের সাথে হজ্ব করার সুযোগ পাবো না। আরাফাত ও মীনাতে খুত্‌বার মধ্যে তিনি এ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আরাফাতে "আল্ ইয়াওমা আক্‌মালতু"

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৭

আয়াতটি নাযিল হয়। হযরত ওমর, হযরত আবু বকর ও হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম- প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামগণ উক্ত আয়াতে নবী করিম ﷺ'র বিদায়ের প্রচ্ছন্ন আভাস পেয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন।

মিনায় আইয়ামে তাশরীক (৯–১৩ যিলহজ্ব)-এর মাঝামাঝি সময়ে (অর্থাৎ ১১ তারিখে) পূর্ণ সূরা নসর নাযিল হয়। কুরআন মজিদ নাযিলের ধারা এই সূরার দ্বারাই সমাপ্ত হয়। এরপর কোন সূরা বা আয়াত নাযিল হয়নি।[১০৪] কেউ কেউ বলেন- এরপর একটি মাত্র আয়াত নাযিল হয়েছিল। উক্ত আয়াতটি হলো- সূরা বাক্বারার ২৮১নং আয়াত "ওয়াততাক্বু ইয়াওমান"...। সূরা নসর নাযিল হওয়ার সাথে সাথে সুক্ষ্মদর্শী সাহাবীগণের বুঝতে আর বাকী রইল না যে, নবী করিম ﷺ'র বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। ৬৩ বৎসর বয়স এমন কিছু নয়। তবুও আল্লাহর ইচ্ছা-ই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলেন। ২৩ বৎসরের মধ্যেই তিনি ৩০ পারা কুরআন মজিদ নাযিল সমাপ্ত করে দিলেন।

অন্যান্য নবীগণের নিকট আসমানী কিতাবসমূহ লিখিত আকারে একদিনে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু কুরআনেই এর ব্যতিক্রম। ২৩ বৎসরে কুরআন মজিদ নাযিল হয় এবং জিব্রাঈল আ. পাঠ করে শুনিয়েছেন নবী করিম ﷺ কে। নবী করিম ﷺ নিজের পবিত্র যবানে তা পাঠ করে শুনিয়েছেন উম্মতকে। কালাম হলো আল্লাহর, আর জবান হলো রাসূলুল্লাহর। রাসূলে পাকের যবানে আল্লাহ পাক কালাম করেছেন ২৩ বৎসর পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক ঘোষণা করেন- "তিনি (রাসূল) আপন ইচ্ছায় নিজের পক্ষ হতে বানানো কথা বলেন না; বরং যা বলেন- তা ওহী ব্যতিত আর কিছুই নয়- যা তাঁর প্রতি গোপনে অবতীর্ণ হয়।"[১০৫] ২৩ বৎসর পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা এভাবে নিজের বাণী আপন হাবীবের পবিত্র যবান দিয়ে প্রকাশ করেছেন। অন্য কোন নবীর মুখে এভাবে আল্লাহ্ তায়ালা আপন বাণী প্রকাশ করেননি। ইহা নবীজীর একক বৈশিষ্ট্য। আল্লাহপাক হযরত মুসা আ.'র সাথে কথা বলেছিলেন খেজুর গাছের মাধ্যমে। কিন্তু তাওরাত নাযিল করেছেন একরাত্রে লিখিত আকারে।

ওহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সকলেই বুঝে ফেললেন যে, সময় ঘনিয়ে এসেছে। সকলের মনে এক আশংকা বিরাজ করছিল। একদিন হযরত ওমর রা. হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে জিজ্ঞেস করলেন- সূরা নসর সম্পর্কে আপনার মতামত কি? ইবনে আব্বাস রা. বললেন- আল্লাহ্ তায়ালা এই সূরায় মহান

১০৪. ইত্‌কান।
১০৫. সূরা আন্ নাজম, আয়াতঃ ৩।

বিজয়দানের কথা বলেছেন এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এরপরই বলেছেন- "হে রাসূল! এখন আপনি শুধু আপনার প্রতিপালকের তস্‌বীহ্ পাঠ করুন এবং তাঁর কাছে (উম্মতের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবাহ্ কবুলকারী।"

এখানে দেখা যাচ্ছে- নবী করিম ﷺ'র আসল কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন শুধু দোয়া ও এস্তেগফার করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ। সুতরাং হুযুর ﷺ'র সময় যে শেষ হয়ে আসছে- এতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। ইবনে আব্বাসের একথা শুনে হযরত ওমর রা. বললেন- আপনি যা বুঝেছেন, আমিও তাই অনুমান করেছি। তাবরানী শরীফে উল্লেখ আছে- যখন নবী করিম ﷺ বিদায় হজ্ব শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন একদিন মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে এক ভাষণে আল্লাহর প্রশংসা ও সানা পাঠ করে বললেন– "হে লোক সকল! আবু বকর কখনও আমাকে কষ্ট দেয়নি। তোমরা তাঁর এ কাজের স্বীকৃতি দিও। হে উপস্থিত লোক সকল! আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, যোবাইর, আবদুর রহমান এবং প্রথম দিকের হিজরতকারীগণের প্রতি আমি সন্তুষ্ট। তোমরা তাঁদের অবদানের প্রতি স্বীকৃতি দিও। হে লোক সকল! তোমরা আমার সাহাবী ও শ্বশুরদ্বয়ের ব্যাপারে এবং আমার বন্ধুদের ব্যাপারে আমার কথার সম্মান রক্ষা করো। হে লোক সকল! তোমরা মুসলমানের ব্যাপারে তোমাদের মুখকে সংযত রাখো! তাদের কেউ মারা গেলে তার সম্পর্কে ভাল বলবে।"[১০৬]

অসুখ আরম্ভঃ

সময় গড়িয়ে চললো। সফর মাসের মধ্যভাগে নবীজী একদিন মদিনার পবিত্র গোরস্থান জান্নাতুল বাক্বীতে রাত্রে যিয়ারত করতে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি যিয়ারত করলেন এবং ইন্তিকালপ্রাপ্ত সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন- "হে কবরবাসী সাহাবীগণ! তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক! তোমরা ভালয় ভালয় চলে গেছো। আগামীতে ফেৎনা-ফাসাদ অন্ধকার রাত্রির মত ঘনিয়ে আসছে। পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে পরবর্তী সময়টি হবে নিকৃষ্ট"। এরপর তাঁর সহগামী আবু মোয়াইহাবা-কে লক্ষ্য করে বললেন: "আমাকে দুনিয়ার যাবতীয় ধন-ভাণ্ডারের চাবি প্রদান করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা অথবা জান্নাতে গমনের এখতেয়ারও দেয়া হয়েছে"।

আবু মোয়াইহাবা রা. আরয করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দুনিয়ার ধন ভাণ্ডার এবং দীর্ঘদিন দুনিয়াতে অবস্থানের বিষয়টি প্রথমে গ্রহণ করুন। তারপর

১০৬. আল বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০।

বেহেশতে গমন! নবী করিম ﷺ তাঁর কথা শুনে বললেন– "না-বরং আমার প্রতিপালকের সান্নিধ্য এবং জান্নাতকেই আমি গ্রহণ করেছি"।

এরপর জান্নাতুলবাক্বী কবরবাসীদের জন্য দোয়া করে অধিক রাতে হুজরা শরীফে ফিরে আসলেন। এসে দেখেন- বিবি আয়েশা সিদ্দিকা রা. 'মাথা গেলো, মাথা গেলো'– বলে কাতরাচ্ছেন। নবী করিম ﷺ বললেন– "না, তোমার মাথা নয়- বরং আমার মাথা"। একথা বলার সাথে সাথে হযরত আয়েশা রা. সুস্থ হয়ে উঠলেন, আর মাথা ব্যথা শুরু হলো নবী করিম ﷺ'র। একজনের অসুখ বা বিপদাপদকে অন্যজনে নিজের মধ্যে টেনে নেয়াকে আরবীতে "ছালব" বলা হয়। এটা ফয়েযের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এভাবেই নবী করিম ﷺ স্বেচ্ছায় অসুখ বরণ করে নিলেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন- যখন আমি মাথা ব্যথায় কাতরাচ্ছিলাম এবং বলছিলাম-মাতা গেলো, তখন নবী করিম ﷺ আমাকে বললেন- "যদি তুমি আমার পূর্বেই মারা যাও, তা হলে তো তোমার ভাগ্য ভাল। কেননা, আমি নিজে তোমার গোসল ও কাফন দাফনের ব্যবস্থা করবো। আমার হাতে তুমি মারা যাবে। এটা তোমার বড় সৌভাগ্য"। তখন আমি অভিমান করে বললাম- "তাহলে তো বরং আপনারই বড় সৌভাগ্য হবে। আমার বিছানায় আর একজন বিবিকে নিয়ে সংসার করতে পারবেন"। একথা শুনে নবী করিম ﷺ মৃদু হাসলেন এবং মাথা ব্যথা নিয়েই শুয়ে পড়লেন।

অসুখ নিয়েই নবী করিম ﷺ প্রত্যেক বিবির ঘরে সমান সমান পালায় অবস্থান করতে লাগলেন। বিবি মায়মুনা রা.'র ঘরে অবস্থানকালে অসুখ অনেক বেড়ে যায়। তখন সকল বিবিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন- অসুস্থ অবস্থায় কার ঘরে তিনি অবস্থান করবেন? সকলেই বিবি আয়েশা রা. এর ঘরে থাকার অনুমতি প্রদান করেন। এ ছিল বিবিগণের মধ্যে সমতা রক্ষা করার আদর্শ। হযরত আয়েশা রা. বলেন- "নবী করিম ﷺ বিবি মায়মুনার ঘর থেকে হযরত ফযল ইবনে আব্বাস রা. ও হযরত আলী রা. এর কাঁধের উপর ভর দিয়ে বের হলেন। তখন তাঁর পা মোবারক মাটিতে হোঁচট খাচ্ছিল"।[১০৭]

আখেরী চাহার শোম্বাঃ

সফর মাসের শেষ বুধবার রোগমুক্তির গোসলঃ সফর মাসের শেষ বুধবার ছিল চাঁদের ৩০ তারিখ। এদিন নবী করিম ﷺ'র অসুখ হঠাৎ কমে গেল। তিনি সকালবেলা উঠেই হযরত আয়েশা রা.কে ডেকে বললেন- "আমার জ্বর কমে গেছে।

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

তুমি আমাকে গোসল করিয়ে দাও"। সেমতে তাঁকে গোসল করানো হলো। তিনি সুস্থ বোধ করলেন। এটিই ছিল তাঁর দুনিয়ার শেষ গোসল। ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন ও বিবি ফাতেমা রা.কে ডেকে আনা হলো। নাতীদ্বয়কে নিয়ে তিনি সকালের নাস্তা করলেন। হযরত বেলাল রা. ও সুফ্‌ফাবাসীগণ বিদ্যুতের ন্যায় এ সংবাদ মদিনার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো। তাঁরা বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত দলে দলে আসতে লাগলেন এবং হুযুর ﷺ কে এক নযর দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলেন।

হুযুরের রোগমুক্তির সংবাদে সাহাবায়ে কেরাম কত খুশী ও আনন্দিত হয়েছিলেন- তাঁর কিছুটা আন্দাজ করা যায় পরের ঘটনার মাধ্যমে। হযরত আবু বকর রা. পাঁচ হাজার দিরহাম ফকির মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। হযরত ওমর রা. দান করলেন সাত হাজার দিরহাম। হযরত ওসমান রা. দান করলেন দশ হাজার দিরহাম। হযরত আলী রা. দান করলেন তিন হাজার দিরহাম। সবচেয়ে বেশী দান করলেন ধনী ব্যবসায়ী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা.- তিনি একশত উট আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিলেন। সুব্‌হানাল্লাহ! নবী করিম ﷺ'র একটু শান্তি ও আরামের সংবাদে সাহাবীগণ কিভাবে জানমাল উৎসর্গ করে দিতেন- এটা তারই আংশিক প্রমাণ। "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. প্রতি বৎসর ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ'র দিনে একটি মূল্যবান লাল উট যবেহ করে যিয়াফত দিতেন" (Endless Blessings- বা সাআদাতে আবাদিয়া দ্রষ্টব্য-তুরস্ক)।

নবী করিম ﷺ'র সাময়িক রোগমুক্তির দিবসকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য পারশ্যসহ মধ্য এশিয়া ও পাক ভারত উপমহাদেশে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই দিবসটি পালন করা হয়। বুযুর্গানে দ্বীনের তরিকা অনুযায়ী এদিনে নবীজীর স্মরণে এবং রোগবালাই থেকে মুক্তির নিয়তে আখেরী চাহার শোম্বা দিবসে গোসল করে দু'রাকাআত শুকরিয়া নামায আদায় করা হয়। এছাড়াও বৈধ সমস্ত নেক আমল করা হয়। কুরআন মজিদের ৬টি আয়াতে শেফা ও সাত সালামের আয়াত চিনির প্লেটে বা কলা পাতায় লিখে পানিতে ধৌত করে ঐ পানি পান করলে পাইলস্ বা গেজ রোগ নিরাময় হয় বলে বুযুর্গানে দ্বীন ফ্বায়ায়েলের কিতাবে লিখে গেছেন।

আখেরী চাহার শোম্বা বা সফরের শেষ বুধবার দিবসটি পালন করে মুসলমানরা ইসলামের একটি স্মরণীয় দিনকে এখনও প্রেরণার উৎস করে রেখেছে। মূলতঃ এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই ইসলামী জোশ্ বারবার চাঙ্গা হয়ে উঠে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, নবী করিম ﷺ'র স্মৃতি বিজড়িত এই দিবসটি পালন

করতে একশ্রেণীর ওলামা নিষেধ করেন এবং এটাকে বিদ্‌আত বলে মানুষকে ভয় দেখান। তাদের উদ্দেশ্য একটিই- সেটি হলো- ইসলামের স্মরণীয় ঘটনাসমূহ মুসলমানদের হৃদয় থেকে মুছে ফেলা। নবী-অলীদের স্মৃতিবিজড়িত চিহ্ন সংরক্ষণ করা ও দিবস পালনের মধ্যে অজস্র কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এ জন্যই কুরআন মজিদে পূর্ববর্তী নবীগণের বিভিন্ন স্মরণীয় দিনের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে– যাতে মানুষ ঐগুলো থেকে হেদায়াতের আলো লাভ করতে পারে। ঐসব স্মরণীয় দিনগুলোকে আল্লাহ্‌পাক কুরআন মজিদে "আইয়ামিল্লাহ" বা "আল্লাহর স্মরণীয় দিবস" বলেছেন। আখেরী চাহারশোম্বার গোসলটি ছিল নবী করিম ﷺ'র জীবনের শেষ গোসল। এরপর ছিল জানাযার গোসল।

আখেরী চাহার শোম্বার দিন বিকাল থেকেই পুনরায় জ্বর দেখা দেয়। এই জ্বরেই নবী করিম ﷺ ১২দিন পর ইন্তিকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহ...)। সুতরাং সফর মাসের শেষ বুধবার একদিকে খুশীর দিন- অপর দিকে শোকেরও দিন। সকালে আনন্দ-বিকালে বিষাদ। কিন্তু দুটি একসাথে হলে প্রথমটিই পালন করতে হয়- যেমন ১২ই রবিউল আউয়াল।[১০৮]

আল্লাহর সাথে মহামিলনের প্রস্তুতি:

শেষ ১২ দিনের ঘটনা প্রবাহ: হযরত মায়মুনা রা. এর ঘর থেকে নবী করিম ﷺ অসুস্থ অবস্থায় হযরত আয়েশা রা. এর ঘরে দু'জন সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে তশরীফ নিয়ে আসেন এবং অন্যান্য বিবিগণের অনুমতিক্রমে ইন্তিকাল পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। ইন্তিকালের পর এই ঘরের একাংশের মধ্যেই রওযা মোবারক তৈরী করা হয়। [বর্তমানে রওযা মোবারক মসজিদে নববীর ভিতরে অবস্থিত। তিনদিকে মসজিদ। পূর্বদিক খোলা চত্বর।]

আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আখেরী চাহারশোম্বার দিন বিকাল থেকেই তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। সকাল ছিল আনন্দময়, বিকাল হলো বিষাদময়। এ সময় থেকে তিনি ৮ই রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার যোহর পর্যন্ত অসুখ নিয়েই সমস্ত নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন। সাহাবীগণের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি মসজিদে যেতেন এবং নামায আদায় করতেন। কোন কোন সময় হযরত আবু বকর রা.কে ইমামতি করতে বলতেন। কিন্তু তাঁর আগমনের সাথে সাথে হযরত আবু বকর রা. পিছনে সরে আসতেন এবং বাকী নামায নবীজীর পিছনে মোকাব্বির হয়ে আদায় করতেন।

---

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২-১৮৩

নামাযকে তিনি এত গুরুত্ব দিতেন। আমরা উম্মত হয়ে আজ নামাযের গুরুত্ব ভুলে গিয়েছি। আফসোস! নামাযে আমাদের দৃষ্টি থাকে মোসল্লার দিকে- কিন্তু হযরত আবু বকর ও সাহাবীগণের দৃষ্টি থাকতো আল্লাহর রাসূলের দিকে।

অসুস্থ অবস্থায় নবী করিম ﷺ প্রায়ই বলতেন- "হে আয়েশা! খায়বরের ইয়াহুদী রমনী যয়নবের বিষমিশ্রিত খাদ্যের বিষক্রিয়া এখন আমি অনুভব করছি। আমার মনে হয়- ঐ বিষের জ্বালায় আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাচ্ছে"।

[মোহাদ্দেস আবদুল গনি নাবলুছী (ফিলিস্তিন)- যিনি আল্লামা শামীর ওস্তাদ ও মোজ্‌তাহিদ ছিলেন- তাঁর লিখিত কিতাব "আল হাদিকায়" উল্লেখ আছে- "নবী করিম ﷺ দু'বার নিজের মউতের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিলেন। প্রথমবার খায়বরের বিষক্রিয়া জনিত সম্ভাব্য মৃত্যু তিনি ৪ বৎসর পর্যন্ত বিলম্বিত করেছিলেন। দ্বিতীয় বার ইন্তিকালের সময় হযরত আযরাঈল আ.কে বসিয়ে রেখে জিব্‌রাঈল আ. ও আল্লাহর সাথে কিছু কথা বলেছিলেন এবং উম্মতের জন্য কিছু প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন"।] এই বিলম্ব নবীজীর ইচ্ছায় ও আল্লাহর নির্দেশে ঘটেছিল। কাযী আয়ায রহ. তাঁর শিফা শরীফের "বাবুল কারামাত ও নবীজীর বৈশিষ্ট্য" অধ্যায়ে লিখেছেন- "আমরা মউতের অধীন, কিন্তু মউত নবীজীর ইখতেয়ারাধীন"। মউত আল্লাহর সৃষ্ট মখলুক। "সকল মখলুককেই আল্লাহ তায়ালা নবীজীর অধীনস্থ করে দিয়েছেন- কেননা তিনি সমস্ত সৃষ্টির মূল" (শিফা শরীফ)।[১০৯]

নবী জীবনের শেষ বৃহস্পতিবার ৮ই রবিউল আউয়াল:

নবী করিম ﷺ'র জীবনের শেষ বৃহস্পতিবার ছিল ৮ই রবিউল আউয়াল। ঐ দিন হুযুর ﷺ যোহরের নামাযের বাকী অংশে কোন রকমে জামাতের ইমামতি করেন। ঐ দিন হযরত আবু বকর রা. হুযুরের নির্দেশে যোহরের নামায পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় হুযুর ﷺ কে আসতে দেখে পিছনে হঁটে আসলেন। নামায শেষে তিনি সমবেত সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে এক অশ্রুপূর্ণ ভাষণ দেন এবং তাঁদের থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করেন। সেদিনের করুণ পরিবেশ আকাশ বাতাসকে অশ্রু ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। সাহাবায়ে কেরামের রোনাজারীতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। মদিনায় রোনাজারী ও মাতমের হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল সেদিন। শেষ বৃহস্পতিবারের হৃদয় বিদারক অবস্থার কথা স্মরণ করে পরবর্তী সময়ে ইবনে আব্বাস রা. প্রায়ই বলতেন- **"ইয়াওমুল খামিছ, ওয়ামা ইয়াওমুল খামিছ"।**

---

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

সেদিনের ভাষণে তিনি হযরত আবু বকর রা. এর অনেক মর্তবা ও মর্যাদা বর্ণনা করেন এবং অবশিষ্ট দিনগুলোতে নবী করিম ﷺ'র স্থলে ইমামতি করার জন্য তাঁকে নির্দেশ প্রদান করেন। এর মাধ্যমেই পরবর্তী খিলাফতের বিষয়টি একরকম চূড়ান্ত হয়ে যায়। নামাযের ইমামতি হচ্ছে- ইমামতে ছোগরা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ইমামত বা নেতৃত্ব হচ্ছে ইমামতে কোব্‌রা। সাহাবায়ে কেরাম রা. আকারে ইঙ্গিতে ভবিষ্যৎ নির্ধারণের নীতিমালা আঁচ করে নিলেন।

বিদায়ী শেষ ভাষণ:

নামাযের পর নবী করিম ﷺ যে বিদায়ী ভাষণ প্রদান করেন- তা কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন: হযরত আইউব বিন বশীর রা., উম্মে সালমা রা., আবু সাঈদ রা., আবুল মোয়াল্লা রা., জুনদুব রা., আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এবং ফযল ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখ। তাঁদের বর্ণিত হাদীসে শব্দের কিছু বেশ কম রয়েছে। সবার বর্ণিত হাদীসের সারমর্ম নিম্নরূপ।

"যোহরের নামায শেষ করে নবী করিম ﷺ মিম্বারে উঠে উপবেশন করলেন। আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা পাঠ করে সমবেত সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন– "আল্লাহ তায়ালা আপন এক প্রিয় বান্দাকে দুটি জিনিসের মধ্যে একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার ও স্বাধীনতা দিয়েছেন। যথা- (ক) তিনি যতদিন ইচ্ছা জীবিত থেকে দুনিয়ার সুখ শান্তি ও আরাম আয়েশ ভোগ করতে পারবেন।

(খ) এখনই আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে গিয়ে তাঁর জন্য সংরক্ষিত নেয়ামত ভোগ করবেন। আল্লাহর সেই প্রিয় বান্দা এই দুটির মধ্যে শেষেরটিই গ্রহণ করে নিয়েছেন।"

হযরত উম্মে সালমা রা. বলেন- "দীর্ঘজীবনের এখতিয়ার একমাত্র নবী করিম ﷺকেই দান করা হয়েছে- অন্য কাউকে নয়"। নবী করিম ﷺ'র ভাষণের অন্তর্নিহিত মর্ম বুঝতে পেরে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর রা. কেঁদে কেঁদে আরয করতে লাগলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নিজের জীবন, পিতা-মাতার জীবন, সন্তানাদির জীবন ও অর্থ সম্পদের বিনিময়ে আমরা আপনাকে পেতে চাই"।

নবী করিম ﷺ হযরত আবু বকর রা.কে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিলেন। আবু সাঈদ রা.এর বর্ণনায় নবী করিম ﷺ এরশাদ করলেন–

"আমার সান্নিধ্য লাভে এবং দ্বীনের জন্য ধন-সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে আমার উপর আবু বকরের চেয়ে অন্য কারো অধিক এহ্‌সান আছে বলে আমার

জানা নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে যদি আমি খলীল বা একান্ত বন্ধু বানিয়ে নিতাম, তা হলে আবু বকরকেই খলীল বানিয়ে নিতাম। আল্লাহ আমাকে খলীল বা একান্ত বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন এবং আমিও আল্লাহকে জানপ্রাণ দিয়ে খলীল বা একক বন্ধু বানিয়েছি। তোমরা আমার মসজিদের দিকে তোমাদের ঘরের ছোট ছোট সব দরজা, জানালা বন্ধ করে দাও। একমাত্র আবু বকরের দরজাটি খোলা রাখো। আবু বকরের সাথে আমার ইসলামী বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রয়েছে"।[১১০]

হযরত আইউব বিন বশীর রা. এর বর্ণনা মতে আরো কিছু নসিহতের কথা উল্লেখ আছে। যথা- "নবী করিম ﷺ মিম্বারে বসে প্রথমে ওহোদের শহীদানদের জন্য বিশেষ দোয়া করেন। ইসলামের জন্য তাঁদের আত্মত্যাগ ও শাহাদতের কথা স্মরণ করেন"।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনায় আরো আছে– "নবী করিম ﷺ মদিনার আনসারদের সেবা ও অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে বললেন"–

"হে মোহাজিরগণ! তোমরা সংখ্যায় অনেক বেড়ে গিয়েছো এবং দিন দিন তোমাদের আগমনের সংখ্যা বাড়ছেই। কিন্তু আনসারের সংখ্যা পূর্বের ন্যায়ই রয়েছে। তাঁরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তোমরা (মোহাজিরগণ) তাঁদের সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান করবে এবং তাঁরা কোন ত্রুটি করলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে"।

ফযল ইবনে আব্বাস রা. বলেন: নবী করিম ﷺ অন্যান্য কথার মধ্যে একথাও বলেছিলেন–

"হে উপস্থিত লোক সকল! তোমাদের বিগত জনেরা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমার বর্তমান মিম্বারে তোমরা আর কখনও আমাকে দেখতে পাবেনা। আমি যদি তোমাদের কারো পিঠে চাবুক দ্বারা আঘাত করে থাকি, তাহলে এই নাও আমার পিঠ। তোমরা বদলা নিতে পারো। আমি যদি কারও নিকট থেকে মাল নিয়ে থাকি, তাহলে তোমরা তা আমার থেকে নিয়ে নাও। আর যদি কারও সম্মান লাঘব করে থাকি, তাহলে আমার থেকে তার বদলা নিতে পারো। কেউ যেন আমাকে কাপুরুষ বা বখিল বলতে না পারে। বখিলী আমার শানও নয় এবং চরিত্রও নয়। যদি তোমাদের কারও কোন হক্ক আমার উপর থেকে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি সে হক্ক নিয়ে নিক-সে ব্যক্তিই আমার সবচেয়ে প্রিয় হবে"।

---

[১১০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার কাছে তিন দিরহাম পাওনা আছি। একদিন এক ফকির আপনার কাছে কিছু চাইলে আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে তিনটি দিরহাম দেয়ার জন্য। ঐ তিনটি দিরহামই আমি পাবো। নবী করিম ﷺ ফযল ইবনে আব্বাস রা.কে তা দিয়ে দিতে আদেশ করলেন।

এরপর নবী করিম ﷺ বললেন– তোমাদের কারও কাছে যুদ্ধেপ্রাপ্ত কোন অবৈধ মাল আছে কি? তাহলে তা বাইতুলমালে জমা দিয়ে দাও। এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন– আমার নিকট তিন দিরহাম আছে। নবী করিম ﷺ বললেন– তুমি কেন তা নিয়েছিলে? ঐ সাহাবী উত্তর করলেন- আমি খুবই দরিদ্র। তাই নিয়েছিলাম। নবী করিম ﷺ ফযল রা.কে তা আদায় করে নিতে নির্দেশ দিলেন। নবী করিম ﷺ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন- কারও মনে কিছু ঈমানী দুর্বলতা থাকলে বলো- আমি দোয়া করবো। একজন লোক সামনে এগিয়ে এসে বললো- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন মুনাফিক, মিথ্যাবাদী ও দুরাচার। তার কথা শুনে হযরত ওমর রা. বললেন– তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি নিজের দোষ খোলাখোলি না বললেও পারতে! আল্লাহ্ তোমাকে গোপনে ক্ষমা করে দিতেন। নবী করিম ﷺ হযরত ওমরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন- "দুনিয়ার অপমান পরকালের অপমানের তুলনায় অনেক তুচ্ছ। হে আল্লাহ্! তুমি তাকে সততা ও ঈমান দান করো"। তারপর হযরত ওমরকে শান্তনা দিয়ে বললেন- ওমর আমার সাথে এবং আমিও ওমরের সাথে আছি। আমার পর "সত্য ওমরের সাথী হবে"। ভাষণ শেষ করে সবার থেকে বিদায় নিয়ে তিনি হুজরা মোবারকে চলে গেলেন। এরপর থেকে হযরত আবু বকর রা. নামাযে ইমামতি করতে লাগলেন। বৃহস্পতিবার আছর থেকে সোমবার ফজর পর্যন্ত তিনি একাধারে ১৯ ওয়াক্ত নামাযে ইমামতি করেন। তখন থেকে নবী করিম ﷺ নিজ হুজরায় একাকী নামায পড়তেন।[১১১]

খেলাফতের ইঙ্গিত:

হযরত আবু বকর রা. মোট ১৯ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করেন: ৮ই রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার যোহরের নামাযান্তে নবী করিম ﷺ হুজরা মোবারকে চলে আসেন। ঐ দিন আছরের নামায থেকে ১২ তারিখ সোমবার ফযরের নামায পর্যন্ত মোট ১৯ ওয়াক্ত নামাযে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ইমামতি করেন।

একদিন হযরত আবু বকর রা. এর বিলম্ব হলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জামআ রা. হযরত ওমর রা.কে ইমামতি করতে বলেন। যখন ওমর রা.

---

[১১১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৭।

উচ্চস্বরে তাকবীর দিয়ে নামায আরম্ভ করেন, তখন নবী করিম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন- আবু বকর কোথায়? আল্লাহ এবং মুসলমানগণ আবু বকর ছাড়া অন্য কাউকে গ্রহণ করবে না। এভাবে দুবার বললেন। অত:পর হযরত আবু বকর রা. এর কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে আনা হলো এবং পুনরায় হযরত আবু বকর রা.কে দিয়ে নবী করিম ﷺ দ্বিতীয়বার নামায আদায় করান। এ ব্যাপারে হযরত ওমর রা. আবদুল্লাহ ইবনে জাম্‌আ রা.কে খুব শাঁসালেন এবং বললেন- আমি মনে করেছি- তুমি নবী করিম ﷺ'র নির্দেশেই আমাকে নামায পড়ানোর জন্য বলেছিলে। আবদুল্লাহ ইবনে জাম্‌আ রা. বললেন- না, নবী করিম ﷺ নির্দেশ করেননি- বরং আবু বকর রা.কে অনুপস্থিত দেখে উপস্থিত মুসল্লীগণের মধ্যে আপনাকেই সর্বাধিক উপযুক্ত মনে করে আমি নিজেই আপনাকে নামায পড়ানোর অনুরোধ করেছিলাম (ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ)। নবীজীর বর্তমানে অন্য কেউ হুকুম দিতে পারে না।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন- "এশার নামাযের সময় হলে হযরত বেলাল রা. আযান দিলেন। নবী করিম ﷺ এরশাদ করলেন- আবু বকরকে নামায পড়াতে বলো। হযরত আয়েশা রা. আরয করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আবু বকর রা. খুবই শোকে কাতর। আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি ইমামতি করা সহ্য করতে পারবেন না– বরং অন্য কাউকে দিয়ে নামায পড়ান। নবী করিম ﷺ পুনরায় বললেন- আবু বকরকে বলো ইমামতি করার জন্য। এভাবে তিনবারের সময় বললেন- তোমরা হযরত ইউসুফ আ.'র সাথে মিশরীয় মহিলাদের ন্যায় আমার সাথে আচরণ করছো। যাও, আবু বকরকে বলো- নামায পড়াতে। অত:পর হযরত আবু বকর রা. নামায পড়াতে দাঁড়ালেন। নবী করিম ﷺ শরীর কিছুটা হাল্কা অনুভব করলেন। হযরত আব্বাস রা. ও হযরত আলী রা. এর কাঁধে ভর দিয়ে তিনি হুজরা মোবারক থেকে বের হলেন। কিন্তু তাঁর পা মোবারক মাটিতে হোঁচট খাচ্ছিল। হযরত আবু বকর রা. টের পেয়ে পিছিয়ে আসতে চাইলেন। নবী করিম ﷺ তাঁকে ইশারায় ডান পার্শ্বে দাঁড় করিয়ে নিজে অবশিষ্ট নামায বসে বসে আদায় করলেন। হযরত আবু বকর রা. মোকাব্বির হয়ে নামায আদায় করলেন।

[এটি কোন্ নামায ছিল? হযরত আয়েশা রা. এর বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে- এটি ছিল এশার নামায্ কিন্তু অন্য একটি বর্ণনা মতে এটি ছিল যোহরের নামায। ইবনে কাছির বলেন– এটি ছিল শেষ বৃহস্পতিবার যোহর নামাযের ঘটনা। কেননা, এরপর নবী করিম ﷺ আর মসজিদে যেতে পারেননি।[১১২]

[১১২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

১২ই রবিউল আউয়াল: ফজরের শেষ নামায:

সোমবার ফজরের নামাযের সময় নবী করিম ﷺ জানালার পর্দা সরিয়ে সর্বশেষ জামাতের দৃশ্য দেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। সাহাবায়ে কেরাম টের পেয়ে নামায ছেড়ে দেওয়ার মত অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু বকর রা. পিছনে সরে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন সময় নবী করিম ﷺ হাতে ইশারা দিয়ে তাঁকে বারণ করে জানালার পর্দা ফেলে দেন। ঐ নামাযের মধ্যে সাহাবীগণ নবীজীর সম্মানকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

নামায জামাতে শেষ করে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বিবি আয়েশার গৃহে প্রবেশ করেন এবং বলেন- মনে হয়- নবী করিম ﷺ আজ অনেক সুস্থ, অসুক অনেক কমে গেছে। আমাদের দিকে চেয়ে তিনি হেসেছেন। মুসল্লিগণসহ আমরা সকলেই হুযুরের হাসি দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি। এমন কি- আমাদের নামায ছেড়ে দেয়ারও উপক্রম হয়েছিল। একথা বলে তিনি মদিনার অদূরে নিজ স্ত্রীর গৃহের দিকে রওনা হন। মদিনা শরীফের পূর্বপ্রান্তে তাঁর এক বিবি বিনতে খারেজা রা. বাস করতেন। মহল্লাটির নাম ছিল সানাহ্। তিনি ঘোড়ায় চড়ে সেদিকে রওনা দিলেন।[১১৩]

শেষ দিনের ঘটনা:

১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর গৃহে নবী করিম ﷺ অবস্থানরত। বেলা যতই বাড়তে লাগলো- নবী করিম ﷺ'র জ্বর ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। কন্যা হযরত ফাতেমা রা. এবং অন্যান্য বিবিগণ এসে উপস্থিত। নবী করিম ﷺ'র অবস্থার পরিবর্তন দেখে হযরত ফাতেমা রা. কাঁদতে লাগলেন। নবী করিম ﷺ তাঁকে শান্তনা দিয়ে বললেন- "মা! কেঁদোনা! আজকের পর তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট থাকবে না"।

একথা শুনে হযরত ফাতেমা রা. ডুকরে কেঁদে উঠলেন। স্নেহময় পিতা এবার হযরত ফাতেমাকে টেনে নিজের কাছে নিলেন এবং কানে কানে কিছু কথা বললেন। হযরত ফাতেমা রা. একটু করুণ হাসি হাসলেন। হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে পরবর্তীতে তিনি বলেছিলেন- নবী করিম ﷺ তাঁকে শান্তনা দিয়ে বলেছিলেন- "তুমি অচিরেই আমার পরিবারবর্গের মধ্যে প্রথমে আমার সাথে মিলিত হবে। তুমি বেহেশতের নারীদের সর্দার হবে"। নবী করিম ﷺ'র এ আগাম সংবাদটি ছিল মৃত্যু সম্পর্কীয় ইলমে গায়েব। ঠিক ছয় মাসের মাথায় নবী পরিবারের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইন্তিকাল করেন। এই ছয় মাসের মধ্যে কেউ তাঁকে কোনদিন হাসতে দেখেননি।

[১১৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

সকালবেলা নবী করিম ﷺ'র অসুখ বৃদ্ধির কথা দাবানলের মত মদিনায় ছড়িয়ে পড়ে। সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে এসে সমবেত হন। হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী রা. হুজরা মোবারকে প্রবেশ করে নবী করিম ﷺ কে সালাম দিয়ে পবিত্র শরীরে হাত রেখে বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! জ্বরের তাপে আপনার পবিত্র শরীরে হাত রাখা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। এমন কঠিন অবস্থায়ও নবী করিম ﷺ এরশাদ করলেন– "আমরা নবীগণের পুরস্কার যেমন দ্বিগুণ, তদ্রূপ পরীক্ষাও দ্বিগুণ। নবীগণ সুখের সময় যেমন আনন্দিত, তদ্রূপ পরীক্ষাকালেও আনন্দিত"।

নবী করিম ﷺ'র পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারেছা রা. ৮ম হিজরিতে মুতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র হযরত উসামা রা.কে নবী করিম ﷺ অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি বলেন- আমি যুদ্ধের সেনাপতি হয়ে নবী করিম ﷺ'র নির্দেশে সিরিয়ার পথে রওয়ানা দিয়ে দিলাম। হুযুর ﷺ'র অবস্থার পরিবর্তনের কথা শুনে রাস্তা হতে ফিরে আসলাম এবং নবীজীর খেদমতে হাযির হলাম। তখন নবী করিম ﷺ কথা বলতে পারছিলেন না। তিনি শুধু হাত মোবারক আসমানের দিকে উত্তোলন করে পুনরায় মুখে মালিশ করলেন। আমি বুঝতে পারলাম– তিনি আমার জন্য নীরবে দোয়া করছেন।[১১৪]

হযরত আয়েশা রা. নবী করিম ﷺ'কে বুকে নিয়ে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। নবী করিম ﷺ ক্ষণে ক্ষণে নিকটে সংরক্ষিত পাত্র থেকে পানি নিয়ে মুখে মালিশ করছিলেন আর বলছিলেন- "মৃত্যুর যন্ত্রণা সত্যিই কষ্টদায়ক"। এই কঠিন সময়ের মধ্যেও উম্মতকে লক্ষ্য করে তিনি কতিপয় ওসিয়ত বা শেষ উপদেশ দিয়ে যান। তিনি এরশাদ করেন: "তোমরা নামাযের পাবন্দী করবে এবং দাস-দাসীদের প্রতি সদয় হবে"।

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত ছিল দাস-দাসী। শেষ সময়েও নবী করিম ﷺ'র দৃষ্টি সেই অবহেলিত মানুষের দুর্দশার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি ছিলেন মানবতার মুক্তিদূত। আল্লাহর হক্ক নামায এবং বান্দার হক্ক সেবা-এই দুটি নীতির প্রতি তিনি সর্বশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আমরা আজ উভয়টিকে ভুলতে বসেছি।

পিতা মাতার সর্বশেষ ওসিয়ত সন্তানগণ প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে। কিন্তু আমরা উম্মত হয়ে নবীজীর শেষ ওসিয়ত ভঙ্গ করছি। সেকারণেই আজ আমরা অধঃপতিত। নামায আমাদের জন্য ভারী বোঝা স্বরূপ। আর দুর্বলদের শোষণ করা আমাদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়েছে। ইমাম মালেক র. মোয়াত্তায় লিখেন–

[১১৪]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, সূত্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

"নবী করিম ﷺ'র আখেরী উপদেশের মধ্যে এটিও ছিল যে, পূর্ববর্তী ইহুদী ও নাছারাগণ তাদের নবী ও বুযুর্গগণের মাযারকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছিল। তারা মাযারকে সিজদা করতো। তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। তারা যা করতো, তোমরা তা করোনা। (মাযারে সিজদা করা হারাম- শুধু চুম্বন করা বৈধ)। আরব উপদ্বীপে দুটি ধর্ম একসাথে অবস্থান করবেনা। ইয়াহুদ নাছারাদেরকে জাযিরাতুল আরব থেকে বের করে দাও"।[১১৫]

ওফাত: আল্লাহর যখন ইচ্ছা হলো নবী করিম ﷺ কে আপন সান্নিধ্যে তুলে নেবেন, তখন হযরত আযরাঈলকে বললেন- "তুমি উত্তম সূরতে আমার প্রিয় হাবীবের খেদমতে হাযির হয়ে প্রথমে আমার সালাম দিয়ে বলবে যে, তুমি তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছো এবং তাঁর অনুমতি পেলেই তাঁর রূহ্ মোবারক কব্‌য করবে"।

হযরত আযরাঈল আ. নির্দেশ মোতাবেক উত্তম সূরত ধারণ করে হযরত আয়েশা রা. এর হুজরার দরজায় এসে দাঁড়ালেন এবং নবী পরিবারবর্গকে সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। এই আওয়ায হুযুর পাক ﷺ'র কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র তিনি হযরত ফাতেমা রা.কে আগন্তুকের পরিচয় জানার জন্য পাঠালেন। হযরত ফাতেমা রা. ফিরে এসে বললেন– দরজায় এক ভয়ঙ্কররূপী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। নবী করিম ﷺ বললেন–

هٰذَا هَادِمُ اللَّذَّاتِ – هٰذَا مُخْمِدُ الصَّوْتِ- هٰذَا مَلَكُ الْمَوْتِ- "মা ফাতেমা! ইনি মানুষের সমস্ত স্বাদ আহলাদ হরণকারী, ইনি মানুষের কণ্ঠ রোধকারী, ইনি মালাকুল মউত"।

অত:পর তিনি আযরাঈল আ.কে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। হযরত ফাতেমা রা. মানুষের বেশে আযরাঈলকে দেখে নিলেন। এরপর অদৃশ্যভাবে আযরাঈল আ. ভিতরে এসে নবী করিম ﷺ কে সালাম দিলেন এবং বললেন– "আল্লাহ্ আপনাকে সালাম দিয়েছেন। আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি। আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত যেন আপনার রূহ্ মোবারক কব্‌জ না করি"। একথা শুনে হুযুর ﷺ বললেন– "তুমি বসো, আমার ভাই জিবরাঈল আসুক"। আযরাঈল বসে রইলেন।

এমন সময় হযরত জিবরাঈল আ. এসে বললেন– "আলবেদা; ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিচ্ছেদের সময় সমাগত, প্রস্থানের সময় নিকটবর্তী, আপনার প্রভু আপনার প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান"। নবী করিম ﷺ বললেন, "হে ভাই জিবরাঈল!

[১১৫]. মোয়াত্তা ইমাম মালেক, সূত্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০-১৯১।

আযরাঈল আমার রূহ্ কব্জ করার অনুমতি চাচ্ছে। আমি ২৩ বৎসর যাবৎ আমার উম্মতের দেখা শুনা করেছি এবং তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিয়েছি। আমার পর উম্মতের জিম্মাদার কে হবে"? একথা শুনে জিবরাঈল অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আবার মুহূর্তের মধ্যে দৃশ্যমান হয়ে বললেন– "আল্লাহ্ আপনাকে সালাম দিয়ে বলছেন, আপনার পর তিনিই আপনার উম্মতের জিম্মাদার হবেন। কুরআন মজিদে তো আল্লাহ পাক আপনাকে রাযী ও সন্তুষ্ট করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (সূরা দোহা)! অতএব, আপনি সন্তুষ্ট চিত্তে রাজী হোন"।

এ সময় নবীজীর সম্মানে ইসমাঈল ফেরেশতা এক হাজার কোটি ফেরেশতা নিয়ে হাযির হলেন (বায়হাকী)। অত:পর নবী করিম ﷺ আযরাঈল আ.কে রূহ্ কব্জ করার অনুমতি প্রদান করলেন। যখন ইন্তিকাল-ক্রিয়া শুরু হয়, তখন নবী করিম ﷺ আযরাঈল আ.কে বললেন– "আর একটু সহজভাবে জান কব্জ করো"। আযরাঈল আ. বললেন- আল্লাহর সমস্ত প্রাণীকূলের মধ্যে আপনার রূহ্ মোবারকই সবচেয়ে সহজভাবে কব্য করার জন্য আমি নির্দেশ পেয়েছি। নবী করিম ﷺ উম্মতের মৃত্যু কষ্ট স্মরণ করে বলে উঠলেন– "তাহলে আমার উম্মতের মউতের সমস্ত কষ্টই আমাকে দিয়ে দাও"।

একথা বলেই নবী করিম ﷺ মেসওয়াক করা অবস্থায় বিবি আয়েশা রা. এর বুকে মাথা মোবারক এলিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করলেন–

"আল্লাহুম্মা বির রাফীক্বিল আ'লা"– "আমার প্রিয়তম বন্ধুর সান্নিধ্যে- হে আল্লাহ"! একথা বলেই তাঁর পবিত্র রূহ্ আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন এবং তিনি বেছাল প্রাপ্ত হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে তখন সময়টি ছিল দ্বিপ্রহরের পূর্বে চাশ্ত-এর নামাযের সময়। দিনটি ছিল সোমবার। মাস ছিল রবিউল আউয়াল। তারিখ ছিল প্রসিদ্ধ ও অধিকাংশ বর্ণনাকারীদের মতে ১২ই রবিউল আউয়াল।[১১৬] কাযী আয়ায শিফা শরীফে নবীজীর বৈশিষ্ট্য অধ্যায়ে বর্ণনা করেন– "মউত ও মউতের সময়কে নবী করিম ﷺ'র এখতিয়ারাধীন করা হয়েছে। অন্য কাউকে এ বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়নি"।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন– হে প্রিয় রাসূল! "আপনার ইন্তিকাল হবে একপ্রকার (ক্ষণিকের জন্য) এবং অন্যদের মৃত্যু হবে অন্যপ্রকার।"[১১৭]

[১১৬]. বেদায়া ও নেহায়া-ইবনে কাছির, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৬, ছাপাখানা মাকতাবাতুল মাআরেফ ১৯৮৮ইং। সূত্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।

[১১৭]. ২৩ পারা, সূরা যুমার, আয়াত: ৩০

সালেম ইবনে ওবায়দ রা. নামে জনৈক সাহাবী নবী করিম ﷺ'র ইন্তিকালের সংবাদ নিয়ে সানাহ্ গমন করেন এবং হযরত আবূ বকর রা.কে সংবাদ দেন। সংবাদ পেয়ে তিনি ছুটে আসেন এবং হুজরায় প্রবেশ করে নবী করিম ﷺ'র চেহারা মোবারকের কাপড় সরিয়ে কেঁদে ফেলেন। তিনি তিনবার হুযুরের ললাটে চুম্বন করেন (বেদায়া-নেহায়া)।

আল্লামা তাকিউদ্দিন সুবুকী রহ. "শিফাউস সিকাম" গ্রন্থে বলেন– "হুযুর ﷺ'র দাফনের পর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রূহ্ মোবারক দেহ মোবারকে ফিরত পাঠিয়ে দেন। তাই তিনি কিয়ামত পর্যন্ত হায়াতুন্নবী"। কাজেই তাঁর মৃত্যুদিবস পালন করা অবৈধ।[১১৮]

রাসূল ﷺ'র ইন্তেকালে পৃথিবীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি গোলাম মোস্তফা বলেন, "রাসূল নাই! রাসূল নাই! ধরণীর অন্তস্থল হইতে একটা অস্ফুট আর্তনাদ উত্থিত হইয়া আকাশ-বাতাসকে উতলা করিয়া তুলিল। এতদিন যাহাকে পাইয়া বিশ্ব প্রকৃতি শান্ত হইয়াছিল, আজ আবার তাঁহাকে হারাইয়া সে হাহাকার করিতে লাগিল। মিলনোৎসবের প্রধান অতিথি চলিয়া গেলে সভাগৃহ যেমন নিষ্প্রভ হইয়া যায়, চমনবাগিচা হইতে বুলবুল উড়িয়া গেলে যেমন করিয়া তরুপল্লবে বিরহ ঘনায়, বিশ্ব ধরণীরও আজ সেই দশা হইল। যাঁহার আগমনে তোরণে-তোরণে একদিন বাঁশি বাজিয়াছিল, নানা পত্রপুষ্পে যাঁহাকে আনন্দিত করা হইয়াছিল, দিকে দিকে আনন্দমেলা বসিয়াছিল, সেই সম্মানিত প্রধান অতিথি আজ চলিয়া গেলেন, উৎসব ভূমি আজ মলিন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। স্থলে-জলে, লতায়-পাতায়, ফুলে-ফলে, তৃণে-তৃণে শোকের ছায়া নামিল। সমস্ত হাসি-গান থামিয়া গেল, দিকে দিকে শুধুই একটা করুণ ক্রন্দনের সুর শুনা যাইতে লাগিল। মেষশিশুরা তৃণমুখে দিয়া হঠাৎ ব্যথার সুরে কাঁদিয়া উঠিল, মরু পথে চলিতে চলিতে উটেরা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়া মদিনা পানে মুখ তুলিয়া জল ছলছল নয়নে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বাগিচা হইতে বুলবুল উড়িয়া গেল; ফুলদল ঝরিয়া পড়িল; পাখিরা গান ভুলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল; সমীরণ গতি হারাইল! 'লু'-হাওয়া ধ্বনীর অর্ন্তদাহ বহন করিয়া মরুদিগন্ত হাহাকার করিয়া ফিরিতে লাগিল। উদাসীন বেদুঈন তাহার বল্লম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। অশ্ব পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিমর্ষভাবে বারে বারে হ্রেষারব করিতে লাগিল; জড়চেতনে আজ এমনি করিয়া শোকের মাতম উঠিল। সকলেই মনে

[১১৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।

করিতে লাগিল কী যেন তাহার নাই, কী যেন সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে, কোথায় যেন খনিকটা শূন্য হইয়া গিয়াছে।[১১৯]

গোসল ও কাফন-দাফনঃ

নবী করিম ﷺ অসুস্থ অবস্থায়ই নিজের ইন্তিকাল পরবর্তীকালের সমস্ত অনুষ্ঠানাদির বিস্তারিত বিবরণ অগ্রিম বলে যান। কখন ইন্তিকাল হবে, কে গোসল দেবে, কোন্ দেশীয় কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হবে, কোন্ স্থানের পানি দিয়ে গোসল করানো হবে, কে প্রথম জানাযার সালাত আদায় করবে, কোন্ ধরনের জানাযা বা সালাত পড়া হবে, কে হুযুর ﷺ'কে রওযা মোবারকে নামাবে- ইত্যাদি বিষয়ে হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর প্রশ্নের জবাবে নবী করিম ﷺ অগ্রিম বলে গেছেন। ইমাম বায়হাকী কর্তৃক সংগৃহীত ইবনে মাসউদ রা. বর্ণিত ইলমে গায়েব সম্বলিত এই হাদীসখানা ইবনে কাছির- ইবনে তাইমিয়ার অনুসারী হয়েও, আল বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন- তার অনুবাদ নিম্নে পেশ করা হলো।

হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনা :

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন- যখন নবী করিম ﷺ অসুস্থতার কারণে দূর্বল হয়ে পড়লেন, তখন আমরা কতিপয় ঘনিষ্ট সাহাবী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর গৃহে একত্রিত হলাম। আমাদেরকে দেখে নবী করিম ﷺ'র দুচোখ পানিতে ভরে উঠলো। তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন- "বিদায়কাল অতি নিকটবর্তী। তোমাদের আগমন শুভ হোক। আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তমভাবে জীবিত রাখুন। আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়াত দান করুন। তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করুন। তোমাদেরকে উপকৃত করুন। তোমাদেরকে উত্তম কাজের তৌফিক দিন। দ্বীনের পথে তোমাদেরকে দৃঢ় রাখুন। তোমাদেরকে তিনি হেফাযত করুন। তোমাদেরকে সাহায্য করুন। তোমাদেরকে কবুল করুন। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর প্রতি ভয়-ভীতির জন্য অসিয়ত করে যাচ্ছি। আমার ইন্তিকালের পর তোমাদের জন্য আল্লাহকে হেফাযতকারী রেখে গেলাম। আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহর বান্দার ব্যাপারে এবং আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করবে না"।

তারপর তিনি পরকালের শান্তি ও শাস্তি সম্পর্কিত দুটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমরা আরয করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ!

১১৯. কবি গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, খণ্ড-১, পৃ. ২৬৩।

আপনার ইন্তিকাল কখন হবে? উত্তরে নবী করিম ﷺ বললেন "নির্ধারিত সময় নিকটবর্তী। উত্তম বিছানা, পরিপূর্ণ পানপাত্র, সিদরাতুল মোন্তাহা এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের সময় ঘনিয়ে আসছে"।

আমরা পুনরায় আরয করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে গোসল দেবে কে? হুযুর ﷺ বললেন- "আমার আহলে বাইতের পুরুষগণ; অতি নিকটজন, তারপর ক্রমান্বয়ে অন্যরা। সাথে থাকবে অনেক ফেরেশতা। তারা তোমাদেরকে দেখেন, কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখোনা"।

আমরা আরয করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ ধরনের কাপড় দিয়ে আপনার কাফন পরানো হবে? এরশাদ করলেন, "আমার পরিধানের জামা দ্বারা এবং ইয়ামেন দেশীয় কাপড় দ্বারা অথবা মিশরীয় সাদা কাপড় দ্বারা"।

আমরা আরয করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে আপনার উপর সালাত বা জানাযা আদায় করবে? একথা শুনে তিনি কাঁদলেন। আমরাও কাঁদলাম। অত:পর তিনি বললেন- "এ প্রসঙ্গ বাদ দাও। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তোমাদের নবীর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে তিনি উত্তম পুরস্কার দান করুন। শুন! যখন তোমরা আমাকে গোসল দিয়ে সুগন্ধি লাগাবে এবং কাফন পরাবে, তখন তোমরা আমাকে আমার রওযার কিনারে রেখে কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যাবে। কেননা, এ সময়ে আমার দুই বন্ধু-জিব্রাঈল ও মিকাঈল, এরপর ইস্রাফীল, তারপর মালাকুল মউত অন্যান্য ফেরেশতাগণকে সাথে নিয়ে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। এরপর প্রথমে আমার আহলে বাইত বা পরিবারবর্গের পুরুষেরা আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে। এরপর আমার পরিবারের মহিলাগণ দুরূদ পড়বে। এরপর তোমরা ভাগে ভাগে আমার গৃহে প্রবেশ করে দুরূদ পড়বে অথবা একা একা এসে দুরূদ পড়বে। রোনাজারীকারিনী কোন মহিলা দ্বারা আমাকে কষ্ট দিও না। আমার যেসব সাহাবী উপস্থিত হতে পারবে না- তাদের কাছে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিও। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি- যারা ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত করবে- যারা আমার দ্বীনের বিষয়ে আমার অনুসরণ করবে, আমি তাদের সকলকে সালাম দিয়ে গেলাম"।

আমরা পুনরায় আরয করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে আপনাকে রওযা মোবারকে নামাবে? নবী করিম ﷺ এরশাদ করলেন- "আমার পরিবারস্থ পুরুষ লোকজন, নিকটতম ব্যক্তি, তারপর ক্রমানুসারে অন্যরা। সাথে অনেক ফেরেশতা প্রবেশ করবে- যারা তোমাদেরকে দেখছেন, কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছো না"।[১২০]

১২০. বায়হাকী সূত্রে আলবেদায়া ও নেহায়া, ৫ম খণ্ড, ২৫৩পৃ.।

দাফনে বিলম্বের কারণঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করিম ﷺ'র গোসল ও কাফন-দাফনের পূর্বে খলিফা নির্বাচন করা ছিল রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ। খলিফা নির্বাচনের পূর্বে এসব কাজ কার নেতৃত্বে করা হবে- এ নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তদুপরি, খলিফা নির্বাচন না করে কাফন-দাফন করে ফেললে প্রশাসনে শূন্যতা দেখা দিবে। তাই খলিফা নির্বাচন করা ছিল প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দাফন বিলম্বের ইহাই একমাত্র কারণ। সোমবারের অর্ধদিন এবং মঙ্গলবারের প্রথমভাগে উক্ত রাষ্ট্রীয় কাজ সমাধা করে হযরত আবু বকর রা. এর নেতৃত্বে এবং তাঁর আদেশে গোসল ও কাফন-দাফনের দিকে মনোযোগ দেয়া হয়। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেছেন, "নবীগণ যেস্থানে ইন্তিকাল করেন-সেখানেই তাঁদেরকে দাফন করা হয়"।

সে মোতাবেক হযরত আবু বকর রা. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর হুযরার ভিতরে রওযা মোবারক তৈরীর নির্দেশ দিলেন। হযরত আব্বাস রা. মদিনা শরীফের আবু তাল্‌হা ইবনে সহল আনসারী রা.কে রওযা মোবারক খনন করার জন্য আনয়ন করেন। তিনি মদিনাবাসীদের অনুকরণে বগলী কবর খনন করেন এবং উপরে কাঁচা ইটের টাইল্‌স্ দ্বারা রওযা মোবারককে আবৃত করেন।

গোসল মোবারকঃ

হযরত আলী রা., হযরত আব্বাস রা., তাঁর ছেলে হযরত ফযল রা., অপর ছেলে কুসাম রা., নবী করিম ﷺ'র পালিত পুত্রের ছেলে হযরত উসামা রা. এবং তাঁর আশ্রিত হযরত সালেহ রা. গোসল দেওয়ার জন্য নির্ধারিত হলেন। মদিনার জনৈক আনসার সাহাবী হযরত আউছ ইবনে আওলা রা. হযরত আলীর রা. অনুমতি নিয়ে গোসলে শরীক হন। নবী করিম ﷺ'র পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক কোবার 'গারছ' নামক কূপ থেকে পানি আনা হলো। পানির সাথে বরই পাতা ও কাপুর দেয়া হলো।

গোসলের সময় শরীর মোবারক থেকে পরিধানের কাপড় পৃথক করা হবে কিনা- এ নিয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হলো। হঠাৎ করে তাঁদের মধ্যে তন্দ্রার ভাব দেখা দিল। এমতাবস্থায় তাঁরা শুনতে পেলেন-কে যেন বলছে- "নবী করিম ﷺ'র বদন মোবারক থেকে কাপড় সরানো যাবে না"। তাই করা হলো। কাপড়ের উপরেই পানি ঢেলে হযরত আলী রা. ডান হাত দিয়ে ধৌত করে দিলেন। নবী করিম ﷺ'র নির্দেশ ছিল- "আলী ছাড়া অন্য কেউ যেন আমাকে গোসল না দেয়"। সেমতে হযরত আলী রা. একা গোসলের কাজ সামাধা করেন। হযরত আব্বাস, ফযল ও কুসাম পিতা-পুত্রগণ নবী করিম ﷺ'র দেহ

মোবারক এদিক সেদিক ডান-বাম করানোর কাজে সহায়তা করেন। পানি ঢালার কাজে সহায়তা করেন উসামা ও সালেহ; মতান্তরে উসামা ও আব্বাস রা.। হযরত আলী রা. বলেন– মৃত ব্যক্তির মলমূত্র পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু নবী করিম ﷺ'র ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। কেননা, তিনি ইন্তিকালের পূর্বে ও পরে-সর্বাবস্থায়ই পাক পবিত্র ছিলেন। হযরত আলী রা. ডান হাত দিয়ে হুযুর ﷺ'র শরীর মোবারক ধৌত করেছিলেন। এর বরকতে তাঁর ডান হাতে সব সময় আতরের মত সুগন্ধি পাওয়া যেত (সুবহানাল্লাহ)।

কাফন মোবারকঃ

নবী করিম ﷺ কে গোসল দেয়ার পর কাফন মোবারক পরিধান করা হয়। চেহারা মোবারক, কনুই মোবারক, হাঁটু মোবারক এবং প্রতি অঙ্গের জোড়ায় জোড়ায় কাপুর লাগানো হয়। তারপর তিনখানা কাপড় দিয়ে কাফন পরানো হয়। হযরত আয়েশা রা., হযরত আবদুল্লাহ রা., হযরত ফযল রা. ও হযরত আলী রা. থেকে কাফনের কাপড়ের নমুনা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, নবী করিম ﷺ তিন ধরনের কাপড়ের মধ্যে যে কোন কাপড় দিয়ে কাফন দেয়ার কথা পূর্বেই বলে গেছেন- কাফনের কাপড় হবে ইয়েমেনের তৈরী অথবা মিশরীয় সাদা কাপড়। সে মতে দু'খানা সাদা কাপড় এবং হুযুর ﷺ'র নিজ গায়ের জামা মোবারক দিয়ে কাফন পরিধান করানো হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা মতে হুযুর ﷺ'র ইন্তিকালের সময় গায়ের জামা এবং ইয়েমেন দেশীয় দু'খানা কাপড় (একজোড়া) দিয়ে হুযুর ﷺ কে কাফন পরিধান করানো হয়। পাগড়ী পরিধান করানো হয়নি। হযরত আলী রা. বলেন– আমি নিজ হাতে হুযুর আকরাম ﷺ কে দু'খানা সাদা কাপড় ও একখানা চাদর দ্বারা কাফন পরিধান করিয়েছি। হযরত আয়েশা রা. এর রেওয়ায়াত মোতাবেক তিনখানা সাদা 'সাহুলী' কাপড় দ্বারা কাফন পরানো হয়। ফযল রা. এর বর্ণনা মতে দু'খানা সাদা সাহুলী কাপড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। মোটকথা নিজ জামাসহ তিনখানা কাপড়েরই উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২১]

জানাযার ধরণঃ

নবী করিম ﷺ'র ক্ষেত্রে জানাযার বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল। হুযুর ﷺ'র বেলায় কোন ইমাম ছিলনা। মোক্তাদীও ছিলনা। কেবলামুখী হওয়াও ছিলনা। হাদীস শরীফে শুধু সালাত শব্দের উল্লেখ আছে। এখানে সালাত অর্থ

---

[১২১]. অধ্যক্ষ এম এ জলিল র., নূর নবী, পৃ. ১৯৯-২০১।

দোয়া ও দুরূদ। ইবনে মাসউদ রা. এর প্রতি নবী করিম ﷺ যে অসিয়ত করে গেছেন, সে অনুযায়ী সাহাবীগণ নবী করিম ﷺ'র হুজরা মোবারকে প্রবেশ করে রওযা মোবারকের কিনারায় রক্ষিত খাটের কাছে গিয়ে দুরূদ ও সালাম পেশ করে বের হয়ে আসতেন। একদল বের হওয়ার পর আর এক দল প্রবেশ করতেন এবং দুরূদ ও সালাম পেশ করতেন। এভাবে প্রথমে পুরুষগণ, তারপর মহিলাগণ, তারপর ছোট ছোট বালকগণ, তারপর আশ্রিত দাস-দাসীগণ ও মাওয়ালীগণ ব্যক্তিগতভাবে হুজরায় প্রবেশ করে দুরূদ ও সালাম পেশ করেছিলেন। সাধারণ জানাযা নামায হলে মহিলাগণ অংশগ্রহণ করতে পারতেন না।

আল্লামা সোহায়লী রহ. বলেন- আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদের সূরা আহ্যাবে যেভাবে দুরূদ ও সালাম পড়ার জন্য মোমেনগণকে নির্দেশ করেছেন, ইন্তিকালের পরও অনুরূপভাবেই শুধু দুরূদ ও সালাম পেশ করা হয়েছিল।[১২২]

মাওয়াহিব-লাদুন্নিয়া গ্রন্থে আল্লামা শিহাবুদ্দীন কাস্‌তুলানী শারেহে বোখারী রহ. উল্লেখ করেছেন–

وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ النَّاسُ اَفْوَاجًا اَفْوَاجًا بِغَيْرِ اِمَامٍ وَبِغَيْرِ دُعَاءِ الْجَنَازَةِ الْمَعْرُوْفِ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.

অর্থ: "নবী করিম ﷺ'র অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটিও একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে, লোকেরা দলে দলে এসে ইমাম ছাড়াই দুরূদ পাঠ করতেন। তাঁরা প্রচলিত জানাযার দোয়া ও তাকবীর পড়েননি। ইমাম বায়হাকী ও অন্যান্য মোহাদ্দিসগণ এরূপই বর্ণনা করেছেন"।[১২৩] হুযুর ﷺ হায়াতুন্নবী, সেজন্যই প্রচলিত জানাযা হয়নি।

হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রা. কর্তৃক জানাযা সালাতের ধরণ:

হযরত আবু বকর রা. এবং হযরত ওমর রা. কিভাবে জানাযার পরিবর্তে শুধু দুরূদ ও সালাম পাঠ করেছিলেন– তার একটি পরিষ্কার বর্ণনা আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থের ৫ম খণ্ড ২৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় সাহাবীর আমল মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম নামে জনৈক রাবী লিখে রেখেছিলেন। ওয়াকেদী ঐ দলীলখানার ভাষ্য এভাবে বর্ণনা করেছেন–

لَمَّا كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضِعَ عَلٰى سَرِيْرِهٖ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَعَهُمَا نَفَرٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ الْبَيْتُ فَقَالَا :

১২২. আলবেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৫ম খণ্ড, ২৬৫ পৃ.।

১২৩. আনওয়ারে মোহাম্মদীয়া মিন মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া, পৃ.-৩২০।

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ كَمَا سَلَّمَا اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ، ثُمَّ صَفُّوا صُفُوفًا لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ وَ عُمَرُ وَهُمَا فِى الصَّفِّ الْأَوَّلِ حِيَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَشْهَدُ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ وَنَصَحَ لِاُمَّتِهٖ وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى اَعَزَّاللهُ دِيْنَهُ وَتَمَّتْ كَلِمَتُهُ وَ اُوْمِنَ بِهٖ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ فَاجْعَلْنَا اِلٰهَنَا مِمَّنْ يَّتَّبِعُ الْقَوْلَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهُ وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتّٰى تَعْرِفَهَا بِنَا وَتَعْرِفَنَا بِهٖ فَاِنَّهُ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفًا رَّحِيْمًا لَانَبْتَغِىْ بِالْاِيْمَانِ بِهٖ بَدِيْلًا وَنَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا اَمَدًا فَيَقُوْلُ النَّاسُ: اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ وَيَخْرُجُوْنَ وَيَدْخُلُ اٰخَرُوْنَ حَتّٰى صَلَّى الرِّجَالُ ثُمَّ النِّسَاءُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ–

অর্থ: "নবী করিম ﷺ'কে কাফন পরিধানের পর খাঁটের উপর রেখে ঐ খাঁট (হুজরার ভিতর) রওযা মোবারকের পার্শ্বে রাখা হলো। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রা. হুজরার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী কয়েকজন মোহাজির ও আনসারকে সাথে নিয়ে প্রবেশ করলেন। তাঁরা দু'জনে প্রথমে এভাবে সালাম আরয করলেন– "আস্‌সালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"। হযরত আবু বকর ও ওমর রা. এর ন্যায় মোহাজির ও আনসারগণও সালাম আরয করলেন। তারপর সকলে সারি বেঁধে খাটের চতুর্দিকে দাঁড়ালেন। তাঁদের মধ্যে কেউ ইমাম ছিলেন না। রাসূল করিম ﷺ'র খাটের চতুপার্শ্বে দণ্ডায়মান কাতারগুলোর মধ্যে প্রথম কাতারে হযরত আবু বকর ও ওমর রা. দাঁড়িয়ে এভাবে মুনাজাত করলেন:

"হে আল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবী করিম ﷺ'র উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি তা পরিপূর্ণভাবে পৌছিয়ে দিয়েছেন। উম্মতকে তিনি উপদেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহর পথে তিনি জেহাদ পরিচালনা করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করেছেন। তাঁর কলেমা পূর্ণতা লাভ করেছে। লা শারীক আল্লাহর উপর লোকেরা ঈমান এনেছে। হে আমাদের মাবুদ! তুমি আমাদেরকে তাঁর উপর অবতীর্ণ যাবতীয় বাণীর অনুসরণকারী বানিয়ে দাও। তুমি আমাদের ও উনার মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দাও। তুমি আমাদের (কার্যকলাপের) দ্বারা যেন তাঁর পরিপূর্ণ প্রকাশ্য পরিচয় পাও এবং তাঁর মাধ্যমেও আমাদের প্রকাশ্য পরিচয় পাও। কেননা, তিনি মোমেনদের প্রতি রউফ এবং রাহীম। তাঁর প্রতি ঈমান আনার বিনিময়ে আমরা কিছুই প্রতিদান চাইনা এবং তাঁর নাম ভাঙ্গায়েও আমরা কখনও দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিল করতে চাইনা"। কাতারে দাঁড়ানো লোকজন শুধু আমীন আমীন বলেছেন। তাঁরা

বের হয়ে যাওয়ার পর অন্য একদল প্রবেশ করতেন। এভাবে প্রথমে পুরুষগণ, তারপর মহিলাগণ, তারপর শিশুগণ ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করে সালাম ও দুরূদ পেশ করেছেন।[১২৪]

মঙ্গলবার দিন গোসল ও কাফনের পর হতে মধ্যরাত পর্যন্ত এভাবেই পালাক্রমে দুরূদ ও সালামের অনুষ্ঠান চলতে থাকে। সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে, ইমাম বিহীন এবং চার তাকবীর বিহীন শুধু দুরূদ, সালাম ও মুনাজাতের মাধ্যমেই জানাযার কাজ সমাধা করা হয়েছে।

অন্যদের বেলায় প্রচলিত জানাযার নিয়ম নবীজীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এরূপ করার অন্য একটি কারণ এও ছিল যে, নবী করিম ﷺ ইন্তিকাল করলেও তাঁর সাথে রূহ্ মোবারকের যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। তাই তিনি ইন্তিকাল অবস্থায়ও ঠোঁট মোবারক নেড়ে নেড়ে ইয়া উম্মাতী! ইয়া উম্মাতী! বলে কেঁদেছিলেন। এজন্যই একথার উপর সকলে একমত পোষণ করেছেন যে, "নবী করিম ﷺ হায়াতুন্নবী-জিন্দা নবী। এই ইজমার অস্বীকারকারী কাফির"। তাই তাঁর জানাযা হয়নি- শুধু সালাম ও দুরূদ পড়া হয়েছে।

উক্ত হায়াত বরযখী- না দুনিয়াবী-এ নিয়ে ইখতিলাফ থাকলেও শেষ সমাধান হলো- দুনিয়াবী হায়াতেই তিনি জীবিত আছেন। (আদিল্লাতু আহলিস সুন্নাহ, শিফাউস সিক্বাম, ফত্হুল বারী শরহে বোখারী, দ্বারু কুত্নী, জাআল হক, খলীল আহমদ আম্বেটীর প্রতারণামূলক গ্রন্থ 'আত তাস্দীকাত' এ বলা হয়েছে- নবীজী দুনিয়ার হায়াতে রওযা পাকে শুয়ে আছেন)। দাফনের অধ্যায়ে হায়াতুন্নবীর প্রামাণ্য দলীল সামনেই উল্লেখ করা হবে- ইন্শা আল্লাহ![১২৫]

দাফন কার্যঃ রওযা মোবারকঃ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন- تَوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَدُفِنَ لَيْلَةَ الْأَرْبَعَاءِ- অর্থ: "রাসূল করিম ﷺ সোমবার দিন ইন্তিকাল করেন এবং বুধবারের পূর্ব রাত্রে তাঁকে দাফন করা হয়"।[১২৬] এটাই বিশুদ্ধ মত। মঙ্গলবার দিন পবিত্র গোসলকার্য ও কাফন অনুষ্ঠান শেষে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রা. এর নেতৃত্বে দুরূদ ও সালাম এবং দোয়া-মুনাজাত অনুষ্ঠানের পর পালাক্রমে পুরুষ, নারী ও শিশুগণ হুজরা মোবারকে প্রবেশ করে

[১২৪]. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া কৃত ইবনে কাছির, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫।
[১২৫]. অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল র., নূর নবী স., পৃ. ২০২-২০৫।
[১২৬]. বায়হাকী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল।

অনুরূপভাবে দুরূদ-সালাম ও দোয়া মুনাজাত করতে থাকেন। এই অনুষ্ঠান মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চালু থাকে। তারপর রওযা মোবারকে পবিত্র দেহ মোবারক স্থাপন করা হয়।

প্রথমে রওযা মোবারকে নবী করিম ﷺ'র একখানা লাল ইয়ামানী চাদর বিছানো হয়, যা তিনি সচরাচর পরিধান করতেন। এ চাদরখানা তিনি জঙ্গে হোনাইনে (৮ম হিজরী) গণিমতের মাল হিসাবে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নবী করিম ﷺ এ চাদরখানা তাঁর রওযা মোবারকে বিছিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন। হযরত হাসান রা. বলেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرِشُوْا لِيْ قَطِيْفَةً فِيْ لَحْدِيْ فَاِنَّ الْاَرْضَ لَمْ تُسَلَّطْ عَلَى اَجْسَادِ الْاَنْبِيَاءِ. অর্থ: "রাসূল করিম ﷺ এরশাদ করেছেন- তোমরা আমার রওযা মোবারকে একখানা চাদর বিছিয়ে দিও। কারণ, এই জমিন নবীগণের শরীর মোবারক নষ্ট করতে পারে না বা বদন মোবারকে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না"।[১২৭]

ওয়াকিদী বলেন- كَانَ هٰذَا خَاصًّا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَوَاهُ اِبْنُ عَسَاكِرِ অর্থ: "চাদর বিছানোর এই ব্যবস্থা শুধু নবী করিম ﷺ'র জন্যই খাস"।[১২৮] কেননা, তিনি রওযা মোবারকে চিরদিন জীবিত থাকবেন। রওযা মোবারকের স্থান নির্ধারণ নিয়ে প্রথমে বিভিন্ন মতামত দেয়া হয়। কেহ বলেন- জান্নাতুল বাক্বীতে দেওয়া হোক-কেননা সেখানে অধিক দোয়া ইস্তিগফার করা হয়। কেউ কেউ মন্তব্য করেন- মিম্বার শরীফের কাছে রওযা করা হোক। আবার কেউ কেউ বলেন- বরং নবী করিম ﷺ'র মিহ্রাবে নামাযের স্থানেই কবর শরীফ করা হোক। প্রকৃত অবস্থা তাঁদের তখনও জানা ছিলনা। এমন সময় হযরত আবু বকর রা. আসলেন এবং এর সমাধান এভাবে দিলেন- اِنَّ عِنْدِيْ مِنْ هٰذَا خَبَرًا وَعِلْمًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا قُبِضَ نَبِيٌّ اِلَّا دُفِنَ حَيْثُ تَوَفّٰى (بَيْهَقِيْ) অর্থ- "এ ব্যাপারে আমার কাছে একটি সঠিক সংবাদ ও তথ্য আছে। তা হলো- আমি স্বয়ং নবী করিম ﷺ'কে বলতে শুনেছি যে, নবীগণ যেস্থানে ইন্তিকাল করেন, সেখানেই তাঁদের দাফন করা হয়"।[১২৯]

[১২৭]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ.-২৬৯।
[১২৮]. ইবনে আসাকির।
[১২৯]. বায়হাকী।

তারপর হযরত আবু বকর রা. এভাবে নির্দেশ দিলেন–

فَاَخِّرُوْا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوْا تَحْتَ فِرَاشِهِ অর্থ: "তোমরা নবী করিম ﷺ'র বিছানা মোবারক সরিয়ে নিয়ে যাও এবং সেস্থানেই রওযা শরীফ তৈরী করো।"[১৩০]

সিদ্ধান্ত মোতাবেক নবী করিম ﷺ'কে খাটে উঠিয়ে গোসল দেয়ার জন্য অন্য পার্শ্বে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিছানার স্থানে রওযা মোবারক প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। একাজের জন্য মক্কাবাসী আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্ রা. এবং মদিনাবাসী আবু তাল্‌হা যায়েদ ইবনে সাহ্‌ল রা.কে অনুসন্ধান করার জন্য হযরত আব্বাস রা. দু'জন লোক পাঠান। মদিনাবাসী আবু তালহা সাহাবীকে প্রথম পাওয়া গেল। সুতরাং তিনি এসে মদিনা শরীফের নিয়মে বগলী বা সিন্দুকী রওজা শরীফ তৈরী করেন।

তিন চাঁদের স্বপ্ন:

এ প্রসঙ্গে বায়হাকী শরীফে বর্ণিত সাঈদ ইবনে মোসাইয়েব তাবেয়ী রহ. এর একখানা রেওয়ায়াত উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন- হযরত আয়েশা রা. একদিন স্বপ্নে দেখেন- তিনটি চাঁদ তাঁর কোলে পতিত হয়। এ ঘটনা পিতা আবু বকর রা.কে জানালে তিনি মন্তব্য করেন- "যদি তুমি সত্যই এ স্বপ্ন দেখে থাকো, তাহলে এর অর্থ হচ্ছে- তোমার গৃহে পৃথিবীর তিনজন শ্রেষ্ঠ মানবের মাযার শরীফ হবে। যখন নবী করিম ﷺ'র ইন্তিকাল হয়, তখন হযরত আবু বকর রা. হযরত আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন– يَا عَائِشَة هَذا خَيْر اقمارك "হে আয়েশা! তোমার স্বপ্নে দেখা তিন চাঁদের মধ্যে ইনিই হচ্ছেন প্রথম উত্তম চাঁদ"।[১৩১] পরবর্তীতে আরো মাযার হয় সেখানে- অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রা.'র।

বেদনা বিধুর মুহূর্ত:

মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাত ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। উম্মাহাতুল মোমেনীনগণ ও হযরত ফাতেমা রা. হযরত আয়েশা রা. এর হুজরার অপর অংশে কান্নারত ছিলেন। হযরত উম্মে সালমা রা. বলেন–

بَيْنَمَا نَحْنُ مُجْتَمِعُوْنَ نَبْكِيْ لَمْ نَمْنَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بُيُوْتِنَا وَ نَحْنُ نَتَسِلُ بِرُؤْيَتِهِ عَلَى السَّرِيْرَ اِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ الْكَرَّارِيْ فِي السَّحْرِ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ فَصِحْنَا وَصَاحَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ فَارْتَجَّةَ الْمَدِيْنَةُ صَيْحَةً وَّاحِدَةً وَ اَذَّنَ بِلَالُ بِالْفَجْرِ (وَاقِدِىْ)

[১৩০]. ইমাম আহমদ।

[১৩১]. বায়হাকী সূত্রে আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ২৬৮।

অর্থ: "আমরা বিবিগণ একত্রিত হয়ে কান্নাকাটি করছিলাম। রাত্রে আমাদের নিদ্রা হয়নি। নবী করিম ﷺ আমাদের ঘরেই ছিলেন। আমরা নবী করিম ﷺ'কে খাটের উপর শয়নরত অবস্থায় দেখে মনকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছিলাম যে, তিনি তো আমাদের মাঝেই আছেন। ভোরের দিকে ক্রন্দনরত লোকদের কান্নার আওয়ায শুনতে পেলাম। উম্মে সালমা রা. বলেন- আমরাও চিৎকার দিয়ে উঠলাম এবং মসজিদে অবস্থানরত শোকাতুর লোকেরাও চিৎকার দিয়ে উঠলো। সকলের কান্নার রোল মিলে মদিনার জমিন থর থর করে কেঁপে উঠলো। এমন সময়ই হযরত বেলাল রা. ফজরের আযান দিলেন"। এটা ছিল দাফনের শেষ পর্যায়ের ঘটনা।[১৩২]

হায়াতুন্নবী ﷺ:

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর হুজরার মধ্যে রওযা মোবারক তৈরী করা হয়। হযরত আলী রা., হযরত আব্বাস রা., হযরত ফযল ইবনে আব্বাস রা. এবং নবী করিম ﷺ'র আশ্রিত খাদেম হযরত সালেহ রা. এই চারজন সাহাবী নবী করিম ﷺ কে রওযা মোবারকে নামান। হযরত আব্বাস রা. দেখতে পেলেন- কাফনের ভিতরে হুযুর ﷺ'র ঠোঁট মোবারক নড়ছে- তিনি জীবিত। তিনি কান লাগিয়ে শুনতে পেলেন- নবী করিম ﷺ "রাব্বি হাব্‌লী উম্মতি" বলে কাঁদছেন। ইমাম বায়হাকীর সূত্রে ইমাম তকিউদ্দিন সুব্‌কি রেওয়ায়াত করেন:

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا دُفِنَ فِيْ قَبْرِهِ رَدَّاللهُ رُوْحَهُ وَاسْتَمَرَّتِ الرُّوْحُ فِيْ جَسَدِهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِيَرُدَّ عَلٰى مَنْ سَلَّمْ عَلَيْهِ (شِفَاءُ السِّقَامِ فِيْ زِيَارَةِ خَيْرِالْاَنَامِ لِلْعَلَّامَةِ تَقِيِّ الدِّيْنِ سُبْكِيْ رحـ)

অর্থ: "রাসূল মকবুল ﷺকে রওযা মোবারকে দাফন করার পরপরই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রূহ্ মোবারককে ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং রূহ্ মোবারক দেহ মোবারকের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত সবসময় অবস্থান করতে থাকবে- যাতে তিনি উম্মতের সালামের জবাব দিতে পারেন"।[১৩৩]

উপরে বর্ণিত ইমাম বায়হাকী রহ. এর রেওয়ায়াতখানা একথাই প্রমাণ করছে, নবী করিম ﷺ'র রূহ্ মোবারক সোমবার দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব হতে মঙ্গলবার মধ্যরাত পর্যন্ত প্রায় ৪০ ঘণ্টা দেহ মোবারক থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে পৃথক থাকার পর ঐ রাত্রেই পুনরায় ফেরত দান করা হয়। কাজেই নবী করিম

[১৩২]. অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল র., নূর নবী, পৃ. ২০৫-২০৮।

[১৩৩]. ইমাম তকিউদ্দীন সুবুকী, ৬২৭হি., কৃত সিফাউস সিকাম ফী যিয়ারাতে খাইরিল আনাম, সূত্র প্রাগুক্ত।

ﷺ এখন সশরীরে রওযা মোবারকে হায়াতুন্নবী হিসাবে জীবিত আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন।[১০৪]

উম্মুহাতুল মু'মিনীনঃ

রাসূল ﷺ'র পবিত্র স্ত্রীগণ কুরআনের দলীল দ্বারা মু'মিনদের মা হিসাবে প্রমাণিত। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ অর্থ: নবী মু'মিনদের জন্য তাদের আত্মার চেয়ে উত্তম আর তাঁর স্ত্রীগণ হলেন তাদের মা।

উল্লেখ্য যে, রাসূল ﷺ'র পবিত্র স্ত্রীগণ দু'টি বিষয়ে মু'মিনদের মা হিসাবে বিবেচিত। ১. তাঁদের সাথে কোন উম্মতের বিবাহ জায়েয নেই। ২. তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব যেমন গর্ভধারিনী মা'কে করতে হয়। অবশিষ্ট বিষয়ে তারা মায়ের ন্যায় নয়। যেমন মীরাসের বেলায়, পর্দার ক্ষেত্রে এবং তাদের ভাই-বোনের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ তাদের ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, মু'মিনদের ভাই-বোন ও সন্তান-সন্ততি হিসাবে গণ্য হবে না।

রাসূল ﷺ'র পবিত্র স্ত্রীগণের সংখ্যা নিয়েও মতবিরোধ আছে। তবে এগার জনের ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'জন হযরত খদীজা রা. ও যয়নব বিনতে খোযায়মা রা. রাসূল ﷺ'র জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন। বাকী নয়জন রাসূল ﷺ'র ইন্তেকালের সময় জীবিত ছিলেন। এগার জন স্ত্রীগণের মধ্যে ছয়জন ছিলেন কুরাইশিয়া। ১. হযরত খদীজা বিনতে খুয়াইলাদ রা. ২. হযরত আয়েশা বিনতে আবি বকর রা.। ৩. হাফসা বিনতে ওমর রা.। ৪. হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে আবি সুফিয়ান। ৫. হযরত উম্মে সালমা বিনতে আবি উমাইয়্যা এবং ৬ হযরত সাওদা বিনতে যামআ রা.। চারজন ছিলেন আরবিয়া। যথা- ১. যয়নব বিনতে জাহাশ রা. বনী আসাদ ইবনে খোযাইমা বংশের ছিলেন। ২. মাইমুনা বিনতে হারেস রা. হেলালিয়্যা, ৩. হযরত যয়নাব বিনতে খোযাইমা উম্মুল মাসাকীন রা. হেলালিয়্যা। ৪. হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস রা. খোযাঈয়া মুস্তালাকিয়্যা। একজন ছিলেন বনী ইস্রাঈল তথা ইহুদী। তিনি হলেন হযরত সাফিয়া বিনতে হোয়াই বিন আখবাত রা.।

রাসূল ﷺ'র বিবিগণের আকদের ধারাবাহিকতা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। তবে হযরত খদীজা রা. যে তার প্রথমা স্ত্রী এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। তাঁর জীবদ্দশায় রাসূল ﷺ কোন বিবাহ করেননি এটিও ঐকমত্য বিষয়।

[১০৪]. অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল র., নূর নবী, পৃ. ২০৯।

আল্লামা যুহরীর মতে- হযরত খদীজা রা.'র পরে বিবাহের ধারাবাহিকতা হল- হযরত সাওদা, অত:পর হযরত আয়েশা অত:পর হাফসা, অত:পর উম্মে সালমা অত:পর উম্মে হাবীবা অত:পর যয়নব বিনতে জাহাশ অত:পর হযরত উম্মুল মাসাকীন অত:পর হযরত মাইমুনা অত:পর হযরত জুয়াইরিয়া অত:পর হযরত সফিয়া রা.।

অপর বর্ণনায় আছে- হযরত খদীজা রা.'র পরে সাওদা তারপর আয়েশা তারপর উম্মে হাবীবা তারপর মাইমুনা তারপর সফিয়া তারপর উম্মুল মাসাকীন রা.।[১০৫]

রাসূল ﷺ'র আওলাদগণঃ

রাসূল ﷺ'র সন্তান-সন্ততির সংখ্যা নিয়েও মতবিরোধ আছে। তবে অধিকাংশ ও নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী হল ৭ জন। তন্মধ্যে তিনজন ছেলে আর চারজন মেয়ে। যথা- ১. হযরত সৈয়্যদ কাসেম রা., ২. হযরত সৈয়্যদ ইব্রাহীম রা., ৩. হযরত সৈয়্যদ আব্দুল্লাহ রা., ৪. হযরত সৈয়্যদা যয়নাব রা., ৫. হযরত সৈয়্যদা রোকাইয়্যা রা., ৬. হযরত সৈয়্যদা উম্মে কুলসুম রা. এবং ৭. হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা রা.। হযরত সৈয়্যদ ইব্রাহীম রা. মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অবশিষ্টরা হযরত খদীজা রা.'র গর্ভের সন্তান।[১০৬]

রাসূল ﷺ'র আওলাদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

১. হযরত কাসেম ইবনে রাসূলিল্লাহ। ইনি রাসূল ﷺ'র বড় সাহেবজাদা। নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে জন্মলাভ করেন। এ কারণেই রাসূল ﷺ'র উপনাম- আবুল কাসেম হয়েছে। সতের মাস বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং নবীর আওলাদগণের মধ্যে প্রথম ইন্তেকালকারী ছিলেন।

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাসূলিল্লাহ। ইনি মক্কা শরীফে ইসলাম প্রকাশের পর জন্মগ্রহণ করেন এবং তখনই ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে আস ইবনে ওয়ায়েল রাসূল ﷺ কে 'আবতার' তথা বংশহীন বললে আল্লাহ্ তায়ালা إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ আয়াত নাযিল করেন।

৩. হযরত ইব্রাহীম ইবনে রাসূলিল্লাহ্। ইনি ৮ম হিজরি সনে যিলহজ্ব মাসে মদীনা শরীফে জন্মলাভ করেন। মারিয়া কিবতিয়া রা. তাঁর মা। যাকে মিশরের বাদশা মুকাইকাস নবী করিম ﷺ'র জন্য হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। হযরত

[১০৫]. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ, আসাহহুস সিয়ার উর্দু, পৃ. ৫৬৬-৫৬৮।
[১০৬]. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী র., মাদারেজুন নবুয়্যত, খণ্ড-২, পৃ. ৭২৫-৭২৬।

ইব্রাহীম রা.'র জন্মের সংবাদ দাতা আবু রাফে রা.কে রাসূল ﷺ খুশীতে আজাদ করে দিয়েছিলেন। হযরত জিব্রাঈল আ.কে নবী করিম ﷺ আবু ইব্রাহীম বলে সম্বোধন করলে তিনি আনন্দিত হন। তিনি দু'টি দুম্বা দিয়ে তার আকীকা করেন তারপর মাথা মুণ্ডন করে নাম রাখলেন। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, মাথার চুল মুণ্ডন করে চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করেন আর চুলগুলো মাটিতে দাফন করে দেন। তিনিও ষোল-সতের মাস বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয় অত:পর তাঁর কবরে পানি ছিটানো হল। এটিই প্রথম কবর যাতে পানি ছিটকানো হল। স্বয়ং রাসূল ﷺ পাথর বহন করে এনে তার কবরের উপর স্থাপন করে কবর চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের দিন (১০ মহররম কিংবা ১০ রবিউল আউয়াল) সূর্যগ্রহণ হয়েছিল।

৪. হযরত সৈয়্যদা যয়নাব বিনতে রাসূলিল্লাহ্। হস্তী বাহিনীর ঘটনার ত্রিশতম বছর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করেন, হিজরত করেন। তাঁর খালত ভাই আবুল আস'র সাথে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীর পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্বামী বদরের বন্দীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। পরে মুসলমান হয়েছিলেন। রাসূল ﷺ'র জীবদ্দশায় ৮ম হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। রাসূল ﷺ স্বীয় তাহবন্দ শরীফ দিয়ে বললেন, এটি দিয়ে তার কাফন পরানো হোক। রাসূল ﷺ স্বয়ং তাঁর কবরে অবতরণ করে দাফন করেন।

৫. হযরত সৈয়্যদা রোকাইয়্যা বিনতে রাসূলিল্লাহ। রোকাইয়্যা রা. ছিলেন রাসূল ﷺ'র দ্বিতীয় কন্যা। হযরত সৈয়্যদা যয়নব রা.'র তিন বছর পর তাঁর জন্ম হয়। রাসূল ﷺ'র নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে আবু লাহাবের পুত্র উতবার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। সূরা লাহাব নাযিল হলে আবু লাহাবের নির্দেশে উতবা তাঁকে তালাক দেয়। এরপর রাসূল ﷺ তাঁকে হযরত ওসমান রা.'র সাথে বিবাহ দেন মক্কা শরীফে। বদর যুদ্ধের সময় তাঁর ইন্তেকাল হয় এবং তাঁর সেবা করার জন্য রাসূল ﷺ হযরত ওসমান রা.কে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রেখেছেন কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং গণিমতের অংশও প্রদান করেন।

৬. হযরত সৈয়্যদা উম্মে কুলসুম বিনতে রাসূলিল্লাহ। রাসূল ﷺ'র তৃতীয় কন্যা তিনি। আবু লাহাবের পুত্র উতাইবার সাথে বিবাহ হয়েছিল। উতাইবা উম্মে কুলসুম রা.কে তালাক দিয়ে রাসূল ﷺ'র সাথে চরম ভাবে বেয়াদবী মূলক আচরণ করেছিল। রাসূল ﷺ'র জামা মোবারক ছিড়ে ফেলেছিল, তার নাপাক মুখের নাপাক থুথু রাসূল ﷺ'র পবিত্র দেহ মোবারকে নিক্ষেপ করেছিল। রাসূল

ﷺ তার জন্য বদদোয়া করলেন- বললেন, "হে আল্লাহ্! আপনার কুকুর সমূহ থেকে একটি কুকুর তার উপর অর্পিত করুন।" এই পাপীষ্ঠ সিরিয়ায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে এক হিংস্রপ্রাণীর এলাকায় মনযিল করল। আবু লাহাব বলল, আজ রাতে কাফেলার সকলে আমাদের সাহায্য করবে, কারণ আমার মনে হচ্ছে আজ রাতেই মুহাম্মদের বদদোয়া আমার ছেলের উপর প্রভাব ফেলবে। অত:পর সকল লোকের মাল-সামানা একত্রিত করে বিরাট স্তুপ করে এর উপর উতাইবার জন্য বিছানা করা হল আর সবাই এই স্তুপের চর্তুদিকে ঘিরে ঘুমিয়ে পড়ল। ইত্যবসরে একটি বাঘ এসে সকলের মুখের ঘ্রাণ নিতে লাগল। কিন্তু কাউকে কিছুই করল না। অবশেষে বাঘ লাফ দিয়ে স্তুপের উপর উঠে উতাইবাকে বুক ছিড়ে খেয়ে চলে গেল।

হিজরতের পরে তৃতীয় বছর রাসূল ﷺ উম্মে কুলসুম রা.'র বিবাহ হযরত ওসমান রা.'র সাথে করিয়ে দেন। হিজরতের নবম বছর তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর রাসূল ﷺ হযরত ওসমান রা.কে লক্ষ্য করে বলেন, যদি আমার অপর তৃতীয় কোন কন্যা থাকত আমি তাকেও তোমার সাথে বিবাহ দিতাম।

উল্লেখ্য যে, এদের কারো কোন সন্তান পৃথিবীতে জীবিত ছিল না।

৭. হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা বিনতে রাসূলিল্লাহ। তিনি রাসূল ﷺ'র চতুর্থ কন্যা। তাঁর জন্ম হয়েছিল মহানবী ﷺ'র ৪১তম বছরে। ইবনে জওযী'র মতে নবুয়তের পাঁচ বছর পূর্বে জন্মলাভ করেন। তাঁর ফাতেমা নামকরণের কারণ হল- তাঁকে মহব্বতকারী সকল মুসলমানকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত রাখবেন। বতুল নামকরণের কারণ হল- তিনি সমকালের সকল নারীদের মধ্যে দ্বীন, সৌন্দর্য্য ও চারিত্রিক গুণে শ্রেষ্ঠ ও একক ছিলেন। আল্লাহ ব্যতিত অন্য সব কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী ছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ'র সদৃশ ছিলেন। তিনি আসলে রাসূল ﷺ স্নেহবশে দাঁড়িয়ে যেতেন, হাতে হাত রেখে কপালে চুমু খেতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ তাঁর নিকট তাশরীফ নিলে ফাতেমা রা. দাঁড়িয়ে যেতেন, সামনে অগ্রসর হয়ে হাত ধরতেন এবং তাঁকে স্বীয় আসনে বসাতেন।

বদর যুদ্ধ থেকে ফেরার পর রাসূল ﷺ হযরত আলী রা.'র সাথে তাঁর বিবাহ দেন। এটি দ্বিতীয় হিজরি রমযান মাসে হয়েছিল। বাসর রাত হয়েছিল যিলহজ্ব মাসে। কোন কোন বর্ণনা মতে এই বিবাহ রজব কিংবা সফর মাসে হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। তাঁর বিবাহ আল্লাহর হুকুমে ওহীর ভিত্তিতে হয়েছে। এ সময় তার বয়স হয়েছিল পনের বছর সাড়ে পাঁচ মাস। আর আলী রা.'র বয়স হয়েছিল একুশ বছর।

তাঁর গর্ভে হযরত ইমাম হাসান, হোসাইন, মুহসিন, যয়নাব, উম্মে কুলসুম এবং রোকাইয়্যা জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মুহসিন ও রোকাইয়্যা অল্প বয়সে ইন্তেকাল করেন। হযরত যয়নাব রা.'র সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রা.'র বিবাহ হয়, আর উম্মে কুলসুম রা.'র সাথে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা.'র সাথে বিবাহ হয়।

হযরত ফাতেমা রা.'র বহু ফযিলত হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে। রাসূল ﷺ তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। কোথাও সফরে যাত্রাকালে তাঁকে দেখে যেতেন, তাঁর ঘর থেকে সর্বশেষ বের হতেন আবার ফিরে আসলে সর্বপ্রথম তাঁর ঘরে গিয়ে তাকে দেখে আসতেন তারপর পবিত্র স্ত্রীগণের ঘরে যেতেন।

রাসূল ﷺ'র ইন্তেকালের ছয় মাস পর ৩ রমযান ১১ হিজরি সনে মঙ্গলবার রাতে তিনি ইন্তেকাল করেন। রাতের বেলায় জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর নামাযে জানাযা হযরত আলী রা. পড়ায়েছেন। তাঁর অসিয়ত ছিল রাতের বেলায় যেন তাঁকে দাফন করা হয়, যেন কোন না মুহরিম ব্যক্তি তাঁকে দেখতে না পায়।

তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। কারো মতে তাঁর ঘরেই তাকে দাফন করা হয়।[১৩৭]

২. হযরত আদম আ.

হযরত আদম আ.'র সৃষ্টি:

তাফসীরে আযিযী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত আদম আ.'র সৃষ্টির ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে– আল্লাহ্ তায়ালা হযরত জিব্রাঈল আ.কে হুকুম দিলেন যেন তিনি সমগ্র পৃথিবী থেকে সর্বপ্রকারের কাল, সাদা, লাল রঙের এবং টক, মিষ্টি, তরল ও শুকনো এক মুষ্টি মাটি নিয়ে আসেন। হযরত জিব্রাঈল আ. পৃথিবীতে আগমন করে এক মুষ্টি মাটি নিতে চাইলে পৃথিবী এর কারণ জানতে চাইল। তিনি পৃথিবীকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। অর্থাৎ এই মাটি দিয়ে আল্লাহ আদম আ. ও তাঁর সন্তান তথা মানবজাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য বললে- পৃথিবী আরয করল, আমি এর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন তিনি আমায় দিয়ে মানুষ সৃষ্টি না করেন। কারণ এদের কিছু সংখ্যক গুনাহের কারণে জাহান্নামে যাবে। ফলে এদের কারণে আমাকেও জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

পৃথিবীর কথা শুনে হযরত জিব্রাঈল আ. মাটি বিহীন ফেরৎ আসলেন এবং আল্লাহর দরবারে ওযর পেশ করলেন, হে আল্লাহ্! পৃথিবী আপনার ইজ্জতের

[১৩৭]. আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী র. মাদারেজুন নবুয়ত, উর্দু, পৃ. ৭২৪-৭৪৩।

আশ্রয় নিয়েছে। ফলে আপনার নাম ও ইজ্জতের আদব রক্ষার্থে তা থেকে মাটি নেই নি। এরপর আল্লাহ তায়ালা পর পর হযরত ইস্রাফিল ও মিকাঈল আ.কে প্রেরণ করেন। তারাও একই অযুহাতে মাটি বিহীন ফেরৎ আসেন। অবশেষে হযরত আযরাঈল আ.কে পাঠানো হল। তিনি পৃথিবীর কোন কথা শুনলেন না বরং বললেন– আমি আল্লাহর হুকুমের অধীনস্ত। তোমার কাকুতি-মিনতির কারণে আমি আল্লাহর আদেশ অমান্য করতে পারি না। তুমি যেই আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছ সেই আল্লাহই আমাকে মাটি নিতে পাঠিয়েছেন- এই বলে তিনি এক মুষ্টি মাটি নিয়ে আসেন। এ কারণেই তাঁকে মানুষের প্রাণহানি করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

অতঃপর আদেশ হল যে, সেই মাটিকে বর্তমান খানায়ে কা'বা যেখানে অবস্থিত সেখানে রাখা হোক। ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেয়া হল যেন বিভিন্ন প্রকারের পানি দ্বারা সেই মাটিকে খামির করা হোক। ফলে সেই মাটির উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হতে লাগল। উনচল্লিশ দিন যাবৎ দুঃখ-চিন্তার বারিপাত হল আর মাত্র একদিন আনন্দের বারিপাত হল। এ কারণেই মানুষের জীবনে সুখের চেয়ে দুঃখ-কষ্ট অধিক হয়। এরপর ঐ খামিরকে বিভিন্ন ধরণের বাতাস দ্বারা ভালভাবে শুকানো হল। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে– صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ অতপর ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেয়া হল যেন পরিশোধিত মাটিকে মক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী 'ওয়াদিয়ে নু'মান' এ আরাফাত পাহাড়ের নিকটে রাখে। তারপর স্বয়ং আল্লাহ নিজ কুদরতী হাতে সেই মাটি থেকে হযরত আদম আ.'র শরীর তৈরী করে আকৃতি প্রদান করলেন। ফেরেশতারা ইতিপূর্বে এরূপ আকৃতি দেখেনি। তাই তারা অবাক হয়ে এর চর্তুদিকে ঘুরাফেরা করতে লাগলেন। এর সুন্দর আকৃতিতে তারা ছিলেন মুগ্ধ। শয়তানও এসে দেখতে লাগল আর বলতে লাগল- হে ফেরেশতারা! তোমরা কেন আশ্চর্য হচ্ছ? এটি তো ভিতরে খালি একটি শরীর যার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ছিদ্র রয়েছে। আর এর দূর্বলতার অবস্থা এই যে, যদি ক্ষুধার্ত থাকে তবে ঢলে পরে যাবে আর যদি পেট ভরে খায় তবে চলতে অক্ষম হয়ে পড়বে। এই খালি শরীর দ্বারা কিছুই হবে না। তবে এর বাম পাশে একটি ছোট পাত্র আছে। জানিনা এতে কি আছে। সম্ভবত এটিই হল লতীফায়ে রাব্বানীর স্থান যার বদৌলতে ইনি খিলাফতের উপযুক্ত হয়েছেন।

অতপর 'রূহ'কে আদেশ দেয়া হল যেন সেই শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। রূহ যখন শরীরে প্রবেশ করতে চাইল দেখল ভিতরে অন্ধকার এবং সংকীর্ণ। ফলে ভিতরে প্রবেশ হওয়া থেকে বিরত রইল। কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তখন নূরে মোস্তফা ﷺ দ্বারা সেই শরীর আলোকিত করা হল। অর্থাৎ নূরে

মুহাম্মদী ﷺকে হযরত আদম আ.'র কপালে আমানত রাখা হল। তখন রূহ ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে লাগল। রূহ মস্তক পর্যন্ত পৌছলে আদম আ.'র হাঁচি আসল আর তার মুখ দিয়ে বের হল- আলহামদুলিল্লাহ। উত্তরে আল্লাহ তায়ালা বললেন- ইয়ারহামুকাল্লাহ। যখন রূহ কোমর পর্যন্ত পৌছল তখন তিনি দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে ঢলে পড়লেন। কারণ তখনো নিচের দিকে রূহ পৌছেনি। রূহ যখন সম্পূর্ণ শরীরে পৌছে গেল তখন আদেশ হল- হে আদম! ফেরেশতাদের নিকট গিয়ে তাঁদেরকে সালাম কর। আর তারা কি উত্তর দেয় তা ভালভাবে শুন। তখন আদম আ. গিয়ে বললেন- আস্‌সালামু আলাইকুম। উত্তরে তারা বললেন- ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হল- এটিই তোমার আর তোমার সন্তানদের সালামের পদ্ধতি। আদম আ. আরয করলেন, হে আল্লাহ্! আমার সন্তান কারা? তখন হযরত আদম আ.'র পিঠে আল্লাহর কুদরতী হাত বুলিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আগন্তুক সকল মানুষের রূহ বের করে আদম আ.কে দেখালেন। এতে কাফের, মু'মিন, মুনাফিক, আউলিয়া, কতুব এবং আম্বীয়া সকলকে দেখানো হয়েছে।[১৩৮]

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম আ.কে সৃষ্টি করেছেন শুক্রবারে। মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমার হাত ধরে এরশাদ করলেন– আল্লাহ্ তায়ালা মাটি সৃষ্টি করেছেন শনিবারে, পর্বতরাজি রবিবারে, বৃক্ষলতা সোমবারে, অসৎ কর্ম সমূহ মঙ্গলবারে, নূর বা জ্যোতিকে বুধবারে এবং পশুকুলকে বৃহস্পতিবারে। সর্বশেষে আদম আ.কে সৃষ্টি করেন শুক্রবারে। তখন ছিল আসর ও মাগরীবের মধ্যবর্তী সময়।[১৩৯]

হযরত হাওয়া আ.'র সৃষ্টি

হযরত আদম আ.কে বর্তমান কা'বা শরীফের অবস্থান স্থলে জুমার দিন সৃষ্টি করা হয়। এরপর তিনি পৃথিবীতে একাকী চলা-ফেরা করতেন আর পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীকে ভিন্ন জাতি দেখে ভয় পেয়ে যেতেন এবং প্রার্থনা করতেন যদি স্বজাতি থাকতো তবে তাদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব হত। পরবর্তী জুমার দিন তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। এ সময় ফেরেশতাগণ তাঁর বাম পাঁজর কেটে তা থেকে মুহূর্তের মধ্যে অত্যন্ত সুশ্রী নারী হযরত হাওয়া আ.কে সৃষ্টি করেন। তবে এতে হযরত আদম আ. অনুভবও করতে পারেন নি। অতপর তার কাটাস্থান জোড়া

১৩৮. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র. (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-১, পৃ. ২৫৩ ও আল্লামা ইবনে কাসীর র.,৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বীয়া, আরবী, খণ্ড-১, পৃ. ৩৭-৩৮।
১৩৯. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., (১২২৫হি.), তাফসীরে মাযহারী, বাংলা, খণ্ড-১ম, পৃ. ৯৫।

লাগিয়ে দেয়া হল। তিনি জাগ্রত হয়ে হাওয়া আ.কে বসা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি কে? উত্তর আসল- ইনি আমার বন্দিনী। তোমার ভীতি দূরীভূত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আদম আ. তার দিকে হাত বাড়াতে চাইলে হুকুম হল হে আদম! আগে তার মাহর আদায় কর তারপর হাত লাগাবে। আদম আ. আরয করলেন- হে আমার রব! এর মাহর কী? বলা হল- আমার শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ'র উপর দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ কর। এভাবে ফেরেশতাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে হযরত আদম আ.'র সাথে হাওয়া আ.'র বিবাহ সম্পন্ন হয়।[১৪০]

নোটঃ হযরত আদম আ.'র সৃষ্টি সর্বসম্মতিক্রমে পৃথিবীতে মক্কা শরীফে হয়েছে। তবে হযরত হাওয়া আ.'র সৃষ্টির স্থান নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.'র মতে হযরত হাওয়া আ. জান্নাতে সৃষ্টি হয়েছেন। কিন্তু হযরত ওমর রা. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম বর্ণনা করেন- ফেরেশতারা হযরত আদম ও হাওয়া আ.কে নূরানী পোশাক পরিধান করায়ে, হযরত আদম আ.'র মাথায় তাজ পরায়ে, স্বর্ণের তখতে বসায়ে এবং হযরত হাওয়া আ.কে বিভিন্ন প্রকারের অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয়কে জান্নাতে পৌছিয়ে দেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাওয়া আ. পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছেন।[১৪১]

হযরত আদম ও হাওয়া আ. জান্নাত থেকে অবতরণের ঘটনাঃ

আল্লাহর নির্দেশে হযরত আদম আ.কে সিজদা না করে শয়তান চিরস্থায়ী অভিশপ্ত ও জাহান্নামী হয়েছে বিধায় আদম আ. ও বনী আদমের প্রতি তার ক্ষোভ, হিংসা ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। তাই সে সর্বদা আদম আ. ও বনী আদমকে বিপদগ্রস্ত করার সুযোগ সন্ধানে লিপ্ত থাকে। একদা সুযোগ পেয়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করল। অথবা ময়ূর ও সাপের সাহায্যে জান্নাতের দরজায় এভাবে উপস্থিত হল যে, ময়ূর ও সাপ জান্নাতে অত্যন্ত সুন্দর আকৃতির জীব ছিল। এরা উভয়ই হযরত আদম আ.'র খেদমত করত। শয়তান জান্নাতের দরজায় পৌছলে ময়ূরও তথায় পৌছল। শয়তান ও ময়ূর উভয়ের মধ্যে পরামর্শ হল যে, যে কোন কৌশলে ময়ূর হযরত আদম ও হাওয়া আ.কে দরজায় নিয়ে আসবে। আর সাপের সাথে চুক্তি হল যে, সাপে শয়তানকে মুখের ভিতর করে জান্নাতের দেয়ালে ঐ সময় নিয়ে যাবে যখন আদম আ. দরজায় আসবেন। এই চুক্তি

১৪০. আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী র., (১২২৫হি.), তাফসীরে আযিযী, সূত্রঃ মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, পৃ. ২৭৭।
১৪১. তাফসীরে কবীর ও তাফসীরে রূহুল বয়ান, সূত্রঃ তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-১, পৃ. ২৮১।

সম্পাদিত হওয়ার পর ময়ূর আদম আ.'র সামনে নাচা আরম্ভ করল। আদম ও হাওয়া আ. ময়ূরের নাচ দেখে মুগ্ধ হলেন। আর ময়ূর নাচতে নাচতে পিছনের দিকে যেতে লাগল। ওরা দু'জনও ময়ূরের দিকে যেতে যেতে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত পৌছে গেলেন। ওদিকে সাপ শয়তানকে মুখের ভিতর নিয়ে জান্নাতের দেয়ালে পৌছিয়ে দিল। এভাবে শয়তান আদম আ.'র সামনে এসে গেল এবং তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ পেল। আদম আ. জান্নাতে আর শয়তান বাইরে দেয়ালে অবস্থান করে উভয়ের মধ্যে কথোপকোথন হয়েছে। এ ঘটনা সম্পর্কে ফখরুদ্দিন রাযী র. তাফসীরে কবীর গ্রন্থে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাফসীরে আযিযী গ্রন্থে আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী র. উক্ত ঘটনা সমালোচনা ব্যতিরেকে বর্ণনা করেন।

যা হোক শয়তান সুকৌশলে হযরত আদম আ.'র মুখোমুখি হয়ে আরয করল- আপনার শানে আমার বড় বেয়াদবী হয়ে গেছে। আমি আপনাকে সিজদা না করার কারণে অভিশপ্ত হয়েছি। আমি চাই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ব করতে। আমি আপনাকে এমন মর্যাদায় পৌছিয়ে দেবো যাতে আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং আমার উপর আপনার যে রাগ তাও চলে যাবে। আর তা হল- আপনি জান্নাতের এ নিয়ামতরাজিতে প্রাতারিত হবেন না। কেননা অবশেষে আপনার উপর মৃত্যু আগমণ করবে যা আপনার সমস্ত নিয়ামত ও আরাম-আয়েশের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। আদম আ. জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত্যু কী? শয়তান মৃত জন্তুর ন্যায় তাঁর সামনে পড়ে গেল এবং প্রাণ নির্গত হওয়ার প্রাক্কালে যে মর্মান্তিক অবস্থা হয় তা অভিনয় করে দেখাল। আদম ও হাওয়া আ. এই অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন- মৃত্যু থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় আছে? সে বলল, হ্যাঁ, আছে। কুরআন মাজিদে তার কথা এভাবে বলা হয়েছে- هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ অর্থ: আমি আপনাকে এমন বৃক্ষের সন্ধান দিচ্ছি, যে সেই বৃক্ষ থেকে খাবে সে কখনো মৃত্যুবরণ করবে না এবং নিয়ামতরাজি ও আরাম-আয়েশও ধ্বংস হবে না। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, সেই বৃক্ষ কোনটি? শয়তান সেই বৃক্ষের কথা বলল যা থেকে তাঁদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। তিনি বললেন, এই বৃক্ষ তো ধ্বংসের কারণ। আল্লাহ তায়ালা এর কাছে যেতেও নিষেধ করেছেন। যদি আমরা তা থেকে খাই তাহলে আল্লাহর শাস্তির উপযোগী হয়ে যাবো। যদি এটি কল্যাণকর হয় তবে আমাদেরকে এর কাছে যেতে নিষেধ করলেন কেন? শয়তান বলল, مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ এই বৃক্ষ থেকে আপনাদেরকে

এ জন্যেই নিষেধ করা হয়েছে যেন আপনারা ফেরেশতা না হয়ে যান অথবা আপনারা চিরস্থায়ী জান্নাতী হয়ে না যান। কারণ এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলে হয়তো ফেরেশতা হয়ে যাবে নতুবা চিরস্থায়ী জান্নাতী হয়ে যাবে। অথচ আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করতে। এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলে এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না তাই নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া এই নিষেধাজ্ঞা তাহরিমী নয় বরং তানযিহী। আবার আপনাকে আল্লাহ এই বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেন নি বরং বৃক্ষের ধারে কাছে যেতে নিষেধ করেছেন। ঠিক আছে আমি এনে দিচ্ছি আপনি ভক্ষণ করুন। আর যদি একান্তই খেতে নিষেধ করে থাকেন তা আপনার সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থার জন্য। কারণ তখন হজম করার শক্তি আপনার ছিলনা। আল্লাহর রহমতে এখন আপনি শক্তিশালী হয়েছেন। এখন খেতে পারবেন কোন ক্ষতি হবে না। এভাবে সর্বদিক দিয়ে কথা বলে পরিশেষে সে আল্লাহর শপথ করে বলল, আমি আপনাদের কল্যাণকামী। শয়তানের শপথে আদম আ. নমনীয় হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করার কারো সাধ্য নাই। আল্লাহর নিকট থেকে জেনে নেয়ার কথা তিনি ভুলে গেলেন।

অতপর প্রথমে হযরত হাওয়া আ. নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলেন তারপর আদম আ.কে খাওয়ালেন। ফলে তাঁদের শরীর থেকে জান্নাতী পোশাক চলে গেল আর তারা বিবস্ত্র হয়ে গেলেন। লজ্জিত হয়ে ইঞ্জির বৃক্ষের পাতা দিয়ে স্বীয় শরীর আবৃত করলেন। এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়ায আসল, হে আদম ও হাওয়া! আমি কি তোমাদেরকে ঐ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি? তোমাদেরকে বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তার প্রতারণায় প্রতারিত হইওনা। তখন তাঁরা অক্ষমতা প্রকাশ করলেন আর লজ্জিত হলেন। ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হল যেন তারা সবাইকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করা হোক। সুতরাং আদম আ.কে হিন্দুস্থানের 'চরণদ্বীপ' শহরের লুদ নামক পর্বতে, হাওয়া আ.কে আরব সাগরের তীর 'জিদ্দায়', ময়ূরকে 'মরজুল হিন্দ' নামক স্থানে, শয়তানকে বসরার অদূরে 'মায়সান' নামক জঙ্গলে অথবা বর্তমান ইয়াজুজ-মাজুজের দেয়াল যেখানে অবস্থিত সেখানে আর সাপকে সিজিস্থান কিংবা ইস্পাহানে অবতীর্ণ করা হয়। এখানে এখনো সাপের উপদ্রব বেশী পরিলক্ষিত হয়। হযরত আদম আ. ক্ষেত-খামার করে জীবন ধারণের দু:খ-কষ্ট ভোগের সম্মুখীন হলেন। হাওয়া আ. ঋতুস্রাব, গর্ভধারণ, জ্ঞানের স্বল্পতা এবং স্বল্প মীরাসের অধিকারী হলেন। সাপের পা অদৃশ্য করে দেয়া হল এবং বুকে চেচড়িয়ে চলতে হয় আর তার খাদ্য নির্ধারিত হয় মাটি। ময়ূরের পা দু'টি বিশ্রী করে দেয়া হয়েছে। ইবলিসের আকৃতি বিকৃতি করে দেয়া হল এবং নিতান্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় পৃথিবীতে রাখা হল।

হযরত আলী রা. বলেন, হিন্দুস্থানের মাটি খুবই উর্বর ও সুজলা-সুফলা। 'আউদ' ও 'করণফুল' ইত্যাদি সুগন্ধি জাতীয় বৃক্ষ ওখানে উৎপন্ন হয়। কারণ আদম আ. যখন এই ভূমিতে আগমন করেন তখন শরীরে যতগুলো জান্নাতী বৃক্ষের পাতা ছিল তা বাতাসে উড়ে যে বৃক্ষে পড়েছিল তা স্থায়ীভাবে সুগন্ধি হয়ে গিয়েছিল। আদম আ. জান্নাত থেকে বিভিন্ন প্রকারের বীজ, তিন প্রকারের ফল, হাজরে আসওয়াদ এবং সেই লাঠি মোবারক যা পরবর্তীতে হযরত মুসা আ.'র হাতে এসেছিল। এটি লম্বায় দশ গজ ছিল। তাছাড়া সামান্য স্বর্ণ রৌপ্য এবং ক্ষেত-খামারের অল্প সরঞ্জাম সঙ্গে এনেছিলেন। তিনি এমনভাবে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন যে ঐ বীজগুলো বপন করতে পর্যন্ত ভুলে গেলেন। সুযোগ পেয়ে শয়তান তাতে হাত লাগিয়ে দিল। ফলে যে সব বীজে শয়তানের হাত লেগেছে সেগুলো বিষাক্ত হয়ে গেল পক্ষান্তরে যেগুলো তার হাতের স্পর্শ থেকে মুক্ত ছিল সেগুলোর উপকারিতা বহাল রইল।

আদম আ. জান্নাত থেকে তিন ধরণের ফল নিয়ে এসেছেন। এক. যা সম্পূর্ণ খাওয়া যায়। দুই. যার উপরিভাগ খাওয়া যায় কিন্তু ভিতরের দানা নিক্ষেপ করা হয়। যেমন- খেজুর ইত্যাদি আর তিন. যার উপরিভাগের খোসা ফেলে দেয়া হয় এবং ভিতরের অংশ খাওয়া হয়।

বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে- হযরত আদম আ.'র পৃথিবীতে আসার সময় সাথে লোহার যন্ত্র ছিল, একটি সাণ্ডাসি ছিল যা দিয়ে তিনি লোহা ধরতেন, দ্বিতীয় একটি হাতুড়ি ছিল আর তৃতীয়টি ছিল আয়রণ (ایرن)। হাজরে আসওয়াদ যখন জান্নাত থেকে আনা হল তখন এর আলো কয়েক মাইল পর্যন্ত পৌছে যেতো। এর আলো যতদূর পর্যন্ত পৌছেছিল ততটুকু পর্যন্ত হেরম সাব্যস্ত হয়েছিল।

আদম আ. পৃথিবীতে এসে ভীতি ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করলে হযরত জিব্রাঈল আ. আল্লাহর নির্দেশে পৃথিবীতে উচ্চকণ্ঠে আযান দেন। আদম আ. আযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ'র নাম শুনে স্বস্তিবোধ করলেন এবং ভীতি দূরীভূত হল। উপরে বর্ণিত ঘটনা সমূহ বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত যা শাহ আব্দুল আযিয দেহলভী র. তাফসীরে আযিযী গ্রন্থে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন।[১৪২]

▪ জান্নাতে নিষিদ্ধ বৃক্ষটি কী বৃক্ষ ছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব রা.'র মতে ওটা ছিল গম বৃক্ষ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, আঙ্গুর বৃক্ষ। হযরত ইবনে জুরাইহ রা. বলেছেন, ডুমুর বৃক্ষ। হযরত আলী রা. বলেছেন, কর্পুর বৃক্ষ। কেউ

[১৪২]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-১, উর্দু, পৃ. ২৮৭-২৯১।

কেউ বলেছেন জ্ঞান বৃক্ষ। এ ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে যে, ওই বৃক্ষটি কি একটিই বৃক্ষ, না ওই প্রজাতির বৃক্ষের মধ্যে একটি।[১৪৩]

হযরত আদম আ.'র ভুলটি ইজতিহাদী ছিল। ইজতিহাদী ভুলেও এক সাওয়াব পাওয়া যায়। আর শুদ্ধ হলে দুই সাওয়াব। পৃথিবীতে আগমনটা তাঁর শাস্তিস্বরূপ নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়ন মাত্র। আর ভুলটা ছিল উপলক্ষ। তবে তিনি তাওবা করার কারণ হল- আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারী প্রিয় বান্দা হিসেবে দুই সাওয়াব হাতছাড়া হওয়া তাঁর কাম্য ছিল না। তাই তিনি প্রায় সাড়ে তিনশত বছর যাবৎ কান্না করেছিলেন। তাঁর ভুলটা যদি মহাপাপ হত তাহলে আল্লাহ তায়ালা আদম আ.কে তাঁর খলীফা মনোনীত করতেন না।

হযরত আযরাঈল আ.কে মৃত্যুদূতের দায়িত্ব অর্পণ:

হযরত জিব্রাঈল আ., হযরত মিকাঈল আ. এবং হযরত ইস্রাফীল আ. যখন পৃথিবী থেকে মানব সৃষ্টির জন্য মাটি আনতে অক্ষম হলেন তখন হযরত আযরাঈল আ. মাটি আনতে সক্ষম হলেন। প্রথমোক্ত তিন ফেরেশতা মাটির কাকুতিপূর্ণ আবেদনে দয়াপর্বশ হয়ে ফেরৎ আসলেন পক্ষান্তরে হযরত আযরাঈল আ. মাটির আবেদন উপেক্ষা করে আল্লাহর আদেশ পালনে দৃঢ় ছিলেন এবং যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়ে মাটি নিয়ে আসলেন।

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আযরাঈল আ.'র বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা এবং কঠিন হৃদয় দেখে বললেন, হে আযরাঈল! আজ তুমি মানবজাতির সৃষ্টিলগ্নে যেভাবে নিজের যোগ্যতা ও সক্ষমতার প্রমাণ দিলে, প্রাণীকুলের ধ্বংস তথা মৃত্যুর কাজেও তুমি একইভাবে নিজের যোগ্যতা ও সক্ষমতার প্রমাণ দিতে পারবে নিশ্চয়। সুতরাং আমি এখনি সে কাজটি তোমার জন্য নির্ধারণ করে দিলাম। সকল প্রাণীর প্রাণ তুমিই কব্‌জ করবে।

আল্লাহ্ তায়ালার এ সিদ্ধান্ত শুনে হযরত আযরাঈল আ. উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে আরয করলেন, হে মা'বুদ! আমি আপনার যেকোন আদেশ পালন করতে প্রস্তুত আছি। তবে আপনি এ কঠিন আদেশ পালন হতে আমাকে মুক্তিদান করুন। কেননা এ আদেশ পালন করতে গেলে দুনিয়ার সকল প্রাণী আমার উপর এই বলে অভিশাপ দিতে থাকবে যে, নিষ্ঠুর আযরাঈল আমার অমুক আত্মীয়ের প্রাণ হরণ করেছে। সে অভিশাপ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

[১৪৩]. হযরত ছানাউল্লাহ পানিপথি র., (১২২৫হি.), তাফসীরে মাযহারী বাংলা, খণ্ড-১, পৃ. ১১১।

আযরাঈলের আবেদন শুনে আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, হে আযরাঈল! এ বিষয়ে তোমার চিন্তা বা ভয়ের কোন কারণ নেই, কারণ এ ব্যাপারে আমি এমন এক কৌশল অবলম্বন করব, যাতে কেউই তোমাকে অভিযুক্ত করবে না, তোমার নামও কেউ উল্লেখ করবে না। সুতরাং কেউ তোমাকে অভিশাপও দিবে না। আর তা হল- প্রত্যেকের মৃত্যুর পূর্বে আমি কোন না কোন রোগ-ব্যাধি কিংবা যে কোন বালা-মুসিবত নাযিল করব। তখন সকলেই ঐগুলোকেই মৃত্যুর কারণ হিসাবে মনে করবে। কারো মৃত্যুর জন্য কেউ তোমাকে দায়ী করবে না। অতএব তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই।[১৪৪]

মাটি থেকে পানির ফুয়ারা প্রবাহিত হওয়া:

আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত আদম আ.কে সৃষ্টি করার মনস্থ করলেন তখন মাটিকে বললেন, আমি তোমা থেকে এমন এক মাখলুক সৃষ্টি করব, এদের মধ্যে যারা আমার অনুগত হবে তাদেরকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাব আর যারা আমার অবাধ্য হবে আমি তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। তখন মাটি আরয করল- হে বারী তায়ালা! আমা থেকে সৃষ্ট মাখলুক জাহান্নামে যাবে? আল্লাহ্ বললেন, হ্যাঁ। একথা শুনে মাটি এত বেশী ক্রন্দন করেছে যে, তার ক্রন্দনে মাটিতে নদী-নালা তথা পানির ফুয়ারা সৃষ্টি হল যা কিয়ামত পর্যন্ত প্রবাহিত হতে থাকবে।[১৪৫]

মানবজাতির জীবনে খুশীর চেয়ে দুঃখ-চিন্তা বেশী হওয়ার কারণ:

হযরত আযরাঈল আ. পৃথিবী থেকে মাটি নিয়ে আসলে আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিলেন যে, মাটিগুলো সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের নিকট রাখ। অতঃপর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, বিভিন্ন ধরণের পানি দিয়ে উহাকে খামির বানানো হোক। এরপর চল্লিশ দিন যাবৎ বৃষ্টিপাত হতে লাগল। উনচল্লিশ দিন পর্যন্ত দুঃখ-দুর্দশার পানি দ্বারা বৃষ্টিপাত হল আর মাত্র একদিন আনন্দের পানির পৃষ্টিপাত হল। এ কারণেই মানবজীবনের অধিকাংশ সময় দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয় আর সুখ-সাচ্ছন্দ হয় মাত্র অল্প সময়।[১৪৬]

বিভিন্ন জায়গার মাটি দ্বারা আদম আ.'র দেহ তৈরী:

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন. إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو

[১৪৪]. মাওলানা গোলাম নবী, খোলাসাতুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ১৫-১৬, মাওলানা তাহের সূরাটী, (ভারত): কাসাসুল আম্বিয়া, বাংলা, পৃ. ২০-২১।

[১৪৫]. সাবী আলাল জালালাইন, খণ্ড-১, পৃ. ৪, সূত্র: আল্লামা যুলফিক্কার আলী, জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ২৯।

[১৪৬]. আল্লামা ইবনে কাসীর, ৭৭৪হি. কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, পৃ. ৭৭, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ২৯।

آدَمَ قَدَرَ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَالِكَ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَالسَّهْلُ وَالْحُزْنُ وَبَيْنَ ذَالِكَ. "আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম আ.কে সমগ্র পৃথিবীর মাটি থেকে সংগৃহীত মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আদম আ.'র সন্তানগণ মাটির গুণাবলী অনুযায়ী সৃষ্ট। কেউ কঠোর প্রকৃতির, কেউ শান্ত প্রকৃতির, কেউ মধ্যমপন্থী স্বভাবের। আবার কেউ শুভ্র, কেউ লাল এবং কেউ কাল বর্ণের আবার কেউ এগুলোর মধ্যবর্তী বর্ণের সৃষ্ট। কেউ মন্দ, কেউ সৎ আবার কেউ উভয় দোষে গুণে সৃষ্ট।[১৪৭]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা আদি মানব হযরত আদম আ.কে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কা'বা ঘরের মাটি দ্বারা মাথা, পাক ভারতের মাটি দ্বারা পেট ও পৃষ্ঠদেশ, দুনিয়ার পূর্ব সীমান্তের মাটি দ্বারা দু'হাত এবং পশ্চিম সীমান্তের মাটি দ্বারা দু'পা সৃষ্টি করা হয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে- বাইতুল মোকাদ্দাসের মাটি দ্বারা হযরত আদম আ.'র মাথা, বেহেশতের মাটি দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল, পাক ভারতের মাটি দ্বারা তাঁর দন্তরাজি, পবিত্র কাবার মাটি দ্বারা তাঁর হস্তদ্বয়, ইরাকের মাটি দ্বারা তাঁর পৃষ্ঠদেশ, জান্নাতুল ফেরদাউসের মাটি দ্বারা তাঁর কলিজা, তায়েফের মাটি দ্বারা তাঁর জিহ্বা, হাউজে কাউছারের মাটি দ্বারা তাঁর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরী করা হয়েছে।

অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে যে, তাঁর মাথা মক্কা শরীফের মাটি দ্বারা, ঘাড় বাইতুল মুকাদ্দাসের মাটি দ্বারা, পেট ও পিঠ আদনের মাটি দ্বারা, হস্তদ্বয় পাক ভারতের মাটি দ্বারা, পা'দ্বয় দুনিয়ার পূর্ব সীমান্তের মাটি দ্বারা এবং অস্থি, চর্ম ও মাংস পশ্চিম সীমান্তের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, এভাবে হযরত আদম আ.'র দেহ তৈরী করে তা বেহেশতের এক পাশে চল্লিশ বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল।[১৪৮]

আদম আ.'র তাওবা কবুল:

আদম আ. স্বীয় ভুলের কারণে কয়েকশ বছর লজ্জিত ছিলেন। তাফসীরে আযিযী, তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান ও তাফসীরে রূহুল বয়ান গ্রন্থ সমূহে তাবরানী, হাকেম, আবু নুআঈম এবং বায়হাকীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- হযরত

[১৪৭]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র., ২৭১হি. খণ্ড-৪, পৃ. ৪০০, সূত্র: আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, খণ্ড-১, পৃ. ৩৭।

[১৪৮]. মাওলানা তাহের সূরাটী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২১।

ওমর ফারুক ও আলী রা. বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আদম আ.'র দুঃশ্চিন্তা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছল তখন একদা তাঁর স্মরণ হল যে, আমি তো আমার জন্মলগ্নে আরশ আ'যমে লিখা দেখেছিলাম– لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ যাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মর্যাদা কত বড়। আরশ আ'যমে প্রভুর নামের পার্শ্বে তাঁর নাম লিপিবদ্ধ। তাঁর উসিলায় দোয়া করবো। আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম বা ঐশী দ্বারা বর্ণিত দোয়া رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ এর সাথে এই দোয়াও আরয করলেন- أَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ أَنْ تَغْفِرَلِيْ অর্থ: আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি- মুহাম্মদ ﷺ'র উসিলায় আমাকে ক্ষমা করুন।

ইবনে মনযর র.'র বর্ণনায় দোয়াটি এভাবে বর্ণিত আছে- أَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَكَرَامَتِهٖ عَلَيْكَ أَنْ تَغْفِرَلِيْ خَطِيْئَتِيْ অর্থ: হে প্রভু! আপনার নিকট আপনার বিশেষ প্রিয় বান্দা মুহাম্মদ ﷺ'র যে সম্মান ও মর্যাদা আপনার নিকট রয়েছে এর উসিলায় আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়ায আসল- হে আদম! তুমি ঐ মহান ব্যক্তিকে কিভাবে চিনলে? আদম আ. সব ঘটনা বর্ণনা করলে আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে আদম! ঐ মাহবুব বান্দা সর্বশেষ নবী এবং তোমার সন্তান। যদি তিনি না হতেন তবে তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।

আদম আ.'র তাওবা কবুলের দিনটি ছিল মহররমের দশ তারিখ আশুরা ও জুমার দিন। তিনি তাওবার কালিমা পাওয়াতে খুশীতে উৎফুল্ল হলেন। উযূ করে বাইতুল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করেন। অতপর ঐ কালিমাত দ্বারা দোয়া করলেন। তিনি জান্নাত থেকে অবতরণের সময় তাঁর শরীর মোবারকের রঙ কালো হয়ে গিয়েছিল। তাওবা কবুল হওয়ার পর আদেশ হল চাঁদের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখার। অতএব তিনি এই তিন দিন রোযা রাখলে প্রতিদিন একতৃতীয়াংশ করে শুভ্র হতে লাগলেন। এভাবে পূর্বের ন্যায় তাঁর পুরো শরীর শুভ্র হয়ে গেল।

প্রতি মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের রোযা হযরত নূহ আ.'র সময়কাল পর্যন্ত ফরয ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও তা ফরয ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ায় এগুলোর ফরযিয়ত রহিত হয়ে গেল তবে সুন্নাত হিসাবে আদৌ বহাল রয়েছে।

তাওবা কবুল হওয়ার পর আরফা ময়দানে তাঁর সাথে হাওয়া আ.'র সাক্ষাত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে পরিচয় হয়। এ জন্যই এই স্থানকে পরিচিতির স্থান

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

বলা হয়। তিনি জান্নাত থেকে অবতরণের পর আরবী ভাষাও ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে এতদিন যাবৎ তিনি সুরীয়ানী ভাষায় কথা বলতেন। তাওবা কবুল হওয়ার পর পুনরায় আরবী ভাষা প্রদান করা হল। অতপর জিব্রাঈল আ. সমগ্র পৃথিবীর জীব-জন্তুদেরকে ডাক দিয়ে বললেন- হে পৃথিবীর জীব-জন্তু! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন। তোমরা তাঁর অনুগত হও। সামুদ্রিক জীব-জন্তু মাথা তুলে আনুগত্য প্রকাশ করল আর স্থলভাগের জীব-জন্তুরা তাঁর চারপাশে এসে একত্রিত হল। আদম আ. ওদের উপর হাত বুলালেন। তাঁর হাত যাদের শরীরে স্পর্শ হয়েছে, তারা গৃহপালিত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। যেমন ঘোড়া, উট, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। আর যাদের পর্যন্ত পৌছেনি তারা হয়েছে জঙ্গলী ও হিংস্র। যেমন হরিণ ইত্যাদি।

অতপর তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহ! আমার আওলাদগণ খুবই দূর্বল প্রকৃতির। পক্ষান্তরে ইবলিসের ধোকা বড়ই শক্ত। যদি আপনি তাদেরকে সাহায্য না করেন তবে তারা ইবলিসের প্রতারণা থেকে বাঁচতে পারবে না। উত্তর আসল, হে আদম! তোমার বেলায় এক বিধান আর তোমার সন্তানদের বেলায় ভিন্ন বিধান। আমি প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন ফেরেশতা রাখবো যে মানুষকে ইবলিসের প্রতারণা থেকে রক্ষা করবে। আর প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাওবার দরজা উন্মুক্ত রাখবো। তখন তিনি খুশী হয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

তাফসীরে আযিযী গ্রন্থে বর্ণিত আছে– আদম আ.'র পুত্র ও পৌত্রের সংখ্যা সব মিলিয়ে তাঁর জীবদ্দশায় চার হাজার পর্যন্ত পৌছেছিল।[১৪৯]

হযরত আদম আ.'র শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ:

আল্লাহ তায়ালা মানব সৃষ্টি করে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করার যখন মনস্থ করলেন, তখন ফেরেশতাদেরকে অভিহিত করার লক্ষ্যে কিংবা পরীক্ষা নেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তা ফেরেশতাদের নিকট ব্যক্ত করলেন। ইতিপূর্বে জ্বিন জাতির ফেৎনা-ফ্যাসাদের উপর কিয়াস করে তারা অভিমত প্রকাশ করল যে, মানবজাতি পৃথিবীতে গিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে। খেলাফতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মানবজাতি পুরোপুরি অযোগ্য। বরং ফেরেশতারা যেহেতু সর্বদা সৃষ্টিকর্তার অনুগত থাকে সুতরাং খেলাফতের যোগ্য তারাই।

---

১৪৯. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ২৯৭।

আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বললেন, إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জাননা। অর্থাৎ পৃথিবীতে খেলাফতের প্রকৃত যোগ্যতা এবং এর আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমরা মোটেও জ্ঞাত নও।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা খেলাফতের প্রকৃত যোগ্যতা নির্ণয় করলেন জ্ঞানকে। বিশ্ব খেলাফতের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের অর্ন্তগত সৃষ্ট সকল বস্তু সমূহের নাম, গুণাবলী, কার্যকরিতা, বিস্তারিত অবস্থা ইত্যাদি যাবতীয় লক্ষণাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আ.কে সৃষ্টি করার পর তাঁকে উপরোল্লিখিত বিষয় সমূহের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। তাফসীরে রুহুল মায়ানী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা আদম আ.কে مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ অর্থাৎ সৃষ্টিলগ্ন হতে যা হয়েছে এবং যা হবে সব কিছুর জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।

ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম আ.'র শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ঐসব বস্তু সামগ্রীকে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন আর বললেন, তোমরা আমাকে এগুলোর নাম বল। ফেরেশতারা তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল, আপনি পবিত্র, আপনি যা আমাদেরকে শিখায়েছেন তা ব্যতিত আমরা কিছুই জানিনা। নিশ্চয় আপনি প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, প্রজ্ঞাময়।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ঐসব বস্তু সামগ্রীর দিকে ইঙ্গিত করে হযরত আদম আ.কে বললেন, হে আদম! তুমি এই সব বস্তু সামগ্রীর নাম ফেরেশতাদেরকে বলে দাও। তখন হযরত আদম আ. ওই সব বস্তু সামগ্রীর প্রত্যেকটির নাম, গুণাগুণ, কার্যকরিতা সহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিলেন স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা। এভাবে আল্লাহ তায়ালা প্রথমে হযরত আদম আ.'র শ্রেষ্ঠত্ব ও যোগ্যতা প্রমাণ করলেন। এরপর ফেরেশতাদেরকে আদম আ.কে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করার আদেশ দিলেন।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ . وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ . قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ . অর্থ: আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন: আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। আর আল্লাহ্ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। তারা বলল, আপনি পবিত্র। আমরা কোন কিছু জানি না, তবে আপনি যা আমাদিগকে শিখিয়েছেন (সেগুলো ব্যতীত)। নিশ্চয় আপনি প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। তিনি বললেন, হে আদম! ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি? এবং সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর।[১৫০]

ফেরেশতা কর্তৃক হযরত আদম আ.কে সিজদা:

আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম আ.'র শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন তারপর তাঁকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলেন। কারণ পরিচয় জানা না থাকলে সম্মান করা যায় না। তাছাড়া নিজের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ না হলে নিজ থেকে কাউকে সম্মান করা বা তার নেতৃত্ব মেনে নেয়া সহজ হয় না। তাই আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম আ.'র শ্রেষ্ঠত্ব ও যোগ্যতা প্রমাণ করে ফেরেশতাদের অহমিকা চুড়মার করে দিয়ে সিজদার আদেশ দেন।

আল্লাহ তায়ালার আদেশ পাওয়া মাত্র ফেরেশতারা সিজদায় পতিত হল ইবলিস ব্যতিত। সে অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষের বশীভূত হয়ে আদম আ.কে সিজদা না করে আল্লাহর আদেশের অমান্য করে কাফির ও চির অভিশপ্ত হল।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে– وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ অর্থ: যখন আমি ফেরিশতাদের বললাম, আদমকে সিজ্দা কর', তখন ইব্লীস ব্যতীত সকলেই সিজ্দা করল; সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।[১৫১]

---

১৫০. সূরা বাকারা, আয়াত: ৩০-৩৩।
১৫১. সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৪।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি- ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ অর্থ: আদমকে সিজদা কর তখন সবাই সিজদা করেছে, কিন্তু ইবলিস, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।[১৫২]

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ . فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ . إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ . অর্থ: আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানবজাতির পত্তন করব। অতপর তাকে যখন ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় অবনত হইও। তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সিজদা করল। কিন্তু ইবলিস, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে স্বীকৃত হল না।[১৫৩]

সিজদা শব্দের অর্থ হল-وضع الجبهة على الارض মাটিতে কপাল রাখা। সকল ফেরেশতা হযরত আদম আ.'র সামনে কপাল রেখে সিজদা করেছিল। এটি ছিল সিজদায়ে তাহিয়্যাহ তথা সম্মান সূচক সিজদা। এটি পূর্ববর্তী আম্বিয়া কিরামগণের শরীয়তে বৈধ ছিল। তবে নবী করিম ﷺ'র শরীয়তে এরূপ সিজদাও নিষিদ্ধ ও হারাম।

অথবা ফেরেশতারা সিজদা মূলত আল্লাহকে করেছিল। হযরত আদম আ. ছিলেন তাদের কেবলা স্বরূপ। যেমন আমরা বায়তুল্লাহকে কেবলা করে আল্লাহকে সিজদা করি। কেউ কেউ বলেন, ফেরেশতাদের সিজদা মূলত নূরে মুহাম্মদী ﷺকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ছিল যা হযরত আদম আ.'র কপালে বিদ্যমান ছিল। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা আলূসী র. বলেন, فَهُوَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ الْخَلِيْفَةُ الاَعْظَمُ فِي الخَلْقِ وَالإِمَامُ المُقَدَّمُ فِي الأَرْضِ وَالسَّمٰوَاتِ وَلَوْ لَا لَمَا خُلِقَ آدَمُ بَلْ وَلَاوَلَا . সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃত প্রধান খলীফা হলেন রাসূল ﷺ। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে সর্বপ্রথম ইমাম হলেন রাসূল ﷺ। যদি নবী করিম ﷺ সৃষ্টি না হতেন তাহলে না আদম আ. সৃষ্টি হত, না অন্য কোন বস্তু সৃষ্টি হত।[১৫৪]

---

[১৫২]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১১।

[১৫৩]. সূরা হিজর, আয়াত: ২৮-৩১।

[১৫৪]. আল্লামা সৈয়দ আহমদ আলূসী র., ১২৭০হি., তাফসীরে রুহুল মায়ানী, খণ্ড-৪, পৃ. ২১৮।

ইবলিস শয়তান সিজদা না করার কারণ:

ইবলিস শয়তান তার বাহ্যিক ইবাদত বন্দেগী এবং খোদাপ্রদত্ত সামান্য জ্ঞানের কারণে ফেরেশতাদের সাথে বসবাসের সুযোগ লাভ করেছিল বটে তবে সে মূলত ছিল কাফের। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ সে আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল আর সে মূলত ছিল কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত। আদম আ.'র প্রতি প্রচণ্ড হিংসা-বিদ্বেষ ছিল শয়তানের। কারণ সে মনে করত দীর্ঘদিন ইবাদত বন্দেগী করে খেলাফত তারই প্রাপ্য। অথচ আদৌ আদম আ. কোন ইবাদতই করেনি তবুও তাকে খলীফা বানানো হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ সে মনে করত আদম আ. মাটির তৈরী আর সে আগুনের তৈরী। আগুনের স্বভাব হল উপরের দিকে উঠা পক্ষান্তরে মাটির স্বভাব হল নিম্নমুখী হওয়া। সুতরাং উর্ধ্বগামী নিম্নগামীকে কিভাবে সিজদা করবে। অহংকার মূলকভাবে সে এই যুক্তি উপস্থাপন করেছিল মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সামনে। তাছাড়া আল্লাহর সাথে বেয়াদবীমূলক ভাবে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল সে। ফলে সে চিরস্থায়ী অভিশপ্ত ও জাহান্নামী হয়ে গেল।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন- قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ . قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ . قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ . ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ . قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ . অর্থ: আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ করল? সে বলল: আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। বললেন তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নাই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভূক্ত। সে বলল: আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ্ বললেন: তোকে সময় দেয়া হল। সে বলল: আপনি আমাকে যেমন উদ্‌ভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছনদিক থেকে, ডানদিক থেকে এবং বামদিক থেকে। আপনি তাদের

অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ্ বললেনঃ বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব।[১৫৫]

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ . قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ . قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ . وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ . قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ . قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ . অর্থঃ আল্লাহ্ বললেনঃ হে ইবলীস, তোমার কি হলো যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে স্বীকৃত হলে না? বললঃ আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সেজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ বললেনঃ তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত। এবং তোমার প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত। সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ্ বললেনঃ তোমাকে অবকাশ দেয়া হল, সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব। আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত।[১৫৬]

قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا . قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا . قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا . وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا . إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ অর্থঃ স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদায় পড়ে গেল। কিন্তু সে বললঃ আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, যাকে আপনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? সে বললঃ দেখুন তো, এ না সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চ মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত

---

[১৫৫]. সূরা আ'রাফ, আয়াতঃ ১২-১৮।
[১৫৬]. সূরা হিজর, আয়াতঃ ৩২-৪০।

সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব। আল্লাহ্ বলেনঃ চলে যা, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তোদের সবার শাস্তি-ভরপুর শাস্তি। তুই সত্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়ায দ্বারা, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না আমার বান্দাদের উপর কোন ক্ষমতা নেই।[১৫৭]

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ . قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ . قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ . وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ . قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ . قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ . قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ . لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ . অর্থঃ আল্লাহ্ বললেন, হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? সে বললঃ আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। আল্লাহ্ বললেনঃ বের হয়ে যা, এখান থেকে। কারণ, তুই অভিশপ্ত। তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ্ বললেনঃ তোকে অবকাশ দেয়া হল সে সময়ের দিন পর্যন্ত যা জানা। সে বলল, আপনার ইয্যতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব। তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া। আল্লাহ্ বললেনঃ তাই ঠিক, আর আমি সত্য বলছি– তোর দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।[১৫৮]

ইবলিস শয়তানের যুক্তিটি ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্তঃ

আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে সিজদা না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে সে আগুনের তৈরী বলে দাবী করে মাটির তৈরী আদম আ.কে সিজদা না করার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছিল। সে আগুনকে মাটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিল। অথচ বাস্তবে মাটিই আগুনের চেয়ে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী

---

[১৫৭]. সূরা বনী ইস্রাঈল, আয়াতঃ ৬১-৬৫।
[১৫৮]. সূরা ছোয়াদ, আয়াতঃ ৭৫-৮৫।

র. বলেন, বিজ্ঞজনদের অভিমত হল- মাটির মধ্যে রয়েছে বিনয়, নম্রতা ও সহনশীলতা। তাই মাটি থেকে সৃষ্ট হযরত আদম আ.কে প্রথম থেকেই দেয়া হয়েছে চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের ঠিকানা। মাটির মধ্যে আরো রয়েছে অনুতাপ, ধৈর্য, গাম্ভীর্য এবং ক্রন্দন। তাই হযরত আদম আ.'র মধ্যে ছিল তাওবা, নম্রতা এবং কান্নাকাটির বৈশিষ্ট্য। ফলে তিনি লাভ করেছিলেন হেদায়েত ও উচ্চ মর্যাদা। অপর দিকে আগুনের মধ্যে রয়েছে উগ্রতা, উত্তাপ ও চাঞ্চল্য। এই স্বভাবের কারণেই প্রথম থেকে আগুন থেকে সৃষ্ট ইবলিসের মধ্যে ছিল উগ্র অহংকার এবং আদেশ লংঘণের প্রবৃত্তি। তাই তার উপর আপতিত হয়েছে নির্দয় অভিশম্পাত। এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আগুনের উপর মাটির শ্রেষ্ঠত্ব। মাটির শ্রেষ্ঠত্বের আরো একটি কারণ হল- মাটি সব কিছুকে আত্মস্থ করে। আর আগুন সৃষ্টি করে বিপর্যয়। মাটি উদ্ভিদ ও অন্যান্য সৃষ্টি জীবনোপকরণের উৎস এবং প্রাণের ধারক। আর আগুন তরুলতা সহ সকল কিছুকে ভস্ম করে দেয়।[১৫৯]

আরো বহুদিক বিবেচনায় মাটি আগুন থেকে উত্তম। যেমন-

১. আগুনের বৈশিষ্ট্য হল ধ্বংস করা। আগুনে কিছু পড়লে আগুন তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে। পক্ষান্তরে মাটি তার বিপরীত। মাটির বৈশিষ্ট্য হল সৃষ্টি করা। মাটিতে কিছু পড়লে মাটি তার কয়েক গুণ বেশী সৃষ্টি করে বের করে দেয়। যেমন ধান, গম, ফল ইত্যাদি।

২. আগুনের স্বভাব হল- উগ্রতা, উষ্ণতা, অস্থিরতা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে মাটির স্বভাব হল বিনয়তা, স্থিরতা, দৃঢ়তা, নম্রতা ইত্যাদি।

৩. মাটি দ্বারা বিভিন্ন বস্তু তৈরী করা হয়, মানুষ সহ বিভিন্ন জীব-জন্তুর রিযিক উৎপন্ন হয় এবং জীবনোপকরণ ও আবাসস্থল হয়। পক্ষান্তরে আগুনের মধ্যে এসব কিছুই নেই।

৪. মাটি জীবন-যাপনের জন্য আবশ্যক পক্ষান্তরে আগুন অত্যাবশ্যক নয়।

৫. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে মাটির বরকত, উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে আগুনের উল্লেখ করা হয়েছে কেবল শাস্তি, ভয়, আযাব ইত্যাদির স্থানে।

৬. মাটিতে মসজিদ, বায়তুল্লাহ শরীফ ইত্যাদি ইবাদতের স্থান নির্মিত হয় পক্ষান্তরে আগুনে তা অনুপস্থিত।

৭. আল্লাহ তায়ালা সমস্ত গুপ্তধন মাটিতে রেখেছেন এবং নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন পক্ষান্তরে আগুনে তা বিদ্যমান নেই। এরূপ আরো বহু ক্ষেত্রে আগুনের চেয়ে মাটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।[১৬০]

---

১৫৯. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৪, পৃ. ৪০২।

১৬০. আল্লামা ইসমাঈল হক্বী র., ১১৩৭হি., তাফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড-৮, পৃ. ৮৪।

শয়তানের কান্না:

হযরত মুসা আ. একদা শয়তানকে প্রচণ্ডভাবে কান্নাকাটি করতে দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। শয়তান বলল, আল্লাহর অনেক বান্দা শতসহস্র সিজদা দিচ্ছে না অর্থাৎ নামায আদায় করছেনা অথচ তাদের কাউকে চির অভিশপ্ত করতেছেন না। আমি কেবল একটি সিজদা না দেয়ার কারণে আমাকে চির অভিশপ্ত ও জাহান্নামী করা হয়েছে। তাই এভাবে কান্নাকাটি করছি। শয়তান আরো বলল, হে মুসা! আপনি আল্লাহর নিকট আমার পক্ষে সুপারিশ করুন যেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন। শয়তানের কথায় মুসা আ.'র অন্তরে করুণা হল। তিনি আল্লাহর দরবারে শয়তানের আবেদনের কথা উল্লেখ করলে আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মুসা! তুমি গিয়ে শয়তানকে বল, সে যদি এখনো আদম আ.'র কবরে গিয়ে সিজদা করে তবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। মুসা আ. আল্লাহর প্রস্তাব শয়তানকে বললে, শয়তান বলল, জীবিত আদমকে সিজদা করিনি আর এখন মৃত আদমকে কিভাবে সিজদা করব। এভাবে সে আদম আ.কে সিজদা করা থেকে বিরত রইল।[১৬১]

হাবিল-কাবিলের দ্বন্দ্ব:

হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ. যখন পৃথিবীতে আগমন করলেন এবং তাদের থেকে সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা-এরূপ জময সন্তান জন্মগ্রহণ করত। তখন ভ্রাতা, ভগ্নি ছাড়া হযরত আদম আ.'র আর কোন সন্তান ছিল না। এভাবে হযরত হাওয়া আ. বিশ বারে মোট চল্লিশ জন সন্তান প্রসব করেছিলেন। বিশ জন পুত্র ও বিশ জন কন্যা। প্রথম জোড়ার পুত্রের নাম ছিল কাবিল আর কন্যার নাম ছিল আকলিমা। দ্বিতীয় জোড়ার পুত্রের নাম ছিল হাবিল আর কন্যার নাম ছিল লিমুজা। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তার নাম ছিল লাবুদা। সর্বশেষ জোড়া জন্মগ্রহণ করেছিল আবুল মুগীছ ও উম্মুল মুগীছ।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম আ. পৃথিবীতে থাকাকালেই তাঁর অধঃস্তন বংশধরের সংখ্যা পৌছে গিয়েছিল চল্লিশ হাজারে।

হযরত আদম আ.'র সন্তানেরা যখন যৌবনপ্রাপ্ত হলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান ছিল যে, এক জোড়ার পুত্রের সাথে অন্য জোড়ার কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। কারণ একই জোড়ার ভাই বোন পরস্পর সহোদর

---

১৬১. তাযকারাতুল আম্বিয়া, পৃ. ৬০, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫৭।

ভাই-বোন হিসাবে গণ্য হত। কিন্তু এক জোড়ার ভাই-বোন অন্য জোড়ার ভাই-বোনের মধ্যে পরস্পর সহোদর ভাই-বোন হিসাবে গণ্য হবেনা। তাই তাদের মধ্যে বিবাহ বৈধ। যেহেতু তৎকালে বংশ প্রজননের এছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

আল্লাহর বিধান মতে হযরত আদম আ. সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হাবিলের সঙ্গে কাবিলের জোড়া বোন আকলিমাকে এবং কাবিলের সঙ্গে হাবিলের জোড়া বোন লিমুজাকে বিবাহ দিবেন। হাবিল পিতার সিদ্ধান্তে সম্মত হলেও কাবিল সম্মত হলনা। কারণ তার জোড়া বোন আকলিমা ছিল পরমাসুন্দরী, তাই সে তার সহজন্মের বোনটিকে ছাড়তে অস্বীকার করল। হযরত আদম আ. বললেন, তোমার জোড়া বোন তোমার জন্য বৈধ নয়। এটা আল্লাহর বিধান। কাবিল বলল, না, এটা আল্লাহর বিধান নয় বরং আপনার ব্যক্তিগত অভিমত। আদম আ. বললেন, ঠিক আছে, তাহলে তোমরা দু'জনেই আল্লাহর জন্য কোরবানী কর। যার কোরবানী গৃহীত হবে, সেই লাভ করবে আকলিমাকে। তখন কোরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন ছিল এই- কোরবানীর বস্তু পাহাড়ে বা প্রান্তরে রেখে দিলে, আকাশ থেকে শুভ্র আগুন নেমে এসে ভস্মীভূত করে দিত কোরবানীকে। এটাই ছিল কোরবানী কবুল হওয়ার প্রমাণ।

একটি পাহাড়ে কোরবানী নিয়ে উপস্থিত হলেন কাবিল ও হাবিল। কৃষিকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করত কাবিল। তাই সে উপস্থিত করল তার জমির ফসল। মনে মনে ভাবল, কোরবানী কবুল হোক বা না হোক আমার কোন পরোয়া নেই। হাবিলের সঙ্গে আকলিমার বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না। হাবিলের পেশা ছিল পশু পালন। তিনি তার পশুপালের মধ্য থেকে একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দুম্বা পেশ করলেন কোরবানী হিসাবে। মনে মনে নিয়ত করলেন- এই কোরবানী কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিবেদিত। হযরত আদম আ. দোয়া করলেন। একটু পরেই আকাশ থেকে নেমে এল শুভ্র আগুন। সে আগুনে ভস্মীভূত হল হাবিলের বিশুদ্ধ নিয়ত সংবলিত কোরবানী। এ রকম স্পষ্ট নিদর্শন দেখেও কাবিলের জ্ঞানোদয় ঘটল না। সে রাগে ফুঁসতে লাগল। তার সব রাগ গিয়ে পড়ল হাবিলের উপর। সে সিদ্ধান্ত নিল- যে করেই হোক হাবিলকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগল সে। অল্প কিছু দিন পরেই কাঙ্খিত সুযোগ এসে গেল। হযরত আদম আ. হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে যাত্রা করলেন। পিতাবিহীন হাবিলকে একা পেয়ে কাবিল বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। হাবিল বলল, কেন? কাবিল বলল, আল্লাহ তোমার কোরবানী কবুল করেছেন। তুমি আমার সুন্দরী বোনকে বিবাহ

করলে লোকে বলবে তুমি আমার চেয়ে উত্তম। আর তোমার সন্তান-সন্ততিরাও এ নিয়ে গৌরববোধ করবে।

হাবিল তখন ক্রোধের জওয়াবে ক্রোধপ্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করলেন। বললেনঃ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ অর্থঃ আল্লাহ তায়ালা কেবল খোদাভীতি অবলম্বনকারীদের কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি খোদাভীতি গ্রহণ করনি বিধায় কোরবানী গৃহীত হয়নি, এতে আমার দোষ কি?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেছেন, আল্লাহর কসম! কাবিলের চেয়ে হাবিলই ছিলেন অধিক শক্তিশালী। কিন্তু তিনি কেবল আল্লাহর ভয়ে নিজেকে সংযত রেখেছিলেন। আর বলেছিলেন, আমাকে হত্যার জন্য তুমি হস্ত উত্তোলন করলেও, আমি তোমাকে হত্যার জন্য হস্ত উত্তোলন করব না; আমি তো বিশ্ব জগতের প্রতিপালককে ভয় করি। হাবিলের এ রকম বলার প্রকৃত কারণ ছিল, ওই সময় প্রতিবাদ বা প্রতিহত করার বৈধতা ছিলনা। অথবা প্রতিবাদ বৈধ ছিল কিন্তু ধৈর্য অবলম্বনই ছিল শ্রেয়। হাবিলের কথায় চরম ধৈর্য ও ভদ্রতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন নি যে, আমি তোমাকে হত্যা করব না। বরং বলেছিলেন- হত্যা তো দূরের কথা হত্যা করার জন্য হস্ত পর্যন্ত উত্তোলন করব না। এতে মন্দ কর্মের প্রতি তার আন্তরিক অসন্তোষ প্রকাশিত হয়।

কাবিল কর্তৃক হাবিল নিহতঃ

হাবিল কাবিলকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তুমি তোমার জিঘাংসা চরিতার্থ করে আমার ও তোমার পাপের বোঝা ভারী করে নিজের কাঁধে নিয়ে বহন করে জাহান্নামী হও। এটাই যালিমদের কর্মফল। অবশেষে কাবিল ভ্রাতৃ হত্যার পথেই অগ্রসর হল। কাবিল যখন বুঝল হাবিল তাকে প্রতিহত করবে না, তখন সে আরো অধিক উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

কাবিল হাবিলকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ হল বটে, কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না কিভাবে হত্যা করবে। হত্যার ধারণা ইতিপূর্বে তো কেউ কখনো করেনি। ইবনে জারির র. বর্ণনা করেন, শয়তান তখন তার রূপ পরিবর্তন করে কাবিলের সামনে একটি পাখিকে ধরে পাথরের উপরে রেখে অন্য একটি পাথর দিয়ে আঘাত হানল। এভাবে পাখিটির মস্তক পিষ্ট হল। সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গ হল পাখিটির জীবন। কাবিল বুঝল এভাবেই হত্যাকাণ্ড ঘটাতে হয়। সে হাবিলকে ঠিক এভাবেই হত্যা করল। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, হাবিল কাবিলের কথামত নিজেই একটি পাথরে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে হাবিল এক স্থানে নিদ্রিত ছিলেন। তখন কাবিল প্রস্তরাঘাতে হাবিলের মস্তক চূর্ণ করে ফেলল।

পৃথিবীতে সংঘটিত হল প্রথম ভ্রাতৃহত্যা। মৃত্যুকালে হাবিলের বয়স হয়েছিল বিশ বছর। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছিল কোহেনূর পর্বতের পাদদেশে। কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী র. বলেন, সম্ভবত পাহাড়টির নাম কোহে সওর- কোহে নূর নয়। কেউ কেউ বলেছেন, হেরা পর্বতের আশেপাশে নিহত হয়েছিলেন হাবিল।

নিহত হওয়ার পর তাঁর মরদেহ খোলা আকাশের নিচে পড়ে রইল। কাবিল বুঝতে পারছিল না যে, ভাইয়ের লাশ কী করবে। ওদিকে মানুষের প্রথম মরদেহ ভক্ষণ করতে এগিয়ে আসতে চাইছে হিংস্র প্রাণীকূল। উপায়ন্তর না দেখে মরদেহ ঘাড়ে নিয়ে কাবিল উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পথ চলতে শুরু করল। এভাবে চল্লিশদিন পর্যন্ত ঘুরে বেড়াল। হযরত ইবনে আব্বাস রা.'র বর্ণনায় এসেছে কাবিল হাবিলের লাশ নিয়ে এক বছর ধরে ঘুরে ছিল। পশু পাখিরা তার অনুসরণ করতে লাগল কাবিল সরে গেলে হাবিলের লাশ ভক্ষণ করার জন্য। একদিন কাবিল দেখল যে, তার সামনে দু'টি কাক প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হল। কাবিলকে শিক্ষা দানের জন্য আল্লাহ তায়ালা কাক দু'টি পাঠিয়েছেন। যুদ্ধরত কাক দু'টি একটি অপরটিকে হত্যা করে ঠোঁট ও পা দিয়ে মাটিতে গর্ত করে মৃত কাকটিকে শুইয়ে দিল হত্যাকারী কাকটি। তারপর মাটি দিয়ে ঢেকে দিল তার মরদেহ।

আল্লাহ প্রেরিত কাকটির বুদ্ধিমত্তা দেখে কাবিলের বোধোদয় হল। সে বলল, আমি তো কাকের মতোও বুদ্ধিমান নই। যাতে আমি আমার ভাইয়ের মরদেহ গোপন করতে পারি। হত্যার পর কিংবা কাকের কর্মকাণ্ড দেখার পর অথবা ভাইয়ের লাশ পিঠে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অনুতাপ এসেছিল কাবিলের অন্তরে। কাবিল যখন হত্যা করল হাবিলকে, তখন পৃথিবী প্রকম্পিত হল। পৃথিবীর মাটি হল প্রথম রক্তে রঞ্জিত। পৃথিবী সেই তাজা রক্ত নিঃশেষে পান করে নিল। অদৃশ্য থেকে আওয়ায আসল, তোমার ভাই কোথায়? কাবিল উত্তর দিল আমি জানিনা। পুন: আওয়ায হল, মাটি তার রক্ত শোষণ করে নিয়েছে। কাবিল বলল, কই, কোথাও তো রক্তের চিহ্ন নেই। এরপর থেকে নিঃশেষে রক্তপানকে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর জন্য নিষিদ্ধ করলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, ভাই হত্যার পর কাবিলের শরীর ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের হয়ে গিয়েছিল। হযরত আদম আ. পুত্র শোকে শোকাহত ছিলেন। এক বছর পর্যন্ত তিনি কখনও হাসেন নি।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, কাবিলের ভ্রাতৃ হত্যার সময় হযরত আদম আ. মক্কায় ছিলেন। হাবিলের শাহাদতের পর কোন কোন বৃক্ষ হয়ে পড়ল কণ্টাকীর্ণ। আহার্য বস্তু হয়ে পড়ল স্বাদহীন। ফলবান বৃক্ষ থেকে ঝড়ে পড়তে লাগল ফলের সম্ভার। পানির স্বাদ হল লবণাক্ত। পৃথিবীর অনেক ভূ-খণ্ড হয়ে

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

পড়েছিল বালুকাময়। তাঁর শাহাদতের পূর্বে কোন বৃক্ষই কণ্টকযুক্ত ছিলনা। কোন আহার্য বিনষ্ট হত না, ফলন্ত বৃক্ষ থেকে ফল ঝড়ে পরত না। পানি ছিলনা লবণাক্ত। মাটি ছিলনা বালুকাময়। এসব পরিবর্তন দেখে হযরত আদম আ. আপন মনে বললেন, নিশ্চয়ই পৃথিবীতে কোন অঘটন ঘটেছে। তিনি হিন্দুস্থান অভিমুখে ফিরে চললেন। গৃহে উপস্থিত হয়ে জানতে পারলেন, কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছে। মৃত্যুকালীন হাবিলের বয়স হয়েছিল বিশ বছর।

ভ্রাতৃ হত্যার পর কাবিলের উপর নেমে এল অভিশাপ। তার গায়ের রং হয়ে গিয়েছিল কাল বর্ণের। এর পর সে আরো একশত বিশ বছর বেঁচেছিল। কিন্তু কখনও মুহূর্তের জন্যও মনে শান্তি মিলেনি। কাবিল তখন সহজন্মের বোনকে নিয়ে ইয়ামেনের এডেন নামক অঞ্চলে চলে গেল। সেখানে ইবলিস তার বন্ধু সেজে তাকে বলল, হাবিল ছিল অগ্নিউপাসক। তাই আগুন সদয় হয়ে আকাশ থেকে নেমে এসে তার কোরবানীকে ভস্মীভূত করে ফেলেছিল, তুমিও অগ্নিপূজার প্রচলন কর। তাহলে আগুনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে তোমার এবং তোমার বংশধরের একচ্ছত্র অধিকার। ইবলিসের কুপরামর্শকে সৎ পরামর্শ মনে করে শিঘ্রই অগ্নিমন্দির প্রতিষ্ঠা করে সর্বপ্রথম সে আগুনের উপসনা করল। তার সন্তানরা তৈরী করল বিভিন্ন খেলাধূলার উপকরণ ও সঙ্গীত যন্ত্র। যেমন- মুরালী, বাঁশী, ঢোল, তানপুরা ইত্যাদি। তারা সকলে খেলাধুলা, মদ্যপান, ব্যভিচার, অগ্নি উপসনা ইত্যাদির মধ্যে ডুবে গেল। পরবর্তী সময়ে হযরত নূহ আ.'র প্লাবনের মাধ্যমে কাবিলের সকল বংশধরকে সলিল সমাধি দেয়া হয়েছিল। প্লাবন পরবর্তী পৃথিবীতে রয়ে গিয়েছিল কেবল হযরত শীষ আ.'র বংশধরেরা।[১৬২]

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, অন্যায়ভাবে হত্যাকারীর পাপের একাংশ হযরত আদম আ.'র প্রথম পুত্র কাবিলের কাঁধে আপতিত হয়। কারণ, কাবিলই প্রথম হত্যাকারী।

ইমাম বায়হাকী র. শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, দোযখ থেকে শাস্তির অর্ধাংশ ভোগ করবে হযরত আদম আ.'র জ্যেষ্ঠ সন্তান কাবিল। অর্থাৎ সকল দোযখীর অর্ধেক আযাব সে ভোগ করবে।

ইবনে আসাকের হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় এক বছর অতিবাহিত করবে, সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহপাকের সম্মুখে কাবিলের

[১৬২]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৩, পৃ. ৪৭২-৪৮১, রূহুল মাআনী, খণ্ড-৬, পৃ. ১১৬, মুয়ালিমুত তানযীল, খণ্ড-২, পৃ. ৩৪ এবং তাফসীরে খাযেন, খণ্ড-২, পৃ. ৩৪, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৬-৭৭।

পাপের বোঝা বহন করবে। দোযখে প্রবেশ করার পূর্বে সে আর কাবিল থেকে পৃথক হতে পারবেনা। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে সে হবে কাবিলের সাথী। কিন্তু দোযখে তার অবস্থান হবে কাবিলের অবস্থান থেকে পৃথক। কারণ কাবিলের শাস্তি হবে সুকঠিন ও সুদীর্ঘ।[১৬৩]

হযরত আদম আ.'র কবর শরীফ

হযরত আদম আ.'র কবর শরীফ কোথায় তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। এক বর্ণনায় আছে, জবলে আবু কুবাইস নামক পাহাড়ে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে নূহ আ.'র প্লাবনের পর তাঁর লাশ স্থানান্তর করে বায়তুল মোকাদ্দাসে দাফন করা হয়। অপর বর্ণনামতে তাঁর কবর হল মিনায় মসজিদে খায়ফের নিকট। প্রসিদ্ধ হল যে, তাঁকে সেই পাহাড়ের নিকট দাফন করা হয়েছে, হিন্দুস্থানে যেখানে তাঁকে অবতরণ করা হয়েছিল।

কা'ব আহবার থেকে বর্ণিত আছে যে, নূহ আ.'র প্লাবনের সময় তাঁর শরীর মোবারককে গাছের তাবুতে সংরক্ষিত নূহ আ. নৌকায় সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্লাবনের পর নূহ আ. সেই তাবুতকে সরন্দীপে নিয়ে দাফন করেছিলেন। সরন্দীপের পাহাড়ে হযরত আদম আ.'র রওযা শরীফের উপর একটি বৃক্ষ আছে। যাতে বছরে দু'বার ফল আসে। এই বৃক্ষের ফুলে সাতটি পাপড়ি হয়। প্রতিটি পাপড়িতে কুদরতী কলমে لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ লেখা থাকে। সরন্দীপের বাদশা লোক নিয়োগ দিয়েছেন যেন ঐ ফুলের পাপড়ি সংরক্ষন করে। এই পাপড়ি রোগ আরোগ্যের জন্য খুবই উপকারী। এমন কি অন্ধ ব্যক্তির চোখে ঐ পাপড়ি লাগালে চোখের দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ আসত। হযরত আদম আ.'র মাজার শরীফে চব্বিশ ঘণ্টা আল্লাহর অশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়।[১৬৪]

আদম আ.'র ইন্তিকাল

আদম আ.'র অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসলে জান্নাতী ফল খাওয়ার আকাঙ্খা হল। নিজের সন্তানদেরকে বললেন, কা'বা শরীফে গিয়ে দোয়া কর আল্লাহ তায়ালা আমার আকাঙ্খা পূর্ণ করবেন। তারা সেখানে পৌঁছে হযরত জিব্রাঈল আ. সহ অন্যান্য ফেরেশতাদের সাক্ষাৎ পেল। তারা ফেরেশতাদেরকে আদম আ.'র আকাঙ্খার কথা বললে ফেরেশতারা বললেন, আমাদের সাথে এসো- আমরা সঙ্গে জান্নাতের ফল নিয়ে এসেছি। অতএব তারা সবাই আদম আ.'র

[১৬৩]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৩, পৃ. ৪৮১।

[১৬৪]. তারীখুল কামিল, খণ্ড-১, পৃ. ৫০, তাযকারাতুল আম্বিয়া, পৃ. ৯১, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১০৯, কৃত ইবনে কাসীর, জাহানে আম্বিয়া, পৃ. ৭২, সূত্রঃ জামে কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৯-৮০।

নিকট উপস্থিত হলে হাওয়া আ. ফেরেশতাদেরকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন এবং আদম আ.'র কাপড়ের আঁচলে লুকাতে চেষ্টা করেন। আদম আ. বললেন- হে হাওয়া! এখন তুমি আমার থেকে পৃথক থাক। আমার এবং আমার প্রভুর দূতগণের মধ্যখানে আড়াল হইওনা। তাঁর রূহ বের করা হল আর তাঁর সন্তানদেরকে বলা হল- আমরা যেভাবে তোমাদের পিতার কাফন-দাফন করছি তেমনি তোমরাও করবে। জিব্রাঈল আ. জান্নাতী সুগন্ধি, জান্নাতী কাফন এবং জান্নাতী বরইপাতা সঙ্গে এনেছিলেন। তিনি নিজেই আদম আ.কে গোসল দেন, কাফন পরিধান করালেন, সুগন্ধি লাগালেন আর ফেরেশতারা তাঁর লাশ মোবারক বহন করে কা'বা শরীফে এনে তাঁর নামাযে জানাযা আদায় করলেন। জিব্রাঈল আ. ছিলেন ইমাম আর সকল ফেরেশতা ছিলেন মুক্তাদি। আর এ নামাযে তাকবীর ছিল চারটি। অতপর কা'বা শরীফ থেকে তিন মাঈল দূরে মিনায় মসজিদে খায়ফের নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়। বগলী কবরে দাফনের পর কবর শরীফকে উটের পিঠের ন্যায় উপরিভাগ উঁচু, নিম্নভাগ ঢালু করে দেয়া হল। হযরত হাওয়া আ.'র কবর শরীফ হল জিদ্দায় যেটি বর্তমানে 'মাকবারায়ে হাওয়া' নামে পরিচিত।[১৬৫]

বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম আ.'র ছেলের সংখ্যা ছিল একশ একুশ জন। শহীদ হয়েছিল কেবল হাবীল। আদম আ.'র অন্তিমকালে পুত্ররা এসে বলল, আমাদের কিছু অর্থের প্রয়োজন, যা দিয়ে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করব। তখন জিব্রাঈল আ. এক মুষ্টি স্বর্ণ ও এক মুষ্টি রৌপ্য এনে আদম আ.কে দিলেন। পুত্ররা বলল, এত সামান্য স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে আমাদের কি হবে? অদৃশ্য থেকে আওয়ায আসল- স্বর্ণ-রৌপ্যগুলো পাহাড়ে ঢেলে দাও। যাতে তারা সেখান থেকে প্রয়োজন অনুপাতে নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাবে। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে খেতে পারবে। অতঃপর তাঁর মৃত্যু সন্নিকটে হলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছু ফল খাওয়ার ইচ্ছে করলে সব সন্তানরা ফল সংগ্রহে চলে গেল। কেবল শীষ আ. সেবার উদ্দেশ্যে পিতার নিকট রয়ে গেলেন। সন্তানরা যখন ফল নিয়ে আসতে বিলম্ব করল, তখন তিনি শীষকে বললেন, তুমি এই পাহাড়ে গিয়ে দোয়া কর। তোমার দোয়ার বরকতে আল্লাহ আমার জন্য ফলের ব্যবস্থা করবেন। শীষ বললেন, আপনি আমার সম্মানিত পিতা, আপনিই দোয়া করার অধিক হকদার। আপনি আল্লাহর দরবারে মকবুল। তিনি বললেন, আমি 'গুন্দম' খাওয়ার কারণে আল্লাহর নিকট লজ্জিত। তুমি পবিত্র, সুতরাং তুমিই দোয়া কর।

[১৬৫]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, পৃ. ২৯১ ও আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বিয়া, খণ্ড-১, পৃ. ৫৮

পিতার আদেশ মতে পাহাড়ে গিয়ে দোয়া করলেন। দেখলেন জিব্রাঈল আ. একটি মূল্যবান পাত্রে বিভিন্ন প্রকারের ফলমূলে ভরা অপর একটি লাল বর্ণের মূল্যবান পাত্র দ্বারা আবৃত অবস্থায় একজন হুরের মাথায় করে নিয়ে এসেছেন। হুর নিজের চেহারার নেকাব খুলে হযরত আদম আ.'র সামনে এসে দণ্ডায়মান হল। আদম আ. জিব্রাঈল আ.কে জিজ্ঞাসা করলেন, এই হুর কার জন্যে? জিব্রাঈল আ. বললেন, আল্লাহ তায়ালা বেহেস্ত থেকে হযরত শীষ'র জন্য পাঠিয়েছেন। কেননা আপনার সব সন্তানরা জোড়া জোড়া জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু শীষ জন্মগ্রহণ করেছে একা। তার কোন জুটি নাই। হযরত আদম আ. সেই হুরকে হযরত শীষের সাথে বিবাহ দেন। এই হুরের ভাষা ছিল আরবী এবং এর থেকে যাদের জন্ম হয়েছিল তারাও আরবী ভাষায় কথা বলত। হযরত মুহাম্মদ ﷺ তারই বংশ থেকে আগমন করেছেন।

অতঃপর হযরত আদম আ. কিছু ফল নিজে খেলেন আর অবশিষ্ট ফল পুত্রদেরকে খাওয়ালেন। যে-ই সেই ফল খেয়েছিল সেই জ্ঞানী ও সম্মানী হয়েছে। অতঃপর তিনি পুত্রদেরকে অসিয়ত করলেন, আমি অচিরেই ইহকাল ত্যাগ করব। শীষ আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। তোমরা তার অনুগত থাকবে এবং তার উপর ঈমান আনবে। তার সামনে যখন সন্তানরা স্বীকারোক্তি মূলক জবাব দিল তখন তিনি পরলোক গমন করলেন। সন্তানরা অনেক কান্নাকাটি করল আর জানাযা পড়ে তাঁকে দাফন করল। দুই বছর যাবৎ পিতার কবরের পাশে অবস্থান করার পর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিজ নিজ ঘরে চলে গেল।[১৬৬]

হযরত আদম আ. সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ বর্ণিত হয়েছে–

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ . وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ . قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ . وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ . وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ

---

[১৬৬]. মৌলভী গোলাম নবী, খোলাসাতুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৩৪-৩৫।

وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ . فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ . فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

অর্থ: আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন: আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। আর আল্লাহ্ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। অতঃপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। তারা বলল, আপনি পবিত্র। আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছেন (সেগুলো ব্যতীত)। নিশ্চয় আপনি প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। তিনি বললেন, হে আদম! ফেরেশতদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন আল্লাহ্ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি? এবং সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর। এবং যখন আমি হযরত আদম (আ:)কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইব্লীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে। অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে। অতঃপর হযরত আদম আ.

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কেয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহপাক তাঁর প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অনন্তকাল সেখানে থাকবে।[১৬৭]

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ . قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ
خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ . قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا
فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ . قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . قَالَ
فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ . ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ . قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا
مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ . وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ . فَوَسْوَسَ لَهُمَا
الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ
الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ . وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ
النَّاصِحِينَ . فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ
الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ . قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ . قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى
حِينٍ. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ . অর্থ: আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব, তৈরী করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি– আদমকে সেজদা কর তখন সবাই সেজদা করেছে; কিন্তু ইবলীস, সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। আল্লাহ্ বললেন: আমি

১৬৭. সূরা বাকারা, আয়াত: ৩০-৩৯।

যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ করল? সে বলল: আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। বললেন- তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নাই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভূক্ত। সে বলল: আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ্ বললেন: তোকে সময় দেয়া হল। সে বলল: আপনি আমাকে যেমন উদ্‌ভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বামদিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ্ বললেন: বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও, তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়ো না। তাহলে তোমরা গোনাহ্গার হয়ে যাবে। অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বলল: তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও– কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী। সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল: আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী। অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন:আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?তারা উভয়ে বলল: হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। আল্লাহ্ বললেন: তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল ভোগ আছে। বললেন: তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে।[১৬৮]

১৬৮. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১১-২৫।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ . وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ
نَارِ السَّمُومِ . وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ .
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ . فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ . قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ
السَّاجِدِينَ . قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ . قَالَ
فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ . وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ . قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ
يُبْعَثُونَ . قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ . قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ . قَالَ هَذَا
صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ . إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ .
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ . لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ . অর্থ:
আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এবং জিনকে এর আগে লূ-এর আগুনের দ্বারা সৃজিত করেছি। আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন: আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব। অত:পর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো। তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সেজদা করল। কিন্তু ইবলীস– সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে স্বীকৃত হল না। আল্লাহ্ বললেন: হে ইবলীস! তোমার কি হলো যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে স্বীকৃত হলে না? বলল: আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সেজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ বললেন: তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত। এবং তোমার প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত। সে বলল: হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন: তোমাকে অবকাশ দেয়া হল, সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব। আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। আল্লাহ্ বললেন, এটা আমা পর্যন্ত সোজা পথ। যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে

চলে, তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্যে এক-একটি পৃথক দল আছে।[১৬৯]

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ
طِينًا . قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ
إِلَّا قَلِيلًا . قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا . وَاسْتَفْزِزْ
مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا . إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا . অর্থ: স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম: আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদায় পড়ে গেল। কিন্তু সে বলল: আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, যাকে আপনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? সে বলল: দেখুন তো, এ না সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চ মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব। আল্লাহ্ বলেন: চলে যাও, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি-ভরপুর শাস্তি। তুই সত্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়ায দ্বারা, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই আপনার পালনকর্তা যথেষ্ট কার্যনির্বাহী।[১৭০]

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ
أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. অর্থ:
যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম: আদমকে সেজদা কর, তখন সবাই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালেমদের জন্যে খুবই নিকৃষ্ট বদল।[১৭১]

---

[১৬৯]. সূরা হিজর, আয়াত: ২৬-৪৪।
[১৭০]. সূরা আসরা, আয়াত: ৬১-৬৫।
[১৭১]. সূরা কাহফ, আয়াত-৫০।

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا . وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى . فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا
مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى . إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى . وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى .
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى . فَأَكَلَا
مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ
فَغَوَى . ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى .قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى . وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى . قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيرًا . قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى .

অর্থ: আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি। যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম: তোমরা আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে অমান্য করল। অতঃপর আমি বললাম: হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন বের করে না দেয় তোমাদের জান্নাত থেকে। তাহলে তোমরা কষ্টে পতিত হবে। তোমাকে এই দেয়া হল যে, তুমি এতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না। এবং তোমার পিপাসাও হবে না এবং রৌদ্রেও কষ্ট পাবে না। অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল: হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা? অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথভ্রান্ত হয়ে গেল। এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাকে সুপথে আনয়ন করলেন। তিনি বললেন: তোমরা উভয়েই এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ্

বলবেন: এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব।[১৯২]

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ . أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ . مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ
يَخْتَصِمُونَ . إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ . إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا
مِنْ طِينٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ . فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ
كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ . إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ . قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ
تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ . قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ
نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ . قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ . وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .
قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ .
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ . قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ .
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ . قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ . إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ . وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ .

অর্থ: বলুন, এটি এক মহাসংবাদ যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। ঊর্ধ্ব জগৎ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। যখন ফেরেশতারা কথাবার্তা বলছিল। আমার কাছে এ ওহীই আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সেজদায় নত হয়ে যেয়ো। অতঃপর সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে সেজদায় নত হল, কিন্তু ইবলীস; সে অহংকার করল এবং অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ্ বললেন, হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? সে বলল: আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। আল্লাহ্ বললেন: বের হয়ে যা, এখান থেকে। কারণ, তুই অভিশপ্ত। তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ্ বললেন: তোকে অবকাশ দেয়া হল সে সময়ের দিন পর্যন্ত যা জানা। সে বলল, আপনার ইয্যতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব।

---

১৯২. সূরা ত্বোহা, আয়াত: ১১৫-১২৬।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া। আল্লাহ বললেন: তাই ঠিক, আর আমি সত্য বলছি– তোর দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব। বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই। এটা তো বিশ্ববাসীর জন্যে এক উপদেশ মাত্র। তোমরা কিছুকাল পরে এর সংবাদ অবশ্যই জানতে পারবে।[১৭৩]

ইবলিস:

ইবলিস জিন জাতি না ফেরেশতা তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তবে নির্ভরযোগ্য মত হল ইবলিস জিন জাতি ছিল। কেননা প্রথমত: পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ইবলিস সিজদা করেনি সে ছিল জিন জাতি।[১৭৪] দ্বিতীয়ত: ইবলিসের বংশধর আছে। অথচ ফেরেশতাদের কোন বংশধর নেই। আল্লাহ তায়ালা ইবলিস সম্পর্কে বলেন- أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে (ইবলিসকে) এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ?[১৭৫] উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা ইবলিসের বংশধর সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হল। পক্ষান্তরে ফেরেশতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ আর তারা নারী স্থির করে ফেরেশতাগণকে, যারা আল্লাহর বান্দা। তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? এখন তাদের দাবী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।[১৭৬]

উক্ত আয়াত দ্বারা ফেরেশতা নারী হাওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে সন্তান প্রজননও নেতিবাচক হয়ে যায়। কারণ সন্তান জন্ম হয় নারী জাতি থেকে।

তৃতীয়ত: ফেরেশতারা নিষ্পাপ। অথচ ইবলিস এক বড় পাপী। সুতরাং ইবলিস ফেরেশতার অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না।

চতুর্থত: ইবলিসকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে। যেমন পবিত্র কুরআনে তার উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে- خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে।[১৭৭] কুরআনে আরো বলা হয়েছে যে, وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ আর আল্লাহ জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে।[১৭৮] পক্ষান্তরে ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে।

১৭৩. সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ৬৭-৮৮।
১৭৪. সূরা কাহফ, আয়াত: ৫০।
১৭৫. প্রাগুক্ত।
১৭৬. সূরা যুখরূপ, আয়াত: ১৯।
১৭৭. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১২।

পঞ্চমত: ফেরেশতারা হলেন আল্লাহর বিশেষ দূত তথা বার্তাবাহক। আল্লাহ তায়ালা বলেন- جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا তিনি ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক।[১৭৯] অর্থ: ফেরেশতাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণের নিকট ওহী ও হুকুম-আহকাম নিয়ে আসেন। অতএব যারা আল্লাহর দূত তারা নিষ্পাপ হয়। অথচ ইবলিসের মধ্যে এসব কিছু অনুপস্থিত বিধায় ইবলিস ফেরেশতাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

৩. হযরত শীষ আ.

পরিচিতি:

হযরত শীষ আ. হযরত হাবীলের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন। হাবীলের ইন্তেকালের পর হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ. পুত্র শোকে শোকাহত ও মর্মাহত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের দুঃখ-চিন্তা দূর করার লক্ষ্যে তাদেরকে হযরত শীষ আ.'র মত সুন্দর সন্তান দান করেছেন। শীষ শব্দের অর্থ আল্লাহর দান। যখন তিনি জন্মলাভ করেন, তখন হযরত জিব্রাঈল আ. হযরত হাওয়া আ.কে বললেন, هَٰذَا هِبَةُ اللَّهِ لَكِ بَدَلَ هَابِيلَ এই বাচ্চাটি হাবিলের পরিবর্তে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য উপহার স্বরূপ।

হযরত শীষ আ.'র জন্মের সময় হযরত আদম আ.'র বয়স হয়েছিল ২৩৫ বছর। হযরত হাওয়া আ.'র গর্ভে প্রতিবার এক ছেলে এক মেয়ে এভাবে জোড়া সন্তান জন্মলাভ করত। কিন্তু হযরত শীষ আ. এককভাবে জন্মলাভ করেন। এটি একমাত্র নবী করিম ﷺ'র সম্মানার্থেই ছিল। হযরত শীষ আ.'র জন্মের পরে তাঁর দু'চোখের মাঝখানে হযরত আদম আ. হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র নূর মোবারক দেখেছিলেন।[১৮০]

চরিত্র:

হযরত আদম আ.'র সন্তানদের মধ্যে হযরত শীষ আ. ছিলেন জ্ঞানে-গুণে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, ইবাদত-বন্দেগী এবং ধার্মিকতায় সবার শ্রেষ্ঠ। তাঁকেই হযরত

১৭৮. সূরা আর্-রহমান, আয়াত: ১৫।
১৭৯. সূরা: ফাত্বির, আয়াত: ১।
১৮০. তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৩, পৃ. ৮৭, ইবনে আসাকির, খণ্ড-২৩, পৃ. ২৮১, হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, খণ্ড-১, পৃ. ৩৫৪, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৮২।

আদম আ. নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। অন্যান্য সকল বংশধরকে একত্রিত করে এ মর্মে নসিহত করে যান যে, তারা যেন সকলে হযরত শীষ আ.'র আদেশ মেনে চলে। হযরত শীষকে আল্লাহ তায়ালা নবুয়ত ও আসমানী গ্রন্থও দান করেছেন।

হযরত আবু যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা আম্বিয়া কিরামগণের উপর মোট একশত চারখানা সহীফা (আসমানী ঐশীগ্রন্থ) নাযিল করেছেন। তন্মধ্যে পঞ্চাশখানা হযরত শীষ আ.'র উপর নাযিল করেছেন।[১৮১]

হযরত শীষ আ. নেক্কার, পরহেযগার, সৎ, আবেদ ও যাহেদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বদা দুরূদ ও যিকর নিয়ে মশগুল থাকতেন। অত্যন্ত নরম ও ভদ্র স্বভাবের লোক ছিলেন। দুনিয়ার আরাম-আয়েশ থেকে সর্বদা বিমুখ থাকতেন। একাকীত্ব পছন্দ করতেন। আল্লাহর হক, বান্দার হক এবং বিশেষ করে পিতা-মাতার হক ও সেবার প্রতি অতি আগ্রহী ছিলেন।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে দিবা-রাত্রির সময়ের জ্ঞান দান করেছিলেন। সর্বদা মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করতেন এবং আজীবন হজ্ব ও ওমরা করেছেন। তিনি হযরত আদম আ. এবং তাঁর উপর নাযিলকৃত সহীফা সমূহ একত্রিত এবং সুসজ্জিত করেছেন আর সেগুলো মতে আমল করতেন। বায়তুল্লাহ'র নির্মাণ করেছেন মাটি ও পাথর দ্বারা।[১৮২]

হযরত আদম আ. স্বীয় পুত্র হযরত শীষ আ.কে বলেছিলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি আমার পর আমার খলীফা নিযুক্ত হবে। 'তাকওয়া'কে নিজের উপর আবশ্যক করে নিবে। যখন আল্লাহর যিকর করবে তখন সাথে মুহাম্মদ আরবী ﷺ'রও যিকর করবে। আমি তাঁর নাম মোবারক আরশের পায়ায় লিখিত দেখেছি। তখন আমি ছিলাম রূহ ও মাটির মধ্যে। আমি আসমানের চতুর্দিকে ঘুরে দেখেছি। আমি সেখানে প্রত্যেক জায়গায় 'ইসমে মুহাম্মদ' লিখিত দেখেছি। আমি ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুরদের গর্দানের উপর এই মোবারক নাম লেখা দেখেছি। এই নাম মোবারক আমি লিখিত দেখেছি তূবা নামক বৃক্ষে, সিদরাতুল মোন্তাহা নামক বৃক্ষে, নূরানী পর্দা সমূহের পাশে এবং ফেরেশতাদের দু'চোখের মধ্যখানে। তাঁর যিকর বেশী পরিমাণে করবে। ফেরেশতারা প্রতি মুহূর্তে তাঁর যিকর করতেছে।[১৮৩]

---

১৮১. ইবনে আসাকির, খণ্ড-২৩, পৃ. ২৭৩, সূত্রঃ প্রাগুক্ত।
১৮২. তারিখুল কামিল, খণ্ড-১, পৃ. ৫৪, সূত্রঃ প্রাগুক্ত।
১৮৩. ইবনে আসাকির, খণ্ড-২৩, পৃ. ২৮১, সূত্রঃ প্রাগুক্ত।

মৃত্যুঃ

ইঞ্জিলের বর্ণনা মতে তাঁর বয়স একশ পাঁচ বছর হলে তখন তার প্রথম সন্তান আনূশ জন্মগ্রহণ করেন, শীষ আ. ইন্তেকালের নিকটবর্তী হলে তিনি আনূশকে নসিহত করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন। তবে তিনি নবী ছিলেন না। ৯১২ বছর বয়সে হযরত শীষ আ. ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর যোগ্য পুত্র আনূশ তাঁকে গোসল দিয়ে কাফন পরায়ে জবলে আবু কুবাইসে দাফন করেন।[১৮৪]

৪. হযরত ইদ্রিস আ.

পরিচিতিঃ

হযরত ইদ্রিস আ.'র নাম ও বংশ নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তিনি হযরত নূহ আ. পরদাদা ছিলেন। এক বর্ণনা মতে তাঁর নাম হল আখনূখ। বংশনামা হল- আখনূখ ইবনে ইয়ারদ ইবনে মাহলায়েল ইবনে কাইনান ইবনে আনূশ ইবনে শীষ ইবনে আদম আ.।[১৮৫]

উপাধিঃ ইদ্রিস হল তাঁর উপাধি। আরবী 'দরস' শব্দ থেকে উৎকলিত হয়েছে। অর্থ পাঠক বা অধ্যয়নকারী। যেহেতু তিনি নিজেও খুব বেশী অধ্যয়ন করতেন এবং দেশের জনসাধারণকে শিক্ষা-দীক্ষায় উপযুক্ত রূপে গড়ে তুলেছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি মানুষকে শিক্ষা দিতেন, ওয়ায-নসিহত করতেন এবং ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন।

দৈহিক আকৃতিঃ তিনি গন্দম রঙের, দীর্ঘ ও সুঠাম দেহের অধিকারী, সুন্দর ও সুশ্রী ছিলেন। মাথায় চুল ছিল কম তবে মুখে দাঁড়ি ছিল ঘন। রং, রূপ ও চেহারায় মাধুর্যতা ছিল আকর্ষণীয়। সুদৃঢ় বাহু, হাল্কা-পাতলা এবং উজ্জ্বল্য নয়ন বিশিষ্ট ছিলেন। কথা-বার্তায় গাম্ভীর্য, নিরবতা প্রিয়, চলার সময় নিম্নদৃষ্টি, অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন। রাগান্বিত হলে শাহাদতী আঙ্গুল দ্বারা বারবার ইশারা করার অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর আংটিতে লিখা ছিল- اَلصَّبْرُ مَعَ الْاِيْمَانِ بِاللهِ يُوْرِثُ الظَّفَرَ আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে ধৈর্য্য ধারণ করলে সফলতা অর্জিত হয়।

নবুয়ত লাভঃ হযরত ইদ্রিস আ. এমনিই প্রথম থেকে অত্যন্ত ইবাদত গুজার লোক ছিলেন। সর্বদা নির্জনে থেকে ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবুয়তের মর্যাদায় আসীন করেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রতি তিরিশখানা সহীফা তথা আসমানী ঐশীগ্রন্থ নাযিল করেছেন।

---

১৮৪. ইবনে আসাকির, খণ্ড-২৩, ২৮১, সূত্রঃ প্রাগুক্ত।
১৮৫. তাফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড-৫, পৃ. ৪০৬, সূত্রঃ জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৮৫।

তৎকালে বাহাত্তর ভাষার প্রচলন ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সব ভাষাজ্ঞান দান করেছিলেন। যে যেই ভাষার লোক, তিনি তাকে সেই ভাষায় দাওয়াত দিতেন, ওয়ায-নসিহত করতেন।

তাঁর বৈশিষ্ট্য: ইমাম বগভী র. লিখেছেন, হযরত ইদ্রিস আ.ই সর্বপ্রথম কলম দ্বারা লেখার প্রচলন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম সেলাই করা কাপড় পরিধানের প্রথা আবিষ্কার করেন। এর পূর্বে মানুষ চামড়ার পোশাক পরিধান করত। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন যুদ্ধাস্ত্র। তিনিই সর্বপ্রথম অস্ত্র দিয়ে শত্রুর বিরোদ্ধে যুদ্ধ ও সংগ্রাম করেছিলেন। জ্যোর্তিবিদ্যা ও অংক শাস্ত্রেরও প্রথম আবিষ্কারক তিনি।[১৮৬]

বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজের জামা-কাপড় নিজেই সেলাই করে ব্যবহার করতেন এবং অন্যকে জামা-কাপড় সেলাই করে দিতেন। অবশ্য সেজন্য তিনি কোন পারিশ্রমিক নিতেন না।

তিনি এতই ইবাদতকারী ছিলেন যে, একদিকে তিনি কাজ করতেন, অন্য দিকে মনে মনে আল্লাহর যিকির করতেন। জামা-কাপড় সেলাই করার সময় সূচের প্রতিটি ফোঁড়ে ফোঁড়ে তিনি আল্লাহর নামের তাসবীহ পাঠ করতেন।[১৮৭]

তাঁর আবিষ্কৃত বস্তু সমূহ: ১. দাঁড়ি পাল্লা, ২. জিহাদের জন্য যুদ্ধাস্ত্র, ৩. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, ৪. গণিত এবং নক্ষত্র বিদ্যার উপর গবেষণা, ৫. কলম দ্বারা লিখন, ৬. কাপড় সেলাই বিদ্যা, ৭. কাবিল গোত্রকে বন্দী করা, ৮. সর্বপ্রথম তিনিই সূতার কাপড় পরিধান করেছেন।[১৮৮]

হযত ইদ্রিস আ. সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا - وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا - হে প্রিয় হাবীব! এই কিতাবে ইদ্রিসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবী। আমি তাকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম।[১৮৯] ইঞ্জিল কিতাবের বর্ণনা মতে পৃথিবীতে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৫৬ বছর।[১৯০]

---

[১৮৬]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৭, পৃ. ৩৯৪।
[১৮৭]. মাওলানা তাহের সূরাটী, (ভারত), কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৬৬।
[১৮৮]. তাফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড-৫, পৃ. ৪০৬, সূত্রঃ জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৮৭।
[১৮৯]. সূরা মরয়ম, আয়াতঃ ৫৬-৫৭।
[১৯০]. তাযকারাতুল আম্বিয়া, কৃতঃ জামীর আলী, পৃ. ৯২, সূত্রঃ প্রাগুক্ত।

হযরত ইদ্রিস আ.'র আকাশারোহণের ঘটনাঃ হযরত কা'ব আহবার প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, একদিন হযরত ইদ্রিস আ. প্রখর রোদের মধ্যে সারাদিন পথ চললেন। শেষে ক্লান্ত হয়ে বললেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! একদিন পথ চলতেই আমি এতো ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু যে দিন সকলে পাঁচশত বছরের পথ অতিক্রম করতে বাধ্য হবে, সেদিন তাদের কী দূরবস্থাই না হবে। তাই তোমার সকাশে আমার প্রার্থনা– তুমি সূর্যের উত্তাপকে কিছুটা স্তিমিত করে দাও। পরদিন সকালে সূর্য পরিচালনাকারী ফেরেশতা অনুভব করলো সূর্যের উত্তাপ অনেকটা স্তিমিত। সে আল্লাহ্ সকাশে জিজ্ঞেস করলো, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! সূর্যের উত্তাপ স্তিমিত হওয়ার কারণ কী। আল্লাহ্ বললেন, আমি এরকম করেছি আমার প্রিয়বান্দা ইদ্রিসের প্রার্থনার কারণে। ফেরেশতা বললো, হে পরোয়ারদিগার! তুমি তাকে আমার বন্ধু করে দাও। আল্লাহ্ বন্ধুত্বের অনুমতি দিলেন। ফেরেশতা উপস্থিত হলো হযরত ইদ্রিসের নিকটে। হযরত ইদ্রিস তাঁর পরিচয় পেয়ে বললেন, আমি জানি আপনি মহাসম্মানিত এক ফেরেশতা। মৃত্যুর ফেরেশতা আযরাঈলও আপনাকে সমীহ করেন। তাই আমি বলি, আপনি তার নিকট আমার জন্য এইমর্মে সুপারিশ করুন যেনো তিনি আমার মৃত্যুর সময় কিছুটা পিছিয়ে দেন। আর বর্ধিত আয়ু পেয়ে আমি যেনো আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি এবং করতে পারি আরো অধিক ইবাদত। ফেরেশতা বললো, মৃত্যুর সময়তো সুনির্ধারিত। তবুও আমি মৃত্যুর ফেরেশতার নিকট আপনার আবেদনটি উত্থাপন করবো। এরপরে সূর্যের ফেরেশতা হযরত ইদ্রিসকে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে গেলো। সূর্যের কাছাকাছি একস্থানে তাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখে সে উপস্থিত হলো মৃত্যুর ফেরেশতার কাছে। বললো, আদম সন্তানদের মধ্যে একজন বন্ধু রয়েছেন আমার। তিনি আমাকে তার মৃত্যুর সময় কিছুটা পিছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আপনার কাছে সুপারিশ করতে বলেছেন। মৃত্যুর ফেরেশতা বললো, এরকম করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমি কেবল তাঁর মৃত্যুলগ্নের কথা পূর্বাহ্নে জানিয়ে দিতে পারি। এতে করে তিনি মৃত্যুর জন্য যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবেন। একথা বলে মৃত্যুর ফেরেশতা তার দপ্তর খুলে বসলো। তারপর বললো, আপনি এমন এক লোকের কথা বলছেন, যার মৃত্যুর কোনো তারিখ আমার দপ্তরে নেই। তার মৃত্যু পৃথিবীতে হবে না। হবে আকাশে। সুতরাং আপনি গিয়ে দেখুন, তিনি আর জীবিত নেই। সূর্যের ফেরেশতা তখন হযরত ইদ্রিসের নিকটে গিয়ে দেখলো, সত্যিই তিনি মৃত।

ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, আকাশে হযরত ইদ্রিস জীবিত অবস্থায় রয়েছেন না মৃত অবস্থায়– সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্নরকম মন্তব্য করেছেন।

একদল বলেছেন, তিনি আকাশে জীবিত অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর মতো মৃত্যুহীন জীবনপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন চারজন। তন্মধ্যে দু'জন রয়েছেন আকাশে এবং অবশিষ্ট দু'জন রয়েছেন পৃথিবীতে। আকাশের অমর নবীদ্বয়ের নাম হযরত ইদ্রিস ও হযরত ঈসা আ.। আর পৃথিবীর অমর নবীযুগল হচ্ছেন হযরত খিজির ও হযরত ইলিয়াস আ.। ওয়াহাব আরো বলেছেন, হযরত ইদ্রিস আ. ছিলেন অত্যধিক ইবাদত গুজার। তখনকার বিশ্বাসীগণর সম্মিলিত ইবাদতের সমান ইবাদত করতেন তিনি একাই। ফেরেশতারা একথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলো। কৌতূহলী হয়ে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে মৃত্যুর ফেরেশতা হযরত ইদ্রিসের সঙ্গে সাক্ষাত করলো। হযরত ইদ্রিস আ. নিয়মিত রোযা রাখতেন। তাই ইফতারের সময় তিনি মানবরূপী ফেরেশতা মেহমানকে যথারীতি ইফতার করতে বললেন। কিন্তু মেহমান তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলো না। পরপর তিনদিন এরকম ঘটলো। শেষে হযরত ইদ্রিস আ. জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রিয় অতিথি! আপনার পরিচয় দিন। সে বললো, আমি মৃত্যুর ফেরেশতা। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমি আপনার সঙ্গলাভের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত। হযরত ইদ্রিস আ. বললেন, তবে আমার একটি কাজ করে দিন। অতিথি বললো, কি কাজ? হযরত ইদ্রিস আ. বললেন, আমার প্রাণ হরণ করুন। আল্লাহ্র হুকুমে মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁর জান কবজ করলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আল্লাহ্র হুকুমে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠলেন। অতিথি বললো, এরকম ঘটলো কেনো? হযরত ইদ্রিস আ. বললেন, আমি মৃত্যুর আস্বাদ পেতে চেয়েছিলাম। মৃত্যুবরণ করা আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। আল্লাহ্ আমার ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। এখন আমি যথাসময়ে মৃত্যুবরণ করার যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবো। কারণ মৃত্যুর স্মৃতি আমার স্মরণপটে থাকবে সদা জাগরূক। এখন আপনি আরো একটি কাজ করে দিন আমার। আমাকে নিয়ে চলুন আকাশে। দেখিয়ে দিন বেহেশত ও দোযখ। মৃত্যুর ফেরেশতা এবারও অনুমতি পেলো। হযরত ইদ্রিস আ.'কে নিয়ে প্রথমে গেলো দোযখের দ্বারপ্রান্তে। হযরত ইদ্রিস আ. বললেন, দোযখের প্রধান প্রহরীকে বলে দরজা খোলার ব্যবস্থা করুন। তাই করা হলো। হযরত ইদ্রিস আ. ভালো করে দেখে নিলেন দোযখের অভ্যন্তর ভাগ। তারপর বললেন, দোযখ তো দেখা হলো। এবার আমাকে নিয়ে চলুন বেহেশতে। মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁকে নিয়ে উপস্থিত হলো বেহেশতে। আল্লাহ্র নির্দেশে ও তাঁর অনুরোধে বেহেশতের দরজাও খুলে দেয়া হলো। হযরত ইদ্রিস আ. ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন, বেহেশতের অপরূপ রূপ। মৃত্যুর ফেরেশতা বললো, এবার ফিরে চলুন। হযরত ইদ্রিস আ. একটি বৃক্ষের ঢাল আঁকড়ে ধরে বললেন, আমি এখান থেকে কোথাও যাবো না। আল্লাহর নির্দেশে তখন সেখানে উপস্থিত হলো আর একজন ফেরেশতা।

বললো, আপনি ফিরে যেতে রাজি হচ্ছেন না কেনো? হযরত ইদ্রিস আ. বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন, সকলকেই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমি তা আস্বাদন করেছি। আল্লাহ্ আরো বলেছেন, সকলকেই দেখানো হবে দোযখ। তা-ও অবলোকন করেছি আমি। একথাও তিনি বলেছেন, বেহেশতে প্রবেশকারীরা আর কখনো বহিষ্কৃত হবে না। আমি তো সেই জান্নাতেই প্রবেশ করেছি। সুতরাং আমি এখান থেকে বের হবো কেনো? আল্লাহ্ তখন মৃত্যুর ফেরেশতাকে জানালেন, আমার অনুমতিক্রমেই তো সে বেহেশতে প্রবেশ করেছে। সেখান থেকে বের হতে হলে আমার অনুমতিক্রমেই তা হবে। তোমাদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আর কোনো চেষ্টা করো না। এভাবেই হযরত ইদ্রিস আ. লাভ করেছেন এক ব্যতিক্রমী উচ্চ মর্যাদা।[১৯১]

৫. হযরত নূহ আ.

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

নূহ ইবনে লামেক ইবনে মুতাওয়ালাখ ইবনে আখনক খুনূখ (ইদ্রিস আ.) ইবনে ইয়ারুদ ইবনে মাহলায়েল ইবনে কায়নান ইবনে আনূশ ইবনে শীষ আ. ইবনে আদম আ.।

তিনি হযরত আদম আ.'র ইন্তেকালের একশ ছাব্বিশ বছর পর জন্মলাভ করেন। হযরত আদম আ.'র পর তিনিই একমাত্র নবী যিনি রাসূলও ছিলেন।[১৯২] পবিত্র কুরআনে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত আকারে মোট ২৮টি সূরায় মোট ৪৩ স্থানে হযরত নূহ আ.'র ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে সূরা আ'রাফ, সূরা হুদ, সূরা মু'মিনুন, সূরা শুয়ারা, সূরা কামর এবং সূরা নূহে। উপরোক্ত সূরা সমূহের আয়াতের বর্ণনার আলোকে নিম্নে তাঁর জীবন কাহিনী বর্ণিত হল।

হযরত নূহ আ.'র সম্প্রদায়ের লোকেরা ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসর নামক দেব-দেবীর পূজা করত। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ আ.কে নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন। যেহেতু তিনি একটি সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত হয়েছেন তাই তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে সঠিক পথের দিশা দিয়ে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি তাদেরকে মূর্তি পূজার শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু সম্প্রদায়ের লোকেরা

[১৯১]. কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথি র., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৭, পৃ. ৩৯৪-৩৯৬।
[১৯২]. নবী বলা হয় যে ইনসানের উপর ওহী নাযিল হয় আর রাসূল বলা হয় যার উপর আসমানী কিতাব ও নতুন শরীয়ত অবতীর্ণ হয়।

তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। সম্প্রদায়ের নেতারা বলল, হে নূহ! তুমি আমাদের মধ্যে গরীব ও নিঃস্ব আর তোমার অনুসারীরাও ইতর শ্রেণীর লোক। আমরা কীভাবে তোমাকে নবী বলে স্বীকার করব? তুমি তো আমাদের ন্যায় একজন মানুষ। কেবল তা নয় বরং তারা নূহ আ.কে চলার পথে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিত তারপর গলাটিপে ধরত আবার কখনো প্রহার করত। এভাবে অত্যাচার আরম্ভ করে দিল তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, হযরত নূহ আ.কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্মম প্রহারে জর্জরিত করতো। প্রহৃত হয়ে তিনি কখনো মাটিতে ঢলে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। এতে লোকেরা খুশী হতো। মনে করতো তিনি পরলোকগমণ করেছেন। অচেতন নবীকে তারা বস্ত্রাচ্ছাদিত করে ফেলে রেখে আসতো তাঁরই গৃহে। কিন্তু দেখা যেতো দু'একদিন পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে আহত নবী পুনরায় আরম্ভ করতেন সত্য ধর্মের অন্তরঙ্গ প্রচার।

এক বর্ণনায় এসেছে, জনৈক বৃদ্ধ তার ছেলের সাথে পথ চলতে চলতে হযরত নূহের সাক্ষাত পেল। বৃদ্ধটি তার ছেলেকে বলল, বৎস, সাবধান! এই বুড়োর খপ্পরে পড়ো না। সে কিন্তু পাগল। ছেলে পিতাকে বলল, আপনার লাঠিটা দিন। এই বলে পিতার লাঠি দিয়ে উপর্যুপরি প্রহার করতে লাগল বয়োবৃদ্ধ নবীকে। এভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন তিনি। এতদসত্ত্বেও তিনি সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমার প্রার্থনা করতেন। তিনি ভেবেছিলেন হয়তো পরবর্তী প্রজন্ম ফিরে আসবে সত্য ধর্মের প্রতি। তিনি প্রায় সাড়ে নয়শত বছর যাবৎ দ্বীনি দাওয়াত দিয়েছিলেন দিন রাত। তাঁকে দেখলে সম্প্রদায়ের লোকেরা চাদর আবৃত অবস্থায় দূরে সরে যেতো। মাত্র কয়েক জন ব্যতিত বাকীরা ঈমান আনল না। অবশেষে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলতে লাগল- হে নূহ! তুমি যদি সত্য নবী হও তবে তোমার বর্ণিত আযাব নিয়ে এসো। তখন হযরত নূহ আ. দোয়া করলেন- হে পরওয়ারদিগার! আপনি কোন কাফিরকে পৃথিবীতে আযাব থেকে মুক্তি দিবেন না। তাদেরকে যদি আপনি এমনি ছেড়ে দেন তাহলে তারা আপনার অন্যান্য বান্দাহগণকে গোমরাহ করে ফেলবে এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মও তাদের ন্যায় পাপী কাফির হবে।

আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ আ.'র দোয়া কবুল করেছেন এবং প্রতিশ্রুত আযাবের ইঙ্গিত দেন। অপরদিকে মু'মিনগণ আযাব মুক্ত থাকার লক্ষে আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ আ.কে নৌকা নির্মাণের আদেশ দেন।

পবিত্র কুরআনে যে সকল নবী-রাসূলগণের উপর কিতাব ও সহীফা অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম উল্লেখ করা হয়েছে হযরত নূহ আ.'র।

কুরআনে বলা হয়েছে- إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ হে নবী মুহাম্মদ ﷺ! আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম।[১৯৩] সর্বপ্রথম নবী হলেন হযরত আদম আ.। অথচ এখানে তাঁর নাম উল্লেখ না করে হযরত নূহ আ.'র নামোল্লেখ করার কারণ হল- তিনি মহাপ্লাবন পরবর্তী মানবতার পিতা। মহাপ্লাবনের সময় তাঁর নৌকায় যারা ওঠেনি, তারা সকলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। রক্ষা পেয়েছিলেন কেবল তিনি ও তাঁর বংশধরেরা। আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র এরশাদ করেছেন- وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ তাঁর বংশকে কেবল আমি অবশিষ্ট রেখেছি।[১৯৪]

হযরত নূহ আ.'র আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন- ১. তিনিই প্রথম শরীয়ত প্রবর্তনকারী নবী। ২. সর্বপ্রথম তিনি শিরকের জন্য আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে ভীতিপ্রদর্শন করেছিলেন। ৩. তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাঁর উম্মতের প্রতি নেমে এসেছিল প্রথম আযাব। ৪. তাঁর বদদোয়ার কারণে তাঁর বিশ্বাসী বংশধর ব্যতিত পৃথিবীর সকল অধিবাসীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল। ৫. নবীগণের মধ্যে তিনিই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী হায়াত পেয়েছিলেন। তাঁর পৃথিবীর সাড়ে নয়শ বছরের হায়াত ছিল একটি অনন্য মু'জিযা। এই দীর্ঘ হায়াতের মধ্যে তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি, চুল সাদা হয়নি, শারীরিক শক্তিও ছিল অটুট। সুদীর্ঘ জীবনে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রদত্ত অনেক অত্যাচার সহ্য করেছিলেন তিনি। ৬. উলুল আযম রাসূলগণের মধ্যে তিনিই প্রথম।[১৯৫]

নূহ আ.'র সময়কাল: মুসতাদরাক গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আদম আ. থেকে হযরত নূহ আ. পর্যন্ত ব্যবধান ছিল দশ পুরুষের। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত নূহ আ. হযরত ইদ্রিস আ.'র পরবর্তী সময়ের নবী। আর হযরত ইদ্রিস আ. হযরত নূহ আ.'র পূর্ববর্তী সময়ের নবী। অধিকাংশ সাহাবীও এরকম অভিমত প্রকাশ করেছেন। কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত আদম আ.'র ১৬৫০ অথবা ২২৬২ বছর পর হযরত নূহ আ.'র আর্বিভাব হয়।

ইমাম বগভী র.'র মতে হযরত নূহ আ.'র প্রকৃত নাম ছিল সাকান, শাকির অথবা ইয়াশাকির। হযরত আদম আ.'র পর তিনিই ছিলেন তাঁর সমকালীন মানবতার পথপ্রদর্শক এবং আশ্রয়স্থল। তাই তাঁর নাম হয়েছে সাকান। আল্লামা

---

[১৯৩]. সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৩।
[১৯৪]. সূরা সফ্ফাত, আয়াত: ৭৭।
[১৯৫]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৩, পৃ. ৩৫০।

সুয়ূতী র. তাঁর ইতকান গ্রন্থে মুসতাদরাক গ্রন্থের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, হযরত নূহ আ.'র প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল গাফ্ফার। তিনি নিজের জন্য এবং স্ব সম্প্রদায়ের জন্য অনেক কেঁদেছেন। তাই তাঁর উপাধি হয়েছে নূহ। অথবা কিয়ামতের জন্য তিনি অধিকাংশ সময় থাকতেন রোদন ভারাক্রান্ত। তাই তাঁর নাম হয়েছে নূহ।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি একবার কুৎসিতদর্শন একটি কুকুরকে দেখে বলেছিলেন, কী কুৎসিত! আল্লাহ তখন কুকুরের মুখে ভাষা খুলে দিলেন। কুকুর বলল, দোষ কি তবে আমার না স্রষ্টার? একথা শুনে হযরত নূহ আ. বেঁহুশ হয়ে গেলেন। হুঁশ ফিরে আসলে এর জন্য তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে ক্রন্দন করলেন।

ইমাম বগভী র. লিখেছেন, কপালে ফোঁটা বিশিষ্ট একটি কুকুরকে দেখে হযরত নূহ আ. একবার বলেছিলেন, নাপাক, নাপাক। দূর হয়ে যাও। এরপর ওহী অবতীর্ণ হল- হে নূহ! তুমি কি কুকুরকে দোষারোপ করছ না তার সৃষ্টিকর্তাকে।

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি অবিশ্বাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তাদের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। তাই আল্লাহ তায়ালা অবিশ্বাসীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন মহাপ্লাবনের মাধ্যমে। সেই বদদোয়া করার কারণে তিনি অনেক কেঁদেছেন। তাই তিনি হয়েছেন নূহ।

কারো কারো মতে মহাপ্লাবনের সময় তাঁর এক অবিশ্বাসী পুত্র কেনানকে উদ্ধারের জন্য তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন। ওই স্বাভাবিক অথচ নিষিদ্ধ পুত্র বাৎসল্যের কথা স্মরণ করে তিনি প্রায়শ: লজ্জিত ও রোদনার্থ থাকতেন, তাই তিনি উপাধি পেয়েছেন নূহ।[১৯৬]

দৈহিক আকৃতি:

হযরত নূহ আ.'র চেহারা মোবারক, চোখ মোবারক ছিল বড়। হাত পায়ের জোড়া ও উরু ছিল মোটা এবং পায়ের গোড়ালী ছিল হাল্কা পাতলা। মুখের দাড়ি ছিল লম্বা এবং শারিরীক গঠন ছিল দৈর্ঘ্য। সুঠাম দেহের অধিকারী ও গঠন প্রকৃতি ছিল খুবই সুন্দর।[১৯৭]

হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ বর্ণনা করেন, হযরত নূহ আ. তাঁর সমকালের সকলের চেয়ে অধিক সুন্দর ছিলেন। তিনি চেহারায় নেকাব পরিধান করতেন। নৌকার আরোহীগণ যখন ক্ষুধা অনুভব করতেন, তখন হযরত নূহ আ.'র চেহারা মোবারক দেখলেই তাদের ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যেতো।[১৯৮]

---

[১৯৬]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, বাংলা, খণ্ড-৪, পৃ. ৪৭৬-৪৭৭।
[১৯৭]. রূহুল মায়ানী, খণ্ড-৩০, পৃ. ৬৮, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৯৪।
[১৯৮]. ইবনে আসাকির, খণ্ড-৬২, পৃ. ২৭২, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ১২৭।

নবুয়ত লাভের সময়: হযরত নূহ আ.'র নবুয়ত লাভের সময়কাল নিয়ে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.'র মতে হযরত নূহ আ. চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন। নয়শত পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি ধর্মপ্রচার করেছিলেন, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে।

'খুলাসাতুস সায়ের' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নূহ আ. নবী হয়েছিলেন তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে। মহাপ্লাবনের পর তিনি পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন চার শত পঞ্চাশ বছর। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি নবী হয়েছিলেন মতান্তরে ২৫০/ ৪৫০/ ৪৬০ বছর বয়সে।

মহাপ্লাবন শেষ হওয়ার পর তিনি পৃথিবীতে অবস্থানগ্রহণ করেছিলেন আরো দুইশত পঞ্চাশ বছর। তাঁর পৃথিবীর বয়স ছিল সর্বমোট চৌদ্দশত পঞ্চাশ বছর।

মুকাতিল বলেছেন, একশত বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেছিলেন হযরত নূহ আ.। ইবনে জারির বলেছেন, হযরত নূহ আ. জন্মগ্রহণ করেছিলেন হযরত আদম আ.'র মহাপ্রস্থানের আটশত ছাব্বিশ বছর পর।[১৯৯]

হযরত নূহ আ.'র দাওয়াত: প্রথিবীতে হযরত আদম আ. যদিও প্রথম নবী, কিন্তু তাঁর আমলে ঈমানের সাথে কুফ্র ও গোমরাহীর মোকাবেলা ছিলনা। তাঁর শরীয়তের অধিকাংশ বিধানই পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কুফ্র ও কাফিরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিলনা। ঈমানের সাথে কুফর ও শিরকের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে হযরত নূহ আ.'র আমল থেকে।

হযরত নূহ আ. ছিলেন আদম আ.'র অষ্টম পুরুষ। মুস্তাদরাকে হাকেমে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত মতে আদম আ. ও নূহ আ.'র মাঝখানে দশ শতাব্দির ব্যবধান ছিল। একশ বছরে এক শতাব্দি হয়। এ হিসাব মতে তাঁদের উভয়ের মাঝে এক হাজার বছরের ব্যবধান ছিল।

এই দীর্ঘ সময়ে মানুষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নামের মূর্তি বানিয়ে সেগুলোর পূজারী হয়ে গেল। শয়তান এ ব্যাপারে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ সাহায্য ও উৎসাহিত করেছিল। তাই হযরত নূহ আ. নবুয়ত প্রাপ্তির পর সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা, কুফর ও শিরক পরিত্যাগ করে তৌহিদ তথা এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দেয়া আরম্ভ করলেন। মূর্তিপূজা ও শিরকের শাস্তিস্বরূপ ইহ ও পরকালের কঠিন শাস্তি সম্পর্কেও সম্প্রদায়ের লোকদেরকে অভিহিত করেছেন।

পবিত্র কুরআনে হযরত নূহ আ.'র দাওয়াত সম্পর্কে বিভিন্ন সূরায় বহু আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন- لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ

---

[১৯৯]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৪, পৃ. ৪৭৭।

مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا
لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ . أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ
جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

অর্থ: নিশ্চয় আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল: আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! আমি কখনও ভ্রান্ত নই; কিন্তু আমি বিশ্বপ্রতিপালকের রসূল। তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমনসব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না। তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপলকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে– যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যেন তোমরা সংযত হও এবং যেন তোমরা অনুগৃহীত হও।[২০০]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ . أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ . অর্থ: আর অবশ্যই আমি নূহ আ.-কে তাঁর জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি, (তিনি বললেন) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো এবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করছি।[২০১]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ . অর্থ: আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তোমরা কি ভয় কর না?[২০২]

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ . أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ . يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

[২০০]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৫৯-৬২।
[২০১]. সূরা হূদ, আয়াত: ২৫-২৬।
[২০২]. সূরা মু'মিনুন, আয়াত: ২৩।

وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . অর্থ: আমি নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি একথা বলে: তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসার আগে। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী। এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার এবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।[২০৩]

তিনি দিনে ও রাতে, প্রকাশ্যে ও গোপনে, একাকী নির্জনে ও জন সমাবেশে এভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে মানুষকে হেদায়েত করতেন। কিন্তু কোনটাই কাজে আসলনা। তিনি প্রায় সাড়ে নয়শত বছর যাবৎ এভাবে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে দ্বীনি দাওয়াত দিয়েছিলেন। মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতিত কেউ ঈমান আনেনি। পবিত্র কুরআনে তাঁর দাওয়াতী কৌশল বর্ণিত হয়েছে এভাবে– قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا . فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا . وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا . ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا . ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا . অর্থ: সে বলল: হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি; কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি।[২০৪]

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ আ.কে নবুয়ত প্রদান করে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি যখন তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট গেলেন তখন ঈদের দিন ছিল। তারা মূর্তিপূজায় এবং মদ্যপানে লিপ্ত ছিল। জীব-জন্তুর ন্যায় প্রকাশ্যে স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত ছিল। তিনি উচ্চস্বরে আওয়ায দিয়ে তাওহীদের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা তাঁকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে প্রহার করছিল।[২০৫]

[২০৩]. সূরা নূহ, আয়াত: ১-৩।
[২০৪]. সূরা নূহ, আয়াত: ৫-৯।
[২০৫]. রুহুল বয়ান, খণ্ড-৪, পৃ. ১৫৫, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৯৬।

সম্প্রদায় প্রধান কর্তৃক দাওয়াত প্রত্যাখ্যান:

যুগে যুগে দেখা গেছে যে, যে কোন নবী-রাসূলের আগমন হলে সর্বপ্রথম সমাজের প্রতাপশালী নেতা বা প্রধানরাই বিরোধীতা ও প্রত্যাখ্যান করে থাকে। কারণ নবী-রাসূল হওয়ার জন্য তারা নিজেদেরকেই অধিক যোগ্য বলে মনে করে। আরো একটা প্রমাণিত সত্য যে, অধিকাংশ নবী-রাসূলগণের দ্বীনি দাওয়াতে সর্বাগ্রে সাড়াদানকারী হয় সাধারণ গরীব, নিঃস্ব, মযলুম জনগোষ্ঠি। হযরত নূহ আ.'র বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রথমত: তার সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী প্রধানরা বলল, اِنَّا لَنَرٰيكَ فِى ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি।

তার উত্তরে হযরত নূহ আ. বলেছিলেন- قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ . أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. অর্থ: সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! আমি কখনও ভ্রান্ত নই; কিন্তু আমি বিশ্বপ্রতিপালকের রসূল। তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমনসব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না। তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে- যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যেন তোমরা সংযত হও এবং যেন তোমরা অনুগৃহীত হও।[২০৬]

তাঁর সম্প্রদায়ের সর্দাররা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার আরো একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলল। তা হল তারা বলতে লাগল- নূহ তো আমাদের মতই একজন মানুষ। সে কেবল আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজেকে রাসূল দাবী করতেছে। অথচ সামাজিকভাবে এবং ধন-দৌলতে আমরাই শ্রেষ্ঠ।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا অর্থ: তার কওমের কাফের প্রধানরা বলল, আমরা তো আপনাকে আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতিত আর কিছু মনে করি না।[২০৭]

[২০৬]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৬১-৬৩।

[২০৭]. সূরা হুদ, আয়াত: ২৭।

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ما سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ . إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ . অর্থ: তখন তার সম্প্রদায়ের কাফের-প্রধানরা বলেছিল: এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই নাযিল করতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরূপ কথা শুনিনি। সে তো এক উন্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়। সুতরাং কিছুকাল তার ব্যাপারে অপেক্ষা কর।[২০৮]

তারা মনে করত যে, নূহ আ. তো আমাদের মতই একজন মানুষ। আমাদের মত পানাহার করেন, হাট-বাজারে যাতায়াত করেন। নিদ্রা যান, জাগ্রত হন সব কিছু স্বাভাবিক। আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূলরূপে কোন মানুষের প্রেরিত হওয়া সমীচীন নয় বরং ফেরেশতা হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ ফেরেশতার মধ্যে মানুষের গুণাবলী অনুপস্থিত। তাদের মাধ্যমে মানবজাতির পথপ্রদর্শন মোটেই সমীচীন নয়। বরং মানুষের হেদায়েতের জন্যে মানুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে সেই মানুষের মধ্যে নবুয়তের অকাট্য প্রমাণ অবশ্যই প্রয়োজন। সাধারণত নবীদের মু'জেযাই নবুয়তের অকাট্য প্রমাণ।

আমাদের শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ'কেও মক্কার কাফির-মুশরিকরা একই যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল মুহাম্মদ তো আমাদেরই মত একজন মানুষ। তিনি কিভাবে নবী রাসূল হবেন? কোন নবী-রাসূলকে নিজেদের মত মনে করা কাফির-মুশরিকদের কাজ। বর্তমানেও মুসলমান নামধারী কিছু সম্প্রদায় আছে, যারা কাফির-মুশরিকদের ন্যায় রাসূল ﷺ'কে নিজেদের মত দোষে-গুণে সাধারণ মানুষ মনে করে। (নাউযুবিল্লাহি)।

হযরত নূহ আ.'র সম্প্রদায়ের উঁচু শ্রেণির লোকেরা তাঁকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল যে, হে নূহ! আমরা কিভাবে আপনাকে অনুসরণ করব? আপনার উপর ঈমান আনয়নকারী এবং আপনার অনুসারী সবাই আমাদের সমাজের মধ্যে সবচেয়ে ইতর, নিম্নশ্রেণীর এবং স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন। তাদের মধ্যে কোন সম্রান্ত, মর্যাদা সম্পন্ন, ভদ্র ও বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি দেখি না। আপনি যদি সত্য নবী হতেন, তবে সম্প্রদায়ের সম্মানিত লোকেরাই ঈমান আনত। এতাবস্থায় আমরা ঈমান আনলে আমরাও ইতর শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হব এবং ইতর শ্রেণীর লোকেরা আমাদের সমকক্ষ হয়ে যাবে। ফলে আমাদের আভিজাত্য ও কুলীনতার হানি হবে। তবে

[২০৮]. সূরা মু'মিনুন, আয়াত: ২৪-২৫।

আপনি যদি তাদেরকে আপনার কাছ থেকে বের করে দেন, তাহলে আমরা আপনার উপর ঈমান আনয়নের কথা বিবেচনা করতে পারি।

মক্কার কুরাইশরাও আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ কে একই প্রস্তাব দিয়েছিল। তারা বলেছিল, আপনি যদি ঐসব গরীব, কাঙ্গাল সাহাবীদেরকে মজলিস থেকে তুলে দেন, তাহলে আমরা আপনার অনুসরণ করতে পারি। তাদের সাথে একই মজলিসে বসতে আমাদের লজ্জাবোধ করে।[২০৯]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ . অর্থ: তখন তাঁর কওমের কাফের প্রধানরা বলল– আমরা তো আপনাকে আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না, আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না এবং আমাদের উপর আপনাদের কোন প্রাধান্য দেখি না, বরং আপনারা সবাই মিথ্যাবাদী বলে আমরা মনে করি।[২১০]

قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ . অর্থ: তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব যখন তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনেরা?[২১১]

হযরত নূহ আ. উত্তরে বলেছিলেন, যারা ঈমানী দৌলতে ধনবান এবং চরিত্র গুণে গুণবান তাদেরকে আমি মজলিস থেকে বের করে দিতে পারব না। কারণ প্রকৃত মর্যাদার মাপকাঠি হল ঈমান ও তাকওয়া। সত্য ধর্মে ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু এবং সাদা-কালোর কোন প্রভেদ নেই। আল্লাহর বান্দা ও ঈমানদার হিসাবে সকলের মর্যাদা সমান। তাছাড়া কারা উত্তম আর কারা অধম সেটা নির্ণয় করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আল্লাহর কাজ। সুতরাং আমি মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারব না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ . وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ . إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ . অর্থ: নূহ বললেন, তারা কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার? তাদের হিসাব নেয়া আমার পালনকর্তারই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে। আমি মুমিনগণকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই। আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।[২১২]

---

২০৯. রুহুল মায়ানী, খণ্ড-১২, পৃ. ৪১, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ১০০।

২১০. সূরা হুদ, আয়াত: ২৭।

২১১. সূরা শোআরা, আয়াত: ১১১।

২১২. সূরা শোআরা, আয়াত: ১১২-১১৫।

মানসিক ও দৈহিক নির্যাতন:

নূহ আ.'র সম্প্রদায়ের লোকেরা এতই নিষ্ঠুর ও যালিম ছিল যে, তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালি দিত এবং তাঁর নবুয়তের শানের বিরোধী কথা-বার্তা বলে তাঁকে মানসিক ভাবে কষ্ট দিত। মিথ্যাবাদী, পাগল, ইতর ইত্যাদি বলে তাঁকে লোক সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করত। তারা বলতإِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ সে তো এক উম্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়।[২১৩] তারা তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে বলত নূহ একজন পাগল লোক। তার কথায় কান দিওনা। এমনকি অবুঝ সন্তানদেরকে পর্যন্ত বুঝ হওয়ার পরে তাঁর বিরোধীতা করার তালীম দেয়া হত।

মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি তারা তাঁকে দৈহিক ভাবেও নির্যাতন করত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, হযরত নূহ আ.'কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্মম প্রহারে জর্জরিত করত। প্রহৃত হয়ে তিনি কখনো কখনো মাটিতে ঢলে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। লোকেরা খুশী হত। মনে করত, তিনি পরলোক গমণ করেছেন। অচেতন নবীকে তারা বস্ত্রাচ্ছাদিত করে ফেলে রেখে আসত তাঁর গৃহে। কিন্তু দেখা যেত দু'একদিন পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে আহত নবী পুনরায় শুরু করতেন সত্য ধর্মের অন্তরঙ্গ প্রচার। এক বর্ণনায় এসেছে, জনৈক বৃদ্ধ তার ছেলের সঙ্গে পথ চলতে চলতে সাক্ষাত পেল নবী নূহ আ.'র। বৃদ্ধটি বলল, বৎস! সাবধান, এই বুড়োর খপ্পরে পড়োনা। সে পাগল। ছেলেটি বলল, লাঠিটা দিন তো। একথা বলেই পিতার লাঠি নিয়ে উর্পযুপুরি প্রহার করতে লাগল বয়োবৃদ্ধ নবী নূহ আ.কে। এভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তিনি।[২১৪]

উবাইদ বিন উমাইর লাইসীর সূত্রে মুহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, স্বসম্প্রদায়ের লোকেরা হযরত নূহ আ.'র উপর অকথ্য অত্যাচার করত, প্রহার করত, কখনো গলাধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত মাটিতে। তারপর গলাটিপে ধরত। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতেন। জ্ঞান ফিরে এলে প্রার্থনা করতেন, হে করুণাময় প্রভু! আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা বোধ-বুদ্ধিহীন। তুমি তাদেরকে মার্জনা কর। তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো পরবর্তী প্রজন্মের বোধদোয় হবে, ফিরে আসবে সত্য ধর্মের প্রতি। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা হয়ে পড়ল আরো অধিক উন্নাসিক।

হযরত নূহ আ. যখন তাদেরকে দাওয়াত দিতে যেতেন কোন মাহফিল মজলিসে তখন তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ঢেকে পলায়ন করত এবং নিজের

---

২১৩. সূরা মু'মিনুন, আয়াত: ২৫।

২১৪. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, বাংলা, খণ্ড-৪, পৃ. ৪৯।

আঙ্গুল সমূহ কর্ণে প্রবেশ করে দিত যেন তাঁর কোন কথা তাদের কর্ণে প্রবেশ না করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا . فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا . وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا . ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا . ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا . فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . অর্থ: সে বলল: হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি; কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্য দাওয়াত দিয়েছি, অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। অতঃপর বলেছি: তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।[২১৫]

মৃত্যুর সময় নিজের ওয়ারিশদেরকে অসিয়ত করত যেন তাঁর সান্নিধ্যে না যায়। এক ব্যক্তি নিজের সন্তানকে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ার পথে হযরত নূহ'র সাক্ষাত হলে লোকটি সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বলল, হে আমার প্রিয় সন্তান! আমি যদি মরে যাই আর তুমি যদি জীবনে বেঁচে থাক তবে এই বৃদ্ধ থেকে দূরে থাকিও। কারণ সে একজন পাগল।[২১৬]

অবশেষে হযরত নূহ আ.'র সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে হত্যা করার হুমকি দিল। তারা বলল, তুমি আমাদের সাথে বেশী বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করতেছ। এসব কথাবার্তা থেকে বিরত থাক অন্যথায় আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে বাধ্য হব। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. অর্থ: তারা বলল, হে নূহ! যদি তুমি (দ্বীন প্রচার থেকে) বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।[২১৭]

আযাব নাযিলের দাবী:

হযরত নূহ আ. তাঁর সম্প্রদায়কে দ্বীন প্রচারকালে সত্য ধর্মে দীক্ষা লাভের জন্য ওয়ায-নসিহত করতেন। তিনি বলতেন-তোমরা মুর্তিপূজা, কুফর ও শিরক

[২১৫]. সূরা নূহ, আয়াত: ৫-১০।
[২১৬]. ইবনে আসাকির, খণ্ড-৬২, পৃ. ২৪৪, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ১০৬।
[২১৭]. সূরা শোআরা, আয়াত: ১১৬।

পরিত্যাগ না করলে আল্লাহর আযাব তোমাদের উপর নাযিল হবে। তখন তোমরা কেউ আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না। হযরত নূহ আ.'র প্রতি বিরক্ত হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা এক পর্যায়ে পৌঁছে বলল, হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে তর্ক করেছ এবং অনেক কলহ করেছ। এখন আর তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন নাই। তুমি যদি সত্যবাদি হও, তবে তোমার প্রতিশ্রুত আযাব নিয়ে এসো, যেন চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.- অর্থ: তারা বলল- হে নূহ! আমাদের সাথে আপনি তর্ক করেছেন এবং অনেক কলহ করেছেন। এখন আপনার সেই আযাব নিয়ে আসুন, যে সম্পর্কে আপনি আমাদিগকে সতর্ক করেছেন, যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন।[২১৮]

হযরত নূহ আ. দীর্ঘদিন যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজ জাতিকে তাওহীদ ও সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তেমন কোন ফল হলনা। তখন আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, হে নূহ! আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে যাদের ঈমান আনার যোগ্যতা ছিল, তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। সুতরাং আপনি তাদের জন্য চিন্তিত, দুঃখিত কিংবা বিমর্ষ হবেন না।

নূহ আ. কর্তৃক আযাব নাযিলের দোয়া:

একদিকে নূহ আ.'র সম্প্রদায় কর্তৃক আযাব নাযিলের দাবী অপর দিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসল যে, আদৌ যারা ঈমান আনেনি তারা ভবিষ্যতেও ঈমান আনবেনা- তখন হযরত নূহ আ. সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে আযাব নাযিলের প্রার্থনা করলেন। বললেন- رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ হে প্রভু! আপনি আমাকে সাহায্য করুন। কেননা, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।[২১৯]

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ . وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ . وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ . وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ . سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ . إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ . ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ . অর্থ: আর নূহ আমাকে ডেকেছিল। আর কি চমৎকারভাবে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে এক মহাসংকট থেকে রক্ষা করেছিলাম এবং

[২১৮]. সূরা হুদ, আয়াত: ৩২।
[২১৯]. সূরা মু'মিনুন, আয়াত: ২৬।

তার বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছিলাম। আমি তার জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি এভাবেই সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম। অতঃপর আমি অপরাপর সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।[২২০]

وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ . وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ . অর্থ: এবং স্মরণ করুন নূহকে; যখন তিনি এর পূর্বে আহ্বান করেছিলেন, তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিল। নিশ্চয়, তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।[২২১]

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ . فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ . ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ . অর্থ: নূহ বললেন, "হে আমার পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। অতএব, আমার ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সংগী মুমিনগণকে রক্ষা করুন। অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গিগণকে বোঝাই করা নৌকায় রক্ষা করলাম। এরপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম।"[২২২]

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا . إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا . অর্থঃ নূহ আরো বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃবাসীকে রেহাই দিবেন না। যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের।[২২৩]

নৌকা নির্মাণের নির্দেশ:

ইতিপূর্বে হযরত নূহ আ.'র সম্প্রদায়ের মধ্যে আযাবের প্রাথমিক অবস্থা পরিদৃষ্ট হল। তাদের উপর বৃষ্টি অবতরণ বন্ধ করে দেয়া হল। চল্লিশ কিংবা

[২২০]. সূরা আস্‌সাফ্‌ফাত, আয়াত: ৭৫-৮২।
[২২১]. সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৭৬-৭৭।
[২২২]. সূরা শোআরা, আয়াত: ১১৭-১২০।
[২২৩]. সূরা নূহ, আয়াত: ২৬-২৭।

সত্তর বছর পর্যন্ত তাদের নারীরা বন্ধ্যা হয়ে গেল। কোন সন্তান-সন্ততি জন্ম হয়নি এ সময়ের মধ্যে। এতেও যখন তারা তাওবা-এস্তেগ্‌ফার করল না তখন আল্লাহ্ তায়ালা হযরত নূহ আ.কে অভিনব পদ্ধতিতে নৌকা নির্মাণ করার আদেশ দেন। অথচ তিনি নৌকা চিনতেন না এবং তৈরী করতেও জানতেন না। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বললেন- وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ আর আপনি আমারই তত্ত্বাবধানে এবং আমারই প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করুন। আর পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলবেন না অর্থাৎ তাদের জন্য কোন সুপারিশ করবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে মরবে।[২২৪]

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে ইসহাক ইবনে বাশার এবং ইবনে আসাকির উল্লেখ করেছেন, নৌকা নির্মাণের নির্দেশ পেয়ে হযরত নূহ আ. নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্! তক্তা পাবো কোথায়? আল্লাহ্ জানালেন, গোফর অথবা শালগাছ বপন করুন। তিনি তাই করলেন। বিশ বছর পর্যন্ত গাছ বেড়ে উঠার জন্য অপেক্ষা করলেন। ওই বিশ বছর তিনি ধর্মপ্রচারের কাজ করেননি। বিরোদ্ধবাদীরাও আর অত্যাচার করেনি। অন্য বর্ণনায় আছে, চল্লিশ বছর। শাল বৃক্ষ যখন বড় হল তখন তিনি সেগুলোকে কেটে ফেঁড়ে তক্তা বানালেন। ভাল করে শুকিয়ে নিলেন। তারপর আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিব্রাঈল আ.'র সহযোগিতায় তিনি নৌকা নির্মাণ করলেন। এটি ছিল ত্রিতল বিশিষ্ট। সম্মুখভাগ ছিল মোরগের মাথার মত আর পশ্চাৎভাগ ছিল মোরগের পুচ্ছের মত। আর মধ্যভাগ ছিল পাখির বুকের মত সামনের দিকে প্রসারিত। দু'পাশে ছিল জানালা। তেলের সঙ্গে ধুপ মিশিয়ে পালিশ করা হয়েছিল নৌকার ভিতরে বাইরে। নৌকার দৈর্ঘ্য ছিল আশি হাত, প্রস্থ পঞ্চাশ হাত এবং গভীরতা ছিল ত্রিশ হাত।

হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নৌকাটি লম্বায় ছিল তিনশত হাত, পাশে পঞ্চাশ হাত আর উচ্চতায় ত্রিশ হাত। কাঠের নির্মিত ঐ নৌকায় নিচের তলায় ছিল বন্যপ্রাণী ও হিংস্র জানোয়ার। মধ্যম তলায় ছিল উট, ঘোড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশু। আর উপরের তলায় পানাহারের সামগ্রি ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন হযরত নূহ আ. ও তাঁর সঙ্গীগণ।

হযরত নূহ আ. কর্তৃক নির্মিত জাহাজখানায় সর্বমোট একলক্ষ চব্বিশ হাজার তক্তা ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এর একেকখানায় একলক্ষ চব্বিশ হাজার

[২২৪]. সূরা হুদ, আয়াত: ৩৭।

নবীর একেক জনের নাম লেখা হল। প্রথম তক্তায় লেখা হয়েছিল হযরত আদম আ.'র নাম আর সর্বশেষ তক্তায় লেখা হয়েছিল হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র নাম।

জাহাজখানা তৈরী করার পর হযরত নূহ আ. তা ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় লক্ষ্য করলেন যে, তাতে আরো চারখানা তক্তা দেয়ার প্রয়োজন আছে। অথচ তাঁর নিকট অতিরিক্ত কোন তক্তা নেই। চিন্তায় পড়ে গেলেন। ঐ তক্তা কোথায় পাওয়া যাবে? আর পাওয়া গেলেও ঐ তক্তা চারখানায় কাদের নাম লেখা হবে?

এমন সময় হযরত জিব্রাঈল আ. উপস্থিত হলেন এবং হযরত নূহ আ.কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর নবী! আপনি চিন্তা করছেন কেন? নূহ আ. সমস্যার কথা বললে, জিব্রাঈল আ. বললেন, নীল নদের তীরে একটি গাছ রয়েছে। আপনি কারো দ্বারা সেই গাছটি এনে তা দ্বারা চারখানা তক্তা বানিয়ে জাহাজে লাগিয়ে দিন। তারপর শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ'র একান্ত অন্তরঙ্গ এবং প্রধান চারজন সাহাবী যথা- ১. হযরত আবু বকর, ২. হযরত ওমর, ৩. হযরত ওসমান এবং হযরত আলী রা. এঁদের নাম তক্তায় লিখে দিন।

জিব্রাঈল আ. আরো বললেন, ঐ চারজনের নাম যুক্ত চারখানা তক্তা জাহাজে লাগাইলেই তা সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত থাকবে।

হযরত জিব্রাঈল আ.'র পরামর্শ অনুযায়ী হযরত নূহ আ. নিজের সন্তানগণকে নীল নদীর তীর থেকে গাছটি কেটে আনতে বললে তারা অপারগতা প্রকাশ করল। তারা বলল, এ কাজে আপনি 'উজ বিন ওনোক'কে পাঠিয়ে দিন। সে নীল নদের পথ চিনে এবং সে আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। এরপর হযরত নূহ আ. উজকে গাছ আনার প্রস্তাব দিলে সে শর্ত দিল যে, এর বিনিময়ে আমাকে এক বেলা পরিতৃপ্ত সহকারে খানা খাওয়াতে হবে। হযরত নূহ আ. তার শর্ত মেনে নিলেন। উজ খুশী হয়ে নীল নদীর তীরে গিয়ে একটানে গাছটি উপড়িয়ে ফেলল। তারপর তা কাঁধে নিয়ে চলে আসল এবং হযরত নূহ আ.'র কাছে পেশ করল। হযরত নূহ খুশী হয়ে তাকে তিনখানা রুটি খেতে দিলেন। উজ তা দেখে হেসে বলল, এই তিনখানা রুটি দিয়ে আমার কি হবে জনাব? এরূপ বার হাজার রুটি আমি প্রতি বেলায় খেয়ে থাকি এবং তা আমার সাধারণ খানা। হযরত নূহ আ. বললেন, তোমার ভাবনা কিসের, পেট ভরলেই তো হল। তুমি পরিপূর্ণ তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে রুটি দেয়া হবে। তবে 'বিসমিল্লাহ' বলে খানা খেতে শুরু করে দাও। উজ আশ্বস্ত হয়ে 'বিসমিল্লাহ' বলে রুটি খেতে আরম্ভ করল: কিন্তু সে মাত্র দেড়খানা রুটি খেতেই তার পেট সম্পূর্ণরূপে ভরে গেল। সে খানা খাওয়া বন্ধ করে দিল।

নূহ আ. জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে তোমার, খাচ্ছনা কেন? রুটিতো আরো রয়েছে। উজ বলল, আমার পেট ভরে গিয়েছে। একটুকরা খাবারও খাওয়ার সাধ্য আমার নেই। এরূপ পেট ভরে খাবার আমি জীবনে কখনো খাইনি। সুতরাং আমাকে আর খেতে বলবেন না। একথা বলে উজ খাওয়ার আসন থেকে উঠে গেল।

এরপর নূহ আ. উক্ত গাছের দ্বারা তক্তা বানিয়ে চারখানা তক্তা জাহাজে লাগিয়ে তাতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র চার সাহাবীর নাম লিখে দিলেন।[২২৫]

নৌকা যখন তৈরী হয়ে গেল তখন আল্লাহ তায়ালা নৌকাকে কথা বলার শক্তি দান করলেন। নৌকা বলল, لا اله الا الله فى الاولين والاخرين আমি এমন নৌকা যার মধ্যে কেবল তারাই আরোহণ করবে, যারা মুক্তিপ্রাপ্ত হবে আর তারাই পিছনে পড়ে থাকবে যাদের তাকদীরে ধ্বংস অবধারিত। আমার ভিতর শুধু মু'মিন মুখলিস ব্যক্তিরাই প্রবেশ করতে পারবে। একথা শুনে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, হে নূহ! এটাও তোমার যাদুর তামাশা।[২২৬]

বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ আ. দিনের বেলায় নৌকা নির্মাণ করতেন আর রাতের বেলায় তাঁর সম্প্রদায়ের দুষ্ট লোকেরা এসে ভেঙ্গে দিত। তিনি আল্লাহর দরবারে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করে বলেন, "হে নূহ! নৌকার হেফাযতের জন্য একটি কুকুর রাখুন। কুকুর আপনার নৌকা পাহারা দেবে।" আল্লাহর নির্দেশ মতে তিনি একটি কুকুর রাখলেন। নূহ আ. দিনের বেলায় নৌকা নির্মাণ করতেন আর রাতের বেলায় নিদ্রা যেতেন। রাতের বেলায় যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা নৌকা ভাঙ্গতে আসত তখন কুকুর চিৎকার করে উঠত। তখন হযরত নূহ আ. জাগ্রত হয়ে লাঠি নিয়ে তাদেরকে তাড়া করতেন আর তারা পালিয়ে যেত। হযরত নূহ আ.ই সর্বপ্রথম হেফাযতের জন্য কুকুর রেখেছিলেন।[২২৭]

নির্মাণকৃত নৌকা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রোপঃ

হযরত নূহ আ. যখন নৌকা তৈরী করতে লাগলেন তখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা এই নতুন জিনিস দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল- হে নূহ! আপনি এটি কি

---

[২২৫]. মাওলানা তাহের সুরাটী, ভারত, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৩-৭৪।
[২২৬]. তাফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড-৪, পৃ. ১৬৪, সূত্রঃ জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ১০৯।
[২২৭]. তাফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড-৪, পৃ. ১৬৪, সূত্রঃ প্রাগুক্ত।

এবং কেন তৈরী করতেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, এটি সমুদ্রে পানির উপর চলার উপযোগী নৌকা বা জাহাজ। অচিরেই তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব হিসাবে মহা প্লাবন আসবে। এ সময় এই নৌকায় যারা আরোহণ করবে কেবল তারাই মুক্তি পাবে। অন্যরা প্লাবনে ডুবে মরবে। তাঁর কথা শুনে সম্প্রদায়ের লোকেরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে বলত, 'এখানে পান করার মত পানিও দূর্লভ আর আপনি ডাঙ্গা দিয়ে জাহাজ চালাবার ফিকিরে আছেন।' তারা আরো বলত 'নূহ এতদিন যাবৎ তো নবী ছিলেন আর এখন দেখছি কারিগর হয়ে গেছেন। নৌকা তো বানাচ্ছেন পানি পাবেন কোথায়?'

তাদের উত্তরে নূহ আ. বলতেন, আজ তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস করছ, কিন্তু মনে রেখ, সেদিন দূরে নয়, আমরাও তোমাদেরকে উপহাসের পাত্র হতে দেখবো। অর্থাৎ যেদিন প্লাবন আসবে আর তোমরা অসহায় অবস্থায় ডুবে মরবে তখন তোমাদেরকে নিয়ে লোকেরা উপহাস করবে, যেভাবে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে করতেছ।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ . فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ অর্থ: তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন, আর তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পার্শ্ব দিয়ে যেত, তখন তাঁকে বিদ্রুপ করত। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রুপ তোমাদের উপহাস করছি। অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে– লাঞ্ছনাজনক আযাব কার উপর আসে এবং চিরস্থায়ী আযাব কার উপর অবতরণ করে।[২২৮]

মহা প্লাবনের আগমন:

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ আ.'র সম্প্রদায় আযাব আসার দাবী করেছিল এবং আল্লাহ তায়ালাও বলে দিলেন যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে আর কেউ ঈমান আনবে না। তখন নূহ আ. তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করেছেন তবে আযাব আল্লাহর ইচ্ছায় আসবে। দোয়ার ফল কখন প্রকাশ হবে তা সম্পূর্ণ আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল।

অবশেষ আল্লাহ তায়ালা অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর মহা প্লাবনের আযাব প্রেরণ করলেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ

২২৮. সূরা হূদ, আয়াত: ৩৮—৩৯।

অবশেষে যখন আমার ফায়সালা কার্যকরী করার সময় হল এবং উনুন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল।[২২৯]

কুরআনে বর্ণিত ' তান্নুর ' শব্দের বহু অর্থ রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠকেও তান্নুর বলে, রুটি বানানোর তন্দুরকেও তান্নুর বলে, যমীনের উঁচু অংশকেও তান্নুর বলে। কেউ বলেছেন, হযরত আদম আ.'র রুটি পাকানো তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে, যা সিরিয়ার 'আইনে ওয়ারদা' নামক স্থানে অবস্থিত। কেউ বলেন, হযরত নূহ আ.'র তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে, যা কুফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, শা'বী র. ও হযরত ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখ অধিকাংশ মুফাসসেরীন এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। ইমাম শা'বী র. কসম করে বলেন যে, উক্ত তন্দুর কুফা শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। কুফার বর্তমান মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে হযরত নূহ আ. তাঁর নৌকা তৈরী করেছিলেন। আর তন্দুর ছিল ঐ মসজিদের প্রবেশদ্বার।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ আ.কে মহা প্লাবনের পূর্বাভাস স্বরূপ আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যখন আপনার ঘরের উনুন ফেটে পানি উঠতে দেখবেন, তখন বুঝবেন যে, মহাপ্লাবন শুরু হয়েছে। এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন চুল্লিটি ছিল হিন্দে। তবে এটি কি হিন্দুস্থানের হিন্দ না কি ইরাকের হিন্দ নামক স্থান তা অনিশ্চিত। ইবনে আব্বাসের রা. উক্তিটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারির, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়খ ও হাকেম। হাকেম বলেছেন- উক্তিটি বিশুদ্ধ।[২৩০]

আল্লামা কুরতুবী বলেছেন, 'তান্নুর' শব্দের ব্যাখ্যায় মতভেদ পরিলক্ষিত হলেও আসলে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা প্লাবন যখন শুরু হয়েছে, তখন রুটি পাকানো তন্দুর হতেও পানি উঠেছে, সমতল ও উঁচু যমীন হতেও পানি উঠেছে। সিরিয়ার আইনুল ওয়ারদার তন্দুর হতেও উঠেছে এবং কুফার তন্দুর হতেও পানি উঠেছে। অল্প সময়ের মধ্যে চর্তুদিক থেকে পানি উঠে এসেছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ . وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا অর্থ: অতপর আমি মুষলধারায় বর্ষণের সাথে সাথে আসমানের দ্বার সমূহ খুলে দিলাম এবং যমীনে প্রস্রবণরূপে প্রবাহমান করলাম।[২৩১]

২২৯. সূরা হূদ, আয়াত: ৪০।
২৩০. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি-তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৬, পৃ. ৫৪।
২৩১. সূরা আল ক্বামার, আয়াত: ১১।

জীব-জন্তুদের জোড়ায় জোড়ায় নৌকায় নেয়ার আদেশ:

হযরত হাসান বসরী র. বর্ণনা করেছেন, প্রথম জননী হযরত হাওয়া আ.'র একটি প্রস্তর নির্মিত উনুন ছিল। ওই উনুনটি বংশানুক্রমে পেয়েছিলেন হযরত নূহ আ.। তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল- ওই উনুন থেকে জলোৎসারণ দেখতে পেলেই নৌকায় আরোহণ করবে।

তাঁর উনুন থেকে পানি উঠতে দেখে তিনি নৌকায় আরোহণের প্রস্তুতি নিচ্ছেলেন। পানাহার সামগ্রি ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নৌকায় তুললেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে আদেশ দিলেন– احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ হে নূহ! সর্বপ্রকার জোড়ার দু'টি করে (একটি নর ও একটি নারী) এবং যাদের উপর পূর্বাহ্নেই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদ দিয়ে, আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারকে নৌকায় তুলে নিন। বলাবাহুল্য, অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল।[২০২]

ইমাম বগভী র. বলেছেন, তখন হযরত নূহ আ. নিবেদন জানালেন, হে প্রভু! আমি জীবকুলের জোড়া বুঝব কিভাবে? আল্লাহ্ তায়ালা সকল প্রাণীকে তাঁর নিকটে একত্র করলেন আর হযরত নূহ আ. তাঁর হাতদ্বয় প্রসারিত করলেন। তাঁর ডানহাতে এল পুরুষ জাতীয় প্রাণী আর বাম হাতে আসল নারী জাতীয় প্রাণী। এভাবে জোড়া নির্ধারণ করে তিনি সেগুলোকে নৌকায় তুললেন।[২০৩]

হযরত নূহ আ.'র নৌকায় পৃথিবীর সর্ব ধরণের প্রাণীর সমাবেশ করা হয়নি। বরং যেসব প্রাণী স্ত্রী-পুরুষের মিলনে জন্ম হয় এবং পানির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারেনা, শুধু সেসব প্রাণীই উঠানো হয়েছিল। কোন জলজ প্রাণী উঠানো হয়নি। ডাঙ্গার প্রাণীকুলের মধ্যে যে সব পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, পুরুষ-স্ত্রীর মিলন ছাড়াই জন্ম হয় তাও বাদ পড়েছে। শুধু গরু-ছাগল, ঘোড়া-গাধা ইত্যাদি গৃহ পালিত ও অতীব প্রয়োজনীয় পশু-পাখি নৌকায় উঠানো হয়েছিল।

হযরত হাসান বসরী র. বলেন, নৌকায় কেবল ঐসব জানোয়ার তোলা হয়েছিল যেগুলো বাচ্চা দেয় অথবা ডিম দেয়। মাটি থেকে সৃষ্ট কোন জানোয়ার নৌকায় তোলা হয়নি।[২০৪]

হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা যখন নূহ আ.কে প্রত্যেক জীব-জন্তুর এক এক জোড়া করে নৌকায় তুলতে নির্দেশ দেন তখন নূহ আ. আরয করলেন, মাওলা! আমি সিংহ ও গরু, বাঘ, ছাগল,

[২০২]. সূরা হুদ, আয়াত: ৪০।

[২০৩]. তাফসীরে কাবীর, খণ্ড-৯, পৃ. ২৩৪ ও তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৬, পৃ. ৫৫।

[২০৪]. রূহুল বয়ান, খণ্ড-৪, পৃ. ১৬৮, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১১২।

কবুতর ও বিড়ালকে কিভাবে একত্রিত করব? এগুলো তো একটি আরেকটির প্রতি শত্রুতা পোষন করে এবং আক্রমণ করে। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে কে? নূহ আ. উত্তর দিলেন, আপনিই তা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ বললেন, আমিই আবার তাদের ভালবাসা সৃষ্টি করে দিব। ফলে একে অন্যের ক্ষতি করবে না।[২০৫]

নৌকায় আরোহণকারীর সংখ্যা:

হযরত নূহ আ.'র নৌকায় কতজন আরোহী ছিলেন তা নিয়ে ওলামাগণের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। হযরত কাতাদাহ, ইবনে জুরাইজ ও মুহাম্মদ বিন কা'ব কারাজির মতানুসারে আরোহী ছিলেন আটজন। তন্মধ্যে হযরত নূহ আ. ও তাঁর স্ত্রী, তাঁর তিন পুত্র- শাম, হাম ও ইয়াফিস এবং তাদের তিন বধু ছিলেন।

ইবনে জরির ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, ইবনে জুরাইজ বলেছেন, হযরত নূহ আ.'র সাথে নৌকায় উঠেছিলেন তাঁর তিন পুত্র ও তিন পুত্রবধু। পুত্র গণের নাম ছিল- শাম, হাম ও ইয়াফিস। ভাসমান ওই নৌকায় আপন স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়েছিলেন হাম। এ কারণে নূহ আ. তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ফলে, হামের স্ত্রী প্রসব করেছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণের একটি সন্তান। হযরত আ'মশ, বলেছেন, নৌকায় আরোহী ছিলেন মোট সাত জন। হযরত নূহ আ. ও তাঁর তিন পুত্র এবং তাদের তিন বধু।

বর্ণিত উক্তিগুলো কুরআনের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ কুরআনে পরিবার-পরিজন ছাড়াও মু'মিনদের কথা বলা হয়েছে। অথচ উপরোক্ত মতগুলোর মধ্যে শুধু নূহ আ.'র পরিবারের সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

হযরত কাতাদাহ র.'র মতে নৌকায় পুরুষ আরোহী ছিলেন দশজন। হযরত নূহ আ. তাঁর তিন পুত্র এবং হযরত নূহ আ.'র পরিবার বর্হিভূত ছয়জন। এই দশজনের স্ত্রীও ছিলেন ওই নৌকায়। হযরত মুকাতিল র. বলেছেন, হযরত নূহ আ.'র নৌকায় সর্বমোট ছিলেন আটাত্তর জন। এদের অর্ধেক ছিলেন পুরুষ আর অর্ধেক ছিলেন নারী।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ আ.'র সাথে ওই নৌকায় আরোহী ছিলেন সর্বসাকুল্যে আশিজন। তন্মধ্যে একজন ছিলেন 'জুরহাম' গোত্রের। ইবনে আব্বাস রা. একথাও বলেছেন যে, হযরত নূহ আ. তাঁর নৌকায় সর্বপ্রথম উঠিয়েছিলেন একটি পিপীলিকা আর সর্বশেষ

[২০৫]. তাফসীরে রূহুল মায়ানী, খণ্ড-১২, পৃ. ৫৩, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ১১১।

উঠিয়েছিলেন একটি গাধা। নৌকার দরজা দিয়ে প্রবেশকালে ইবলিশ গাধাটি লেজ ধরে আটকিয়ে দিল। গাধাটি আর অগ্রসর হতে পারল না। হযরত নূহ আ. বললেন, আরে গাধা! ভিতরে প্রবেশ করছনা কেন? গাধাটি অগ্রসর হতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। তখন হযরত নূহ আ. বললেন, ভিতরে ঢুক, যদি তোমার সাথে শয়তান থাকে। অর্তকিতে একথা উচ্চারণ করলেন হযরত নূহ আ.। শয়তান সুযোগ পেল। সে গাধার লেজ ছেড়ে দিল। গাধাটি ভিতরে ঢুকল। সেও ঢুকল গাধার সঙ্গে সঙ্গে। হযরত নূহ আ. তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুই কিভাবে নৌকায় ঢুকলি? সে বলল, আপনি তো গাধাকে এরকম বললেন। হযরত নূহ আ. বললেন, তুই এক্ষুনি বের হয়ে যা। সে বলল, আপনার অনুমতি পেয়ে ঢুকেছি। সুতরাং আপনি আর আমাকে বের করে দিতে পারবেন না।

কেউ কেউ বলেছেন, একটি সর্প ও বিচ্ছুও তখন উপস্থিত হয়ে হযরত নূহ আ.'র নিকট আবেদন করল- হে নূহ আ.! আমাদেরকেও নৌকায় তুলে নিন। হযরত নূহ আ. বললেন, না, তোমরা মানুষকে কষ্ট দাও। সাপ ও বিচ্ছু বলল, যদি কেউ আপনার নাম উচ্চারণ করে, তবে আমাদের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে। আদৌ এই বিশ্বাসটি প্রচলিত যে, কেউ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ আয়াতাংশ পাঠ করলে সাপ ও বিচ্ছু তাকে কামড়ায় না।[২৩৬]

কোন কোন দূর্বল বর্ণনায় এসেছে যে, মানুষ, জীব-জন্তু ও পশু-পাখির মল-মূত্রে যখন জাহাজ আবর্জনার স্তুপে পরিণত হতে যাচ্ছিল তখন হযরত নূহ আ. আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে হাতীর কপালে নিজের হাত বুলালেন। তাতে দু'টি শূকরের জন্ম হল। তারা জাহাজের সম্পূর্ণ মল-মূত্র খেয়ে পরিস্কার করে ফেলল। এ দৃশ্য দেখে পাপীষ্ট ইবলিস শূকরের কপালে তার হাত বুলাইল। যার ফলে দু'টি ইঁদুরের জন্ম হল। এ দেখে নূহ আ. অত্যন্ত রাগস্বরে তাকে বললেন, পাপীষ্ঠ ইবলিস! তুই কার হুকুমে জাহাজে উঠেছিস? ইবলিস বলল, কেন, আপনিই তো আমাকে জাহাজে উঠতে বলেছিলেন। হযরত নূহ আ. বললেন, কখন আমি তোকে জাহাজে উঠতে বললাম? ইবলিস বলল, গাধা যখন জাহাজে উঠতেছিল তখন আমি গাধার লেজ ধরে টানতেছিলাম। তাতে গাধা জাহাজে উঠতে পারছিল না। তখন আপনি রাগান্বিত হয়ে গাধাকে বলেছিলেন, রে শয়তান! দেরি না করে শীঘ্র জাহাজে উঠে পড়। দেখছিস না, কিভাবে বন্যার পানি এসে পড়েছে! আমি তখন মনে করলাম যে, গাধা তো আর শয়তান নয়। শয়তান তো আমারই নাম। কাজেই আমি দ্রুত জাহাজে উঠে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে গাধাও জাহাজে উঠল।

[২৩৬]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৬, পৃ. ৫৫-৫৬।

তখন হযরত নূহ আ. এই অর্তকিত ভুলের জন্য খুবই দুঃখিত হলেন এবং ইবলিসকে জাহাজ থেকে পানিতে ফেলে দিতে উদ্যত হলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহর তরফ থেকে আদেশ আসল, হে নূহ! তাকে জাহাজে থাকতে দাও। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কেননা আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছি যে, তাকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখব। ফলে ইবলিসকে জাহাজে রাখা হল।

ওদিকে ইঁদুর জাহাজের তলার তক্তা কেটে ছিদ্র করতে লাগল। তখন হযরত নূহ আ. ইঁদুরের কবল থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলে এরশাদ হল, হে নূহ! আপনি বাঘের কপালে হাত বুলিয়ে দিন, তিনি তা করলে তাতে দু'টি বিড়াল জন্ম হল। বিড়াল দু'টি সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের ইঁদুরগুলো খেয়ে ফেলল। বলাবাহুল্য, ঐদিন থেকেই বিড়ালের সাথে ইঁদুরের বর্তমান শত্রু সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে।[২৩৭]

যানবাহনে আরোহণের আদব ও দোয়া:

যুগ যুগ ধরে ইসলামের শিক্ষা হল প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া। হযরত নূহ আ. তাঁর অনুসারী নৌকায় আরোহীদেরকে নৌযানে আরোহণ করার আদব ও দোয়া শিক্ষা দিয়ে বললেন, তোমরা এই বলে নৌকায় আরোহণ কর- وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহণ কর, আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ন, মেহেরবান।[২৩৮]

অর্থাৎ এই মুক্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমরা এই নৌকার উপর নির্ভরশীল নই, বরং আমাদের ভরসা সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর উপর। সত্যিকার অর্থে যিনিই এই নৌকার পরিচালক। এই নৌকার চলন ও থামন উভয়টি আল্লাহর নামের বরকতেই হচ্ছে।

হযরত নূহ আ. যখন নৌকা চালানোর ইচ্ছে করতেন, তখন বলতেন بِسْمِ اللهِ جَرَتْ আর যখন থামাতে ইচ্ছে করতেন, তখন বলতেন, بِسْمِ اللهِ رَسَتْ অর্থ: বিছমিল্লাহ বলে চলতে বললে নৌকা চলত আবার বিছমিল্লাহ বললে নৌকা থেমে যেত। কোন ইঞ্জিন কিংবা অন্য কোন যন্ত্রপাতি ছিল না।[২৩৯]

কুরআনে কারীমে অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন- فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا

[২৩৭]. মাওলানা তাহের সূরাটি, ভারত, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৬ ও তাফসীরে বগভী, খণ্ড-৩, পৃ. ২০৮।
[২৩৮]. সূরা হূদ, আয়াত: ৪১।
[২৩৯]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৬, পৃ. ৫৭।

وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ . অর্থ: যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় আরোহণ করবে, তখন বল: আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন। আরও বল: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কল্যাণকরভাবে নামিয়ে দাও, তুমি শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।[২৪০]

নৌকায় আরোহণের তারিখ:

হযরত নূহ আ. ১০ রজব জুমা'র দিন তাঁর উম্মতগণকে নিয়ে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন।[২৪১]

কারো মতে তিনি ১ রজব নৌকায় আরোহণ করেছিলেন আর ১০ মহররম নৌকা থেকে অবতরণ করেছিলেন।

হযরত কাতাদাহ র. থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ আ.'র নৌকাটি প্রলয়ংকরী বন্যায় ভাসতে শুরু করেছিল ১০ রজব। দীর্ঘ একশত পঞ্চাশ দিন ধরে পানিতে ভেসে ভেসে চলার পর ১০ মহররম সেটি ঠেকেছিল জুদী পাহাড়ের গায়ে। যাত্রীরা সেখানেই নেমেছিলেন। ঐদিন নৌকা থেকে অবতরণের প্রাক্কালে নূহ আ. তাঁর সঙ্গীদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইমাম বগভী র. বলেছেন, ১০ রজব নৌকাটি ভাসতে ভাসতে যখন কা'বা শরীফের স্থানে পৌঁছল, তখন অদৃশ্য থেকে ঘোষিত হল সাতটি আওয়ায। বন্যাগ্রস্থ হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ কা'বাকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। নৌকা কা'বা শরীফের চর্তুদিকে সাতবার তাওয়াফ করেছিল। বন্যার পানি কমেছিল দীর্ঘ ছয় মাস পর। নূহ আ. তার অনুচরবৃন্দসহ ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করেছিলেন ১০ই মুহররম। সে দিন কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তিনি রোযা রেখেছিলেন। অনুচরবৃন্দকেও রোযা রাখতে বলেছিলেন।[২৪২]

নূহ আ.'র পুত্র কেনানকে নৌকায় আরোহণের আহ্বান:

হযরত নূহ আ.'র মোট চার পুত্র ছিল। তাদের নাম ছিল যথাক্রমে হাম, শাম, ইয়াফেস এবং কেনান। প্রথম তিন পুত্র বাধ্য ছিলেন, সুতরাং তারা নূহ আ.'র সাথে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন। চতুর্থ পুত্র কেনান পিতার অবাধ্য ও কাফির ছিল। পিতার আদেশ অমান্য করল এবং নৌকায় উঠল না।

প্লাবন প্রবলভাবে আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কেনানকে ডেকে বললেন, হে কেনান! এখনো সময় আছে, আল্লাহর উপর ঈমান এনে বিশ্বাসী হয়ে নৌকায় উঠে

[২৪০]. সূরা মু'মিনুন, আয়াত: ২৮–২৯।
[২৪১]. তাফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড-৪, পৃ. ১৭১।
[২৪২]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি, তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৬, পৃ. ৬০।

এসো। নতুবা অবশ্যই প্লাবনের কবলে পড়ে পানিতে ডুবে মরবে। উত্তরে সে বলল, বন্যায় আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি কোন উঁচু পাহাড়ে উঠে যাব। বন্যায় উঁচু পাহাড় তো ডুবাতে পারবে না। নূহ আ. বললেন, আজ আল্লাহর সিদ্ধান্ত থেকে কেউই রেহাই পাবে না। শুধু আল্লাহ যাকে বাঁচাতে চান সে-ই বাঁচতে পারবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ . قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ . আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে। আর নূহ আ. তাঁর পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে সরে রয়েছিল। তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে থেকো না। সে বলল, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ আ. বললেন, আজকের দিনে আল্লাহর হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই, একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হল।[২৪৩]

মহা প্লাবনের তাণ্ডব:

আসমান এবং জমিন উভয় দিক থেকে পানি আসা শুরু হল। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ . وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। আর ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে।[২৪৪]

আসমান থেকে বর্ষিত পানি ছিল গরম আর মাটি থেকে ঠাণ্ডা পানির স্রোত অবিরল ধারায় উঠতে লাগল। এভাবে একাধারে চল্লিশদিন পর্যন্ত চলল। পানিতে সমস্ত জগত থৈ থৈ করতে লাগল। সব কিছু পানির নীচে তলিয়ে গেল। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতের উপরও পানি চল্লিশ গজ উঁচু হল।

প্লাবনের পানির একেক ঢেউ পাহাড়ের ন্যায় ছিল। অথচ এর মধ্যেও নূহ আ.'র নৌকা চলতে লাগল। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ আর নৌকা তাদের বহন করে চলল, পর্বত সমান তরঙ্গমালার মাঝে।

[২৪৩]. সূরা হূদ, আয়াত: ৪২–৪৩।
[২৪৪]. সূরা কামর, আয়াত: ১২-১২।

এই প্লাবনের সাথে প্রচণ্ড তুফানও ছিল, যার কারণে পানিতে পর্বতসমান ঢেউ উঠেছিল এবং বৃষ্টি ও তুফান মিলে পৃথিবী ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

কেনানের পরিণতি:

হযরত নূহ আ. দেখলেন যে, কেনান প্লাবন থেকে বাঁচার জন্য একটি পর্বতে আরোহণ করল। কিন্তু জলমগ্নহয়ে সেই পাহাড় ডুবে যেতে লাগল। তখন নূহ আ. পুত্রের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন, হে প্রভু! আপনি আমার নিকট ওয়াদা করেছিলেন যে, আমার পরিবারবর্গকে আপনি রক্ষা করবেন। কেনান তো আমার পরিবরের অন্তর্ভূক্ত। সে এখন পানিতে ডুবে প্রাণ হারাচ্ছে। ইত্যবসরে বিশাল এক তরঙ্গ পিতা-পুত্রের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং কেনান পানিতে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত নূহ আ.কে অভিহিত করলেন যে, হে নূহ! আপনি ঈমানদার আর কেনান কাফের। সুতরাং কেনান আপনার পুত্র হলেও আপনার পরিবার পরিজনের অন্তর্ভূক্ত নয়। এখানে পরিবার বলতে ঈমানের সম্পর্ক উদ্দেশ্য। সুতরাং আমার ওয়াদা ছিল আপনার সাথে আপনাকে এবং আপনার বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবর্তী পরিবার-পরিজনকে আর অন্যান্য বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করব। আমি আমার সেই সিদ্ধান্তই কার্যকর করেছি। আপনি তা বুঝতে পারেন নি, তাই তাকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। না জেনে এরকম অনুরোধ নির্বোধজনোচিত কাজ। আপনি তো আমার নবী। আমার একান্ত প্রিয়ভাজন। সুতরাং এরকম অসমীচীন অনুরোধ জ্ঞাপন আপনার জন্য শোভনীয় নয়।[২৪৫]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ . قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ . قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ . অর্থ: আর নূহ্ আ. তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন- হে পরওয়ারদেগার! আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভূক্ত, আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী। আল্লাহ্ বলেন- হে নূহ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভূক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দুরাচার। সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভূক্ত হবেন না। নূহ আ.

২৪৫. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৬ পৃ. ৬১-৬২।

বলেন- হে আমার পালনকর্তা! আমার যা জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব।[২৪৬]

ইমাম আবু জাফর বলেছেন, কেনান মূলত হযরত নূহ আ.'র সন্তান ছিল না। সে ছিল তার মায়ের পূবর্তন স্বামীর সন্তান। এ কারণেই হযরত নূহ আ. তাঁর আবেদনে من اهلى (স্ত্রীর গর্বজাত হিসাবে আমার পরিবারভূক্ত) বলেছিলেন। مِنِّي (আমার ঔরসজাত পুত্র) বলেননি।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর, জুহাক প্রমুখ বিজ্ঞজনদের অভিমত হচ্ছে, কেনান হযরত নূহ আ.'র ঔরসজাত সন্তানই ছিল। সে তাঁর পরিবারভূক্ত না হওয়ার অর্থ হল- সে তাঁর ধর্মমত অনুসারী নয়। সে কাফির। আর কাফির কখনো ঈমানদার পরিবারের সদস্য নয়।[২৪৭]

শায়খ আবু মনসুর র. বলেছেন, কিনান ছিল মুনাফিক। অর্থাৎ প্রকাশ্যত: সে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু অন্তরে ছিল অবিশ্বাসী। হযরত নূহ আ. প্রকাশ্য অবস্থা দেখেই তাকে নিজের পরিবারভূক্ত বলেছিলেন। ইমাম রাযী ও ইমাম কুরতুবীও অনুরূপ মত পোষণ করেন। সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণ করা যাবে না যে, নূহ আ. জেনে শুনে নিজের কাফির ছেলের জন্য পিতৃ স্নেহের বশীভূত হয়ে আল্লাহর নিয়মের এবং নিজের কৃত দোয়ার বিরুদ্ধে মাগফিরাতের দোয়া করেছেন। সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যেতে পারে যে, তিনি বিনা তদারকীতে না জেনে আল্লাহর দরবারে কেনানের জন্য দোয়া করেছিলেন, যা খেলাফে আউলা (উত্তমের বিপরীত) ও ইজতিহাদ জনিত ভুল ছিল। এরূপ হওয়াও একজন নবীর পক্ষে শোভনীয় নয় বিধায় তিনি বিনয়ের সাথে আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন।[২৪৮]

হযরত নূহ আ.'র স্ত্রী:

হযরত নূহ আ.'র স্ত্রীর নাম ছিল ওয়ায়েলা। উপনাম ছিল উম্মে কেনান। সে নবী নূহ আ.'র স্ত্রী হলেও কাফের ছিল। বিভিন্নভাবে নূহ আ.কে কষ্ট দিত। এমনকি সে লোকদেরকে বলত 'নূহ পাগল'। কেউ ঈমান গ্রহণ করলে সে এই সংবাদ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সমাজপতিদেরকে জানিয়ে দিত। সে নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পাইনি। মহাপ্লাবনে সেও নিমজ্জিত হয়েছিল। পরকালেও রেহাই পাবে না।

২৪৬. সূরা হূদ, আয়াত: ৪৫-৪৭।
২৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
২৪৮. আল্লামা গোলাম রাসূল সাঈদী র., তিবইয়ানুল কুরআন, খণ্ড-৫, পৃ. ৫৫৫, সূত্রঃ জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ১১৭।

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ . অর্থ: আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের জন্যে নূহ-পত্নী ও লূত-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল আমার দুই ধর্মপরায়ণ বান্দার গৃহে। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল: জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও।[২৪৯]

এক মু'মিন বৃদ্ধা:

হযরত নূহ আ. নৌকা নির্মাণকালে এক মু'মিন বৃদ্ধা তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে নৌকা নির্মাণের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা অচিরেই মহাপ্লাবনের মাধ্যমে কাফেরদের ধ্বংস করে দেবেন। ঈমানদারগণ তখন নৌকায় আরোহণ করে মুক্তি লাভ করবে। বৃদ্ধা আরয করল, তুফান আসলে আমাকে একটু অভিহিত করবেন যেন আমিও তুফান থেকে মুক্তি পাই। যখন প্লাবন আরম্ভ হল তখন নূহ আ. তাঁর অনুসারীদেরকে এবং প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রী নৌকায় তোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ফলে ঐ বৃদ্ধার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধা তাঁর থেকে দূরে অবস্থান করেছিল। প্লাবনে কাফিররা ধ্বংস হল আর মু'মিনরা মুক্তি পেল। ছয় মাস পর যখন নূহ আ. তাঁর অনুসারীদের নিয়ে নৌকা থেকে অবতরণ করলেন তখন ঐ বৃদ্ধা তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি তো বলেছিলেন, অচিরেই তুফান আসবে। তুফান কি আসেনি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুফান এসেছে এবং কাফেররা ধ্বংস হয়েছে। হযরত নূহ আ. বৃদ্ধাকে জীবিত দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কারণ এই মহা প্লাবনে একজন দূর্বল বৃদ্ধাকে আল্লাহ তায়ালা কোন মাধ্যম ছাড়া তার ঘরেই তাকে রক্ষা করেছেন। বৃদ্ধা নৌকায় আরোহণও করেনি এবং তুফানও চোখে দেখেনি। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছে রক্ষা করেন।

কোন কোন কাশফধারী বুযুর্গ বলেছেন 'বরওয়াসা' শহরে আল জামিউল কবীর নামক স্থানটিই ছিল ঐ বৃদ্ধার ঘর।[২৫০]

---

২৪৯. সূরা আত্ তাহরীম, আয়াত: ১০। ২৮ পারা

২৫০. তাফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড-৪, পৃ. ১৭২, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ১২০।

মহা প্লাবনের সমাপ্তি :

এই মহা প্লাবন দীর্ঘ ছয় মাস স্থায়ী থাকার পর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে ঘোষিত হল, হে পৃথিবী! তোমার অভ্যন্তর থেকে যে পানি তুমি উদগীরণ করেছিলে তা শোষণ করে নাও। পৃথিবী পানি শোষণ করে নিল। রয়ে গেল বৃষ্টির পানি। পুনরায় ঘোষিত হল হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। বন্ধ হয়ে গেল বৃষ্টি। বানের পানি কমতে শুরু করল। এভাবে প্রশমিত হল আল্লাহর গযব। ভূ-পৃষ্ঠে সৃষ্টি হল অনেক স্রোতবতী নদী। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কাফেরকুল। হযরত নূহ আ.'র নৌকা ঠেকল মোসেল শহরের সন্নিকটে অথবা সিরিয়ার জুদী পাহাড়ে।

ইমাম বগভী র. লিখেছেন, কোথাও মাটি জেগে উঠল কিনা, তা জানবার জন্য নূহ আ. তাঁর নৌকা থেকে একটি কাক ছেড়ে দিলেন। কাকটি দেখল সব দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সীমালঙ্ঘনকারীদের গলিত মথিত মরদেহ। মৃত ভক্ষণে মগ্ন হয়ে গেল সে। নৌকায় ফিরে যাবার কথা ভুলে গেল। হযরত নূহ আ. আবার পাঠালেন একটি কবুতরকে। কিছুক্ষণ পর কবুতরটি ফিরে আসল। তিনি দেখলেন, কবুতরটির পায়ে লেগে আছে জয়তুনের ঝরা পাতা ও কাদা মাটি। হযরত নূহ আ. এবার বুঝলেন বন্যার পানি আর নেই। শীঘ্রই অবতরণ করা যাবে। তিনি অবাধ্য কাকটির প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন আর কবুতরটির প্রতি প্রসন্ন হলেন। কাককে বললেন, জনবসতিতে তোমার উপস্থিতি হবে তোমার জন্য ভীতিকর তখন থেকে কাক আর মনুষ্য সমাজে বসবাস করতে পারেনা। কিন্তু হযরত নূহ আ.'র আশীর্বাদ পেয়ে কবুতর বাস করে মানুষের গৃহসীমানায়।[২৫১]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . অর্থ: আর নির্দেশ দেয়া হল- হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ, ক্ষান্ত হও। আর পানি হ্রাস করা হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল, দুরাত্মা কাফেররা নিপাত যাক।[২৫২]

জুদী পর্বত থেকে অবতরণ:

দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত ভাসমান অবস্থায় থাকার পর নূহ আ.'র কিশ্তি জুদী পাহাড়ে গিয়ে থামল। পাখির মাধ্যমে পানির পরিমাণ জেনে নিলেন নূহ আ.।

---

২৫১. কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথি র., ১২২৫হি. তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৬, পৃ. ৬৯।

২৫২. সূরা হূদ, আয়াত: ৪৪।

... তিনি ও তাঁর সঙ্গীদেরকে এবং জীব-জন্তুগুলোকে নিয়ে মাটিতে নেমে আসলেন। তখন পৃথিবী মানুষ শূন্য ছিল। পরবর্তীতে হযরত নূহ আ. সহ আরোহীবৃন্দের মাধ্যমেই মানুষের বংশবিস্তার ঘটেছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. অর্থ: হুকুম হল- হে নূহ ! আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা এবং আপনার নিজের ও সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলির উপর বরকত সহকারে অবতরণ করুন। আর অন্যান্য যেসব সম্প্রদায় রয়েছে আমি তাদেরকেও উপকৃত হতে দেব। অতঃপর তাদের উপর আমার কষ্টদায়ক আযাব আপতিত হবে।[২৫৩]

এরপর আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ আ.কে আদেশ করলেন, হে নূহ ! এবার আপনার নৌকার তক্তা দিয়ে একটি মসজিদ তৈরী করুন। সে অনুযায়ী তিনি জুদী পাহাড়ের চূড়ায় একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। ক্রমে জুদী পর্বতের পাদদেশে একটি জনপদ গড়ে উঠল। এর নামকরণ করা হল 'সামানীন'। এটি আরবী শব্দ। এর অর্থ আশি (সংখ্যা বিশেষ)। যেহেতু হযরত নূহ আ.'র নৌকায় আশিজন ঈমানদার লোক ছিলেন এবং তাদের দ্বারাই ঐ জনপদটি গড়ে উঠেছিল, সেহেতু জনপদটির নাম হয়েছিল সামানীন।[২৫৪]

এখানে উল্লেখ্য যে, প্লাবন কি সমগ্র পৃথিবীতে হয়েছিল না কি নূহ আ.'র সম্প্রদায়ের লোকদের অবস্থান স্থলে হয়েছে তা নিয়ে ওলামা ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। উভয় পক্ষের নিকট যুক্তি প্রমাণ রয়েছে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গও রয়েছেন। তবে বিচার-বিশ্লেষণের পরে তুফান কেবল নির্দিষ্ট এলাকায় সংঘটিত হওয়ার মতটি প্রাধান্য পায়।

পরবর্তী প্রজন্ম হযরত নূহ আ.'র বংশধর :

আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ আ.কে প্রেরণ করেছিলেন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে। আর তা ছিল ইরাক। তাঁর বদদোয়া لا تذر على الارض من الكافرين ديارًا এখানে 'আরদ্ব' দ্বারা ওই ভূ-খণ্ড উদ্দেশ্য যেখানে বসবাস করত নূহ (আ)'র সম্প্রদায়ের লোকেরা। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ অর্থ- আমি

২৫৩. সূরা হূদ, আয়াত: ৪৮।
২৫৪. মাওলানা তাহের সূরাটী, ভারত, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৯।

তাঁর (নূহ আ.) বংশধরকেই অবশিষ্ট রেখেছি।[২৫৫] **এ ব্যাখ্যার আলোকে** উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হবে- প্লাবন পরবর্তী সময়ে ওই ভূ-খণ্ডে হযরত নূহ আ.'র বংশ ব্যতিরেকে অন্য কারো বংশ বিদ্যমান ছিলনা।

দ্বাহ্হাক র. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, যখন হযরত নূহ আ. নৌকা থেকে অবতরণ করলেন তখন তাঁর সাথে যারা ছিল তারা সবাই পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করেছিল, কেবল নূহ আ.'র আওলাদ ও তাদের স্ত্রীরাই জীবিত ছিল।[২৫৬]

অথবা কেউ কেউ বলেছেন, নূহ আ.'র অনুসারী ঈমানদার যারা তাঁর সাথে নৌকায় ছিলেন পরবর্তীতে তাদের কারো সন্তান-সন্ততি জন্মেনি। কারণ তাদের স্ত্রীরা ইতিপূর্বে বন্ধ্যা হয়েগিয়েছিল। ফলে তাদের থেকে কোন বংশবিস্তার হয়নি। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ

ইমাম তিরমিযী র. প্রমুখ লিখেছেন, হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. বর্ণনা করেছেন, উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, হযরত নূহ আ.'র তিন পুত্র ছিল। হাম, শাম ও ইয়াফেস। প্লাবন পরবর্তী মানব বংশ প্রবাহমান হয়েছে তাঁদের মাধ্যমেই।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আরবীয়গণের উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হল শাম। আবিসিনীয়াদের পূর্বপুরুষ হাম আর রোমীয়দের পূর্বপুরুষ ইয়াসেফ।[২৫৭]

জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, মহাপ্লাবনের পর নৌকা থেকে নিরাপদে অবতরণ করেছিলেন হযরত নূহ আ., তাঁর সন্তানগণ ও তাদের সহধর্মিনীগণ। আর সকলে মৃত্যুবরণ করেছিল বানে ডুবে।[২৫৮]

হযরত নূহ আ.'র শরীয়ত:

আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ আ.কে নবুয়ত ও রিসালত উভয়টি দান করেছেন। তিনি পূর্বে শরীয়ত রহিত করে দিয়েছেন। আদম আ.'র শরীয়তে ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ বৈধ ছিল। নূহ আ. তা হারাম করে দিয়েছেন। রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় অর্থ: মুহরিমের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তাঁর শরীয়তে যা আদৌ বিদ্যমান। তিনি স্বতন্ত্র শরীয়ত প্রচলন করেন।

২৫৫. সূরা আস্সাফ্ফাত, আয়াত: ৭৭।
২৫৬. তাফসীরে বগভী, খণ্ড-৪, পৃ. ৫৬৪, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ১২৫।
২৫৭. তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং ৩০৩৬৩২, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ১২৫ ও তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-১০, পৃ. ৮৭।
২৫৮. প্রাগুক্ত।

কিয়ামত দিবসে নূহ আ.'র পক্ষে শেষনবী ও তাঁর উম্মতের সাক্ষ্য:

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামত দিবসে হযরত নূহ আ.'র কাফির উম্মতরা তাঁর দ্বীন প্রচারকে অস্বীকার করবে। তখন আল্লাহ্ তাঁর পক্ষে সাক্ষী খুঁজবেন। তিনি বলবেন, শেষ নবী মুহাম্মদে আরবী ﷺ এবং তাঁর উম্মতগণই আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। প্রথমে নবী মুহাম্মদ ﷺ সাক্ষ্য দেবেন তারপর তাঁর উম্মতগণ সাক্ষ্য দেবেন। তখন কাফিররা বলবে- তোমরা তো সর্বশেষ উম্মত ছিলে, ঐ সময় তোমরা ছিলেনা, কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ? তখন নবী করিম ﷺ এই আয়াত তিলাওয়াত করবেন- بِسْمِ اللهِ الرحمن الرحيم إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ الخ রাসূল ﷺ পুরো সূরা নূহ পাঠ করবেন। তখন উম্মতে মুহাম্মদীরা বলে উঠবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুরো ঘটনা সত্য। আল্লাহ্ তায়ালা এই সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন এবং হযরত নূহ আ. নির্দোষ প্রমাণিত হবে আর কাফিররা জাহান্নামে নিমজ্জিত হবে।[২৫৯]

দীর্ঘ জীবন অতঃপর মৃত্যু:

হযরত নূহ আ. চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন এবং সাড়ে নয়শত বছর নিজ সম্প্রদায়কে সত্যের পথে আহ্বান করেন। অতঃপর সংঘটিত হল মহাপ্লাবন। মহাপ্লাবনের পর আরো ষাট বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। অতঃপর এক হাজার পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমণ করেন।

সকল নবীগণের মধ্যে তিনিই দীর্ঘজীবি ছিলেন। এ কারণে তাঁকে কবীরুল আম্বিয়া ও শায়খুল মুরসালীন বলা হয়। কিয়ামত দিবসে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ'র পর সর্বপ্রথম তিনিই কবর শরীফ থেকে উঠবেন।[২৬০]

তাঁর মু'জিযা তাঁর মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। তা হল এত দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন কিন্তু তাঁর একটি দাঁত নড়েওনি, পড়েওনি। শরীরের একটি লোমও সাদা হয়নি এমন কি তাঁর শক্তিও বিন্দুমাত্র কমেনি।[২৬১]

তাঁর কবর শরীফ: তাঁর কবর শরীফ কোথায় অবস্থিত তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে–

১. আমীর আলীর মতে তাঁর কবর শরীফ বায়তুল মোকাদ্দাসে অবস্থিত।[২৬২]

২. তাঁর কবর শরীফ জমজম কূপ ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যখানে।[২৬৩]

---

২৫৯. ইবনে কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১৪৬, রূহুল মায়ানী, খণ্ড-২৯-৩০, পৃ. ৬৭, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ১২৮।

২৬০. রূহুল বয়ান, খণ্ড-৬, পৃ. ৫৮১, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ১২৮।

২৬১. তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-২, পৃ. ৫৪৪, সূত্র: প্রাগুক্ত।

২৬২. তাযকারাতুল আম্বিয়া, কৃত. আমীর আলী, পৃ. ১০৯, সূত্র: প্রাগুক্ত।

৩. তাঁর কবর মোবারক 'বরকে নূহ' নামক স্থানে।[২৬৪]

৪. তাঁর কবর শরীফ মসজিদে কূফা অথবা জবলে আহমার, জবলে লেবনানের নিকটে।[২৬৫]

৬. হযরত হুদ আ.

নাম-হুদ, পিতার নাম- আব্দুল্লাহ্ ইবনে রিয়াহ ইবনে খুলুদ ইবনে আদ ইবনে আউস ইবনে শালেখ ইবনে আরফাখশাদ ইবনে শাম ইবনে নূহ আ.। মায়ের নাম ছিল মা'কাবাহ বিনতে উয়াইলাম বিন শাম বিন নূহ। তাঁর জন্মের সময় তাঁর মায়ের বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছর।

দৈহিক গঠন:

তাঁর গায়ের রঙ ছিল গন্দম, শরীরে প্রচুর লোম ছিল, চেহারা মোবারক অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তিনি দেহ অবয়বে হযরত আদম আ.'র সাদৃশ্য ছিলেন। সুন্দর চেহারা ও দৈহিক গঠন ছিল লম্বা, চুল ছিল এলোমেলো তবে দাঁড়ি ছিল ঘন।

রাসূল ﷺ'র নূর মোবারক তাঁর কপালে উদ্ভাসিত ছিল। মানুষ ওই নূরের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলত, এই ব্যক্তি এক আল্লাহর উপাসনা করবে এবং মূর্তি ভেঙ্গে দিবে। মানুষ তাঁকে অত্যধিক শ্রদ্ধা করত।[২৬৬]

তাঁর সময়কাল:

হযরত হুদ আ. হযরত নূহ আ.'র আটশত বছর পর আগমণ করেন। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবুয়ত দান করেন। আদ সম্প্রদায়ের সময়কাল ছিল হযরত ঈসা আ.'র প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে।

আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসকারী তুফানের ধরণ:

আল্লাহ্ তায়ালা আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংসকারী তুফান সম্পর্কে সূরা হা-মীম সিজদায় বলেছেন- رِيْحًا صرصرًا অর্থ: ঠাণ্ডা বাতাস যা প্রত্যেক বস্তুকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এটি প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি হয়ে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করত। সূরা আল-হাক্কাহ-এ ৬নং আয়াতেও رِيْحٌ صَرْصَرٌ বলা হয়েছে।

---

২৬৩. ইবনে আসাকির, খণ্ড-৬২, পৃ. ২৮৮, সূত্র: প্রাগুক্ত।

২৬৪. কাসাসাসুল আম্বিয়া, কৃত. ইবনে কাসীর, পৃ. ১৭১, সূত্র: প্রাগুক্ত।

২৬৫. রূহুল মায়ানী, খণ্ড-২৯-৩০, পৃ. ৬৮, সূত্র: প্রাগুক্ত।

২৬৬. রূহুল মায়ানী, খণ্ড-৭-৮, পৃ. ১৫২ ও তাফসীরে মাযহারী বাংলা, খণ্ড-৩, পৃ. ৪২১, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ১৩০।

সূরা যারিয়াতে বলা হয়েছে- الريح العقيم অকল্যাণকর বাতাস। অর্থ: এমন বাতাস যাতে কোন কল্যাণ ও বরকত থাকে না। যে বাতাস না বৃষ্টির আগমন ঘটায় না প্রাণী ও বৃক্ষের কল্যাণ করে। ঐ বাতাস ছিল ঘূর্ণিঝড়, পশ্চিমা বিনাশী বাতাস। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- সাবা তথা পূর্বাল বাতাস দ্বারা আমার উম্মতকে সাহায্য করা হয়েছে। আর পশ্চিমা বাতাস দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল আদ জাতিকে।[২৬৭]

উল্লেখ্য যে, صبا বলা হয় পূর্বপ্রান্ত থেকে আগত বাতাসকে যা উপকারী। পক্ষান্তরে دبور বলা হয় পশ্চিম দিক থেকে আগত বাতাসকে যা অত্যন্ত ধ্বংসশীল ও ক্ষতিকারক।

যখন প্রবল বাতাস প্রবাহিত হত তখন রাসূল ﷺ দোয়া করতেন- اَللّٰهُمَّ اِجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اَللّٰهُمَّ اِجْعَلْهَا لَنَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا হে আল্লাহ্! বায়ুকে রহমত বানিয়ে দিন, তাকে আযাব বানাবেন না। হে আল্লাহ্! তাকে আমাদের জন্য 'রিয়াহ' বানান, 'রীহ' বানাবেন না।

কারণ আদ জাতির ধ্বংসকারী বাতাস 'রীহ' জাতীয় ছিল। কুরআনে তিনটি স্থানেই ريح শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাই রাসূল ﷺ 'রীহ' থেকে আশ্রয় চেয়েছেন।

এই তুফান এসেছিল শাওয়াল মাসের শেষের দিকে। এক বুধবারে আরম্ভ হয়ে অপর বুধবার পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। অর্থ: এক বুধবারে সকালে আরম্ভ হয়েছিল পরের বুধবারে সন্ধ্যা বেলায় বন্ধ হয়েছিল।[২৬৮]

আদ সম্প্রদায় ও হযরত হুদ আ. :

পবিত্র কুরআনে আদ সম্প্রদায় সম্পর্কে নয়টি সূরায় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- এক. সূরা আ'রাফ, দুই. সূরা হুদ, তিন. সূরা মু'মিনুন, চার. সূরা শূ'য়ারা, পাঁচ. সূরা ফুস্‌সিলাত, ছয়. সূরা আহকাফ, সাত. সূরা আয্‌যারিয়াত, আট. সূরা আল-কুমর এবং নয়. সূরা আল-হাক্কাহ। আর মোট সাতটি স্থানে হযরত হুদ আ.'র নাম উল্লেখ এসেছে। তা হল- সূরা আ'রাফের ৬৫নং আয়াত, সূরা হুদ'র ৫০, ৫৩, ৫৮, ৬০, ৮৯ এবং সূরা শূ'য়ারা এর ১২৪নং আয়াত।[২৬৯]

[২৬৭]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-১১, পৃ. ১১৩।
[২৬৮]. তাফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড-৮, পৃ. ৩২৮, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ১৪৪।
[২৬৯]. মাওলানা মুহাম্মদ হেফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ১০২।

আদ সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত নূহ আ.। তাদের বংশধারা হল- আদ-আউস-ইরম-সাম-নূহ। আদ সম্প্রদায় পকৃতপক্ষে নূহ আ.'র পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং তাঁর পুত্র সামের বংশধরেরই এক ব্যক্তির নাম। আদ ও সামুদ মূলত ইরমের দু'টি শাখা। এক শাখাকে প্রথম আদ আর অপর শাখাকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়।

আদ সম্প্রদায়ের তেরটি পরিবার ছিল। আম্মান থেকে শুরু করে হাযারা মউত ও ইয়েমন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। তাদের খেত-খামারগুলো অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল ছিল। সব রকমের বাগান ছিল। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপু সম্পন্ন। তাদের দীর্ঘতম ব্যক্তির উচ্চতা ছিল একশত হাত আর বেঁটে ব্যক্তির উচ্চতা ছিল সত্তর হাত। তাদের কোন লোকের মস্তক ছিল গম্বুজসদৃশ এবং চোখের কোটর, নাক ও কানের ছিদ্র এত বড় ছিল যে, ভোঁদর জাতীয় প্রাণী সেখানে অনায়সে তাদের শাবক প্রসব করতে পারত। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের জন্য দুনিয়ার যাবতীয় নেয়ামতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির কারণে এসব নেয়ামতই তাদের ধ্বংসের কারণে পরিণত হয়েছিল। তারা শক্তিমদ মত্ত হয়ে নিজেদের সবচেয়ে শক্তিশালী মনে করে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে থাকে। ফলে তারা নানারকম পাপাচারে লিপ্ত হলে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সম্প্রদায় ভূক্ত থেকে হযরত হুদ আ.কে নবী হিসাবে তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেন। তিনি হযরত নূহ আ.'র শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর পৃথিবীর আয়ু ছিল চারশত কিংবা চারশত যাট বছর। তাঁর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে রিয়াহ এবং মাতার নাম ছিল মারজানা। তাঁর পবিত্র সমাধি রয়েছে 'হাদ্বরা মউত' নামক স্থানে। কেউ কেউ বলেছেন, মক্কায় হাজরে আসওয়াদ, জমজম ও মকামে ইব্রাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে তার কবর শরীফ।[২৭০]

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন সূরায় এরশাদ করেন-

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ . قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ . أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا

[২৭০]. কাযী ছানা উল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, বাংলা, খণ্ড-৪, পৃ. ৪৮২-৮৩ ও ৪৮৬।

كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ . قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ
أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ . فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ . অর্থ: আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল: আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! আমি মোটেই নির্বোধ নই, বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত পয়গাম্বর। তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বিশ্বস্ত। তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে- যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে কওমে নূহের পর সর্দার করেছেন এবং তোমাদের দেহের বিস্তৃতি বেশী করেছেন। তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর- যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়। তারা বলল: তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছ যে আমরা এক আল্লাহর এবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা করত, তাদেরকে ছেড়ে দেই? অতএব নিয়ে আস আমাদের কাছে যদ্দ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও। সে বলল: অবধারিত হয়ে গেছে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ। আমার সাথে ঐসব নাম সম্পর্কে কেন তর্ক করছ, যেগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছে। আল্লাহ্ এদের সম্পর্কে কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি। অতএব অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। অনন্তর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করত তাদের মূল কেটে দিলাম। তারা মান্যকারী ছিল না।।[২৭১]

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا
مُفْتَرُونَ . يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ .
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ

[২৭১]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৬৫-৭২।

قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ . قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ
قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ . إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ
وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ . مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ . إِنِّي تَوَكَّلْتُ
عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ
شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ . وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ . وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا
أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ . وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ
أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ . وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ
مُجِيبٌ . অর্থ: আর আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছি; তিনি বলেন- হে আমার জাতি! আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নেই, তোমরা সবাই মিথ্যা আরোপ করছ। হে আমার জাতি! আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন মজুরী চাই না; আমার মজুরী তাঁরই কাছে যিনি আমাকে পয়দা করেছেন; তবু তোমরা কেন বোঝ না? আর হে আমার কওম! তোমাদের পালনকর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর; তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মত বিমুখ হয়ো না। তারা বলল- হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আস নাই, আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই। বরং আমরা তো বলি যে, আমাদের কোন দেবতা তোমার উপরে শোচনীয় ভূত চাপিয়ে দিয়েছে। হুদ বললেন- আমি আল্লাহকে সাক্ষী করেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নাই তাঁদের সাথে যাদেরকে তোমরা শরিক করছ। তাকে ছাড়া, তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতঃপর আমাকে কোন অবকাশ দিও না। আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই। তথাপি যদি তোমরা মুখ ফেরাও, তবে আমি তোমাদেরকে তা পৌছিয়েছি যা আমার

কাছে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে; আর আমার পালনকর্তা অন্য কো
জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুই বিগড়াতে
পারবে না; নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগারই প্রতিটি বস্তুর হেফাজতকারী। আর
আমার আদেশ যখন উপস্থিত হল, তখন আমি নিজ রহমতে হুদ এবং তাঁর সঙ্গী
ঈমানদারগণকে পরিত্রাণ করি এবং তাদেরকে এক কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা
করি। এ ছিল আদ জাতি, যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতকে অমান্য করেছে,
আর তদীয় রসূলগণের অবাধ্যতা করেছে এবং প্রত্যেক উদ্ধত বিরোধীদের
আদেশ পালন করেছে। এ দুনিয়ায় তাদের পিছনে পিছনে লা'নত রয়েছে এবং
কেয়ামতের দিনেও; জেনে রাখ, 'আদ জাতি তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার
করেছে, হুদ ও আদ জাতির প্রতি অভিসম্পাত রয়েছে জেনে রাখ। আর সামূদ
জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করি; তিনি বললেন– হে আমার
জাতি! আল্লাহ্র বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নাই। তিনিই
যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান
করেছেন। অতএব; তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে
চল। আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবূল করে থাকেন; সন্দেহ নেই।[২৭২]

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ . إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ . إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ .
فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ . وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ .
أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ . وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ . وَإِذَا بَطَشْتُمْ
بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ . وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ . أَمَدَّكُمْ
بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ . وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ . إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا
أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ . إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ . وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ .
فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ . وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ . كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ . অর্থ: আদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী
বলেছে। তখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললেন: 'তোমাদের কি ভয় নেই?
আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার
আনুগত্য কর, আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে প্রতিদান চাই না। আমার
প্রতিদান তো পালনকর্তা দেবেন। তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন

[২৭২]. সূরা হুদ, আয়াত: ৫০-৬১।

নির্মাণ করছ? এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে? যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জালেম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সেসব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র-সন্তান, এবং উদ্যান ও ঝরণা। আমি তোমাদের জন্যে মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।" তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ নয়। আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। অতএব, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। এবং আপনার পালনকর্তা, তিনি তো প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। সামুদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে।[২৭৩]

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ . فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ. অর্থ: যারা ছিল আদ, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর? বস্তুত: তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত। অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আযাব আস্বাদন করানোর জন্যে তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্জাবায়ু বেশ কতিপয় অশুভ দিনে। আর পরকালের আযাব তো আরও লাঞ্ছনাকর এমতাবস্থায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।[২৭৪]

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ . قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ . فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا

[২৭৩]. সূরা শু'য়ারা, আয়াত: ১২৩-১৪১।
[২৭৪]. সূরা হা-মীম সিজদা, আয়াত: ১৫-১৬:

...ضٍ مُنْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ . تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا
...بَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ . وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ
...كَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ
...أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.

অর্থ: আ'দ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা স্মরণ করুন, তার পূর্বে ও পরে অনে... সতর্ককারী গত হয়েছিল, সে তার সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় ... মর্মে সতর্ক করেছিল যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও এবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্যে এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য দেব-দেবী থেকে নিবৃত্ত করতে আগমন করেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দাও, তা নিয়ে আস। সে বলল, এ জ্ঞান তো আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। আমি যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌছাই। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়। (অতঃপর) তারা যখন শাস্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যক... অভিমুখী দেখল, তখন বলল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। বরং এটা সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা বায়ু এতে রয়েছে মর্মন্তু... শাস্তি। তার পালনকর্তার আদেশে সে সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে। অতঃপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শাস্তি দিয়ে থাকি। আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি। আমি তাদের দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়, কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসল না, যখন তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল এবং তাদেরকে সেই শাস্তি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করত।[২৭৫]

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ . إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ . تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ . فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ . وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ . অর্থ: আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্জাবায়ু এক চিরাচরিত অশুভ দিনে। তা মানুষকে উৎখাত করছিল,

[২৭৫]. সূরা আহকাফ, আয়াত: ২১-২৬।

যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড। অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?[২৭৬]

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى . وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى . وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى . وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى . فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى . অর্থ: তিনিই প্রথম আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, এবং সামুদকেও; অতঃপর কাউকে অব্যাহতি দেননি। এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল আরও জালেম ও অবাধ্য। তিনিই জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করেছেন। অতঃপর তাকে আচ্ছন্ন করে নেয় যা আচ্ছন্ন করার। অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে মিথ্যা বলবে?[২৭৭]

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ . مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ . অর্থ: এবং নিদর্শন রয়েছে তাদের কাহিনীতে, যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু। এই বায়ু যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল: তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।[২৭৮]

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ . الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ . وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ . وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ . الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ . فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ . فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ . إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ . অর্থ: আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি এবং সামুদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। এবং বহু কীলকের অধিপতি ফেরাউনের সাথে যারা দেশে সীমালজ্ঘন করেছিল। অতঃপর সেখানে বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশাঘাত করলেন। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।[২৭৯]

[২৭৬]. সূরা কামর, আয়াত: ১৮-২২।
[২৭৭]. সূরা নাজম, আয়াত: ৫০-৫৫।
[২৭৮]. সূরা আয্ যারিয়াত, আয়াত: ৪১-৪২।
[২৭৯]. সূরা ফজর, আয়াত· ৬-১৪।

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ . سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ
حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ . فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ .

অর্থ: এবং আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু, যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। আপনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। আপনি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পান কি?[২৮০]

আ'দ সম্প্রদায়ের কাহিনী:

মোহাম্মদ বিন ইসহাক প্রমুখ লিখেছেন, 'আহ্কাফ' বা আম্মান এবং 'হাদ্বরা'মাউত' এর মধ্যবর্তী মরুভূমি এলাকায় ছিলো আ'দ সম্প্রদায়ের বসবাস। তারা ছিলো দীর্ঘদেহী ও বলবান। শারীরিক শক্তিমত্তার কারণে তারা হয়ে উঠেছিলো অহংকারী। অন্য সম্প্রদায়গুলির উপর তারা চালাতো অত্যাচার। ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখতো সকলকে। প্রতিমাপূজারী ছিলো তারা। পূজা করতো তিনটি প্রতিমার– সদা, সমুদ এবং হিবা। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের বংশের হূদ নামক এক ব্যক্তিকে নবুয়ত দান করলেন। বংশমর্যাদার দিক থেকে হযরত হূদ অত্যুন্নত হলেও চরিত্রগত দিক থেকে ছিলেন সর্বাধিক উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আহ্বান জানালে ; তৌহিদের দিকে। আরো বললেন, খবরদার! কারো প্রতি অত্যাচার কোরো না। কিন্তু তাঁর এই সরল ও পবিত্র আহ্বানে সাড়া দিলো না তাঁর সম্প্রদায়। উপরন্তু বললো, তুমি মিথ্যাবাদী। আর আমরা হচ্ছি এক শক্তিমান সম্প্রদায়। আমাদের সমকক্ষ কে? আ'দ সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করতো এবং সেগুলোকে জবর দখল করে রাখতো। অবাধ্যতার জন্য তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ্পাক। পরপর তিন বছর বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হলো। চরম দুঃখ কষ্টে নিপতিত হলো মানুষ। সে যুগের নিয়ম ছিলো– বিপদ মুসিবত দেখলে বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, অংশীবাদী সকলেই কাবা গৃহের চত্বরে উপস্থিত হয়ে বিপদমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাতো। ওই সময় মক্কায় বসবাস করতো আমালিকা। অর্থাৎ আমালিক বিন লাদের বিন শাম বিন নুহের বংশধরেরা। তাদের সর্দার ছিলো মুয়াবিয়া বিন বকর। মুয়াবিয়ার মা কাল্হিদা বিনতেল খাইর ছিলো আদ কুলোদ্ভবা। তাই আদ সম্প্রদায় ছিলো মুয়াবিয়া বিন বকরের মাতুলকুল। তাঁর মাতুল গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ছিলো কায়েল বিন উনায, ইয়াকিম বিন হাযাল বিন হুযায়েল, আতিল বিন যাদ বিন বড় আদ এবং মুরসাদ বিন সা'দ বিন আকীর।

[২৮০]. সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ৬-৮।

ফাবিয়া বিন বকরের মাতুল জাইসুমাহ্ বিন কুসাইর। প্রত্যেকেই গোত্রের কিছু কিছু লোক নিয়ে চলে গেলেন মক্কায়। এরপর কিছু অনুসারী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন লোকমান বিন ছোট আদ বিন বড় আদ প্রমুখ। তাদের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ালো সত্তরে। মুয়াবিয়া বিন বকরের আতিথ্যে সেখানে তারা অবস্থান করলো মাসাধিককাল। তারা প্রতিদিন মদ্যপান করতো এবং মুয়াবিয়া বিন বকরের দু'টি সুন্দরী ও সুকণ্ঠী ক্রীতদাসীর গান শুনতো। ওই বাঁদী দু'জনকে একত্রে বলা হতো জাররাদাতাইন। এভাবে কেটে গেলো আরো এক মাস। মুয়াবিয়া বিন বকর বললো, আমার মামাবাড়ীর লোকেরা খরা ও দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হতে চলেছে। তাদের বিপদমুক্তির জন্য এরা এসেছে মক্কায়। তারপর আসল কথা ভুলে মত্ত হয়েছে নৃত্যগীত ও মদ্যপানে। এরা আমার অতিথি। তাই তাদেরকে চলে যাওয়ার কথাও বলতে পারি না। কী করবো? যদি কিছু বলি তবে তারা বলবে, আমি মেহমানদারী করতে অনিচ্ছুক। ওদিকে আমার মাতৃকুলের আত্মীয়েরা মরতে বসেছে। এ রকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে উপায়ন্তর না দেখে তাঁর বাঁদীদের কাছে পরামর্শ চাইলো মুয়াবিয়া বিন বকর। বাঁদীদ্বয় বললো, আপনি এ সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা করুন। আমরা তা মেহমানদের মজলিশে সঙ্গীতাকারে গাইবো। আমাদের সুরেলা আবৃত্তি শুনে নিশ্চয় তাদের অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। আর তারা বুঝতেও পারবে না যে, কবিতা রচনা করেছে কে? পরামর্শটি মনঃপুত হলো মুয়াবিয়ার। সে তখন একটি কবিতা রচনা করলো, যার মর্মার্থ নিম্নরূপ–

কায়েল, হে কায়েল এবং হাইছুম! ওঠো। সম্ভবত: আল্লাহ্ বৃষ্টির দ্বারা আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করবেন। খরাতপ্ত আদ সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে তৃষ্ণার্ত। তাদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। বয়োবৃদ্ধরা মরোনোন্মুখ। ললনাকুল ছিলো ধৈর্যধারণকারিণী। কিন্তু তারাও এখন ছটফট করছে পিপাসায়। দুর্ভাগা আদ সম্প্রদায়কে ভক্ষণের জন্য যেনো হিংস্রপ্রাণীকুল আক্রমণোদ্যত। দুঃখের অকূল পাথারে দিশাহীন তারা। আর তোমরা এদিকে মদ-মত্ত আনন্দমগ্ন। হে আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ! ধিক তোমাদেরকে। তোমাদের কপালে নেই নিরাপত্তা এবং শুভবার্তা।

সুন্দরী ক্রীতদাসীদের উপরে বর্ণিত কবিতার সাংগিতিক আবৃত্তি শুনে অতিথিরা একজন আরেকজনকে বলতে শুরু করলো, দেখেছো! কী বেভুল আমরা। আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তো বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছে এ মক্কায়। আর এদিকে আমরা সব ভুলে বসে আছি। চলো, চলো। এক্ষুণি চলো কাবা গৃহের চত্বরে গিয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা শুরু করি। তাদের

মধ্যে একজন ছিলেন ঈমানদার। কিন্তু তাঁর সাথীরা তা জানতো না। হযরত হুদের সত্য আহ্বানকে স্বীকার করেছিলেন তিনি। তাঁর নাম মুরসাদ বিন মাসউদ বিন আফীর। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের দোয়ায় বৃষ্টি হবে না। তোমাদের দোয়া কবুল হবে তখনই, যখন তোমরা হবে নবী হুদের অনুগত এবং অংশীবাদীতা থেকে বিশুদ্ধ প্রত্যাবর্তনকারী। এরপর মুরসাদ ঘোষণা করলেন, আমি ঈমানদার। একথা বলার পর তিনি আবৃত্তি কররেন কয়েকটি ছন্দবদ্ধ কবিতা, যেগুলোর মর্মার্থ নিম্নরূপ–

আদ সম্প্রদায় তাদের নবীর আদেশ লংঘন করেছে। তাই তারা আজ খরাপীড়িত, পিপাসিত। আকাশ তাদের প্রতি এক বিন্দু পানিও বর্ষণ করেনি। সমুদ্ নামক এক প্রতিমার উপাসক তারা। তার সঙ্গে আরো দু'টো প্রতিমা রয়েছে তাদের। সে দু'টোর নাম– সদা ও হাবা। অসংখ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। তিনি আমাদেরই হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন সত্য রসূল। তাঁর অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা সন্ধান পেতে পারি সরল সত্য পথের। আমাদের অন্ধত্ব দূর হতে পারে কেবল তাঁরই আনুগত্যের মাধ্যমে। আমি স্পষ্ট ঘোষণা করছি, হযরত হুদের উপাস্যই আমার উপাস্য। সে-ই একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপাস্য আল্লাহ্ তায়ালাই আমার একমাত্র নির্ভর। আমি তাঁরই প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা করি।

আদ সম্প্রদায়ের অতিথিদল মুয়াবিয়া বিন বকরকে বললো, মুরসাদকে ঠেকাও। সে যেনো আমাদের সঙ্গে কাবা চত্বরে না যেতে পারে। কিন্তু মুরসাদ তাদের আগেই কাবাগৃহের চত্বরে গিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া প্রার্থনা করতে লাগলেন। একটু পরে অন্যান্যরাও সেখানে উপস্থিত হয়ে পৃথক অবস্থান গ্রহণ করে বৃষ্টি প্রার্থনা শুরু করলো। মুরসাদ তাঁর একক নিবেদনে জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! বিশ্বাসীদের মধ্যে এখানে আমি একা। তুমি আমার দোয়া কবুল করো। আমার অবিশ্বাসী সাথীদের অন্তর্ভূক্ত আমাকে কোরো না!

অবিশ্বাসীদের দলনেতা ছিলো কায়েল বিন উনায। তার দলের লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্! কায়েলের দোয়া কবুল করো। তার সঙ্গে আমাদের আবেদনও মঞ্জুর করে নাও।

অবিশ্বাসীদের আরেক নেতা ছিলো লোকমান বিন আদ। তাদের সম্মিলিত দোয়া শেষ হওয়ার পর সে পৃথক স্থানে গিয়ে এই বলে দোয়া শুরু করলো, হে আমার প্রভু! আমি তোমার সকাশে এবার আমার একক নিবেদন পেশ করছি। তুমি আমার হায়াত বাড়িয়ে দাও। তার ওই দোয়া কবুল হয়েছিলো। দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলো সে।

কায়েল বিন উনাযও তার একক প্রার্থনায় জানালো, হে প্রভু! হুদ যদি সত্য পয়গম্বর হয় তাহলে আমাকে অনাবৃষ্টির আযাব থেকে রক্ষা করো। বৃষ্টিবিহীন জীবন তো আমাকে নিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে। এ রকম প্রার্থনা করার ফলে আকাশে দেখা দিলো তিন রঙের মেঘ– সাদা, লাল ও কালো। ওই মেঘকুণ্ডলী থেকে আওয়াজ ভেসে এলো– হে কায়েল! তোমার জন্য এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য এই তিন রঙের মেঘের মধ্যে যে কোনো এক রঙের মেঘ নির্বাচন করো। কায়েল বললো, আমি কালো মেঘকে পছন্দ করলাম। কারণ ঘন কালো মেঘ থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টিপাত হয়। মেঘ থেকে পুনরায় আওয়াজ ভেসে এলো– তুমি পছন্দ করেছো ধ্বংসকে। আদ সম্প্রদায়ের একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। এই ঘোষণার পর পর ভয়াবহ ঘন কালো মেঘপুঞ্জ উড়ে চললো আদ সম্প্রদায়ের বসতির দিকে।

দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো আদ সম্প্রদায়। বললো, এই মেঘ নিশ্চয় আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। কিন্তু নেপথ্যে ঘোষিত হলো, কক্ষনো নয়। এটি হচ্ছে সেই আযাব, যার প্রার্থী তোমরা হয়েছিলে। এটি হচ্ছে মর্মন্তুদ শাস্তি সম্বলিত একটি ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিবার্তা। এই ঘূর্ণিঝড় তোমাদের সকল কিছুর ধ্বংস সাধন করবে।

শুরু হলো সেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রভঞ্জন। নির্মম আযাব। ঝড়ের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে সর্বপ্রথম বেহুঁশ হয়ে গেলো মিহ্‌দার নামক এক রমণী। কিছুক্ষণ পর তার হুঁশ ফিরে এলে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কী দেখেছো তুমি? সে বললো, বিকটদর্শন লেলিহান অগ্নিকুণ্ডের মতো প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিঝড়। বিশাল আকৃতির কিছু লোক সেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলেছে। এরপর শুরু হলো অভূতপূর্ব সেই প্রলয়ঙ্করী পবন। সাত রাত আট দিন ধরে বয়ে চললো সেই ভয়ঙ্কর প্রলয়। সেই তুফানে মৃত্যুমুখে পতিত হলো আদ সম্প্রদায়ের সকল সদস্য। সেই ভয়ঙ্কর তুফানের মধ্যেও হযরত হুদ ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরেরা রইলেন পূর্ণ নিরাপদ। তাঁদের সমাবেশস্থলে বয়ে যাচ্ছিল মৃদুমন্দ সমীরণ। তাঁদের এলাকার বাইরে সবকিছু হয়ে যাচ্ছিলো তছনছ। বিক্ষিপ্ত বাতাসে উড়ে যাচ্ছিলো উটের পিঠের বোঝা। আবার তা আছড়ে পড়ছিলো সেগুলোর উপর। বাতাস কখনো সকলকে উঠিয়ে নিচ্ছিলো আসমানে। আবার সকলকে সজোরে আছাড় দিচ্ছিলো পাথরের উপর।

ওদিকে আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদল তখন অবস্থান করছিলো তাদের মেজবান মুয়াবিয়া বিন বকরের বাড়িতে। ঝড়ের তৃতীয় দিনে এক চাঁদনী রাতে আদ সম্প্রদায়ের এক উষ্ট্রারোহী মক্কায় অবস্থানরত তাদের প্রতিনিধি দলের

নিকট উপস্থিত হলো। উষ্টারোহী ব্যক্তিটি তাদেরকে জানালো, মহাসর্বনাশ শুরু হয়েছে। মনে হয় আদ সম্প্রদায়ের আর কেউই অবশিষ্ট নেই। প্রতিনিধিদল তার কথা বিশ্বাস করতে পারছিলো না। তারা বললো, বলো কী? তুমি যখন রওয়ানা হয়েছিলে তখন হুদ ও তার সঙ্গীদেরকে কোথায় দেখেছো? সে বললো, আমি তাদেরকে দেখে এসেছি নিরাপদ সমুদ্র উপকূলে। এ কথা শুনে সেখানে উপস্থিত হারমিলা বিনতে বকর বললো, কাবার প্রভুর কসম! এ লোক সত্য কথা বলেছে।

বর্ণনাকারীগণ উল্লেখ করেছেন, মুরসাদ্ বিন সা'দ, লোকমান বিন আদ এবং কায়েল বিন উনাযের দোয়া কবুল হওয়ার প্রাক্কালে তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিলো যে, তোমাদের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। এখন তোমরা বলো, কে কি চাও? জেনে রেখো, তোমরা কেউই চিরদিন বেঁচে থাকতে পারবে না। মৃত্যু তোমাদের হবেই হবে। মুরসাদ দোয়া করলো, হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তুমি আমাকে সততা ও পুণ্য দান করো। তাঁর প্রার্থনা কবুল করা হলো। লোকমান দোয়া করলো, হে প্রভু! আমার আয়ু বাড়িয়ে দাও। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কতো বছর বাঁচতে চাও তুমি? লোকমান বললো, সাতটি শকুন যতদিন বাঁচে ততদিন। তার দোয়া কবুল করা হলো। পরবর্তী সময়ে লোকমান নিয়ম করে নিয়েছিলো এ রকম– ডিম থেকে সদ্য বর্হিগত পুরুষ শকুনের বাচ্চা প্রতিপালন করতো সে। পরিণত বয়সে ওই শকুন মরে গেলে সে পুনরায় আরেকটি শকুন শাবক পুষতে শুরু করতো। এভাবে একে একে সাতটি শকুন শাবক পুষেছিলো সে। প্রতিটি শকুন শাবক বেঁচে ছিলো আশি বছর ধরে। একে একে সেগুলো মরে যাওয়ার পর লোকমান ঢলে পড়েছিলো মৃত্যুর কোলে। তার সর্বশেষ শকুনটির নাম ছিলো লুবাত।

কায়েলেরও দোয়া কবুল হয়েছিলো। সে বলেছিলো, হে প্রভু! আমার সম্প্রদায়ের লোকদের যে পরিণতি হয় আমি চাই সেই পরিণতি। তাকে বলা হয়েছিলো, তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তো ধ্বংস হতে চলেছে। সে বলেছিলো, তাহলে আমার জীবিত থাকার কোনো প্রয়োজনই নেই। তার এমতো প্রার্থনার প্রেক্ষিতে তাকেও গ্রাস করেছিলো ঝঞ্ঝাতুফানের ওই ভয়ংকর আযাব।

সুদ্দী বলেছেন, ঘন কৃষ্ণ মেঘ থেকে আদ সম্প্রদায়ের উপর নেমে এসেছিলো ভয়াবহ তুফানের আওয়াজ। তারা যখন দেখলো বোঝা বহনকারী উটের পালকে শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে ঘুরপাক খাওয়ানো হচ্ছে, তখন ভয়ে তারা আশ্রয় গ্রহণ করলো আপনাপন গৃহে। সকল দরজা অর্গলাবদ্ধ করে দিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করলো তারা। কিন্তু এতে করেও আত্মরক্ষা করতে পারলো না। ঘর

দরজাসহ সকলকে ধ্বংস করে ফেলা হলো। পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইলো তাদের মরদেহ। এরপর আল্লাহ্‌তায়ালা অবতীর্ণ করলেন কালো রঙের পাখির এক বিশাল ঝাঁক। ওই পাখিরা তাদের মরদেহগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করলো সমুদ্রে।

এক বর্ণনায় এসেছে, ওই ভয়াবহ তুফান ওলটপালট করে দিলো আদ সম্প্রদায়ের সমগ্র জনপদ। সাত রাত আট দিনের সেই ভয়ংকর বালুঝড় বালির মধ্যে প্রোথিত করলো তাদেরকে। বিক্ষিপ্ত বালুকারাশির মধ্য থেকে উত্থিত হচ্ছিলো তাদের আর্তচিৎকার। তারপর সেই ভয়াবহ ঝড় বালুকারাশিসহ তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিলো সাগরে। ওই দিন ঝড়ো বাতাস ছিলো সর্বাপেক্ষা তীব্র গতিসম্পন্ন। সেই বিক্ষিপ্ত তীব্র গতির পরিমাপ করার সাধ্য ছিলো না কারো।[২৮১]

৭. হযরত সালেহ্ আ. ও ছামুদ জাতি

ছামুদ সম্প্রদায়ের কাহিনীঃ

হযরত আমর বিন খারেজা থেকে মোহাম্মদ বিন ইসহাক, ওহাব বিন মুনাব্বাহ্, ইবনে জারীর এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসূল ﷺ বলেছেন, আদ জাতির ধ্বংসপ্রাপ্তির পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো ছামুদ জাতি। তারা ছিলো দীর্ঘদেহী এবং দীর্ঘ আয়ুসম্পন্ন। তারা কাঁচা পাকা ইট দিয়ে বাড়ি তৈরী করতো। সেগুলো এক সময় ধ্বংস হয়ে যেতো, অথচ তারা বেঁচে থাকতো। এতোই দীর্ঘ ছিলো তাদের আয়ুষ্কাল। তাই তারা পাহাড়ের পাথর কেটে কেটে ঘর বানাতো। তারা ছিলো আপাদমস্তক পৃথিবীর মোহে আচ্ছন্ন। ছিলো অনাচারী ও লুণ্ঠনকারী। তাদের হেদায়েতের জন্য তাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন নবী সালেহ্ আ.। তিনি ছিলেন আরব গোত্রভূত। বংশগত মর্যাদার দিক থেকে মধ্যম স্তরের হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মহান ও সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। রেসালতের দায়িত্ব তিনি পেয়েছিলেন যৌবনকালে। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ধর্ম প্রচারের পুরো দায়িত্ব বহন করেছিলেন তিনি। এভাবেই তিনি উপনীত হলেন বার্ধক্যে। কিন্তু তখনও তাঁর বিশ্বাসী উম্মতের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। তাছাড়া তারা ছিলো দরিদ্র ও প্রভাবপ্রতিপত্তিহীন। কিন্তু নবী সালেহ্ আ. সমান উদ্যমে তখনও জানিয়ে চলেছিলেন সত্য ধর্মের আহ্বান। অবাধ্যদেরকে তিনি প্রদর্শন করতে লাগলেন আল্লাহ্ তায়ালার আযাবের ভয়। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা একদিন বললো, হে সালেহ্! তোমার নবুয়তের পক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করো। হযরত সালেহ্ আ.

[২৮১]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৪, পৃ. ৪৮৯-৪৯৩।

বললেন, কী প্রমাণ চাও? তারা বললো, আগামীকাল তুমি আমাদের সাথে আমাদের মেলায় চলো। পরদিন ছিলো তাদের বাৎসরিক উৎসবের দিন। বিরাট মেলা বসতো ওই দিন। ওই দিন তারা স্বহস্তে নির্মিত মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতো মেলায়। তারা বললো, মেলায় গিয়ে তুমি তোমার মাবুদের নিকট প্রার্থনা কোরো। আর আমরা প্রার্থনা করবো আমাদের মাবুদের নিকট। যদি তোমার প্রার্থনা কবুল হয়, তবে আমরা হয়ে যাবো তোমার অনুগত। আর আমাদের প্রার্থনা গৃহীত হলে, আমাদের আনুগত্য করতে হবে তোমাকে। নবী সালেহ্ আ. তাদের কথা মেনে নিলেন। পরদিন মেলায় গিয়ে মূর্তিপূজকেরা তাদের প্রতিমাগুলোর নিকট প্রার্থনা করলো– সালেহের প্রার্থনা যেনো গৃহীত না হয়। তাদের নেতা জানদা বিন আমর বিন জাও বললো, হে সালেহ্! ওই প্রস্তরখণ্ড থেকে পূর্ণ গর্ভবতী ঘন পশমবিশিষ্ট একটি উটনীকে যদি তুমি বের করে নিয়ে আসতে পারো, তবে আমরা তোমাকে সত্য পয়গম্বর বলে মেনে নিবো। পয়গম্বর সালেহ্ আ. তাদের সকলকে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ করালেন। সকলে স্বীকার করলো, প্রার্থিত মোজেজা প্রকাশিত হলে আমরা হয়ে যাবো ঈমানদার।

পয়গম্বর সালেহ্ আ. দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। তারপর প্রার্থনা পেশ করলেন আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে। হঠাৎ একটি পাথরের অভ্যন্তর থেকে সন্তান প্রসবিনী উটের আওয়াজের মতো আওয়াজ বের হতে শুরু করলো। একটু পরে পাথরটি গেলো ফেটে, ওই ফাটল থেকে বেরিয়ে এলো একটি গর্ভবতী উটনী। উটনীটি একটু পরেই তার বাচ্চা প্রসব করলো। এই বিস্ময়কর নিদর্শন দেখে জানদা বিন আমর এবং তার বংশের কিছু লোক তৎক্ষণাৎ ঈমানদার হয়ে গেলো। অন্যান্য গোত্র প্রধানেরাও ঈমান আনার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কিন্তু প্রধান পুরোহিত যাওয়াব বিন আমর বিন লবিদ ও হাব্বাব এবং গণক দাব্বাব বিন সাহর তাদেরকে নিরস্ত করলো। পুরোহিতদ্বয় ও গণকও ছিলো তাদের গোত্র প্রধান।

হযরত সালেহ্ আ. তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের বললেন, এখানকার কূপের পানি একদিন পান করবে 'এই উটনী'। আরেকদিন পান করবে তোমাদের পশুগুলো। আর এর বিচরণে কেউ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না। হযরত সালেহ্ আ.'র এ নির্দেশ সঠিকভাবে পালন করা হলো কিছুদিন। অলৌকিক ওই উটনীটি তার শাবকসহ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে লাগলো। নির্বিঘ্নে ভক্ষণ করতে লাগলো বিভিন্ন স্থানের তৃণ ও উদ্ভিদ। কূপের পানি পান করতে লাগলো একদিন পর একদিন। যেদিন সে পানি পান করতো সেদিন কূপে আর কোনো পানি অবশিষ্ট থাকতো না। পানি পান করার পর সে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে

যেতো। লোকেরা এসে দুগ্ধ দোহন করতো তার। দোহন শেষে পুনরায় যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতো সে। গ্রীষ্মকালে উটনীটি বিচরণ করতো সমভূমিতে। অন্য পশুরা তখন তাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যেতো মরুভূমির দিকে। কিন্তু শীতকালে দিনে সে বিচরণ করতো মরুভূমির তপ্ততায়। গৃহপালিত উট ভেড়া ছাগলগুলো তখন ভয়ে অবস্থান গ্রহণ করতো শীতার্ত মরুদ্যানে। সে পাহাড়ে উঠলে অন্য পশুরা নেমে যেতো নিচে আর নিচে নামলে অন্য পশুরা উঠে যেতো পাহাড়ে। মানুষ তাদের পশুগুলোর দুরবস্থা দেখে ধীরে ধীরে চঞ্চল হয়ে উঠতে শুরু করলো। উটনীটি হয়ে উঠলো তাদের নিকট চরম বিরক্তিকর। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করলো, ওটাকে হত্যা করাই সমীচীন। সকলে একমত হলো এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলো উটনীটিকে এবার সরিয়ে দিতেই হবে।

উনাইযাহ্ এর ডাক নাম ছিলো উম্মে গানাম। তার পিতার নাম ছিলো গানাম বিন মাজায এবং তার স্বামীর নাম ছিলো যাওয়াব বিন আমর। তার ছিলো কয়েকটি সুন্দরী কন্যা এবং অনেক গৃহপালিত পশু। এ রকম অনেক গৃহপালিত পশুর অধিকারিনী ছিলো মোখতারের কন্যা সাদুফও। এই দুই মহিলার সঙ্গে ছিলো রসূল সালেহ্ আ.'র শত্রুতা। কারণ অলৌকিক উষ্ট্রীটির কারণে তাদের পশুগুলো কষ্ট পেতো খুব। তাই ওই দুই মহিলাই উটনীকে হত্যা করার ব্যাপারে গ্রহণ করেছিলো অগ্রবর্তিনীর ভূমিকা। সাদুফ প্ররোচিত করলো হাব্বাবকে। কিন্তু হাব্বাব রাজী হলো না। তখন সাদুফ উৎসাহিত করলো তার চাচাতো ভাই মাসদাকে। বললো, উটনীটিকে হত্যা করতে পারলে আমি হয়ে যাবো তোমার। সাদুফ ছিলো সুন্দরী ও বিত্তবতী। তাই মাসদা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্মত হলো। অপর মহিলা উনাইযাহ্ ঠিক করলো কাযার বিন সালিফকে। উনাইযাহ্ তাকে বললো, তুমি উটনীটিকে মেরে ফেলতে পারলে আমার কন্যাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তুমি পাবে। কাযারের গায়ের রঙ ছিলো লাল। চোখ ছিলো নীল বর্ণের। দীর্ঘদেহ বিশিষ্ট ছিলো সে। বর্ণনাকারীদের ধারণা, সে ছিলো অবৈধ জাত। সালিফের গৃহে জন্ম হয়েছিলো বলেই তাকে বলা হতো কাযার বিন সালিফ। সালিফ ছিলো তাদের সম্প্রদায়ের এক প্রতাপশালী নেতা। 'ইজিম্বায়াচ্ছা আশক্বাহা' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রসূল ﷺ বলেছেন, সে ছিলো তাদের গোত্র প্রধান। আবু জামআর মতো দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জামআ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারী। হাদিসে বর্ণিত উষ্ট্রী বধের ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে– মাসদা ও কাযার দু'জনেই উষ্ট্রী বধ করতে চললো। সাহায্যকারী হিসাবে সাতজন লোককে সঙ্গে নিলো তারা। উষ্ট্রীটির প্রত্যাবর্তনের পথে পাথরের

প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে ওৎ পেতে বসে রইলো কাযার। অন্য পথে আত্মগোপন করে প্রতীক্ষা করতে লাগলো মাসদা। হঠাৎ সে উষ্ট্রীটিকে চলে যেতে দেখে নিক্ষেপ করলো একটি তীর। তীরটি বিদ্ধ হলো উষ্ট্রীটির পায়ের উপরিভাগে। ওদিকে উনাইযাহ্ তার সুন্দরী এক কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে কাযারকে গিয়ে বললো, এখানে নয়, ওদিকে যেয়ে দেখো উষ্ট্রীটি তীরবিদ্ধ হয়েছে। কাযার তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলো সেদিকে এবং সজোরে তার উপরে হানলো তরবারীর আঘাত। উষ্ট্রীটি তার শাবককে জোরে চিৎকার করে ডাকলো। তরবারীর আঘাতে কুঁজ কর্তিত হয়েছিলো তার। কাযার এবার তার বুকে ছুঁড়ে মারলো বর্শা। বর্শাবিদ্ধ উষ্ট্রীটি একটু পরেই মৃত্যুবরণ করলো। অবাধ্য জনতা আনন্দে হৈ চৈ করে উঠলো। তারা উটের গোশত ভাগ করে নিলো এবং সে গোশত রান্নাও শুরু করলো। শাবকটি তার গর্ভধারিণীর এ রকম পরিণতি দেখে উঠে গেলো একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়। কেউ কেউ বলেছেন, পাহাড়টির নাম সুর। আবার কেউ কেউ বলেছেন, খাযাহ্।

রসূল সালেহ্ আ. সেখানে উপস্থিত হলেন একটু পরেই। তাঁর বিশ্বাসী অনুচরেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কোনো দোষ নেই। উষ্ট্রীটিকে হত্যা করেছে কাযার এবং মাসদা। রসূল সালেহ্ আ. বললেন, শাবকটির সন্ধান করো। যদি তাকে পাও, তবে আশা করা যায় তোমরা আযাব থেকে বাঁচতে পারবে। লোকেরা তৎক্ষণাৎ শাবকটিকে খুঁজতে বের হলো। পাহাড়ের উপরে সেটিকে দেখতে পেয়ে ধরতে গেলো। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা পাহাড়কে করে দিলেন অনেক অনেক উচ্চ। যেখানে উড়ন্ত পাখিরাও পৌছতে সক্ষম হলো না।

বর্ণিত হয়েছে, শাবকটি হযরত সালেহ্ আ.কে দেখতে পেয়ে কেঁদে আকুল হলো। অনেক রোদনের পর সে তিনবার উচ্চারণ করলো বুকভাঙ্গা আওয়াজ। সে আওয়াজে ফেটে গেলো একটি বড় পাথর। আর ওই ফাটলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলো শাবকটি। এভাবে সে চিরদিনের জন্য চলে গেলো মানবচক্ষুর অন্তরালে। হযরত সালেহ আ. হন্তারক জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শাবকটি চিৎকার করেছে তিনবার। তাই তোমাদের জন্য আয়ু নির্ধারিত হলো মাত্র তিনদিন। তিনদিন পর তোমাদের উপর নেমে আসবে আযাব। এর কোনো অন্যথা হবে না।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, অলৌকিক উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার জন্য রওয়ানা হয়েছিলো নয়জন। পাঁচজন উষ্ট্রীটিকে এবং অবশিষ্ট চারজন তার শাবকটিকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হলো। শাবক হত্যার দলে ছিলো মাসদা ও তার ভাই যাব বিন মাহ্‌রাজ। শাবকটিকে দেখতে পেয়েই মাসদা নিক্ষেপ করলো

তীর। তীরটি বিদ্ধ হলো তার হৃৎপিণ্ডে। মাসদা ও তার সঙ্গীরা তার পা ধরে পাহাড় থেকে নিচে টেনে নামালো এবং সেটিকেও তার মায়ের মতো জবাই করে গোশত বন্টন করে নিলো নিজেদের মধ্যে। হযরত সালেহ্ বললেন, তোমরা চরম সীমালংঘনকারী। এবার তবে আল্লাহ্র আযাব আস্বাদনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু অবিশ্বাসীরা ভয় করলো না। তারা আরো উপহাস করে বলতে শুরু করলো, হে সালেহ্! আযাব তো আসবে বুঝলাম, কিন্তু কখন আসবে? সে আযাবের নিদর্শন কোথায়? ছামুদ সম্প্রদায় রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবারকে বলতো যথাক্রমে– আওয়াল, আওন, দিবার, জাব্বার, মোনেস, আরুবাহ্ এবং শায়ার। তারা উটনীটিকে হত্যা করেছিলো বুধবার। তাদের বিদ্রূপের উত্তরে হযরত সালেহ্ আ. বলেছিলেন, বৃহস্পতিবার ভোর বেলা থেকে তোমাদের চেহারা হয়ে যাবে হলুদ। শুক্রবার সকাল থেকে হবে লাল এবং শনিবার সকাল থেকে হবে কালো। আর রবিবার সকালে তোমাদের প্রতি আপতিত হবে আযাব। এ কথা শুনে নয়জন হন্তারক বলতে লাগলো, এবার চলো আমরা সালেহকেই শেষ করে দেই। আযাব যদি আসেই তবে আযাব আসার আগেই তাকে শেষ করে দেয়া ভালো। আর যদি আযাব না আসে তবে সেও চলে যেতে পারবে তার প্রিয় উটনীটির কাছে। হত্যার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো তারা। গভীর রাতে তারা একযোগে উপস্থিত হলো হযরত সালেহ্ আ.'র বাসগৃহের নিকটে। কিন্তু যারা হত্যা করতে উদ্যত হলো তারা আর ফিরে এলো না। ফেরেশতারা পাথর নিক্ষেপ করে তাদেরকে মেরে ফেললো। ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে অবাধ্য জনতা এগিয়ে গেলো হযরত সালেহ্ আ.'র বসতবাড়ির দিকে। মৃত সাথীদেরকে দেখে তারা বললো, হে সালেহ্! তুমিই এদেরকে হত্যা করেছ। তাই এবার আমরা তোমাকেও হত্যা করবো। তাদের কোন কোন লোক প্রতিবাদ করে উঠলো। বলল, সংযত হও। সালেহ্ আ. যদি সত্য পয়গম্বর হয়, তবে তোমরা তাঁকে হত্যা করতে পারবে না, বরং কথিত আযাব এসে পড়বে আরো তাড়াতাড়ি। আমাদের জন্য তিনদিন অপেক্ষা করাই সংগত। তিনদিন পরেই আমরা বুঝতে পারবো সালেহের কথা সত্য না মিথ্যা। যদি মিথ্যা হয়, তবে তখন যে কোনো সময় আমরা তাকে হঁত্যা করতে সক্ষম হবো। এই পরামর্শটি মেনে নিলো সকলে। তারা আর জটলা না করে সরে পড়লো।

বৃহস্পতিবার সকালে তারা সবিস্ময়ে দেখলো, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের চেহারা হয়ে গেছে হলুদ। তারা বুঝলো আর উপায় নেই। আযাব থেকে বাঁচবার আর কোনো আশাও নেই। কিন্তু আযাবের আলামত দেখতে পেয়েও এতটুকু অনুতপ্ত হলো না অবাধ্যরা। তওবা করার পরিবর্তে আরো বেশী উগ্র হয়ে পড়লো

তারা। হত্যার উদ্দেশ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগলো হযরত সালেহ্ আ.কে। কিন্তু হযরত সালেহ্ আ. তখন আত্মগোপন করেছেন। গোপনে উপস্থিত হয়েছেন ছামুদ সম্প্রদায়ের বনী গানাম গোত্রাধিপতির নিকট। ওই গোত্রাধিপতির নাম ছিলো তাকাব্বাল। ডাক নাম আবু হারব। সে অংশীবাদী হওয়া সত্ত্বেও ছিলো হযরত সালেহ্ আ.'র অনুরাগী। সে হযরত সালেহ্ আ.কে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রাখলো। তাঁকে না পেয়ে দূরাচারেরা তাঁর অনুচরবর্গের উপর শুরু করে দিলো জুলুম। এই অত্যাচারের দৃশ্য দেখে এক বিশ্বস্ত অনুচর গোপনে হযরত সালেহ্ আ.'র নিকটে উপস্থিত হলো। তার নাম ছিলো সদা' বিন হরোম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র নবী! পাষণ্ড অবিশ্বাসীরা আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে। আমরা কি আপনার ঠিকানা বলে দিবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমরা তাদেরকে বলো যে, আমাদের নবী কোথায় আছে তা আমরা জানি। কিন্তু তাঁর ঠিকানা বলে দিলেও তোমরা তাঁকে পাবে না। এ কথা বলে তোমরা আমার অবস্থানস্থলের সংবাদ তাদের জানাও। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। বিশ্বাসী অনুচরবৃন্দ জানিয়ে দিলেন, কোথায় রয়েছেন হযরত সালেহ্ আ.। কিন্তু বিশ্বাসীদের কথা শুনে অবিশ্বাসীরা হয়ে পড়লো উদ্যমহীন। আযাবের আতঙ্ক তাদেরকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছিলো। অবাক হয়ে তারা দেখছিলো তাদের চেহারার হলুদ রঙ। সন্ধ্যার পর তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো হায়! তিনদিনের একদিন তো গত হয়ে গেলো। পরদিন সকালে তারা দেখলো, লাল টকটকে চেহারা হয়েছে সকলের। মনে হচ্ছিলো, চেহারায় লাগিয়ে দেয়া হয়েছে লাল রক্তের প্রলেপ। আহাজারিতে কেটে গেলো তাদের সমস্ত দিন– সমস্ত রাত্রি। তৃতীয় দিন সকালে তারা দেখলো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গিয়েছে সকলের চেহারা। আতঙ্ক আর রোদন বেড়েই চললো তাদের। সন্ধ্যার পর বিশ্বাসী সহচরবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে হযরত সালেহ্ আ. রওয়ানা দিলেন সিরিয়ার দিকে। ফিলিস্তিনের একটি মরুভূমিতে নিরাপদ অবস্থান গ্রহণ করলেন।

ওদিকে রবিবার সকালে অবাধ্য ছামুদ সম্প্রদায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলো। দেহে জড়িয়ে নিলো কাফনের কাপড়। তারা একবার তাকাতে লাগলো মাটির দিকে। আর একবার তাকাতে লাগলো আকাশের দিকে। বুঝতে চেষ্টা করছিলো– আযাব কি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে, না উত্থিত হবে মাটি থেকে। কিন্তু তারা কোনো কিছুই ঠাহর করতে পারছিলো না। বেলা বাড়তে শুরু করলো। হঠাৎ বিকট আওয়াজে শুরু হলো ভূমিকম্প। একই সঙ্গে আকাশ থেকে উচ্চারিত হলো এক বিকট আওয়াজ। ওই আওয়াজ ছিলো বজ্রপাতের চেয়েও অনেক অনেক শক্তিশালী। ওই আওয়াজে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবনিতা মুহূর্তের মধ্যে কলিজা ফেটে মরে গেলো। কিন্তু ওই

আওয়াজের মধ্যেও সাময়িকভাবে বেঁচে গেলো এক রমণী। তার নাম যারিয়াত বিনতে সালাফ। হযরত সালেহ্ আ.'র ঘোর শত্রু ছিলো সে। আযাব আসার আগেই আযাবের ভয়ে খসে পড়েছিলো তার এক পা; সে ভয়ে কোনো রকমে পালিয়ে পৌঁছেছিলো পাশের কুরা উপত্যকাতে। গ্রামবাসীদেরকে ভয়ানক আযাবের সংবাদ জানিয়ে সে পানি প্রার্থনা করলো। পানি দেয়া হলো তাকে, কিন্তু পানি পান করার সাথে সাথে সে মরে পড়ে রইলো।

সুদ্দীর বর্ণনায় এসেছে– আল্লাহ্তায়ালা হযরত সালেহ্ আ.'র নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলেন– তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা অতি শীঘ্র তোমার উটনীকে হত্যা করবে। হযরত সালেহ্ আ. তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এ কথা বলতেই তারা বলে উঠলো, আমরা কখনোই এ রকম করতে পারবো না। হযরত সালেহ্ আ. বললেন, এ মাসে জন্মগ্রহণ করবে একটি শিশু। সে বড় হয়ে হত্যা করবে অলৌকিক উটনীটিকে। ফলে তোমাদের ধ্বংস হয়ে উঠবে অনিবার্য। তারা বললো, এ মাসে ভূমিষ্ঠ হওয়া সকল শিশুকে হত্যা করে ফেলবো আমরা। সে মাসে ভূমিষ্ট হলো দশটি শিশু। তাদের নয়টিকেই হত্যা করে ফেললো তারা। কিন্তু কেমন করে যেনো লাল রঙ এর নীল চক্ষু বিশিষ্ট একটি শিশু বেঁচে গেলো। অতি দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগলো শিশুটি। তাকে দেখে নিহত শিশুদের পিতারা আক্ষেপ করে বলতো, হায়! আমাদের শিশুদের হত্যা না করলে সেও এতদিনে বড় হয়ে উঠতো। তাদের আক্রোশ তখন গিয়ে পড়তো হযরত সালেহ্ আ.'র উপর। তারা বললো, এই লোকটির উস্কানিতেই আমাদের শিশু সন্তানগুলোকে হত্যা করা হয়েছে। তারা একজোট হলো। নিজেদের মধ্যে এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো যে, গভীর নিশীথে আমরা আক্রমণ করে সালেহ্ আ. ও তাঁর বাড়ির সকলকে হত্যা করে ফেলবো। তারা ঠিক করলো সকলকে দেখিয়ে আমরা বের হবো সফরে। মানুষ মনে করবে আমরা অন্য দেশে সফরে গিয়েছি। কিন্তু আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে থাকবো কয়েকদিন। তারপর সালেহ্ আ. যখন ইবাদতের উদ্দেশ্যে গভীর রাতে উপাসনালয়ের দিকে যাবে তখন তাঁকে আমরা একযোগে আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলবো। পুনরায় ফিরে যাবো পর্বতের গুহায়। কয়েকদিন পর ঘরে ফিরে এসে আমরা হত্যার সংবাদ শুনে বিস্মিত হবার ভান করবো। বলবো, হায়! কী মর্মবিদারক সংবাদ। আমরা তো তখন এখানে ছিলামও না। লোকেরা বুঝতেও পারবে না, কে আসলে হত্যা করেছে সালেহ্ আ.কে।

হযরত সালেহ্ আ. তাঁর জনপদের লোকদের সঙ্গে রাত্রি অতিবাহিত করতেন না। তিনি রাত্রিযাপন করতেন এক মসজিদে। ওই মসজিদটির নাম মসজিদে সালেহ্। সকালে তিনি ওই মসজিদে আগত লোকজনদের উদ্দেশ্যে

ওয়াজ নসিয়ত করতেন। দিনের বেলায় ফিরে আসতেন স্বগৃহে। সন্ধ্যায় পুনরায় গমন করতেন ওই মসজিদে।

যারা তাঁকে হত্যা করতে মনস্থ করেছিলো তারা একদিন দিনের বেলায় সফরের ভান করে সকলের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো। অদূরের একটি পাহাড়ে আত্মগোপন করে রইলো তারা। পরিকল্পনা করলো, রাত্রের অন্ধকারে মসজিদে অবস্থানরত হযরত সালেহ্ আ.কে একযোগে আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলবে তারা। কিন্তু তাদের সে আশা সফল হলো না। আল্লাহ্পাকের হুকুমে গুহাটি ধ্বসে পড়লো। গুহার মধ্যেই পাথর চাপা পড়ে মারা পড়লো তারা। এভাবেই সকল কৌশলের উপর আল্লাহ্তায়ালার কৌশল বিজয়ী হয়। তাই এর আয়াতে বলা হয়েছে– 'তারা ফন্দি আঁটলো। আমিও তাদের ফন্দির জবাব দিলাম। অথচ তারা অনুভব করতে পারলো না।'

বিষয়টি কিন্তু চাপা রইলো না। কিছু লোকের নজরে পড়লো, ওই লোকগুলোর লাশ পাথর চাপা পড়ে বিক্ষিপ্তরূপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা জনপদের সকল লোককে একত্র করে জানালো, দেখো সালেহ্ আ. কেবল ওই লোকগুলোর সদ্যভূমিষ্ঠ নয়টি শিশুকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। তাদের পিতাদেরকেও হত্যা করে ফেলে রেখেছে পাহাড়ের পাশে। সকলে তখন একমত হলো যে, সালেহ্ আ.'র উটনীটিকে এবার হত্যা করতেই হবে। ইবনে ইসহাক বলেছেন, উটনীকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিলো হযরত সালেহ্ আ.কে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে।

সুদ্দীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, দশটি শিশুর মধ্যে নয়টিকে হত্যা করা হয়েছিলো। একটিকে হয়নি। সেই শিশুটি খুব দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকলো। অন্য শিশুরা এক বছরে যতটুকু বাড়ে, সে ততটুকু বাড়তে থাকলো এক মাসে। এভাবে অতি দ্রুত বড় হলো সে। বড় হয়ে একদিন সে তার সাথীদেরকে নিয়ে মদ্য পান করতে বসলো। মদ্যপানের জন্য প্রয়োজন হলো পানির। ওই দিন ছিলো উটনীটির পানি পানের দিন। তাই কূপে কোনো পানি পাওয়া গেলো না। পানি না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো তারা। বললো, উটনীর দুধ দিয়ে আমরা কী করবো। আমাদের দরকার পানি। উটনীটি যেদিন পানি পান করে সেদিন কূপের আর কোনো পানিই থাকে না। আমাদের সকল পশুকে সেদিন থাকতে হয় পিপাসিত। উটনীটি পানি পান না করলে আমরা ওই বিপুল পরিমাণ পানি দিয়ে আমাদের পশুগুলোকে পরিতৃপ্ত করতে পারতাম। ক্ষেতেও পানি সিঞ্চন করতে পারতাম। এই উটনীটির জন্যই আমাদের পশুগুলোকে একদিন পর একদিন তৃষ্ণার্ত থাকতে হয়। এই উপদ্রব আমরা সহ্য করি কী করে। উটনীটিকে তাই

হত্যা করাই সমীচীন। সকলে এ প্রস্তাবে সায় দিয়ে বললো, ঠিক আছে, তাই করা হোক। এরপর সকলে মিলে হত্যা করলো ওই অলৌকিক উটনীটিকে।

আব্দুল্লাহ্ বিন দীনারের চাচাতো ভাই থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তাবুক যুদ্ধের সময় রসূল ﷺ হিজর নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সহচরবৃন্দকে নির্দেশ দিলেন, এখানকার কূপটির পানি কেউ পান করো না। পশুদেরকে পান করিয়ো না। সাহাবীগণ বললেন, আমরা তো ওই কূপের পানি সংগ্রহ করেছি। আর ওই পানি দিয়ে আটার খামিরও তৈরী করেছি। রসূল ﷺ বললেন, পানি ও আটার খামির ফেলে দাও।

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বাগভী বর্ণনা করেছেন, রসূল ﷺ হুকুম দিয়েছিলেন, হিজর এলাকায় কূপ থেকে যদি তোমরা পানি সংগ্রহ করে থাকো, তবে সে পানি ফেলে দাও। আর ওই পানি দিয়ে যদি খামির প্রস্তুত করে থাকো, তবে তা খাইয়ে দাও তোমাদের উটগুলোকে। পানি সংগ্রহ করো ওই কূপ থেকে, যে কূপের পানি পান করেছিলো সালেহ্ নবীর উটনী।

বাগভী লিখেছেন, আবু যোবায়ের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত জাবের রা. বলেছেন, তাবুক যুদ্ধের সময় রসূল ﷺ যখন ছামুদ সম্প্রদায়ের এলাকা হিজর অতিক্রম করেছিলেন, তখন সাহাবীগণকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা কখনো এই বিরান জনপদে বিচরণ করবে না। এখানকার পানিও পান করবে না। এ এলাকাটি হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার আযাবগ্রস্ত এলাকা। সুতরাং ভয়ে রোদন করতে করতে এই এলাকা অতিক্রমের সময় মনে মনে প্রার্থনা করতে থেকো যে, তোমাদের উপরে যেনো এ রকম আযাব আপতিত না হয়। আর তোমরা তোমাদের রসূলের নিকট কখনো কোনো মোজেযা দেখতে চেয়ো না। ছামুদ সম্প্রদায় তাদের রসূলের নিকট মোজেযা দেখতে চেয়েছিলো। আল্লাহ্ তায়ালা তখন একটি পাথরের অভ্যন্তর থেকে বের করে দিয়েছিলেন একটি অলৌকিক উটনী। এই পাহাড়ী পথ ধরে ওই উটনীটি একটি কূপে পানি পান করতে যেতো। যেদিন পানি পান করতো, সেদিন কূপের পানি হয়ে যেতো নিঃশেষ। অবাধ্য ছামুদ সম্প্রদায় ওই অলৌকিক উটনীটিকে হত্যা করেছিলো। তাই আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এভাবে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে ওই প্রতাপশালী সম্প্রদায়কে। তাদের সম্প্রদায়ের আবু রাগাল নামক এক ব্যক্তি তখন ছিলো মক্কায়। তাই সে ওই আযাব থেকে তখন রক্ষা পেয়েছিলো। কিন্তু যখন সে হেরেমের সীমানার বাইরে গেলো তখন তার উপরেও আপতিত হলো আযাব। সে ভূমিতে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিলো। তার কাছে তখন ছিলো একটি স্বর্ণ খণ্ড। তার সাথে সাথে ওই স্বর্ণ

খণ্ডটিও দেবে গিয়েছিলো মাটিতে। এ কথা বলে রসূল ﷺ সাহাবীগণকে আবু রাগালের কবর দেখিয়ে দিলেন। সাহাবীগণ সেখানকার ভূমি খনন করে পেয়ে গেলেন ওই স্বর্ণখণ্ডটি। ছামুদ গোত্রের চার হাজার লোক ঈমান এনেছিলেন হযরত সালেহ্ আ.'র প্রতি। হযরত সালেহ্ আ. তাঁর বিশ্বাসী উম্মতগণকে নিয়ে আযাব আসার আগেই চলে গিয়েছিলেন হাদ্বরা মাউতে। সেখানেই গড়ে উঠেছিলো বিশ্বাসীদের এক নতুন জনপদ। সেখানেই মহাপ্রয়ান ঘটেছিলো হযরত সালেহ্ আ.'র। তাই ওই স্থানের নাম হয়েছে হাদ্বরা মাউত। এরপর তাঁর উম্মতেরা গড়ে তুলেছিলো আর একটি জনপদ। ওই জনপদের নাম ছিলো হাসুরা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হযরত সালেহ্ আ.'র মহাঅন্তর্ধান ঘটেছিলো মক্কায়। পরকাল যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর বয়স হয়েছিলো আটান্ন বছর। তিনি তাঁর বিশ্বাসী উম্মতগণের মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন মাত্র বিশ বছর।[২৮২]

সালেহ আ.'র ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহ:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ . فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ . فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ . فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ .

অর্থ: সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহ্র উষ্ট্রী তোমাদের জন্যে প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহ্র ভূমিতে চরে

বেড়াবে। একে অসৎভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমাদেরকে আদ জাতির পরে সর্দার করেছেন; তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং পর্বত গাত্র খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। অতএব আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা ঈমানদার দরিদ্রদেরকে জিজ্ঞেস করল: তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালেহকে তার পালনকর্তা প্রেরণ করেছেন? তারা বলল: আমরা তো তার আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী। দাম্ভিকরা বলল: তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তাতে অস্বীকৃত। অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তারা বলল: হে সালেহ, নিয়ে এস যদ্দারা আমাদেরকে ভয় দেখাতে, যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক। অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে সকাল বেলায় নিজ নিজ গৃহে উপড় হয়ে পড়ে রইল। সালেহ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করলো এবং বলল: হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের পয়গাম পৌছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি কিন্তু তোমরা মঙ্গলাকাঙ্খীদেরকে ভালবাস না।[২৮৩]

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ . قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ . قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ . وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ . فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ . فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ . وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ . كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ .

অর্থ: আর সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করি; তিনি বললেন– হে আমার জাতি! আল্লাহ্র বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নাই। তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন,

তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতএব; তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে চল। আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন; সন্দেহ নেই। তারা বলল– হে সালেহ! ইতিপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যা পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে তার পূজা করতে নিষেধ কর? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদের আহ্বান জানাচ্ছ আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না। সালেহ বললেন– হে আমার জাতি! তোমরা কি মনে কর, আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে বুদ্ধি-বিবেচনা লাভ করে থাকি আর তিনি যদি আমাকে নিজের তরফ হতে রহমত দান করে থাকেন, অতঃপর আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই তবে তার থেকে কে আমায় রক্ষা করবে? তোমরা তো আমার ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করতে পারবে না। আর হে আমার জাতি! আল্লাহর এ উষ্ট্রী তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব তাকে আল্লাহর যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও, এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করবে না। নতুবা অতি সত্বর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে। তবু তারা উহার পা কেটে দিল। তখন সালেহ বললেন– তোমরা নিজেদের গৃহে তিনটি দিন উপভোগ করে নাও। ইহা এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না। অতঃপর আমার আযাব যখন উপস্থিত হল, তখন আমি সালেহকে ও তদীয় সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি, এবং সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা তিনিই সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। আর ভয়ঙ্কর গর্জন পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল, ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। যেন তারা কোনদিনই সেখানে ছিল না। জেনে রাখ, নিশ্চয় সামুদ জাতি তাদের পালনকর্তার প্রতি অস্বীকার করেছিল। আরো শুনে রাখ, সামুদ জাতির জন্য অভিশাপ রয়েছে।[২৮৪]

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ . وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ . وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ . فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ . فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . অর্থ: নিশ্চয় হিজরের বাসিন্দারা পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। আমি তাদেরকে নিজের নিদর্শনাবলী দিয়েছি। অতঃপর তারা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর খোদাই করত। অতঃপর এক প্রত্যুষে তাদের উপর একটা শব্দ এসে আঘাত করল। তখন কোন উপকারে আসল না যা তারা উপার্জন করেছিল।[২৮৫]

২৮৪. সূরা হুদ, আয়াত: ৬১-৬৮।

২৮৫. সূরা হিজর, আয়াত: ৮০-৮৪।

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا . অর্থ: পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার ফলেই আমাকে নিদর্শনাবলী প্রেরণ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। আমি তাদেরকে বোঝাবার জন্যে সামুদকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম। অতঃপর তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যই নিদর্শনাবলী প্রেরণ করি।[২৮৬]

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ . إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ . إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ . وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ . فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ . وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ . وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ . وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ . الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ . قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ . مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ . قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ . وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ . فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ . فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ . وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ . অর্থ: সামুদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই সালেহ, তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেয়া হবে? উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং ঝরণাসমূহের মধ্যে? শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে ? তোমরা পাহাড় কেটে জাঁকজমকের গৃহ নির্মাণ করছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য কর না; যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না।" "তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের একজন। তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নও। সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর।" সালেহ্ বললেন, 'এই উষ্ট্রী, এর জন্যে আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা– নির্দিষ্ট এক-এক দিনের। তোমরা একে কোন কষ্ট দিও না।

২৮৬. সূরা আসরা, আয়াত: ৫৯।

তাহলে তোমাদেরকে মহাদিবসের আযাব পাকড়াও করবে। তারা তাকে বধ করল। ফলে, তারা অনুতপ্ত হয়ে গেল। এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।[২৮৭]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ . قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ . وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ . قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ . وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ . فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ . فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . অর্থ: আমি সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে এই মর্মে প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। অতঃপর তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হল। সালেহ্ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কল্যাণের পূর্বে দ্রুত অকল্যাণ কামনা করছ কেন? তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন? সম্ভবতঃ তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে। তারা বলল, 'তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি।' সালেহ্ বললেন, 'তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহর কাছে; বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং সংশোধন করত না। তারা বলল, 'তোমরা পরস্পরে আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করব। অতঃপর তার দাবীদারকে বলে দেব যে, তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। আমরা নিশ্চয়ই সত্যবাদী। তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব, দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নেস্তনাবুদ করে দিয়েছি। এই তো তাদের বাড়ীঘর–তাদের অবিশ্বাসের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন আছে। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং পরহেযগার ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।[২৮৮]

---

২৮৭. সূরা শু'য়ারা, আয়াত: ১৪১-১৫৯।
২৮৮. সূরা নমল, আয়াত: ৪৫-৫৩।

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . অর্থ: আর যারা সামুদ, আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিলাম, অতঃপর তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করল। অতঃপর তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আযাবের বিপদ এসে ধৃত করল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও সাবধানে চলত, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম।[২৮৯]

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ . فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ . أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ . سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ . إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ . وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ . فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ . فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ . إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ . وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ . অর্থ: সামুদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। তারা বলেছিল: আমরা কি আমাদেরই একজনের অনুসরণ করব? তবে তো আমরা বিপথগামী ও বিকারগ্রস্তরূপে গণ্য হব। আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি উপদেশ নাযিল করা হয়েছে? বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। এখন আগামীকল্যই তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। আমি তাদের পরীক্ষার জন্য এক উষ্ট্রী প্রেরণ করব, অতএব, তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবর কর এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানির পালা নির্ধারিত হয়েছে এবং পালাক্রমে উপস্থিত হতে হবে। অতঃপর তারা তাদের সঙ্গীকে ডাকল। সে তাকে ধরল এবং বধ করল। অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। আমি তাদের প্রতি একটিমাত্র নিনাদ প্রেরণ করেছিলাম। এতেই তারা হয়ে গেল শুষ্ক শাখাপল্লব নির্মিত দলিত খোয়াড়ের ন্যায়। আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?।[২৯০]

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا . إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا . فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا . وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا . অর্থ: সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশতঃ মিথ্যারোপ করেছিল যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল, অতঃপর আল্লাহর রসূল তাদেরকে বলেছিলেন: আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক। অতঃপর ওরা

---

২৮৯. সূরা হা-মীম সিজদা, আয়াত: ১৭-১৮।
২৯০. সূরা ক্বামার, আয়াত: ২৩-৩২।

তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং উষ্ট্রীর পা কর্তন করেছিল। তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন। আল্লাহ্ তাআলা এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না।[২৯১]

৮. হযরত ইব্রাহীম আ.

নাম ও বংশঃ নাম ইব্রাহীম, উপনাম, আবুদ দ্বায়ফান, উপাধি খলীলুল্লাহ, পিতার নাম, তারেখ, মাতার নাম মতান্তরে আমীলা, বুনাহ, মাতালী, শাফী, তার বংশনামা হলো- ইব্রাহীম ইবনে তারেখ ইবনে নাহুর ইবনে সারূগ ইবনে রাগু ইবনে ফালেগ ইবনে আবের ইবনে সালেহ ইবনে আরফাখশায ইবনে সাম ইবনে নূহ আ.।[২৯২]

তাফসীরে হাক্কানীর উদ্ধৃতি দিয়ে মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র. তাফসীরে নঈমী প্রথম খণ্ড ৬৬৯ পৃষ্ঠায় বলেন, ইব্রাহীম ইবনে তারেখ ইবনে নাখূর ইবনে সারূ ইবনে রাউ ইবনে তাবে ইবনে আবের ইবনে সালেহ ইবনে আরফাহশাদ ইবনে শাম ইবনে নূহ ইবনে মালেক ইবনে মুতাওয়াশালেহ ইবনে ইদ্রীস ইবনে ইয়ারু ইবনে মাহলায়েল ইবনে কায়নান ইবনে আনূশ ইবনে শীষ ইবনে আদম আ.।

হযরত ইব্রাহীম আ. নূহ আ.'র প্লাবনের সতেরশ' নয় বছর পর এবং হযরত ঈসা আ.'র প্রায় দুই হাজার তিনশ' বছর পূর্বে বাবেল ও কুফা শহরের নিকটবর্তী কূকী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

'তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান'- এ বলা হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম আ. আহওয়ায নামক এলাকায় 'সূস' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

অধিকাংশ মুফাস্সিরীনগণের মতে 'আযর' ইব্রাহীম আ.'র চাচা ছিলেন। কারণ আযর মূর্তিপূজারী ছিল। অথচ হযরত ইব্রাহীম আ.'র পূর্ব পুরুষের মধ্যে কেউ মূর্তি পূজারী ছিলেন না। কারণ এই বংশ দিয়েই শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ আগমণ করেন। আর তাঁর বংশ পরম্পরায় কোন মুশরিক ছিল না।

হযরত ইব্রাহীম আ.'র জন্ম কাহিনীঃ

নমরূদ ইবনে কেনআন সমগ্র পৃথিবীর বাদশাহ ছিল। তার রাজধানী ছিল বাবেল শহরে যেটি বাগদাদ ও কূফা'র মধ্যবর্তীতে অবস্থিত। নমরূদ প্রথম বাদশাহ যে সর্বপ্রথম বাদশাহী তাজ পরিধান করেছিল এবং লোকদেরকে নিজের

[২৯১]. সূরা আশ্ শামস, আয়াতঃ ১১-১৫।

[২৯২]. আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, খণ্ড-১, পৃ. ১১৭।

ইবাদত করার আহ্বান করেছিল। তার দরবারে সর্বদা অনেক গণক ও তারকাপূজারী উপস্থিত থাকতো। একরাতে নমরূদে স্বপ্ন দেখল যে, আকাশে একটি তারা চমকালো যার ফলে সূর্যের আলো নিস্প্রভ হয়ে গেল। এই স্বপ্ন দেখে সে ভীত হয়ে পড়ল এবং দরবারের গণকদের নিকট এর ব্যাখ্যা জানতে চাইল। তারা বলল, আপনার শহরে এই বছর একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন যিনি আপনার এবং আপনার রাজত্বের ধ্বংসকারী হবেন। এই ব্যাখ্যা শ্রবণমাত্র নমরূদ বলল, তাহলে এই সন্তান জন্মগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। সাথে সাথে সে আদেশ দিল যে, আমার এলাকায় যে সব গর্ভবতী আছে তাদেরকে নজরদারীতে রাখা হোক। কন্যা সন্তান জন্ম দিলে তো ভাল নতুবা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হোক। আজ থেকে আগামী এক বছর পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট যেতে পারবে না যাতে কেউ স্ত্রী সহবাস করতে না পারে। বিষয়টির দায়িত্ব পুলিশের উপর ন্যস্ত করা হলো। একদা কোনভাবে তারেখ তাঁর স্ত্রীর নিকট পৌঁছে সহবাস করলেন। ফলে স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে গেলেন। স্ত্রীর বয়স খুব কম হওয়ায় তার গর্ভ বুঝা যায়নি। দায়িত্বেরত দায়ীরা খোঁজ-খবর নিতে লাগল। কিন্তু আল্লাহর কুদরতী কৌশলের কারণে তা প্রকাশ পায়নি। এ সময় তারেখের বয়স হয়েছিল পচাত্তোর বছর। প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসলে পূর্ব থেকে তারেখ কতৃক তৈরী পাহাড়ের একটি গর্তে স্ত্রী চলে যান। সেখানেই হযরত ইব্রাহীম আ. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা তাকে গর্তে রেখে গর্তের মুখে একটি পাথর দিয়ে ঢেকে দিয়ে সন্তানকে আল্লাহর সোপর্দ করে চলে আসেন। পরের দিন গিয়ে দেখেন ইব্রাহীম আ. একেক অঙ্গুলি থেকে মধু, দুধ, মাখন ইত্যাদি চুসে পান করতেছেন। এটা দেখে মা অত্যন্ত খুশী হলেন। এভাবে তিনি প্রতিদিন গিয়ে দেখে আসতেন। অন্যান্য ছেলে এক বছরে যতটুকু বাড়তো ইব্রাহীম আ. সেখানে এক মাসে ততটুকু বাড়তেন। এভাবে পনের মাসে তিনি পনের বছরের ছেলের সমান হয়ে গিয়েছিলেন।[২৯৩]

নবুয়ত ও দাওয়াতঃ

হযরত ইব্রাহীম আ.'র জন্মস্থানের অধিবাসীরা মূর্তিপূজারী ও তারকা-পূজারী ছিল। এমনকি নিজের বংশের আপনজনরাও স্বহস্তে মূর্তি বানিয়ে বিক্রি করে জীবিকার ব্যবস্থা করতো। তারা এই মূর্তিগুলোকে নিজেদের ভাগ্যাদাতা, রিযিকদাতা ইত্যাদি মনে করতো আর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গিয়েছিল।

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম আ.কে অল্প বয়স থেকে সু-বুদ্ধি ও হক-বাতিল সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলেন সাথে নবুয়তও দান করেছিলেন। হযরত

[২৯৩]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-৭, পৃ. ৬১৮।

ইব্রাহীম আ. যখন দেখলেন নিজের পরিবারের মধ্যেই মূর্তি পূজারী বিদ্যমান তখন সর্বপ্রথম তিনি নিজের আপনজনদের কৃতকর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন এবং সত্যিকারের পালনকর্তার পরিচয় তুলে ধরলেন।

তিনি তাদেরকে বললেন, আপনারা নিজ হস্তে তৈরী নিস্প্রাণ মূর্তিগুলোকে কেন পূজা করতেছেন? উত্তরে তারা বলল, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে করতে দেখেছি। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বপুরুষরাও গোমরাহীতে ছিল, তোমরাও গোমরাহীতে আছ। কারো পূর্বপুরুষরা ভুল করলে পরবর্তীরাও যে ভুল করতে থাকবে তা মোটেও সঠিক নয়, বরং যেটি সত্য সেটি গ্রহণ করাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন– وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ . قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ . قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ . قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ . অর্থ: আর আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে তার সৎপন্থা দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাতও ছিলাম। যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন: "এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ"? তারা বলল: আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এদের পূজা করতে দেখেছি। তিনি বললেন: তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও। তারা বলল: তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ আগমন করেছ, না তুমি কৌতুক করছ? তিনি বললেন: না, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন; এবং আমি এই বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা।[২৯৪]

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে হযরত ইব্রাহীম আ.'র পিতার নাম 'আযর' বলা হলেও প্রায় সব মুফাস্সিরীনে কেরামগণের মতে মূলত 'আযর' ছিল তাঁর চাচা। ওলামায়ে কিরাম এর পক্ষে অনেক প্রমাণাদি পেশ করেছেন। সুতরাং পবিত্র কুরআনে এবং অত্র গ্রন্থে যেখানেই ইব্রাহীম আ.'র পিতার কথা বলা হয়েছে সেখানেই ধরে নিতে হবে যে, তাঁর চাচা 'আযর'ই উদ্দেশ্য।

---

২৯৪. সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৫১-৫৬।

পিতা-পুত্রের বিতর্ক:

পূর্বেই বলা হয়েছে হযরত ইব্রাহীম আ. নিজের পরিবার থেকেই দাওয়াত আরম্ভ করেছেন। তিনি পিতা 'আযর'কে যখন দেখলেন যে, নিজের হাতে মূর্তি তৈরী করে পালনকর্তা মনে করে মূর্তিকে পূজা করতেছে, তখন প্রথমে তাকেই উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনি এবং আপনার পূর্বপুরুষরা যাকে খোদা মনে করে পূজা করতেছেন তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও শিরিকী কাজ। হক ও সত্য হলো যা আমি বলছি তাই। কিন্তু পিতার অন্তরে যখন এই উপদেশের কোন প্রভাব পড়ল না অবশেষে হযরত ইব্রাহীম আ. পিতা থেকে পৃথক হয়ে গেলেন আর বললেন, আমি আপনার অনুপস্থিতিতেও আপনার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবো।

সূরা মরয়মে এই ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে– وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا . يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا . يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا . يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا . قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا . قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا . وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا .
অর্থ: আপনি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবী। যখন তিনি তার পিতাকে বললেন: হে আমার পিতা, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তার এবাদত কেন কর? হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে; যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শয়তানের এবাদত করো না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশঙ্কা করি, দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। পিতা বলল: হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। ইবরাহীম বললেন: তোমার উপর শান্তি হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ্

ব্যতীত যাদের এবাদত কর তাদেরকে, আমি আমার পালনকর্তার এবাদত করব। আশা করি, আমার পালনকর্তার এবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না।[২৯৫]

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ .

অর্থ: স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম পিতা আযরকে বললেন: তুমি কি প্রতিমা সমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট।[২৯৬]

এরপর হযরত ইব্রাহীম আ. তাঁর দাওয়াতকে আরো প্রসারিত করে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকেও সত্যের বাণী পৌছে দিলেন। বিভিন্ন যুক্তি-উপমার মাধ্যমে তাদের প্রকৃত পালনকর্তার পরিচয় তুলে ধরলেন। কিন্তু যাদের তকদীরে হেদায়ত নেই তাদের কান বধির, তাদের চোখ অন্ধ, তাদের অন্তরসমূহ মোহরাঙ্কিত। তারা কখনো সত্য শুনবে না, দেখবে না এবং তা গ্রহণ করবে না। তাদের বেলায়ও অনুরূপ হলো।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ . إِذْ قَالَ
لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ . قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ . قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ
إِذْ تَدْعُونَ . أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ . قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ . قَالَ
أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ . أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ . فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ .
الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ . وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ . وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ .
وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ . وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ . رَبِّ هَبْ لِي
حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ . وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ . وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ
جَنَّةِ النَّعِيمِ . وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ . وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ . يَوْمَ لَا يَنْفَعُ
مَالٌ وَلَا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ . অর্থ: আর তাদেরকে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন। যখন তাঁর পিতাকে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের এবাদত কর? তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সারাদিন এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি। ইব্রাহীম বললেন, তোমরা যখন আহ্বান কর, তখন তারা শোনে কি? অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে? তারা বলল: না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি,

২৯৫. সূরা মরয়ম, আয়াত: ৪১-৪৮।
২৯৬. সূরা আনআম, আয়াত: ৭৪।

তারা এরূপই করত। ইব্রাহীম বললেন, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা? বিশ্ব পালনকর্তা ব্যতীত তারা সবাই আমার শত্রু, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন, যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পূনর্জীবন দান করবেন। আমি আশা করি তিনিই বিচারের দিনে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন। হে আমার পালনকর্তা! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত কর এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর। এবং আমাকে নেয়ামত উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর। এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর। সে তো পথভ্রষ্টদের অন্যতম। এবং পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করো না, যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না।[২৯৭]

ইব্রাহীম আ. মুশরিক ছিলেন না:

ইব্রাহীম আ.'র যুগের লোকেরা প্রতীমা পূজার পাশাপাশি তারকা, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি জাতীয় কোন বড় কিছু দেখলেই ওগুলোকে খোদা মনে করে উপসনা করত। তাদের এসব বদ্ধমূল ধারণা ও উপসনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে হযরত ইব্রাহীম আ. একটা কৌশল অবলম্বন করলেন। একদা রাতে একটি উজ্জ্বল তারকা দেখে হযরত ইব্রাহীম আ. স্বজাতীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এটি আমার পালনকর্তা। কিছুক্ষণ পর যখন নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেল তখন তিনি জাতিকে জব্দ করার চমৎকার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন, আমি অস্তগামী বস্তুকে পছন্দ করি না। অর্থাৎ যা স্থায়ী হয় না বরং ক্ষণস্থায়ী তা আমার পালনকর্তা হতে পারে না। যে বস্তু তার পূজারীদের ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে যায় সে বস্তু পালনকর্তা কিভাবে হতে পারে? কারণ যিনি পালনকর্তা হবেন, তিনি অবশ্যই চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব হওয়া প্রয়োজন। অতঃপর অন্য এক রাতে পূর্ণ চন্দ্রকে সমুজ্জল দেখলেন তখন বললেন, এটিই আমার পালনকর্তা। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন চন্দ্র অস্তমিত হল তখন তিনি বললেন, যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথপ্রদর্শন না করতেন, তবে আমিও তোমাদের ন্যায় পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম এবং চন্দ্রকেই পালনকর্তা ও উপাস্য মনে করতাম। কিন্তু এর উদয়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এ নক্ষত্রটিও আরাধনার যোগ্য নয়। এরপর দিনের বেলায় সূর্যকে দেখে জতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এটিই আমার পালনকর্তা এটি বৃহত্তর। অতঃপর

২৯৭. সূরা শু'আরা, আয়াত: ৬৯-৮৯।

সূর্য যখন নির্দিষ্ট সময়ে অস্ত গেল তখন তিনি জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ সম্পন্ন করার পর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন আর বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যে বস্তুতে শিরিক কর আমি তা থেকে মুক্ত। তোমরা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট বস্তুকেই আল্লাহর অংশীদার স্থির করেছ।

অর্থাৎ তারকা, চন্দ্র ও সূর্য এগুলো আল্লাহর সৃষ্ট। এগুলো স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত। সুতরাং এগুলো উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। অতএব তোমাদের উচিত এসব সৃষ্টির উপসনা পরিত্যাগ করে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তার উপসনা করা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা। আমিও কেবল তাঁর উপসনা করি তাঁকেই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা মনে করি। আর আমি মুশরিক নই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. অর্থ: আমি এরূপভাবেই ইবরাহীমকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম- যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বলল: এটি আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন বলল: আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, বলল: এটি আমার প্রতিপালক। অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বলল: যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ-প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। অতঃপর যখন সূর্যকে

চকচক করতে দেখল, বলল: এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত। আমি একমুখী হয়ে স্বীয় আনন ঐ সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেক নই। তাঁর সাথে তার সম্প্রদায় বিতর্ক করল। সে বলল: তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্ক করছ; অথচ তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরীক কর, আমি তাদেরকে ভয় করি না- তবে আমার পালনকর্তাই যদি কোন কষ্ট দিতে চান। আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা কর না? যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছ, তাদেরকে কিরূপে ভয় কর, অথচ তোমরা ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরীক করছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। অতএব, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি লাভের অধিক যোগ্য কে, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক। যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকীর সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী। এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।[২৯৮]

কেউ কেউ বলেছেন হযরত ইব্রাহীম আ. যখন পাহাড়ের গর্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পনের মাসে পনের বছরের বয়সের ছেলের ন্যায় বৃদ্ধি পেয়েছিলেন তখন এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। তিনি তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পালনকর্তা কে? মা উত্তর দিলেন, তোমার পালনকর্তা (মুরুব্বী তথা বাহ্যিকভাবে লালন-পালনকারী) আমি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিও তো আমার ন্যায় পানাহারের প্রতি এবং মানবীয় প্রয়োজনাদির মুখাপেক্ষী। সুতরাং আপনার পালনকর্তা কে? মা উত্তরে বললেন, তোমার পিতা। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তিনিও তো মানবীয় প্রয়োজনাদির মুখাপেক্ষী, তার পালনকর্তা কে? উত্তরে মা বললেন, তার পালনকর্তা হলো নমরূদ। (তারেখ নমরূদের কাছে ভাতা পেতেন) তিনি বললেন, নমরূদও তো আমাদের ন্যায় অনেক কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী। তার পালনকর্তা কে? তখন মা বললেন, হে পুত্র আমার! চুপ থাক। তারপর মা তারেখকে বললেন, যে ছেলের ভয়ে ভীত নমরূদ, সে ছেলে আপনার ঘরে। সে আজ আমাকে বিজ্ঞজনের ন্যায় প্রশ্ন করেছে। আমি নই বরং সমগ্র জাতিই এর উত্তর দিতে পারবে না। একথা শুনে তারেখ খুশী

২৯৮. সূরা আনআম, আয়াত: ৭৫-৮৩।

হলেন। হযরত ইব্রাহীম আ. সাত বছর বয়সে সন্ধা বেলায় গর্ত থেকে উঠে আসেন। তখন স্বীয় সম্প্রদায়কে একত্রিত করে তিনি তাদের সাথে এসব কথাপোকথন করেন যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[২৯৯]

হযরত ইব্রাহীম আ. কতৃক মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা:

হযরত ইব্রাহীম আ. স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে অনেক ওয়ায-নসীহত করার পরও তারা সত্য গ্রহণ থেকে বিমুখ রইল। তখন তিনি বুঝে নিলেন যে, এদেরকে মুখে উপদেশ দিয়ে লাভ নেই। তাই তিনি মনস্থ করলেন যে, তাদেরকে বাস্তব ঘটনার সম্মুখীন করে তাদের পূজনীয় কর্মাক্ষম নি:প্রাণ মূর্তিগুলোর মধ্যে যে কোন প্রকারের শক্তি-সামর্থ নেই তা প্রমাণ করবেন।

সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে একজনে বলল, কাল আমাদের ঈদ উৎসব। আমরা খুব ধুম-ধাম করে এই উৎসবে মেলা উদযাপন করি। আমাদের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই এই মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। চল, তুমিও আমাদের সাথে মেলায় যাই। সেখানে আমাদের ধর্মীয় উৎসব দেখলে আমাদের ধর্মের প্রতি তোমার আগ্রহ জন্মাতে পারে। এ সময় তিনি আল্লাহর শপথ করে বললেন, যখন তোমরা মেলায় চলে যাবে তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা করবো।

বাবেল শহরে লোকেরা বছরে একদিন উৎসব পালন করত। তাদের সবাই ঐদিনে শহরের বাইরে গিয়ে সারাদিন খেল-তামাশায় লিপ্ত থাকত। যাবার সময় বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু খাবার মন্দিরে মূর্তিগুলোর সামনে রেখে যেতো এবং উৎসব শেষে সন্ধায় এসে ঐ খাবারগুলোকে তাবাররুক মনে করে খুশী হয়ে বড় ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে খেতো।

উৎসবের দিন যখন লোকেরা শহর ছেড়ে বাইরে মেলায় যেতে লাগল, তখন ইব্রাহীম আ.কেও সঙ্গে যাবার আহ্বান করল। যেহেতু সম্প্রদায়ের লোকেরা তারকা পূজারী ছিল তাই তিনি তাদেরকে তাঁর কথা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য কিছুক্ষণ তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, আমি অসুস্থ। তোমাদের সাথে যেতে অক্ষম। মূলত হযরত ইব্রাহীম আ. কোন তারকাপূজারী কিংবা জ্যোতি:শাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। কেবল উৎসবে যোগদান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে এ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, যা তাদের দৃষ্টিতে অধিক

---

[২৯৯]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-৭, পৃ. ৬১৮, সূত্র তাফসীরে সাবী, রূহুল বয়ান ও খাযায়েনুল ইরফান ও মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আরাফা হানাফী র., বাদা'য়েউয যহুর, আরবী, পৃ. ৮৪।

গ্রহণযোগ্য। অথবা তাঁর এই বক্তব্যটি ছিল 'তাওরিয়া', তাওরিয়া অর্থ এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তবের প্রতিকূলে তবে বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তবের অনুকূলে। অথবা এর অর্থ আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো। কারণ আরবী ব্যাকরণে اسم فاعل বহুল পরিমাণে ভবিষ্যৎকালের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অথবা সত্যি সত্যিই তিনি তাদের কুফুরীর কারণে মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। পরের দুই অর্থ নিলে ইব্রাহীম আ.'র কথা মিথ্যা নয় বরং সত্য ছিল। সম্প্রদায়ের লোকেরা ইব্রাহীম আ.'র ওযর মেনে নিল এবং তাঁকে রেখে উৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে শহর ছেড়ে চলে গেল। নারী-পুরুষ, ছোট-বড় এমনকি মন্দিরে অবস্থানকারী পুরোহীতরাও চলে গিয়েছে।

তখন হযরত ইব্রাহীম আ. মন্দিরে গিয়ে দেখেন যে, পুরো মন্দিরে মূর্তি এবং তাদের সামনে হরেক রকমের সু-স্বাদু খাবার পড়ে আছে। তিনি মূর্তিগুলোকে সম্বোধন করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে বললেন, কি ব্যাপার তোমাদের সামনে সুস্বাদু খাবার, তোমরা খাচ্ছ না কেন? কিন্তু এদের পক্ষ থেকে কোন উত্তর আসল না। তখন তিনি একটি কুড়াল নিয়ে একে একে সমস্ত মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন, বড় মূর্তিটি ব্যতিত। তিনি তাদের বিরুদ্ধে হুজ্জত কায়েম করার উদ্দেশ্যে এটা ভাঙ্গেন নি। তিনি বড় মূর্তির কাঁধে কুড়ালটি রেখে ঘরে চলে আসেন।

সন্ধ্যায় লোকেরা মেলা থেকে মন্দিরে এসে দেখল যে, তাদের মূর্তিগুলো মাটিতে টুকরা টুকরা হয়ে পড়ে আছে আর বড় মূর্তির কাঁধে আছে কুড়াল। এই দৃশ্য দেখে তাদের হৃদয় ভেঙ্গে গেল আর বলতে লাগল যে একাজ করেছে সে বড় যালিম। তাদের মধ্যে একজনে বলল, ইব্রাহীম নামী একজন ব্যক্তি সেই আমাদের মূর্তিগুলোর সমালোচনা করত। এই দু:সাহসিক কাজ সেই করতে পারে। দেখতে দেখতে সম্প্রদায়ের লোকেরা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে গেল আর চিৎকার করে করে বলতে লাগল এই যালিমকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

ইব্রাহীম আ. এমন সুযোগের অপেক্ষায় আছেন যে, যেন লোক সমাগমে তাদের মূর্তির অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ হোক। যাতে অন্তত কিছু লোকের অন্তরে এগুলোর প্রতি ঘৃণা জন্মাবে এবং মূর্তিপূজা ত্যাগ করে আল্লাহর উপর ঈমান আনবে।

বিশাল লোকের সমাবেশে হযরত ইব্রাহীম আ.কে গ্রেফতার করে আনা হলো। সবাই তাঁর উপর ক্ষিপ্ত। জিজ্ঞাসা করা হল তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছ? তিনি উত্তরে বললেন- بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ

هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ বরং এদের এই প্রধান মূর্তিই তো একাজ করেছে, তারা যদি কথা বলতে পারে তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

এখানে ইব্রাহীম আ. একটা বাস্তব সত্যের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। সাধারণত যার হাতে অস্ত্র পাওয়া যায় সেই দোষী সাব্যস্ত হয়। যেহেতু তোমাদের বড় মূর্তির কাঁধে কুড়াল আর এর সামনে বাকী মূর্তিগুলো ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে পড়ে আছে সেহেতু সেই এ কাজ করেছে। তা ছাড়া যে সব মূর্তিগুলো ভাঙ্গা হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর কে ভেঙ্গেছে? যদি তারা বলতে পারে। অথবা সর্ব মূর্তি ভেঙ্গে গেলেও বড় মূর্তি তো অক্ষত আছে। অন্য কেউ ভাঙ্গলেও সে বলতে পারবে। কারণ তার সামনেই ভাঙ্গা হয়েছে। সুতরাং তাকেই জিজ্ঞাসা কর।

হযরত ইব্রাহীম আ.'র দাত ভাঙ্গা জবাবে তারা চুপ হয়ে গেল। তারা নিজেরা নিজেরাই বলতে লাগল- আমরাও বড় বোকামীর কাজ করেছি। আমাদের খোদাগুলো কোন পাহারাদার ছাড়া একাকী রেখে গিয়েছি। তারা কিছুটা শান্ত হয়ে বলল, হে ইব্রাহীম! তুমি ভাল করেই জান যে, এদের মধ্যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষমতা নেই, নেই কোন নড়াচড়া করার ক্ষমতা এবং নেই কোন অনুভূতি শক্তি। কিভাবে তাদের কেউ কারো উপর আক্রমণ করবে আর কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবে? অর্থাৎ তারা সকলের সামনে স্বীকার করল যে, তাদের খোদাগুলোর কোন লাভ-ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই। যারা নিজেকে রক্ষা করতে পারে না তারা তাদের পূজারীদেরকে কিভাবে রক্ষা করবে? বিষয়টি সবার সামনে প্রমাণিত হয়ে গেল। আর এটাই ছিল হযরত ইব্রাহীম আ.'র আসল উদ্দেশ্য। তিনি সেদিক দিয়ে সফল হয়েছেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের কোন লাভ-ক্ষতি করতে পারে না? ধিক তোমাদের জন্যে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতিত যাদের ইবাদত কর তাদের জন্যে। তোমরা কি বুঝ না?

যখন তারা যুক্তি-তর্কে পরাজিত হয়ে নিরোত্তর হয়ে গেল তখন তারা আলোচনা বাদ দিয়ে শক্তি প্রয়োগের কথা উল্লেখ করল। তারা সবাই একমত হলো যে ইব্রাহীম আ.কে আগুনে নিক্ষেপ করে চিরতরে শেষ করে দেয়া হোক। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ . فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ . قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ . قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ . قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ

النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ . قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ . قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ . فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ . ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ . قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ . أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ . قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ . অর্থ: আল্লাহর কসম, যখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা করব। অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন ওদের প্রধানটি ব্যতীত; যাতে তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে। তারা বলল: আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করল? সে তো নিশ্চয়ই কোন জালিম। কতক লোকে বলল: আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইব্রাহীম বলা হয়। তারা বলল: তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা দেখে। তারা বলল: হে ইব্রাহীম, তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছ? তিনি বললেন: এদের এই প্রধানই তো একাজ করেছে। অতএব তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তারা কথা বলতে পারে। অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং বলল: লোকসকল; তোমরাই বে-ইনসাফ। অতঃপর তারা ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে: "তুমি তো জান যে, এরা কথা বলে না"। তিনি বললেন: তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক তোমাদের জন্যে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরই এবাদত কর, ওদের জন্যে। তোমরা কি বোঝ না? তারা বলল: একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।[৩০০]

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ . إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ . أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ . فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ . فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ . فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ . فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ . فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ . مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ . فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ . فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ . قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ . وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ . قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ . فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ . অর্থ: আর নূহপন্থীদেরই একজন ছিল ইবরাহীম।

৩০০. সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৫৭-৬৮।

যখন সে তার পালনকর্তার নিকট সুষ্ঠু চিত্তে উপস্থিত হয়েছিল, যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমরা কিসের উপাসনা করছ? তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত মিথ্যা উপাস্য কামনা করছ? বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? অতঃপর সে একবার তারকাদের প্রতি লক্ষ্য করল। এবং বলল: আমি পীড়িত। অতঃপর তারা তার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। অতঃপর সে তাদের দেবালয়ে, গিয়ে ঢুকল এবং বলল: তোমরা খাচ্ছ না কেন? তোমাদের কি হল যে, কথা বলছ না? অতঃপর সে প্রবল আঘাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন লোকজন তার দিকে ছুটে এলো ভীত-সন্ত্রস্ত পদে। সে বলল: তোমরা স্বহস্ত নির্মিত পাথরের পুজা কর কেন? অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। তারা বলল: এর জন্যে একটি ভিত নির্মাণ কর এবং অতঃপর তাকে আগুনের স্তূপে নিক্ষেপ কর।[৩০১]

অগ্নিকুণ্ড শীতল হওয়াঃ

নমরূদ ও তার সম্প্রদায় সম্মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত নিল যে, ইব্রাহীম আ.কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হোক। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে,

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ . তার জন্য একটি ইমারত তৈরী কর হোক তারপর প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হোক।[৩০২] তখন তারা পাথর দিয়ে ত্রিশ গজ লম্বা, বিশগজ প্রস্ত চারটি দেওয়ালা তৈরী করে ঘোষণা করা হল যে, নমরূদের আদেশ যে, ছোট-বড় নারী-পুরুষ সকলেই লাকড়ি জমা করে এখানে আনতে হবে অন্যথায় ইব্রাহীমের সাথে তাকেও অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে সকলেই কাঠ সংগ্রহ করে বিশাল স্তুপ করল। দীর্ঘ একমাস যাবৎ কাঠ সংগ্রহের কাজ চলল। এমনকি তাদের অসুস্থ মহিলা মান্নত করল যে, আর হলে অগ্নিকুণ্ডের জন্য কাঠ সংগ্রহ করবে। অতঃপর তাতে অগ্নিসংযোগ করে সাতদিন পর্যন্ত প্রজ্জলিত করতে থাকে। অগ্নিশিখা আকাশ চুম্বি হল। কোন পাখি এর উপর আকাশে উড়লে জ্বলে ছাই হয়ে যেত।

এরপর হযরত ইব্রাহীম আ. কে হাত-পা ও গলায় বেঁধে তাঁকে আগুনের পাশে আনা হল। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের পাশে যাওয়াই মুশকিল হয়ে পড়ল। অগ্নির অসহ্য তাপের কারণে তার ধারে-কাছেও যেতে কারো সাধ্য ছিলনা। তারা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল কিভাবে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করবে। এমতাবস্থায় শয়তান এসে

[৩০১]. সূরা সাফ্ফাত, আয়াতঃ ৮৩-৯৭।
[৩০২]. সূরা সাফ্ফাত, পারা:২৩, আয়াতঃ ৯৭

ইব্রাহীম আ.কে 'মিনজানিকে'(এক প্রকার নিক্ষেপন যন্ত্র) রেখে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিল। যখন তাঁকে মিনজানিকে রেখে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন এই দৃশ্য ফেরেশতাকুল, দ্যুলোকে ভূলোকে সমস্ত সৃষ্টিজীব চিৎকার করে কেঁদে উঠল আর আরজ করল- হে আল্লাহ! সমগ্র ভূপিষ্ঠে শুধুমাত্র তোমার একজন বান্দাই তোমার ইবাদত করতেছে। তাঁকে আজ অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। যদি অনুমতি হয় তবে আমরা তাঁকে সাহায্য করতে পারি। আল্লাহ বলেন, যদি তিনি সাহায্য চায় তবে অনুমতি দিলাম তোমরা সাহায্য করতে পার। আর যদি আমার কাছে চায় তবে অমি তাকে সাহায্য করব। তখন পানির ও বাতাসের দায়িত্ববান ফেরেশতাদ্বয় এসে সাহায্যের আবেদন করলে তিনি বলেন, তোমাদের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই, প্রভুর সন্তুষ্টিতেই ইব্রাহীম সন্তুষ্ট। মিনজানিক থেকে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার পর যখন তিনি অগ্নিকুণ্ডের নিকটে পৌঁছে গেলেন তখন জিব্রাঈল আ. তাঁর খেদমতে এসে বলল, يا ابراهيم الك حاجة হে ইব্রাহীম! সাহায্যের প্রয়োজন আছে? উত্তরে তিনি বললেন, نعم اما اليك فلا প্রয়োজন তো আছে তবে তোমার কাছে নয়। জিব্রাঈল আ. বলল, অচ্ছা যার কাছে প্রয়োজন তাকে আহ্বান করুন। কারণ আগুনের একেবারে নিকটে এসে গিয়েছেন আপনি। তিনি বললেন, علمه بحالى حسبى من سوالى তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত আছেন, তিনিই আমার প্রয়োজন পুরণে যথেষ্ট। তখন আল্লাহ তায়ালা আগুনকে আদেশ করলেন- يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ হে আগুন! ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।[৩০৩] সাথে সাথে অগ্নিকুণ্ড আরামদায়ক বাগানে পরিণত হয়ে গেল এবং তাঁকে জান্নাতি রেশমী পোষাক পরিধান করায়ে বেহেশ্‌তী একটি তখতে বসানো হল। ডানে জিব্রাঈল, বামে মিকাঈল আ. বসে আছেন অপর এক ফেরেস্তা হাতে পাখা নিয়ে বাতাস করতেছে। যে সব রশি বেঁধে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল সেগুলো পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল কিন্তু ইব্রাহীম আ.'র একটি লোমও পুড়েনি বরং কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহর আদেশে সে সময় পৃথিবীর সমস্ত প্রজ্জলিত আগুন নিভে গিয়েছিল।[৩০৪]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ . فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ . অর্থঃ তারা বলল: এর জন্যে একটি ভিত

[৩০৩]. সূরা আম্বিয়া, পারা:১৭, আয়াত নং ৬৯
[৩০৪]. মুল্লা মুঈম আল হারভী র. (৯০৭হি.), মা'আরেজুন্নবুয়াত, পৃ:৩২৬

নির্মাণ কর এবং অতঃপর তাকে আগুনের স্তুপে নিক্ষেপ কর। তারপর তারা তার বিরুদ্ধে মহা ষড়যন্ত্র আঁটিতে চাইল, কিন্তু আমি তাদেরকেই পরাভূত করে দিলাম।[৩০৫]

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ . قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ . وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ . অর্থ: তারা বলল: একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি বললাম: 'হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটিতে চাইল, অত:পর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।[৩০৬]

নমরুদের সাথে বিতর্ক:

নমরূদ একজন প্রভাবশালী বাদশা ছিল। একদা সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে নমরূদ খাদ্য বিতরণ করল। যারা তার কাছে খাদ্য বস্তু নেওয়ার জন্য আসত সে জিজ্ঞেস করত তোমার প্রভু কে? যারা বলত- আপনিই আমাদের প্রভু, তাদেরকে খাদ্য দিত। হযরত ইব্রাহীম আ. ও খাদ্য নিতে গেলে সে তাঁকে জিজ্ঞেস করল তোমার প্রভু কে? উত্তরে তিনি বলেন, যিনি হায়াত-মওতের মালিক তিনিই আমার প্রভু। সে বলল, এই ক্ষমতা তো আমারও আছে। দু'জন কয়দী ডেকে সে একজনকে হত্যা করায়ে দিল আর অপরজনকে আযাদ করে দিয়ে বলল, দেখ, যাকে ছেড়ে দিলাম তাকে জিন্দেগী তথা হায়াত দিলাম আর যাকে হত্যা করলাম তাকে মৃত্যু দিলাম। সুতরাং আমিই তো প্রভু, হায়াত-মওত আমার আয়ত্ত্বে। মুলত নমরূদ হায়াত-মওতের মালিক হওয়ার মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেনি। তাই ইব্রাহীম আ. সে বিষয়ে বিতর্কে না গিয়ে বললেন-আমার প্রভু সর্বদা সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন আর পশ্চিম দিকে অস্ত করেন। যদি তুমি প্রভু হয়ে থাক তবে সূর্যের উদয়-অস্ত পরিবর্তন করে দেখাও। অন্তত একবার হলেও সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। এবার নমরূদ চুপ হয়ে গেল এবং কোন উত্তর দিতে না পেরে বলল, তোমার জন্য আমার কাছে কোন খাদ্যবস্তু নেই, তুমি তোমার সে প্রভুর কাছে খাদ্য প্রার্থনা কর যার ইবাদত তুমি কর।

হযরত ইব্রাহীম আ. খালি হাতে ফেরৎ আসার সময় পথে বালুময় এলাকা থেকে এক থলে বালু ভরে ঘরে নিয়ে আসেন। বালুর থলে রেখে তিনি শুয়ে

৩০৫. সূরা সাফ্ফাত, আয়াত: ৯৭-৯৮।

৩০৬. সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৬৮-৭০।

গেলেন। তাঁর স্ত্রী সারা আ. থলে খুললে তাতে উন্নত মানের গম পেলেন। তিনি তা দিয়ে রুটি তৈরী করেন। ইব্রাহীম আ. ঘুম থেকে জাগ্রত হলে স্ত্রী তাঁর খেদমতে খাবার পেশ করলে জিজ্ঞেস করলেন এই গম কোথা থেকে আসল? উত্তরে স্ত্রী বললেন, এগুলো এই থলেই পেয়েছি। তখন ইব্রাহীম আ. বুঝতে পারলেন, এই রিযিক আল্লাহ তায়ালাই দান করেছেন।

এরপর আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেশতাকে মানুষের আকৃতি ধারণ করে তার কাছে পাঠান। ফেরেস্তা বললেন, তোমার প্রভু বলতেছেন- তুমি আমার উপর ঈমান আন। সে বলল, প্রভু তো আমিই, আমার প্রভু আবার কে হবে? এভাবে ফেরেশতা তিনবার বলার পর আল্লাহ তায়ালা নমরূদ বাহিনীর উপর মশার আযাব প্রেরণ করেন। এত বেশী মশা আগমন করল ফলে সূর্য আচ্ছাদিত হয়ে গেল এবং সুর্যের আলো মাটিতে পড়তেছেনা। এই মশাগুলো নমরূদ ব্যতীত সকলের রক্ত চুসে মাংস পর্যন্ত খেয়ে ফেলল শুধু হাড্ডিগুলো পড়ে রইল। একটি মশা নমরূদের নাক দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে চারশ বছর পর্যন্ত মগজে আঘাত করেছিল। মাথার উপর আঘাত করলে মশার আঘাতও বন্ধ থাকে নতুবা মশা মগজে আঘাত করতে থাকে। সুতরাং দিবা-রাত্রি তার মাথায় জুতার আঘাত মারতে হত। এমনকি তার দরবারের একটি নিয়ম করে দেয়া হল যে, দরবারে যে-ই আসবে তার মাথায় জুতার আঘাত করতে হবে। এভাবে চারশ বছর পর্যন্ত ছিল। নমরূদ ইতিপূর্বে চারশ বছর আরাম-আয়েশে বাদশাহী করেছিল। আর চারশ বছর জুতা-পিটা খেয়েছিল। সে মোট আটশ বছরের কিছু বেশী হায়াত পেয়েছিল।[৩০৭]

ইবনে আবি শায়বা (র.) আবু সালেহ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইব্রাহীম আ.'র মু'জিযায় যে বালু গমে রূপান্তরিত হয়েছিল সেই গমকে বপন করা হলে তা গম বৃক্ষ হয়ে শিকড় থেকে শাখার উপরিভাগ পর্যন্ত খোশায় ভরে যেতো।[৩০৮]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. অর্থ: তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে

৩০৭. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:৩য়, পারা:৩য়, পৃ:৬৭

৩০৮. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী র., ৯১১হি., আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য় পৃ:৩০৮

বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ্ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন? ইবরাহীম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমালংঘণকারী সম্প্রদায়কে সরলপথ প্রদর্শন করেন না।[৩০৯]

হযরত ইব্রাহীম আ.'র তিন জায়গায় মিথ্যা বলা মূলতঃ মিথ্যা নয়:

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, ان ابراهيم عليه السلام لايكذب غير ثلاث অর্থ: ইব্রাহীম আ. তিন স্থান বা তিনবার ব্যতিত কোনদিন ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বলেন নি। তন্মধ্যে দু'টি আল্লাহর জন্যে আর অপরটি স্ত্রী সারা রা.কে যালিম বাদশাহ'র হাত থেকে হেফাযত করার জন্যে। প্রথমটি হলো তিনি মেলায় যাওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে বলেছিলেন انى سقيم অর্থ: আমি অসুস্থ। আর দ্বিতীয়টি হলো মন্দিরে মূর্তিগুলো ভাঙ্গার পর সম্প্রদায়ের লোকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন- بل فعلهم كبيرهم অর্থ: বরং এদের বড় মূর্তিটিই এই কাজ করেছে।

তৃতীয় ঘটনাটি হলো হযরত ইব্রাহীম আ. স্বীয় স্ত্রী সারাহ রা.কে নিয়ে মিশরের দিকে রওয়ানা হলেন। হযরত সারাহ রা. অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা ছিলেন। এমন কি মহিলাদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা ছিলেন। হযরত ইউসুফ আ. তাঁর সৌন্দর্যের কিছু পেয়েছিলেন। তখন মিশরের বাদশাহ ছিল যালিম ও ব্যভিচারী। কোন ব্যক্তির সাথে স্ত্রীকে দেখলে ধরে নিয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হতো। তবে কোন কন্যা পিতার সাথে কিংবা বোন স্বীয় ভাইয়ের সাথে থাকলে সে এরূপ করতোনা। ইব্রাহীম আ. তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এই পথ দিয়ে যাওয়ার সংবাদ বাদশাহ'র গোয়েন্দারা বাদশাহকে অভিহিত করলে বাদশাহ হযরত সারাহ রা.কে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠাল। লোকেরা ইব্রাহীম আ.কে জিজ্ঞাসা করল এই মহিলার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? ইব্রাহীম আ. যালিমের কবল থেকে হযরত সারাহ রা.কে রক্ষা করার নিমিত্তে বলে দিলেন, সে আমার বোন। (এটাই হাদিসে বর্ণিত মিথ্যা) কিন্তু তবুও যালিমরা হযরত সারাহ রা.কে বন্দি করল। ইব্রাহীম আ. সারাহ রা.কে বললেন, আমি তোমাকে আমার বোন বলেছি, তুমিও তা বলিও। কারণ ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে তুমি

[৩০৯]. সূরা বাকরা, আয়াত: ২৫৮।

আমার বোন। এখন এদেশে আমরা দু'জনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বে সম্পর্কশীল। হযরত ইব্রাহীম আ. যালিমের মোকাবেলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তাই তিনি আল্লাহর সাহায্যের জন্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যে নামায পড়তে আরম্ভ করলেন। অবশেষে হযরত সারাহ রা. যালিম বাদশাহ'র সামনে নীত হলেন। বাদশাহ যখন কুমতলবে তাঁর দিকে হাত বাড়াল, তখনি সে অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। তখন বাদশাহ সারাহ রা.কে অনুরোধ করল যে, তুমি দোয়া কর, যাতে আমি পূর্বের ন্যায় সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলবো না। হযরত সারাহ রা.'র দোয়ায় সে সুস্থ হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় খারাপ উদ্দেশ্যে তাঁর দিকে হাত বাড়ালো। কিন্তু আল্লাহর হুকুমে সে আবার অবশ হয়ে গেল। এভাবে তিনবার এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর সে সারাহ রা.কে ফেরৎ পাঠিয়ে দিল আর যালিম বাদশাহ হযরত হাযেরা রা.কে হযরত সারাহ রা.'র জন্য দান করলো।

এ প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ { إِنِّي سَقِيمٌ } وَقَوْلُهُ { بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا } وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنْ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَ أُخْتِي فَأَتَى سَارَةَ قَالَ يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تُكَذِّبِينِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأُخِذَ فَقَالَ ادْعِي اللهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتْ اللهَ فَأُطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ فَقَالَ ادْعِي اللهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَيْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ مَهْيَا قَالَتْ رَدَّ اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أَوْ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْدَمَ هَاجَرَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ.

অর্থ: হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্রাহীম আ. তিনবার ব্যতিত কখনও কথাকে ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলেন নি। তম্মধ্যে দু'বার ছিল আল্লাহ প্রসঙ্গে। তার উক্তি- 'আমি অসুস্থ' আর এক উক্তি বরং এ কাজ করেছে এই তো তাদের বড়টি। বর্ণনাকারী বলেন, একদা ইব্রাহীম আ. এবং সারা অত্যাচারী শাসকগণের কোন এক শাসকের এলাকায় এসে পৌছলেন। তখন তাকে সংবাদ দেয়া হল যে, এ এলাকায় একজন লোক এসেছে। তার সাথে

একজন সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মহিলা রয়েছে। তখন সে তাঁর কাছে লোক পাঠাল। সে তাঁকে মহিলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, এ মহিলাটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, মহিলাটি আমার বোন, তারপর তিনি সারার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে সারা! তুমি আর আমি ছাড়া পৃথিবীর উপর আর কোন মু'মিন নেই। এ লোকটি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন আমি তাকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিও না। এরপর (রাজা) সারাকে আনার জন্য লোক পাঠাল। তিনি যখন রাজার কাছে প্রবেশ করলেন এবং রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়াল তখনই সেই পাকড়াও হল। তখন অত্যাচারী রাজা সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তখন সারা আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয়বার তাঁকে ধরতে চাইল। এবার সে পূর্বের ন্যায় বা তার চেয়ে কঠিনভাবে পাকড়াও হল। এবারও সে বলল, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া কর। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দোয়া করলেন, ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। তারপর রাজা তার কোন এক দারোয়ানকে ডাকল। আর বলল, তুমি তো আমার জন্য কোন মানুষ আননি বরং এনেছ এক শয়তান। তারপর রাজা সারার খেদমতের জন্য হাযেরাকে দান করল। এরপর তিনি তাঁর (ইব্রাহীম) কাছে আসলেন, এ সময় তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে সারাকে বললেন, কি ঘটেছে? তখন সারা বললেন, আল্লাহ্ কাফির বা ফাসিকের চক্রান্ত তারই বক্ষে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর সে হাযেরাকে খেদমতের জন্য দান করেছে। আবু হোরায়রা রা. বলেন, হে আকাশের পানির সন্তানগণ! এ হাযেরাই তোমাদের আদি মাতা।[৩১০]

উল্লেখ্য যে, হযরত ইব্রাহীম আ.'র মিথ্যাগুলো মূলত মিথ্যা ছিলনা। এগুলো ছিল তাওরিয়া। তাওরিয়া জায়েয। কিয়ামত দিবসে হযরত ইব্রাহীম আ.'র কাছে লোক সুপারিশের জন্য ছুটে গেলে তিনি নিজের বেলায় 'তাওরিয়া'গুলোকে ত্রুটি মনে করে সুপারিশ করা থেকে বিরত থাকবেন। সে কথাটি বলার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মূলত ইব্রাহীম আ. তিন স্থানে মিথ্যা বলেছেন বলে বলেছিলেন, এরূপ বলা কেবল তাঁর জন্যেই বৈধ। আর অন্যরা রাসূল ﷺ'র হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে কিংবা অনুবাদের ক্ষেত্রে এরূপ বলার অনুমতি আছে। কিন্তু কোন উম্মত নিজের পক্ষ থেকে এরূপ বলা জায়েয নেই। কুরআন হাদিসে অন্যান্য নবী-রাসূলগণের বেলায়ও এ ধরণের যে সব শব্দ ব্যবহার হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও

৩১০. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল র., ২৫৬হি., সহীহ বুখারী, পৃ. ৪৭৪, হাদিস নং ৩১২০।

একি বিধান। অর্থাৎ তিলাওয়াত, রেওয়ায়েত ও অনুবাদের ক্ষেত্রে বলা যাবে কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে এ ধরণের শব্দ তাঁদের শানে বলা যাবে না।

এ ঘটনায় আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো হযরত হাযেরা রা. কি মিশরের বাদশাহ'র কন্যা ছিলেন নাকি দাসী ছিলেন? কেউ কেউ বলেন, তিনি মিশরের যালিম বাদশাহ'র দাসী ছিলেন। হযরত সারাহ রা.'র ন্যায় তাঁকেও যালিম বাদশাহ্ সম্ভ্রম নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম আ.'র জন্য তাঁকে আমানত ও হেফাযত রাখেন। বাদশাহ বারবার চেষ্টা করেও নিষ্ফল হয়ে যাদুকরনী মনে করে বন্দি করে রেখে দিয়েছিল। অতঃপর হযরত সারাহ রা.কেও একই ধরণের মনে করে তাঁকে দান করে দিয়েছিল।

তবে অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামগণের মতে হযরত হাযেরা রা. দাসী ছিলেন না বরং যালিম বাদশাহ'র সতি-সাধ্বি কন্যা ছিলেন। হযরত সারাহ রা.'র কারামত ও বুযূর্গী দেখে নিজের কন্যাকে তাঁর খেদমতে দিয়ে দিল। কোন রাজপুত্রের ঘরে রাজরাণী হয়ে থাকার চেয়ে এই পবিত্র মহিলার খেদমতে থাকাটা বাদশাহ শ্রেয় মনে করেছে। তাই নিজ কন্যাকে হযরত সারাহ রা.কে উপহার স্বরূপ দান করেছিল। তাওরাত কিতাবেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩১১]

হযরত ইব্রাহীম আ.'র শ্রেষ্ঠত্ব:

হযরত ইব্রাহীম আ. ছিলেন শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ ব্যতিত সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তিনি তাঁর পরবর্তী সকল নবীগণের পিতা স্বরূপ মুরুব্বী। প্রত্যেক আসমানী দ্বীনে তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য রয়েছে। প্রত্যেক দ্বীন প্রাপ্তগণ তাঁকে সম্মান করেন। তাঁরই স্মরণে কুরবানী হয়, তাঁরই স্মৃতি রক্ষার্থে হজ্জের আরকান-আহকামের বিধান। মকামে ইব্রাহীম নামক পাথরটি তাঁরই কদমের সদকায় সিজদার মর্যাদা লাভ করেছে এবং কিয়ামত দিবসে তাঁকেই সর্বপ্রথম দামী পোশাক (লেবাসে ফাখেরা) পরিধান করানো হবে অতঃপর আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺকে পরিধান করানো হবে। তাঁরই বরকতে বালু গমে পরিণত হয়েছিল। জঙ্গলের হিংস্র বাঘে তাঁর কদম চেঁটেছিল এবং বরযখ জগতে সকল মুসলমানের মৃত বাচ্চাদের লালন-পালন তিনিই করে থাকেন।[৩১২]

এমন কতিপয় প্রসংশিত কাজ আছে যেগুলো সর্বপ্রথম হযরত ইব্রাহীম আ.ই পালন করেছিলেন। যেমন- ১. তিনিই সর্বপ্রথম নিজের এবং নিজের সন্তানকে খত্না করেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণ খত্না করা অবস্থায় জন্মলাভ করতেন।

৩১১. মুহাম্মদ আহমদ জাদ, কাসাসুল কুরআন, পৃ. ৮১।

৩১২. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-১, পৃ. ৬৭০, সূরা আলবাকারাহ্ ও তাফসীরে আযিযী।

আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺও খত্না করা অবস্থায় পৃথিবীতে আগমণ করেছিলেন। ২. সর্বপ্রথম তাঁর চুলই সাদা হয়েছিল। ৩. তিনিই সর্বপ্রথম নখ, গোঁফ কেটেছিলেন এবং নাভীর নিচের লোম পরিস্কার করার প্রথা চালু করেছিলেন। তাঁর দ্বীনে এগুলো ফরয ছিল কিন্তু আমাদের দ্বীনে এগুলো সুন্নত। ৪. তিনিই সর্বপ্রথম সেলাই করা পায়জামা পরিধান করেছিলেন। ৫. তিনি সর্বপ্রথম চুলে খেযাব লাগিয়েছিলেন। ৬. তিনি সর্বপ্রথম মিম্বর নির্মাণ করেন এবং এর উপর খোতবা পাঠ করেন। ৭. তিনিই সর্বপ্রথম হাতে লাঠি নিয়েছিলেন। ৮. তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছিলেন, যখন রূমী কাফিররা তাঁর ভাতিজা লূত আ.কে আটক করে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। ৯. তিনিই সর্বপ্রথম মেহেমানদারী করেছিলেন। মেহেমান ব্যতিত তিনি কোনদিন নাস্তা পর্যন্ত করতেন না। এমনকি মেহেমান তালাশের জন্য অনেক সময় চার কোস পর্যন্ত চলে যেতেন। ১০. তিনিই সর্বপ্রথম ময়দার রুটি অথবা পরটা তৈরী করে মেহেমানকে খাওয়ায়েছিলেন। ১১. তিনি সর্বপ্রথম কোলাকুলি করেছিলেন। তাঁর পূর্বে সিজদায়ে তাহাইয়্যা'র প্রথা ছিল। ১২. তাঁকেই সর্বপ্রথম অনেক সম্পদ এবং খাদেম দেয়া হয়েছিল। ১৩. তিনিই সর্বপ্রথম 'সারিদ' নামক খাবার রান্না করেছিলেন।[৩১৩]

ইব্রাহীম আ.'র পরীক্ষা:

কষ্টি পাথরে পরীক্ষার মাধ্যমে যেমন খাঁটি স্বর্ণের পরিচয় হয় তেমনি আল্লাহ্‌র হাবীব, খলীল ও কলীম হওয়ার জন্যও অনেক বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়। নবী মুহাম্মদ ﷺ'র পরে নবীগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম আ.কে। সাধারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে যেমন পদোন্নতি হয় তেমনি আল্লাহ তায়ালাও তাঁর বান্দাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য, মর্যাদা তথা নবুয়ত, রিসালত, বেলায়ত, ইমামত ইত্যাদি দান করেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন– وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ অর্থ: যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির ইমাম করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌছাবে না।[৩১৪]

---

[৩১৩]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-১, পৃ. ৬৬৯-৬৭০।

[৩১৪]. সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৪।

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম আ. থেকে অনেক কঠিন কঠিন পরীক্ষা নিয়েছিলেন। এসব পরীক্ষা সমূহের বিষয় ও সংখ্যা নিয়ে ওলামাগণের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, এই পরীক্ষা সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় পরীক্ষা ছিল সাতটি, যথা– ১. তারকা, চন্দ্র ও সূর্য নিয়ে পরীক্ষা, ২. নমরূদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা, ৩. পরিণত বয়সে খত্না, ৪. অগ্নিকুণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হওয়া, ৫. প্রাণপ্রিয় সন্তানকে কোরবানী করা, ৬. আল্লাহর রাস্তায় নিজের প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করা এবং ৭. নিজের প্রিয় স্ত্রী ও পুত্রকে আল্লাহর নির্দেশে জঙ্গলে রেখে আসা। এসব পরীক্ষা হযরত ইব্রাহীম আ. থেকে ইমামত তথা নবুয়তের পূর্বে নেয়া হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর পরীক্ষাসমূহ ছিল আহকাম বিষয়ক। এগুলোর সংখ্যা সম্পর্কে কেউ বলেছেন দশটি আবার কেউ বলেছেন- ত্রিশটি। দশটির মধ্যে প্রথম পাঁচটি হলো কেবল মাথার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- ১. কুলি করা, ২. নাকে পানি দেওয়া, ৩. মাথায় সিঁথি কাটা, ৪. গোঁফ কাটা এবং ৫. মিসওয়াক করা। আর বাকী পাঁচটি হলো- শরীরের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- ৬. খত্না করা, ৭. নাভীর নিচের লোম পরিস্কার করা, ৮. বগলের লোম তোলা, ৯. নখ কাটা এবং ১০. ঢিলা নেওয়ার পর পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করা।

আর ত্রিশটির বর্ণনা হলো– তন্মধ্যে দশটি সূরা বরাতে উল্লেখ হয়েছে। যথা- ১. তাওবা, ২. ইবাদত, ৩. আল্লাহর প্রশংসা, ৪. ভ্রমণ, ৫. রুকু, ৬. সিজদা, ৭. ভাল কাজের উপদেশ দেওয়া, ৮. অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, ৯. আল্লাহর হুদুদ সমুহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং ১০. আল্লাহকে সর্বদা হাযির-নাযির জানা। দশটি সূরা আহযাবে বর্ণিত হয়েছে। যথা- ১. ইসলাম, ২. ঈমান, ৩. আনুগত্য, ৪. ধৈর্য, ৫. বিনয়, ৬. সাদকা, ৭. রোযা, ৮. লজ্জাস্থান হেফাযত করা, ৯. দৃষ্টির হেফাযত এবং ১০. সর্বদা মুখে আল্লাহর স্মরণ করা।

অবশিষ্ট দশটি সূরা মু'মিনে উল্লেখ হয়েছে। যথা-১. কিয়ামত বিশ্বাস করা, ২. নামাযে হুযূরে ক্বলব অবলম্বন করা, ৩. মুস্তাহাব সমূহের প্রতি যত্নবান হওয়া, ৪. অনর্থক কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকা, ৫. সানন্দে যাকাত আদায় করা, ৬. নিজের স্ত্রী ও দাসী ব্যতিত অন্য কারো থেকে লিঙ্গকে হেফাযত করা, ৭. প্রতিজ্ঞা পালন করা, ৮. আমানত রক্ষা করা, ৯. ঠাট্টা-বিদ্রোপ পরিহার করা এবং ১০. সত্য সাক্ষ্য গোপন না করা।

فَأَتَمَّهُنَّ বলে আল্লাহ তায়ালা বলেন– ইব্রাহীম আ. সব পরীক্ষা পূর্ণ করেছেন অর্থাৎ সফলতা অর্জন করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ আর ইব্রাহীম পরীক্ষায় পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই ঘোষণা দিলেন যে, ইব্রাহীম আ. প্রতিটি পরীক্ষায় একশ' ভাগ সফল হয়েছেন।

সবপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ মানবজাতির জন্য ইমাম বানালেন। অর্থাৎ তাঁকে নবুয়ত দান করলেন এবং খলীলুল্লাহ্ তথা আল্লাহর বন্ধুরূপে গ্রহণ করলেন।[৩১৫]

মাতৃগর্ভ থেকে খত্না করা অবস্থায় জন্মগ্রহণকারী নবীগণের তালিকা:

হযরত কা'ব আহবার রা. বলেন, যে সব আম্বিয়া আ. খতনাকৃত অবস্থায় পৃথিবীতে আগমন করেছেন, তাদের সংখ্যা হল তের জন। ১. আবুল বশর আদম আ., ২. শীষ আ., ৩. ইদ্রিস আ., ৪. নূহ আ., ৫. সাম আ., ৬. লূত আ., ৭. ইউসুফ আ., ৮. মুসা আ., ৯ শোয়াইব আ., ১০. সোলায়মান আ., ১১. ইয়াহিয়া আ., ১২. ঈসা ইবনে মরয়ম আ. ও ১৩. খাতেমুন নবীয়্যিন সায়্যেদানা হযরত মুহাম্মদ ﷺ।

মুহাম্মদ ইবনে হাবীব হাশেমী র.'র মতে এদের সংখ্যা চৌদ্দজন। ১. আদম আ., ২. শীষ আ., ৩. নূহ আ., ৪. হুদ আ., ৫. সালেহ আ., ৬. লূত আ., ৭. শোয়াইব আ., ৮. ইউসুফ আ., ৯. মুসা আ., ১০. সোলায়মান আ., ১১. যাকারিয়া আ., ১২. ঈসা আ., ১৩. হানযালা ইবনে সুফিয়ান যিনি আসহাবির রাস্বের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, ১৪. হযরত মুহাম্মদ ﷺ।[৩১৬]

মক্কা মুকাররমা'র আবাদঃ

তাফসীরে আযিযীতে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত ইব্রাহীম আ. নমরূদের হাত থেকে মুক্তি পেলেন এবং বাবেলবাসীদের ঈমান আনা থেকে নৈরাশ হয়ে পড়লেন তখন তিনি হারানে অবস্থিত স্বীয় চাচা হারানের ঘরে হিজরত করে চলে যান। হারানের এক সুন্দরী কন্যা ছিল। চাচা হযরত ইব্রাহীম আ.'র চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে নিজের কন্যা হযরত সারাহ রা.কে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। ইব্রাহীম আ. কিছু দিন সেখানে দ্বীন প্রচারে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু হযরত সারাহ ও হযরত লূত আ. ছাড়া কেউ ঈমান আনেনি। বরং চাচা হারান রাগান্বিত হয়ে নিজের কন্যা এবং জামাতা ইব্রাহীম আ.কে ঘর থেকে বের করে দিলেন। হযরত ইব্রাহীম আ. হযরত সারাহ'র সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি সর্বদা সারাহ'র অনুগত হবেন আর সারাহও তাঁর অনুগত থাকবেন। তিনি, সারাহ এবং হযরত লূত আ. এই তিনজন হারান থেকে বের হয়ে মিশরের দিকে রওয়ানা হলেন। মিশরের বাদশা ছিল বড় যালিম এবং অবাধ্য। তার নাম ছিল সাদিফ বিন সাদিফ কিংবা সিনান বিন উলুয়ান। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ওমর বিন ইমরাউল কায়েস।

---

৩১৫. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৬৬৭-৬৬৮।
৩১৬ আল্লামা দুমাইরী র., ৮০৮হি., হায়াতে হাইওয়ান, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ১৯৯।

সে কোন সুন্দরী মহিলা দেখলে তার স্বামীকে হত্যা করে মহিলাকে ছিনিয়ে নিত। যখন তিনজনের এই ছোট কাফেলা মিশর পৌছল তখন রাষ্ট্রীয় পুলিশ বাদশাহকে সংবাদ দিল যে, দেশে এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা এসেছে। হযরত ইব্রাহীম আ. হযরত সারাহ রা.কে বুঝিয়ে দিলেন যে, যদি তোমাকে পুলিশ গ্রেফতার করে বাদশাহ'র নিকট নিয়ে যায়, তবে তুমি বলবে না যে, আমি তোমার স্বামী। বরং বলবে তিনি আমার ভাই। কেননা আমি তোমার দ্বীনি ভাই। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে এই যালিম থেকে রক্ষা করবেন। এই কথা বার্তা চলতে চলতে তাদেরকে পুলিশ এসে গিরে ফেলেছে এবং হযরত সারাহকে বাদশাহ'র কাছে নিয়ে গেল। ইব্রাহীম আ. এই অবস্থা দেখে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দোয়ায় মনোনিবেশ করলেন। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম আ.কে প্রশান্ত রাখার জন্য তাঁর দৃষ্টি থেকে পর্দা তুলে দিলেন। তিনি সেখান থেকে সারাহ ও বাদশাহ'র সংঘটিত ঘটনা নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছেন।

বাদশাহ হযরত সারাহ রা.কে দেখা মাত্রই আশেক হয়ে গেল এবং বেয়াদবীমূলক আচরণ করতে চাইল। হযরত সারাহ রা. বললেন, আমাকে এতটুকু সুযোগ দিন যেন গোসল করে সামান্য ইবাদত করে নিতে পারি। বাদশাহ দ্রুত গোসলের ব্যবস্থা করে দিল। তিনি উযূ করে নামাযের নিয়্যত বাঁধলেন আর মহান আল্লাহর দরবারে দোয়ায় মশগুল হলেন। যালিম বাদশাহ যখন দেখল যে, দেরী হয়ে যাচ্ছে, তখন সে হযরত সারাহ'র কক্ষে প্রবেশ করে নামায রত অবস্থাই তাঁর গায়ে হাত দিতে চাইল। তখন হঠাৎ তার উভয় হাত অবশ হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল এবং জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল আর মুখ দিয়ে লালা বের হচ্ছিল। হযরত সারাহ রা. দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! যদি এই যালিম মরে যায়, তবে আমার উপর তার হত্যার অভিযোগ আসবে। এটি আমার জন্য কল্যাণকর হবে না। এই দোয়া করা মাত্র তার হুঁশ এসে গেল। অতঃপর আবার সেই ইচ্ছায় হাত বাড়ানো মাত্র পূর্বাবস্থায় পতিত হলো এবং সারাহ রা. দোয়ায় সুস্থ হয়ে উঠল। এভাবে তিনবার চেষ্টা করেও বাদশাহ যখন ব্যর্থ হলো তখন বলল, ইনি কোন মানুষ নন বরং জ্বিন কিংবা যাদুঘরনী। আমার কাছে এরূপ আরো একজন মহিলা আছে যাকে আমি কিবতীদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। আমি তাঁকেও বাধ্য ও আয়ত্বে আনতে পারিনি। তাঁকেও (হাযেরা) এর সাথে যুক্ত করে দাও এবং এদেরকে মিশর থেকে বের করে দাও।

অতঃপর হযরত সারাহ হযরত হাযেরাকে নিয়ে হযরত ইব্রাহীম আ.'র কাছে আসলেন তখনও তিনি নামাযে রত ছিলেন। নামায শেষে তিনি হযরত সারাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি অবস্থা? সারাহ খাতুন উত্তর দিলেন, ভাল, আল্লাহ তায়ালা

যালিমকে লাঞ্ছিত করেছেন আর আমাকে একজন খাদেমা দিয়েছে, যার নাম হাযেরা। ইব্রাহীম আ. অনেক খুশী হলেন এবং এখান থেকে এই চারজন রওয়ানা হয়ে ফিলিস্তিনে চলে যান। ওখানকার লোকেরা এদেরকে মূল্যায়ন করেছিল এবং অনেক জমি দান করেছিল। আল্লাহ তায়ালা সেই জমিতে এমন বরকত দান করেছেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর অসংখ্য ক্ষেত, বাগান, জন্তু, গোলাম ইত্যাদি হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেখানে মুসাফিরখানা, লঙ্গরখানা প্রচলন করে দিলেন। হযরত লূত আ.কে দ্বীন প্রচারের জন্যে রোমের দিকে প্রেরণ করলেন।

একদা হযরত সারাহ রা. হযরত ইব্রাহীম আ.কে আরয করলেন, আল্লাহ্ আমাদের ঘরে অনেক কিছু দিয়েছেন কিন্তু কোন সন্তান আমাদের নেই। আপনি হাযেরাকে বিবাহ করেন, হয়তো তার থেকেই কোন সন্তান জন্মলাভ করতে পারে, তিনি হাযেরাকে হযরত ইব্রাহীম আ.'র সাথে বিবাহ দিলেন। অতঃপর হযরত হাযেরা রা.'র গর্ভ থেকে হযরত ইসমাঈল আ. জন্মগ্রহণ করেন। হযরত সারাহ তাঁকে সীমাহীন ভালবাসতেন এবং লালন-পালন করতেন, হযরত হাযেরা রা. কেবল দুধ পান করাতেন মাত্র। হযরত ইব্রাহীম আ. হযরত সারাহ'র কষ্টের প্রতি খেয়াল রেখে নিজের সন্তানকে কোলেও নিতেন না। আল্লাহ্র শান! একদা ইসমাঈল আ.কে একাকী হুজরায় পড়ে থাকতে দেখে পিতৃব্য স্নেহে কোলে তুলে নিয়ে মুখে আদর ও চুমু খেতে লাগলেন। এ সময় হযরত সারাহ এসে দেখে ফেললেন এবং মনে তাঁর প্রতি ঈর্ষা জাগলো। তখন হযরত সারাহ হযরত ইব্রাহীম আ.কে বললেন, আপনি এক্ষুনি একে এবং এর মাকে আমার ঘর থেকে বাইরে নিয়ে কোন দানা-পানি বিহীন জঙ্গলে রেখে আসুন। তিনি সারাহকে অনেক বুঝাতে চেষ্টা করেও নিষ্ফল হলেন। তাছাড়া তার সাথে পূর্ব থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন তিনি। ওদিকে ওহী আসল ইব্রাহীম আ.'র কাছে। তাতে বলা হলো, সারাহ'র কথা মান্য কর। কারণ এতে রহস্য নিহিত আছে। এই দুই মহতি মহিলার ঝগড়ার বরকতে আরব একটি রাজ্য হলো, মক্কা একটি শহর হলো এবং বায়তুল্লাহ আবাদ হলো।

ইব্রাহীম আ. ওরা দু'জনকে সাওয়ারীতে আরোহণ করে রওয়ানা হলেন এবং একেক মনযিল অতিক্রম করে অবশেষে ওখানে পৌছেছেন, যেখানে বর্তমানে খানায়ে কা'বা বিদ্যমান। আল্লাহর আদেশ আসল যে, এরা দু'জনকে এখানে রেখে যাও এবং আমার উপর সোপর্দ করে দাও। যমযমের স্থানে একটি বৃক্ষ ছিল আর অবশিষ্ট সব ছিল অঘোর জঙ্গল। ছিল না কোন ছায়া, কোন দানা-পানি, কোন মানুষ। তিনি হযরত হাযেরা রা.কে মাত্র এক টুকরী খোরমা,

কয়েকটি রুটির টুকরা এবং এক মশক পানি দিয়ে চলে আসতে লাগলেন। হযরত হাযেরা রা. পিছে পিছে দৌড়ে এসে বলতে লাগলেন, আমাদেরকে দানা-পানি বিহীন এই মরুভূমিতে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? তিনি কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে হযরত হাযেরা রা. জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে কি আল্লাহ্ হুকুম দিয়েছেন এরূপ করতে? তিনি মাথার ইশারায় হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন। তখন হযরত হাযেরা রা. বলেন, তাহলে আমার কোন চিন্তা নাই, আমার প্রভু আমাকে ধ্বংস করবেন না। হযরত হাযেরা রা. ফিরে এসে সন্তানকে কোলে নিয়ে একাকী বসে দুধ পান করাতে লাগলেন। হযরত ইব্রাহীম আ. পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে কা'বার দিকে মুখ করে হাত তুলে দোয়া করলেন رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي الخ হে প্রভু! আমি আমার সন্তানকে দানা-পানি বিহীন প্রান্তরে আপনার সম্মানিত ঘরের পাশে রেখে যাচ্ছি... ।

যতদিন যাবৎ খোরমা ও পানি ছিল ততদিন যাবৎ হাযেরা রা. সন্তানকে দুধ পান করায়েছিলেন। কিন্তু পানি শেষ হয়ে গেলে বুকে দুধ শুকিয়ে গিয়েছে, শিশু ক্ষুধায় কান্নাকাটি করতে লাগল। নিজের জন্যে কোন চিন্তা ছিলনা কিন্তু প্রাণ-প্রিয় সন্তানের চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। সন্তান রেখে সাফা পর্বতে উঠে দেখলেন কোথাও কোন পানির সন্ধান মিলে কিনা। কিন্তু কোথাও পানির চিহ্নও পেলেন না। নিরাশ হয়ে নিচে নামলেন তারপর মারওয়া পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিলেন কিন্তু দৃষ্টি সন্তানের দিকে। পথে কিছু অংশে সন্তান আড়াল হয়ে অদৃশ্য হলে দ্রুত দৌড়ে আড়াল অতিক্রম করে ধীর গতিতে চলেছেন। এভাবে মারওয়া পর্বতে উঠেও কোথাও পানির সন্ধান মিলেনি। অতঃপর পুনরায় সাফা পর্বতে উঠলেন। এভাবে সাতবার চক্কর দিলেন। প্রত্যেকবার আড়ালের স্থানে পৌছে দৌড়েছিলেন। আজকের সাফা-মারওয়া'র সাঈ তারই স্মৃতিচারণ। শেষ বার মারওয়া পর্বতে উঠে একটি বিকট শব্দ কানে আসে। ভয়ে দৌড়ে সন্তানের নিকট এসে দেখলেন, সন্তান কান্না করছে আর স্বীয় পায়ের পিছনের অংশ মাটিতে ঘষাঘষি করছে। যা থেকে মিষ্টি পানির কূপ প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি তা দেখে অত্যন্ত খুশী হলেন আর কূপের চর্তুদিকে মাটি দিয়ে পানি আটকানোর চেষ্টা করলেন এবং মুখে বললেন, يا ماء زم زم হে পানি! স্থীর হও, স্থীর হও, এ কারণেই এর নাম হয়েছে যমযম। কারো কারো মতে তিনি বলেছিলেন مَاءٌ زُمْ زُمْ পানি মিষ্টি, পানি মিষ্টি। কেউ বলেছেন, তিনি বলেছিলেন مَاء زَمْزَمْ পানি যথেষ্ট পরিমাণ হয়েছে। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি হযরত হাযেরা রা. পানিকে আবদ্ধ করে না দিতেন, তবে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হতে থাকতো।

অবশেষে উক্ত পানি তিনি নিজেও পান করতেন এবং তাঁর সন্তানকেও পান করাতেন। এভাবে অনেকদিন অতিবাহিত হল এবং দিন যাপন করতে লাগলেন। কেননা এই পানিতে খাদ্যের গুণও রয়েছে।

ভাগ্যক্রমে ইয়ামনের জুরহাম গোত্রের একটি কাফেলা এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা কুদা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলে দেখল যে, কিছু দূরে অনেক পাখি উড়তেছে। তারা তা দেখে বলল যে, এখানে কাছে কোথাও পানি আছে। কেননা এই পথ দিয়ে আমরা আরো বহুবার যাতায়াত করেছি কিন্তু কখনো পাখি দেখিনি। তারা অনুসন্ধানের জন্য কোন এক ব্যক্তিকে পাঠাল। সে এসে সংবাদ দিল যে, এখানে একটি পানির গায়েবী কূপ আছে, যার পাশে এক মহিলা স্বীয় সন্তান নিয়ে বসে আছেন। এ সংবাদ শুনে পুরো কাফেলা হযরত হাযেরা রা.'র নিকট এসে বলল, যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমরা এখানে বসবাস করতে পারি। যেহেতু তিনি একাকী, তিনিও চাচ্ছেন কোন জনবসতি হোক, তাই তিনি এই শর্তে অনুমতি দিলেন যে, এই কূপের পানির দাবী কেউ করতে পারবে না। অর্থাৎ সবাই ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু অধিকার থাকবে আমার। সকলেই এই শর্ত মেনে তারা নিজেরা এবং নিজেদের চাকর-কর্মচারীদেরকেও ডেকে নিয়ে বসতি শুরু করল। ফলে সেখানে একটি সুন্দর বসবাসস্থল হয়ে উঠল। কিছু দিনের মধ্যে হযরত ইসমাঈল আ. একজন বুদ্ধিমান যুবক হয়ে উঠলেন। তিনি জুরহাম গোত্র থেকে ভাল আরবী শিখে নিলেন। অত্যন্ত বিচক্ষণ, মেধাবী এবং যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক হলেন। জুরহাম গোত্রের সর্দার নিজের কন্যাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। তখন হযরত হাযেরা রা. ইন্তেকাল করলেন। যখন হযরত ইসমাঈল আ.'র বয়স চৌদ্দ বছর হলো তখন হযরত সারাহ রা.'র গর্ভেও একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, যার নাম হযরত ইসহাক রাখা হলো।

হযরত সারাহ রা. তাঁর লালন-পালনে ব্যস্ত ছিলেন আর ইতিমধ্যে তার মধ্যে হযরত হাযেরার প্রতি রাগও কমে আসল। হযরত ইব্রাহীম আ. তাকে বললেন, যদি তুমি অনুমতি দাও, তবে আমি একটু ইসমাঈলকে দেখে আসতে চাই। সারাহ এই শর্তে হযরত ইব্রাহীম আ.কে অনুমতি দিলেন যে, সেখানে মাটিতে পা রাখতে পারবেন না এবং বেশীক্ষণ থাকবেন না। শর্ত মেনে তিনি মক্কার দিকে রওয়ানা দিলেন আর এসে জানতে পারলেন যে, ছেলে বড় হয়েছে এবং বিবাহ করেছে আর হযরত হাযেরা রা. ইন্তেকাল করেছেন। সন্ধান করতে করতে হযরত ইসমাঈল আ.'র ঘরের দরজায় পৌঁছে গেলেন। এ সময় হযরত ইসমাঈল জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিলেন। কেননা তাদের জীবিকা ছিল শিকারের

মাংস আর যমযমের পানি। হযরত ইব্রাহীম আ. পুত্রবধুকে দরজায় ডেকে তাদের জীবন-যাপনের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর জানতে চাইলেন। কিন্তু সাওয়ারী থেকে নামেন নি এবং নিজের পরিচয়ও দেননি। পুত্রবধু বলল, আমরা খুবই গরীব, মিসকীন এবং অনেক অভাব অনটনে কালযাপন করছি। পুত্রবধু এই বয়স্ক লোকটাকে কোন নম্রতা-ভদ্রতা কিংবা কোন ধরণের মেহেমান নেওয়াযী করল না। তিনি বললেন, তুমি তোমার স্বামীকে আমার সালাম বলবে, আর বলবে ঘরের দরজার চৌকাট যেন বদলে ফেলে। কেননা এই ধরণের চৌকাট এই ঘরের উপযুক্ত নয়। বিকেলে যখন হযরত ইসমাঈল আ. শিকার থেকে ফিরে আসলেন তখন মক্কার গলিতে নবুয়তের বরকত ও সুগন্ধি অনুভব করে বুঝে গেলেন যে, নিশ্চয় এখানে আমার পিতা এসেছিলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজকে কি কেউ এসেছিলেন? স্ত্রী সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, ঐ বুযুর্গ ব্যক্তি হলেন আমার পিতা। আর তুমি হলে আমার ঘরের চৌকাট। তিনি আমাকে তোমাকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। তখনই তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মা-বাবার ঘরে পাঠিয়ে দেন এবং জুরহাম গোত্রের অন্য এক মেয়েকে বিবাহ করেন। অতঃপর কিছুদিন পর হযরত ইব্রাহীম আ. হযরত সারাহ রা. থেকে অনুমতি নিয়ে পুনরায় পূর্বের শর্ত সাপেক্ষে হযরত ইসমাঈল আ.কে দেখতে আসেন। তিনি হযরত ইসমাঈল আ.'র ঘরের দরজায় গিয়ে জানতে পারলেন যে, এবারও ছেলে শিকারে বেরিয়েছেন। নতুন পুত্রবধু তাঁকে দেখে বলল, হযরত! ভিতরে আসুন, আমাদের গরীবালয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করুন। তাঁর মাথা মোবারক সফরের কারণে ধুলি-বালি মিশ্রিত ছিল এবং চুল এলোমেলো ছিল। পুত্রবধু বলল, আমাকে অনুমতি দিন, আপনার মাথা ধুইয়ে দেই এবং চিরনী করে দেই, তিনি বললেন, আমার নীচে অবতরণের অনুমতি নেই। তখন নেক্কার পুত্রবধু একটি উঁচু পাথর (এটি মকামে ইব্রাহীম ছিল) নিয়ে এসে সাওয়ারীর পাশে রেখে আরয করল, আপনি এই পাথরে কদম রাখুন আর আপনার মাথা মোবারক নীচু করে দিন, যাতে আপনার কৃত ওয়াদাও ঠিক থাকে আর আমারও খেদমতের সুযোগ হয়। তিনি পুত্রবধুর সমাদর ও বুদ্ধিমত্তা দেখে খুশী হলেন এবং যেমন বলেছে তেমন করেছেন। পুত্রবধু তাঁকে ভাল করে মাথা ধুইয়ে চিরনী করে দিল। ইতিমধ্যে তিনি পুত্রবধুর কাছ থেকে ঘরের সব খবরা-খবর জিজ্ঞাসা করে নেন। নেক্কার পুত্রবধু তাঁকে উত্তর দিল, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা অনেক আরামে আছি, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে কারো প্রতি মুখাপেক্ষী রাখেন নি। আমার স্বামী জঙ্গল থেকে শীকার করে আনেন, যমযমের পানি আমাদের পাশেই আছে। গোশত ও পানি দিয়ে আমাদের জীবন সুন্দর ভাবে চলছে। তিনি তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন আর বললেন, আল্লাহ

তায়ালা যেন তোমাদের গোশত ও পানিতে বরকত দান করেন। (তাঁর এ দোয়ার বরকত এখনো সেখানে পরিলক্ষিত হয়) চলে আসার সময় বললেন, তোমার স্বামীকে আমার সালাম বলিও আর বলে দিও যে, তার দরজার চৌকাট অনেক ভাল। সে যেন এটাকে গণীমত মনে করে যত্নসহকারে সংরক্ষণ করে।

সন্ধ্যায় যখন হযরত ইসমাঈল আ. আসলেন পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন আলামত দেখে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন আজ কি কোন বুযুর্গ ব্যক্তির আগমন হয়েছে? স্ত্রী হ্যাঁ বাচক উত্তর দিয়ে আদ্য-পান্ত ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তিনি হলেন আমার পিতা হযরত ইব্রাহীম আ.। তিনি তোমার পক্ষে সুপারিশ করে গিয়েছেন যেন আমি তোমাকে রাখি এবং তোমার সাথে সদাচরণ করি।

এরপর আরো কিছুদিন পরে হযরত ইব্রাহীম আ. হযরত সারাহ রা.কে বললেন, ইতিপূর্বে আমি দুইবার ছেলে দেখতে গিয়েছিলাম কিন্তু একবারও দেখা হয়নি। এখন আরেকবার অনুমতি দাও যেন আমি তাকে দেখে আসতে পারি এবং কিছুদিন তার সেখানে থাকতে পারি। এবার হযরত সারাহ রা. বিনা শর্তে অনুমতি দিলেন। হযরত ইব্রাহীম আ. সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, হযরত ইসমাঈল আ. যমযম কূপের পাশে একটি বৃক্ষের নীচে বসে তীর ঠিক করতেছেন। পিতা-পুত্রের সাক্ষাত হলো, পরিচয় হলো, কোলাকোলি হলো এবং এমনভাবে কান্নাকাটি করলো পাখিরাও বাতাসে কাঁদতে লাগল। তিনি সেখানে কিছুদিন অবস্থান করলেন। একদিন বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ্ আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমি এই জায়গায় খানায়ে কা'বা নির্মাণ করি। আমি চাই যে, এই কাজটি আমি নিজের হাতে করবো তবে তুমি আমাকে সাহায্য করবে। তিনি খুশী মনে মেনে নিলেন।

হযরত ইব্রাহীম আ. ১লা যিলক্বদ থেকে বায়তুল্লাহ নির্মাণ আরম্ভ করলেন এবং ২৫ যিলক্বদ সমাপ্ত করেছেন। তারপর ৮ যিলহজ্ব স্বপ্নে নিজের প্রাণপ্রিয় একমাত্র পুত্রকে কুরবানী করার আদেশ পেলেন এবং ১০ যিলহজ্ব তা বাস্তবায়ন করেন।

তাফসীরে রূহুল বয়ান-এ ২৩ পারায় বর্ণিত আছে যে, যবেহ করার সময় হযরত ইসমাঈল আ.'র বয়স হয়েছিল তের বছর। কিন্তু তাফসীরে আযিযীর বর্ণনা মতে বুঝা যায় যে, এ সময় তাঁর বয়স অনেক বেশী হয়েছিল। কেননা তাঁর চৌদ্দ বছর বয়সে হযরত ইসহাক আ. জন্মলাভ করেছিলেন এবং এর আরো কিছুদিন পর হযরত ইব্রাহীম আ. পর পর তিনবার মক্কা মুয়াযযমায় এসেছিলেন। কেবল তৃতীয়বার হযরত ইসমাঈল আ.'র সাথে সাক্ষাত হয়।

আরো প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত হাযেরা রা.'র জীবদ্দশায় যবেহের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। তাফসীরে আযিযীর বর্ণনামতে এটিও ভুল প্রমাণিত হয়।

কেননা ঐ বর্ণনা মতে জানা যায় যে, হযরত হাযেরা রা. জীবদ্দশায় তিনি মক্কা শরীফ আসেন নি। আরো জানা যায় যে, যবেহের ঘটনা বায়তুল্লাহ নির্মাণের পর হয়েছিল। কেননা হযরত ইব্রাহীম আ. ও ইসমাঈল আ.'র প্রথম সাক্ষাত থেকে ২৫ যিলক্বদ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বায়তুল্লাহ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল আর ১০ যিলহজ্বে যবেহের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। সঠিক তথ্য আল্লাহই ভাল জানেন।[৩১৭]

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ أَاللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَبِّ {إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى بَلَغَ يَشْكُرُونَ}

وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدَتْ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنْ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتْ الْوَادِيَ ثُمَّ أَتَتْ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَهٍ تُرِيدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ أَيْضًا فَقَالَتْ قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ

[৩১৭]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৬৯২-৬৯৬।

عِنْدَكِ غِوَاثٌ فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا قَالَ فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لَا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتَ اللهِ يَبْنِي هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ وَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَهْلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَأْتِيهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمَ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءٍ فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ فَرَأَوْا طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ فَأَقْبَلُوا قَالَ وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ فَقَالَتْ نَعَمْ وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْإِنْسَ فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ فَشَكَتْ إِلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا فَقَالَ هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ قَالَ فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكِ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ فَقَالَ مَا طَعَامُكُمْ قَالَتِ اللَّحْمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتِ الْمَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ قَالَ

فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ قَالَ فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكِ أَبِي وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ قَالَ فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَتُعِينُنِي قَالَ وَأُعِينُكَ قَالَ فَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَا هُنَا بَيْتًا وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُولَانِ { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ র. .... সাঈদ ইবনে জুবায়র রা. থেকে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্দ বানানো শিখেছে ইসমাঈল আ.'র মায়ের (হাযেরা) নিকট থেকে। হাযেরা আ. কোমরবন্দ লাগাতেন সারাহ্ আ. থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। তারপর (আল্লাহ্র হুকুমে) ইব্রাহীম আ. হাযেরা আ. এবং তাঁর শিশু ছেলে ইসমাঈল আ.কে সাথে নিয়ে বের হলেন, এ অবস্থায় যে, হাযেরা আ. শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কা'বা ঘর অবস্থিত, ইব্রাহীম আ. তাঁদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মসজিদের উঁচু অংশে যমযম কূপের উপরে অবস্থিত একটি বিরাট গাছের নীচে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন মানুষ না ছিল কোনরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের কাছে রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর এবং একটি মশকে কিছু পরিমাণ পানি। এরপর ইব্রাহীম আ. ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল আ. এর মা পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইব্রাহীম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আমাদেরকে এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী আর না আছে (পানাহারের) কোন ব্যবস্থা। তিনি একথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইব্রাহীম আ. তাঁর দিকে তাকালেন না। তখন হাযেরা আ. তাঁকে বললেন, এ (নির্বাসনের) আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ্ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাযেরা আ. বললেন, তাহলে

আল্লাহ্ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। আর ইব্রাহীম আ.ও সামনে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌছলেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছেন না, তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি দু'হাত তুলে এ দু'আ করলেন, আর বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার পরিবারের কতকে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায়... যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (১৪:৩৭) (এ দু'আ করে ইব্রাহীম আ. চলে গেলেন) আর ইসমাঈলের মা ইসমাঈলকে স্বীয় স্তন্যের দুধ পান করাতেন এবং নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তিনি নিজে পিপাসিত হলেন, এবং তাঁর (বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) শিশু পুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটির প্রতি দেখতে লাগলেন। পিপাসায় তার বুক ধড়ফড় করছে অথবা রাবী বলেন, সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। শিশুপুত্রের এ করুণ অবস্থার প্রতি তাকানো অসহনীয় হয়ে পড়ায় তিনি সরে গেলেন আর তার অবস্থানের সংলগ্ন পর্বত 'সাফা'কে একমাত্র তাঁর নিকটতম পর্বত হিসাবে পেলেন। এরপর তিনি তার উপর উঠে দাঁড়ালেন আর ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথায়ও কাউকে দেখা যায় কিনা? কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন 'সাফা' পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। এমন কি যখন তিনি নিচু ময়দান পর্যন্ত পৌছলেন, তখন তিনি তাঁর কামিজের এক প্রান্ত তুলে ধরে একজন শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষের ন্যায় ছুটে চললেন। অবশেষে ময়দান অতিক্রম করে 'মারওয়া' পাহাড়ের নিকট এসে তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এদিকে সেদিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পান কিনা? কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন। ইবন আব্বাস রা. বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, এজন্যই মানুষ (হজ্জ বা উমরার সময়) এ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সায়ী করে থাকে। এরপর তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন এবং তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। (মনোযোগ দিয়ে শুনি) তিনি একাগ্রচিত্তে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তো তোমার শব্দ শুনিয়েছ, আর আমিও শুনেছি)। যদি তোমার কাছে কোন সাহায্যকারী থাকে (তাহলে আমাকে সাহায্য কর)। হঠাৎ যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে তিনি একজন ফেরেশতা দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন অথবা তিনি বলেছেন, আপন ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হতে লাগল। তখন হাযেরা আ. এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধ দিয়ে একে হাউযের ন্যায় করে দিলেন এবং হাতের কোষভরে তাঁর মশকটিতে

পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উপছে উঠতে থাকলো। ইবন আব্বাস রা. বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ইসমাঈলের মাকে আল্লাহ্ রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোষে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে যমযম একটি কূপ না হয়ে একটি প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হতো। রাবী বলেন, তারপর হাযেরা আ. পানি পান করলেন, আর শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন, তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোন আশংকা করবেন না। কেননা এখানেই আল্লাহ্র ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তাঁর পিতা দু'জনে মিলে এখানে ঘর নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ্ তাঁর আপনজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। ঐ সময় আল্লাহর ঘরের স্থানটি যমীন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বন্যা আসার ফলে তার ডানে বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। এরপর হাযেরা আ. এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। অবশেষে (ইয়ামান দেশীয়) জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামক উঁচু ভূমির পথ ধরে এদিকে আসছিল। তারা মক্কার নীচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল একঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির উপর উড়ছে। আমরা এ ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করেছি। কিন্তু এখানে কোন পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন লোক সেখানে পাঠালো। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে সকলকে পানির সংবাদ দিল। সংবাদ শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হল। রাবী বলেন, ইসমাঈল আ. এর মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁ, বলে তাদের মত প্রকাশ করল। ইবন আব্বাস রা. বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন। এরপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদের কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হল। আর ইসমাঈলও যৌবনে উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌছে তিনি তাদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। এরপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল। এরই মধ্যে ইসমাঈলের মা হাযেরা আ. ইন্তিকাল করেন। ইসমাঈলের বিবাহের পর ইব্রাহীম আ. তাঁর পরিত্যক্ত

পরিজনের অবস্থা দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু তিনি ইসমাঈলকে পেলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। এরপর তিনি পুত্রবধুকে তাদের জীবন যাত্রা এবং অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমরা অতি দুরাবস্থায়, অতি টানাটানি ও খুব কষ্টে আছি। সে ইব্রাহীম আ. এর নিকট তাদের দুর্দশার অভিযোগ করল। তিনি বললেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসলে, তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজায় চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। এরপর যখন ইসমাঈল বাড়ী আসলেন, তখন তিনি যেন (তাঁর পিতা ইব্রাহীম আ. এর আগমনের) কিছুটা আভাস পেলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে কেউ কি এসেছিল? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ! এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাঁকে জানালাম, আমরা খুব কষ্ট ও অভাবে আছি। ইসমাঈল আ. জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন উপদেশ দিয়েছেন? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌছাই এবং তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। ইসমাঈল আ. বললেন, ইনি আমার পিতা। এ কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। অতএব তুমি তোমার আপন জনদের কাছে চলে যাও। এ কথা বলে, ইসমাঈল আ. তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ঐ লোকদের থেকে অপর একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। এরপর ইব্রাহীম আ. এদের থেকে দূরে রইলেন, আল্লাহ্ যতদিন চাইলেন। তারপর তিনি আবার এদের দেখতে আসলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাঈল আ. এর দেখা পেলেন না। তিনি ছেলের বউয়ের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে ইসমাঈল আ. সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললো, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। ইব্রাহীম আ. জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাদের জীবনযাপন ও অবস্থা জানতে চাইলেন। তখন সে বলল, আমরা ভাল এবং স্বচ্ছলতার মধ্যেই আছি। আর সে আল্লাহ্র প্রশংসাও করলো। ইব্রাহীম আ. জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কি? সে বলল, গোশ্ত। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কি? সে বলল, পানি। ইব্রাহীম আ. দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! তাদের গোশ্ত ও পানিতে বরকত দিন। নবী ﷺ বলেন, ঐ সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো না। যদি হতো তাহলে ইব্রাহীম আ. সে বিষয়েও তাদের জন্য দু'আ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা

ব্যতীত অন্য কোথাও কেউ শুধু গোশ্ত ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারেনা। কেননা, শুধু গোশ্ত ও পানি জীবন যাপনের অনুকূল হতে পারে না। ইব্রাহীম আ. বললেন, যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে, তখন তাঁকে আমার সালাম বলবে, আর তাঁকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে যে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে। এরপর ইসমাঈল আ. যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং সে তাঁর প্রশংসা করলো, (তারপর বললো) তিনি আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। এরপর তিনি আমার নিকট আমাদের জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি যে, আমরা ভাল আছি। ইসমাঈল আ. বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন কিছুর জন্য আদেশ করেছেন? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখেন। ইসমাঈল আ. বললেন, ইনিই আমার পিতা। আর তুমি হলে আমার ঘরের দরজার চৌকাঠ। একথার দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি। এরপর ইব্রাহীম আ. এদের থেকে দূরে রইলেন, যদ্দিন আল্লাহ্ চাইলেন। এরপর তিনি আবার আসলেন। (দেখতে পেলেন,) যমযম কূপের নিকটস্থ একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে বসে ইসমাঈল আ. তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। যখন তিনি তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। এরপর একজন বাপ বেটার সঙ্গে, একজন বেটা বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেরূপ করে থাকে তাঁরা উভয়ে তাই করলেন। এরপর ইব্রাহীম আ. বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ্ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল আ. বললেন, আপনার রব আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করুন। ইব্রাহীম আ. বললেন, তুমি আমার সাহায্য করবে কি? ইসমাঈল আ. বললেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব। ইব্রাহীম আ. বললেন, আল্লাহ্ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন যার চারপাশে ঘেরাও ছিল, তখনি তাঁরা উভয়ে কা'বা ঘরের দেয়াল উঠাতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল আ. পাথর আনতেন, আর ইব্রাহীম আ. নির্মাণ করতেন। পরিশেষে যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল আ. (মাকামে ইব্রাহীম নামে খ্যাত) পাথরটি আনলেন এবং ইব্রাহীম আ. এর জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইব্রাহীম আ. তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাঈল আ. তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। তখন তারা উভয়ে এ দু'আ করতে থাকলেন, হে আমাদের রব!

আমাদের থেকে (এ কাজ) কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।"[৩১৮]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا قَالَ إِلَى اللهِ قَالَتْ رَضِيتُ بِاللهِ قَالَ فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا قَالَ فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتْ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أَحَدًا فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا فَلَمَّا بَلَغَتْ الْوَادِيَ سَعَتْ وَأَتَتْ الْمَرْوَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ تَعْنِي الصَّبِيَّ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتْ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ فَقَالَتْ أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَإِذَا جِبْرِيلُ قَالَ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هَكَذَا وَغَمَزَ عَقِبَهُ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ فَانْبَثَقَ الْمَاءُ فَدَهَشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِزُ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتْهُ كَانَ الْمَاءُ ظَاهِرًا قَالَ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا قَالَ فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمَ بِبَطْنِ الْوَادِي فَإِذَا هُمْ بِطَيْرٍ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَاكَ وَقَالُوا مَا يَكُونُ الطَّيْرُ إِلَّا عَلَى مَاءٍ فَبَعَثُوا رَسُولَهُمْ فَنَظَرَ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَتَوْا إِلَيْهَا فَقَالُوا يَا أُمَّ إِسْمَاعِيلَ أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَكِ أَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ ابْنُهَا فَنَكَحَ فِيهِمْ امْرَأَةً قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي قَالَ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ قَالَ قُولِي لَهُ إِذَا جَاءَ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ قَالَ أَنْتِ ذَاكِ فَاذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي قَالَ فَجَاءَ فَقَالَ أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ

৩১৮. ইমাম বুখারী র., ২৫৬হি., সহীহ বুখারী শরীফ, পৃ. ৪৭৪-৪৭৫, হাদিস নং-৩১২৫

ذَهَبَ يَصِيدُ فَقَالَتْ أَلَا تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتْ طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا الْمَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي فَجَاءَ فَوَافَقَ إِسْمَاعِيلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ يُصْلِحُ نَبْلًا لَهُ فَقَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ رَبَّكَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ لَهُ بَيْتًا قَالَ أَطِعْ رَبَّكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ قَالَ إِذَنْ أَفْعَلَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَقَامَا فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُولَانِ { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } قَالَ حَتَّى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعُفَ الشَّيْخُ عَنْ نَقْلِ الْحِجَارَةِ فَقَامَ عَلَى حَجَرِ الْمَقَامِ فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُولَانِ { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ র. ... ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইব্রাহীম আ. ও তাঁর স্ত্রী (সারার) মাঝে যা হওয়ার হয়ে গেল, তখন ইব্রাহীম আ. (শিশুপুত্র) ইসমাঈল এবং তাঁর মাকে নিয়ে বের হলেন। তাদের সাথে একটি থলে ছিল, যাতে পানি ছিল। ইসমাঈল আ. এর মা মশক থেকে পানি পান করতেন। ফলে শিশুর জন্য তাঁর স্তন্যে দুধ বাড়তে থাকে। অবশেষে ইব্রাহীম আ. মক্কায় পৌঁছে হাযেরাকে (শিশুপুত্র ইসমাঈলসহ) একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর ইব্রাহীম আ. আপন পরিবার (সারার) নিকট ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল আ. এর মা কিছু দূর পর্যন্ত তাঁর অনুসরণ করলেন। অবশেষে যখন কাদা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তিনি পিছন থেকে ডেকে বললেন, হে ইব্রাহীম! আপনি আমাদেরকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন? ইব্রাহীম আ. বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে। হাযেরা আ. বললেন, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। রাবী (ইবন আব্বাস রা.) বলেন, এরপর হাযেরা আ. ফিরে আসলেন, তিনি মশক থেকে পানি পান করতেন আর শিশুর জন্য (তাঁর স্তন্যের) দুধ বাড়ত। অবশেষে যখন পানি শেষ হয়ে গেল। তখন ইসমাঈল আ. এর মা বললেন, আমি যদি গিয়ে এদিকে সেদিকে তাকাতাম! তাহলে হয়ত কোন মানুষ দেখতে পেতাম। রাবী (ইবন আব্বাস রা.) বলেন, এরপর ইসমাঈল আ. এর মা গেলেন এবং সাফা পাহাড়ে উঠলেন আর এদিকে ওদিকে তাকালেন এবং কাউকে দেখেন কিনা এজন্য বিশেষভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকেও দেখতে পেলেন না। (এরপর যখন নীচু ভূমিতে পৌঁছলেন) তখন দ্রুত বেগে মারওয়া পাহাড়ে এসে গেলেন। এবং এভাবে তিনি কয়েক চক্কর দিলেন। পুনরায় তিনি (মনে মনে) বললেন, যদি গিয়ে দেখতাম যে শিশুটি কি করছে।

এরপর তিনি গেলেন এবং দেখতে পেলেন যে সে তার অবস্থায়ই আছে। সে যেন মরণাপন্ন হয়ে গেছে। এতে তাঁর মন স্বস্তি পাচ্ছিল না। তখন তিনি বললেন, যদি সেখানে (আবার) যেতাম এবং এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখতাম। সম্ভবতঃ কাউকে দেখতে পেতাম। এরপর তিনি গেলেন, সাফা পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং এদিক সেদিক দেখলেন এবং গভীরভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনকি তিনি সাতটি চক্কর পূর্ণ করলেন। এরপর তিনি মনে মনে বললেন, যদি যেতাম তখন দেখতাম যে সে কি করছে। হঠাৎ তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, যদি আপনার কোন সাহায্য করার থাকে তবে আমাকে সাহায্য করুন। হঠাৎ তিনি জিবরাঈল আ.কে দেখতে পেলেন। রাবী (ইব্ন আব্বাস রা.) বলেন, তখন তিনি (জিবরাঈল) তাঁর পায়ের গোড়ালি দ্বারা এরূপ করলেন অর্থাৎ গোড়ালি দ্বারা যমীনের উপর আঘাত করলেন। রাবী (ইব্ন আব্বাস রা.) বলেন, তখনই পানি বেরিয়ে আসল। এ দেখে ইসমাঈল আ. এর মা অস্থির হয়ে গেলেন এবং গর্ত খনন করতে লাগলেন। রাবী (ইব্ন আব্বাস রা.) বলেন, এ প্রসঙ্গে আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেছেন, হাযেরা আ. যদি একে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিতেন তাহলে পানি বিস্তৃত হয়ে যেত। রাবী (ইব্ন আব্বাস রা.) বলেন, তখন হাযেরা আ. পানি পান করতে লাগলেন এবং তাঁর সন্তানের জন্য তাঁর দুধ বাড়তে থাকে। রাবী (ইব্ন আব্বাস রা.) বলেন, এরপর জুরহুম গোত্রের (ইয়ামন দেশীয়) একদল লোক উপত্যকার নীচু ভূমি দিয়ে অতিক্রম করছিল। হঠাৎ তারা দেখল কিছু পাখি উড়ছে। তারা যেন তা বিশ্বাসই করতে পারছিল না আর তারা বলতে লাগল এসব পাখি তো পানি ছাড়া কোথাও থাকতে পারে না। তখন তারা সেখানে তাদের একজন দূত পাঠাল। সে সেখানে গিয়ে দেখল, সেখানে পানি মাওজুদ আছে। তখন সে তার দলের লোকদের কাছে ফিরে আসল এবং তাদেরকে সংবাদ দিল। এরপর তারা হাযেরা আ. এর কাছে এসে বলল, হে ইসমাঈলের মা! আপনি কি আমাদেরকে আপনার কাছে থাকা অথবা (রাবী বলেছেন), আপনার কাছে বসবাস করার অনুমতি দিবেন? (হাযেরা আ. তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দিলেন এবং এভাবে অনেক দিন কেটে গেল)। এরপর তাঁর ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হল। তখন তিনি (ইসমাঈল) জুরহুম গোত্রেরই একটি মেয়ে বিয়ে করলেন। রাবী (ইব্ন আব্বাস রা.) বলেন, পুনরায় ইব্রাহীম আ. এর মনে জাগল (ইসমাঈল এবং তাঁর মা হাযেরার কথা) তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে (সারা) বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা সম্পর্কে খবর নিতে চাই। রাবী (ইব্ন আব্বাস রা.) বলেন, এরপর তিনি (তাদের কাছে) আসলেন এবং সালাম দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইসমাঈল কোথায়? ইসমাঈল আ. এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। ইব্রাহীম আ. বললেন, সে

যখন আসবে তখন তুমি তাকে আমার এ নির্দেশের কথা বলবে, "তুমি তোমার ঘরের চৌকাঠখানা বদলিয়ে ফেলবে।" ইসমাঈল আ. যখন আসলেন, তখন স্ত্রী তাঁকে খবরটি জানালেন, তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি সেই চৌকাঠ। অতএব তুমি তোমার পিতামাতার কাছে চলে যাও। রাবী (ইবন আব্বাস রা.) বলেন, অতঃপর (তাদের কথা) ইব্রাহীম আ. এর আবার মনে পড়ল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারা) কে বললেন, আমি আমার নির্বাসিত পরিবারের খবর নিতে চাই। এরপর তিনি সেখানে আসলেন, এবং (পুত্রবধুকে) জিজ্ঞাসা করলেন, ইসমাঈল কোথায়? ইসমাঈল আ. এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। পুত্রবধু তাঁকে বললেন, আপনি কি আমাদের এখানে অবস্থান করবেন না? কিছু পানাহার করবেন না? তখন ইব্রাহীম আ. বললেন, তোমাদের খাদ্য এবং পানীয় কি? স্ত্রী বলল, আমাদের খাদ্য হল গোশ্‌ত আর পানীয় হল পানি। তখন ইব্রাহীম আ. দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ্! তাদের খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যের মধ্যে বরকত দিন।" রাবী (ইবনে আব্বাস রা.) বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন, ইব্রাহীম আ. এর দু'আর কারণেই (মক্কার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের মধ্যে) বরকত রয়েছে। রাবী (ইবন আব্বাস রা.) বলেন, আবার কিছুদিন পর ইব্রাহীম আ. এর মনে তাঁর নির্বাসিত পরিজনের কথা জাগল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারা)কে বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের খবর নিতে চাই। এরপর তিনি এলেন এবং ইসমাঈলের দেখা পেলেন, তিনি যমযম কূপের পিছনে বসে তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। তখন ইব্রাহীম আ. ডেকে বললেন, হে ইসমাঈল! তোমার রব তাঁর জন্য একখানা ঘর নির্মাণ করতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল আ. বললেন, আপনার রবের নির্দেশ পালন করুন। ইব্রাহীম আ. বললেন, তিনি আমাকে এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি যেন আমাকে এ বিষয়ে সহায়তা কর। ইসমাঈল আ. বললেন, তাহলে আমি তা করব অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বলেছিলেন। এরপর উভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইব্রাহীম আ. ইমারত বানাতে লাগলেন আর ইসমাঈল আ. তাঁকে পাথর এনে দিতে লাগলেন আর তাঁরা উভয়ে এ দু'আ করছিলেন, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ কাজ কবূল করুন। আপনি তো সব কিছু শুনেন এবং জানেন। রাবী বলেন, এরি মধ্যে প্রাচীর উঁচু হয়ে গেল আর বৃদ্ধ ইব্রাহীম আ. এতটা উঠতে দূর্বল হয়ে পড়লেন। তখন তিনি (মাকামে ইব্রাহীমের) পাথরের উপর দাঁড়ালেন। ইসমাঈল তাঁকে পাথর এগিয়ে দিতে লাগলেন আর উভয়ে এ দু'আ পড়তে লাগলেন, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ কাজটুকু কবুল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।[৩১৯]

৩১৯. ইমাম বুখারী র., ২৫৬হি., সহীহ বুখারী শরীফ, পৃ. ৪৭৪-৪৭৫, হাদিস নং- ৩১২৬।

বায়তুল্লাহ'র ইতিহাসঃ

যখন হযরত আদম আ. জান্নাত থেকে পৃথিবীতে তশরীফ আনলেন, তখন আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, হে আল্লাহ্! এখানে ফেরেশতার কোন তাসবীহ'র শব্দ শুনতে পাচ্ছি না এবং কোন ইবাদতখানাও দেখতে পাচ্ছি না। যেভাবে আসমানে বায়তুল মা'মুর দেখেছি, যার চর্তুদিকে ফেরেশতারা তাওয়াফ করতো। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসল যে, যেখানে আমি চিহ্নিত করে দেবো সেখানে তুমি কা'বা নির্মাণ করে এর চতুর্দিকে তাওয়াফ কর এবং এর দিকে ফিরে নামাযও আদায় কর। হযরত আদম আ.কে সহযোগিতা করার জন্য হযরত জিব্রাঈল আ. সঙ্গে চললেন। তিনি আদম আ.কে ঐস্থানে নিয়ে গেলেন যেখান থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল। জিব্রাঈল আ. ওখানে স্বীয় পাখা মেরে সপ্তম জমি পর্যন্ত বুনিয়াদ দিলেন যাতে ফেরেশতারা পাঁচটি পাহাড়ের পাথর দিয়ে ভর্তি করে দিলেন। এই পাঁচটি পাহাড় হল– ১. লেবানান পাহাড়, ২. তূর পর্বত, ৩. জোদী পর্বত, ৪. হেরা পর্বত এবং ৫. যীতা পর্বত। ভিত্তি স্থাপন শেষে চতুর্দিকে দেওয়াল তুলে দিলেন আর হযরত আদম আ. ওদিকে ফিরে নামায ও তাওয়াফ আদায় করতে লাগলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, স্বয়ং 'বায়তুল মা'মুর'কে অবতরণ করে সেই ভিত্তির উপর রেখে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ নীচের ভিত্তি ছিল দুনিয়াবী পাথর দ্বারা আর মূল ইমারতটি ছিল বায়তুল মা'মুর। হযরত নূহ আ.'র প্লাবন পর্যন্ত এটি বিদ্যমান ছিল। এই প্লাবনের সময় বায়তুল মা'মুরকে আসমানে তুলে নেয়া হলো আর কা'বার ভিত্তিটি উঁচু টিলার ন্যায় রয়ে গেল। তবে লোকেরা সর্বদা বরকতের উদ্দেশ্যে এখানে আসতো এবং দোয়া করতো। ইব্রাহীম আ.'র সময়কাল পর্যন্ত এরূপ ছিল। হযরত হাযেরা রা. ও হযরত ইসমাঈল আ. এখানে এসে অবস্থান করার ফলে এটি কিছুটা আবাদ হলো। হযরত হাযেরা রা.'র ইন্তেকালের পর হযরত ইব্রাহীম আ. আদিষ্ট হলেন যে, ইসমাঈল আ.কে নিয়ে যেন কা'বা নির্মাণ করেন। বায়তুল্লাহর স্থান চিহ্নিত হলো এভাবে- এক টুকরা মেঘ পাঠানো হলো, যাতে মেঘের ছায়ায় কা'বার সীমা নির্ধারিত হয়। হযরত জিব্রাঈল আ. মেঘের ছায়া পরিমাণ রেখা টেনে দিয়ে সীমা নির্ধারণ করে দিলেন আর হযরত ইব্রাহীম আ. নির্ধারিত সীমা মতে মাটি খনন করেন। হযরত আদম আ.'র ভিত্তি যখন প্রকাশিত হল, তখন সেই ভিত্তির উপরই হযরত ইব্রাহীম আ. ইমারত নির্মাণ করেন।

এই ইমারতের পরিমাণ হলো- উচ্চতা নয় হাত, রুকনে আসওয়াদ থেকে রুকনে শামী পর্যন্ত দেয়াল ছিল ৩৩ হাত আর রুকনে শামী থেকে রুকনে গরবী পর্যন্ত দেয়াল ছিল ২২ হাত। রুকনে গরবী (পশ্চিম প্রান্ত) থেকে রুকনে ইয়ামনী

পর্যন্ত ৩১ হাত আর রুকনে ইয়ামনী থেকে রুকনে আসওয়াদ পর্যন্ত ছিল ২০ হাত। এর আকৃতি লম্বা-লম্বি যার দৈর্ঘ্য প্রস্তের চেয়ে বেশী ছিল। এর দরজা মাটির সাথে মিলিত ছিল, যাতে কোন চৌকাট-কপাট ছিলনা। অনেকদিন পর তুব্বায়ে হুমাইরী এই দরজায় চৌকাট, কপাট, শিকল ও তালা লাগিয়েছিলেন। ইব্রাহীম আ. কা'বার অভ্যন্তরে ডান দিকে নজর-নেয়াজ রাখার জন্যে একটি তাক বানিয়েছিলেন। এ নির্মাণে দু'টি দরজা ছিল। একটি প্রবেশের অপরটি বের হওয়ার জন্যে। কা'বা নির্মাণকারী হলেন হযরত ইব্রাহীম আ. আর সহযোগী ছিলেন হযরত ইসমাঈল আ.। এই নির্মাণে তিনটি পাহাড়ের পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। ১. আবু কুবাইস ২. হেরা এবং ৩. ওয়ারকান পাহাড়। ইসমাঈল আ. এই পাথর সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। ইব্রাহীম আ.'র পূর্বে কেউ এখানে ইমারত নির্মাণ করেননি তবে এর পরে অনেকবার এর মেরামত বা সংস্কার হয়েছে। যেমন- একবার আমালেকা গোত্র এবং জোরহাম গোত্র। আরেকবার কুসাই ইবনে কিলাব এর সংস্কার করেছিল যাতে মুকিল বৃক্ষের কাঠ দিয়ে ছাদ বানানো হয়েছিল যার উপর তখ্তার পরিবর্তে খেজুর বৃক্ষের ঢাল ব্যবহার করা হয়েছিল। অতঃপর রাসূল ﷺ'র বয়স যখন ২৫ বছর হলো তখন কুরাইশরা এর সংস্কার করেছিল। এই সংস্কারের কারণ হলো এক মহিলা সেখানে সুগন্ধি জ্বালাতো। একদা হঠাৎ করে তা থেকে আগুন ধরে গেলে কা'বার ছাদ জ্বলে গেল। তাছাড়া আগে থেকেও বিভিন্ন বন্যা ইত্যাদির কারণে দেয়ালে ফাটল ধরেছিল। ফলে কুরাইশ সর্দার বা ওলীদ ইবনে মুগীরাকে প্রধান মেরামতকারীর দায়িত্ব দিল। কা'বাকে শহীদ করে দ্বিতীয়বার নির্মাণ করা হয়েছিল। তবে এতে শর্ত ছিল যে, কেবল হালাল পন্থায় অর্জিত টাকাই এই নির্মাণে ব্যয় করা হবে। ঐসময় প্রায় সম্পদশালী ব্যক্তিরা সূদী ছিল। এ কারণে হালাল টাকা খুব কমই সংগ্রহ হলো। হালাল অর্থের অভাবে তারা বায়তুল্লাহ'র ইমারত ছোট করে ফেলল এবং কিছুটা পরিবর্তনও করে ফেলল। যেমন- ১. ইব্রাহীম আ.'র ভিত্তি থেকে কিছু অংশ বাদ দিয়ে ওটাকে 'হাতীম' করেছে। যার উপর আদৌ কা'বার ছাদের পানির নালা বিদ্যমান। ২. দুই দরজার স্থলে একটি দরজা রাখা হলো, তাও আবার মাটি থেকে অনেক উপরে। যাতে যাকে ইচ্ছে তারা যেতে দেবে আর যাকে ইচ্ছে যেতে দেবে না। ৩. এই নির্মাণে কা'বার ভিতরে বৃক্ষের স্তম্ভ সমূহকে দুই সারি করে প্রতি সারিতে তিনটি করে স্তম্ভ রাখা হয়েছে। ৪. এর উচ্চতা আগের দ্বিগুণ করা হয়েছে। আগে ছিল ৯ হাত আর এখন হলো ১৮ হাত। ৫. এই নির্মাণে রুকনে ইয়ামানী কা'বার অভ্যন্তরে নিকটে একটি সিঁড়ি বানিয়েছিলেন যা দিয়ে ছাদে আরোহণ করা যায়।

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা আমাকে স্বয়ং রাসূল ﷺ কা'বার সাথে সংযুক্ত মাটি খনন করে দেখালেন যে, সেখানে উটের পিঠের ন্যায় পাথর জমানো আছে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, হে আয়েশা! কুরাইশরা হালাল টাকার অভাবে বুনিয়াদী ইব্রাহীমের কিছু অংশ বাদ দিয়েছিল। এখনো লোকেরা নতুন মুসলমান। যদি তারা পথভ্রষ্ট হওয়ার ভয় না থাকতো তবে আমি বর্তমান কা'বাকে শহীদ করে বুনিয়াদী ইব্রাহীমীর উপর পরিপূর্ণ নির্মাণ করতাম।

পরবর্তীতে হযরত আয়েশা রা.'র হাদিসের ভিত্তিতে তাঁর ভাগ্নেয় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. কা'বা শরীফকে ইব্রাহীম আ.'র ভিত্তির উপর পূণ:নির্মাণ করেন। এতে কুরাইশদের পরিবর্তন দূরীভূত করা হয়েছে এবং 'হাতীম'কে কা'বার অংশ করা হয়েছে। এতে মাটির সাথে সংযুক্ত করে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দু'টি দরজা রাখা হয়েছে। ইয়ামেন থেকে সুগন্ধযুক্ত মাটি সংগ্রহ করে চুনার সাথে মিশ্রণ করে দেয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে। দরজার ভিতর-বাইরে মেশক ও আম্বরের মিশ্রণ লাগানো হলো। দেয়াল সমূহ অত্যন্ত মূল্যবান রেশমী গিলাফ দ্বারা আবৃত করা হতো যাকে গিলাফে কা'বা বলা হতো। এখনো এর রেওয়াজ রয়েছে। কা'বায় সর্বপ্রথম গিলাফ পরিধান করেছিলেন ইয়েমেনের বাদশাহ আসআদ যাকে তুব্বা বলা হতো। ইনিই সর্বপ্রথম মদীনা মুনাওয়ারাকে আবাদ করেছিলেন। রাসূল ﷺ'র সাক্ষাতের আশায় তিনি এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কা'বা নির্মাণ কাজ শেষ করেছেন ৬৪ হিজরি ২৭ রজব। অতঃপর ৭৪ হিজরি সনে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের প্রতিনিধি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এই নির্মাণ শহীদ করে কুরাইশ কর্তৃক নির্মিত ভিত্তি অনুযায়ী পুনরায় নির্মাণ করেছিল। এরপর বাদশাহ হারুনুর রশিদ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের ভিত্তি অনুযায়ী পুনরায় নির্মাণ করতে চাইলে ইমাম মালেক র. সহ ওলামাগণ নিষেধ করে দিলেন। কারণ এভাবে ভাঙ্গা-গড়া হতে থাকলে কা'বা শরীফের গুরুত্ব কমে যাবে এবং খেলনার বস্তুতে পরিণত হয়ে যাবে। এরপর থেকে বিভিন্ন ইসলামী রাজা-বাদশাহগণ মেরামত করেছিলেন বটে কিন্তু কেউ দ্বিতীয়বার নির্মাণ করেন নি। এরপর ১০৪০ হিজরি সনে সুলতান মুরাদ ইবনে আহমদ খান যিনি কুসতুনতুনিয়ার বাদশাহ ছিলেন, তিনি যখন দেখলেন যে, ইমারত অনেক পুরাতন হয়ে গিয়েছে তখন তিনি যে রুকনে হাজরে আসওয়াদ সংযুক্ত আছে সে রুকন থেকে শুরু করে নতুন ভাবে হাজ্জাজের ভিত্তি মতে পুণ:সংস্কার করেছেন, যার ভিতরে মরমর পাথরের ফরশ বিছানো হলো।

ছাদের নীচে খুবই উন্নতমানের মখমলী চাদর লাগিয়েছেন। বাইরের দেয়ালে কালো রঙের কাপড়ে স্বর্ণের রঙে রঙীনকৃত ধাতু দিয়ে " لا إله إلا الله محمد رسول الله " খুঁদিত নকশাযুক্ত গিলাফ চড়ানো হয়েছে। বর্তমান কা'বা সুলতান মুরাদের নির্মিত নকশার উপরই বিদ্যমান। মিশর থেকে প্রতি বছর গিলাফ তৈরী করে এনে বড় ধুম-ধামের সহিত পরিধান করা হতো। ১৩৮২ হিজরিতে একবার লাহোর থেকে তৈরী করে নেয়া হয়েছিল। এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে যে, প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে পুরাতন গিলাফ খুলে নিয়ে কা'বার খাদেমগণকে এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে উপহার দেয়া। হাজীরাও সুযোগ পেলে টুকরা টুকরা ক্রয় করে নিত বরকতের জন্য। আর নতুন গিলাফ কা'বায় পরিধান করা হয়। ১২৫০ হিজরি থেকে বাদশা আব্দুল আযিয ইবনে সউদ মিশর থেকে গিলাফ আনা বন্ধ করে দিল আর নজদেই এই গিলাফ তৈরী করে এর উপরিভাগে ইবনে সউদের নাম যুক্ত করা হয়েছে।[৩২০]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. অর্থ: স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করেছিল: পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই, তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।[৩২১]

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.

---

৩২০. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৬৭৮-৬৮০।

৩২১. সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৭।

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ . অর্থ: যখন আমি ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তাওয়াফকারীদের জন্যে, নামাযে দণ্ডায়মানদের জন্যে এবং রুকূ-সেজদাকারীদের জন্যে। এবং মানুষের মধ্যে হজ্বের জন্যে ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ্ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। এরপর তারা যেন দৈহিক ময়লা দূর করে দেয়, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং এই সুসংরক্ষিত গৃহের তওয়াফ করে। এটা শ্রবণযোগ্য। আর কেউ আল্লাহর সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্যে উত্তম। উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক; আল্লাহ্র দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে শরীক না করে; এবং যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। এটা শ্রবণযোগ্য। কেউ আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহ্ভীতিপ্রসূত। চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে তোমাদের জন্যে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উপকার রয়েছে। অতঃপর এগুলোকে পৌছাতে হবে মুক্ত গৃহ পর্যন্ত।[৩২২]

মকামে ইব্রাহীম'র ইতিহাসঃ

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হাজরে আসওয়াদ ও মকামে ইব্রাহীম এ দু'টি পাথর জান্নাতী, ইয়াকুত পাথর। এ দু'টি প্রথমে অনেক নূরানী ও উজ্জ্বল ছিল। আল্লাহ তায়ালা এগুলোর উজ্জল্যতা মিঠিয়ে দিয়েছেন। অন্যথা এগুলোর আলোয় মাগরীব থেকে মাশরিক তথা পূর্ব-পশ্চিমসীমা পর্যন্ত আলোকিত হতো।

মকামে ইব্রাহীম ঐ পাথর যার উপর হযরত ইব্রাহীম আ. তিনবার দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রথমবার হলো- যখন তাঁর পুত্রবধু হযরত ইসমাঈল আ.'র স্ত্রী হযরত ইব্রাহীম আ.কে মাথা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে সেই পাথরে কদম রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর পুত্রবধু তাঁর খেদমত করতে

৩২২. সূরা হাজ্ব, আয়াত: ২৬-৩৩।

পেরেছিলেন। দ্বিতীয়বার খানায়ে কা'বা নির্মাণের সময় যখন দেয়াল উঁচুতে উঠে গেল তখন তিনি হযরত ইসমাঈল আ.কে বলেছিলেন, আমার জন্যে এমন এক পাথর নিয়ে এসো যার উপর দাঁড়িয়ে আমি বাইতুল্লাহর দেয়ালের উপরিভাগ নির্মাণ করতে পারি। হযরত ইসমাঈল আ. পাথরের খোঁজে বের হয়ে জবলে আবু কুবাইসে গেলেন। পথিমধ্যে হযরত জিব্রাঈল আ.'র সাক্ষাত পেলেন। তিনি বললেন, আসুন, আমি আপনাকে এমন এক পাথরের সন্ধান দেবো যেটি হযরত আদম আ. জান্নাত থেকে আসার সময় এনেছিলেন। এটিকে হযরত ইদ্রিস আ. নূহ আ.'র তুফানের ভয়ে জাবলে আবু কুবাইসে দাফন করে রেখেছিলেন। এখানে দু'টি পাথর আছে। একটি বড় ও অপরটি ছোট। ছোটটি কা'বার দরজার নিকটে লাগিয়ে দেবেন যাতে প্রত্যেক তাওয়াফকারীরা এটাকে চুমু করতে পারে। এটি হলো হাজরে আসওয়াদ। আর বড়টিতে আরোহণ করে হযরত ইব্রাহীম আ. কা'বা নির্মাণ করবেন।

তিনি উভয় পাথর নিয়ে আসলেন এবং ইব্রাহীম আ.কে আল্লাহর আদেশের কথাও বললেন। তিনি আল্লাহর নির্দেশ মতে কাল পাথরকে যথাস্থানে লাগিয়ে দিলেন আর বড় পাথরে দাঁড়িয়ে কা'বার নির্মাণ কাজ চালিয়ে যান। দেয়াল যে পরিমাণ উপরে উঠতো এই পাথরও সেই পরিমাণ উপরে উঠে যেতো। অর্থাৎ এই পাথরটি বর্তমান আধুনিক যুগের লিফটের ন্যায় কাজ করেছিল। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হাজরে আসওয়াদ যখন দেয়ালে লাগানো হলো, তখন এর আলোতে চর্তুদিকে বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে পড়তো। যে পর্যন্ত এর আলো পৌছেছে সেই পর্যন্ত হেরেমের সীমা নির্ধারিত হয়েছিল, যার মধ্যে কোন প্রকারের শিকার করা নিষেধ। এই পাথরের রং সম্পূর্ণ শুভ্র ছিল। গুনাহগারদের হাতের স্পর্শে কাল বর্ণ ধারণ করেছে। তৃতীয়বার দাঁড়িয়ে ছিলেন, যখন তিনি কা'বা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন তখন আল্লাহর নির্দেশে জাবলে আবু কুবাইসে গিয়ে এই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হজ্জে আগমনের জন্য আল্লাহর বান্দাদেরকে আহ্বান করেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম আ.'র এই আহ্বান পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের সকলেই শুনেছিলেন। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যাদের আগমন হবে আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকেও এই আহ্বান শুনিয়ে দিয়েছিলেন। যারা এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে লাব্বায়েক বলেছিল কেবল দুনিয়াতে এসে তারাই হজ্জ করতে পারবে এবং যারা যতবার লাব্বায়েক বলেছিল তারা ততবার হজ্জ করবে। এ সময় এই পাথরে হযরত ইব্রাহীম আ.'র পদচিহ্ন প্রকাশিত হল। দীর্ঘদিন যাবৎ লোকেরা এই চিহ্ন দেখে অধিকহারে পাথরে চুমু খেতে খেতে চিহ্ন কিছুটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানেও এর চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। এটি প্রথমে

কা'বা শরীফের সাথেই মিলিতভাবে রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে হযরত ওমর রা.'র সময়কালে বড় ধরণের এক বন্যার কারণে পাথর স্বীয় স্থান থেকে সরে দূরে চলে গিয়েছিল। হযরত ওমর রা. নিজে এসে মাতাফের নিকট যমযম কূপের পাশে স্থাপন করে এর উপর একটি ছোট ঘর করে সংরক্ষিত করেছেন। বর্তমানে মজবুত গ্লাস দিয়ে ওটাকে সেই স্থানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাওয়াফকারীরা তাওয়াফ করার সময় স্বচ্ছ গ্লাস দিয়ে তা দেখতে পায়। হাজীরা তাওয়াফ শেষে সেই পাথরের দিকে ফিরে কিবলাকে সামনে রেখে দুই রাকাত নামায আদায় করে থাকেন।[৩২৩]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. অর্থ: যখন আমি কা'বাগৃহকে মানুষের জন্যে সম্মিলন স্থল ও শান্তির আলয় করলাম, আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকূ-সেজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখ।[৩২৪]

বি:দ্র:- আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দাদের সাথে সম্পর্কিত বস্তুকে সম্মান করা এবং বরকত হাসিল করা পবিত্র কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত। মকামে ইব্রাহীম পাথরটি জান্নাতি বলে এর দিকে মুখ করে নামায পড়ার কথা বলা হয়নি বরং মকামে ইব্রাহীম তথা হযরত ইব্রাহীম আ.'র দিকে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে পাথরের এই সম্মান হয়েছে। এখানে আল্লাহ্‌ তায়ালা 'মকামে জান্নাত' বলেন নি। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনে বহু জায়গায় আম্বিয়ায়ে কিরামের সাথে সম্পৃক্ত বস্তুর উসিলায় বরকত প্রাপ্তি, বিপদ মুক্তি ও রোগ মুক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যেমন- হযরত ইউসুফ আ.'র জামা'র উসিলায় হযরত ইয়াকুব আ.'র দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ পেয়েছিলেন, হযরত আইয়ুব আ.'র পায়ের আঘাতে প্রাপ্ত পানি দ্বারা তাঁর শেফা হওয়া, যমযম কূপের সৃষ্টি হযরত ইসমাঈল আ.'র উসিলায় এবং হযরত মূসা আ.'র ব্যবহৃত জিনিস-পত্রের উসিলায় হযরত তালুত যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন।[৩২৫]

[৩২৩]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৬৮০।
[৩২৪]. সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৫।
[৩২৫]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৬৮১।

বায়তুল্লাহ নির্মাণ ও সংস্কার সংখ্যা:

আল্লামা আহমদ কাসতুল্লানী র. মতে মোট দশবার বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মিত হয়েছিল। ১. ফেরেশতারা ২. হযরত আদম আ. ৩. হযরত শীষ আ. ৪. হযরত ইব্রাহীম আ. ও হযরত ইসমাঈল আ. ৫. আমালেকা সম্প্রদায় ৬. জুরহাম গোত্র, ৭. কুসাই ইবনে কিলাব ৮. কুরাইশরা ৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ'র ইচ্ছে মতে হযরত ইব্রাহীম আ.'র ভিত্তির উপর নির্মাণ করেছিলেন। যাতে দু'টি দরজা ছিল। একটি প্রবেশের জন্যে অপরটি বাহির হওয়ার জন্যে। হাতীমকে কা'বার ভিতর অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছিলেন। ১০. আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নির্মাণ করেছিল। সে ইবনে যুবায়েরের ভিত্তি শহীদ করে পুনরায় কুরাইশদের ভিত্তি মোতাবেক নির্মাণ করেছিল।[৩২৬]

খলীলুল্লাহ উপাধি লাভের কারণ:

হযরত ইব্রাহীম আ. খলীলুল্লাহ উপাধি লাভের বহুকারণ ওলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেছেন। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

১. ফেরেশতারা যখন তাঁর নিকট পুত্রের সুসংবাদ নিয়ে আসলেন, তখন তিনি তাদের জন্য খাবার তৈরী করলেন। ফেরেশতারা বলল, আমরা মূল্য আদায় করা ব্যতিত কারো খাবার গ্রহণ করিনা। ইব্রাহীম আ. বললেন, ঠিক আছে মূল্য প্রাদান করুন। ফেরেশতারা জানতে চাইল যে, এই খাবারের মূল্য কি? ইব্রাহীম আ. বললেন, এই খাবারের মূল্য হল খাবার পূর্বে আল্লাহর নাম নেওয়া আর পরে আল্লাহর প্রশংসা করা। তখন হযরত জিব্রাঈল আ. হযরত মিকাঈল আ.'র দিকে তাকিয়ে বললেন, এই মহান ব্যক্তিত্ব আল্লাহর খলীল হওয়ার যোগ্য। তখন থেকেই তিনি খলীলুল্লাহ উপাধি লাভ করেন।[৩২৭]

২. হযরত ইব্রাহীম আ.'র ঘর ছিল রাস্তার পাশে। তিনি বড়ই মেহেমানধারী ব্যক্তি ছিলেন। রাস্তা দিয়ে যারাই চলত তিনি তাদেরকে মেহেমান নাওয়াযী করতেন। অর্থাৎ সকল পথিককে খাবার খাওয়াতেন। একদা দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিল। লোকেরা একত্রিত হয়ে হযরত ইব্রাহীম আ.'র দরজায় সমবেত হল। এ সময় তাঁর নিকটও খাদ্যসম্ভার ছিল না। তাঁর জন্য প্রতি বছর খাদ্য সম্ভার পাঠাত তাঁর মিশরী এক বন্ধু। তিনি তাঁর এক গোলামকে তাঁর মিশরী বন্ধুর নিকট খাদ্য আনার জন্য প্রেরণ করলেন। গোলাম বন্ধুর কাছে গিয়ে

[৩২৬]. ইরশাদুস সারী, শরহে বুখারী, খণ্ড-৩, পৃ. ১৪৩-১৪৪।
[৩২৭]. তারীখে তাবারী, খণ্ড-১, পৃ. ১২৮, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ১৭২।

খাদ্যের কথা বললে, বন্ধু বলল, আমরাও খাদ্যাভাবে পতিত হয়েছি। যদি ইব্রাহীম আ.'র জন্য হয়, তবে কিছু খাদ্য সম্ভার দিতে পারি, সমস্ত লোকের জন্য দেয়া সম্ভব নয়। তাঁর গোলাম খালি হাতে ফেরৎ আসল।

গোলাম একটি উপত্যকা দিয়ে আসার সময় মনে মনে চিন্তা করল, খালি হাতে কিভাবে যাব। এই উপত্যকা থেকে কিছু বালি বস্তায় ভরে নেই। অতঃপর বালি নিয়ে বস্তা ভরে চলে আসল এবং হযরত ইব্রাহীম আ.কে সব ঘটনা খুলে বলল। এ সময় লোকেরা তাঁর ঘরের সামনে সমেবত। হযরত সারাহ রা. ঘুম থেকে উঠে বস্তার মুখ খুলে দেখলেন বস্তায় উন্নতমানের আটা। তিনি রুটি ওয়ালাকে রুটি বানাতে আদেশ দিলেন। তারপর সমবেত লোকদেরকে তৃপ্ত সহকারে খাওয়ালেন। হযরত ইব্রাহীম আ. ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে সারাহ! এই খাবার কোথা থেকে আসল? স্ত্রী বললেন, আপনার মিশরী বন্ধুর নিকট থেকে এসেছে। তখন হযরত ইব্রাহীম আ. বলেছেন, এইগুলো আমার খলীল (বন্ধু) আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, মিশরী বন্ধু থেকে নয়। সেই দিন থেকে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম আ.কে নিজের খলীল তথা বন্ধু বানিয়ে নিলেন।[৩২৮]

৩. একদা এক ফেরেশতা মানুষের আকৃতি নিয়ে হযরত ইব্রাহীম আ.'র নিকট এসে মধুর কণ্ঠে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলেন। হযরত ইব্রাহীম আ. আল্লাহর নাম শুনে আকৃষ্ট হলেন। তিনি বললেন, এই নামটি আরো একবার উচ্চারণ করুন। মানুষরূপী ফেরেশতা বললেন, বিনিময় ছাড়া ঐ নাম নিব না। তিনি বললেন, এই নামের বিনিময়ে আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ উৎসর্গ করব। তখন ফেরেশতা পূর্বের চেয়ে আরো অধিক সুমধুর কণ্ঠে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন, তৃতীয়বার উচ্চারণ করুন আমি বিনিময় স্বরূপ আমার সন্তান দেরকেও উৎসর্গ করব। তখন ফেরেশতা বললেন, সুসংবাদ শুনুন, আমি মূলত একজন ফেরেশতা। আপনার সম্পদ ও আওলাদের আমার প্রয়োজন নেই। আমার উদ্দেশ্য তো আপনাকে পরীক্ষা করা। আপনি যখন আল্লাহর নাম শুনার জন্য স্বীয় সম্পদ ও আওলাদকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন তখন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে স্বীয় খলীল বানিয়ে নিয়েছেন।[৩২৯]

৪. একদা রাসূল ﷺ হযরত জিব্রাঈল আ.'র নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিব্রাঈল! আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম আ.কে স্বীয় খলীল কেন বানিয়েছেন?

৩২৮. তাফসীরে বগভী, খণ্ড-২, পৃ. ১৬৩, সূত্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।
৩২৯. তাফসীরে কবীর, খণ্ড-৬, পৃ. ৬০, সূত্রঃ প্রাগুক্ত।

উত্তরে জিব্রাঈল আ. বললেন, হে মুহাম্মদে আরবী! তাঁর খাবার খাওয়ানোর কারণে।[৩৩০]

উল্লেখ্য যে, আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺকে আল্লাহ তায়ালা খলীল ও হাবীব উভয় ভূষণে ভূষিত করেছেন। অর্থাৎ নবী করিম ﷺ খলীলুল্লাহও, হাবীবুল্লাহও। খলীলের মর্তবার চেয়ে হাবীবের মর্তবা অনেক উর্ধ্বে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম আ.কে স্বীয় খলীল, হযরত মূসা আ. স্বীয় নাজী, আমাকে তাঁর হাবীব বানিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার ইজ্জতের শপথ! আমি হাবীবকেই খলীল ও নাজী'র উপর প্রাধান্য দেবো।[৩৩১]

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে স্বীয় খলীল বানিয়েছেন। যদি আমি আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে খলীল বানাতাম তবে হযরত আবু বকরকেই স্বীয় খলীল বানাতাম।[৩৩২]

হযরত জনদুব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকেও খলীল বানিয়েছেন যেভাবে হযরত ইব্রাহীম আ.কে স্বীয় খলীল বানিয়েছিলেন।

হযরত জিব্রাঈল আ.'র দ্রুতগামীতাঃ

রাসূল ﷺ হযরত জিব্রাঈল আ.কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে জিব্রাঈল! আসমান থেকে অবতরণকালে কি কখনো আপনাকে বেগ পেতে হয়েছিল? উত্তরে জিব্রাঈল আ. বললেন, হ্যাঁ, চার বার এরূপ হয়েছিল আমার।

এক. যখন হযরত ইব্রাহীম আ.কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন আমি আরশের নীচে ছিলাম। তখন আল্লাহ আমাকে আদেশ দিলেন أَدْرِكْ عَبْدِىْ আমার বান্দার নিকট পৌঁছে যাও। আমি তৎক্ষণাৎ নীচে এসে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার দ্বারা কোন খেদমতের প্রয়োজন আছে কি? তিনি বললেন, না।

দুই. যখন হযরত ইব্রাহীম আ. হযরত ইসমাঈল আ.'র গলায় চুরি রাখলেন, আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন- أَدْرِكْ عَبْدِىْ আমার বান্দার সংবাদ নাও। আমি চোখের পলক মারার পূর্বেই এসে গেলাম এবং চুরি ফিরিয়ে দিলাম।

তিন. যখন কাফেররা উহুদ যুদ্ধে আপনাকে আহত করেছে এবং আপনার দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছে, তখন আল্লাহ তায়ালা আমাকে বললেন, যাও,

৩৩০. তাফসীরে রূহুল মায়ানী, খণ্ড-১৬, পৃ. ১৫৫, সূত্রঃ প্রাগুক্ত।
৩৩১. তাফসীরে রূহুল মায়ানী, খণ্ড-৫-৬, পৃ. ১৫৫, সূত্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।
৩৩২. রূহুল বয়ান, খণ্ড-১, পৃ. ৩৫৭, সূত্রঃ প্রাগুক্ত।

আমার হাবীব ﷺ'র রক্ত মোবারক মাটিতে পড়ার পূর্বে নিয়ে নাও। যদি রক্তের একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়ে তবে কিয়ামত পর্যন্ত মাটি থেকে কোন বৃক্ষ, তরুলতা কিংবা কোন শাক-সবজী উৎপাদন হবে না। অতঃপর মুহূর্তের মধ্যে আমি এসে রক্ত মোবারক হাতে নিয়ে নিলাম তারপর তা বাতাসে উড়িয়ে দিলাম।

চার. যখন হযরত ইউসুফ আ.কে তাঁর ভাইয়েরা অন্ধ কূপে ফেলে দিল, তখন আল্লাহ তায়ালা আমাকে বললেন, আমার বান্দার কাছে পৌছে যাও। তিনি কূপে তলায় পৌছার পূর্বেই আমি পৌছে গেলাম এবং কূপ থেকে একটি পাথর বের করে এর উপর তাঁকে বসিয়ে দিলাম।[৩৩৩]

হযরত ইব্রাহীম আ. আগুনে অবস্থান করার সময়ঃ

হযরত ইব্রাহীম আ.কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ষোল বছর। তিনি সেই আগুনে চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ দিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি বলতেন, যতদিন আমি সেই আগুনে ছিলাম, ততদিন ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে উত্তম সময়। আমি চাই যে, আমার পুরোজীবন যদি এভাবে কেটে যেতো![৩৩৪]

হযরত ইব্রাহীম আ.'র মা আগুনে অক্ষত ছিলেনঃ

হযরত ইব্রাহীম আ.কে নমরুদে আগুনে নিক্ষেপ করার সময় তাঁর মাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আগুন ইব্রাহীম আ.কে জ্বালাতে সক্ষম হচ্ছে না তখন তিনি উচ্চস্বরে বললেন, হে ইব্রাহীম! আমিও তোমার কাছে আসতে চাই। তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া কর যেন আগুন আমাকেও জ্বালাতে না পারে। ইব্রাহীম আ. বললেন, আপনি চলে আসুন। মা জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন, কপালে চুমু দিলেন। তারপর নিরাপদে চলে আসলেন। আগুন তাঁর একটি লোমও দগ্ধ করতে পারেনি।[৩৩৫]

নমরূদ কর্তৃক আল্লাহর জন্য কোরবানীঃ

হযরত ইব্রাহীম আ. আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাঈল মা'রফত রেশমের তৈরী জান্নাতী কামিজ এবং জান্নাতী গালিচা প্রেরণ করেন। জিব্রাঈল আ. তাঁকে তা পরিধান করায়ে গালিচায় বসিয়ে দিলেন। নমরূদ তার উঁচু মহলে উঠে ইব্রাহীম আ.'র দৃশ্য দেখতেছিল। সে দেখল যে,

[৩৩৩]. তাফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড-৭, পৃ. ৫৫৭, সূত্রঃ প্রাগুক্ত।
[৩৩৪]. ইবনে কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২৬৩, সূত্রঃ প্রাগুক্ত।
[৩৩৫]. ইবনে কাসীর, আল বিদায়া ওয়া নিহায়া, খণ্ড-১, পৃ. ১৪৬, সূত্রঃ প্রাগুক্ত।

ইব্রাহীম আ. একটি বাগানে বসে আছেন। ফেরেশতা তাঁর পাশে উপস্থিত রয়েছে। তাঁর চতুর্দিকে আগুন। নমরূদ আওয়ায দিল- হে ইব্রাহীম! আপনার সেই মাবুদ অনেক মহান, যার শক্তি এতই বেশী যে, যিনি আগুনের মধ্যে আপনার জন্য আকর্ষণীয় স্থান করে দিয়েছেন। আপনি কি এই আগুন থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নমরূদ বলল, আপনি যদি আগুনে শুয়ে যান তখন কি আগুন আপনাকে দগ্ধ করবে? উত্তরে তিনি বললেন, না। নমরূদ বলল, তাহলে বেরিয়ে আসুন। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আগুনের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে বাইরে চলে আসলেন। নমরূদ তাঁকে স্বাগত জানাল এবং অনেক সম্মান করল আর জিজ্ঞেস করল- হে ইব্রাহীম! আপনার সাথে কে ছিলেন যাকে আমি আপনার পাশে দেখেছি? যিনি আপনার সাথে সাদৃশ্য। তিনি বললেন, ইনি ছিলেন ছায়া দানের দায়িত্ববান ফেরেশতা। আমার আল্লাহ্ আমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে তাকে আমার নিকট পাঠিয়েছেন। নমরূদ বলল, হে ইব্রাহীম! আপনার মাবুদের এই শক্তি ও মহানত্ব দেখে আমি আপনার খোদার জন্য চার হাজার গরু যবেহ করার ইচ্ছে করেছি। ইব্রাহীম আ. বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার কোরবানী গ্রহণ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার ধর্মে অটল থাক। তোমার ধর্ম ত্যাগ করে আমার ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করলে তোমার কোরবানী আল্লাহ কবুল করবেন। নমরূদ বলল, আমি আমার এই বিশাল সাম্রাজ্য ছাড়তে পারবো না, তবে এই কোরবানী আমি অবশ্যই দেবো। অতঃপর নমরূদ চার হাজার গরু যবেহ করল।[৩৩৬]

৯. হযরত ইসমাঈল আ.

হযরত ইসমাঈল আ. ছিলেন হযরত ইব্রাহীম আ.'র প্রথম পুত্র সন্তান। তাঁর জন্মের সময় হযরত ইব্রাহীম আ.'র বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে ইব্রাহীম আ. কতৃক মক্কা শরীফ আবাদ শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। তিনি হযরত ইসহাক আ.'র তের বছরের বড় ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম আ. ৮৫ বছর বয়সে উপনীত হয়েছিলেন কিন্তু কোন সন্তানের মুখ দেখননি তিনি। ফলে আল্লাহর কাছে নেককার সন্তানের জন্য দোয়া করলেন, বললেন- رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ 'হে প্রভু! আমাকে নেক্কার পুত্র সন্তান দান করুন'। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করে বললেন, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ 'অতঃপর আমি তাকে সহনশীল একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম'। ইনিই غُلَامٍ حَلِيمٍ তথা সহনশীল পুত্র অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল আ.।

[৩৩৬]. তাফসীরে রূহুল মায়ানী, খণ্ড-১৮, পৃ. ৬৮, সূত্রঃ প্রাগুক্ত।

হযরত ইব্রাহীম আ.'র বয়স যখন ৯৯ বছর হল এবং হযরত ইসমাঈল আ.'র বয়স ১৩ বছর হল তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে খত্না করার আদেশ আসল। তখন আদেশ পালনার্থে প্রথমে এই বুড়ো বয়সে নিজের খত্না করলেন অতঃপর হযরত ইসমাঈল সহ পরিবারের অন্যান্যদেরকে এমনকি গোলামদের সহ খত্না করালেন। এই সুন্নাত আদৌ সুন্নতে ইব্রাহীমী হিসাবে প্রচলিত আছে।

কুরবানীর ইতিহাসঃ

কুরবানীর ইতিহাস যদিও আদিকালের তবে আমরা যে কুরবানী করি মূলত তা হযরত ইব্রাহিম আ.'র সুন্নত ও তাঁর আত্মত্যাগের অবিস্মরণীয় ঘটনাকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের জন্য চিরস্মরণীয় ও প্রাণবন্ত করে রাখার জন্য উম্মতে মুহাম্মদীর উপর তা ওয়াজিব করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজাহ র. যায়েদ ইবনে আরকাম রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ، حَسَنَةٌ» قَالُوا: " فَالصُّوفُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ، حَسَنَةٌ» রাসূল ﷺ এর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কুরবানী কী? উত্তরে তিনি বললেন, ইহা তোমাদের পিতা ইব্রাহিম আ.'র সুন্নত। তাঁরা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এতে আমাদের জন্য কি কল্যাণ নিহিত আছে? তিনি বললেন, এর প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে। তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, বকরীর পশমও কি তাই? জবাবে তিনি বললেন, বকরীর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকী আছে।[৩৩৭]

ইব্রাহিম আ. কর্তৃক স্বীয় প্রাণপ্রিয় পুত্র কুরবানীটি মূলত ছিল একটি মহাপরীক্ষা। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছিলেন। সাধারণত মানুষের নিকট দু'টি বস্তু সবচেয়ে প্রিয়ভাজন হয়। একটি হল নিজের প্রাণ আর অপরটি হলো প্রাণপ্রিয় নিজের সন্তান। নমরুদের আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রাণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। অবশেষে বৃদ্ধাবস্থায় আল্লাহর কাছ থেকে দোয়া করে প্রাপ্ত একমাত্র ছেলেকে কুরবানী দেওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করে উত্তীর্ণ হন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

৩৩৭. শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ র.,৭৪০ হি., মিশকাত শরীফ, পৃ-১২৯

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ .

ইব্রাহিম আ. দোয়া করলেন– হে আমার প্রভু! আমাকে এক নেককার পুত্র সন্তান দান করুন। সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহিম তাকে বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি। এখন তোমার অভিমত কি? সে বলল, পিতা! আপনাকে যা আদেশ দেয়া হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল হিসেবে পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়ই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহিম তাকে যবেহ করার জন্যে শায়িত করল, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইব্রাহিম! তুমিতো স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার জন্যে এক মহানজন্তু। আমি তার জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি।[৩৩৮]

কুরবানীর সংক্ষেপ ঘটনা হলো হযরত ইব্রাহিম আ.'র স্ত্রী হযরত সারার গর্ভে যখন কোন সন্তান হচ্ছে না তখন তিনি নিজেকে বন্ধ্যা মনে করলেন। মিশরের সম্রাট ফেরাউন তার হাজেরা নাম্নী কন্যাকে হযরত সারার খেদমতের জন্য দান করেছিল। তিনি হাজেরাকে ইব্রাহিম আ.'র খেদমতে দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি তাকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করে নিলেন। এ হাজেরার গর্ভেই হযরত ইসমাঈল আ. জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের বয়স যখন ১৩ বা ১৫ বছরে উপনীত হলো তখন হযরত ইব্রাহিম আ.কে উপর্যুপরি তিন রাত স্বপ্ন দেখানো হলো যে, তুমি তোমার প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী কর। একথা স্বীকৃত সত্য যে, নবীগণের স্বপ্নও ওহীহ বটে। স্বপ্নের মাধ্যমে প্রদত্ত আদেশে মানব মনের পক্ষে ভিন্ন অর্থ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু ইব্রাহিম আ. ভিন্ন অর্থের পথ অবলম্বন না করে বরং আল্লাহর আদেশের সামনে মাথানত করে আদেশ পালনে ব্রত হলেন। অতঃপর তিনি ১০ই যিলহজ্জ সকালে স্ত্রী হাজেরাকে

৩৩৮. সূরা আস্ সাফফাত, আয়াত; ১০০-১০৮

বললেন, তোমার ছেলেকে সেজে-গুছে দাও– আমরা একটি দাওয়াতে যাবো। কোন কোন বর্ণনায় আছে তিনি হাজেরাকে বলেছেন ছুরি ও রশি দাও। পুত্রকে নিয়ে শিকারে যাব। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে আমরা আল্লাহর রাস্তায় দুম্বা কুরবানী দিতে যাবো। যা হোক মা ছেলেকে গোসল করায়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করায়ে, সুগন্ধি লাগিয়ে এবং চোখে সুরমা দিয়ে ও মাথায় তেল দিয়ে চিরুনী করে দিয়ে পিতার কাছে অর্পন করে দিলেন। হযরত ইব্রাহিম আ. ছেলের হাত ধরে জাবলে আরফার দিকে রওয়ানা হলেন। এদিকে ইবলিস শয়তান এক বৃদ্ধের আকৃতি ধারণ করে হযরত হাজেরাকে গিয়ে বলল, তুমি কি জান তোমার ছেলেকে তার পিতা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। হাজেরা ঘটনা খুলে বললে, শয়তান বলল, আল্লাহ তায়ালা নাকি তাকে তার পুত্রকে যবেহ করতে আদেশ দিয়েছেন তাই তাকে যবেহ করতে নিয়ে যাচ্ছে? হাজেরা বললেন, যদি আল্লাহর আদেশ হয়ে থাকে তাহলে এক ইসমাঈল কেন হাজার ইসমাঈল আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী দিতে পারি। এতে শয়তান ব্যর্থ হয়ে হযরত ইসমাঈল আ.'র নিকট এসে বলল, তোমাকে তোমার পিতা যবেহ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন? শয়তান বলল, তার ধারণা হল যে, তাকে আল্লাহ এর আদেশ দিয়েছেন। তখন ইসমাঈল আ. বললেন, আল্লাহ যদি আমার কুরবানী কবুল করেন তাহলে এর চেয়ে বড় ভাগ্যের ব্যাপার আর কি হতে পারে? এরপর শয়তান হযরত ইব্রাহিম আ. কেও অনুরূপ ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা চালালে তিনি তিনবার শয়তানের দিকে সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে দেন। এ কাজটি আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দ হয়েছিল বলেই কিয়ামত পর্যন্ত সকল হাজীগণের উপর এই সুন্নাতকে আবশ্যক করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর মিনায় কুরবানগাহে পৌছে তিনি পুত্রকে স্বপ্নের কথা বললে পুত্র সাথে সাথে বললেন, হে পিতা! আপনি আদেশ পালন করুন। তিনি পুত্রের কাছে স্বপ্নের কথা বলেছেন কিন্তু পুত্র বুঝে নিলেন যে, নবীগণের স্বপ্ন ওহী। তাই পুত্র উত্তরে আপনি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করুন না বলে বলেছেন আপনি আদেশ পালন করুন। পুত্র পিতাকে বললেন, আপনি আমাকে শক্ত করে বেঁধে নিন, যাতে আমি বেশী ছটপট করতে না পারি। আপনার পরিধেয় বস্ত্রও সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটা তাতে না পড়ে। এতে আমার সওয়াব হ্রাস পেতে পারে। তাছাড়া রক্ত দেখলে আমার মা অধিক ব্যাকুল হবেন। আপনি ছুরিটাও ধার করে নিন এবং তা আমার গলায় দ্রুত চালাবেন যাতে আমার প্রাণ সহজে বের হয়ে যায়। কারণ মৃত্যু বড় কঠিন। আপনি আমার মায়ের কাছে পৌছে আমার সালাম বলবেন। যদি আমার জামা তার কাছে নিয়ে যেতে চান, তবে নিয়ে যাবেন। হয়তো এতে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন। ইব্রাহিম আ. পুত্রের কথা শুনে

বললেন, বৎস! আল্লাহর নির্দেশ পালনে তুমি আমার চমৎকার সহায়ক হয়েছ। অতঃপর তার কপালে চুমু খেয়ে তাকে শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। তাকে কাত করে শুয়ায়ে গলার উপর ধারাল ছুরি চালাতে লাগলেন। তিনি কয়েকবার এরূপ করলেন কিন্তু ছুরি কাজ করছে না এবং গলাও কাটা যাচ্ছে না। এসময় ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সকল ফেরেশ্তা, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, এমনকি পানির ভিতরে মাছ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে লাগল আর বলতে লাগল হে পরওয়ারদিগার! ارحم هذا الشيخ الكبير وافد هذا الطفل الصغير এই বৃদ্ধের উপর দয়া করুন এবং এই ছোট বাচ্চার প্রাণ রক্ষা করুন। তখন পুত্র বললেন, হে পিতা! ছুরিকে পুনরায় ধার দিয়ে নিন এবং আমাকে কাত করে শুইয়ে দিন। কেননা আপনি আমার চেহারা দেখলে আপনার মধ্যে হয়তো পৈতৃক স্নেহ উতলে উঠবে। তারপর তিনি পুত্রকে কাত করে শুয়াইয়ে ছুরি চালালেন কিন্তু এবারও ছুরি কোন কাজ করল না। এতে তিনি রাগ করে ছুরিকে হাত থেকে নিক্ষেপ করলে ছুরি একটি পাথরে পড়লে পাথর দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তায়ালা ছুরিকে বাকশক্তি দান করলেন। ছুরি বলে উঠল– يا ابراهيم انا بين امرين فالخليل يقول اقطعى والجليل يقول لا تقطعى وانى من قبل الجليل لامن قبل الخليل وكيف اقطع فى نحر اسماعيل ونور محمد صلى الله عليه وسلم فى جبهته يلمع হে ইব্রাহিম, আমি দুই আদেশের মধ্যবর্তীতে অবস্থান করছি। খলীল বলছেন তুমি যবেহ কর আর জলীল (আল্লাহ) বলছেন তুমি যবেহ করিওনা। আর আমি জলিলের পক্ষে খলীলের পক্ষে নই। আর কিভাবেই আমি ইসমাঈলের গলা কাটব? নূরে মুহাম্মদী ﷺ তার চেহারায় সমুজ্জল হয়ে আছেন।[৩৩৯]

হযরত ইব্রাহিম আ. ও ইসমাঈল আ. যবেহের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইসমাঈল আ.'র পরিবর্তে জান্নাত থেকে একটি দুম্বা বা ভেড়া দিয়ে তাদের কুরবানী কবুল করলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি জবেহ করার জন্য এক মহান জীব দান করলাম। গাউসে পাক র. গুনিয়াতুত তালেবীন গ্রন্থে বলেন, ঐ দুম্বার নাম ছিল ওয়াযীর। এটি জান্নাতে চল্লিশ বছর যাবৎ চরণকারী ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, এটি ছিল সেই দুম্বা যেটি হযরত আদম আ.'র পুত্র হাবিল কুরবানী দিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে ডাক দিয়ে বলছেন– হে ইব্রাহিম! তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন

৩৩৯. শেখ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আয়াস র. বাদায়েউয যহুর, আরবী, পৃ-৯২

করে দেখিয়েছ এবং এতে কোন ত্রুটি করনি। আমি সৎকর্মশীলদের এভাবেই বিনিময় দিয়ে থাকি। পিতা কর্তৃক পুত্র কুরবানী করা আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিলনা বরং এর পিছনে রয়েছে অন্য একটি উদ্দেশ্য। ফেরেশ্তারা আল্লাহর কাছে জানতে চাইলেন যে, এর মূল উদ্দেশ্য কি? উত্তরে আল্লাহ বলেন, খলীলের অন্তরে আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ভালবাসা যেন না থাকে। কারণ আমার ভালবাসায় অন্য কারো শরীক থাকা আমি পছন্দ করিনা। হযরত ইব্রাহিম আ. পুত্রকে ভালবেসেছে তাই তাকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। হযরত ইয়াকুব আ. হযরত ইউসূফ আ. কে ভালবেসেছে তাই চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাকে পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে এবং ইয়াকুব আ.কে ইউসূফের পৃথক হওয়ার কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। আমাদের নবী করিম ﷺ হযরত হাসান ও হোসাইন রা.কে মহব্বত করেছেন তাই জিব্রাইল আ. এসে আরয করলেন এদের একজনকে বিষ পান করানো হবে আর অপরজনকে শহীদ করা হবে। উদ্দেশ্য হলো মাহবুবের সাথে অন্যের মুহাব্বত যেন শরীক না হয়।[৩৪০]

যবিহুল্লাহ কে ছিলেন?

অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম ও ওলামায়ে ইজামের মতে যবিহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল আ. এবং এটি অধিক শুদ্ধ। এ জন্যেই তাঁকে ইসমাঈল যবিহুল্লাহ বলা হয়। কেবল ইহুদীরা এবং কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম ও ওলামায়ে কিরামের মতে যবিহুল্লাহ ছিলেন ইব্রাহীম আ.'র দ্বিতীয় পুত্র হযরত সারাহ রা.'র গর্ভে জন্মগ্রহণকারী হযরত ইসহাক আ.।

তাছাড়া পবিত্র কুরআনের বর্ণনাতেও হযরত ইসমাঈল আ. যে যবিহুল্লাহ এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা সূরা সাফ্ফাতে হযরত ইব্রাহীম আ.কে সহনশীল পুত্র সন্তানের সংবাদ দেয়ার পর ইব্রাহীম আ. কতৃক পুত্র যবেহের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে দশটি আয়াত বর্ণনা করার পর হযরত ইসহাক আ.'র নাম ধরে সুসংবাদ দেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যবেহ সম্পর্কিত ঘটনা বড় ভাই হযরত ইসমাঈল আ.'র সাথে সংঘটিত হয়েছে।

অনেকের মতে যবেহের ঘটনার সময় হযরত ইসহাক আ. জন্মগ্রহণও করেন নি। কারণ যবেহের সময় হযরত ইসমাঈল আ.'র বয়স মতান্তরে ১৩, ১৪, ১৮। অথচ ইসহাক আ. যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন ইসমাঈল আ.'র বয়স হয়েছিল ১৪ বছর।

৩৪০. আব্দুল কাদের জিলানী র. (৫৬১ হি), গুনিয়াতুত তালেবীন, উর্দু, পৃ-৪১৫

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজীর বরাত দিয়ে আল্লামা বগভী র. লিখেছেন, খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আযিয র. একবার এক পুণ্যবান নওমুসলিমকে (যিনি পূর্বে ছিলেন ইহুদী) জিজ্ঞেস করলেন, বলুন- দেখি, হযরত ইব্রাহীম আ. তাঁর কোন পুত্রকে যবেহ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, ইসমাঈলকে। তিনি আরো বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইহুদীরা একথা জানে। কিন্তু হিংসা বশতঃ স্বীকার করতে চায় না।[৩৪১]

পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে হযরত ইসমাঈল আ.'র আলোচনা করা হয়েছে- فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ . فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ . অর্থ: সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বলল: বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বলল: পিতা:! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ্ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন।[৩৪২]

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا . وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا . অর্থ: এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রসূল, নবী। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তার পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন।[৩৪৩]

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ . إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ . وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ . وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ . অর্থ: স্মরণ করুন, হাত ও চোখের অধিকারী আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা। আমি তাদের এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলাম। আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সৎলোকদের অন্তর্ভূক্ত। স্মরণ করুন, ইসমাঈল, আল ইয়াসা ও যুলকিফলের কথা। তারা প্রত্যেকেই গুণীজন।[৩৪৪]

৩৪১. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., তাফসীরে মাযহারী, বাংলা, খণ্ড-১০, পৃ. ১০০।
৩৪২. সূরা সাফ্ফাত, আয়াত: ১০১-১০২।
৩৪৩. সূরা মরয়ম, আয়াত: ৫৪-৫৫।
৩৪৪. সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ৪৫-৪৮।

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ . وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ . অর্থ: এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ করুন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সবরকারী। আমি তাঁদেরকে আমার রহমত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছিলাম তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ।[৩৪৫]

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ অর্থ: আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি ইসমাঈল, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানবর্গের প্রতি।[৩৪৬]

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ অর্থ: তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি।[৩৪৭]

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ অর্থ: অথবা তোমরা কি বলছ যে, নিশ্চয়ই ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের সন্তানগণ ইহুদী অথবা খ্রীস্টান ছিলেন? আপনি বলে দিন, তোমরা বেশী জান, না আল্লাহ্ বেশী জানেন?[৩৪৮]

হযরত ইসমাঈল আ.'র সন্তান সন্ততি:

হযরত ইসমাঈল আ. যুবক হয়ে আমালেকা গোত্রের এক মহিলাকে বিবাহ করেছেন। পিতার ইঙ্গিতমূলক নির্দেশে তিনি তাকে তালাক দেন। উমুভী বলেন, সেই স্ত্রীর নাম ছিল- আম্মারাহ বিনতে সা'দ বিন উসামা বিন আকীল আমালেকী। পরে জুরহাম গোত্রের এক নারীকে বিবাহ করেছেন। তার সাথেই বিবাহ স্থায়ী হয়েছিল। তার নাম হল- সায়্যেদাহ বিনতে মুদ্বাদ্ব বিন আমর জুরহামী। তাঁর গর্ভে বারজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। মুহাম্মদ বিন ইসহাকের মতে তাদের নাম হল– ১. নাবাত, ২. কাইযার, ৩. আযঈল, ৪. মাইশী, ৫. মাসমা, ৬. মাশ, ৭. দুশা, ৮. আওরার, ৯. ইয়াতূর, ১০. নাবশ, ১১. তীমা বা তাইমা ও ১২. কাইযমা।[৩৪৯]

[৩৪৫]. সূরা আম্বীয়া, আয়াত: ৮৫-৮৬।
[৩৪৬]. সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৩।
[৩৪৭]. সূরা বাকারা, আয়াত: ১৩৬।
[৩৪৮]. সূরা বাকারা, আয়াত: ১৪০।

তাওরাতের বর্ণনা মতে হযরত ইসমাঈল আ.'র বারজন পুত্র সন্তান ছিল যাদেরকে বার সর্দার বলা হতো। তারা আরবের পরবর্তী প্রজন্মের গোত্রদের পূর্বপুরুষ ছিলেন। একজন কন্যা সন্তানও ছিল যার নাম ছিল বাশামা কিংবা মুহাল্লাহ।[৩৫০]

ইন্তেকাল:

হযরত ইসমাঈল আ.'র বয়স যখন ১৩৬ কিংবা ১৩৭ হলো তখন তাঁর ওফাত হয়। এ সময় তার আওলাদগণের বংশ পরম্পরা অনেক ছড়িয়ে পড়েছিল। যারা হেজাজ, সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন এবং মিশরে বিস্তার লাভ করেছিল।

তাওরাতের বর্ণনা মতে তাঁর কবর ফিলিস্তিনে। কিন্তু বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তাঁর কবর তাঁর মাতা হযরত হাজেরা রা.'র পাশে হেরেমের ভিতরে বাইতুল্লাহ'র নিকটে হাজরের পাশে।[৩৫১]

১০. হযরত ইসহাক আ.

পরিচিতি:

হযরত ইসহাক আ. ছিলেন হযরত ইব্রাহীম আ.'র পুত্র এবং হযরত ইসমাঈল আ.'র ছোট ভাই। মায়ের নাম হল সারাহ রা.। হযরত ইব্রাহীম আ.'র বয়স যখন ১০০ বছর পূর্ণ হল তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম আ.কে সুসংবাদ দিলেন যে, তোমার স্ত্রী সারাহ'র গর্ভে একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তার নাম রাখবে ইসহাক।

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ আ.কে সন্তান লাভের সুসংবাদ দেয়ার জন্য তাঁর কাছে কতিপয় ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা, হযরত ইব্রাহীম আ.'র স্ত্রী সারাহ নি:সন্তান ছিলেন। তিনি সন্তানের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু উভয়ের বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে দৃশ্যত: সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনা ছিলনা। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা কতৃক সুসংবাদ দিলেন যে, তাঁরা অচিরেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন। তাঁর নামকরণ করা হল ইসহাক। আরো অভিহিত করা হল যে, হযরত ইসহাক আ.

[৩৪৯]. আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি., কাসাসুল কুরআন, আরবী, খণ্ড-১. পৃ. ১৯২।
[৩৫০]. কাযী হেফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ২৪৬।
[৩৫১]. আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি., কাসাসুল কুরআন, আরবী, খণ্ড-১, পৃ. ১৯৩, কাযী হেফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ২৪৭।

দীর্ঘজীবী হবেন, সন্তান লাভ করবেন, তাঁর সন্তানের নাম হবে ইয়াকুব আ.। উভয়ে নবুয়তের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

ফেরেস্তাগণ মানবাকৃতিতে আগমণ করায় হযরত ইব্রাহীম আ. প্রথমে তাদের চিনতে পারেন নি। তাই তাদের জন্য ভুনা গোশত দিয়ে মেহেমানদারী করলেন। কিন্তু তারা তা স্পর্শ করেন নি। এতে ইব্রাহীম আ. শঙ্কিত হলে ফেরেশতারা তাদের আগমণের উদ্দেশ্য বলে দিলেন। তারা বললেন, আমরা আল্লাহর আদেশে দু'টি কাজের জন্য এসেছি। একটি আপনাকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেয়া আর অপরটি হল হযরত লূত আ.'র কওমের উপর আযাব নাযিল করা। হযরত ইব্রাহীম আ.'র স্ত্রী হযরত সারাহ পর্দার আড়ালে এই সুসংবাদ শুনে খুশী হয়ে হেসে ফেললেন এবং বললেন, এহেন বৃদ্ধকালে আমার গর্ভে সন্তান জন্ম হবে। আর আমার স্বামীও তো অতি বৃদ্ধ। ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন, আপনি কি আল্লাহর কুদরতে বিস্ময় প্রকাশ করছেন? অথচ তাঁর জন্য অসাধ্য বলতে কিছুই নেই। কুরতুবী'র বর্ণনা মতে এ সময় হযরত সারাহ এর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। কারো মতে তখন তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

হযরত ইসহাক আ.'র জন্মের শুভ সংবাদ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে– وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ . فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ . وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ . قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ . قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . অর্থ: আর অবশ্যই আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ইব্রাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল। তারা বলল– সালাম, তিনিও বললেন– সালাম। অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে, আহার্যের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি সন্দিগ্ধ হলেন এবং মনে মনে তাঁদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগলেন। তারা বলল– ভয় পাবেন না। আমরা লূতের কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তাঁর স্ত্রীও নিকটেই দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরের ইয়াকুবেরও। সে বলল– কি দুর্ভাগ্য আমার! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এতো ভারী আশ্চর্য কথা। তারা বলল– তুমি আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে বিস্ময়বোধ করছ? হে গৃহবাসীরা, তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও প্রভূত বরকত রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রশংসিত মহিমায়।[৩৫২]

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ . إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ . فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ . فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ . فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ . فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ . قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ . অর্থ: আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল: সালাম, তখন সে বলল: সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক। অতঃপর সে গৃহে গেল এবং একটি ঘৃতেপক্ক মোটা গোবৎস নিয়ে হাযির হল: তারা বলল: ভীত হবেন না। তারা তাঁকে একটি জ্ঞানীগুণী পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল। অতঃপর তাঁর স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এল এবং মুখ চাপড়িয়ে বলল: আমি তো বৃদ্ধা, বন্ধ্যা। তারা বলল: তোমার পালনকর্তা এরূপই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ।[৩৫৩]

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ . إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ . قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ . قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ . قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ . قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ . অর্থ: আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের অবস্থা শুনিয়ে দিন। যখন তারা তাঁর গৃহে আগমন করল এবং বলল: সালাম! তিনি বললেন: আমরা তোমাদের ব্যাপারে ভীত। তারা বলল: ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে একজন জ্ঞানবান ছেলে-সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তিনি বললেন: তোমরা কি আমাকে এমতাবস্থায় সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন আমি বার্ধক্যে পৌছে গেছি? তারা বলল: আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি। অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। তিনি বললেন: পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়?[৩৫৪]

ইসহাক নাম করণের কারণ:

اسحاق শব্দটির মূল উচ্চারণ হলো يصحق। এটি ইবরানী শব্দ, যার আরবী শব্দ হল يضحك অর্থ সে হাসতেছে। ফেরেশতারা যখন এই বার্ধক্য বয়সে পুত্র সন্ত

[৩৫২] সূরা হুদ, আয়াত: ৬৯-৭৩।
[৩৫৩] সূরা আয্ যারিয়াত, আয়াত: ২৪-৩০।
[৩৫৪] সূরা হিজর, আয়াত: ৫১-৫৬।

[সন্তা]নের সুসংবাদ দেন তখন হযরত সারাহ হেসেছিলেন। অথবা হযরত ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ হযরত সারাহ'র জন্য খুশীর কারণ হয়েছিল। তাই তাঁর নাম ইসহাক রাখা হয়েছিল। জন্মের অষ্টম দিনে তাঁকে খত্না করা হয়েছিল।[৩৫৫]

হযরত ইসহাক আ.'র বিবাহ:

তাওরাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম আ. তাঁর গোলাম ইয়ারয দামেশ্কীকে বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি ইসহাকের বিবাহ ফিলিস্তিনের কেনআন খান্দানদের কারো সাথে করাবো না। বরং আমার ইচ্ছা যে, নিজের খান্দান এবং স্বীয় পুরুষের বংশের সাথে আত্মীয়তা করবো, তুমি সফর সামগ্রী নিয়ে 'ফাদ্দানে আরামে' যাও। সেখানে আমার ভাতিজা ও বাতওয়াভীল বিন নাহুরকে পয়গাম দাও যে, সে যেন তার কন্যাকে আমার সন্তান ইসহাককে বিবাহ দেয়। সে যদি সম্মতি প্রকাশ করে, তবে এটাও বলবে যে, ইসহাককে আমি আমার থেকে পৃথক করতে চাইনা। সুতরাং তার কন্যাকে যেন তোমার সাথে পাঠিয়ে দেয়। ইয়ারয আদেশ মতে রওয়ানা হয়ে গেল। যখন জনবসতির কাছাকাছি পৌছল তখন উট থামিয়ে সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে লাগল। সে যে স্থানে উট থামাল, তার পাশেই ইব্রাহীম আ.'র ভাতিজা বাতওয়াভীল খান্দানের বসতিস্থাপন ছিল। ইত্যবসরে ইয়ারয সামনে একজন সুন্দরী কন্যা দেখল, সে পানির কলসী ভরে পানি নিয়ে বাড়ী যাচ্ছে। ইয়ারয তার থেকে পানি চাইলে সে পানি পান করাল তাকে এবং তার উটকে। অতঃপর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইল। ইয়ারয তার কাছে বাতওয়াভীলের ঠিকানা জানতে চাইলে মেয়েটি বলল, উনি আমার পিতা। মেয়েটি তাকে মেহেমান করে ঘরে নিয়ে গেল এবং তার ভাই লাবানকে অভিহিত করল। লাবান ইয়ারযকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলো আর ইয়ারয হযরত ইব্রাহীম আ.'র প্রস্তাব শুনালে লাবান খুবই খুশী হল এবং অনেক ধন-সম্পদ দিয়ে নিজের বোন রিফকা'কে ইয়ারযের সাথে বিদায় দেন। অতঃপর ইব্রাহীম আ. রিফকা বিনতে বাতওয়াভীলকে হযরত ইসহাক আ.'র সাথে বিবাহ দেন।[৩৫৬]

হযরত ইসহাক আ.'র বংশ থেকে এক হাজার নবীর আগমণ ঘটেছিল পৃথবীতে। তিনি সিরিয়া এলাকার নবী ছিলেন।

ইসহাক আ.'র মৃত্যু:

হযরত ইয়াকুব আ. পিতা ইসহাক আ.'র নিকট আগমণ করেন এবং তাঁর নিকট অবস্থান করেন 'হাবরুন' নামক কেনআনে অবস্থিত একটি গ্রামে। যেখানে

[৩৫৫]. কাযী হেফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ২৫০।
[৩৫৬]. কাযী হেফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ২৫০।

দাদা হযরত ইব্রাহীম আ. বসবাস করতেন। অতঃপর হযরত ইসহাক আ. অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং মৃত্যুবরণ করলেন ১৮০ বছর বয়সে। তাঁর দুই সন্তান আইস ও ইয়াকুব তাঁকে তাঁর পিতা হযরত ইব্রাহীম আ.'র পাশে কবরস্থানে দাফন করেছেন।[৩৫৭]

১১. হযরত ইয়াকুব আ.

পরিচিতি:

হযরত ইয়াকুব আ. হলেন হযরত ইসহাক আ.'র সন্তান। মায়ের নাম রিফকা বিনতে বাতওয়াভীল। হযরত ইয়াকুব আ.'র মা যখন গর্ভবতী হলেন তখন দু'টি জময সন্তান জন্ম দেন। একজন হল আইস (عيص) অপরজন হল ইয়াকুব।

ইমাম সুদ্দী র. বলেন, আইস মায়ের গর্ভে কথা বলত। মা শুনে তা ইসহাক আ.কে বললেন। ইসহাক আ. স্ত্রীকে বললেন, তুমি যদি কথা বলতে শুন, তবে আমাকে অভিহিত করবে। যখন স্ত্রী শুনলেন, তখন স্বামীকে অভিহিত করলেন। হযরত ইসহাক আ. স্ত্রীর পেটে কান লাগিয়ে দিলে শুনতে পেলেন যে, আইস ইয়াকুবকে বলল, আল্লাহর শপথ! যদি তুমি মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে আমার আগে বেরিয়ে যাও, তবে আমি আমার মায়ের পেট নষ্ট করে দেবো এবং তোমাকেও হত্যা করবো। তখন হযরত ইসহাক আ. বললেন, হে মোবারক পুত্র! তোমার মায়ের হকের প্রতি খেয়াল রাখ। তোমার মায়ের পেট নষ্ট করো না এবং তোমার ভাইকেও হত্যা করোনা। মা যখন সন্তান প্রসব করতে লাগলেন, তখন আইস ইয়াকুবের আগে অগ্রগামী হল। অর্থাৎ আইসই পৃথিবীতে আগে আসল আর ইয়াকুব আসল পরে। এ কারণেই আইসকে আইস করে নামকরণ করা হয়েছে। عيص অর্থ অবাধ্য। যেহেতু তিনি অবাধ্য হয়ে ইয়াকুবের আগে বেরিয়ে আসলেন। অথচ ইয়াকুব ছিলেন আইসের বড়। গর্ভে আইসের পূর্বেই ইয়াকুব এসেছিল। আর ইয়াকুব (يعقوب) অর্থ পিছে আসা। যেহেতু বয়সে বড় হয়ে পৃথিবীতে মায়ের গর্ভ থেকে আইসের পরে এসেছে, তাই তাঁর নামকরণ করা হয় ইয়াকুব।

তারা দু'ভাই যখন বড় হল, তখন পিতা ইসহাক আ. আইসকে বেশী ভালবাসতেন। আর মাতা রিফকা হযরত ইয়াকুব আ.কে বেশী ভালবাসতেন।

[৩৫৭]. আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি., কাসাসুল কুরআন, আরবী, খণ্ড-১, পৃ. ১৯৮।

হযরত ইসহাক আ. বৃদ্ধকালে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। আইস শিকার করত আর পিতা-মাতাকে খাওয়াতো। একদা পিতা ইসহাক আ. প্রিয় পুত্র আইসকে বললেন, হে আইস! আল্লাহর রাস্তায় ভাল একটি দুম্বা কুরবানী করে এর মাংস ভুনা করে কাবাব বানিয়ে আমার জন্য নিয়ে এসো। আমি তা খেয়ে তোমার জন্য দোয়া করবো। আল্লাহ চাহেন তো এই দোয়া তোমার অনেক উপকারে আসবে। আর দোয়ার সময় তুমি তোমার হাত আমার হাতে রাখবে। একথা তাদের মা রিফকা শুনে ফেলেছেন। তখন তাড়াতাড়ি মা তার প্রিয় সন্তান ইয়াকুবকে বললেন, তুমি দ্রুত একটি দুম্বা ভুনা করে কাবাব বানিয়ে এনে তোমার পিতাকে খেতে দাও। আর পশমী কাপড় পরিধান করে এসো। কারণ আইসের শরীরে বেশী পরিমাণে লোম ছিল কিন্তু ইয়াকুব আ.'র তা ছিল না। এতে করে ইসহাক আ. হাত ধরলেও বুঝতে পারবে না যে, ইনি ইয়াকুব আ.। বরং ইয়াকুবকে আইস মনে করে বিশেষ দোয়াটি করবেন।

মায়ের কথা মতে ইয়াকুব আ. দ্রুত দুম্বা ভুনা করে এবং পশমী কাপড় পরিধান করে পিতার নিকট নিয়ে আসলেন। পিতা তা খেলেন আর বললেন, হে আমার পুত্র! তুমি সামনে এসো। তিনি মনে করেছিল ইনি আইস। অতঃপর হযরত ইয়াকুব আ. সামনে আসলে পিতা তাকে স্পর্শ করে বললেন, إِنَّ الْمَسَّ مَسُّ العيص والريح ريح يعقوب অর্থাৎ হাতের স্পর্শে তো মনে হচ্ছে আইস কিন্তু ঘ্রাণে তো মনে হচ্ছে ইয়াকুব। তখন স্ত্রী রিফকা বললেন, এ আপনার ছেলে আইস, আপনি তার জন্য দোয়া করুন। তখন ইয়াকুব আ. পিতা ইসহাক আ.'র হাতে হাত রাখলে দোয়া করলেন- اَللّٰهُمَّ اَجْعَلْ مِنْ ذُرِّيَّتِه الاَنْبِيَاءَ وَالْمُلُوْكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনি এর সন্তানদের মধ্যে নবী এবং বাদশাহী দান করুন। হযরত ইয়াকুব আ. দোয়া নিয়ে ধন্য হয়ে চলে গেলে আইস দুম্বা ভুনা করে পিতার সামনে পেশ করলেন। পিতা বললেন, কে তুমি? তিনি বললেন, আমি আপনার সন্তান আইস। তখন পিতা বললেন, হে পুত্র! দোয়া তো তোমার পূর্বে তোমার ভাই ইয়াকুব নিয়ে গেছে এবং সে সফলকাম হয়েছে। তখন আইস রাগান্বিত হলেন আর বললেন, আমি অবশ্যই ইয়াকুবকে হত্যা করবো। তখন পিতা বললেন, হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি রাগান্বিত হয়োনা, আমার কাছে তোমার জন্যও একটি দোয়া রয়েছে। অতঃপর তিনি হাত তুলে দোয়া করলেন আর বললেন– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذُرِّيَّتِه عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصٰى অর্থ: হে আল্লাহ্! তার বংশধর বালু-পাথর পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। ফলে তার আওলাদ ও বংশধর

অনেক বেশী হয়েছিল। পশ্চিমা দেশে, ইসকান্দরিয়ায় তার বংশধর বিস্তার লাভ করেছিল।

আইস ছিলেন হলুদ বর্ণের। একারণেই তার বংশধরকে বনী আসফার বলা হয়। তার এক ছেলের নাম ছিল রোম। বর্তমান রোম শহর তার সেই ছেলের নামেই প্রসিদ্ধ হয়েছে। এরপর হযরত ইসহাক আ. ১৬০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করলেন এবং নিজের মা সারাহ'র পাশে সমাধিস্থ হন।

কৌশলে হযরত ইয়াকুব আ. পিতার দোয়া নেয়াতে আইস তার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন। তাছাড়া তিনি তখন ইয়াকুব আ.কে হত্যার হুমকিও দিয়েছিলেন তাই মা সর্বদা ইয়াকুবকে নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। তাই মা ইয়াকুবকে বলেছিলেন, তুমি নাজরানে (সিরিয়ায়) তোমার মামা লাবানের কাছে চলে যাও। তিনি ধনাঢ্য ও সেখানকার সর্দার। তুমি তোমার পিতার অছিয়ত মতে সেখানে চলে যাও আর তার মেয়েকে বিবাহ কর। তখন ইয়াকুব আ. রাতের বেলাই কেনআন ত্যাগ করে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হন। অনেকের মতে তাঁর ইস্রাঈল নামকরণের কারণ এটিই। অর্থ: ইস্‌রা অর্থ ভ্রমণ করা আর লাইল অর্থ রাত। এটি يسرى بالليل থেকে اسرائيل হয়েছে। অথবা ইস্‌রা অর্থ বান্দা আর ائيل অর্থ আল্লাহ। তখন এর অর্থ হবে আল্লাহর বান্দা।

অতঃপর তিনি দিনের বেলায় গোপন থাকতেন আর রাতের বেলায় ভ্রমণ করতেন। এভাবে তিনি মামার কাছে গিয়ে পৌঁছেন। ভাগিনার কাছে আদ্য-পান্ত ঘটনা শুনে তিনি তাকে সান্তনা দিলেন এবং নিজের ছেলের ন্যায় আদর-যত্ন করে রাখলেন। মামার ছিল দুই কন্যা। একজনের নাম- লাইয়্যা আর অপর জনের নাম রাহীল। তবে রাহীল খুবই সুন্দরী ছিল। তখন ইয়াকুব আ. মামাকে বললেন, আপনি আমাকে রাহীল'র বিবাহ করিয়ে দিন, যাতে আমার পিতার অছিয়ত পূর্ণ হবে। কারণ তিনি আমাকে অছিয়ত করেছেন, যেন আমি মামার মেয়েকে বিবাহ করি। উত্তরে মামা বললেন, তোমার কাছে তোমার পিতার কিছু নেই, তুমি দেন-মহর কীভাবে আদায় করবে? উত্তরে ইয়াকুব আ. বললেন, আমার কাছে কিছুই নাই বটে, তবে আমি আপনার ছাগল চড়ায়ে এর বিনিময় দিয়ে দেন-মহর পরিশোধ করবো। তখন উভয়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত হল যে, ৭/১০ বছর আমার ছাগল চড়াবে তারপর বিবাহের ব্যবস্থা হবে। নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর হযরত ইয়াকুব আ. রাহীলকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন মামা রাতের বেলায় বাশর রাতে লাইয়্যা নাম্নী কন্যাকে তার নিকট সোপর্দ করলেন। পরের দিন সকালে উঠে মামাকে গিয়ে বললেন, আমি তো রাহীলকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, লাইয়্যাকে নয়। উত্তরে মামা বললেন, ভাগিনা! লাইয়্যা অসুন্দর,

তাকে আমি কাকে বিবাহ দেব। তাছাড়া লাইয়্যা বড়। তাকে রেখে ছোট বোনকে বিবাহ দেয়ার নিয়ম এখানে নেই। এটি এখানে বড় দোষণীয় বিষয়। লোকেরা সমালোচনা করবে। তাই তোমাকে তাকে বিবাহ দিয়েছি। তবে তুমি যদি চাও তবে আরো ৭/১০ বছর ছাগল চড়াও তবে আমি রাহীলকেও তোমাকে রিবাহ দেবো।

উল্লেখ্য যে, তৎকালীন শরীয়তে দু'বোনকে একজনে বিবাহ করা বৈধ ছিল। হযরত ইব্রাহীম আ.'র সময়কাল থেকে তাওরাত নাযিল হওয়া পর্যন্ত এরূপ বৈধ ছিল। পরবর্তীতে তাওরাত ও কুরআনে দু'বোনকে এক বিবাহে রাখা নিষেধ হয়ে গেল। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে- وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ অর্থ: দু'বোনকে এক বিবাহে একত্রিত করো না, তবে যা পূর্বে হয়েছে তা ব্যতিত।

হযরত ইয়াকুব আ. আরো ৭/১০ বছর মামার ছাগল চড়ালেন তখন মামাতো বোন রাহীলকে বিবাহ করলেন। মামা উভয় কন্যাকে একজন করে দাসীও দিলেন সেবা করার জন্য। এভাবে অনেক ধন-দৌলত দিয়ে নিজের দু'কন্যাকে এবং জামাতাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। বিবি লাইয়্যা থেকে ছয় জন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করল। এদের নাম হল—১. রুবীল, ২. শামউন, ৩. লাভী, ৪. ইয়াহুদা, ৫. আইসাখার ও ৬. যাবলূন। দীর্ঘদিন যাবৎ রাহীল'র কোন সন্তান-সন্ততি হয়নি। তিনি তার 'বালহা' নাম্নী দাসীকে হযরত ইয়াকুব আ.কে দান করলে তার থেকে দু'টি সন্তান জন্ম হয়েছিল। একজনের নাম ছিল 'দান' আর অপর জনের নাম ছিল 'নীফতালী'। এতে লাইয়্যাও তার যুলফা নাম্নী দাসীকে হযরত ইয়াকুব আ.কে দান করলে তার থেকেও দু'টি সন্তান জন্ম হয়েছিল। একজনের নাম ছিল জাদ আর অপজনের নাম ছিল আশীর। অনেক দিন পর বিবি রাহীল'র গর্ভে হযরত ইউসুফ আ. জন্ম লাভ করেছিলেন। এখন হযরত ইউসুফ আ. সহ হযরত ইয়াকুব আ.'র ঘরে দুই স্ত্রী ও দুই দাসী থেকে মোট ১১ জন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেন। হযরত ইয়াকুব আ. সকলের মধ্যে হযরত ইউসুফ আ.কে সর্বাপেক্ষা ভালবাসতেন এবং মুহূর্তের জন্যও ইউসুফ আ. দৃষ্টির অগোচরে রাখতেন না। ইয়াকুব আ. কেনআন থেকে মামার কাছে আসার ২১ বছর পর হযরত ইউসুফ আ. জন্মগ্রহণ করেন।

এতদিনে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইয়াকুব আ.'র ধন-দৌলতে প্রচুর বরকত দান করেছেন, ১১টি সন্তানও দান করেছেন তখন তিনি পুনরায় কেনআনে গিয়ে মায়ের সেবা করার মনস্থ করলেন। তখন মামার অনুমতি নিয়ে তিনি ছেলে সন্তান, দুই স্ত্রী, অনেক দাস-দাসী এবং প্রচুর চতুষ্পদ জন্তু নিয়ে কেনআনের পথে রওয়ানা দিলেন। তবে তিনি পথিমধ্যে ভয় করতেন যে, ভাই আইস যদি এখনো তার উপর নারাজ থাকে এবং পথে যদি সাক্ষাত হয় তবে হয়তো তাকে হত্যা

করতে চাইবে। মনে মনে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পথ চলতে লাগলেন। কেনআনের নিকটবর্তী যখন তিনি কাফেলা নিয়ে পৌঁছলেন, তখন ঘটনাক্রমে এসময় আইস শিকার করতে ময়দানের দিকে বের হল। পথে এই কাফেলার সাথে তার সাক্ষাত হল। কিন্তু দূর থেকে গোপনে হযরত ইয়াকুব আ. তাকে চিনে ফেললেন। তখন তিনি তাঁর কাফেলার চাকর-বাকরদের বলে দিলেন যে, যদি ঐ লোকে (আইস) জিজ্ঞাসা করে- এই ধন-সম্পদ ও মালপত্রের মালিক কে? তোমরা সবাই বলবে- আইসের এক গোলাম ছিল, নাম তার ইয়াকুব। সিরিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। এসব কিছু তার।

অতঃপর ইয়াকুব আ. আইসের ভয়ে স্বীয় কাফেলায় চুপে চুপে আসতে লাগলেন। কাফেলা যখন আইসের সম্মুখীন হল, তখন আইস জিজ্ঞাসা করল এই ছাগলপালের মালিক কে? কাফেলার লোকেরা উত্তর দিল- এগুলো সব আইসের গোলাম ইয়াকুবের যিনি সিরিয়ায় চলে গিয়েছিল। আইস যখন ইয়াকুবের নাম শুনল চোখ বেয়ে পানি চলে আসল আর বলতে লাগল ইয়াকুব গোলাম নয় বরং আইসের ভাই। সেই আইসের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। সবাই বলল, সিরিয়ায়ও ইয়াকুব সবাইকে বলত যে, তিনি নাকি আইসের গোলাম। ইয়াকুব আ. যখন গোপনে দেখলেন যে, আইসের অন্তরে ক্রোধ নেই বরং তার প্রতি ভালবাসা রয়েছে তখন তিনি এসে ভাইকে নিজের পরিচয় দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে উভয়ে অঝোর নয়নে কান্নাকাটি করলেন। সেই দিন সেখানে অবস্থান করে পরের দিন উভয়ে ঘরে চলে যান। উভয় এক সাথে বসবাস করেন। এর আরো এক বছর পর রাহীল'র গর্ভে ইয়াকুব আ.'র আরো এক সন্তান জন্মগ্রহণ করলেন, যার নাম হল বিনইয়ামিন। এরপর রাহীল ইন্তেকাল করলে বিনইয়ামিনকে লাইয়্যা লালন-পালন করেছিলেন। এখন হযরত ইয়াকুব আ.'র ১২ জন পুত্র সন্তান পূর্ণ হল। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবুয়ত দান করেন। তখন আইস কেনআন ত্যাগ করে তার রোম নামক সন্তানকে নিয়ে বর্তমান রোম শহরে চলে যান। সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তার সন্তান রোম সেখানেই বসতি স্থাপন করে এই শহর আবাদ করেন। তার অনেক সন্তান-সন্ততি হয়েছিল। বর্ণিত আছে যে, আইসের বংশে হযরত আইয়ুব আ. ছাড়া আর কোন নবী আগমন করেননি। বাকী সব পয়গম্বর হযরত ইয়াকুব আ.'র বংশ থেকে আগমণ করেছেন। হযরত ইয়াকুব আ. যখন 'ফাদ্দানে আরাম' চলে গিয়েছিলেন আইস তখন সিরিয়ায় চাচা হযরত ইসমাঈল আ.'র কাছে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি চাচাতো বোন নাসামা বিনতে ইসমাঈলকে বিবাহ করেন।[৩৫৮]

---

৩৫৮. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আয়াস, বাদায়েউয যহুর, আরবী, পৃ. ৯৬-৯৭। আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি., কাসাসুল কুরআন, আরবী, খণ্ড-১, পৃ. ১৯৪-১৯৮, কাযী হেফজুর রহমান,

হযরত ইয়াকুব আ.'র ১২ সন্তানের তালিকা:

- হযরত ইয়াকুব আ.'র প্রথমা স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে লাবান থেকে মোট ৬ জন। যথা- ১. রুবীল, ২. শামউন, ৩. লাভী, ৪. ইয়াহুদা, ৫. আইসাখার ও ৬. যাবলূন।
- দ্বিতীয়া স্ত্রী রাহীল থেকে মোট- ২ জন। যথা- ১. ইউসুফ আ. ও বিনইয়ামিন।
- রাহীল কতৃক প্রদত্ত দাসী বালহা থেকে ২ জন। ১. দান ও ২. নীফতালী।
- লাইয়্যা কতৃক প্রদত্ত দাসী- যুলফা থেকে ২ জন। ১. জাদ ও ২. ঈসাখার।

১২. হযরত লূত আ.

পরিচিতি ও কওমে লূতের ঘটনা:

হযরত লূত আ. ছিলেন হযরত ইব্রাহীম আ.'র ভাতিজা। তাঁর পিতার নাম হল হারান। হযরত লূত আ. বাল্যকাল থেকে হযরত ইব্রাহীম আ.'র তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তিনি এবং হযরত সারাহ ছিলেন মিল্লাতে ইব্রাহীমী'র প্রথম মুসলমান। হযরত লূত আ. হযরত ইব্রাহীম আ.'র নির্দেশে পশ্চিম জর্দানে সাদুম ও আমূরাহ সম্প্রদায়ের এলাকায় দ্বীন প্রচারের নিমিত্তে মিশর থেকে হিজরত করেন। এই এলাকার লোকেরা ছিল অতি জঘন্য পাপী, অবাধ্য ও চরিত্রহীন। তারা নারীর পরিবর্তে পুরুষের সাথে সমকামিতায় অভ্যস্ত ছিল। ইতিপূর্বে পৃথিবীতে এই মারাত্মক কু-অভ্যাস কোন জাতির মধ্যে ছিলনা। শুধু তা নয় তারা এটাকে পাপাচারই মনে করত না বরং গর্বের বিষয় মনে করে প্রকাশ্যে তাতে লিপ্ত হত। এছাড়াও তারা ছিল ডাকাত, লুটেরা, যালেম, লজ্জাহীন, উদ্ধত্য ও উপহাসকারী।

হযরত লূত আ. তাদের অত্যন্ত নম্র ও ভদ্রতার সহিত এসব দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকার এবং আল্লাহর দ্বীনের অনুসরণের প্রতি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেন। আবার এসব অপকর্মের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহর আযাবের ভয়াবহতা সম্পর্কেও অবহিত করেন। এত সব করেও কোন কাজে আসল না বরং তারা প্রত্যুত্তরে বলল- وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ লূত সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল,লূত ও তার পরিবারকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও। তারা খুব সাধু থাকতে চায়।[৩৫৯]

কাসাসুল কুরআন, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ২৭৭-২৭৮। মৌলভী গোলাম নবী, খোলাসাতুল আম্বীয়া, উর্দু, পৃ. ৯২-৯৫।

[৩৫৯]. সূরা আরাফ, আয়াত: ৮২।

হযরত লূত আ. এক মজলিসে তাদের সম্বোধন করে বললেন- أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. তোমরা কি পুং মৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ? উত্তরে তার সম্প্রদায় কেবল বলল- আমাদের উপর আল্লাহর আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও।[৩৬০]

এদিকে পাপীষ্টরা আল্লাহর আযাব কামনা করছে ওদিকে আল্লাহ তাঁর আযাবের ব্যবস্থা করছেন। তা হল- হযরত ইব্রাহীম আ. মেহেমানদারীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কোন মেহেমান ছাড়া দস্তরখানায় খেতে বসতেন না। একদা তিনি জঙ্গলে ভ্রমণে বের হয়েছেন মেহেমানের খোঁজে। পথে তিনজন মেহেমান দেখে খুশী মনে তাদেরকে নিয়ে ঘরে আনলেন এবং গরুর বাছুর যবেহ করে রান্না করে তাদের সামনে পেশ করেন। তারা তা খেতে অস্বীকৃত জনালে তিনি তাদেরকে শত্রু মনে করে পেরেশান হয়ে গেলেন। তখন তারা নিজেদেরকে ফেরেশতা পরিচয় দিয়ে ইব্রাহীম আ.কে সান্তনা দিয়ে বলেন- আমরা আল্লাহর নির্দেশে লূত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য এসেছি। তখন হযরত ইব্রাহীম আ. বললেন- লূত আ. একজন নবী, তিনি তথায় বিদ্যমান। তোমরা কিভাবে তাকে ধ্বংস করবে। উত্তরে ফেরেশতারা বললেন- আমরা সব জানি তবে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের ঈমানদার সদস্যদের রক্ষা করা হবে। তবে তাঁর সত্য প্রত্যাখ্যানকারী স্ত্রী হবে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত।

কাহিনীটি আল্লামা সুদ্দী ও কাতাদা র.'র বিবরণে এসেছে এভাবে- তখন সময় ছিল দ্বিপ্রহর। হযরত ইব্রাহীম আ.'র গৃহ থেকে ফেরেশতারা রওয়ানা হলেন হযরত লূতের জনপদ অভিমুখে। কোন কোন বর্ণনা মতে ঐ ফেরেশতারা ছিলেন- হযরত জিব্রাঈল, হযরত মিকাঈল ও হযরত ইস্রাফিল আ.। ফেরেশতারা যখন ফিলিস্তিন থেকে সাদুম নগরে হযরত লূত আ.'র সাক্ষাত করেন তখন তিনি তাঁর কৃষি ক্ষেত্রে কর্মরত ছিলেন কিংবা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ছিল যে, নবী লূত তাঁর সম্প্রদায়ের পাপাচার সম্পর্কে চারবার সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত যেন তাদেরকে ধ্বংস করা না হয়। ফেরেশতারা গোফ-শ্মশ্রুবিহীন চিত্তাকর্ষক সুদর্শন কিশোরের রূপ ধারণ করলেন। নবী লূতের সঙ্গে সাক্ষাত করে তারা বললেন- আমরা আপনার অতিথি। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল উগ্র সমকামী। তাই তিনি

[৩৬০]. সূরা আনকাবুত, আয়াত: ২৯।

তাদেরকে দেখে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। লূত আ. তাদেরকে নিয়ে যাত্রা করলেন গৃহাভিমুখে। চলতে চলতে বললেন, আপনারা কি এই এলাকার লোকদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে কিছু জানেন? অতিথিরা বললেন, না তো। তিনি বললেন, এই জনপদটি পৃথিবীর সর্ব নিকৃষ্ট জনপদ। কথাচ্ছলে এই বাক্যটি তিনি চারবার উচ্চারণ করলেন। এভাবে কথোপকথনের মাধ্যমে পৌছলেন স্বগৃহে। এক বর্ণনায় এসেছে- হযরত লূত আ. কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে আগে আগে চললেন, পিছনে চলল অতিথি বৃন্দ। পথচারীরা অশ্লীল দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল অতিথি বালকদের প্রতি। হযরত লূত বলেছিলেন, এখানকার লোকগুলো এরকমই। এ ধরণের জঘন্য আর কোথাও নেই। চলন্ত পথে একথাও উচ্চারণ করলেন চারবার। অতিথিরা পরস্পর পরস্পরের ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে বললেন, শুনলে তো সাক্ষদানের সংখ্যা চারবার পূর্ণ হল। অপর বর্ণনায় এসেছে জনচক্ষুর অন্তরালে হযরত লূতের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন অতিথিরা। নবী গৃহের সদস্য ছাড়া অন্য কেউ তাদের আগমণ সংবাদ জানতে পারেনি। সত্য প্রত্যাখ্যানকারিনী নবী পত্নীই সংবাদটি রটিয়ে দিয়েছিল পাড়ার যুবকদের মধ্যে। সে বলেছিল, এমন সুন্দর মেহমান আমি আর কখনো দেখিনি।

যা হোক সুদর্শন যুবকদের আগমনের সংবাদ পেয়ে লোকেরা উল্লাসিত হয়ে দ্রুত গতিতে হযরত লূত আ.'র আঙ্গিনায় সমবেত হল বিকৃত কাম চরিতার্থ করার জন্য। কামোন্মাদ সমবেত নগরবাসীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! ক্ষান্ত হও। এরা আমার সম্মানিত মেহেমান। তোমরা এদেরকে অবমাননা করে আমার মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত করোনা, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নির্লজ্জ অপকর্ম থেকে বিরত থাক। পাপের শাস্তি নিশ্চিত। সম্মানিত মেহেমানদের সম্মুখে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করো না। উত্তরে সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিল- হে লূত! সারা দুনিয়ার লোককে তুমি আশ্রয় দিবে নাকি? এটা তোমার অনধিকার চর্চা। আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দাও আর তুমি থাকো তোমার কাজে। এভাবে যাকে তাকে আশ্রয় দিতে আমরা তোমাকে নিষেধ করিনি?

লূত আ.'র উপদেশ ও নিষেধাজ্ঞা যখন উপেক্ষিত হতে লাগল তখন তিনি অনন্যোপায় হয়ে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আমার কন্যা কিংবা আমার সম্প্রদায়ের কন্যারা রয়েছে। তোমরা বৈধ পন্থায় তথা বিবাহ সম্পাদনের মাধ্যমে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ কর। তিনি আরো বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই? যে সদুপদেশের মাধ্যমে তোমাদেরকে সংযত করতে পারে? উত্তরে তারা বলল, হে লূত! তুমি তো জান, তোমাদের কন্যাদের

আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা কী চাই তুমি তো তা জানই। সুতরাং এই মুহূর্তে আমরা তোমার অতিথি বালকদের চাই।

তাদের দাপট ও আস্ফালন দেখে হযরত লূত আ. অসহায়বোধ হয়ে বললেন, তোমাদের উপর যদি আমি শক্তি প্রয়োগ করতে পারতাম কিংবা কোন শক্তিশালী দলের সাহায্য পেতাম তবে আমি আমার অতিথিদের নিরাপদ রাখতে পারতাম। এ সময় হযরত লূত আ. ও অতিথিবৃন্দ ছিলেন অবরুদ্ধ ও গৃহবন্দী। গৃহাভ্যন্তর থেকেই তিনি দুর্বৃত্তদের সঙ্গে বাদানুবাদ করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে উশৃঙ্খল পাষণ্ডরা তাঁর গৃহের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে লাগল। কিংবকর্তব্যবিমূঢ় নবীকে দেখে অতিথিরা বললেন- হে লূত! আমরা আপনার পালনকর্তার প্রেরিত ফেরেশতা। তাদেরকে সমুচিত শাস্তি প্রদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি। আমাদের ক্ষতি করার সাধ্য কারো নেই। সুতরাং আপনি দরজা খুলে দিতে পারেন। হযরত লূত আ. বর্হিবাটির দরজা উন্মুক্ত করে দিলে পঙ্গপালের ন্যায় দুর্বৃত্তরা গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করল। আল্লাহর অনুমতিক্রমে হযরত জিব্রাঈল আ. আর্বিভূত হলেন স্বরূপে। সামান্য সঞ্চালন করলেন তাঁর ডানা। তাতেই তারা হয়ে গেল অন্ধ। ফলে আর অগ্রসর হতে পারল না। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে শুরু করল। চিৎকার করে একে অপরকে বলতে লাগল- পালাও, পালাও। লূতের বাড়ীতে এসেছে একজন মস্ত বড় যাদুকর। আরো বলতে লাগল, অপেক্ষা কর, ভোর হতে দাও। সকালে তোমার সাথে শেষ বুঝাপড়া হবে। তিনি ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আযাব শুরু হবে কখন? ফেরেশতারা বললেন, ভোর বেলা।

ফেরেশতারা তাঁকে বললেন, আপনি রাতের শেষ ভাগে আপনার পরিবার পরিজন সহ গৃহত্যাগ করবেন এবং কেউ পশ্চাতে ফিরে তাকাবে না। কিন্তু আপনার স্ত্রী আপনার সাথে যাবে না। কারণ তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে অবাধ্যদের সাথে। লূত আ.'র স্ত্রী মূলত কাফের ছিল। সে পথ চলার সময় কাফেরদের প্রতি দুর্বলতার কারণে পিছন দিকে ফিরে কাফেরদের উপর ভয়ংকর আযাব দেখে আফসোস করে বলে উঠল- হায়! আমার স্বজাতি তো ধ্বংস হয়ে গেল। ফলে সেও আযাবের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল।

বর্ণিত হয়েছে, হযরত লূত আ. তাঁর পিতৃব্য হযরত ইব্রাহীম আ.'র সঙ্গে বাবেল শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সিরিয়া অতিক্রম কালে তিনি যাত্রা স্থগিত করলেন জর্ডান নামক স্থানে। আল্লাহ্ তায়ালা সেখান থেকে তাঁকে নবী বানিয়ে প্রেরণ করলেন সদোমবাসীদেরকে হেদায়েতের উদ্দেশ্যে। সদোমের লোকেরাই শুরু করেছিলো ঘৃণ্য সমকামিতা। হযরত লূত আ. তাদেরকে ওই জঘন্য পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করতে বললেন। কিন্তু তারা হযরত লূতের কথায়

কর্ণপাত করলো না। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে প্রস্তর বৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংস করে দিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে ইসহাক বিন বশীর এবং ইবনে আসাকেরও এ রকম বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, গৃহবাসী সদোমদেরকে ভূমিধ্বসের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। আর মুসাফির সদোমদেরকে বিনাশ করা হয়েছিলো পাথরের বৃষ্টির দ্বারা।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, সদোম সম্প্রদায়ের এলাকাটি ছিলো সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। আশে পাশের সকল অঞ্চলের চেয়েও সুন্দর অঞ্চল ছিলো ওই সদোম। তাই আশে পাশের লোকেরা প্রায়শঃই অত্যাচার করতো তাদের উপর। ফল ও ফসল লুঠ করে নিয়ে যেতো। অবাধে পশুপাল চরাতো ফসলের ক্ষেতে। ইবলিস একদিন মানুষের আকৃতিতে শুভাকাঙ্খীর ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হলো বিমর্ষ সদোমদের নিকট। পরামর্শ দিলো– তোমরা যদি পুরুষ সম্ভোগ করো, তবে বেঁচে থাকতে পারবে সকল অত্যাচার থেকে। সদোমেরা প্রথমে এ পরামর্শকে ভালো মনে করলো না। কিন্তু বহিরাগতদের উপদ্রব যখন চরমে পৌছলো, তখন উদ্ধারের আশায় মরিয়া হয়ে চোর, ডাকাত অথবা তাদের অল্পবয়সী সন্তানদেরকে ধরে শুরু করলো পুরুষ সম্ভোগ।

হাসান বসরী র. বলেছেন, সদোম সম্প্রদায়ের লোকেরা এতো চরমে পৌছলো যে, তারা রমণীদেরকে কেবল বিয়েই করতো। কিন্তু কাম চরিতার্থ করতো পুরুষদের সঙ্গে। কালাবী বলেছেন, ইবলিসই সদোম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম এনেছিলো এই ঘৃণিত প্রথাটি। সদোমদের জনপদ ছিলো ফল ও ফসলে ভরা। বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকেরা সেখানে আসতো। কিন্তু সদোমবাসীরা ছিলো বড়ই সংকীর্ণচিত্ত। পথিক ও অনাথদেরকে তারা কিছুই দিতে চাইতো না। একদিন ইবলিস উঠতি বয়সের যুবকের আকৃতিতে লোভনীয় ভঙ্গিতে হাজির হলো তাদের এলাকায়। যারা তার প্রতি আকৃষ্ট হলো তাদেরকে সে ইঙ্গিত করলো তার পশ্চাৎদেশের দিকে। এভাবে তাদেরকে সে প্রথম শিক্ষা দিলো সমকাম। ধীরে ধীরে ওই ঘৃণ্য কুকর্মের মধ্যে ডুবে গেলো সকলে। পরিণাম হলো অত্যন্ত ভয়াবহ। পাথর বৃষ্টি এবং ভূমিধ্বসের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হলো সকলকে।

হযরত লূত আ.'র সম্প্রদায় বসবাস করত সাদুম, আমূরা, উমা, ছাবুবিম, বালে কিংবা সুগর নামক পাঁচটি শহরে। এসব শহরের মধ্যে সাদুমই ছিল রাজধানী। প্রত্যুষে আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিব্রাঈল আ. ওই জনপদগুলোর নিম্নে প্রবেশ করালেন তাঁর একটি ডানা। তারপর শহর সহ এর অধিবাসীদেরকে উত্তোলন করলেন অনেক উপরে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তখন ওই শহরগুলোর মোরগ ও

কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিল। গৃহবাসীরা তখন ছিল ঘুমন্ত। হযরত জিব্রাঈল আ. এমনভাবে শহরগুলোকে আকাশে উঠিয়ে নিলেন যে, কোন গৃহের তৈজসপত্রও সামান্য স্থানচ্যুত হয়নি। এমন কি পানির পাত্র থেকে একবিন্দু পানিও পড়েনি। আর গৃহবাসীদের নিদ্রাভঙ্গও হয়নি। এভাবে তিনি শহরগুলোকে উল্টিয়ে পুনরায় সজোরে নিক্ষেপ করলেন মাটিতে। শহরগুলোর মোট জনসংখ্যা ছিল পাঁচ লাখ মতান্তরে পাঁচ কোটি। অথবা প্রথমে আকাশ থেকে প্রস্তর বৃষ্টি অবতীর্ণ হয়েছিল পরে ওই জনপদগুলোকে উল্টে দেয়া হয়েছিল। এ ধরণের আযাব দেয়ার কারণ হল তাদের পাপাচারের ধরণের সাথে সাদৃশ্য রাখা। কারণ তারাও উল্টো পথে যৌনাচার করতো। সেই স্থানটিকে এখনো বলা হয় মু'তাফিকাত তথা উল্টানো জনপদ। এই জনপদটি আজো বিদ্যমান। বায়তুল মোকাদ্দাস ও জর্দান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূখণ্ডটি 'লূত সাগর' অথবা 'মৃত সাগর' নামে পরিচিত। এ ভূ-ভাগ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক নীচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ অংশ নদীর আকারে আশ্চর্য ধরণের পানি বিদ্যমান। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই এটাকে 'মৃত সাগর' বলা হয়। কথিত আছে, এটাই সাদুমের অবস্থানস্থল।

অতঃপর হযরত লূত আ. পরিবারবর্গ সহ আল্লাহর নির্দেশে সিরিয়া মতান্তরে জামার নামক স্থানে অথবা জর্দানে গিয়ে বসবাস করেন।[৩৬১]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ.

অর্থ: এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি, যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল: তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? তোমরা তো কামবশত: পুরুষদের কাছে গমণ কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ। তাঁর সম্প্রদায় এ ছাড়া কোন উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে শহর থেকে। এরা খুব সাধু থাকতে চায়। অতঃপর আমি তাকে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কিন্তু তার স্ত্রী। সে

৩৬১. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি.. তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৬. সূরা হুদ, সূরা হিজর, মাওলানা হেফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, খণ্ড ১, পৃ. ২৫৬।

তাদের মধ্যেই রয়ে গেল, যারা রয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। অতএব দেখ, গোনাহগারদের পরিণতি কেমন হয়েছে।[৩৬২]

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ . إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ . يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ . وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ . وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ . قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ . قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ . قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ . فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ . مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ . অর্থ: অতঃপর যখন ইব্রাহীম আ. এর আতঙ্ক দূর হল এবং তিনি সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি আমার সাথে তর্ক শুরু করলেন কওমে লূত সম্পর্কে। ইব্রাহীম আ. বড়ই ধৈর্যশীল, কোমল অন্তর, আল্লাহ্‌মুখী সন্দেহ নেই। ইব্রাহীম! এহেন ধারণা পরিহার কর; তোমার পালনকর্তার হুকুম এসে গেছে, এবং তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই আপতিত হবে, যা কখনো প্রতিহত হবার নয়। আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত আ. এর নিকট উপস্থিত হল, তখন তাঁদের আগমনে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন এবং তিনি বলতে লাগলেন– আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। আর তাঁর কওমের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর (গৃহ) পানে ছুটে আসতে লাগল। পূর্ব থেকেই তারা কু-কর্মে তৎপর ছিল। লূত আ. বললেন- 'হে আমার কওম, এ আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতমা। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না, তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই! তারা বলল– তুমি তো জানই, তোমার কন্যাদের নিয়ে আমাদের কোন গরজ নেই। আর আমরা কি চাই, তাও তুমি অবশ্যই জান। লূত আ. বললেন– হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম। মেহেমান ফেরেশতাগণ বলল– হে লূত আ.! আমরা

[৩৬২]. সূরা আরাফ, আয়াত: ৮০-৮৪।

তোমার পালনকর্তার পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কখনো তোমার দিকে পৌঁছতে পারবে না। ব্যস তুমি কিছুটা রাত থাকতে থাকতে নিজের লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যাও। আর তোমাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রী নিশ্চয় তার উপরও তা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। ভোর বেলাই তাদের প্রতিশ্রুতির সময়, ভোর কি খুব নিকটে নয়? অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর-পাথর বর্ষণ করলাম। যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল। আর সেই পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়।[৩৬৩]

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ . قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ . وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ . قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ . وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ . অর্থ: আর প্রেরণ করেছি লূতকে, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ? জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায় কেবল একথা বলল, আমাদের উপর আল্লাহর আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা জালেম। সে বলল, এই জনপদে তো লূতও রয়েছে। তারা বলল, সেখানে কে আছে, তা আমরা ভাল জানি। আমরা অবশ্যই তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করব তাঁর স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যখন আমার প্রেরিত

[৩৬৩]. সূরা হুদ, আয়াত: ৭৪-৮৩।

ফেরেশতাগণ লূতের কাছে আগমন করল, তখন তাদের কারণে সে বিষণ্ন হয়ে পড়ল এবং তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা বলল, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবই আপনার স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে। আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করব তাদের পাপাচারের কারণে। আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি।[৩৬৪]

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ . إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ . إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ . وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ . وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ . قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ . قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ . رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ . فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ . ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ . وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ . إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ . অর্থ: লূতের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তা দেবেন। সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।" তারা বলল, "হে লূত, তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কৃত করা হবে।" লূত বললেন, "আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি। হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর।" অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত। এরপর অন্যদেরকে নিপাত করলাম। তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। ভীতি-প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।[৩৬৫]

---

৩৬৪. সূরা আনকাবুত, আয়াত: ২৮-৩৫।

৩৬৫. সূরা শু'য়ারা, আয়াত: ১৬০-১৭৪।

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ . قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ . إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ . فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ . قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ . قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ . وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ . فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ . وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ . وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ . قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ . وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ . قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ . قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ . لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ . فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ . فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ . إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ . وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ . إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ . وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ . فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ . وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ . وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ . وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ . فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ . فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . অর্থ: তিনি বললেন: অতঃপর তোমাদের প্রধান উদ্দেশ্য কি হে আল্লাহর প্রেরিতগণ? তারা বলল: আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু লূতের পরিবার-পরিজন। আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে বাঁচিয়ে নেব। তবে তার স্ত্রী। আমরা স্থির করেছি যে, সে থেকে যাওয়াদের দলভূক্ত হবে। অতঃপর যখন প্রেরিতরা লূতের গৃহে পৌছল, তিনি বললেন: তোমরা তো অপরিচিত লোক। তারা বলল: না, বরং আমরা আপনার কাছে ঐ বস্তু নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা বিবাদ করত এবং আমরা আপনার কাছে সত্য বিষয় নিয়ে এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী। অতএব আপনি শেষরাত্রে পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে যান এবং আপনি তাদের পশ্চাদনুসরণ করবেন না এবং আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছন ফিরে না দেখে। আপনারা যেখানে আদেশ প্রাপ্ত হচ্ছেন সেখানে যান। আমি লূতকে এ বিষয় পরিজ্ঞাত করে দেই যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেয়া হবে। শহরবাসীরা আনন্দ-উল্লাস করতে করতে পৌছল। লূত বললেন: তারা আমার মেহেমান। অতএব আমাকে লাঞ্ছিত করো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার ইয্যত নষ্ট করো না। তারা বলল: আমরা কি আপনাকে জগৎদ্বাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি। তিনি বললেন: যদি তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও,

তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে। আপনার প্রাণের কসম, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল। অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচণ্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল। অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর কঙ্করের প্রস্তর বর্ষণ করলাম। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। জনপদটি সোজা পথে অবস্থিত রয়েছে। নিশ্চয় এতে ঈমানদারদের জন্যে নিদর্শন আছে। নিশ্চয় গহীন বনের অধিবাসীরা পাপী ছিল। অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। উভয় বস্তি প্রকাশ্য রাস্তার উপর অবস্থিত। নিশ্চয় হিজরের বাসিন্দারা পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। আমি তাদেরকে নিজের নিদর্শনাবলী দিয়েছি। অতঃপর তারা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর খোদাই করত। অতঃপর এক প্রত্যুষে তাদের উপর একটা শব্দ এসে আঘাত করল। তখন কোন উপকারে আসল না যা তারা উপার্জন করেছিল।[৩৬৬]

১৩. হযরত ইউসুফ আ.

নাম ও বংশ ঃ ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আ.। মাতার নাম রাহীল বিনতে লাবান। তার সহোদর ছোট ভাই হলেন বিনআমীন। তারা মোট বার ভাই। বাকী দশজন বৈমাত্রীয় ভাই। হযরত ইয়াকুব আ. বার সন্তানের মধ্যে হযরত ইউসুফে আ. কে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসতেন। তিনি খুবই সুন্দর ছিলেন ও মার্জিত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফ আ.'র আলোচনা ২৬ জায়গায় এসেছে। তম্মধ্যে কেবল সূরা ইউসুফে এসেছে ২৪ বার আর সূরা আনআমে ও সূরা গাফের এ এসেছে একবার করে। তাঁর দাদা হযরত ইব্রাহীম আ.'র ন্যায় তাঁর নামেও পবিত্র কুরআনে একটি সূরার নামকরণ হয়েছে। এ সূরায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে তাঁর জীবন সম্পর্কীয় বর্ণিত ঘটনাকে "احسن القصص" তথা উত্তম কাহিনী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ এ কাহিনীতে যে পরিমাণ উপদেশ, হেকমত, ওয়ায-নসীহত বিদ্যমান অন্য কোন কাহিনীতে এত বেশী পরিলক্ষিত হয় না। এতে জীবনের উত্থান-পতন, কৃতদাস থেকে বাদশা ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিতভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ আ.'র ছোট ভাই বিনআমীন জন্মের পর তাঁর মা রাহীল ইন্তেকাল করেছেন। এসময় হযরত ইউসুফ আ.'র বয়স

[৩৬৬] সূরা হিজর, আয়াত: ৫৭-৮৪।

হয়েছিল পাঁচ বছর। বিনআমীনকে তাঁর খালা ও বড় মা লাইয়্যা লালন-পালন করেন। ইয়াকুব আ.'র এক বোন ছিল। একদা তিনি তার সব ভাতিজাদেরকে দেখলেন কিন্তু কারো প্রতি মন বসল না। তবে হযরত ইউসুফ আ.কে দেখে তিনি তাঁর প্রতি আসক্তি হলেন আর ভাইকে বললেন– তোমার অনেক সন্তান কিন্তু স্ত্রী একজন। তার একার পক্ষে এত সন্তানের সেবা-যত্ন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। ইউসুফকে আমাকে দিয়ে দাও। আমি তাঁর সেবা-যত্ন এবং লালন পালন করব। বোনের আবদার রক্ষার্থে ইয়াকুব আ. হযরত ইউসুফ আ.কে বোনের কাছে সোপর্দ করলেন। বোন ভাতিজাকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং অতি আদর যত্ন সহকারে লালন পালন করতে লাগলেন। কিন্তু ইয়াকুব আ. প্রতি মুহূর্তে পুত্রের স্মরণে ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং প্রায় বোনের ঘরে হযরত ইউসুফ আ. কে দেখে আসতেন। এভাবে দিন দিন তাঁর মনে ইউসুফ আ.'র ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন তিনি বোনকে বললেন, আমি হযরত ইউসুফ আ. কে না দেখে এক মুহূর্তেও থাকতে পারিনা। তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তখন বোন বলল, আমিও তো তাকে না দেখে থাকতে পারি না। অতঃপর ইয়াকুব আ. বললেন, তাহলে হযরত ইউসুফ আ. এক সপ্তাহ তোমার কাছে থাকবে এবং এক সপ্তাহ আমার কাছে থাকবে। বোন বলল, তাহলে প্রথম সপ্তাহ আমার কাছেই থাকুক। ইয়াকুব আ. তা মেনে নিলেন।

উল্লেখ্য যে হযরত ইব্রাহীম আ.'র একটি কোমরবন্দ ছিল। হযরত ইয়াকুব আ.'র এই বড় বোন সেই কোমরবন্দটি দাদার মিরাস হিসাবে পেয়েছিলেন। আর এই কোমরবন্দ দিয়েই হযরত ইব্রাহীম আ. কুরবানীর সময় হযরত ইসমাইল আ.'র হাত-পা বেধেছিলেন।

হযরত ইউসুফ আ. সাতদিন ফুফীর কাছে থাকার পর বাকী সাতদিনের জন্য যখন ইয়াকুব আ.কে নিতে পাঠালেন তখন বোন তাকে না দেয়ার জন্য একটি উপায় বের করলেন। তিনি কোমরবন্দটি হযরত ইউসুফ আ.'র কাপড়ের নীচে বেঁধে দিলেন যাতে করে হযরত ইউসুফ আ.কে চোর সাব্যস্ত করার বাহানা করে নিজ ঘরে নিয়ে আসতে পারেন। যখন ইয়াকুব আ. হযরত ইউসুফ আ.কে নিয়ে গেলেন তখন বোন এসে বললেন, আমার পূর্বপুরুষের সেই কোমরবন্দটি খুঁজে পাচ্ছিনা। নিশ্চয় ইউসুফের সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে কেউ চুরি করেছে। সবাইকে তুমি উপস্থিত কর, আমি তালাশ করব। মিথ্যা মিথ্যা সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অবশেষে হযরত ইউসুফ আ.'র কাছে গিয়ে কোমরবন্দটি পেলেন আর বললেন- হযরত ইউসুফ আ. আমার নিকট অপরাধী। শাস্তি স্বরূপ সে আমার নিকট দশ বছর বন্দী থাকবে আর আমার সেবা করবে। অতঃপর

ইয়াকুব আ. মর্মাহত হয়ে হযরত ইউসুফ আ.কে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন বোনকে। দুই বছর পর বোনের মৃত্যু হলে ইয়াকুব আ. হযরত ইউসুফ আ.কে নিজের কাছে নিয়ে আসলেন।[৩৬৭]

হযরত ইউসুফ আ.'র স্বপ্নঃ

হযরত ইয়াকুব আ. তাঁর অন্যান্য পুত্রদের মধ্যে হযরত ইউসুফ আ.কে অধিক ভালোবাসতেন। অন্যান্য দশজন সৎ ভাইয়েরা তা সহ্য করতে পারছিল না। তারা সর্বদা চেষ্টায় থাকত যে, যে কোনো ভাবে হোক ইয়াকুব আ.'র অন্তর থেকে হযরত ইউসুফ আ.'র ভালোবাসা দূরীভূত করতে হবে অথবা হযরত ইউসুফ আ. কে সরিয়ে দিতে হবে।

ইতিমধ্যে একদা কদর এবং জুমার রাতে হযরত ইউসুফ আ. স্বপ্ন দেখলেন যে, এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রসহ তাকে সিজদা করতেছে। এই স্বপ্নের কথা পিতাকে বললে, পিতা বললেন হে প্রিয় বৎস! এই স্বপ্নের কথা তুমি তোমার অপরাপর ভাইদের কাছে বর্ণনা করিওনা। কারণ তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

ইবনে আব্বাস রা.'র মতে এই এগারটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে– হযরত ইউসুফ আ.'র এগার ভাই আর সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ হচ্ছে তাঁর পিতা ও মাতা। তবে যেহেতু অনেক পূর্বেই তাঁর আপন মাতা ইন্তেকাল করেছিলেন এবং তাঁর খালা লাইয়্যা তাঁর পিতার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাছাড়া খালা মায়ের মতোই হয়। তাই এখানে মাতা বলতে খালা লাইয়্যাই উদ্দেশ্য।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

যখন ইউসুফ পিতাকে বলল: পিতা! আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে। সূর্যকে এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশে সেজদা করতে দেখেছি। তিনি বললেনঃ বৎস! তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

[৩৬৭]. মৌলভী গোলাম নবী, খোলাসাতুল আম্বীয়া, উর্দু, পৃ. ৯৬-৯৭

এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুব পরিবার-পরিজনের প্রতি, যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।[৩৬৮]

উপরোক্ত ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউসুফ আ.কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত দানের ওয়াদা করেছেন। ১. আল্লাহ তাঁকে অনুগ্রহ রাজীর জন্য মনোনীত করবেন। যেমন– মিশরের বাদশাহ, সম্মান, ধন-দৌলত ইত্যাদি দান করবেন। ২. আল্লাহ তাঁকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জ্ঞান শিক্ষা দেবেন, ৩. তাঁর উপর নিয়ামত পূর্ণ করবেন অর্থাৎ নবুয়ত দান করবেন।

বৈমাত্রীয় ভাইদের হিংসা ও নির্যাতনের কাহিনীঃ

এ সূরার ৮নং আয়াত থেকে এ কাহিনী আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ আ.'র ভাইয়েরা দেখল যে, পিতা ইয়াকুব আ. হযরত ইউসুফ আ.কেই সর্বাপেক্ষা অসাধারণ মহব্বত করেন। ফলে তাদের মধ্যে হিংসার উদ্রেক হল। এটাও হতে পারে যে, কোন প্রকারে হযরত ইউসুফ আ.'র স্বপ্নের খবরও তারা পেয়েছিল। এতে হযরত ইউসুফ আ.'র বিরাট মাহাত্মের কথা বুঝতে পেরে তাঁর প্রতি তাদের হিংসার- মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেল। তারা বলাবলি করল যে, আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের চেয়ে ইউসুফ ও বেনিয়ামিনকে অধিক ভালোবাসেন। অথচ আমরা দশজন এবং তাদের বড় হওয়ার কারণে ঘরের কাজকর্ম করতে আমরাই সক্ষম। তারা উভয়ই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থলীর কাজকর্ম করতে অক্ষম। আমাদের পিতার উচিত যে, বিষয়টি অনুধাবন করে তাদের চেয়ে আমাদেরকে বেশী ভালবাসা। এটি নিশ্চয় অন্যায়। তাই এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হয়তো হযরত ইউসুফ আ.কে হত্যা করতে হবে নয়তো এমন দূরদেশে নির্বাসিত করতে হবে যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে পারবে না।

হযরত ইউসুফ আ.'র ভাইয়েরা নির্জনে গোপনে পরামর্শ করল কী এমন করা যায় যাতে কার্য সিদ্ধি হবে আমরাও নির্দোষ প্রমাণিত হবো। তাদের মধ্যে কেউ বলল, ইউসুফকে হত্যা করা হোক। কেউ বলল তাঁকে কোন গভীর অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করা হোক, যাতে এই কন্টক দূর হয়ে যায় আর পিতার ভালবাসায় আমরাও অংশীদার হবো। কার্য সিদ্ধি হলে তাওবা করে কিংবা দোষ

[৩৬৮]. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৪-৬।

স্বীকার করে পাপ মুক্ত হয়ে যাবো। ভাইদের মধ্যে বড় ভাই রুবীল কিংবা ইয়াহুদা হত্যার বিরোধীতা করল বরং গভীর কূপে নিক্ষেপের পক্ষে মত দিল। সে বলল, তাঁকে কোন গভীর কূপে নিক্ষেপ কর যাতে কোন পথিক কূপে পানি নিতে আসবে, তখন তাঁকে দেখলে তুলে নিয়ে যাবে।

পরামর্শ মতে ভাইয়েরা সকলে পিতার নিকট গিয়ে আবেদন করল, হে পিতা! আপনি ইউসুফ'র ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না। অথচ আমরা তার পুরোপুরি হিতকাঙ্খী। আগামী কাল সকালে আপনি তাঁকে আমাদের সাথে আনন্দ ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন যাতে সে স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলা করতে পারে। আমরা তাঁকে হেফাযতে রাখবো।

ইয়াকুব আ. সন্তানদের আবেদন শুনে বললেন, তোমরা তাঁকে নিয়ে গেলে আমি ঘরে একাকী হয়ে যাব। দ্বিতীয়ত আশঙ্খা করছি যে, জঙ্গলে তোমাদের অসাবধানতার মুহূর্তে তাঁকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে।

হযরত ইয়াকুব আ.'র অন্তরে বাঘের আক্রমণের আশঙ্খার কারণ হল- কেনানে বাঘের বিস্তর প্রাদুর্ভাব ছিল। অথবা ইয়াকুব আ. স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি পাহাড়ের চূড়ায় আছেন। নীচে পাহাড়ের পাদদেশে হযরত ইউসুফ আ.। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাঁকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু একটি ভাগ এগিয়ে এসে তাঁকে মুক্ত করে দেয়। অত:পর হযরত ইউসুফ আ. মাটির সরু গর্তে আত্মগোপন করেন। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা ওলামায়ে কিরাম এভাবে করেছেন যে, দশটি বাঘ ছিল তাঁর দশজন ভাই আর যে বাঘটি এগিয়ে এসে তাঁকে রক্ষা করল সে হল তার বড় ভাই রুবীল কিংবা ইয়াহুদা। মাটির গর্তে আত্মগোপন করার অর্থ হল অন্ধকার কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, এই স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইয়াকুব আ. স্বয়ং এ ভাইদের পক্ষ থেকেই আশঙ্খা করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ওদের কাছে এই কথা ব্যক্ত করেন নি।

অবশেষে সন্তানদের পীড়াপীড়ির কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি হযরত ইউসুফ আ.কে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন তবে রুবীল কিংবা ইয়াহুদা থেকে অঙ্গীকার নিলেন, যাতে হযরত ইউসুফ আ.'র কোন কষ্ট না হয়। তারাও তাঁকে অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি হযরত ইউসুফ আ.কে তাদের হাতে সোপর্দ করলেন। ভ্রাতারা পিতার সামনে হযরত ইউসুফ আ.কে আদর করে, চুমু খেয়ে কাঁধে তুলে নিল এবং পালাক্রমে সবাই কাঁধে উঠাতে লাগল। হযরত ইয়াকুব আ. তাদেরকে বিদায় দেয়ার জন্য কিছু দূর পর্যন্ত গেলেন তারপর ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফিরে আসলেন।

তারা যখন হযরত ইয়াকুব আ.'র দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল তখন হযরত ইউসুফ আ. যে ভাইয়ের কাঁধে ছিলেন সে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিল। তখন তিনি পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে দৌড়াতে অক্ষম হয়ে অন্য এক ভাইয়ের আশ্রয় নিলেন। সে তাঁকে সহানুভূতির পরিবর্তে মারতে লাগল। এভাবে সব ভাইয়ের কাছে সহানুভূতি চাইলেন কিন্তু সবাই কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেছে আর বলছে তুই যে এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র সূর্যকে সিজদা করতে দেখেছিস তাদেরকে ডাক দে তারাই তোকে সাহায্য করবে। অবশেষে হযরত ইউসুফ আ. ইয়াহুদার কাছে গিয়ে বললেন, আপনিই বড়, আমার দুর্বলতা ও অল্প বয়স্কতা এবং পিতার মনোকষ্টের কথা চিন্তা করে আমার প্রতি দয়াদ্র হোন। আপনি ঐ অঙ্গীকার স্মরণ করুন, যা পিতার সাথে করেছিলেন। এ কথা শুনে ইয়াহুদার মনে দয়ার সঞ্চার হল এবং তাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিল। ইয়াহুদা অন্যান্য ভাইদেরকে বলল নিরাপরাধকে হত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহকে ভয় কর এবং ইউসুফকে পিতার নিকট নিয়ে চল। তবে তাঁর কাছ থেকে অঙ্গীকার নাও যেন পিতার কাছে কোন অভিযোগ না করে। ভাইয়েরা বলল, তুমি পিতার কাছে তোমার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এরূপ করতে চাও। আমরা তা হতে দেবো না। তুমি যদি আমাদের কাজে বাধা দাও তবে আমরা তোমাকেও হত্যা করব। ইয়াহুদা নিরুপায় হয়ে প্রস্তাব দিল- যদি তোমরা তাঁকে নিপাত করতে চাও, তবে আমার পরামর্শ শোন। নিকটেই একটি প্রাচীন গভীর কূপ আছে। এতে অনেক ঝোপ জঙ্গল গজিয়েছে। সেখানে সাপ, বিচ্ছু ও হরেক রকমের বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ বাস করে। তাঁকে সেখানে ফেলে দাও। কোন বিষাক্ত সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি দংশন করে তাঁকে শেষ করে দিলে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং নিজ হাতে হত্যার কলংক থেকেও মুক্তি পাবে। অগত্য যদি জীবিতও থাকে তাতেও ক্ষতি নেই। কারণ কোন পথিকদল পানির খোঁজে কূপে এসে তাঁকে পেলে কোথাও দূরদেশে নিয়ে যাবে।[৩৬৯]

এই কূপটি ছিল হযরত ইয়াকুব আ.'র বাসস্থান থেকে ৬ মাইল দূরে। কূপটির মুখ ছিল সরু তবে ভিতরের অংশ ছিল প্রশস্ত।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ . إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ . قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ

[৩৬৯]. তাফসীরে রুহুল মাআনী, খণ্ড-১১-১২, পৃ. ১৯৭, সূত্রঃ জামে কাসাসুল আম্বীয়া, পৃ. ৩০৩।

فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ . قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ . أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ . قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ . قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ . অবশ্য ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। যখন তারা বলল: অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত শক্তিবিশেষ। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন। হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধকূপে যাতে কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়। তারা বলল: পিতা:! ব্যাপার কি, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? আমরা তো তার হিতাকাংখী। আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন- তৃপ্তিসহ খাবে এবং খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। তিনি বললেন: আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি যে, ব্যাঘ্র তাঁকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তার দিক থেকে গাফেল থাকবে। তারা বলল, আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি ব্যাঘ্র তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমরা সবই হারালাম।[৩৭০]

কূপে নিক্ষেপ করার কাহিনী:

হযরত ইউসুফ আ.'র ভাইয়েরা যখন তাকে গভীর অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করতে ঐকমত্যে পৌছল, তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউসুফ আ.কে ওহী কিংবা ইলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, তুমি ধ্বংস হওয়া থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমন একদিন আসবে যেদিন তুমি তাদেরকে ওদের ষড়যন্ত্রের তিরষ্কার করার সুযোগ পাবে; অথচ তারা তোমাকে চিনতেও পারবে না।

অত:পর সিদ্ধান্ত মতে ভাইয়েরা হযরত ইউসুফ আ.কে রশি দিয়ে হাত পা বেঁধে গায়ের জামা খুলে একটি বালতিতে রেখে কূপে নিক্ষেপ করতে লাগল। তখনো হযরত ইউসুফ আ. কূপের প্রাচীর জড়িয়ে ধরে তাদের কাছে দয়ার ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু তখনো সেই একই উত্তর পাওয়া গেল। বলল, যে এগারটি নক্ষত্র তোকে সিজদা করছিল তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোমার সাহায্য করবে।

[৩৭০]. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৭-১৪।

বালতির রশি ছিল ইয়াহুদার হাতে। সে ধীরে ধীরে হাত থেকে রশি ছাড়ছিল আর হযরত ইউসুফ আ. অন্ধকার কূপের নীচের দিকে যাচ্ছিলেন। কূপের মাঝখানে পর্যন্ত পৌছার পর বড় ভাই শামউন এসে দ্রুত পতিত হয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য রশি কেটে দিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কুদরতি ভাবে হযরত ইউসুফ আ.কে রক্ষা করলেন। কথায় আছে- রাখে আল্লাহ মারে কে? আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাইল আ.কে প্রেরণ করলেন। তিনি কূপের পানির উপর একটি প্রস্তর খণ্ড বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে হেফাযত করলেন।

হযরত ইউসুফ আ. কূপে তিনদিন অবস্থান করলেন। ইয়াহুদা প্রত্যেহ গোপনে তার জন্যে কিছু খাদ্য আনত এবং বালতির সাহায্যে তাঁর কাছে পৌছে দিত।

হযরত ইউসুফ আ.কে কূপে নিক্ষেপ করার পর ভাইয়েরা পরামর্শ করল, বলল, এখন তো পথের কাটা দূর হয়েছে কিন্তু পিতাকে কি জবাব দেব? তারা ছাগল পাল থেকে একটি ছাগল যবেহ করে এর রক্ত জামায় লাগিয়ে নিল। অত:পর সন্ধ্যা বেলায় তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় পিতার নিকট পৌছল। ইয়াকুব আ. ক্রন্দনের শব্দ শুনে বাইরে এলেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে-তিনি হযরত ইউসুফ আ.'র অপেক্ষায় অধীর হয়ে পথে বসে রইলেন। পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? তোমাদের ছাগপালের উপর কেউ আক্রমণ করেনি তো? ইউসুফ কোথায়? তখন ভাইয়েরা বলল- হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম আর ইউসুফকে আসবাবপত্রের কাছে রেখে দিলাম। ইত্যবসরে একটি বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। তাই আমরা তাঁর রক্তমাখা জামা আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের মিথ্যা ফাঁস করে দেয়ার জন্যে তাদেরকে একটি জরুরী বিষয় থেকে গাফেল করে দিয়েছেন। যদি তারা রক্ত মাখা জামাটিকে চিড়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিত, তবে কথাটি বিশ্বাসযোগ্য হত। কিন্তু তারা অক্ষত অবস্থায় দিয়ে পিতাকে ধোকা দিতে চাইল। ইয়াকুব আ. বললেন, বাবারা! এটি কেমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান বাঘ ছিল যে, ইউসুফকে তো খেয়েছে কিন্তু জামার কোন অংশ ছিন্ন হতে দেয়নি। এভাবে পিতার কাছে তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছিল- তিনি বলেন- قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ইউসুফকে বাঘে খায়নি বরং তোমাদেরই মন একটি বিষয় দাড় করেছে। এখন আমার জন্য উত্তম হল ধৈর্য্য ধারণ করি এবং তোমরা যা বল তাতে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি।

হযরত ইউসুফ আ.'র জামাও অনেক বিস্ময়কর বিষয়াদির স্মারক হয়ে রয়েছে। তিনটি বিরাট ঘটনা এ জামার সাথেই জড়িত রয়েছে। এক. রক্ত রঞ্জিত

করে পিতাকে ধোকা দেয়া এবং অক্ষত জামার দ্বারাই তাদের মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া। দুই. যুলায়খার ঘটনা। এতে হযরত ইউসুফ আ.'র জামাটিই তাঁকে নির্দোষ প্রমাণে সহায়ক হয়েছে। তিন. ইয়াকুব আ.'র দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার ঘটনা। এতেও তাঁর জামাটিই মুজিযার প্রতীক প্রমানিত হয়েছে।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, ইয়াকুব আ. বললেন, আচ্ছা, তোমরা যদি সত্যবাদি হও, তবে সেই বাঘটিকে ধরে নিয়ে এসো, যে ইউসুফকে খেয়েছে। তারা জঙ্গলে গিয়ে একটি ক্ষুধার্ত বাঘ ধরে মুখে ছাগলের রক্ত মেখে পিতার কাছে নিয়ে আসল। ইয়াকুব আ. বাঘকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে বাঘ! তুমি আমার কলিজার টুকরা নয়নের মণি ইউসুফকে খেয়েছ অথচ আমি বৃদ্ধ পিতার প্রতি ও আমার ছোট সন্তানদের প্রতি এতটুকুও দয়া করলে না? আল্লাহর হুকুমে বাঘের মুখে বুলি ফুটল। সে বলল হে আল্লাহর নবী! আল্লাহর শপথ করে বলছি– আমি আপনপার ইউসুফ কে খাইনি। কেননা কোন নবী, অলী ও ভ্রমণকারীর গোশত খাওয়া আমাদের উপর হারাম। হে হযরত! আমি এক মুছিবত ও কষ্ট নিয়ে আছি। আমারও একভাই ছিল। কিছুদিন পূর্বে সে আমার থেকে পৃথক হয়ে কোথাও চলে গেছে। আমি তার খোঁজে বের হয়েছি। নিজের এলাকা থেকে অসহায় হয়ে আজ তিন দিন তিন রাত অতিক্রম হয়েছে অথচ কোন খানা পিনা খাইনি। ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় ভাইয়ের খোঁজে ভীত হয়ে তিন ফরসখ রাস্তা অতিক্রম করে এই জঙ্গলে এসে পৌঁছেছি। সকালে আপনার ছেলেরা আমাকে ধরে আমার মুখে ছাগলের রক্ত মেখে আমাকে আপনার সামনে উপস্থিত করেছে। ছোগলখোরী যদি মন্দ কাজ তবুও নিজের নির্দোষ প্রমাণের জন্য এবং আপনার পয়গাম্বরীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সত্য কথাটি বলে দিলাম। ইয়াকুব আ. বুঝে গেলেন যে, বাঘে সত্য বলেছে। তাই তিনি ক্ষুধার্ত বাঘকে খানা খাওয়ায়ে বিদায় দিলেন আর সন্তানদেরকে বললেন, আমি ইউসুফকে আল্লাহকে সোপর্দ করলাম আর আমি ধৈর্য্য ধারণ করব।

হযরত ইয়াকুব আ. থেকে হযরত ইউসুফ আ.কে পৃথক করার কারণ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত ইয়াকুব আ. কারো জন্য যিয়াফতের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সময় একজন ক্ষুধার্ত ফকীর তাঁর দরজায় এসে খাবারের আবেদন জানাল। তিনি ফকীরকে বসে অপেক্ষা করতে বলে এবং খাবার মজুদ আছে বলে তিনি অন্য কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। ফকীরকে খাবার দেবার কথা ভুলে গেলেন। ফকীর অনেক্ষণ অপেক্ষা করার পর এই প্রার্থনা করে চলে গেল যে, হে আল্লাহ! তাঁর আকাঙ্খাকেও তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দিন। আল্লাহ তায়ালা ফকীরের দোয়া কবুল করলেন। যদি তিনি ফকীরকে খাবার খাওয়াতেন

তবে এর শক্তি ফকীরের মধ্যে চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকত এবং সেই শক্তি দিয়ে সে আল্লাহর ইবাদত করত। আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম হল যে, এই চল্লিশ দিনের পরিবর্তে তোমার চল্লিশ বছর পুত্রহারা বেদনা সহ্য করতে হবে। তখন তিনি আবেদন করলেন হে আল্লাহ! আপনি রহীম ও করীম। আপনি অদৃশ্যের সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত। যে ভুল আমার হয়েছে তা ভুলক্রমে হয়েছে ইচ্ছাকৃত হয়নি। তখন হযরত জিব্রাইল আ. এসে বললেন- হে ইয়াকুব! আপনার যে দুঃখ কষ্ট হচ্ছে তা ভুলের জন্যেই হচ্ছে নতুবা ইচ্ছাকৃত হলে আরো কঠিন দুঃখ সহ্য করতে হত।

বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত ইউসুফ আ.'র ভাইয়েরা তার শরীর থেকে জামা খুলে নিয়ে কূপে নিক্ষেপ করল, তখন আল্লাহর আদেশে জিব্রাইল আ. জান্নাতী রেশমী জামা এনে তাঁকে পরিধান করে দিয়েছিলেন। এটি হযরত ইব্রাহীম আ.'র ছিল, যার বরকতে নমরূদের আগুন বাগিছা হয়েছিল। এটি হযরত ইয়াকুব আ. পিতার মীরাস হিসাবে পেয়েছিলেন। তা ছাড়া ইয়াকুব আ.হযরত ইউসুফ আ. কে ভাইদের সাথে বিদায় দেয়ার সময় জান্নাতী একটি তাবীজ তাঁর গলায় বেঁধে দিয়েছিলেন। হযরত জিব্রাইল আ. এসে কূপের ভিতর হযরত ইউসুফ আ. কে পরিধান করে দিয়েছিলেন।

হযরত ইউসুফ আ. কে কূপে নিক্ষেপ করার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মতান্তরে ১৮, ১৭ ও ১২ বছর। এ কূপে তিনি তিনদিন তিনরাত ছিলেন।

ঘটনাচক্রে আল্লাহর ইচ্ছায় একটি কাফেলা এ স্থানে পৌছে যায়। এ কাফেলা সিরিয়া থেকে মিশর যাচ্ছিল। পথ ভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হল। মূলত আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে পথ ভুলিয়ে হযরত ইউসুফ আ.কে উদ্ধার করার জন্য নিয়ে এসেছেন। কাফেলার লোকেরা পানি খোঁজার জন্য লোক পাঠালেন। মালেক ইবনে দোবর নামক এক ব্যক্তি এই কূপে পৌছলেন এবং পানি তোলার জন্য কূপে বালতি নিক্ষেপ করলেন। হযরত ইউসুফ আ. শক্ত করে বালতির রশি ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি সমুজ্জল মুখমণ্ডল দেখতে পেয়ে তিনি উল্লাসে চীৎকার করে বললেন يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ আরে আনন্দের সংবাদ, এতো এক অপূর্ব সুন্দর এক কিশোর।

এ কূপের পানি লবণাক্ত। কিন্তু হযরত ইউসুফ আ.'র বরকতে পানি মিষ্টি হয়ে গিয়েছিল। হযরত ইউসুফ আ.'র সৌন্দর্য সম্পর্কে সহীহ মুসলিম শরীফের হাদিসে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, মিরাজ রজনীতে আমি হযরত ইউসুফ আ.'র সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বিশ্বের রূপ সৌন্দর্যের

অর্ধেক দান করেছেন ইউসুফকে আর বাকী অর্ধেক সমগ্র বিশ্বে বন্টন করা হয়েছে।

কাফেলার লোকেরা হযরত ইউসুফ আ.কে মূল্যবান পণ্য দ্রব্য মনে করে গোপন করে ফেলল। অথবা হযরত ইউসুফ আ.'র ভাইয়েরা বাস্তব ঘটনা গোপন করে তাঁকে পণ্য দ্রব্য বানিয়ে নিল। যেমন কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, বড় ভাই ইয়াহুদা প্রত্যেহ গোপনে হযরত ইউসুফ আ.'র জন্য কূপে খাবার নিয়ে আসত। তৃতীয় দিন তাঁকে কূপের মধ্যে না পেয়ে সে ফিরে গিয়ে ভাইদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করল। অত:পর সবাই একত্রে দ্রুত সেখানে পৌছে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে কাফেলার লোকদের মধ্যে পাওয়া গেল। তখন তারা বলল এই ছেলেটি আমাদের গোলাম। পলায়ন করে সে এখানে এসেছে। একথা শুনে মালেক ইবনে দোবর এবং তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে গেল যে, হয়তো তাদের চোর সাব্যস্ত করা হবে। তাই ভাইদের সাথে হযরত ইউসুফ আ.কে ক্রয় করার প্রস্তাব দিল। হযরত ইউসুফ আ. সত্য কথা বলতে চাইলে বড় ভাই শামউন এসে ইব্রানী ভাষায় বলল, যদি তুই সত্য কথা ফাঁস করে দিস তবে তোকে জানে মেরে ফেলব। ভয়ে তিনি আর মুখ খুলেন নি।

অত:পর হযরত ইউসুফ আ.'র ভাইয়েরা তাঁকে অল্পমূল্যে কাফেলার নিকট গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দিল। ইবনে মসউদ রা.'র মতে বিশ দিরহাম মূল্যে তারা তাঁকে বিক্রি করেছিল এবং দশ ভাই দুই দিরহাম করে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিয়েছিল কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে তারা তাঁকে আঠার দিরহাম দিয়ে বিক্রি করেছিল জনপ্রতি দুই দিরহাম ভাগ করে নিয়েছিল কিন্তু একজনে কোন দিরহাম নেয়নি।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ . وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ . قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ . وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ . وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ .

অত:পর তারা যখন তাকে নিয়ে চলল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল এবং আমি তাকে ইঙ্গিত করলাম যে, তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা বলবে এমতাবস্থায় যে, তারা তোমাকে চিনবে

না। তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল। তারা বলল: পিতা: আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাব-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। অত:পর তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। বললেন: এটা কখনই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন ছবর করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্য স্থল। এবং একটি কাফেলা এল। অত:পর তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল। সে বালতি ফেলল। বলল: কি আন্দের কথা। এ তো একটি কিশোর! তারা তাকে পণ্যদ্রব্য গণ্য করে গোপন করে ফেলল। আল্লাহ্ খুব জানেন যা কিছু তারা করেছিল।[৩৭১]

হযরত ইউসুফ আ. গোলাম হওয়ার কারণ:

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত ইউসুফ আ. আয়নায় নিজের সৌন্দর্য দেখে গর্ব করে বলেছিলেন যে, যদি আমি গোলাম হতাম তবে কেউ আমার মূল্য দিতে সক্ষম হত না। তাঁর সৌন্দর্যের রূপ এমন ছিল যে, কোন কিছু খাওয়ার সময় তা গলায় দেখা যেত। যখন নিজের সৌন্দর্যের প্রতি অহংকারী হয়ে মনে মনে এরূপ কল্পনা করলেন, তখন তা মহান আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় হল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অসন্তোষ জনক আওয়ায আসল– হে ইউসুফ! নিজের সৌন্দর্য দেখে অহংকারী হয়ে নিজেই নিজের মূল্য নির্ধারণ করছ অথচ একবারও এই সৌন্দর্য্য প্রদানকারীর প্রতি লক্ষ্য করনি এবং তাঁর শোকর করনি। এখন দেখ কীভাবে আমি তোমাকে গোলাম বানাব আর কত নিম্ন মূল্যে তোমার ক্রয় বিক্রয় হবে।

হযরত ইউসুফ আ. মিশরের বাজারে:

হযরত ইউসুফ আ.'র ভাইয়েরা তাঁকে এত অল্প মূল্যে বিক্রির কারণ হল তারা এই মহাপুরুষের সঠিক মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। অথবা তাঁকে বিক্রি করে টাকা পয়সা অর্জন করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল পিতার কাছ থেকে যে কোনভাবে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। তাই তারা কেবল বিক্রি করে দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা আশঙ্কা করেছিল যে, কাফেলার লোকেরা তাঁর কাকুতি মিনতি দেখে সেখানে তাঁকে ছেড়ে যায় কিনা। তাই তারা কাফেলার পিছে পিছে এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল। তাছাড়া বিক্রি করে কাফেলার হাতে তুলে দেয়ার সময়

[৩৭১]. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১৫-১৯।

বলেছিল যে, এ গোলামটি বড়ই অবাধ্য ও পলায়নপর স্বভাবের। তোমরা একে রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাও, আর ভুলেও কখনো পায়ের বেড়ী খুলে দিওনা, তাহলে সে দ্রুত পলায়ন করবে। অতএব এ অমূল্য নিধির মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ কাফেলার লোকেরা তাঁকে এমনিভাবে বেঁধে মিশরে নিয়ে গেল।

অতঃপর কাফেলার সর্দার মালেক ইবনে যা'য এমন এক ইবরানী অদ্বিতীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত গোলাম নিয়ে যখন মিশরে প্রবেশ করল মুহূর্তের মধ্যে এই সংবাদ মিশরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং মিশরের সওদাগররা স্বাগতম জানাতে এসে হযরত ইউসুফ আ.কে দেখে মোহিত হয়ে পড়ল। মালেক ইবনে যা'য নিজের ঘরকে সুন্দর করে সাজাল এবং হযরত ইউসুফ আ. কে দামী পোশাক এবং মাথায় স্বর্ণের তাজ পরায়ে শহরে ঘোষণা করে দিল যে, অতি সুন্দর একজন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, অনুগত, লজ্জাশীল গোলাম বিক্রি করা হবে। কোন ক্রয় ইচ্ছুক ক্রেতা থাকলে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হবেন। এই ঘোষণা শুনে মিশরবাসী ছোট বড়, ধনী গরীব, সক্ষম-অক্ষম সবাই মালেকের ঘরে একত্রিত হয়ে গেল এবং তারা যা শুনেছে, যা মনে মনে ভেবেছে, হযরত ইউসুফ আ.কে তার চেয়ে শত সহস্রগুণ বেশী সুন্দর দেখতে পেল। তখন ক্রেতারা তাঁর মূল্য নির্ধারণে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দিল। ক্রেতারা চড়া মূল্যে তাঁকে কিনার আগ্রহ দেখে তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, এই মালেক ইবনে যা'য আমার বিক্রির ব্যাপারে ভুল করতেছে। সে দিন আমার বৈমাত্রীয় ভাইয়েরা আমার সম্পর্কে সব কিছু জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ৯ দিরহাম মূল্য নিয়েছিল আর আজ এদেশে আমাকে কেউ চেনেনা, জানেনা। এখানে ৫০ দিরহাম মূল্য হলেও বেশী হয়। সুতরাং ৫০ দিরহাম দিয়ে আমাকে বিক্রি করছেনা কেন? পূর্বে আয়না দেখে অহংকারী মূলক কথা বলাতে তাঁর এই পরিণতি। তাই তিনি এবার নিজেকে তুচ্ছ ও বিনয়ী প্রদর্শন করে এরূপ বলেছেন। আর ৯ দিরহাম বলার কারণ হল– তৎকালে মিশরী দুই টাকা সমান ছিল কেনানের এক টাকা। যেহেতু ভাইয়ের আঠার টাকায় বিক্রি করেছিল আর তা কেনানী টাকায় হচ্ছে নয় টাকা। হযরত ইউসুফ আ. যখন বিনয়ীমূলক কথা বললেন, তখন আল্লাহ তায়ালা ইলহাম করে বললেন, হে ইউসুফ! সে দিন তুমি আয়নায় মুখ দেখে সুন্দরের অহংকার করে নিজের মূল্য নিজেই বৃদ্ধি করেছ। আর আজ নিজের অক্ষমতা ও বিনয়ী প্রদর্শন করে নিজের মূল্য একেবারে কমিয়ে ফেলেছ। এই বিনয়ের কারণে এখন তোমার উপর আল্লাহর দয়া হয়েছে। এখন দেখ তোমার মূল্য কত বেশী হয়।

মালেক ইবনে যা'য হযরত ইউসুফ আ.কে অতি মূল্যবান পোশাক পরিধান করায়ে আসনে বসায়ে বলল– مَنْ يَشْتَرِى غُلَامًا حَسِيْنًا لَطِيْفًا ظَرِفًا لَيْس مِثْلُهُ فِى

الدُّنْيَا "এমন গোলামকে কে কিনবে যেটি সুন্দর, ভদ্র, বিচক্ষণ– পৃথিবীতে এর কোন তুলনা নেই"। হযরত ইউসুফ আ. বললেন, এরূপ বলবেন না বরং এরূপ বলুন– مَنْ يَشْتَرِىْ ضَعِيْفًا غَرِيْبًا مَظْلُوْمًا لَيْسَ مِثْلُهُ فِى الدُّنْيَا এমন দুর্বল, গরীব, মযলুম গোলামকে কে কিনবে যে নিঃস্ব হওয়ার দিক দিয়ে পৃথিবীতে বিরল। তখন দালালরা বলল, এরকম বলার নিয়ম এখানে নেই। তাছাড়া এরকম বললেতো তোমাকে কেউ কিনবেনা। তখন হযরত ইউসুফ আ. বললেন, তাহলে এরূপ বলুন– مَنْ يَشْتَرِىْ يُوْسُفَ صَدِّيْقَ اللهِ اِبْنَ يَعْقُوْبَ اِسْرَائِيْلَ اللهِ اِبْنَ اِسْحَاقَ صَفِىِّ اللهِ اَخِىْ اِسْمَاعِيْلَ ذَبِيْحَ اللهِ اِبْنَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَ اللهِ. তখন দালালরা বলল, তুমি চুপ থাক। ক্রেতারা শুনলে তোমার মূল্য বৃদ্ধি করবেনা। তখন তারা তাঁর চড়ামূল্য ঘোষণা করল। নিলামের ন্যায় প্রতিযোগীতামূলক তার মূল্য বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে মূল্য নির্ধারণ হল– তাঁর ওযন পরিমাণ স্বর্ণ, সমপরিমাণ মৃগনাভী এবং সমপরিমাণ রেশমী বস্ত্র। সমপরিমাণ আতরী মেশক। সমপরিমাণ মুক্তা, সমপরিমাণ রৌপ্য। তখন তাঁর ওজন ছিল ৪০০ রিত্বল তথা প্রায় পাঁচ মণ। তাঁর বয়স ছিল বার বছর। আল্লাহ তায়ালা এই মহামূল্যবান রত্ন আযীয মিসরের ভাগ্যে অবধারিত করেছিলেন। তিনিই উল্লেখিত দ্রব্য সামগ্রীর বিনিময়ে হযরত ইউসুফ আ.কে কিনে নিয়েছিলেন। আল্লামা ইবনে কাসীরের ভাষ্য মতে, এই ক্রেতা ছিলেন মিশরের অর্থমন্ত্রী। তার প্রকৃত নাম কিতফীর কিংবা ইতফীর। তখন মিশরের সম্রাট ছিলেন আমালেকা জাতির জনৈক ব্যক্তি রাইয়্যান ইবনে ওসায়েদ। তিনি পরবর্তীকালে হযরত ইউসুফ আ.'র হাতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁরই জীবদ্দশায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলেন। ক্রেতা আযীয মিশরের স্ত্রীর নাম ছিল রাঈল কিংবা জুলায়খা। তিনি যুবতী, সুন্দরী ও মরক্কোর বাদশা তায়মূসের কন্যা ছিলেন। হযরত ইউসুফ আ.কে স্বপ্নে দেখে তার প্রতি আশেক হয়েছিলেন। স্বপ্ন যোগেই জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর সাথে সাক্ষাত মিশরেই হবে। সে কারণে তিনি মিশরের অর্থমন্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি হযরত ইউসুফ আ.কে ঘরে নিয়ে স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন তাঁকে বসবাসের উত্তম জায়গা দাও, তাঁকে ক্রীতদাসের ন্যায় রেখোনা এবং তার প্রয়োজনাদির সুবন্দোবস্ত কর। অচিরেই সে আমাদের কাজে আসবে অথবা আমরা তাঁকে আমাদের সন্তান বানিয় নেব। আর যখন তিনি পূর্ণ যৌবনে পৌছলেন তখন নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ . وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল: একে সম্মানে রাখ। সম্ভবত: সে আমাদের কাছে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এ জন্যে যে, তাকে বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। আল্লাহ্ নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌছে গেল, তখন তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই।[৩৭২]

হযরত ইউসুফ আ. যুলায়খার তত্ত্বাবধানেঃ

হযরত ইউসুফ আ. কে যুলায়খা মহলে নিয়ে গিয়ে অতি যত্ন সহকারে রাখলেন। দিন রাত তাঁর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। পৃথিবীর সর্বোত্তম খাবার সংগ্রহ করে তাঁকে খাওয়াচ্ছেন। প্রতিদিন নিত্য নতুন মূলবান পোশাক এবং স্বর্ণ মুদ্রা খচিত তাজ মাথায় পরিধান করাতেন এবং আসনে বসিয়ে তাঁর সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। এভাবে দীর্ঘ সাত বছর কেটে গেল। যুলায়খা তাঁর উপর আশেক হয়ে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মন পাওয়ার জন্য তাঁকে বশে আনার জন্য যুলায়খা আপ্রাণ চেষ্টা চালান কিন্তু কিছুতেই হযরত ইউসুফ আ.'র মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন না। যুলায়খা অস্থির হয়ে চটপট করতে লাগলেন এমনকি পানাহার পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছিল। প্রতিবেশী এক বৃদ্ধা এসে বলল, হে যুলায়খা! তোমার কি হয়েছে? কেন তোমাকে এভাবে অস্থির দেখছি? কেন তোমার এই অবস্থা? যুলায়খা বললেন– এক ইবরানী গোলামের প্রেমেই আমার এ অবস্থা করেছে। আমি তাঁর প্রেমে পাগল, তাঁর জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। কিন্তু সে এতই কঠিন হৃদয়ের লোক আমার মত সুন্দরী রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করেনা এবং মিষ্টি মধুর কথাও বলে না। আপনি বলুন, এর চিকিৎসা কী হতে পারে? তখন বৃদ্ধা বলল, হে যুলায়খা! তোমাকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যদি তুমি তা বাস্তবায়ন করতে পার, তবে কামিয়াব হবে তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। তবে এতে আমাকে এ জন্য অনেক খরচ করতে হবে। যুলায়খা বৃদ্ধার চাহিদা মোতাবেক খরচ দিতে

৩৭২. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ২১-২২

সম্মতি প্রকাশ করলে বৃদ্ধা মহলের সাত দরজা বিশিষ্ট একটি কামরা বিভিন্ন নকশাযুক্ত করে মূল্যবান চাদর ও রেশমী কাপড় দিয়ে সাজিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বিশেষ করে উপরে নীচে দেয়ালে সবখানে হযরত ইউসুফ আ. ও যুলায়খার কামোত্তেজক যৌথ ছবি অংকন করে দিয়েছে। স্বর্ণ রৌপ্য নকশাযুক্ত কাপড় সুসজ্জিত বিছানা এবং আম্বর ও আউদ জ্বালিয়ে পুরো মহল সুগন্ধময় করেছে। এক কথায় রাজকীয় যাবতীয় সাজসজ্জা করে যুলায়খা হযরত ইউসুফ আ.কে সেই মহলে নিয়ে আসলেন প্রেমসাধ মিঠানোর জন্যে। মহলের সাতটি দরজা বড় ও মজবুত তালা দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। তারপর হযরত ইউসুফ আ.কে বিছানায় বসিয়ে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগলেন। হযরত ইউসুফ আ. মহলের চর্তুদিকে দেখলেন যে, সবখানেই তার এবং যুলায়খার যৌথ ছবি অংকিত ও মহল সুসজ্জিত এবং শোভাশিত। তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন যে তাঁকে নিয়ে যুলায়খার কু মতলব রয়েছে।

যুলায়খা যখন কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে তাঁকে ফুসলাতে লাগলেন তখন তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে বললেন– معاذ الله তোমার স্বামী আমার আশ্রয়দাতা। আমি কিভাবে তাঁর সাথে বেঈমানী করতে পারি। অথবা انه ربى এর সর্বনামটি আল্লাহর দিকে ফিরেছে। অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং প্রকৃত আশ্রয়দাতা। সুতরাং তার অবাধ্যতা বড় যুলুম। আর যুলুমকারী কখনো সফল হয় না।

সুদ্দী, ইবনে ইসহাক প্রমূখ বর্ণনা করেন যে, এ নির্জনতায় যুলায়খা হযরত ইউসুফ আ.কে আকৃষ্ট করার জন্য তাঁর রূপ যৌবন ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। বললেন, তোমার মাথার চুল কত সুন্দর। উত্তরে হযরত ইউসুফ আ. বললেন মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম এই চুল আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যুলায়খা বললেন, তোমার চোখ দু'টি খুবই আকর্ষণীয়। উত্তরে হযরত ইউসুফ আ. বললেন, মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। যুলায়খা আরো বললেন, তোমার চেহারা কতই কমনীয়। উত্তরে হযরত ইউসুফ আ. বললেন, এগুলো সব মৃত্তিকার খোরাক। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মনে পরকালের চিন্তা এত বেশী প্রবল করে দিয়েছেন যে, ভরা যৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোগ বিলাস তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে উঠে।

যুলায়খার ঘরে একটি মূর্তি ছিল। সে বিশেষ মুহূর্তে যুলায়খা মূর্তিটি কাপড় দ্বারা আবৃত করলে হযরত ইউসুফ আ. এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। যুলায়খা উত্তর দিলেন, এটা আমার উপাস্য। এর সামনে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া আমার

লজ্জাবোধ করে। হযরত ইউসুফ আ. বললেন, আমার উপাস্য আরো বেশী লজ্জা করার যোগ্যতাসম্পন্ন। কোন পর্দা দ্বারা তাঁর দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব নয়। হযরত ইউসুফ আ. আরো বললেন– اَنْتِ تَسْتَحِيْ مِنَ الصَّنَمِ وَاَنَا لَا اَسْتَحِيْ مِنَ الصَّمَدِ তুমি একটি মূর্তিকে লজ্জাবোধ করছ, আমি কি অমুখাপেক্ষী খোদাকে লজ্জাবোধ করব না।

হযরত ইউসুফ আ. বললেন, আমি দু'টি বিষয়ে ভয় পাচ্ছি। একটি আমার প্রভুর ব্যাপারে আরেকটি তোমার স্বামীর ব্যাপারে। যুলায়খা বলল, তুমি আযীযকে ভয় করনা। তাকে আমি সামলাব। প্রয়োজনে বিষ খাওয়ায়ে আমি তাকে হত্যা করব আর মহলের রাজত্ব তোমার হাতেই তুলে দেব। আর তুমিই তো বলেছ– তোমার খোদা বড়ই করীম ও রহীম। তিনি সর্বদা পাপীদের প্রতি দয়ালু হন। আমার যত ধন দৌলত আছে সবকিছু তোমার খোদার নামে সাদকা ও কাফফারা দেব। এতে তোমার খোদা খুশী হয়ে আমাদের পাপ মোচন করে দেবেন। হযরত ইউসুফ আ. বললেন, আমার খোদা ঘুষ নেননা এটা তার সাথে প্রতারণা করার শামিল।

এসব কথা যুলায়খা হযরত ইউসুফ আ.'র প্রেমে পাগল হয়ে উন্মাদনা বশত বলেছিলেন আর হযরত ইউসুফ আ. তা প্রত্যাখ্যান করে যাচ্ছিলেন। যুলায়খা হযরত ইউসুফ আ. কে পাপাচারে লিপ্ত করার জন্য যাবতীয় উপায় উপকরণ কোন কিছুর ত্রুটি করেন নি। নির্জনে একজন পূর্ণ যৌবনের অধিকারী যুবকের সামনে একজন সুন্দরী যুবতী নারীর আবেদন নিবেদন, ধন-দৌলতের অফার এহেন অগ্নিপরীক্ষায় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দৃঢ়পদ রাখলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ প্রমাণ অবলোকন করায়ে তাঁকে এ কল্পনা থেকে বিরত রাখলেন। আল্লাহ বলেন– وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا اَنْ رَاٰبُرْهَانَ رَبِّهٖ অর্থ: যদি তিনি আল্লাহর প্রমাণ অবলোকন না করতেন, তবে তাঁর মনেও কল্পনা সৃষ্টি হত।" পালনকর্তার প্রমাণ দেখার কারণে অনিচ্ছাকৃত কল্পনাও অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল।

স্বীয় পালনকর্তার যে প্রমাণ হযরত ইউসুফ আ.'র সামনে দৃশ্যমান হয়েছিল তা কি ছিল পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ নেই। তাই এ নিয়ে তাফসীর-বিদগণ থেকে নানা মত পরিলক্ষিত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, হাসান বসরী র. প্রমুখ বলেছেন– আল্লাহ তায়ালা মুজিযা হিসাবে এ নির্জন কক্ষে হযরত ইয়াকুব আ. কে এভাবে তাঁর সামনে উপস্থিত করে দেন যে, তিনি হাতের আঙ্গুলি দাঁতে চেপে ধরে তাঁকে সাবধান করে দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন– আযীয মিশরীর ছবি তাঁর সম্মুখে ফুটিয়ে তোলা হয়।

আবার কেউ বলেন– তিনি দৃষ্টি ছাদের দিকে দিলে সেখানে কুরআনে পাকের এ আয়াত লিখিত দেখলেন– وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا "ব্যভিচারের নিকটবর্তী হইও না। কারণ, এটা অত্যন্ত নির্লজ্জতা এবং খুবই মন্দ পথ।"

কেউ বলেছেন, এসময় অদৃশ্য থেকে আওয়ায আসল– يَا يُوْسُفُ لَوْ وَاقَفْتَ الْخَطِيَّةَ يَمْحُوْ اللّٰهُ اِسْمَكَ مِنْ دِيْوَانِ الْاَنْبِيَاءِ হে ইউসুফ! তুমি যদি গোনাহে লিপ্ত হও তবে আল্লাহ তায়ালা তোমার নাম আম্বীয়াদের তালিকা থেকে মুছে দেবেন। সাথে সাথে তিনি দৌড়ে বাইরে চলে যেত উদ্যত হলেন।

খোদায়ী প্রমাণ যাই হোক না কেন তিনি তা প্রত্যক্ষ করা মাত্র সেখান থেকে পলায়ন্যোদ্যত হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার জন্য তালাবদ্ধ দরজার দিকে দৌড় দিলেন। যুলায়খাও নিজের চুল মুখ বিকৃতি করে তাঁকে ধরার জন্য পিছে পিছে দৌড় দিলেন এবং পিছন দিক থেকে তাঁর জামা ধরে তাঁকে বর্হিগমনের বাঁধা দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন, তাই থামলেন না। ফলে জামা পিছন দিক থেকে ছিড়ে গেল। এ সময় আল্লাহর হুকুমে সাত দরজার তালা অনায়াসে খুলে গেল। হযরত ইউসুফ আ.'র টুপি মাথা থেকে পড়ে গেল, মাথার চুল এলোমেলো হয়ে পড়ল। পিছে পিছে যুলায়খাও যৌন উত্তেজনায় মত্ত অবস্থায় দৌড়ে গেলেন। উভয়ই দরজার বাইরে এসে আযীয মিশরকে সামনেই দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পেলেন। যুলায়খা চমকে উঠল মিথ্যা কথা বানিয়ে হযরত ইউসুফ আ.'র উপর দোষ ও অপবাদ চাপিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি এমন গোলাম নিজের ঘরে রেখেছ যে আমার সাথে কুকর্মের ইচ্ছে করে। দেখো সে আমাকে কী অবস্থা করেছে। এর শাস্তি কারাগারে নিক্ষেপ করা কিংবা অন্য কোন কঠোর দৈহিক শাস্তি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। যুলায়খা এরূপ শাস্তির কথা উল্লেখ করার কারণ হল– যেন আযীয তাঁকে হত্যা কিংবা ফাসী না দিয়ে দেয়। তাহলে চিরদিনের জন্য তাঁকে হারাতে হবে। এ দুটি শাস্তি দিলে অন্তত; শাস্তি ভোগের পর হলেও অন্য কোন কৌশলে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে। আযীয মিশর বললেন, ইউসুফ! তোমাকে আমি নিজের সন্তানের ন্যায় অতি যত্নে ঘরে বিশ্বাস করে রেখেছি। তার বিনিময়ে কি তুমি আমার স্ত্রীর উপর কুদৃষ্টি দিয়েছ? হযরত ইউসুফ আ. বাধ্য হয়ে সত্য প্রকাশ করে বললেন– هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي অর্থ: সেই আমার দ্বারা স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্যে ফুসলাচ্ছিল।

ব্যাপারটি ছিল খুবই নাজুক। আযীয মিশরের পক্ষে কে সত্যবাদী তা নির্ণয় করা ছিল সুকঠিন। সাক্ষ্য প্রমাণের কোন সুযোগ ছিল না। সাধারণত এসব

ব্যাপারে নারীদের কথাই সবাই বিশ্বাস করে। তাও আবার নিজের স্ত্রী। হযরত ইউসুফ আ. আদ্যোপান্ত ঘটনা আযীয মিশরকে বললেন, তখন তিনিও দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন। এ সময় আল্লাহ তায়ালা দোলনার চার মাস বয়সের এক শিশুকে মুজিযা হিসাবে কাজে লাগালেন এবং হযরত ইউসুফ আ.কে নির্দোষ প্রমাণ করলেন। আযীয মিশর যখন বললেন, হে ইউসুফ! আমি তোমাকে কীভাবে নির্দোষ ভাবতে পারি, তোমার কাছে কি কোন প্রমাণ আছে? উত্তরে তিনি যুলায়খার মামার দুগ্ধপায়ী দোলনায় থাকা শিশুর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তাকে জিজ্ঞেস করে নিন। হযরত ইউসুফ আ.'র মুযিজা হিসাবে সাথে সাথে শিশুটি মুখ খুলল এবং স্পষ্ট ভাষায় বলতে লাগল হযরত ইউসুফ আ. নির্দোষ এবং যুলায়খাই হল প্রকৃত দোষী। শুধু এতটুকু নয় বরং দার্শনিক সুলভ বিজ্ঞ বিচারকের ন্যায় যুক্তিসঙ্গত ফায়সালা দিল যে, ইউসুফের জামাটি দেখ। যদি তা সামনের দিকে ছেড়া থাকে তবে যুলায়খার দাবী সত্য আর ইউসুফ মিথ্যাবাদী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি জামাটি পেছন দিকে ছেড়া থাকে তবে যুলায়খা মিথ্যাবাদিনী আর হযরত ইউসুফ আ. সত্যবাদী। অত:পর যখন জামাটি পেছন দিকে ছেড়া দেখা গেল, তখন বাহ্যিক আলামত দৃষ্টেও হযরত ইউসুফ আ.'র পবিত্রতা প্রমাণিত হল আর যুলায়খা দোষী সাব্যস্ত হল। তখন আযীয মিশর স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন إِنَّـهُ مِـنْ كَيْـدِكُـنَّ অর্থ: এসব তোমার ষড়যন্ত্র ও ছলনা। তুমি নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও। তারপর বলল, নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। একে বুঝা এবং জাল ছিন্ন করা খুবই কঠিন। কেননা বাহ্যত তারা কোমল নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে। সাধারণত সবাই তাদের কথা সহজে বিশ্বাস করে কিন্তু বুদ্ধি ও ধর্মভীরুতার অভাববশত তা অধিকাংশ সময় ছলনা হয়ে থাকে।

হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল ﷺ এরশাদ করেন– নারীদের ছলনা ও চক্রান্ত শয়তানের ছলনা ও চক্রান্তের চেয়ে গুরুতর। কেননা আল্লাহ তায়ালা শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে বলেছেন– إِنَّ كَيْـدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَـعِيفًا "শয়তানের চক্রান্ত ছিল দূর্বল"। পক্ষান্তরে নারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে বলেছেন–إِنَّ كَيْـدَ كُـنَّ عَظِـيْمٌ "তোমরা নারীদের চক্রান্ত খুবই সবল ও মারাত্মক।"

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে কতিপয় দুগ্ধপায়ী শিশু কথা বলেছে। (১) হযরত ইউসুফ আ.'র পক্ষে দোলনার এই শিশুর সাক্ষী। (২) আমাদের রাসুলে ﷺ তিনি ভূমিষ্ট হতেই আল্লাহর প্রশংসা করেন। (৩) হযরত ঈসা আ., (৪) বিবি

মরয়ম আ., (৫) হযরত ইয়াহিয়া আ., (৬) হযরত ইব্রাহীম আ., (৭) ওই মহিলার ছেলে যার বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, অথচ সে ছিল নিরপরাধ, (৮) খন্দকওয়ালী বিপদগ্রস্থ মহিলার শিশু, (৯) হযরত আসিয়ার মাথায় চিরনীকারী মহিলার শিশু সন্তান, (১০) মুবারক ইয়ামামাহ। সে জন্মগ্রহণ করা মাত্রই হুযুর ﷺ'র পক্ষে হুযুরের নির্দেশে সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং (১১) জুরাইজ রাহিবের পক্ষে শিশু সাক্ষী।

আযীয মিশর যখন নিশ্চিত হলেন যে, হযরত ইউসুফ আ. নির্দোষ তখন বললেন, يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هَـذَا "হে ইউসুফ! এ ঘটনাকে উপক্ষো কর এবং এই ঘটনাকে এখানে শেষ করে দাও, বাইরে বলাবলি করনা। যাতে আমরা পরিবারের বেইজ্জতি না হয়। তারপর যুলায়খাকে সম্বোধন করে বললেন– وَاسْـتَغْفِرِي لِذَنْبِـكِ إِنَّـكِ كُنْـتِ مِـنَ الْخَـاطِئِينَ অর্থ: দোষ তোমারই, তোমার এই দোষের জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর। এই ক্ষমা প্রার্থনা স্বামীর কাছেও হতে পারে অথবা হযরত ইউসুফ আ.'র কাছেও হতে পারে। কারণ সে নিজের দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেছে।

উপরোক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ . وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ . وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ . فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ . يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ .

অর্থ: আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বলল: শুন! তোমাকে বলছি, এদিকে আস। সে বলল: আল্লাহ্ রক্ষা করুন; তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমা লংঘনকারীগণ সফল হয় না। নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত, যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। এমনিভাবে হয়েছে,

যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল: যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে? ইউসুফ আ. বললেন: সে-ই আমাকে আত্মসংবরণ না করতে ফুসলিয়েছে। মহিলার পরিবারের জনৈক সাক্ষী দিল যে, যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদি। এবং যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন, তখন সে বলল: নিশ্চয় এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক। ইউসুফ এ প্রসঙ্গ ছাড়! আর হে নারী! এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তুমি-ই পাপাচারিনী।[৩৭৩]

হযরত ইউসুফ আ.কে দেখে মিশরের নারীদের অঙ্গুলি কর্তন:

আযীয মিশর চেয়েছিলেন ঘটনা এখানেই শেষ হয়ে যাক। ঘরের কথা বাইরে প্রকাশ না হোক। কিন্তু হযরত ইউসুফ আ. ও যুলায়খার বিষয়টি উপস্থিত পাঁচজন মহিলা শুনে ফেলেছিল। একজন বাবুর্চি, দ্বিতীয়জন ছিল সাক্ষী তথা পানীয় পানকারিনী, তৃতীয়জন ছিল আস্তাবলের তত্ত্বাবধায়ক, চতুর্থজন ছিল জেলের দারোগা এবং পঞ্চমজন ছিল দারোয়ানের স্ত্রী। এরা বাইরে গিয়ে কথাটি ফাঁস করে দিয়েছিল। তারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযের স্ত্রী যুলায়খা স্বীয় গোলামের সাথে কুমতলব চরিতার্থ করার চেষ্টা চালায়। সে তাঁর প্রেমে উন্মাদ হয়ে গেছে। এমনি সাধারণত মহিলারা কোন কথা গোপন রাখতে পারে না। এক কান দু'কান করতে করতে তারা ঘটনা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়।

যুলায়খা যখন মহিলাদের কানা ঘুষা শুনল এবং তার সখী বান্ধবীরা তাকে তিরস্কার করতে লাগল এই বলে যে, তুমি একজন বাদশাহর শাহজাদী এবং মিশরের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর পরমা সুন্দরী স্ত্রী অথচ একজন সাধারণ কৃতদাসের প্রেমে উন্মাদ। এটা তোমার মস্তবড় ভুল কাজ। তখন যুলায়খা তাদের কথার উত্তর না দিয়ে অন্য একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। কারণ মৌখিক ভাবে ইউসূফের সৌন্দর্য্যের কথা বললে হয়তো তারা বুঝবে না। তাই

[৩৭৩]. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ২৩-২৯।

তিনি মিশরের সুন্দরী মহিলাদের জন্যে ভোজ সভার আয়োজন করলেন। তাদের জন্য বিলাসবহুল আসনের ব্যবস্থা করা হল। হযরত ইউসুফ আ.'র জন্য মঞ্চ সাজানো হল। মহিলারা ভোজসভায় উপস্থিত হল। তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ও ফল উপস্থিত করা হল। সাথে সাথে একটি লেবু ও একটি ছুরি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যখন মঞ্চে ইউসুফ আসবেন এবং তাঁর থেকে আবরণ সরানো হবে এ সময় যেন প্রত্যেকেই সামনে রাখা ছুরি দিয়ে লেবু কাটবে আর তখনই ইউসুফকে দেখতে পাবে। তারপর যুলায়খা হযরত ইউসুফ আ.কে সুসজ্জিত করে মঞ্চে আনলেন। যখনই তাঁর থেকে পর্দা উঠালেন তখন মহিলারা তাঁকে দেখা মাত্র তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য্য দর্শনে তারা বিমোহিত হয়ে গেল এবং লেবু কাটতে গিয়ে অজান্তে নিজের অঙ্গুলী ও হাত কেটে রক্তাক্ত করে ফেলল। অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ল আর বলে উঠল, ইনি তো কোন মানব নন বরং কোন মহান ফেরেশতা। মহিলাদের জ্ঞান ফিরে আসলে যুলায়খা বললেন দেখ, এ ঐ ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করতে। বাস্তবিকই আমি তার সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সে নিস্পাপ রয়েছে।

মহিলারা বলল, হে যুলায়খা! আমাদের ভৎর্সনা ভুল, তুমিই সঠিক এবং বড় ভাগ্যবান এমন মাশুক তুমি পেয়েছ। মহিলাদের মুখে হযরত ইউসুফ আ.'র সৌন্দর্যের প্রশংসা যুলায়খার আসক্তি তাঁর প্রতি আরো বেড়ে গেল। এতদিন তো বিষয়টি গোপন ছিল এখন মহলের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই, সকলের নিকট জানাজানি হয়ে গেল। যুলায়খা মহিলাদের সামনেই হযরত ইউসুফ আ.কে ভীতি প্রদর্শন করে বললেন, তোমার কারণে আমি তিরষ্কৃত হয়েছি, এতো আয়োজন করে তোমার সৌন্দর্য্য মিশরী সুন্দরী রমণীদের শুনতে হবে, মানতে হবে নতুবা অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে উপস্থিত আমন্ত্রিত রমণীরাও যুলায়খার প্রতি দরদী হয়ে হযরত ইউসুফ আ.কে বলতে লাগল, তুমি যুলায়খার কাছে ঋণী। সে তোমার জন্য অনেক কিছু করেছে তোমাকে ভালোবেসেছে। এজন্য অনেক তিরষ্কৃতও হয়েছে। সুতরাং তাঁর ইচ্ছার অবমাননা করা তোমার উচিত নয়।

হযরত ইউসুফ আ. যখন দেখলেন, সমবেত মহিলারাও যুলায়খার সাথে সুর মিলিয়েছে এবং তাকে সমর্থন করছে, কেউ তাঁকে রক্ষা করার উদ্যোগ নিচ্ছে না। আসলে পৃথিবীটা এরকমই। এখানে সবাই প্রভাবশালীর পক্ষাবলম্বন করে, ন্যায় নিষ্ঠাবান গরীব দুঃখীর সাহার্য্যে এগিয়ে আসার মত লোকের সংখ্যা খুবই নগন্য। হযরত ইউসুফ আ.'র বেলায়ও তা ব্যতিক্রম হল না। তাই তিনি

নিরূপায় হয়ে নারীর চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার বাহ্যিক কোন উপায় না দেখে আল্লাহর সরণাপন্ন হয়ে বললেন, হে আমার প্রভু! মহিলারা আমাকে যে কাজের প্রতি আহবান করছে এর থেকে বাঁচার জন্য জেলখানাই আমার জন্য উত্তম স্থান। অর্থাৎ এই পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে কারাগারে কষ্টভোগ করা উত্তম। তাছাড়া এই মহিলারা চতুর্দিক থেকে যেভাবে আমাকে নিয়ে চক্রান্ত করতেছে, বাইরে থেকে তা সামলানো হয়তো আমার দ্বারা সম্ভবপর হবে না। যদি আপনি আমার থেকে ওদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে সম্ভবত আমি তাদের দিকে ঝুকে পড়ব। তাই আমি জেলখানাই পছন্দ করি।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে–

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ . قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ . قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ . فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

অর্থ: নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। যখন সে তাদের চক্রান্ত শুনল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্যে একটি ভোজসভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিয়ে বলল: ইউসুফ! এদের সামনে চলে এস। যখন তারা তাকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেলল। তারা বলল: কখনই নয়– এ ব্যক্তি মানব নয়! এ তো কোন মহান ফেরেশতা! মহিলা বলল: এ ঐ ব্যক্তি, যার জন্যে তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করছিলে। আমি ওরই মন জয় করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে। আর আমি যা আদেশ দেই, সে যদি তা না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে। ইউসুফ বলল: হে পালনকর্তা! তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো।

অতঃপর তার পালনকর্তা তার দোয়া কবুল করে নিলেন। অতঃপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।[৩৭৪]

কারাগারে হযরত ইউসুফ আ.:

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ আ. দোয়া করেছিলেন যে, এই ফিতনায় লিপ্ত হওয়া থেকে আমি জেলখানায় থাকা পছন্দ করি। ফলে আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ আ. যদি এই বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য নিঃশর্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জেলখানায় প্রেরণ করা ছাড়াও অন্য কোন উপায়ে রক্ষা করতেন। তাছাড়া যুলায়খাও চেয়েছিলেন যে, নিজের ইজ্জত রক্ষার জন্য হযরত ইউসুফ আ. কারাগারে থাকাই হল শ্রেয়। কারণ বাইরে থাকলে কথাটি আরো বেশী জানাজানি হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত: যুলায়খা মনে করেছিল হযরত ইউসুফ আ. বাইরে থাকলে হয়তো অন্য কোন মহিলা তাঁর আশেক হয়ে তাঁকে তার থেকে ছিনিয়ে নেবে। তাই কারাগারে তাঁর সৌন্দর্য গোপন থাকবে। পরে অন্য কোন উপায়ে তাকে বশে আনা যাবে। সর্বোপরি মহান আল্লাহর অনেক হেকমত এতে নিহিত আছে।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করে মহিলাদের চক্রান্ত থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন। হযরত ইউসুফ আ.'র সচ্চরিত্রতা, পবিত্রতা, খোদাভীতির সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী দেখে আযীয মিশর ও তাঁর সহকর্মীদের মনে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, হযরত ইউসুফ আ. সৎ ও নিষ্পাপ। কিন্তু পুরো শহরে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাঁকে কিছুদিনের জন্য কারাগারে রাখাই সমীচীন মনে করেছেন। এর দ্বারা নিজের ঘরও রক্ষা হবে এবং জনগণের মধ্যেও আলোচনা সমালোচনা স্তিমিত হয়ে পড়বে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ আ.কে জেলে পাঠানোর সময়ও অনেক মূল্যবান পোশাক, তাজ ইত্যাদি পরিধান করিয়ে বড় শান শওকত সহকারে পাঠানো হয়েছিল। জেলে কর্তব্যরত দায়িত্ববান ব্যক্তি অভিযোগ করে বলল, এ ধরনের দামী শাহী পোশাক পরে জেলখানায় থাকা নিয়ম বর্হিভূত। কিন্তু তাদেরকে বলা হয়– হযরত ইউসুফ আ. কয়েদী হিসাবে নয় বরং মেহেমান হিসাবে থাকবে। আল্লাহর দয়ায় তিনি জেলখানায়ও শাহী মেহেমানের ন্যায় অবস্থান করেছিলেন, যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ

[৩৭৪]. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৩০-৩৪।

أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ . فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . । অর্থ: ইউসুফ বলল: হে পালনকর্তা! তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো'। অতঃপর তার পালনকর্তা তার দোয়া কবুল করে নিলেন। অত:পর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।[৩৭৫]

কারাগারে সংঘটিত ঘটনা:

হযরত ইউসুফ আ. কারাগারে অবস্থান করছিলেন। ইতিমধ্যে আরো দু'জন কয়েদী কারাগারে গেল। তাদের একজন ছিল মিশরের বাদশাহ রাইয়্যানকে মদ্যপানকারী অপরজন হল বাবুর্চি। তারা উভয়েই বাদশাহকে বিষ পান করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। মোকদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল।

হযরত ইউসুফ আ. পয়গম্বরসূলভ চরিত্র, দয়া ও অনুকম্পার কারণে কারাগারে সব কয়েদীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতেন। সাধ্যমতে, তাদের দেখা শুনা ও সেবা শুশ্রুষা করতেন আর রাতের বেলায় আল্লাহর ইবাদতে সারারাত মশগুল থাকতেন। এতে কারাগারের সব কয়েদী তাঁর ভক্ত হয়ে গেল। কারাধ্যক্ষও তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হল। তিনিও তাঁর প্রতি বিশেষ দয়ার নজর রাখতেন। বিশেষ করে বাদশাহ'র বাবুর্চি ও সাক্বীর সাথে তাঁর ভাব হল। কারণ এ দু'জন ছিল খুবই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ।

হযরত ইউসুফ আ.'র নিকট এসে মদ্যপানকারী বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আঙ্গুর গুচ্ছ থেকে মদ বের করছি। সাক্বী বলল যে, আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, আমার মাথায় তিনটি রুটি ভর্তি একটি ঝুড়ি রয়েছে। তা থেকে পাখীরা এসে ঠুকরে ঠুকরে আহার করছে। তারা তাঁকে তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ করল। কিন্তু তিনি প্রথমেই ব্যাখ্যা বলে না দিয়ে পয়গম্বর সুলভ আচরণের প্রতি মনোনিবেশ দেন। তিনি উত্তর না দিয়ে তাদেরকে ঈমানের প্রতি দাওয়াত ও ধর্মপ্রচারের কাজ আরম্ভ করলেন। তাদের অন্তরে আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি তাঁর একটি মু'জিযা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের জন্য যে খাবার আসে, তা আমি আসার আগেই খাদ্যের প্রকার, গুণাগুন, পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে বলে দেবো। এটি কোন জ্যোতির্ষ বিদ্যা

৩৭৫. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৩৩-৩৪

কিংবা ভেলকিবাজি নয়, বরং আমার পালনকর্তার ওহীর মাধ্যমে আমাকে জানানো হয়। তারপর তিনি কুফরীর নিন্দা করেছেন এবং তিনি নিজেকে পূর্ব পুরুষের সত্য ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করেছেন। তিনি বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে দিয়ে বললেন, এতগুলো পৃথক পৃথক উপাস্যের চেয়ে এক, অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী আল্লাহকে উপাস্য স্বীকার করাই হল যুক্তিযুক্ত। অত:পর মূর্তিপূজার অসারতা এবং এদের মধ্যে উপাস্য হওয়ার কোন যোগ্যতা না থাকার বিষয়টিও তাদের সামনে তুলে ধরলেন। এভাবে প্রচার ও দাওয়াত কাজ সম্পন্ন করার পর হযরত ইউসুফ আ. কয়েদী দু'জনের স্বপ্নের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বললেন, তোমাদের একজন তো মুক্তি পাবে এবং চাকুরীতে পুনর্বহাল হয়ে বাদশাহকে মদ্য পান করাবে, অপরজনের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শূলে চড়ানো হবে। পাখীরা তার মাথার মগজ ঠুকরে খাবে। কিন্তু হযরত ইউসুফ আ. পয়গাম্বর সুলভ অনুকম্পার কারণে নির্দিষ্ট করে বলেন নি যে, কে নির্দোষ আর কে দোষী প্রমাণিত হয়ে শাস্তি ভোগ করবে, যাতে সে এখন থেকে চিন্তাগ্রস্থ না হয়।

কোন কোন মুফাস্‌সীর বলেছন যে, দুই কয়েদী মিথ্যা স্বপ্ন বানিয়ে বলেছিল। হযরত ইউসুফ আ. স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার পর তারা বলে উঠল আমরা কোন স্বপ্ন দেখিনি বরং মিথ্যা স্বপ্ন বানিয়ে বলেছিলাম। তখন হযরত ইউসুফ আ. বললেন, قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ তোমরা স্বপ্ন দেখ বা না দেখ, এখন বাস্তবে তাই হবে, যা বর্ণনা করা হয়েছে।

অত:পর যে জন নিদোর্ষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি পাবে এবং বাদশাহকে মদ্যপান করাবে হযরত ইউসুফ আ. তাকে বলেছিলেন, তুমি বাদশাহর কাছে গিয়ে আমার কথা বলবে। বলবে একজন নিরপরাধ মানুষ কারাগারে বিনা দোষে শাস্তি ভোগ করছে অর্থাৎ বাদশাহকে বলে তুমি আমার মুক্তির ব্যবস্থা করবে। কিন্তু আল্লাহর অসংখ্য অনুকম্পা প্রাপ্ত একজন পয়গাম্বর হয়ে বিপদ মুক্তির জন্য সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর আস্থাশীল না হয়ে বাদশাহর দয়া ও অনুকম্পার প্রতি নির্ভর করা আল্লাহর কাছে মনপুত হয়নি। তাই জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সাক্বী হযরত ইউসুফ আ.'র কথা বাদশাহকে বলতে শয়তান ভুলিয়ে দিয়েছে। ফলে তাঁকে আরো সাত বছর পর্যন্ত কারাগারে কাটাতে হয়েছে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– আমার ভাই ইউসূফের প্রতি আল্লাহ করুণা করুন। তিনি "তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বলিও"– এ রকম না বললে তাঁর বন্দী জীবন দীর্ঘায়িত হত না। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে তিবরাণী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– আমার ভাই ইউসুফ মানুষের কাছে সাহায্য কামনা না করলে সুদীর্ঘকাল তাকে বন্দীজীবন কাটাতে হতো না।

এখানে উল্লেখ্য যে, চতুর্দিক থেকে বিপদ গ্রস্থ একজন মানুষ অন্য কোন মানুষ থেকে সাহায্য চাওয়া অবৈধ কিংবা কোন দোষের বিষয় নয়। কিন্তু কথা আছে যে, حَسَنَاتُ الأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ المُقَرَّبِيْنَ অর্থ: সাধারণ সৎ লোকদের সৎকাজও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারী বিশেষ বান্দাদের জন্য অশোভনীয় কিংবা মন্দ হয়ে যায়। হযরত ইউসুফ আ.'র ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। উনি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারী বিশেষ বান্দা। আল্লাহর নিকট মুক্তির সাহায্য চেয়ে পরে বাদশাহ বা অন্য কারো সাহায্য চাইলেও চলত। কিন্তু আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে কেবল বাদশাহর সাহায্য চাওয়াটাই আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ বর্ণিত হয়েছে-

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ . وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ . قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ . وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ . يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ . يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ . وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ . অর্থ: অত:পর এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাকে কিছুদিন কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করল। তাঁর সাথে কারাগারে দু'জন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল: আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিঙড়াচ্ছি। অপরজন বলল: আমি দেখলাম যে, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখী ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলুন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন: তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দেয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দেব। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি ঐসব লোকের

ধর্ম পরিত্যাগ করেছি। যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী। আমি আপন পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করছি। আমাদের জন্য শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না। হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ্ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। হে কারাগারের সঙ্গীরা! তোমাদের একজন আপন প্রভুকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শূলে চড়ানো হবে। অত:পর তার মস্তক থেকে পাখী আহার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জানার আগ্রহী তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল: আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে। অত:পর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল।[৩৭৬]

মালেক ইবনে দীনার র. বলেছেন, হযরত ইউসুফ আ. যখন সাক্বীর মাধ্যমে রাজার নিকট মুক্তি চাইলেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল, তুমি আমাকে ছেড়ে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল হয়েছ। ঠিক আছে আমি তোমার বন্দী জীবন দীর্ঘায়িত করলাম। তখন হযরত ইউসুফ আ. বলেছিলেন, হে আমার পালনকর্তা! বন্দী জীবনের গ্লানি আমাকে অতিষ্ট করে তুলেছে। আমি বুঝিনি, আমি অনুতপ্ত, এমন কথা কখনো বলব না।

কা'ব বলেছেন এ সময় জিব্রাইল আ. এসে বললেন, হে ইউসুফ! আপনার সৃষ্টিকর্তা কে? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয় কে? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার পিতার নিকট আপনাকে প্রিয়ভাজন করেছেন কে? উত্তরে বললেন, আল্লাহ। জিজ্ঞেসা করলেন, অন্ধকূপ থেকে আপনাকে রক্ষাকারী কে? উত্তর দিলেন- আল্লাহ্। জিজ্ঞেসা করলেন, আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞান দিয়েছেন কে? উত্তর দিলেন, আল্লাহ। তখন হযরত জিব্রাইল আ. বললেন, তাহলে আপনি আপনার ন্যায় একজন মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন কীভাবে?

[৩৭৬]. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৩৫-৪২

কারাগার থেকে মুক্তিলাভঃ

বাদশাহকে বিষ পান করানোর তদন্ত কাজ শেষে হযরত ইউসুফ আ.'র কথা মতে বাবুর্চি দোষী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করল আর সাকী নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে তার চাকুরী পুনর্বহাল হল। কিন্তু সে হযরত ইউসুফ আ.'র কথা ভুলে গিয়েছিল। এভাবে সাত বছর অতিবাহিত হল। অত:পর মিশরের বাদশাহ একরাতে একটি ভয়ংকর স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্ন দেখলেন যে, সাতটি মোটা তাজা গাভীকে অন্য সাতটি দুর্বল গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। এ স্বপ্ন দেখে বাদশাহ উদ্বেগাকুল হলেন এবং রাজ্যের জ্ঞানী ব্যাখ্যাতাদের একত্রিত করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। কিন্তু স্বপ্নটি কারো বোধগম্য হলো না। তারা অপারগ হয়ে বলল, এটা কল্পনা প্রসূত স্বপ্ন। কোন বাস্তব সম্মত স্বপ্ন নয়। আমরা এর ব্যাখ্যা জানিনা। কিন্তু বাদশাহ এতে আরো অস্থির হয়ে পড়লেন এবং এর ব্যাখ্যার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন।

তফসীরে মাযহারী গ্রন্থে বাদশাহর স্বপ্নটি আরো একটু বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, মিশরের বাদশাহ একরাতে দেখলেন একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন। দেখলেন সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী সাগর থেকে উঠে এল। পরক্ষণই উঠে এল আরো সাতটি কৃশকায় গাভী। কৃশকায় গাভীগুলো হৃষ্টপুষ্ট গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলল। এরপর দেখলেন সাতটি শ্যামল শস্যময় শীষ, পরক্ষণই দেখলন শুকনো সাতটি শীষ এসে পেঁচিয়ে ধরল শ্যামল শীষগুলোকে। সবুজ শীষগুলো আর্তনাদ করে উঠল। বাদশাহ ঘাবড়ে গেলেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। সকালে একত্রিত করলেন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অতিন্দ্রিয়বাদী গণৎকার ও জোতিষদেরকে। তারা এই স্বপ্নকে অমূলক অ্যাখ্যা দিয়ে এর ব্যাখ্যা দিতে অপারগতা প্রকাশ করল। এই সভায় বাদশাহকে মদ পরিবেশনকারী সেই ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল যার স্বপ্নের ব্যাখ্যা হযরত ইউসুফ আ. কারাগারে দিয়েছিলেন এবং সত্য প্রমাণিতও হয়েছিল। এর মাধ্যমে তিনি বাদশাহের নিকট সুপারিশ পাঠিয়েছিলেন আর সেই বাদশাহর কাছে সুপারিশ করতে ভুলে গিয়েছিল। এ সময় হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল হযরত ইউসুফ আ.'র কথা। সে বলল, মহারাজ! আমি এক স্বপ্ন বিশারদকে চিনি। অনুমতি দিলে আমি তাঁর কাছ থেকে আপনার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা এনে দিতে পারি। বাদশাহ তাকে অনুমতি দিলেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, বন্দীশালা ছিল নগরীর বাইরে। অনুমতি পেয়ে সাকী দ্রুত চলে গেল বন্দীশালায়। হযরত ইউসুফ আ.'র কাছে গিয়ে বলল, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! আমাদের বাদশাহ এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছেন। কেউ এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে পারছেনা। আমি সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে আপনার কাছে

এসেছি। তাড়াতাড়ী আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যাটি জানিয়ে দিন। বাদশাহ তার সভাসদেরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানবার জন্য উদগ্রীব। স্বপ্নটি হল বাদশাহ স্বপ্ন দেখেছেন- সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভী সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভীকে খেয়ে ফেলছে। আরো দেখেছেন, সাতটি সবুজ শীষকে আক্রমণ করছে সাতটি শুষ্ক শীষ। ইতিপূর্বে সাকী দেখেছিল, হযরত ইউসুফ আ.'র প্রদত্ত স্বপ্নে ব্যাখ্যা সত্য ও সম্পূর্ণ বাস্তব। তাই সে তাকে সত্যবাদী বলে সম্বোধন করেছিল।

হযরত ইউসুফ আ. সাকীর মুখে স্বপ্নের কথা শুনে বললেন, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য হল- একটানা দেশে সাত বছর পর্যন্ত প্রচুর ফসল হবে। আর পরের সাত বছর হবে প্রচণ্ড খরা ও অনাবৃষ্টি। সুতরাং প্রথম সাত বছর ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করতে হবে। উদ্বৃত্ত ফসল শীষ সমেত গুদামজাত করতে হবে। ওই উদ্বৃত্ত ফসল কাজে লাগবে পরের দূর্ভিক্ষের সাত বছর। এভাবে আগাম খাদ্যশস্য সঞ্চয় করে রাখলে দেশবাসী বেঁচে যেতে পারবে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ থেকে। এখানে উল্লেখ্য যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত যে, শীষ সমতে ফসল রাখলে খাদ্যশস্য নষ্ট হয় না। তাই তিনি শীষসমেত অর্থাৎ শীষসহ খাদ্য শস্য গুদামজাত করার পরামর্শ দেন। এই পরামর্শটি তার বিশেষ প্রজ্ঞার পরিচায়ক। খাদ্য ঘাটতির বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য সঞ্চয়ের পরামর্শের মধ্যেও রয়েছে তাঁর নবী সূলভ বুদ্ধিও দূরদর্শিতার প্রমাণ।

হযরত ইউসুফ আ. আরো বললেন, এরপর আসবে এক বৎসর। সেই বৎসর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টি হবে। প্রচুর পরিমাণ ফসল হবে। মানুষ ভোগবিলাস করবে। দুর্দিন কেটে যাবে আর সুদিন ফিরে আসবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত ইউসুফ আ. কেবল স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হননি বরং ব্যাখ্যার সাথে সাথে সমস্যা সমাধানের উপায়ও বলে দিলেন। এটি ছিল হযরত ইউসুফ আ.'র নবীসূলভ প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি।

মদ্য পরিবেশনকারী দ্রুত বাদশাহকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বললে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে বাদশাহ অভিভূত হলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, ব্যাখ্যাটি নির্ভুল। আর এরকম ব্যাখ্যা যিনি করতে পারেন তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দেয়া উচিত। তখন বাদশাহ মদ্য পরিবেশনকারীর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি কে, তাঁর চরিত্র কেমন? উত্তরে সে বলল, তিনি খুবই বুদ্ধিমান, জ্ঞানী এবং সৎ। তাঁর গুণাবলি বর্ণনাতীত। আযীয মিশর তাঁকে মালেক ইবনে যা'য সওদাগর থেকে চড়া মূল্যে কিনেছেন এবং গোলাম হিসেবে ঘরে রেখেছেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে কারাগারে রাখা হল কেন? উত্তরে সাকী বলল, তিনি কারাগারে

আমাদেরকে বলতেন, আমি কোন গোলাম নই, বরং আমার ভাইয়েরা হিংসা এবং শত্রুতা বশত বিনা দোষে মালেকের নিকট বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এভাবে আদ্যোপান্ত ঘটনা সাক্ষী থেকে বাদশাহ শুনলেন এবং তাঁর জন্য আফসোস করলেন, তারপর দারোগাকে ডেকে জানতে চাইলেন হযরত ইউসুফ আ.'র সম্পর্কে। দারোগা বলল, এরূপ সুন্দর পুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মেনি। তিনি দেখতে চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়। রাত দিন কেবল দোয়া, তাসবীহ, তাহলীল ও ইবাদতে মশগুল থাকেন এবং অন্যান্য সকল বন্দীদেরকে পাঠদান করেন আর লোকদের দুঃখে সান্তনা দেন। তাঁর জন্য যে খাবার আসত তা নিজে না খেয়ে অভুক্তদের খাওয়াতেন, কাউকে কষ্ট দেয় না এবং নিজেকে নবীর পুত্র বলেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করল, তাঁর খাবার আসত কোথা থেকে? উত্তরে সে বলল, কখনো কখনো যুলায়খা এবং মিশরের পাঁচজন মহিলা যারা তাকে ভালবাসত গোপনে তারা খাবার পাঠাত কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না। মনে হয় আযীয মিশর তাঁকে বিনা দোষে স্ত্রীর মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে কারাগারে পাঠিয়েছেন। তখন বাদশাহ বললেন, আযীযকে ডেকে আন। আযীয আসলে বাদশাহ বললেন, হে আযীয! একজন সৎ ও নির্দোষ মানুষকে কেন কারাগারে দিয়েছ? অন্যায়ভাবে আল্লাহর একজন বান্দাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ? উত্তরে আযীয বলল, আমি তাঁকে চড়া মূল্যে কিনে নিজের ঘরে নিজের সন্তানের মত করে রেখেছিলাম। আমি ভাবতেও পারিনি সে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে আর আমার পরিবারের দিকে দৃষ্টি দেবে। এই অপরাধে আমি তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছি। তখন বাদশাহ সাক্ষীকে বললেন, তুমি গিয়ে তাঁকে ঘোড়ায় আরোহণ করায়ে সসম্মানে আমার কাছে নিয়ে এসো। কোন কোন বর্ণনায় আছে, বাদশাহ অন্য একজন দূত প্রেরণ করে তাঁকে আনতে পাঠিয়েছিলেন।

রাজদূত হযরত ইউসুফ আ.'র নিকট এসে বলল, হে ইউসুফ! আপনার মুক্তির ব্যবস্থা হয়েছে। দ্রুত চলুন বাদশাহ আপনার অপেক্ষায় প্রতিক্ষমান। হযরত ইউসুফ আ. বললেন না, আমি এভাবে মুক্ত হতে চাইনা। আমাকে অপবাদ দিয়ে কারাগারে ঢোকানো হয়েছে। সুতরাং আমার বিষয়টি তদন্ত করা হোক। জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক ওই রমনীদেরকে যারা আমার সম্মানহানী করেছে এবং যারা আমাকে দেখে তাদের হাত কেটে ফেলেছিল। এখানেও তিনি প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে যে প্রকৃত ছলনাকারিনী মহিলা ছিল যুলায়খা। তাকে অপদস্ত করার সমস্ত পরিকল্পনা ছিল তার। তার কারণেই হযরত ইউসুফ আ. কারাগারে। এতদসত্ত্বেও তিনি তার নাম উল্লেখ করে তাকে অসম্মান করেননি। এটা ছিল তাঁর আভিজাত্য ও মর্যাদাবোধের প্রকাশ।

হাদিস শরীফে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ভাই ইউসুফের উদাহরণ ও সহনশীলতায় আমি মুগ্ধ। আল্লাহ তাকে মার্জনা করুন। তিনি বাদশাহর স্বপ্নের কথা শোনা মাত্রই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর স্থলে আমি হলে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতাম মুক্তির শর্তে। আমি আশ্চর্যান্বিত হই এই ভেবে যে, রাজদূতের মুখে মুক্তির কথা শোনে তিনি বলেছিলেন আগে তদন্ত করা হোক কে অপরাধী তিনি, না ললনাকুল? আমি হলে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে বেরিয়ে যেতাম কারাগারের বাইরে। কোন রকম আপত্তি তুলতাম না। আমি আরো বিস্মিত হই এই ভেবে যে, তিনি মুক্তির চেষ্টা করেছিলেন মানুষের মাধ্যমে। যার জন্য কারাবাস বর্ধিত হয়েছিল আরো সাতবছর।

হযরত ইউসুফ আ.'র উদারতায় নবী মুহাম্মদ ﷺ বিস্ময়বোধ করার কারণ হল- সাধারণত নবী রাসূলগণ দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক. উরুজ বা উর্ধ্বারোহন দুই. নুযূল বা অবরোহন। যারা উর্ধ্বরোহী তাদের সঙ্গে সাধারণত মানুষের সম্পর্ক থাকে ক্ষীণ। পক্ষান্তরে উর্ধ্বরোহনের পর অবরোহণে স্থিত হন যারা তাদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হয় অতি ঘনিষ্ট। তাই অবরোহী নবী-রাসূলগণের দ্বারা বিপুল জনগোষ্ঠী উপকৃত হতে পারে। রাসূল ﷺ ছিলেন অবরোহী শ্রেষ্ঠ। তাই উর্ধ্বরোহী হযরত ইউসুফ আ.'র আচরণ দৃষ্টে তিনি বিস্ময়বোধ করেছিলেন। রাসূল ﷺ হলেন সর্বসাধারণের তথা বিশ্বমানবতার নবী। তাই তাঁর কথায় সাধারণ মানুষের অনুসরণযোগ্য অতি সহজ সরল অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ হলে যা করত তিনি নিজের দিকে ইঙ্গিত করে তাই বলেছেন। নতুবা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এর অনেক উর্ধ্বে।

অতঃপর বাদশাহ আযীয পত্নী যুলায়খা ও তার সহচরীদেরকে রাজ দরবারে ডেকে আনলেন। তারপর সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, সত্য করে বল, তোমরা নিজেরা ইউসুফকে প্ররোচিত করেছিলে না ইউসুফ তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল? যুলায়খার সহচরীরা বলল, বিস্ময়কর আল্লাহর মাহাত্ম্য, আমরা তাঁর স্বভাব আচরণে মন্দ কিছু দেখিনি। যুলায়খা লক্ষ্য করলেন যে, তার সহচরীরা সত্য সাক্ষ্য দিচ্ছে। এখন সত্যকে স্বীকার করা ছাড়া তার কোন উপায়ন্তর নেই। তাই সে বলল, আমি স্বীকার করছি যে, আমিই প্রকৃত দোষী, হযরত ইউসুফ আ. নির্দোষ। আমিই তাঁর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিলাম। এভাবে রাজদরবারে হযরত ইউসুফ আ. নির্দোষ প্রমাণিত হলেন অথচ সেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। যুলায়খার মুখে নিজের দোষের স্বীকারোক্তি শুনে আযীয অত্যন্ত লজ্জিত ও ব্যথিত হলেন এবং যুলায়খাকে ত্যাগ করে দিলেন। এই লজ্জা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাই কিছু দিন একাকী নির্জনে কালাতিপাত করে মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত ইউসুফ আ. তদন্তের কথা বললেন এই জন্য যে, যাতে আযীয মিশর জানতে পারে যে, আমি তার অনুপস্থিতিতে যুলায়খার মহলে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আল্লাহ বিশ্বাস হন্তাদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। তাই আজ রাজদরবারে সে কথাই প্রমাণিত হল।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে–

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ . قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ . وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ . يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ . قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ . ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ . ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ . وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ . قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ .

অর্থ: বাদশাহ বলল: আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী– এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে পরিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক। তারা বলল: এটা কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই। দু'জন কারারুদ্ধের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর স্মরণ হলো, সে বলল, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলছি। তোমরা আমাকে প্রেরণ কর। সে তথায় পৌছে বলল: হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী–তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক, আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে পথনির্দেশ প্রদান করুন: যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করাতে পারি। বলল: তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে।

অত:পর যা কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শষ্য শীষ সমেত রেখে দেবে। এবং এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর; তোমরা এ দিনের জন্যে যা রেখেছিলে, তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে। এরপরেই আসবে একবছর–এতে মানুষের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং এতে তারা রস নিঙড়াবে। বাদশাহ বলল: ফিরে যাও তোমাদের প্রভুর কাছে এবং জিজ্ঞেস কর তাঁকে: ঐ মহিলার স্বরূপ কি, যারা স্বীয় হস্ত কর্তন করেছিল! আমার পালনকর্তা তো তাদের ছলনা সবই জানেন। বাদশাহ্ মহিলাদেরকে বললেন: তোমাদের হাল-হাকিকত কি, যখন তোমরা ইউসুফকে আত্মসংবরণ থেকে ফুসলিয়েছিলে? তারা বলল: আল্লাহ্ মহান, আমরা তার সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না। আযীয–পত্নি বলল: এখন সত্য কথা প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাকে আত্মসংবরণ থেকে ফুসলিয়েছিলাম এবং সে সত্যবাদী। ইউসুফ বললেন: এটা এজন্য, যাতে আযীয জেনে নেয় যে, আমি গোপনে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আরও এই যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে এগুতে দেন না।[৩৭৭]

হযরত ইউসুফ আ. মিশরের সম্রাট:

মিশরের সম্রাট রাইয়্যান হযরত ইউসুফ আ.'র জ্ঞান গরিমায় ও নিষ্কুলুষ চরিত্রের প্রমাণ পেয়ে যখন অভিভূত হলেন তখন সম্রাট ভাবলেন এমন প্রতিভাবান অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। তাই তিনি তাঁকে কোন সম্মানজনক পদ দিয়ে নিজের কাছে রাখতে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং দূত মারফত রাজকীয় সম্মানে তাঁকে আনতে পাঠালেন। রাজদূত গিয়ে হযরত ইউসুফ আ.কে বলল, আপিন বন্দীর পোশাক খুলে এই নতুন রাজকীয় পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে চলুন সম্রাটের দরবারে। তিনি আপনাকে তলব করেছেন। বাগভী র. লিখেছেন যে, রাজদূতের মুখে সুসংবাদ শুনে হযরত ইউসুফ আ. দাঁড়িয়ে বন্দীদের জন্য দোয়া করলেন। বললেন, হে আমার প্রভু! বন্দীদের জন্য সদয় করে দিন পুণ্যশীলদের হৃদয়। তাদের জন্য গোপন করবেন না দেশ ও জাতির সংবাদ প্রবাহ। অত:পর রওয়ানা হলেন কারাগারের প্রধান ফটকের দিকে। ফটকের গায়ে লিখে দিলেন বন্দীশালা হচ্ছে জীবিতদের সমাধিক্ষেত্র। দুঃখ যাতনার আবাস, বন্ধুদের পরীক্ষাগার। শত্রুদের প্রমোদ ভবন। এরপর তিনি গোসলখানায় প্রবেশ করে উত্তমরূপে গোসল করলেন। পরিধান করলেন সম্রাটের পাঠানো মূল্যবান পরিধেয়। তাঁর সৌন্দর্য্যের ছটা বিকশিত হল আরো অধিক মনোহররূপে। তারপর তিনি যাত্রা করলেন সম্রাটের দরবারে।

[৩৭৭]. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৪৩-৫২

রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে পৌঁছে হযরত ইউসুফ আ. দোয়া করলেন- حَسْبِي رَبِّي مِنْ دُنْيَائِي وَحَسْبِيْ رَبِّيْ مِنْ خَلْقِهِ عَزَّ جَارُهُ وَجَلَّ ثَنَائُهُ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُهُ. অর্থ: আমার ইহকালের জন্য আমার পালনকর্তা যথেষ্ট এবং সকল সৃষ্টিজীবের মোকাবেলায় আমার পালনকর্তা আমার জন্য যথেষ্ট। যে তাঁর আশ্রয়ে আসে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নেই।

এরপর তিনি প্রবেশ করলেন সম্রাটের দরবারে। তখনো দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! সম্রাট- সান্নিধ্যের সুফলের চেয়ে আপনার সান্নিধ্যের সুফলই আমার অধিক কাম্য। আর তার সান্নিধ্যের অমঙ্গলাশঙ্কা থেকে আমি আপনারই সহয়তা প্রার্থী।

অতঃপর হযরত ইউসুফ আ. সম্রাটের সাথে সাক্ষাত করলেন এবং আরবী ভাষায় সালাম দিলেন। সম্রাট বললেন, এটা কোন ভাষা? উত্তরে তিনি বললেন, এটা আমার মহান পূর্বপুরুষ হযরত ইসমাঈল আ.'র আরবী ভাষা। তারপর তিনি হিব্রু ভাষায় সম্রাটের জন্য দোয়া করলেন। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন ভাষা? উত্তরে তিনি বললেন, আমার মহান পিতৃপুরুষের হিব্রু ভাষা। এ দু'টি ভাষা সম্রাটের জানা ছিল না। অথচ তিনি সত্তরটি ভাষা জানতেন। অতঃপর সম্রাট ও হযরত ইউসুফ আ.'র মধ্যে মতবিনিময় এবং কথোপকথন শুরু হল। সম্রাট যে ভাষায় কথা বলতেন তিনি সে ভাষাতেই বাক্যালাপ চালিয়ে যান। হযরত ইউসুফ আ. তখন ত্রিশ বছরের যৌবনদীপ্ত পুরুষ। সম্রাট তাঁর বাক্যালাপ শুনে অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং বসালেন আপন আসনের পাশে। তারপর সম্রাট বললেন, হে ইউসুফ! আমি আমার স্বপ্নের বিষয়টি আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই। তখন তিনি স্বপ্নের এমন বর্ণনা দিলেন যা সম্রাট নিজেই কখনো কাউকে বলেন নি। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ আ. স্বপ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা দিয়েছিলেন। তাতেই সম্রাট অবাক হয়ে পড়লেন। এরপর তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন এবং সংঘটিতব্য সমস্যার সমাধানও বাতলিয়ে দিলেন।

হযরত ইউসুফ আ. স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন এভাবে, আপনি দেখেছেন যে, সমুদ্র সৈকত থেকে সুন্দর ও মোটাতাজা সাতটি গাভী উঠে এল। এদের স্তনগুলো ছিল দুধে ভরপুর। এরপর নীল নদীর কর্দমাক্ত তীর থেকে উঠে এল আরো সাতটি শীর্ণকায় গাভী। সেগুলো ছিল হিংস্র জন্তুর ন্যায় ধারাল দাঁত ও নখর বিশিষ্ট। ওই গাভীগুলো আক্রমণ করে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিল মোটা তাজা গাভীগুলোকে। তারপর উদর পূর্তি করল সেগুলোর অস্থিচর্ম ও গোশতের দ্বারা। হে সম্রাট! আপনি তো তখন বিস্ময়ে হতবাক। এরপর দেখলেন সাতটি শ্যামল কোমল শীষ বিশিষ্ট

একটি গুচ্ছ। পরক্ষণেই দেখলেন সাতটি শুষ্ক শীষ বিশিষ্ট আর একটি গুচ্ছ। গুচ্ছ দু'টি ভাসছে তটিনীর তীব্র স্রোতে। আপনি অবাক হলেন, ভাবলেন, পানি থেকে কী করে উদগত হল শস্যের শীষ, বাতাস তখন ধীর। ওই মন্দ সমীরণে শুষ্কশীষ সাতটি ঝরে পড়ল সতেজ সবুজ শীষগুলোর উপর। সহসা হল অশনি সম্পাত। ওই অশনি সম্পাতে জ্বলতে লাগল সকল শস্যদানা। ভেসে উঠল একটি কৃষ্ণকায় অদ্ভুত আকৃতি। দৃশ্যটি একই সঙ্গে বিস্ময় বিমণ্ডিত ও ভয়ার্ত নয় কি? তখন কি আপনি ভীত হননি? সম্রাট বললেন, হ্যাঁ, হয়েছি, তবে আপনার বিবরণ আরো বেশী ভয়ংকর। সম্রাট বললেন, হে ইউসুফ! এখন বলুন আমাকে কী করতে হবে এবং এ সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কী? হযরত ইউসুফ আ. বললেন, প্রথম সাত বছর বৃষ্টিপাত হবে। এ সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে, উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের কাছে শীষ সহকারে সংরক্ষণ করতে হবে। আপনি আদেশ জারি করে দেবেন যেন প্রত্যেকে তাদের উৎপাদিত ফসলের এক পঞ্চমাংশ শীষ সহকারে সঞ্চিত রাখে। এভাবে রাষ্ট্রীয় ও জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগে যে বিশাল খাদ্যভাণ্ডার গড়ে উঠবে তা দিয়ে আপনি অনায়াসে দুর্ভিক্ষের সাত বছর অতিক্রম করতে পারবেন। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর খাদ্যের চাহিদাও আপনি মেটাতে পারবেন। কারণ এ দুর্ভিক্ষা হবে দূরদেশ অবধি বিস্তৃত। তখন তারাও আপনার মুখাপেক্ষী হবে তখন। আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন। বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারী ধনভাণ্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগত হবে। সম্রাট এই বিশাল কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ও পরামর্শ শুনে মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেন, এ বিরাট পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে করবে? তখন হযরত ইউসুফ আ. বললেন, اِجْعَلْنِي خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ হে মিশর সম্রাট! জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমাকে সোপর্দ করুন। আমি এ ব্যাপারে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ। নবুয়তের মহান উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তেই তিনি এই গুরুভার বহন করতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এরকম জনসেবা মূলক কাজের মাধ্যমে তিনি পৌঁছতে পারবেন মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি। সেই সুযোগে তিনি সত্য ধর্মের প্রচার করতে সক্ষম হবেন। তাঁর স্ব প্রণোদিত প্রস্তাবের মধ্যে পার্থিব নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বাকাংখা ছিলনা মোটেও।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে ইমাম বগভী র. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন- ভাই ইউসূফের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক- "আমাকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন" এ রকম কথা তিনি না বললে সম্রাট তাঁকে

মহাসচিবের দায়িত্ব দিতেন। তিনি স্ব-প্রণোদিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন বলেই সম্রাট তাঁকে তৎক্ষণাত দায়িত্ব না দিয়ে রাজপ্রসাদে রেখেছিলেন কিছু দিন। অর্থাৎ তাঁকে সম্রাট এক বছর পর্যন্ত রাজ প্রাসাদে রেখেছিলেন।

কোন কোন তাফসীরবিদ লিখেছেন যে, এ সময় যুলায়খার স্বামী আযীয মিশর মৃত্যুবরণ করলেন এবং বাদশাহ নিজ উদ্যোগে হযরত ইউসুফ আ.'র সাথে যুলায়খার বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। তখন হযরত ইউসুফ আ. যুলায়খাকে বললেন, তুমি যা চেয়েছিলে এটা কি তার চেয়ে উত্তম নয়? যুলায়খা স্বীয় দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তায়ালা সসম্মানে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করলেন এবং খুব আমোদ আহলাদে তাদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়।

ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তাদের দু'জন পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম ছিল ইফরাঈন ও মানশা কিংবা মাইশা। ঐতিহাসিকগণ একথাও বলেছিলেন, যুলায়খার সাথে আযীয মিশরের সাথে দৈহিক কোন সম্পর্ক স্থাপন হয়নি। কারণ আযীয ছিল নপুংশক। এভাবে আল্লাহ তায়ালা যুলায়খাকে নবী হযরত ইউসুফ আ.'র জন্য পবিত্র রেখেছিলেন।

কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, বিবাহের পর আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউসুফ আ.'র অন্তরে যুলায়খার প্রতি এত গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন যা যুলায়খার অন্তরে হযরত ইউসুফ আ.'র প্রতি ছিল না। এমনকি একবার তিনি যুলায়খাকে অভিযোগের স্বরে বললেন, তুমি পূর্বের ন্যায় আমাকে ভালবাসনা কেন? যুলায়খা আরয করলেন, আপনার উসিলায় আমি আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করেছি। এ ভালাবাসার সামনে পার্থিব সব সম্পর্ক ও চিন্তা ভাবনা ম্লান হয়ে গেছে।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, হযরত ইউসুফ আ. মিশর সম্রাট থেকে কৃষিমন্ত্রী কিংবা অর্থমন্ত্রীর পদ প্রার্থনা করেছিলেন যা সূরা ইউসুফের ৫৫ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়। অথচ সম্রাট ছিল একজন কাফের। দ্বিতীয়ত: কোন পদ প্রার্থনা করে গ্রহণ করা কতটুকু ইসলাম সম্মত? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, শাসক কাফের কিংবা যালিম হলেও তার অধীনে থেকে ন্যায় সঙ্গতভাবে দায়িত্ব পালনের এবং জনকল্যাণের সুযোগ নিশ্চত থাকলে তবে কোন দোষ নেই। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হযরত ইউসুফ আ. কাফের সম্রাটের অধীনে কোন রাজকর্মচারী কিংবা কোন শাসক হতে চান নি বরং তিনি চেয়েছিলেন সম্রাটের উপদেষ্টা হতে। সম্রাটতো নিজেই তাঁর উপদেশ ও পরিকল্পনাই গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এ দিক বিবেচনায় সম্রাট নিজেই ছিলেন এক্ষেত্রে অনুসারী। হযরত ইউসুফ আ. সম্রাটের অনুসারী ছিলেন না। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, সাধারণভবে প্রার্থনা করে কোন প্রশাসকের পদ

নেওয়া সঠিক নয়। যেমন মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদিসে আছে, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ'র নিকট একটি পদ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, اَنَّا لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَهُ অর্থ: যে ব্যক্তি নিজে পদ প্রার্থনা করে আমি তাকে সরকারী পদ দান করি না।

মুসলিমের অপর হাদিসে আছে, রাসূল ﷺ আব্দুর রহমান ইবনে সামরা রা. কে বললেন, কখনো প্রশাসকের পদ প্রার্থনা করোনা। নিজে প্রার্থনা করে যদি প্রশাসনের পদ পেয়ে ফেল, তবে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন পাবে না। ফলে তুমি ভুল-ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে বাঁচতে পারবে না। পক্ষান্তরে আবেদন ব্যতিরেকে যদি তোমাকে কোন পদ দান করা হয়, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন পাবে। ফলে তুমি পদের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

উপরোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা প্রার্থনা করে পদ নেওয়ার কুফল প্রমাণিত হয়। তবে বিশেষ অবস্থায় এরূপ পদ নেওয়া জায়েয। যেমন– যদি কোন বিশেষ পদ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান থাকে যে, দায়িত্ববান ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে দায়িত্বভার পালনে অক্ষম হবে এবং নিজে ঐ দায়িত্ব ভালরূপে সম্পাদন করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে আর কোন অন্যায় কিংবা পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকে তবে এমতাবস্থায় পদটি চেয়ে নেয়ার অনুমতি আছে। হযরত ইউসুফ আ.'র ব্যাপারটিও অনুরূপ ছিল। তাই আপত্তির কোন সুযোগ নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে ইমাম বগভী র. বর্ণনা করেছেন যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদানের এক বছর পর রাজ্য পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার হযরত ইউসুফ আ.'র উপরে ন্যস্ত করে সম্রাট অবসর গ্রহণ করলেন। সম্রাট এক বর্ণাঢ্য অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। রাজ্যের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানালেন। সকলের উপস্থিতিতে অবসর প্রাপ্ত সম্রাট তাঁর শিরে রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন। বহুবিচিত্র ও মহামূল্যবান আসনে সুশোভিত হয়ে রাজাসনে উপবেশন করলেন হযরত ইউসুফ আ.। এমনিতেই ছিলেন পৃথিবী পাগল করা সৌন্দর্য্যের সম্রাট। এখন সেই সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সংযোজিত হল রাজকীয় ঋদ্ধি। সকল সভাসদ তাঁর প্রতি নতজানু হয়ে অভিবাদন ও সম্মান প্রদর্শন করল। এত দিনেই মনে হয় এই আসনের যোগ্য ব্যক্তি আসন অলংকৃত করলেন। কি অপূর্ব দৃশ্য। যিনি ছিলেন কয়েকদিন আগে একজন কয়েদী। তারও পূর্বে ছিলেন এক কৃতদাস। মিশরে ছিলনা তাঁর কোন আপনজন। কেবল স্রষ্টার অনুগ্রহে এবং নিজ গুণে আজ তিনি মিশরের রাজাধিরাজ সফল রাষ্ট্রনায়ক। সাথে সাথে একজন আল্লাহ মনোনীত নবী। পরে সম্রাট রাইয়্যান তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা নিম্নরূপ–

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. অর্থ: বাদশাহ বলল: তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো! আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখব। অত:পর যখন তার সাথে মতবিনিময় করল, তখন বলল: নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন। ইউসুফ বলল: আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছা পৌঁছে দেই এবং আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। এবং ঐ লোকদের জন্য পরকালের প্রতিদান উত্তম যারা ঈমান এনেছে ও সতর্কতা অবলম্বন করে।[৩৭৮]

সম্রাট হযরত ইউসুফ আ.'র দরবারে ভাইদের আগমণ:

হযরত ইউসুফ আ.'র হাতে মিশরের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশের জন্যে প্রভূত সুখ স্বাচ্ছন্দ ও কল্যাণ নিয়ে আস। প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয় এবং তা অধিকতর পরিমাণে অর্জন ও সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গড়ে তোলা হয় বিরাট বিরাট শস্য ভাণ্ডার। কৃষকদের উদ্বৃত্ত শস্য ক্রয় করে খাদ্য শস্য জমা করা হল সে সব ভাণ্ডারে। নগদ মূল্যে খাদ্য বিক্রি করতে পেরে কৃষকরাও মহা খুশী। এভাবে অতিক্রম হল আনন্দের সাত বছর। তারপর শুরু স্বপ্নের ব্যাখ্যার দ্বিতীয় পর্ব। আরম্ভ হল অনাবৃষ্টি ও খরা। প্রথম বছর তেমন কোন অসুবিধা হলনা। কিন্তু দ্বিতীয় বছর থেকে দেখা দিল খাদ্যাভাব। জনতা রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হতে লাগল। নগদ মূল্যে খাদ্য বিক্রির অনুমতি দিলেন হযরত ইউসুফ আ.। আরো নির্দেশ দিলেন প্রতি দিনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য কেউ ক্রয় করতে পারবে না।

প্রাক্তন সম্রাট এবং তার পরিবার পরিজনের ও অন্যান্য সভাসদদের নিকটও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করলেন তিনি। প্রয়োজনের বেশি কাউকে খাদ্য শস্য দেওয়া হতনা। তিনি সকলের জন্য নিয়ম করে দিলেন- প্রতিদিন দুপুরে মাত্র একবেলা খাবার গ্রহণ করবে। তিনি নিজেই এই নিয়ম

[৩৭৮]- সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৫৪-৫৭

পালন করতেন। প্রাক্তন সম্রাট প্রথম প্রথম রাতের বেলায় ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়তেন। তিনি তাকে বুঝাতেন, আর বলতেন হে সম্রাট! অনুভব করতে শিখুন জঠরজ্বালা কাকে বলে।

লোকেরা প্রথম বছর খাদ্য সংগ্রহ করল নগদ অর্থের বিনিময়ে, দ্বিতীয় বছর অলংকারের বিনিময়ে, তৃতীয় বছর গৃহপালিত পশুর বিনিময়ে, চতুর্থ বছর দাস-দাসীর বিনিময়ে, পঞ্চম বছর স্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে, ষষ্ঠ বছর শিশু সন্তানদের বিনিময়ে এবং সপ্তম বছর সংগ্রহ করল আত্মবিক্রয়ের বিনিময়ে। এভাবে সমগ্র দেশের সকল মুদ্রা, অলংকার, পশুপাল, মানব সম্পদ সব কিছুর অধিকারী হলেন হযরত ইউসুফ আ.।

পরে একদিন হযরত ইউসুফ আ. প্রাক্তন সম্রাটের সাথে পরামর্শ করলেন যে, এখন তো জনসাধারণের সব কিছুই আমার আয়ত্বে। এগুলো এখন কি করব? সম্রাট বললেন, রাষ্ট্রের সব বিষয়ে এখন আপনিই একক সিদ্ধান্তদাতা। আমিও আপনার অভিপ্রায় অনুসারী। হযরত ইউসুফ আ. বললেন, আমি আল্লাহ ও আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি সকলকে মুক্তি দিলাম এবং তাদের সকল সহায় সম্পদও ফেরৎ দিলাম। ফলে সকল জনগণ আনন্দিত হয়ে তাঁর জয়গান ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল।

শুধু মিশর নয় বরং আশেপাশের দেশ গুলোতে এ দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল। চর্তুদিক থেকে বুভুক্ষু জনসাধারণ মিশরে আগমণ করতে শুরু করল। হযরত ইউসুফ আ. একটি নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে, বিদেশীরা একবারে একটি উটের বহনযোগ্য খাদ্য শস্য সংগ্রহ করতে পারবে। সে কুলীন অকুলীন যেই হোকনা কেন। দুর্ভিক্ষের কাছে অভিজাত অনভিজাত বলে কিছু নেই।

দিন দিন খাদ্য সংগ্রাহকদের সমাগম বেড়ে চলল। কিনান ও সিরিয়াতেও দেখা দিল খাদ্যাভাব। হযরত ইউসুফ আ.'র জন্মভূমি ফিলিস্তিনও দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল। পশু পালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন হযরত ইউসুফ আ. ও তাঁর গোত্রের লোকেরা। হযরত ইয়াকুব আ.'র পরিবারেও অভাব অনটন দেখা দেয়। মিশর সম্রাটের মহানুভবতার সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সেখানে অল্প মূল্যের বিনিময়ে অধিক খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। হযরত ইয়াকুব আ.ও সংবাদ শুনে তাঁর পুত্রদেরকে খাদ্য শস্য সংগ্রহের জন্য মিশর প্রেরণ করলেন। তবে বিন ইয়ামীনকে রেখে দিলেন নিজের কাছে। ইয়াকুব আ. শুনেছিলেন প্রতিজন বিদেশীকে মিশর সম্রাট এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য দেন। তাই তিনি দশপুত্রকে মিশর পাঠিয়েছিলেন। হযরত ইউসুফ আ. নিখোজ হওয়ার পর থেকে তাঁরই সহোদর ভাই বিন ইয়ামীনই ছিলেন হযরত ইয়াকুব আ.'র পুত্র হারার একমাত্র শান্তনা। তাই তিনি বিন ইয়ামীনকে পাঠান নি।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা নিম্নরূপ–

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ . قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ . وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ . وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . অর্থ: বাদশাহ বলল: তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো! আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখব। অত:পর যখন তার সাথে মতবিনিময় করল, তখন বলল: নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন। ইউসুফ বলল: আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছা পৌছে দেই এবং আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। এবং ঐ লোকদের জন্য পরকালের প্রতিদান উত্তম যারা ঈমান এনেছে ও সতর্কতা অবলম্বন করে।[৩৭৮]

সম্রাট হযরত ইউসুফ আ.'র দরবারে ভাইদের আগমণ:

হযরত ইউসুফ আ.'র হাতে মিশরের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশের জন্যে প্রভূত সুখ স্বাচ্ছন্দ ও কল্যাণ নিয়ে আস। প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয় এবং তা অধিকতর পরিমাণে অর্জন ও সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গড়ে তোলা হয় বিরাট বিরাট শস্য ভাণ্ডার। কৃষকদের উদ্বৃত্ত শস্য ক্রয় করে খাদ্য শস্য জমা করা হল সে সব ভাণ্ডারে। নগদ মূল্যে খাদ্য বিক্রি করতে পেরে কৃষকরাও মহা খুশী। এভাবে অতিক্রম হল আনন্দের সাত বছর। তারপর শুরু স্বপ্নের ব্যাখ্যার দ্বিতীয় পর্ব। আরম্ভ হল অনাবৃষ্টি ও খরা। প্রথম বছর তেমন কোন অসুবিধা হলনা। কিন্তু দ্বিতীয় বছর থেকে দেখা দিল খাদ্যাভাব। জনতা রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হতে লাগল। নগদ মূল্যে খাদ্য বিক্রির অনুমতি দিলেন হযরত ইউসুফ আ.। আরো নির্দেশ দিলেন প্রতি দিনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য কেউ ক্রয় করতে পারবে না।

প্রাক্তন সম্রাট এবং তার পরিবার পরিজনের ও অন্যান্য সভাসদদের নিকটও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করলেন তিনি। প্রয়োজনের বেশি কাউকে খাদ্য শস্য দেওয়া হতনা। তিনি সকলের জন্য নিয়ম করে দিলেন- প্রতিদিন দুপুরে মাত্র একবেলা খাবার গ্রহণ করবে। তিনি নিজেই এই নিয়ম

৩৭৮. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৫৪-৫৭

পালন করতেন। প্রাক্তন সম্রাট প্রথম প্রথম রাতের বেলায় ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়তেন। তিনি তাকে বুঝাতেন, আর বলতেন হে সম্রাট! অনুভব করতে শিখুন জঠরজ্বালা কাকে বলে।

লোকেরা প্রথম বছর খাদ্য সংগ্রহ করল নগদ অর্থের বিনিময়ে, দ্বিতীয় বছর অলংকারের বিনিময়ে, তৃতীয় বছর গৃহপালিত পশুর বিনিময়ে, চতুর্থ বছর দাস-দাসীর বিনিময়ে, পঞ্চম বছর স্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে, ষষ্ঠ বছর শিশু সন্তানদের বিনিময়ে এবং সপ্তম বছর সংগ্রহ করল আত্মবিক্রয়ের বিনিময়ে। এভাবে সমগ্র দেশের সকল মুদ্রা, অলংকার, পশুপাল, মানব সম্পদ সব কিছুর অধিকারী হলেন হযরত ইউসুফ আ.।

পরে একদিন হযরত ইউসুফ আ. প্রাক্তন সম্রাটের সাথে পরামর্শ করলেন যে, এখন তো জনসাধারণের সব কিছুই আমার আয়ত্বে। এগুলো এখন কি করব? সম্রাট বললেন, রাষ্ট্রের সব বিষয়ে এখন আপনিই একক সিদ্ধান্তদাতা। আমিও আপনার অভিপ্রায় অনুসারী। হযরত ইউসুফ আ. বললেন, আমি আল্লাহ ও আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি সকলকে মুক্তি দিলাম এবং তাদের সকল সহায় সম্পদও ফেরৎ দিলাম। ফলে সকল জনগণ আনন্দিত হয়ে তাঁর জয়গান ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল।

শুধু মিশর নয় বরং আশেপাশের দেশ গুলোতে এ দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল। চর্তুদিক থেকে বুভুক্ষু জনসাধারণ মিশরে আগমণ করতে শুরু করল। হযরত ইউসুফ আ. একটি নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে, বিদেশীরা একবারে একটি উটের বহনযোগ্য খাদ্য শস্য সংগ্রহ করতে পারবে। সে কুলীন অকুলীন যেই হোকনা কেন। দুর্ভিক্ষের কাছে অভিজাত অনভিজাত বলে কিছু নেই।

দিন দিন খাদ্য সংগ্রাহকদের সমাগম বেড়ে চলল। কিনান ও সিরিয়াতেও দেখা দিল খাদ্যাভাব। হযরত ইউসুফ আ.'র জন্মভূমি ফিলিস্তিনও দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল। পশু পালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন হযরত ইউসুফ আ. ও তাঁর গোত্রের লোকেরা। হযরত ইয়াকুব আ.'র পরিবারেও অভাব অনটন দেখা দেয়। মিশর সম্রাটের মহানুভবতার সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সেখানে অল্প মূল্যের বিনিময়ে অধিক খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। হযরত ইয়াকুব আ.ও সংবাদ শুনে তাঁর পুত্রদেরকে খাদ্য শস্য সংগ্রহের জন্য মিশর প্রেরণ করলেন। তবে বিন ইয়ামীনকে রেখে দিলেন নিজের কাছে। ইয়াকুব আ. শুনেছিলেন প্রতিজন বিদেশীকে মিশর সম্রাট এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য দেন। তাই তিনি দশপুত্রকে মিশর পাঠিয়েছিলেন। হযরত ইউসুফ আ. নিখোজ হওয়ার পর থেকে তাঁরই সহোদর ভাই বিন ইয়ামীনই ছিলেন হযরত ইয়াকুব আ.'র পুত্র হারার একমাত্র শান্তনা। তাই তিনি বিন ইয়ামীনকে পাঠান নি।

দশভাই একত্রে মিশর পৌছলে হযরত ইউসুফ আ. অবহিত হলেন যে, সিরিয়া থেকে কয়েকজন অতিথি এসেছে। অতিথিশালায় তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হল। হযরত ইউসুফ আ.'র শাহী পোশাকে রাজ্যাধিপতির বেশে আসনে বসে তাদেরকে তলব করলেন। তারা আসলে হযরত ইউসুফ আ. দেখামাত্র তাদেরকে চিনে ফেললেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনল না। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর চেনার কথাও নয়। এই দীর্ঘ সময়ে মানুষের আকার অবয়ব পরিবর্তন হয়ে যায়। তাদের কল্পনায়ও ছিল না যে, যে বালককে তারা গোলামরূপে বিক্রি করেছিল, সে কোন দেশের মন্ত্রী বা বাদশাহ হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া হযরত ইউসুফ আ. ছিলেন রাজকীয় পোশাকে সুসজ্জিত।

হযরত ইউসুফ আ. তাদের সাথে আলাপ আরম্ভ করলেন এবং এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, যেমন– সন্দেহযুক্ত লোকদের করা হয়। যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটন করে। প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন- তোমরা মিশরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষা হিব্রু। তারা বলল, আমরা মিশরের অধিবাসী নই। আমরা সিরিয়ার এক পশু পালক পরিবারের লোক। আমাদের অঞ্চল এখন ভয়ানক অন্নসংকটে নিপতিত। আমরা আপনার প্রশংসা শুনে খাদ্য সংগ্রহের জন্য এখানে এসেছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন যে, সম্ভবত; তোমরা গুপ্তচর। তারা বলল, আমরা গুপ্তচর নই। আমরা সকলেই সহোদর ভাই এবং একই পিতার সন্তান। আমাদের পিতা হলেন বয়োপ্রবীন ও মহানুভব নবী হযরত ইয়াকুব আ.। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত? তারা বলল, মোট বার ভাই। এখানে এসেছি দশ ভাই। তম্মধ্যে এক কনিষ্ঠ ভাই শৈশবে জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। ছোট আর এক ভাই বর্তমান পিতার সান্নিধ্যে। নিখোঁজ ভাইকেই পিতা সর্বাদিক আদর করতেন।

হযরত ইউসুফ আ. তাদের সবকথা শুনে তাদের যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা আবার এলে অবশ্যই তোমদের বৈমাত্রেয় ভাইকে সঙ্গে নিয়ে আসবে অন্যথা তোমাদেরকে কোন খাদ্য শস্য দেওয়া হবে না। তাকে ছাড়া তোমরা আসবেই না। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তারা লটারীর মাধ্যমে এক ভাইকে জামানত হিসাবে বাদশাহ'র কাছে মিশরে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সুতরাং লটারীতে নাম উঠল শামউনের। তারা শামউনকে জামানত হিসাবে মিশরে রেখে সিরিয়ায় পিতার নিকট চলে গেল।

হযরত ইউসুফ আ. ভাইদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে একটি গোপন কৌশল করলেন। ভাইয়েরা খাদ্য শস্য মূল্য বাবৎ যেসব নগদ অর্থকড়ি কিংবা অলংকার জমা দিয়েছিল সেগুলি গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেয়ার জন্যে

কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন। যাতে বাড়ী পৌছে যখন আসবাবপত্র খুলে নগদ অর্থকড়ি ও অলংকার পাবে, তখন যেন পুর্নবার খাদ্যশস্য নেয়ার জন্যে আসতে পারে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। তা হল হযরত ইউসুফ আ. এই দীর্ঘ চল্লিশ বছরে একবারের জন্যও পিতার নিকট তার সংবাদ দেওয়া কিংবা পিতার সংবাদ নেওয়া ইত্যাদি কিছুই করলেন না। এ সুযোগ তাঁর অনেক বার হয়েছিল। মিশরের সম্রাট হওয়ার পর পিতার সংবাদ নেওয়া সহজও ছিল। এমনকি খাদ্য শস্য নিতে আসা ভ্রাতারা খাদ্যশস্য নিয়ে চলে গেল তখনও আসল ঘটনা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিদায় দিলেন। এ অবস্থা একজন সাধারণ মানুষ থেকেও কল্পনা করা যায় না। অথচ তিনি একজন আল্লাহর মনোনীত নবী হয়ে তা কিভাবে বা কেন বরদাশত করেছিলেন। এর উত্তরে বলা হবে যে, আল্লাহ তায়ালা বিশেষ রহস্যের কারণে হযরত ইউসুফ আ.কে আত্মপ্রকাশ থেকে বিরত রেখেছিলেন। আর বাহ্যত সেই রহস্য হল হযরত ইয়াকুব আ.'র পরীক্ষার পূর্ণতা দান করা এবং হযরত ইউসুফ আ.'র স্বপ্নের বাস্তবতা প্রকাশ করা।

হযরত ইউসুফ আ.'র নয় ভাই খাদ্যশস্য নিয়ে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। হযরত ইয়াকুব আ. কে গিয়ে বলল, হে আমাদের পিতা! আমরা মিশর সম্রাটের আতিথ্যে মুগ্ধ, অভিভূত। আমরা সেখানে বিশেষ অতিথি হিসাবে দিনযাপন করেছি। ইয়াকুব আ. বললেন, এবার গেলে অবশ্যই তাঁকে আমার সালাম পৌছে দিও আর বলিও তাঁর অত্যুত্তম আচরণের কারণে আমি তাঁর জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ তাঁর প্রতি কৃপাবর্ষণ করুন। পিতা জানতে চাইলেন শামউন কোথায়? তারা বলল, সম্রাট তাকে জামিন হিসাবে রেখে দিয়েছেন। তারপর তারা পুরো ঘটনার বিবরণ দিল পিতাকে। আরো বলেছে যে, মিশর সম্রাট ভবিষ্যতে আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেয়ার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। বলেছেন, ছোট ভাই বিনইয়ামিনকে সাথে নিয়ে গেলে খাদ্যশস্য দিবে অন্যথা নয়। তাই আগামীতে আপনি বিনইয়ামিনকে আমাদের সাথে দেবেন। আমরা তাকে পুরোপুরি হেফাযত করব। তার রক্ষণাবেক্ষণে আমরা কোন ত্রুটি করবনা। পিতা বললেন, আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? চল্লিশ বছর পূর্বে ইউসুফকে নিয়ে যাবার সময়েও তোমরা এরকম বলেছিলে। তখনো তোমাদের কথা বিশ্বাস করেছিলাম আজও করছি। তবে আমার প্রকৃত বিশ্বাস এই যে, আল্লাহই শ্রেষ্ঠ হেফাযতকারী। তিনি সর্বাধিক দয়ালু। অর্থাৎ তিনি সন্তানদের উপর সম্পূর্ণ ভরসা না করে আল্লাহর

উপরই সম্পূর্ণ ভরসা করে এবং আল্লাহর দয়ায় বিশ্বাসী হয়ে ছোট ছেলেকেও ভাইদের সাথে মিশরে প্রেরণ করতে সম্মত হলেন।

এতক্ষণ মিশরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই তাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল। আসবাবপত্র তখনও খোলা হয়নি। অতঃপর যখন তাদের আসবাবপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদের পণ্যমূল্য আসবাবপত্রের মাধ্যমে ফেরত দেয়া হয়েছে। তখন তারা আনন্দিত হয়ে পিতাকে বলল, আমরা আর কি চাই? মিশর সম্রাট আমাদেরকে রাজকীয় মর্যাদায় রেখেছেন, খাদ্যশস্য দ্বারা আমাদের উট বোঝাই করে দিয়েছেন। আবার পরিশোধিত পণ্যমূল্য গোপনে আমাদেরকে ফেরত দিয়েছেন। এর চেয়ে বেশী আর কী আশা করতে পারি আমরা? কোন ভাষায় প্রকাশ করব আমরা তাঁর বদান্যতার কথা? পুনরায় খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য আপনার কাছে নতুন কোন তহবিলের প্রত্যাশী নই। যে পণ্যমূল্য আমরা ফেরৎ পেয়েছি, তাই নতুন খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট। আপনি শুধু বিনইয়ামিনকে আমাদের সাথে দিলেই হবে। যা এনেছি তা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। বিনইয়ামিন সাথে গেলে আরো এক উট বোঝাই পণ্য অতিরিক্ত পাব। যেহেতু সম্রাটের মহানুভবতা সুপ্রমাণিত। সুতরাং বিনইয়ামিনকে আমাদের সাথে পাঠাতে সম্মত জ্ঞাপন করুন।

তখন পিতা হযরত ইয়াকুব আ. বললেন, হে আমার সন্তানরা! তোমরা আমার নিকট এই মর্মে শপথ কর যে, বিনইয়ামিনকে তোমরা আমার কাছে ফেরৎ আনবেই। এরকম শপথ না করা পর্যন্ত আমি তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না। তবে তোমরা যদি অপারগ হয়ে পড় তা ভিন্ন কথা।

কথিত আছে যে, তারা শপথ করেছিল আল্লাহ ও শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ'র নামে। তাই হযরত ইয়াকুব আ. বিনইয়ামিনকে তাদের সঙ্গে মিশর গমণের ব্যাপারে আর আপত্তি তুলতে পারেন নি। তবে তিনি বিষয়টি اللهُ عَلَى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ আমাদের কথাবার্তার ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল বলে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কা'ব আহবার বলেন, এবার হযরত ইয়াকুব আ. শুধু সন্তানদের উপর ভরসা করেন নি বরং ব্যাপারটি আল্লাহর উপর সোপর্দ করেছেন। তাই আল্লাহ বললেন, আমার ইজ্জত ও প্রতাপের শপথ! এখন আমি আপনার উভয় সন্তানকেই আপনার কাছে ফেরত পাঠাব।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে-

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ . وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ
قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ . فَإِنْ لَمْ

تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ . قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ .
وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ . فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ . قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ
حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا
أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ
كَيْلٌ يَسِيرٌ . قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ
بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ . অর্থ: ইউসুফের ভ্রাতারা আগমন করল, অত:পর তার কাছে উপস্থিত হল। সে তাদেরকে চিনল এবং তারা তাকে চিনল না। এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিল, তখন সে বলল: তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখ না যে, আমি পুরা মাপ দেই এবং মেহমানদেরকে উত্তম সমাদার করি? অত:পর যদি তাকে আমার কাছে না আন, তবে আমার কাছে তোমাদের কোন বরাদ্দ নেই এবং তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না। তারা বলল: আমরা তার সম্পর্কে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমাদেরকে একাজ করতেই হবে। এবং সে ভৃত্যদেরকে বলল: তাদের পণ্যমূল্য তাদের রসদ-পত্রের মধ্যে রেখে দাও- সম্ভবত: তারা গৃহে পৌঁছে তা বুঝতে পারবে, সম্ভবত: তারা পুনর্বার আসবে। তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল, তখন বলল: হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্যে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন; যাতে আমরা খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি এবং আমরা অবশ্যই তার পুরোপুরি হেফাযত করব। বললেন, আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে কি সেরূপ বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম? অতএব আল্লাহ্ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু। এবং যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পণ্যমূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল: হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি চাইতে পারি! এই আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। এখন আমরা আবার আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে রসদ আনব এবং আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব এবং এক উটের বরাদ্দ খাদ্যশস্য আমরা অতিরিক্ত আনব। ঐ বরাদ্দ সহজ। বললেন, তাকে কক্ষনও তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহ্র

নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছে দেবে; কিন্তু যদি তোমরা সবাই একান্তই অসহায় না হয়ে যাও। অত:পর যখন সবাই তাঁকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন: আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হলো সে ব্যাপারে আল্লাহ্ই মধ্যস্থ রইলেন।[৩৭৯]

বিনইয়ামিন সহ দ্বিতীয়বার মিশর সফর:

হযরত ইয়াকুব আ. বিনইয়ামিনসহ তাঁর দশ সন্তানকে মিশরে খাদ্যশস্য আনার জন্য দ্বিতীয়বার প্রেরণ করলেন। প্রেরণকালে তিনি সন্তানদেরকে বলেছিলেন- তোমরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশের সময় পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করিও। কারণ সুদর্শন দশ ভাই একত্রে প্রবেশ করলে তাদের উপর অসৎ লোকের বদনজর পড়তে পারে। প্রথমবার এই উপদেশ তিনি দেননি। কারণ তখন তাদেরকে সেখানে কেউ চিনত না। প্রথমবার রাজকীয় আতিথ্য লাভের পর এখন তারা বেশ পরিচিত। তিনি বলেছেন, এটি হচ্ছে সতর্কতা অবলম্বন মাত্র। না হয় অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

অতঃপর পিতার উপদেশ মতে তারা ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। রাজদরবারে প্রবেশের দ্বার ছিল চারটি। তারা পূর্বাহ্নে চার দলে বিভক্ত হয়ে চার দরজা দিয়ে প্রবেশ করে সম্রাট সকাশে উপস্থিত হল। বলল, হে মহামান্য সম্রাট! আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রেখেছি। ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এবার আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি পালন করুন। সম্রাট খুশী হয়ে তাদেরকে সাধুবাদ দিলেন আর তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন অতিথিশালায়। তারা হল সম্রাটের বিশেষ মেহমান। আহারের সময় হলে পরিচারক এসে বলল, ভোজনালয়ে চলুন, সম্রাট আপনাদেরকে নিয়ে আহার করবেন। ভোজনালয়ে গেলে তাদেরকে বলা হয়– আপনারা দু'জন দু'জন মুখোমুখি হয়ে জোড়ায় জোড়ায় উপবেশন করবেন। সেভাবেই বসল সবাই। এভাবে পাঁচ জোড়া পূর্ণ হয়ে দশজন বসে গেল আর বিনইয়ামিন পড়ে গেল একা। সম্রাট এগিয়ে এসে বললেন, বিনইয়ামিনের তো কোন আহার সঙ্গী জুটল না। ঠিক আছে আমিই হলাম তার সঙ্গী।

সকলের সামনে সাজানো হয়েছে রাজকীয় আহার্য সম্ভার। আল্লাহর নামে শুরু হল পানাহার পর্ব। দশ ভাই যত ভাবে, ততই আশ্চর্য হয়। তাদের অদৃষ্টে আজ এক অভূতপূর্ব আপ্যায়ন। আর বিনইয়ামিনের সৌভাগ্যের তো তুলনাই হয়না। স্বয়ং মিশরাধিরাজ আজ তার ভোজনসঙ্গী। দিবাবসান হল। পূর্বের

---

[৩৭৯]. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৫৮-৬৬

নিয়মে নিশীথের পানাহার পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর দেখল, প্রতি দু'জনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে একটি করে শয়ন কক্ষ। এবারেও দেখা গেল সকলে জোড়ায় জোড়ায় শয়ন কক্ষে প্রবেশের পর বিনইয়ামিন হয়ে পড়েছে একা। সম্রাট বললেন সেতো এবারেও নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। ঠিক আছে আমিই রাত্রিযাপন করব তার প্রকোষ্ঠে।

পরের দিন সম্রাট ঘোষণা দিলেন। বিনইয়ামিন নিঃসঙ্গ। সুতরাং এখন থেকে সদরে অন্দরে সব সময় সে আমার সঙ্গে থাকবে। বিনইয়ামিনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এখন থেকে তুমি আমার ভাই। একদা তিনি তাকে একান্তে বললেন, তোমার নাম কী? সে বলল, বিনইয়ামিন। সম্রাট বললেন, অর্থ কী? বিনইয়ামিন বলল, পরলোকগমণকারিণীর সন্তান। আমার জন্মের সময় আমার জন্মদাত্রী মাতা পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বলেই আমাকে এ নামে ডাকা হয়। সম্রাট বললেন, শুনেছি তোমার অগ্রজকে শৈশবে বাঘে নাকি খেয়ে ফেলেছে? মনে কর আমিই তোমার সেই ভাই। তুমি কি খুশী হওনি? বিনইয়ামিন বলল, সম্রাটকে ভাইরূপে পাওয়ার সৌভাগ্য ক'জনের কপালে জুটে। কিন্তু আপনি তো আর নবী ইয়াকুব আ. ও তাঁর পূর্ণবর্তী সহধর্মিণী রাহীলের সন্তান নন। একথা শুনে কেঁদে ফেললেন সম্রাট। বিনইয়ামিনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অনেক্ষণ ধরে অশ্রুপাত করলেন অঝোর ধারায়। নিজের পরিচয় প্রকাশ করলেন। বললেন, আদরের ভাই আমার। আমি শৈশবে হারিয়ে যাওয়া তোমার সেই আসল ভাই। আমি ইউসুফ! তোমার ও আমার পিতামাতা এক। সৎ ভাইয়েরা আমাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে দিয়েছিল। এক বণিক দল আমাকে উদ্ধার করেছিল। আল্লাহই আমার জীবন রক্ষা করেছেন। এভাবে অদৃষ্টের স্রোতে ভাসতে ভাসতে আমাকে এখানে এনেছেন। অনেক ঘাত প্রতিঘাত, অপবাদ, কারাবাস ইত্যাদির পর আমাকে বানিয়েছেন মিশরের সম্রাট। ভাই! আমার, কাহিনী তো শুনলে। দুঃখ করোনা। আল্লাহ আমাদের প্রতি মেহেরবান। দেখো, তিনিই আজ আমাদেরকে মিলিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আল্লাহর। সৎ ভাইদের নির্মম আচরণের কথা ভেবে দুঃখিত হয়োনা।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে–

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ
مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ . وَلَمَّا
دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ

يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ . وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . অর্থ: ইয়াকুব বললেন: হে আমার বৎসগণ! সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহ্‌র কোন বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহ্‌রই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের। তারা যখন পিতার কথামত প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের বাঁচাতে পারল না। কিন্তু ইয়াকুবের সিদ্ধান্তে তাঁর মনের একটি বাসনা ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছেন। এবং তিনি তো আমার শেখানো বিষয় অবগত ছিলেন। কিন্তু অনেক মানুষ অবগত নয়। যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন সে আপন ভ্রাতাকে নিজের কাছে রাখল। বলল: নিশ্চই আমি তোমার সহোদর। অতএব তাদের কৃতকর্মের জন্যে দুঃখ করো না।[৩৮০]

বিনইয়ামিনকে মিশরে রেখে দেয়ার কৌশল:

হযরত ইউসুফ আ.'র ভাইয়েরা দেশে ফিরতে মনস্থ করল, তাদের উটগুলো খাদ্য শস্যের বোঝা দ্বারা সজ্জিত করা হল। সম্রাটের নির্দেশে তখন বিনইয়ামিনের মাল-পত্রের ভিতরে সঙ্গোপনে সম্রাটের বিশেষ পান পাত্রটি রেখে দেয়া হল। মালপত্র নিয়ে তারা সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করল। শহর অতিক্রম করে কিছু দূর গেলেই দেখল পিছন থেকে দৌড়ে আসছে এক রাজ কর্মচারী। সে চিৎকার করে ঘোষণা করল যে, হে যাত্রীদল! থাম, তোমরা নিশ্চয় চোর। সম্রাটের বিশেষ মূল্যবান পান পাত্রটি পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে তোমরা ছাড়া বাইরের কোন অতিথি আসে নি। সুতরাং তোমাদের কেউ এই পানপাত্রটি চুরি করেছ। ঘোষকের কথা শুনে যাত্রীদল থামল আর বলল, তোমাদের কী চুরি হয়েছে? ঘোষক ও তার সঙ্গীরা বলল, আমরা সম্রাটের বিশেষ পান পাত্রটি খুঁজে পাচ্ছিনা। সম্রাট বলেছেন, যে পানপাত্রটির সন্ধান দিতে পারবে পুরষ্কার হিসাবে পাবে সে মালপত্র বোঝাই করা একটি উট। আর পুরষ্কার প্রদানের দায়িত্বও আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। আমাদের ধারণা পানপাত্রটি তোমাদের মালপত্রের মধ্যে রয়েছে। তারা আল্লাহর শপথ করে বলল, তোমরা তো জান আমরা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি। আর আমরা চোরও নই। এ নিয়ে আমরা দু'বার এখানে এসেছি। বেশ কিছুদিন এখানে অবস্থানও করেছি। গতবার আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য আমাদের মালপত্রের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। সেই পণ্যমূল্য আমরা

৩৮০. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৬৭-৬৯

এবার ফেরতও দিয়ে গেলাম। আমাদের আসা যাওয়াতে আমাদের বাহনগুলো যাতে কারো ফসল ভক্ষণ করতে না পারে সেজন্য সেগুলোর মুখ বেঁধে রেখেছি।

ঘোষক ও তার সঙ্গীরা বলল, ঠিক আছে, তোমাদের কথা সত্য। তবে যদি তোমরা চোর প্রমাণিত হও তবে বল তার শাস্তি কী হতে পারে? তারা বলল, আমাদের মালপত্র খুলে দেখ। যদি কারো মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যায় তবে তার শাস্তি হবে দাসত্ব। আমরা নবী ইয়াকুব আ.'র উম্মত। তাঁর শরিয়তের বিধান মতেই এ অপরাধের এই শাস্তি। একথা শুনে অনুসন্ধানকারী দলটি বলল, ঠিক আছে। তোমাদের বিধান মতোই শাস্তি হবে। তবে আমাদের সঙ্গে রাজ দরবারে চল। সেখানে রাজার উপস্থিতিতে তোমাদের মালপত্র গুলো তল্লাশী করা হবে।

রাজদরবারে বিনইয়ামিনের মালপত্র ছাড়া অন্যদের মালপত্র অনুসন্ধান করে দেখা হল। কিন্তু পাত্রটি পাওয়া গেল না। বিষয়টি যে পরিকল্পিত একথা যাতে ভাইয়েরা বুঝতে না পারে তাই তদের মালপত্র আগে খুঁজে দেখা হল। অনুসন্ধানকারীরা দশ ভাইয়ের মালপত্রে পাত্রটি না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ল। বিন ইয়ামিনের মালপত্র তল্লাশী করার আগ্রহ তাদের মধ্যে দেখা গেল না। তখন দশ ভাই বলল, বিনইয়ামিনের মালপত্র তল্লাশী না করা পর্যন্ত আমরা অগ্রসর হব না। অতএব, আপনারা সেটিও তল্লাশী করুন। যাতে আমরা সন্দেহমুক্ত হই। তারপর তারা বিনইয়ামিনের মালপত্রের তল্লাশী করলে সেখানে একটি বস্তার মধ্যে পাওয়া গেল পানপাত্রটি। লজ্জায় মস্তক অবনত হয়ে গেল দশ ভাইয়ের। তারা বিনইয়ামিনকে গাল-মন্দ দিয়ে বলল, তুমি আমাদের মুখে চুনকালি দিলে। মূলত: এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ইউসুফ আ.'র ভাইকে রেখে দেয়ার খাতিরে একটি কৌশল ছিল। কারণ মিশরের আইনে চোরকে মারধর করে চোরাই মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেওয়ার বিধান ছিল। কিন্তু এখানে তারা হযরত ইউসুফ আ. ভ্রাতাদের নিকট থেকে ইয়াকুব আ.'র শরয়ী বিধানানুযায়ী চোরের শাস্তি বিধান জেনে নিয়েছিল। এভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত ইউসুফ আ.'র মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ হল।

বিনইয়ামিনের সরঞ্জামে পানপাত্রটি পাওয়া যাওয়ার পর দশ ভাইয়েরা বলল, বিনইয়ামিন যদি চুরি করে থাকে তবে তা অসম্ভব নয়, করতে পারে। কারণ তার এক বড় ভাই ছিল সেও এমনিভাবে ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। অর্থাৎ সে আমাদের সহোদর ভাই নয়– বৈমাত্রেয় ভাই।

এখানে হযরত ইউসুফ আ.'র ভাইয়েরা হযরত ইউসুফ আ.'র প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। এতে হযরত ইউসুফ আ.'র শৈশবকালীন একটি ঘটনার

দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। ঘটনাটি হযরত ইউসুফ আ.'র শৈশব অবস্থার বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। যেটি তাঁর ফুফু তাঁকে নিজের কাছে রাখার জন্য কৌশল করেছিল। সেখানেও মূলত হযরত ইউসুফ আ. সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন- কথাটি ভাইদেরও জানা ছিল। কিন্তু বিনইয়ামিনের বিরোদ্ধচারণ করতে গিয়ে এবং নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণিত করার লক্ষ্যে এরূপ বলে দিয়েছিল।

কেউ কেউ বলেছেন- তাদের কথাটি অন্য ঘটনার দিকে ইঙ্গিত বহন করে। তা হল- বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ আ.'র নানা ছিলেন প্রতিমা পূজক। তিনি তাঁর নানার সেই প্রতিমাটি নিয়ে ভেঙ্গে চুরে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল নানার প্রতিমা পূজা বন্ধ করা।

আবার কেউ কেউ বলেন, একদিন এক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইল। তখন তিনি ঘর থেকে গোপনে কিছু খাদ্যদ্রব্য দিয়েছিলেন ভিক্ষুককে। দশ ভাই সেই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে তাঁকে চোর বলেছিল। ঘটনা যেটাই হোক, মূলত একটাও চুরি ছিল না। কিন্তু সৎ ভাইয়েরা হিংসা বশত তাঁকে চোর বলেছিল।

যা হোক ভাইদের কথা শুনে হযরত ইউসুফ আ. বিচলিত হলেন না। তাদের প্রদত্ত অপবাদ খণ্ডনের চেষ্টাও করলেন না। মনের কথা মনেই রেখে দিলেন, আর মনে মনে বললেন, তোমরা আমাকে চোর বলছ, অথচ তোমরা তো চোরের চেয়েও নিকৃষ্ট। তোমাদের কথা সত্যি কি মিথ্যা তা আল্লাহই ভালো জানেন।

বিনইয়ামিনকে নিয়ে সম্রাট প্রাসাদে চলে গেলেন। নিরূপায় দশভাই অসহায় নেত্রে তাকিয়ে রইল কেবল। ক্ষোভে, দুঃখে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। এরপর রাগে ফুসতে লাগল তারা। হযরত ইয়াকুব আ.'র পুত্রগণের স্বভাব ছিল একবার তারা রেগে গেলে তাদেরকে সামলানো মুশকীল হয়ে পড়ত। রুবেলের রাগ ছিল সবচেয়ে বেশী। রাগান্বিত হলে বিকট চিৎকার দিত সে। সেই ভয়ঙ্কর চিৎকারে গর্ভিণী নারীর গর্ভপাত ঘটে যেত। আরো একটি বিশেষত্ব ছিল তাদের। রাগের সময় কেউ তাদেরকে স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাগ পানি হয়ে যেত। কেউ কেউ বলেন, এই বিশেষত্বটি ছিল শামউনের।

বিনইয়ামিনকে ছাড়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের কল্পনাই করতে পারছিলোনা দশ ভাই। পরদিন রাগান্বিত অবস্থায় তারা পুনরায় উপস্থিত হল রাজ দরবারে। রুবেল বলল, মহামান্য সম্রাট! বিনইয়ামিনকে ফিরিয়ে দিন। না হয় আমি এমন বিকট চিৎকার দেব যে, শহরের গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত ঘটে যাবে। সম্রাটের পাশে ছিল তার এক শিশু সন্তান। তিনি তাকে বললেন, যাও ওই লোকটিকে ছুয়ে এসো। এরকম বর্ণিত আছে যে, সম্রাট তার শিশু পুত্রকে বললেন, লোকটির হাত ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো তো বাবু। শিশুটি এগিয়ে লোকটির হাত

স্পর্শ করল। নিমিষেই রুবেলের ক্রোধ চলে গেল। সে অবাক হয়ে বলল, নিশ্চয় এখানে হযরত ইয়াকুব আ.'র বংশের কেউ রয়েছে।

এক বর্ণনায় এসেছে, পুনরায় রাগান্বিত হলো রুবেল। সম্রাট তখন অগ্রসর হয়ে তাকে ধাক্কা দিলে সে ধরাশায়ী হল। তিনি বললেন, হে সিরিয়াবাসী! তোমরা কি মনে কর তোমাদের চেয়ে শক্তিশালী কেউ নেই? দশভাই সম্রাটের এরূপ আচরণ দেখে পরাজয় মানল। নিজেরা সলাপরামর্শ করে ঠিক করল, না, এভাবে আমরা আমাদের কাজে সফল হব না। বরং বিনয়ের সাথে সম্রাটের নিকট আবেদন নিবেদন করতে হবে।

তখন প্রার্থনা করল, হে মিশর সম্রাট! এর পিতা অতিশয় বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল। এর বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই এর পরিবর্তে আপনি আমাদের একজনকে গ্রেফতার করুন। আমরা দেখছি আপনি খুবই অনুগ্রহশীল। আপনি আমাদের প্রতি সদয় হোন। পূর্বেও আমাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। এখন এই শেষ আবেদনটি মহানুভবতার মাধ্যমে গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, না, তা হয় না। যার মালপত্রে আমাদের পাত্র পেয়েছি তাকেই রাখতে হবে। অন্য একজনকে আটকে রাখলে তা হবে অন্যায়। এরকম অন্যায় আমরা করিনা। এরূপ যুলুম অন্যায় থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তাছাড়া তোমরাই তো ফতোয়া দিয়েছ যে, যার কাছে চোরাই মাল পাওয়া যাবে, সেই তার শাস্তি পাবে।

হযরত ইউসুফ আ.'র ভাইয়েরা বিনইয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে যখন নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরস্পর পরামর্শ করার জন্যে নির্জনে একত্রিত হলো। তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই (ইয়াহুদ/রুবেল/শামউন) বলল, তোমরা কি জাননা পিতা তোমাদের কাছ থেকে বিনইয়ামিনকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে কঠিন শপথ নিয়েছিলেন। তোমরা ইতিপূর্বেও ইউসূফের ব্যাপারে একটি মারাত্মক অন্যায় করেছ। এখন কীভাবে পিতাকে মুখ দেখাবে। সুতরাং আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মিশর ত্যাগ করবনা, যতক্ষণ পিতা নিজেই আমাকে এখান থেকে যাওয়ার আদেশ না দেবেন অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে এখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ না আসে।

সেই বড় ভাই বলল, আমি এখানেই থাকব। তোমরা পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বিনইয়ামিনের চুরির কথা তাঁকে বলবে। যা সত্য তাইতো পিতাকে বলবে। আরো বলবে যে, আমরা যা দেখেছি এবং যা জানি কেবল তাই আপনাকে বলছি। আমাদের সামনেই তার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে। আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা সম্পর্কে সচেতন ছিলাম। কিন্তু

অদৃশ্যের বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য ছিলনা। অর্থাৎ সে যে আমাদের অজ্ঞাতে চুরি করে গ্রেফতার হবে তা আমাদের জানা ছিলনা অথবা এর অর্থ হবে আমরা বিনইয়ামিনকে চুরি করতে দেখিনি কিন্তু তদন্তকালে তারই আসবাবপত্র থেকে হারিয়ে যাওয়া পানপাত্রটি বের করতে দেখেছি। এর বাইরে আমাদের অজান্তে কিছু হয়ে থাকলে তা আমাদের বোধগম্য নয়।

অতঃপর ইয়াকুব আ.'র সন্তানগণ দীর্ঘপথ অতিক্রম করে দেশে ফিরে এল এবং ইয়াকুব আ. কে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনাল। তারা তাঁকে আশ্বস্ত ও বিশ্বস্ত করতে চাইল যে, যাবতীয় বৃত্তান্ত সত্য এবং তারা সত্যবাদী। তাই তারা পিতাকে বলল, আপনি চাইলে মিশরবাসীদের কাছে কিংবা মিশর থেকে কিনানে আগত কাফেলার লোকজনের কাছেও জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু হযরত ইউসুফ আ.'র ব্যাপারে তারা একবার তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তাই এবারও তিনি তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। যদিও এবার তারা সত্যবাদী। তাই হযরত ইউসুফ আ.কে হারিয়ে তিনি যা বলেছিলেন এবারও তা বললেন। বললেন– بل سولت لكم انفسكم امرًا فصبر جميل অর্থাৎ তোমরা বরং মনগড়া কথা বলছ। কিন্তু আমি এবারও সবর করব। সবরই আমার জন্যে উত্তম। তবে আমার মনে হয় তোমাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিলনা। চোরকে ক্রীতদাস বানানোর নিয়ম মিশর সম্রাট জানল কীভাবে? তাদের দেশের নিয়মতো সেটা নয়। এটাতো আমার শরীয়তের বিধান। নিশ্চয়ই তোমরাই বিনইয়ামিনকে ক্রীতদাস বানিয়ে আমার কাছ থেকে দূরে সরানোর দূরভিসন্ধি করে মিশর রাজকে এই বিধান বলে দিয়েছ। এখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করবনা। ধৈর্য্যই আমার সম্বল। হয়ত শীঘ্রই একদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের উভয়কে এক সাথে আমার নিকট এনে দেবেন। তিনি সন্তানদের কথা মেনে নেননি বরং আল্লাহর কাছে প্রার্থনার সুরে আকাংখা করেছেন যেন আল্লাহ সব ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে তাঁর পুত্রদ্বয়কে তাঁরই নিকট ফিরিয়ে দেবেন।

হযরত ইয়াকুব আ. দ্বিতীয়বার আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর সন্তানদের থেকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আফসোস ইউসুফের জন্য। হযরত ইউসুফ আ.'র বিরহে কাঁদতে কাঁদতে তিনি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চোখ দু'টি শ্বেত বর্ণ ধারণ করল। দৃষ্টিহীন অবস্থায় ছিলেন তিনি ছয় বছর। কিন্তু মনের দুঃখ মনেই হজম করেছেন। প্রকাশ্যে বিলাপ করতেন না। শোকাকুল পিতাকে লক্ষ্য করে সন্তানরা বলল, আল্লাহর কসম, আপনি তো সদা সর্বদা ইউসুফকে স্মরণ করতে থাকেন। এভাবে চলতে থাকলে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হবেন।

সাধারণত সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষ দুঃখ বেদনা ভুলে যায়। কিন্তু এত দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও আপনি প্রথম দিনের মত ইউসুফের শোকে শোকাহত। উত্তরে পিতা বললেন, আমি আমার ফরিয়াদ, দুঃখ কষ্টের বর্ণনা তোমাদের কারো কাছে করিনা বরং দয়াময় আল্লাহর কাছেই করি। সুতরাং আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। তিনি আরো বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি এমন কিছু জানি যা তোমরা জাননা। অর্থাৎ আল্লাহ আমাকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করেছেন যে, ইউসুফ জীবিত। দীর্ঘদিন পর তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতও ঘটাবেন। অথবা আমি জানি যে, ইউসুফের স্বপ্ন সফল হবে। একসময় আমি ও তোমরা সকলে তাঁকে সিজদা করব। কিন্তু এ কথাটি তোমরা জাননা।

বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ইয়াকুব আ.'র সঙ্গে সাক্ষাত করলেন হযরত আযরাঈল আ.। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে পুতঃপবিত্র মৃত্যুদূত! তুমি কি আমার প্রিয় পুত্র ইউসূফের প্রাণ হরণ করেছ? আযরাঈল আ. বললেন, না। ইয়াকুব আ. তখন খুশী হলেন এবং পুত্র দর্শনের প্রতীক্ষায় রইলেন।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে–

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ . قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ . قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ . قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ . قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ . قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ . فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ . قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ . قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ . قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ . فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ . ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ . وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ
لَصَادِقُونَ . جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ . وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ
الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ . قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ
الْهَالِكِينَ . قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

অর্থ: অত:পর যখন ইউসুফ তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিল, তখন পানপাত্র আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিল। অত:পর একজন ঘোষক ডেকে বলল: হে কাফেলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। তারা ওদের দিকে মুখ করে বলল: তোমাদের কি হারিয়েছে? তারা বলল: আমরা বাদশাহ্র পানপাত্র হারিয়েছি এবং যে কেউ এটা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর যামিন। তারা বলল: আল্লাহ্র কসম, তোমরা তো জান, আমরা অনর্থ ঘটাতে এদেশে আসিনি এবং আমরা কখনও চোর ছিলাম না। তারা বলল: যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে যে চুরি করেছে তার কি শাস্তি? তারা বলল: এর শাস্তি এই যে, যার রসদপত্র থেকে তা পাওয়া যাবে, এর প্রতিদানে সে দাসত্বে যাবে। আমরা যালেমদেরকে এভাবেই শাস্তি দেই। অত:পর ইউসুফ আপন ভাইয়ের থলের পূর্বে তাদের থলে তল্লাশী শুরু করলেন। অবশেষে সেই পাত্র আপন ভাইয়ের থলের মধ্য থেকে বের করলেন। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। সে বাদশাহ্র আইনে আপন ভাইকে কখনও দাসত্বে দিতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন। আমি যাকে ইচ্ছা, মর্যাদায় উন্নীত করি এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছে অধিকতর এক জ্ঞানীজন। তারা বলতে লাগল: যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে রাখলেন এবং তাদেরকে জানালেন না। মনে মনে বললেন: তোমরা লোক হিসাবে নিতান্ত মন্দ এবং আল্লাহ্ খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যা তোমরা বর্ণনা করছ; তারা বলতে লাগল: হে আযীয, তার পিতা আছেন, যিনি খুবই বৃদ্ধ-বয়স্ক। সুতরাং আপনি আমাদের একজনকে তার বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন: যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রেফতার করা থেকে আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন। তা হলে তো আমরা নিশ্চিতই অন্যায়কারী হয়ে যাব। অত:পর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামর্শের জন্যে এখানে বসল। তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল: তোমরা কি জান না যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা

অন্যায় করেছ? অতএব আমি তো কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে আদেশ দেন অথবা আল্লাহ্ আমার পক্ষে কোন ব্যবস্থা করে দেন। তিনিই সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক। তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল: পিতা:, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা তাই বলে দিলাম, যা আমাদের জানা ছিল এবং অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য ছিল না। জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের লোকদেরকে যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকে, যাদের সাথে আমরা এসেছি। নিশ্চিতই আমরা সত্য বলছি। তিনি বললেন: কিছুই না, তোমার মনগড়া একটি কথা নিয়েই এসেছ। এখন ধৈর্যধারণই উত্তম। সম্ভবত: আল্লাহ্ তাদের সবাইকে একসঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এবং তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন: হায় আফসোস ইউসুফের জন্যে। এবং দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল। এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। তারা বলতে লাগল: আল্লাহ্র কসম আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত হবেন না, যে পর্যন্ত মরণাপন্ন না হয়ে যান কিংবা মৃতবরণ না করেন। তিনি বললেন: আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহ্র সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জান না।[৩৮১]

শোকাহত হযরত ইয়াকুব আ.:

হযরত ইয়াকুব আ.'র অন্তরে হযরত ইউসুফ আ.'র অসাধারণ মহব্বত ছিল। এটি কোন পার্থিব মহব্বত ছিলনা বরং একজন আদর্শবান, চরিত্রবান পয়গাম্বরের প্রতি ভালাবাসা থাকা পরকালীন বিষয়ক ব্যাপার। পিতা পুত্রের বিচ্ছেদের সময়কাল ছিল চল্লিশ বছর। কোন কোন বর্ণনায় আছে আশি বছর। এসময় তিনি পুত্র শোকে জর্জড়িত মুমূর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। যার ফলে তাঁর প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হয়েছিল। ইমাম বগভী র. লিখেছেন এ অবস্থা দেখে হযরত ইয়াকুব আ.'র এক প্রতিবেশী তাঁকে বলল, হে ইয়াকুব! আপনার শরীরতো দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে। এভাবে তো আপনি একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবেন। অথচ আপনি এখনো আপনার পিতার বয়সে উপনীত হননি। উত্তরে তিনি বললেন হ্যা ইউসুফের বিচ্ছেদ অসহনীয়। ক্রমাগত নিঃশেষ হয়ে চলেছি আমি। আল্লাহ আমাকে মহা পরীক্ষায় ফেলেছেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা জানালেন হে আমার নবী! তুমি মানুষের নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উথাপন করছ। হযরত ইয়াকুব আ. বললেন, হে আমার প্রিয়তম প্রভু! ভুল হয়েছে। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ জানালেন ক্ষমা করলাম। এর পর থেকে কেউ

৩৮১. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৭০-৮৬

তাঁর দূরাবস্থা দেখে আলাপচারিতা শুরু করলে তিনি বলতেন, انما اشكوا بثى وحزنى الى الله ।

এক বর্ণনায় এসেছে একবার এধরনের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, ইউসুফ ও বিনইয়ামীনের জন্য কাঁদতে কাঁদতে আমার এ অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাদেশ হল– হে ইয়াকুব! তুমি আমার সৃষ্টির নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছ? তুমি না আমার নবী! ঠিক আছে আমিও আমার মর্যাদার শপথ করে বলছি- যতক্ষণ তুমি আমার নিকট প্রার্থনা করাকে যথেষ্ট মনে করবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার দুঃখ দূর করবনা। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, انما اشكوا بثى وحزنى الى الله ।

আল্লাহ তায়ালা পুনরায় বললেন, আমার সম্মানের শপথ! তোমার পুত্রদ্বয় মৃত্যুবরণ করলেও আমি তাদেরকে জীবিত করে তোমাকে অর্পণ করতাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদকে আমি দীর্ঘায়িত করব একটি কারণে। কারণটি এই- একবার তোমরা একটি ছাগল জবাই করেছিলে। জনৈক দরিদ্র তখন উপস্থিত হয়েছিল তোমাদের কাছে। কিন্তু তোমরা ওই দরিদ্রকে কিছুই দাওনি। আরো শুন, নবীগণই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তার পর প্রিয় মিসকীনরা। এবার তুমি খাদ্য তৈরি করে মিসকীনদেরকে দাওয়াত কর। তিনি তাই করলেন এবং মিসকীনদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা রোযাদার আমার বাড়ীতে তাদের দাওয়াত।

আরো বর্ণিত আছে যে, এরপর তিনি দিবা-রাত্রি দু'বেলা আহার করতেন মিসকীনদের সঙ্গে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ইয়াকুব! আশি বছর ধরে তোমাকে পুত্র শোকে কাতর রেখেছি এই কারণে যে, তোমার গৃহে একবার গোশত রান্না করা হয়েছিল। কিন্তু তুমি ওই গোশত প্রতিবেশীকে আহার করাওনি। এতে তুমি প্রতিবেশীর হক লংঘন করেছ।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, একবার তিনি একটি গো-শাবককে তার মায়ের সামনেই জবাই করেছিলেন। গো-মাতা ক্রমাগত আর্তনাদ করেছিল। কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেন নি।

ওয়াহাব, সুদ্দী প্রমূখ থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত জিব্রাইল আ. কারাগারে হযরত ইউসুফ আ.'র সাথে সাক্ষাত করলেন। সেখানে অনেক কথাবার্তার পর হযরত ইউসুফ আ. জিজ্ঞাসা করলেন, হে রুহুল আমীন! আপনি কি আমার সম্মানিত পিতার অবস্থা সম্পর্কে অবগত? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ।

আপনার বিচ্ছেদ বেদনায় তিনি কাতর। শোকে দুঃখে মুহ্যমান। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন অসাধারণ ধৈর্য্য। হযরত ইউসুফ আ. জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি অনুমান করতে পারেন তাঁর শোক কত গভীরে? উত্তরে জিব্রাইল আ. বললেন হ্যাঁ, তাঁর শোক সদ্য সন্তানহারা সত্তরজন রমণীর মত। হযরত ইউসুফ আ. জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর সেই অসহনীয় বেদনার প্রতিফল কী? জিব্রাইল আ. বললেন একশত শহীদের পূণ্য। হযরত ইউসুফ আ. বললেন, তাঁর সাথে আমার দেখা হবে কিনা? জিব্রাইল আ. বললেন হ্যাঁ, একদিন পিতা-পুত্রের মিলন হবে অবশ্যই। হযরত ইউসুফ আ. তখন বললেন, তাহলে শত বিপদেও আমি দুঃখিত নই।

ইমাম কুরতুবী র. ইয়াকুব আ.'র এই অগ্নি পরীক্ষার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, একদিন ইয়াকুব আ. তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। তাঁর সামনে ঘুমিয়ে ছিলেন হযরত ইউসুফ আ.। হঠাৎ হযরত ইউসুফ আ.'র নাক ডাকার শব্দ শুনে মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও এমন হল। তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বললেন, দেখ আমার প্রিয় ও মকবুল বান্দা আমাকে সম্বোধন করার মাঝখানে অন্যের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, আমি তার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করে দিব যদ্বারা সে অন্যের দিকে তাকায় এবং যার দিকে মনোযোগ দিয়েছে তাকে দীর্ঘকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দিব।

হযরত ইউসুফ আ.'র ভাইয়েরা তৃতীয়বার মিশর গমণ:

হযরত ইয়াকুব আ.'র নির্দেশে হযরত ইউসুফ আ. ও বিনইয়ামিনকে তালাশের উদ্দেশ্যে ইয়াকুব তনয়গণ তৃতীয়বারের মত পুনরায় মিশর গমন করল। মিশররাজ হযরত ইউসুফ আ.'র সাথে সাক্ষাত করে বলল, হে মহামান্য সম্রাট! আমরা ও আমাদের পরিবারের লোকজন অন্ন সংকটে পতিত। তাই আমরা পুনরায় খাদ্য শস্য সংগ্রহের জন্য আসলাম এবার কিন্তু উপযুক্ত পণ্যমূল্য আমরা আনতে পারিনি। তবুও আমাদের নিবেদন আপনি দয়া করে আমাদের পূর্ণমাত্রায় রসদপত্র দান করুন। আমরা আপনার নিকট অনুদান প্রার্থনা করছি। আল্লাহ নিশ্চয় অনুদান দাতাকে পুরষ্কৃত করেন।

তখন মিশর সম্রাট হযরত ইউসুফ আ. বললেন, তোমাদের কি মনে আছে তোমরা ইউসুফও তাঁর ভাইয়ের সাথে কেমন আচরণ করেছিলে? তোমরা কি ইউসুফকে ঘর ছাড়া করনি? বিদেশী বণিকের কাছে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করে দাওনি। তখন কত অজ্ঞই না ছিলে তোমরা।

হযরত কালবী র. বলেছেন, সম্রাট হযরত ইউসুফ আ. তখন বলেছিলেন, হে দূরাগত পথিকবর্গ! তোমাদের কি ওই দিনের কথা মনে পড়ে, যখন তোমরা

অন্ধকূপ থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত ইউসুফকে দাস হিসাবে বিক্রি করার জন্য তোমরা নিজেদের মধ্যে সলা পরামর্শ করেছিলে? তখন মালেক বলেছিল, আমি এই সুন্দর বালকটিকে একটি কূপ থেকে পেয়েছি এবং আমি তাঁকে ক্রয় করেছি এত দেরহামে। ভাইয়েরা বলল হে সম্রাট! সেই ক্রীতদাসকে তো বিক্রয় করেছিলাম আমরাই। এ কথা শুনে হযরত ইউসুফ আ. রাগান্বিত হয়ে নির্দেশ দিলেন এদের শিরচ্ছেদ করা হোক। সাথে সাথে উপস্থিত হল জল্লাদ বাহিনী। তারা তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিল বধ্যভূমির দিকে। যেতে যেতে ইয়াহুদা বলল, কয়েক যুগ ধরে আমাদের মহান পিতা তাঁর এক পুত্রের শোকে মরণোন্মুখ। দৃষ্টিক্ষমতা রহিত। এবার তাঁর নিকট সব সন্তানের মৃত্যু সংবাদ পৌছবে। হ্যায় কি করুণ অবস্থা হবে তাঁর? তার কথা শুনে সবাই দাঁড়িয়ে গেল আর সম্রাটের নিকট শেষ আবেদন করল– হে মহামান্য সম্রাট! আমাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর আমাদের মালপত্রগুলো আমাদের মহান পিতার নিকট পৌছিয়ে দেবেন। হযরত ইউসুফ আ. আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। কেঁদে ফেললেন আর বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, বিনইয়ামিনকে চুরির দায়ে মিশরে আটকে রাখা হল। তখন হযরত ইয়াকুব আ. মিশর সম্রাটের নিকট প্রেরণ করলেন একটি পত্র। তা ছিল এরকম- আল্লাহর বান্দা ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম খলিলুল্লাহর পক্ষ থেকে সকল পবিত্রতা ও প্রশংসা আল্লাহর জন্য। পর সমাচার এই যে, যে পরিবারে বিপদাপদ নিত্যদিনের ভূষণ, আমি সেই পরিবারের লোক। আমার পিতামহ নবী ইব্রাহীমকে হাত-পা বেঁধে নিক্ষেপ করা হয়েছিল অগ্নিকুণ্ডে। আল্লাহ সেই অগ্নিকুণ্ডকে তাঁর জন্য করে দিয়েছিলেন শীতল ও শান্তিদায়ক। আমার বিপদ আরো প্রলম্বিত অসহনীয়। আমার কলিজার টুকরা ইউসুফকে তাঁর সৎ ভাইয়েরা বিজন বনে নিয়ে গিয়ে নিরুদ্দেশ করেছিল। তখন তারা আমাকে দেখাল কেবল তাঁর রক্তমাখা অঙ্গাবরণ। বলল, বনের বাঘে নাকি তাকে খেয়ে ফেলেছে। তাঁর জন্য কাঁদতে কাঁদতে এখন আমি প্রায় অন্ধ। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদরই ছিল আমার একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু হে সম্রাট! আপনি তাকে আটক করে রাখলেন কেন? কী অপরাধ তার? চুরি? চুরিতো সেই করতেই পারেনা। আমাদের বংশে চোরের জন্ম অসম্ভব। অতএব হে মিশররাজ! সত্বর বিনইয়ামিনকে মুক্তি দিন। নতুবা শোকাকুল পিতার নয়নমণিকে যে বন্দী করেছে তার জন্য বদদোয়া করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় থাকবে না। আর ওই বদদোয়ার প্রতিক্রিয়া চলতে থাকবে আপনার অধঃস্তন সাত পুরুষ পর্যন্ত। পত্রটি

পাঠ করে সম্রাট হযরত ইউসুফ আ. নিজেকে সম্বরণ করতে পারলেন না। দু'চোখ বেয়ে নেমে এল বাঁধ ভাঙ্গা অশ্রুপাত। প্রবেশ করলেন রাজদরবারে। ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তাঁর সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে যখন তোমরা ছিলে অপরিণামদর্শী? ভাইয়েরা সম্রাটের কথা শুনে এবং সাদা মুক্তা সদৃশ দন্তরাজি দেখে অথবা কপালের পার্শ্বে ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড দেখে তারা তাঁকে চিনতে পেরেছিল। তখন তারা উল্লসিত হয়ে বলে উঠল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? তখন সম্রাট বললেন, হ্যাঁ। আমিই ইউসুফ এবং বিনইয়ামিন আমার সহোদর। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ ধর্মভীরু ও ধৈর্যশীলদের পুর্ণ্য নষ্ট করেন না। ধৈর্যের ফল বিলম্বে হলেও নিশ্চিত পাওয়া যাবে। যার দৃষ্টান্ত হলাম আমি ও আমার সহোদর। আল্লাহ আমাদেরকে তাকওয়া ও সবর এ দু'টি দান করেছেন এ গুলো সাফল্যের চাবিকাঠি এবং প্রত্যেক বিপদাপদের রক্ষাকবচ। এর ফলে আল্লাহ আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে এবং সম্পদের স্বল্পতাকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন।

হযরত ইউসুফ আ. ও তাঁর ভাইদের মধ্যে পরিচয় পর্ব সমাপ্ত হলে ভাইয়েরা বলল, আল্লাহর শপথ! তুমি সর্বদিক দিয়ে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমরা প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে তোমার মর্যাদাকে অবমাননা করেছি। তাই আজ অকপটে স্বীকার করছি আমার অপরাধী। ভাইদের অপরাধ স্বীকার দেখে হযরত ইউসুফ আ. বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। অর্থাৎ আমি মুখাপেক্ষী একজন বান্দা হওয়া সত্ত্বেও যখন মার্জনা করলাম তখন চির অমুখাপেক্ষী ও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু আল্লাহও নিশ্চয় তোমাদেরকে মার্জনা করবেন অবশ্যই।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে–

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ . فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ . قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ . قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ . قَالُوا تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ . قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ

الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. অর্থ: বৎসগণ! যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্র রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না। অত:পর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌছল তখন বলল: হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ্ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। ইউসুফ বললেন: তোমাদের জানা আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে করেছ, যখন তোমরা অপরিণামদর্শী ছিলে? তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ! বললেন: আমিই ইউসুফ এবং এ হল আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়, যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ্ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। তারা বলল: আল্লাহ্র কসম, আমাদের চাইতে আল্লাহ্ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম। বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবান চাইতে অধিক মেহেরবান।[৩৮২]

হযরত ইয়াকুব আ. ও হযরত ইউসুফ আ.'র সাক্ষাত:

পরিচয়পর্ব শেষ হলে হযরত ইউসুফ আ. জানতে চাইলেন যে, মহান পিতার কি অবস্থা? ভাইয়েরা বলল, তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি অস্ত হিঁতপ্রায়। তখন তিনি তাঁর জামাটি দিয়ে বললেন, এটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখমণ্ডলে রেখো। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। তারপর পিতাকে সহ তোমাদের পরিবারের সকল সদস্যসহ আমার নিকট চলে এস। ভাইয়েরা তখন ওই অলৌকিক জামাটি নিয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা শুরু করল। তখন সুদূর সিরিয়ার কেনান অঞ্চলে বসে হযরত ইয়াকুব আ. তাঁর কাছে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, তোমরা যদি আমাকে নির্বোধ মনে না কর, তবে আমি বলতে চাই, আমি ইউসূফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।

ইমাম বগভী র. লিখেছেন যে, প্রত্যুষের সমীরণ আল্লাহর অনুমতিক্রমে প্রত্যাবর্তনকারী হযরত ইউসুফ আ.'র ভাইয়েরা গৃহগমণের পূর্বেই হযরত ইয়াকুব আ.'র নিকট সংবাদ পৌছে দিয়েছিল। মুজাহিদ র. বলেছেন, তিন দিনের আর ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আট রাতের পথের দূরত্বে অবস্থান কালেই ইয়াকুব আ. পুত্র হযরত ইউসুফ আ.'র সুবাস পেয়েছিলেন। হযরত

[৩৮২]. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৭-৯২

হাসান বসরী র.'র মতে আশি ফরসখ অর্থাৎ প্রায় আড়াইশ মাইলের ব্যবধান ছিলো। তখন সেখানে উপস্থিত লোকেরা বলল, আপনি তো ইউসুফ ইউসুফ করেই জীবনপাত করলেন। এখনও সেই বিভ্রান্তির মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে চলেছেন।

ভাইয়েরা যখন হযরত ইউসুফ আ.'র জামা মোবারক নিয়ে পিতাসহ পরিবারের সকল সদস্যকে মিশরে নিয়ে আসতে রওয়ানা হল তখন ইয়াহুদা বলল, ইউসূফের রক্তমাখা জামা আমিই প্রথমে পিতাকে দেখিয়েছিলাম এবং মিথ্যা বলে তাঁকে দুঃখ দিয়েছিলাম। আজ আমি সর্বাগ্রে পৌছে এই সুসংবাদ দিয়ে আনন্দিত করব। হযরত ইউসুফ আ.'র জামা নিয়ে দৌড় দিয়েছিলেন দেশের দিকে। খাবার হিসাবে সঙ্গে নিয়েছিলেন মাত্র সাতটি রুটি। সুদীর্ঘ আশি ফরসখ দূরত্বের পথ অতিক্রম করে গৃহে পৌছে গিয়েছিলেন তিনি রুটি নিঃশেষ হওয়ার পূর্বেই। এই অলৌকিক জামা মোবারক নিয়ে হযরত ইয়াকুব আ.'র মুখমণ্ডলের উপর রাখা মাত্র তাঁর দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরে পেলেন। দূর হয়ে গেল তাঁর বার্ধক্যজনিত অবসাদ।

হযরত ইয়াকুব আ. তখন বলেছিলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, ইউসুফ জীবিত এবং তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত ঘটবেই? একথাও কি বলিনি যে, আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়োনা? একথাও তো বলেছি- আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। এ সকল তথ্য ও তত্ত্ব আল্লাহই আমাকে জানিয়েছেন। কিন্তু তোমরা এসকল রহস্য সম্পর্কে অবগত নও। অতঃপর ইয়াকুব আ. ইয়াহুদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইউসুফ কেমন আছে? ইউসুফতো এখন মিশরের সম্রাট। ইয়াকুব আ. বললেন, সেটা কোন বড় কিছু নয়, বরং বল, সে বর্তমান কোন ধর্মের উপর আছে? সে বলল, আল্লাহর মনোনীত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি বললেন, তা হলে তো আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণ হয়েছে।

বাস্তব ও সত্য ঘটনা যখন সবার নিকট জানা হয়ে গেল তখন ইয়াকুব আ.'র সন্তানরা পিতার কাছে স্বীয় অপরাধের ক্ষমা চেয়ে বলল, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করুন। আমরা অপরাধী, তাই আল্লাহর দরবারে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। ইয়াকুব আ. বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাদের জন্য অচিরেই দোয়া করব। অর্থাৎ তিনি তাৎক্ষণাৎ দোয়া করেন নি বরং সেহরীর সময়ের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। কারণ এ সময় দোয়া কবুল হয় বেশী। তাই তিনি রাতের শেষ ভাগে নামাযে দণ্ডায়মান হলেন। নামায শেষে হাত তুলে নিরবে নিভৃতে নিবেদন করলেন- হে মহান আল্লাহ! হে নিঃস্বজনের সহায়! ইউসুফের জন্য যে ধৈর্যচ্যুতি আমার ঘটেছে, তা আপনি ক্ষমা

করে দিন। ইউসুফ ও আমার সঙ্গে আমার সন্তানরা যে দুর্ব্যবহার করেছে তাও মাফ করেদিন। প্রার্থনা শেষ হতে না হতেই আল্লাহ প্রত্যাদেশ প্রেরণ করে বললেন- তোমাকে এবং তোমার সন্তানদের মার্জনা করে দিলাম।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়াকুব আ. বলেছিলেন, আমি তোমাদের জন্য দোয়া করব শুক্রবার রাতে। ওয়াহাব বলেছেন, হযরত ইয়াকুব আ. কুড়ি বছরের অধিক সময় ধরে প্রতি শুক্রবার রাতে দোয়া করেছিলেন। তাউস র. বলেছেন, শুক্রবারে রাতে সেহরীর সময় দোয়া করবেন বলে ইয়াকুব আ. তাঁর দোয়া বিলম্বিত করেছিলেন। ভাগ্যক্রমে শুক্রবারের ওই রাতটিই ছিল দশই মহররমের রাত্রি।

ইমাম নববী লিখেছেন যে, হযরত ইউসুফ আ. ভাইদের সাথে দু'শ উট বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র, বস্ত্র, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। যাতে গোটা পরিবার মিশরে আসার জন্য ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। হযরত ইয়াকুব আ. পরিবারের সবাইকে নিয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এই যাত্রীদলের সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলে মোট বাহাত্তর জন ছিল। অন্য এক বর্ণনা মতে তিরান্নব্বই জন। হযরত মাকরুস র. বলেছেন, বিশাল পরিবারের তিনশ নব্বই জন সদস্য সমভিব্যাহারে হযরত ইয়াকুব আ. যাত্রা করলেন মিশর অভিমুখে।

অপর দিকে তাদের মিশর পৌছার সময় নিটকবর্তী হলে হযরত ইউসুফ আ. ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের অভ্যর্থনার জন্য শহরের বাইরে আগমণ করলেন এবং অভ্যর্থনা কেন্দ্র স্থাপন করে সেখানে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করতেছেন। তাদের সাথে চার হাজার সশস্ত্র সিপাহী ও সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে সমবেত হল। সাধারণ জনতাও যোগ দিল তাদের সাথে পিতা পুত্রের এই মহা মিলন দেখার জন্য।

মিসরে অভ্যর্থনা কেন্দ্রের নিকটে পৌছে হযরত ইয়াকুব আ. পুত্র ইয়াহুদার কাঁধে ভর দিয়ে পদব্রজে অগ্রসর হলেন। বিপুল সংখ্যক মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন হে ইয়াহুদা! এত লোক কেন? ওরা কি সবাই ফেরাউন? ইয়াহুদা বলল, না ওরা হচ্ছে আপনার প্রিয় পুত্রের পরিষদ বর্গ ও প্রজাসাধারণ।

মহামান্য পিতা এবং স্নেহের পুত্র অগ্রসর হলেন একে অপরের দিকে। শেষ হয়ে এল শোক ও সন্তাপের সুদীর্ঘ অধ্যায়। বিরহের অমা-বিভাবরী শেষে এল মহামিলনের আলোকজ্জ্বল প্রত্যুষ। পিতা-পুত্রের হৃদয়ে ছায়াপাত করে চলল অতীতের শত সহস্র স্মৃতি। সেই বাল্যবেলা । পিতৃবক্ষের স্বর্গীয় স্নেহচ্ছায়া, ভাইদের চক্রান্ত। অন্ধকূপ। বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে মিশর যাত্রা। আযীযের

আশ্রয়। আযীয পত্নীর ষড়যন্ত্র। কারাগার, সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ। ওদিকে পিতার বিরতিহীন বেদনার্ত জীবন। বিরামহীন অশ্রুপাত ও ধৈর্য। বিরতি বিহীন ধৈর্য ও অশ্রুপাত। এভাবেই তো হারিয়ে গিয়েছিল চোখের জ্যোতি। কিন্তু প্রতীক্ষার প্রদীপ ছিল সতত প্রোজ্জ্বল। সেই অশ্রুভেজা প্রতীক্ষার অবসান হল আজ। অশীতিপর বৃদ্ধ মহান পিতা নবী হযরত ইয়াকুব আ. ইয়াহুদার কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে এলেন পুত্র ইউসুফ। ভুলে গেলেন তিনি বিশাল মিশর সাম্রাজ্যের দণ্ডমূণ্ডের অধিকর্তা।

আজ তিনি ফিরে পেয়েছেন মিশরের চেয়ে বরং সারা বিশ্বের চেয়ে অধিক বিশাল চিরন্তন পিতৃ স্নেহের হৃত সাম্রাজ্যের অমূল্য অধিকার। বাকরুদ্ধ পিতা-পুত্র পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। অভিবাদন, প্রত্যাভিবাদন কোন কিছুই উচ্চারিত হতে পারল না বাকরুদ্ধ পিতা পুত্রের কণ্ঠে। মহা মিলনের আনন্দ উল্লাসে উল্লাসিত হলো আল্লাহর আরশ। ফেরেশতারা ভুলে গেল তাদের যথাকর্তব্য। আর যিনি এই মহামিলন ঘটালেন সেই পবিত্র সত্তার পক্ষ থেকে এই মিলনমেলায় বর্ষিত হতে থাকল অজস্র অসংখ্য অগণনীয় দয়া ও রহমত।

অতঃপর মাতার সাথে হযরত ইউসুফ আ. আলিঙ্গন করলেন। মাতা বলে এখানে খালা লাইয়্যা'কে বুঝানো হয়েছে। কারণ হযরত ইউসুফ আ.'র জন্মদাত্রী জননী বিনইয়ামিনের জন্মের পর মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাছাড়া লাইয়্যাও ছিলেন হযরত ইয়াকুব আ.'র অপর স্ত্রী। এ সময় পিতা পুত্র অঝোর নয়নে কেঁদেছিলেন। পুত্র বলেছিলেন, হে আমার পিতা! আমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে আপনি প্রায় অন্ধ হয়ে গিলেছিলেন কেন? এ জগতে সাক্ষাত না হলেও তো পরজগতে তো আমাদের সাক্ষাত ঘটতই। পিতা বলেছিলেন, প্রিয় পুত্র আমার! আমি তো তোমার ধর্মভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কাতেই কেঁদে কেঁদে মরতাম। ভাবতাম ধর্মভ্রষ্ট হয়ে গেলে তোমাকে তো আমি হারিয়ে ফেলব চিরকালের জন্য।

হযরত ইউসুফ আ. বললেন, এখন আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন। সমস্ত দুঃখ দুর্দশার দিন শেষ। এখন সুখ-সমৃদ্ধির জীবন শুরু। অতঃপর হযরত ইউসুফ আ. পিতা-মাতাকে রাজ সিংহাসনে বসালেন। পিতা-মাত সহ তাঁর এগার ভাই একসাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে হযরত ইউসুফ আ.'র প্রতি সিজদায় লুটে পড়লেন। এটা ছিল সম্মানসূচক সিজদা। উপাসনামূলক সিজদা ছিল না। কারণ উপাসনামূলক সিজদা সকল নবী রাসূল গণের শরীয়তে নিষিদ্ধ ছিল। মূলত সিজদাটা ছিল আল্লাহর জন্য। হযরত ইউসুফ আ. ছিলেন কেবল সম্মুখে। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ আ. ছিলেন সিজদার উপলক্ষ আর লক্ষ্য ছিলেন আল্লাহ। তাঁকে উপলক্ষ স্থির করার নির্দেশটিও ছিল

আল্লাহর। যেমন আমাদের সিজদার উপলক্ষ বায়তুল্লাহ শরীফ কিন্তু লক্ষ্য আল্লাহ। আর এই উপলক্ষ আল্লাহই আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হযরত আদম.আ. কে ফেরেশতাদের সিজদাও ছিল অনুরূপ।

এদের সিজদাবনত দৃশ্য দেখে হযরত ইউসুফ আ.'র মনে পড়ল বাল্যকালে দেখা স্বপ্নের কথা। তিনি বললেন, হে পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক ওই স্বপ্নকে বিলম্বে হলেও সত্যে পরিণত করেছেন। সেই স্বপ্নের বাস্তবায়িত হল আজ।

এরপর হযরত ইউসুফ আ. আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্বীকার করে পিতাকে বললেন, আল্লাহ আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এবং শয়তান আমার ও ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করবার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। লক্ষণীয় যে, এখানে হযরত ইউসুফ আ. কারাগারের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন নি। অথচ ওই অন্ধকূপের অবস্থানটি ছিল কারাজীবন অপেক্ষা ভয়ঙ্কর এক অধ্যায়। এর কারণ হল ভাইদের অপরাধ তিনি পূর্বে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি ভেবেছিলেন, অন্ধকূপের কথা বললে ভাইয়েরা লজ্জিত হবে এবং অপমান বোধ করবে। আনন্দের সময় ব্যথিত হয়ে পড়বে। তাই তিনি পয়গাম্বরী সুলভ শিষ্টাচার মূলক অন্ধকূপের কথা ছেড়ে কেবল কারাগারের কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তিনি পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদের ঘটনাটি ভাইদেরকে দোষারোপ না করে শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ভাইদের সম্মান রক্ষা করলেন। অর্থাৎ আমার ভাইয়েরা এরূপ ষড়যন্ত্রকারী নয় বরং শয়তানই তাদেরকে প্রতারণা দিয়ে কলহ সৃষ্টির এ কাজটি করেছে। তারপর বললেন, আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছে করেন তা তিনি নিপুণতার সহিত বাস্তবায়ন করেন। আমাদের এই মহামিলন তাঁরই ইচ্ছায় এত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই সব কথার মাধ্যমে হযরত ইউসুফ আ.'র প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, সব বিষয়ে আল্লাহর উপর ভরসা ইত্যাদি বিষয় ফুটে উঠেছে।

ইমাম বয়যাভী র. বলেছেন, হযরত ইউসুফ আ. তাঁর পিতা-মাতাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাষ্ট্রীয় ধন-ভাণ্ডার পরিদর্শন করালেন। হযরত ইয়াকুব আ. এক স্থানে স্তূপকৃত কাগজপত্র দেখে বললেন- এত কাগজপত্র আছে তোমার কাছে অথচ আমার নিকট একটি পত্রও লেখনি। হযরত ইউসুফ আ. বললেন, হযরত জিব্রাইল আ. আমাকে এরকমই পরামর্শ দিয়েছিলেন। পিতা বললেন, তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করনি কেন? পুত্র বললেন, আপনার সঙ্গেই তো তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক। আপনিই জিজ্ঞেস করুন না। হযরত ইয়াকুব আ. জিব্রাইল আ.কে

এসম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন- আল্লাহ আমাকে এরকমই নির্দেশ করেছেন। যখন ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁকে চারণভূমিতে নিতে চেয়েছিল তখন আপনি বলেছিলেন, "আমি আশঙ্কা করি তোমরা তাঁর প্রতি অমনোযোগী হলে তাঁকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলবে।" আপনি তখন আল্লাহর কথা স্মরণ না করে নেকড়ে বাঘের ভয় করেছিলেন।

ইমাম বগভী র. বলেন, ইয়াকুব আ. প্রিয় পুত্রের নিকট চব্বিশ বছর অতিবাহিত করার পর পরলোক গমণ করলেন। ওই চব্বিশ বছর তাঁর জীবনে ছিল কেবল অনাবিল সুখ। তাঁর ইন্তেকাল হয়েছিল মিশরেই। মৃত্যুকালে তিনি হযরত ইউসুফ আ. কে অসিয়ত করলেন, মহান পিতৃপুরুষগণের কবরস্থানে আমাকে সমাধিস্থ করিও। হযরত ইউসুফ আ. পিতৃ আজ্ঞা পালন করলেন। পিতার পবিত্র মরদেহ সিরিয়ায় নিয়ে গিয়ে দাফন করলেন হযরত ইব্রাহীম আ. ও হযরত ইসহাক আ.'র কবরের পাশে। আরো বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ আ. যেদিন পিতার কফিন নিয়ে সিরিয়ায় বায়তুল মাকদিসে পৌঁছলেন সেদিন হঠাৎ ইন্তেকাল করলেন আইস। আইস ছিলেন হযরত ইয়াকুব আ.'র জমজ সহোদর। হযরত ইউসুফ আ. হযরত ইয়াকুব আ. ও আইসকে একই কবরে দাফন করলেন। উভয়ের বয়স হয়েছিল তখন একশ সাতচল্লিশ বছর।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ . وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ . قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ . فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ . قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ . قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ . وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .

অর্থ: তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দিও, এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস। যখন কাফেলা রওয়ানা হল, তখন তাদের পিতা বললেন: যদি তোমরা আমাকে

অপ্রকৃতিস্থ না বল, তবে বলি: আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। লোকেরা বলল: আল্লাহ্র কসম, আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন। অত:পর যখন সুসংবাদদাতা পৌছল, সে জামাটি তাঁর মুখে রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। বললেন: আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না? তারা বলল: পিতা!, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করান। নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম। বললেন, সত্বরই আমি পালনকর্তার কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চিত তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। অত:পর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌছল, তখন ইউসুফ পিতা-মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন এবং বললেন: আল্লাহ্ চাহেন তো শান্ত চিত্তে মিসরে প্রবেশ করুন। এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সেজদাবনত হল। তিনি বললেন: পিতা! এ হচ্ছে আমার ইতিপূর্বেকার স্বপ্নের বর্ণনা। আমার পালনকর্তা একে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৬৩]

হযরত ইউসুফ আ.'র ইন্তেকাল:

পিতা-মাতা ও পরিবার বর্গের সাথে মিলিত হওয়ার পর থেকে হযরত ইউসুফ আ. ধীরে ধীরে পৃথিবীর প্রতি বিরাগভাজন হয়ে পড়লেন। কারণ কোন ব্যাপারে আল্লাহর নিয়ামত পরিপূর্ণতা লাভ করলে এবং কোন সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে গেলে তখন তার প্রয়োজন ফুরিয়ে আসে। তখন পরকালের যাত্রার দিকে মনোনিবেশ হয় বেশী। সেই ধারাবাহিকতায় হযরত ইউসুফ আ. প্রার্থনা করলেন, ইয়া ইলাহী! পবিত্র মিলনাকাঙ্খার পথে আর অন্তরায় কেন? তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ফলে তিনি পিতার মৃত্যুর পর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। কেউ বলেছেন, কয়েক বছর, কেউ বলেছেন এক মাস আবার কেউ বলেছেন মাত্র এক সপ্তাহ জীবিত ছিলেন।

পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদকাল নিয়েও মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কালবী বলেছেন, বিচ্ছেদ কাল ছিল বাইশ বছর। কেউ বলেছেন চল্লিশ বছর। হাসান বসরী র. বলেছেন, তিনি অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন সতের বছর বয়সে। এরপর আশি বছর ছিলেন নিরুদ্দেশ। পিতৃমিলনের পর জীবিত ছিলেন তেইশ

[৬৩]. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৯৩-১০০।

বছর। এভাবে তাঁর পৃথিবীর বয়স হয়েছিল একশ বিশ বছর। তাওরাতে বর্ণিত আছে, তাঁর বয়স হয়েছিল একশ দশ বছর।

যুলায়খাকে বিয়ে করে তিনি সংসারী হয়েছিলেন। যুলায়খার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল তার তিন সন্তান, দুই পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম ছিল ইফরাইম ও মাইশা। কন্যার নাম ছিল রহমত। ইফরাইমের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হযরত মূসা আ.'র বিশেষ সহচর হযরত ইউশা ইবনে নূন আ.। হযরত আইয়ুব আ.'র সাথে বিবাহ হয়েছিল রহমতের।

মিশরবাসীগণ মর্মর পাথরের কফিন প্রস্তুত করে সেই কফিনের ভিতর রেখে তাঁকে সমাধিস্থ করেছিল নীল নদের ঠিক মাঝখানে। ঘটনাটি ছিল এ রকম- তাঁর ইন্তেকালের পর প্রতিটি মহল্লার লোকেরা নিজ নিজ মহল্লায় তাঁকে সমাধিস্থ করার জন্য ঝগড়া আরম্ভ করে দিল। ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত রক্তপাত হওয়ার পর্যায়ে পৌছে গেল। পরিশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হল যে, কোন মহল্লাতে তাঁকে সমাধিস্থ করা হবেনা। সমাধিস্থ করা হবে নীল নদের ঠিক মাঝখানে।

হযরত ইকরামা র. বলেছেন, প্রথমত- তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল নীল নদের দক্ষিণ পার্শ্বে। ফলে দক্ষিণ পার্শ্বের ভূমি হয়ে গেল অসম্ভব রকমের উর্বর। আর অপর পার্শ্বের ভূমি হয়ে গেল শুষ্ক, অনুর্বর। এভাবে দক্ষিণ পার্শ্বে উৎপন্ন হতে লাগল প্রচুর ফল ও ফসল। আর অপর পার্শ্বে দেখা দিল কেবল খরা ও অজন্মা। এ অবস্থা দেখে সকলে ঠিক করল, তাঁকে স্থানান্তর করতে হবে। সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মতে তখন তাঁকে দক্ষিণ দিক থেকে উঠিয়ে এনে উত্তর দিকে কবরস্থ করা হল। এবার দেখা গেল উত্তর দিকে আরম্ভ হয়েছে ফল ও ফসলের বিপুল সমারোহ। আর পরিত্যক্ত কবরের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে দেখা দিয়েছে মরুভূমি। সেখানকার মাটি হয়ে গেছে নিষ্ফলা। অবস্থা বেগতিক দেখে মিশরবাসীরা এবার ঠিক করল তাঁকে সমাধিস্থ করতে হবে নীল নদের ঠিক মাঝখানে। যেন তাঁর দেহ মোবারকের বরকতে উভয় দিক সুজলা সুফলা হয়। অতএব, তাই করা হল। এবার দেখা গেল নীল নদের উভয় পাশে উৎপাদিত হচ্ছে একই রকম ফসল ও শস্য দানা।

প্রায় চারশত বছর পর মিশরে আবির্ভূত হলেন হযরত মূসা আ.। তিনি নীল নদের মাঝখান থেকে হযরত ইউসুফ আ.'র শ্বেত মর্মর নির্মিত কফিন উদ্ধার করে তাকে নিয়ে গিয়ে দাফন করলেন পিতৃপুরুষগণের কবরস্থানে।

হযরত উরওয়া বিন যোবায়ের রা.'র উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে ইসহাক ও ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা আ. কে নির্দেশ দিলেন, ফেরাউনের কবল থেকে বনী ইস্রাঈলকে উদ্ধার করে সিরিয়ায় চলে যেতে হবে।

সঙ্গে করে নিতে হবে হযরত ইউসুফ আ.'র কফিন। আর তাঁকে সমাধিত করতে হবে তাঁর পিতা ও পিতামহের কবরস্থানে। কিন্তু তিনি জানতেন না, তাদের কবর কোথায় ছিল। অনেক অনুসন্ধান করেও খোঁজ মিলেনি। শেষে জানলেন যে, এক বৃদ্ধার কাছে রয়েছে এই সংবাদ। তিনি ওই বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলে বৃদ্ধা বললেন, যদি আপনি মিশর ত্যাগকালে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যান তবে হযরত ইউসুফ আ.'র সমাধির সন্ধান দিবো। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আমরা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। বৃদ্ধা তখন হযরত ইউসুফ আ.'র সমাধির সন্ধান দিলেন। হযরত মূসা আ. বনী ইস্রাইলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাত্রা শুরু করতে হবে চন্দ্রোদয়ের সাথে সাথে। চন্দ্রোদয়ের সময় হল। কিন্তু তখনও হযরত ইউসুফ আ.'র কফিন সংগ্রহ করা যায়নি। তাই হযরত মূসা আ. প্রার্থনা জানালেন, হে আল্লাহ্! চন্দ্রোদয় বিলম্বিত করুন। আমি তো এখনো ইউসুফ আ.'র কফিন উদ্ধার করতে পারিনি। আল্লাহর হুকুমে চন্দ্র উদিত হল বিলম্বে। হযরত মূসা আ. তাঁর একান্ত সহচরগণের মাধ্যমে হযরত ইউসুফ আ.'র কফিন নীল নদীর মাঝখান থেকে তুলে আনলেন। এরপর কফিন, বৃদ্ধা ও বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সিরিয়ায় হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসহাক আ.'র সমাধির পাশে তাঁকে দাফন করলেন।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. অর্থ: হে পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতাও দান করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা! আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে। আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে স্বজনদের সাথে মিলিত করুন।[৩৮৪]

বি.দ্র. পবিত্র কুরআনে যেসব নবীগণের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে, তা খণ্ডিতাকারে বর্ণিত হয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আদ্যপান্ত ঘটনা কারো বর্ণিত হয়নি। কেবল হযরত ইউসুফ আ.'র জীবনবৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর নামেই পবিত্র কুরআনের একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অন্য কারো কোন কাহিনী তাতে স্থান পায়নি।

[৩৮৪]. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১০১

শুধু এ সূরায় বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় থেকে কিছু শিক্ষনীয় বিষয় প্রসঙ্গে সূরার শেষে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ'র এবং তাঁর উম্মতের প্রসঙ্গ এসেছে মাত্র।

হযরত ইউসুফ আ.'র কাহিনী যেহেতু পবিত্র কুরআনে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে তাই আমরা উদ্ধৃতি হিসাবে প্রায় পবিত্র কুরআনের আয়াতই এনেছি। তবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। কাহিনীকে সুন্দরভাবে সাজানোর নিমিত্তে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যেহেতু সবগুলো তথ্য সূরা ইউসুফের তাফসীর থেকে নেয়া হয়েছে সেহেতু তাফসীর গ্রন্থ সমূহের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর দেয়া হয়নি। কেবল তাফসীর গ্রন্থসমূহের নাম দেয়া হয়েছে। তবে অধিকাংশ তথ্য ও তত্ত্ব তাফসীরে মাযহারী ও তাফসীরে নঈমী থেকে গৃহীত হয়েছে। নিম্নে গ্রন্থসমূহের নাম দেয়া হল–

১. তাফসীরে মাযহারী, ২. তাফসীরে নঈমী, ৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪. তাফসীরে কুরতুবী, ৫. তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান, ৬. তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৭. তাফসীরে রুহুল মা'আনী, ৮. তাফসীরে বয়যাভী, ৯. কাসাসুল আম্বিয়া, ১০. বাদায়েউয যহুর ও ১১. কাসাসুল কুরআন।

১৪. হযরত আইয়ুব আ.

হযরত আইয়ুব আ.'র পরিচয়

নাম: হযরত আইয়ুব ইবনে আ-মূস ইবনে রাযিহ ইবনে রূম ইবনে আয়স (আয়স দ্বারা আইস উদ্দেশ্য) ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আ.। তাঁর আম্মাজান হযরত লূত আ.'র বংশধর। তাঁর স্ত্রী হযরত রাহ্‌মাহ বিনতে আফরাশীম অথবা আফরাঈম ইবনে ইউসুফ আ.। আফরাশীম অথবা আফরাঈম হযরত ইউসুফ আ.'র পুত্র, হযরত যুলায়খার পবিত্র গর্ভজাত সন্তান।

হযরত আইয়ুব আ.'র বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তাঁর উপর শুধু তিনজন লোক ঈমান এনেছিলেন।[৩৮৫]

তাঁর বংশনামা নিয়ে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। আল্লামা ইবনে কাসীর র. কাসাসুল আম্বিয়া গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ২৩০ পৃষ্ঠায় দু'টি বংশনামা বর্ণনা করেছেন।

এক. আইয়ুব ইবনে মূস ইবনে রাযিহ ইবনে আইস ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম খলীল আ.।

[৩৮৫]. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ারখান নঈমী র., ১৩৯১ হি., নূরুল ইরফান, সূরা ছোয়াদ'র ৪১ নং আয়াতের ৮৪ নং টীকা।

দুই. আইয়ুব ইবনে মূস ইবনে রা'ভীল ইবনে আইস ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াকুব আ.।

তাঁর স্ত্রীর নাম কেউ বলেছেন, লাইয়্যা বিনতে ইয়াকুব। কেউ বলেছেন রামোহ বিনতে আফরাশীম অথবা আফরাইম ইবনে ইউসুফ। আবার কেউ বলেছেন লাইয়্যা বিনতে মাইশা ইবনে ইয়াকুব।[৩৮৬]

হযরত আইয়ুব আ.'র সময় কাল নিয়ে বেশ মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে অধিকাংশের মতে তাঁর সময়কাল ছিল ইব্রাহীম আ.'র সময়কালের পরে। আর ইমাম তাবারী বলেছেন হযরত শোয়াইব আ.'র সময়কালের পরে। তবে বিশুদ্ধ মত হল তাঁর সময়কাল ছিল হযরত ইয়াকুব আ. এবং হযরত মূসা আ.'র সময়কালের মধ্যবর্তী সময়ে। অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব আ.'র পরে এবং হযরত মূসা আ.'র পূর্বে।

যেহেতু পবিত্র কুরআনে তাঁর জীবনী কিংবা কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা উল্লেখ নেই। কেবল কুরআনে করীমের চারটি সূরায় তাঁর নাম উল্লেখ হয়েছে। তন্মধ্যে সূরা নিসা এবং সূরা আনআমে কেবল নবীগণের নামের তালিকায় তাঁর নামও উল্লেখ হয়েছে।

যেমন, সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে– وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ আর সূরা আনআমে আরো বর্ণিত হয়েছে– وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ.

আর সূরা আম্বিয়া এবং সূরা ছোয়াদ এ হযরত আইয়ুব আ. রোগে কষ্ট ভোগ এবং খোদার অশেষ কৃপায় রোগমুক্তির কথা উল্লেখ হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ . অর্থ: এবং স্মরণ করুন, আইয়্যুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন: আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। অত:পর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গকে ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত: আর এটা এবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ।[৩৮৭]

---

[৩৮৬]. আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪ হিজরি, কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ২৩০।
[৩৮৭]. সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৩-৮৪

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ . ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ . وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ . وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ . অর্থ: স্মরণ করুন, আমার বান্দা আইয়্যুবের কথা, যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলল: শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌছিয়েছে। তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। ঝরণা নির্গত হল গোসল করার জন্যে শীতল ও পান করার জন্যে। আমি তাঁকে দিলাম তাঁর পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও অনেক আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশস্বরূপ। তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও, তদ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তাঁকে পেলাম সবরকারী। চমৎকার বান্দা সে। নিশ্চয় সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল।[৩৮৮]

হযরত আইয়ুব আ.'র ধৈর্য :

আল্লাহ তায়ালা হযরত আইয়ুব আ.কে প্রথমদিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালানকোঠা, যানবাহন, সন্তান-সন্ততি, পশুপালন ও চাকর নওকর দান করেছিলেন। এতদ্বসত্তেও তিনি সদা সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে মশগুল রাখতেন এবং আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামত রাযীর শুকরিয়া জ্ঞাপন করতেন। তাঁর ইবাদত দেখে অভিশপ্ত শয়তান আল্লাহর দরবারে আরয করল, হে প্রভু! আপনার বান্দা আইয়্যুবকে আপনি অঢেল ধন-সম্পদ ও আরাম-আয়েশ দান করেছন বলে এরূপ সর্বদা আপনার ইবাদতে মশগুল থাকেন। যদি এই নিয়ামত তাঁকে আপনি দান না করতেন তবে তিনি এভাবে রাত দিন আপনার ইবাদত করতেন না। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার শক্তি ও আদেশ দিন, দেখি তিনি আপনার ইবাদত কিভাবে করেন এবং কিভাবে ইবাদতে দৃঢ় থাকেন? তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে শয়তান! আমার বান্দা ধন-দৌলত ও সুখ-শান্তির জন্য নয় বরং আমার প্রেমেই আমার বন্দেগী করছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে অনুমতি দিলেন হযরত আইয়্যুব আ.কে পরীক্ষার করার উদ্দেশ্যে। শয়তান একাদিক বার গিয়ে দেখল যে, হযরত আইয়্যুব আ. ইবাদতে মশগুল। অনেক চেষ্টা করেছে তাঁকে ধোকা দিতে। কিন্তু কিছুতেই সম্ভব হল না। অবশেষে নিরাশ ও ব্যর্থ হয়ে শয়তান চলে গেল।

অপর এক বর্ণনায় আছে, ফেরেশতাগণ হযরত আইয়্যুব আ.'র ইবাদত দেখে অবাক হয়ে আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, হে পরওয়ারদিগার! হযরত

---

[৩৮৮]. সূরা ছোয়াদ, আয়াত : ৪১-৪৪

আইয়্যুব আ.'র ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি পাওয়ার কারণে আপনার ইবাদতে মশগুল থাকেন। আপনিই তাঁকে পার্থিব জীবনের আরাম আয়েসের মধ্যে রেখেছেন। এরই ফলে তিনি ইবাদতে ব্যস্ত থাকেন। জবাবে আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ফেরেশতাগণ! তিনি ধন-দৌলত কিংবা সুখ স্বাচ্ছন্দের কারণে নয় বরং আমার সন্তুষ্টির জন্যেই ইবাদত করেন। আমার প্রদত্ত সব নিয়ামত ফিরিয়ে নিলেও তিনি আমার সন্তুষ্টিতে ধৈর্য্যশীল ও সন্তুষ্ট থাকবেন। বর্তমানে যেভাবে আমার অনুগত, ফকীর ও নিঃস্ব অবস্থায় এর চেয়ে বেশী অনুগত হবেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আইয়্যুব আ. বালা মুসিবত আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন, যাতে তিনি ধৈর্য্যশীল হয়ে অধিক সাওয়াব প্রাপ্ত হন। একদা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসল, হে আইয়্যুব! আপনি কি সুস্থতা চান নাকি দুঃখ ও বালা মুসিবত চান? উত্তরে তিনি বললেন, হে পালনকর্তা! সুস্থাতার চেয়ে আপনার পক্ষ থেকে দেয়া মুসিবত আমার জন্য উত্তম। অতএব তিনি স্বেচ্ছায় বালা মুসিবত গ্রহণ করে নিয়েছেন।

রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে এরূপও বর্ণিত আছে যে, একদা কেউ হযরত আইয়্যুব আ. কে বলল, আপনাকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে ধন সম্পদ আওলাদ-ফরযন্দসহ বহু নিয়ামত দান করেছেন। উত্তরে তিনি বললেন, এর বিনিময়ে তো আমি অনেক ইবাদত ও শোকর আদায় করছি। তাঁর একথাটি আল্লাহর অপছন্দ হল। তখনই এই মারাত্মক রোগে তিনি আক্রান্ত হলেন।

প্রথমে তিনি ধন-সম্পদের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। পরে ধীরে ধীরে সকল কিছু চলে যেতে লাগল। সন্তানরা ঘরের ছাদের নীচে চাপা পড়ে মারা গেল এবং চল্লিশ হাজার ছাগল ভেড়া, হাতি, ঘোড়া, গরু, উট ইত্যাদি যা ছিল সবগুলো মরে গেল। রাখালরা এসে তাঁকে সংবাদ দিতে চাইলে তিনি থাকতেন ইবাদতে মশগুল। পরে যখন সংবাদ দেয়া হত তখন তিনি বলতেন, আমি কি করব, যিনি দিয়েছেন তিনিই নিয়ে গেলেন- এই বলে তিনি পুনরায় ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন। আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অদৃশ্যভাবে এসে চারণ ভূমিতে যত গরু-ছাগল ছিল সবগুলো জ্বালিয়ে ফেলল। দায়িত্ববান এসে বললে তিনি সংবাদ শুনে কোন উত্তর না দিয়েই ইবাদতে মনোনিবেশ করতেন। এভাবে যতবার রাখালরা এসে দুঃসংবাদ দিত তিনি বিষয়টি আল্লাহর মর্জির উপর ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ইবাদতে রত হতেন। এমনিভাবে তার বাড়ী-ঘর, আসবাবপত্র, দরজা জানালা, বিছানাপত্র সহ সবকিছু আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে গিয়েছিল। কিছুই বাকী ছিল না। লোকেরা তাঁকে বলল, এখন আপনার কিছুই অবশিষ্ট রইলনা। তিনি বললেন আল্লাহর শোকর, এখনও আমার প্রাণ বেঁচে আছে যা এসব থেকে

উত্তম। পরের দিন চার সন্তান ও তিন কন্যা শিক্ষকের নিকট পড়তেছিল। ঘটনাক্রমে শিক্ষক কোন কাজে মকতব থেকে বের হলেন। ফিরে এসে দেখলেন যে, ঘরের ছাদ ভেঙ্গে সব সন্তানরা মৃত্যুমুখে পতিত হল। শিক্ষক মহোদয় এসে তাঁকে সন্তানদের মৃত্যু সংবাদ দিলে তিনি বললেন, ওরা সবই শহীদ হয়েছে।

এর এক সপ্তাহ পর নামাযে রত অবস্থায় তাঁর পায়ে ফোসকা পড়ল। ধীরে ধীরে এই রোগ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে গেল। ফলে শরীরের গোশতে পঁচন ধরল। শরীরে কীট জন্মাল এবং শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হতে লাগল। এতদ্বসত্ত্বেও তিনি ইবাদত বন্দেগী পূর্বের চেয়ে অধিকহারে করতে লাগলেন। একই জায়গায় পড়ে থাকতেন। উঠা বসা, চলা ফেরা, নড়া-চড়া ইত্যাদি করতে সক্ষম ছিলেন না। এভাবে চার বছর অতিক্রম হল কেবল বিছানায়। এমনকি চোখে পর্যন্ত কীট হয়েছিল। শুধু অন্তর ও জিহ্বা ব্যতিত আপাদমস্তক কীট জন্মেছিল। অন্তর ও জিহ্বা দিয়ে তিনি সর্বদা আল্লাহর যিকর করতেন। অতি আপনজন, আত্মীয় স্বজন এবং মহল্লাবাসীরাও তাঁকে ঘৃণা করতে লাগল। চারজন স্ত্রীর মধ্যে কেবল রাহমাহ কিংবা লাইয়্যা ব্যতিত সবাই তালাক নিয়ে চলে গেল। স্ত্রী বলত, হে হযরত! সুখের সময় আপনার সাথে থেকে নিয়ামত ভোগ করেছিলাম এখন দুঃখের সময়ও আপনার সাথে থেকে মুসিবত ভাগ করে নেব। আপনার সেবা যত্ন করব। এটাই হবে আমার উভয় জগতের নাজাতের উসিলা যদি আল্লাহ কবুল করেন। এভাবে তিনি সাত বছর অতিক্রম করলেন। হাদিস শরীফে হযরত আইয়্যুব আ. আঠার বছর রোগাক্রান্ত ছিলেন বলে বর্ণিত আছে।

عن انس بن مالك انّ النبى ﷺ قال اِنّ نبىّ الله ايوب لبث به بلائه ثمانى عشرة سنةً. হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন– নিশ্চয় আল্লাহর নবী হযরত আইয়্যুব আ. আঠার বছর মুসিবতে লিপ্ত ছিলেন।[৩৮৯]

স্ত্রীর সেবা:

তাঁর শরীরের দুর্গন্ধের কারণে মহল্লার লোকজন অতীষ্ট হয়ে পড়ল এবং তারা ভীত হয়ে পড়ল যে, সেই রোগ মহল্লাবাসীর লোকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে কিনা। ফলে তাঁকে মহল্লায় বাস করতে দিলনা। আত্মীয় স্বজন ও আপন জন কেউ তাঁর সাথে ছিলনা। ছিল কেবল তাঁর এক স্ত্রী এবং দুই শাগরিদ। একটি কাপড়ের তৈরি ঝুড়িতে করে তারা একগ্রাম থেকে অপর গ্রামে নিয়ে

[৩৮৯]. আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪ হিজরী, কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা- ২৩২

যেত। আর কান্নাকাটি করে তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমার ধনদৌলত, স্ত্রী-পুত্র কেউ নেই, কিন্তু আপনিই আমার মালিক এবং মেহেরবান। এই দোষ ত্রুটি আমারই, নিজের গ্রাম থেকেও বের করে দিয়েছে। অপর গ্রামে নিয়ে রেখেছে আমাকে। সেখান থেকেও ঘৃণা করে বের করে দিল আমাকে। বর্ণিত আছে যে, এভাবে সাতগ্রাম থেকে তাঁকে বের করে দেয়া হয়েছে। অবশেষে সেই দুই শাগরিদ অপারগ হয়ে জনমানব শূণ্য এক ময়দানে ছাউনীর নীচে শুয়ায়ে রেখে কিছুদিন পর চলে গেল। এখন কেবল তাঁর স্ত্রী ছাড়া তাঁর সেবায় কেউ নেই।

স্ত্রী প্রতিদিন তাঁকে সেই ময়দানে একা রেখে মহল্লায় গিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে যা পেতেন তা নিয়ে এসে স্বামীর খেদমতে উৎসর্গ করতেন। একদিন তাঁর স্ত্রী প্রতিদিনের ন্যায় গ্রামে গেলেন পরিশ্রম করে যা পাবে তা দিয়ে স্বামীর জন্য কিছু নিয়ে আসবেন। কিন্তু সেদিন কেউ কাজের জন্য তাকে ডাকেনি। দিন শেষে তিনি চিন্তাগ্রস্থ হয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন আজকে খালি হাতে স্বামীর কাছে যেতে হবে। তাকে কি খাওয়াবো? হে আল্লাহ! আমাকে কোথাও থেকে কিছু ব্যবস্থা করুন। অতঃপর স্ত্রী এক কাফের মহিলার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, হে গৃহিনী! আজ আমার ঘরে রান্না করার মতো কিছুই নেই। আমার স্বামী অসুস্থ। আমাকে আজ কিছু খাবার দিন। এর মূল্য যা হবে সে পরিমাণ কাল এসে কাজ করে দিব। কাফের মহিলা বলল, আগামীকাল আমার কোন কাজ নেই। তবে তোমার মাথার চুল আমার কাছে বেশ পছন্দ হয়েছে। কিছু চুল কেটে আমাকে দাও তবে আমি তোমাকে কিছু খাবার বস্তু দিতে পারি। স্ত্রী এ শর্ত শুনে কাঁদতে লাগলেন এবং বিনয়ের সাথে বলতে লাগলেন- আপিন এই শর্ত তুলে নিন। কারণ আমার স্বামী খুবই অসুস্থ, চলা ফেরা করার ক্ষমতা নেই তাঁর। লাঠির পরিবর্তে আমার চুল ধরে তিনি নামাযের জন্য উঠা বসা করেন। এই চুলগুলো কেটে ফেললে তিনি নামাযের জন্য উঠা বসা করতে অক্ষম হয়ে পড়বেন। কিন্তু কাফের মহিলা কিছুতেই মানল না। অবশেষে স্বামীর খোরাখ যোগানোর জন্যে বাধ্য হয়ে স্ত্রী নিজের প্রিয় চুল কেটে কাফের মহিলাকে দিয়ে স্বীয় স্বামীর জন্য কিছু খাবার সংগ্রহ করেন। ওদিকে অভিশপ্ত শয়তান একজন বয়স্ক লোকের বেশ নিয়ে হযরত আইয়্যুব আ.কে গিয়ে বলল, আপনার স্ত্রীকে চুরির দায়ে অমুক মহিলা চুল কেটে দিয়েছে। হযরত আইয়্যুব আ. শুনে দুঃখে কাঁদতে লাগলেন।

বর্ণিত আছে যে, এ সংবাদ শুনে তিনি যে পরিমাণ কেঁদেছেন আঠার বছর রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও এরূপ কাঁদেন নি। নিজ স্ত্রীর উপর অসন্তোষ হয়ে শপথ করে বসলেন যে, যদি আমি এই রোগ থেকে ভাল হই তবে স্ত্রীকে একশ বেত্রাগাত করব।

কোন কোন ঐতিহাসিক আলেমগণ স্ত্রীর চুল কাটার ঘটনা উল্লেখ করেন নি। বরং তারা বলেছেন স্ত্রী গ্রাম থেকে মেহনত করে হযরত আইয়্যুব আ.'র জন্য কিছু খাবার আনতেন। একদা পথে শয়তান এসে বলল, তুমি কে? কোথা থেকে আসতেছ এবং কোথায় যাবে? তুমি এতই পেরেশান কেন? স্ত্রী বললেন, আমার স্বামী অসুস্থ, চলা-ফেরা করার ক্ষমতা তাঁর নেই এবং বিছানায় শুয়ে থাকেন। তাঁর জন্যেই চিন্তিত। শয়তান তাকে বলল, আমি একটি ঔষধ তোমাকে বলে দিচ্ছি। যদি তুমি তা বাস্তবায়ন কর তবে শীঘ্রই তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন। আর তা হল যদি শূয়র ও শরাব ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করাও তাঁকে তবে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং আরাম বোধ করবেন। তিনি স্বামীকে গিয়ে বললেন হে হযরত! আজ পথে এক বৃদ্ধ ব্যক্তির সাক্ষাত হয়েছে। আমি তাকে আপনার করুণ অবস্থার কথা জানালাম। সে আমাকে একটি ঔষধের কথা বলেছে। হযরত আইয়্যুব আ. বললেন, সেটি কি? স্ত্রী বললেন, আপনি শরাব এবং শুয়রের মাংস ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করলে দ্রুত রোগ সেরে যাবে। একথা শুনে স্ত্রীর উপর খুবই রাগান্বিত হলেন আর বললেন, হে আমার স্ত্রী! তুমি কি আমাকে গুনাহে লিপ্ত করতে চাও? তখন তিনি শপথ করেছিলেন যে, আমি ভাল হলে তোমাকে একশ বেত্রাঘাত করব।

ইমাম আহমদ র. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আইয়্যুব আ.'র অসুস্থতার সময় একদা শয়তান চিকিৎসকের বেশে হযরত আইয়্যুব আ.'র পত্নীর সাথে সাক্ষাত করেছে। তিনি ওকে চিকিৎসক মনে করে স্বামীর চিকিৎসা করতে অনুরোধ করেন। শয়তান বলল, এই শর্তে চিকিৎসা করতে পারি যে, আরোগ্য লাভ করলে একথা স্বীকৃতি দিতে হবে যে আমিই তাঁকে আরোগ্য দান করেছি। এ স্বীকৃতিটুকু ছাড়া আমি আর কোন পারিশ্রমিক চাইনা। স্ত্রী হযরত আইয়্যুব আ.কে একথা বললে, তিনি বললেন তোমার সরলতা দেখে সত্যিই দুঃখ হয়। ওতো শয়তান ছিল। যেহেতু প্রস্তাবটি ছিল শিরকে লিপ্ত করার একটা সূক্ষ্ম অপপ্রয়াস। তাই তিনি শপথ করে বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সুস্থ করে তুললে, স্ত্রীর এ অপরাধের জন্য তাকে একশত বেত্রাঘাত করব।

হযরত আইয়্যুব আ. এই দীর্ঘকাল ধরে ধৈর্যচ্যুতিমূলক কান্নাকাটি কিংবা অভিযোগমূলক কোন কর্মকাণ্ড করেন নি। শেষ পর্যায়ে এসে কান্নাকাটি করার কারণ প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে বিভিন্ন বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। কোন বর্ণনায় আছে, হযরত আইয়্যুব আ.'র কান্না করার কারণ হল– তাঁর প্রতিবেশী দু'জন শাগরিদ ছিল, যারা প্রায়ই তাঁর সেবা যত্ন করতে আসত। তারা একদা বলতে লাগল-

হযরত আইয়্যুব আ. যদি কোন গুনাহ না করে থাকেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা এই দীর্ঘ কাল যাবৎ এই মারাত্মক রোগে তাঁকে আক্রান্ত করলেন কেন? আল্লাহ তো কোন বেগুনাহ ব্যক্তিকে কষ্ট দেননা। তিনি ন্যায়পরায়ন। তিনি তাদের কথা শুনে চিন্তাগ্রস্থ হয়ে কান্না করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমি গুনাহ করছি কিনা আপনিই তো ভাল জানেন। এ কারণেই তিনি কান্না করতেন।

অপর বর্ণনায় আছে, একদা দু'টি কীট তাঁর শরীর থেকে পড়ে গেল। তিনি ওই দু'টি ধরে সেই ক্ষতস্থানে রেখে দিয়েছেন যেখান থেকে পড়ে গিয়েছিল। আর বললেন, পড়ে যাচ্ছ কেন? যখন আল্লাহ তোমাদের জন্য আমার শরীরকে খাবার বানিয়েছেন, তখন ওই কীট দু'টি এমনভাবে কাটিতে লাগল যে, রোগের শুরু থেকে আঠার বছর পর্যন্ত এরূপ কষ্ট তিনি অনুভব করেননি। তখন তিনি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ . অর্থ: এবং স্মরণ করুন, আইয়্যুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন: আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। অত:পর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত:; আর এটা এবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ।[৩৯০]

হযরত আইয়্যুব আ.'র দোয়া ধৈর্য্যের পরিপন্থী ছিল না:

হযরত আইয়্যুব আ. দীর্ঘ সাত বছর যাবৎ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরও তিনি কোন সময় হা হুতাস অস্থিরতা ও অভিযোগের বাক্য মুখে উচ্চারণ করেন নি। সতী-সাধ্বী স্ত্রী একবার তাঁকে আরয করলেন, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন। তিনি উত্তর দিলেন, আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপাত করেছি। এর বিপরীতে বিপদের মাত্র সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন? পয়গাম্বর সুলভ দৃঢ়তা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করাও সমুচিত মনে করতেন না। যেন সবরের খেলাফ না হয়

[৩৯০]. সূরা আম্বীয়া, আয়াত : ৮৩-৮৪

যায়। অথচ আল্লাহর কাছে দোয়া করা, নিজের অভাব, দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ করা অধৈর্যের অন্তর্ভূক্ত নয়। অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল যা তাকে দোয়া করতে বাধ্য করল। তাঁর এই দোয়া দোয়াই ছিল কোন বেসবরী ছিলনা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا নিশ্চয় আমি তাঁকে সবরকারী পেয়েছি।

হযরত আইয়্যুব আ.'র দোয়া করার কারণ:

হযরত আইয়্যুব আ.'র জন্য খাবার যোগার করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী মানুষের ঘরে কাজ করতে লাগলেন। যেহেতু তিনি হযরত আইয়্যুব আ.'র স্ত্রী এবং সেবিকা। রোগ ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে লোকেরা তাকে কাজের জন্য রাখতেছেনা। তাই অনন্যোপায় হয়ে তার চুলের দুই বিনিটের একটির বিনিময়ে খাবার সংগ্রহ করে হযরত আইয়্যুব আ.'র নিকট নিয়ে আসলেন। তিনি জানতে চাইলেন যে, এই খাবার তুমি কোথা থেকে কিভাবে সংগ্রহ করেছ? এবং তিনি তা অপছন্দ করলেন। স্ত্রী উত্তর দিলেন, আমি মানুষের খেদমতের বিনিময়ে তা সংগ্রহ করেছি। পরের দিনও যখন কোন কাজ পেলনা তখন খাবারের বিনিময়ে তিনি অপর চুলের বিনিটটিও বিক্রি করে দিলেন এবং খাবার নিয়ে স্বামীর কাছে আসলেন। এতেও হযরত আইয়্যুব আ. অসন্তোষ্ট হলেন আর শপথ করে বললেন, এই খাবার কোথা থেকে এবং কিভাবে সংগ্রহ করেছ তা না বললে, আমি এই খাবার খাবো না। তখন স্ত্রী তার মাথার ওড়না উন্মুক্ত করলে তিনি দেখতে পেলেন যে, স্ত্রীর মাথা মুণ্ডানো। অর্থাৎ তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, স্ত্রী তাঁর জন্য খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে নিজের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু মাথার চুল বিক্রি করে দিয়েছেন।[৩৯১] তারপর তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করলেন–

رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

হযরত আইয়্যুব আ. আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করায় হযরত জিব্রাঈল আ. এসে বললেন, হে আইয়ুব আ.! আপনি এত বেশী কান্নাকাটি করতেছেন কেন? বললেন, কীটের আঘাতের কারণে অসহ্য হয়ে কাঁদছি। আঠার বছর যাবৎ এরূপ কষ্ট ও যাতনা অনুভব করিনি। জিব্রাইল আ. বললেন, আপনি নিজেই আল্লাহর কাছে বালা মুসিবত চেয়ে নিয়েছেন এবং পড়ে যাওয়া কীট নিজেই ক্ষত স্থানে তুলে নিয়েছিলেন। আপনার শরীরে কীট সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা আবার ফেলে দিচ্ছিলেন আল্লাহ তায়ালা। আপনি কেন ওই গুলোকে তুলে নিলেন? সে কারণেই ওই কীটদ্বয়ের আঘাত অসহ্য হয়ে পড়ছিল আপনার জন্য।

[৩৯১]. আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪ হিজরী, কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, খণ্ড– ১, পৃষ্ঠা : ২৩২

আর এক বর্ণনায় এসেছে যে, একদল বণিক হযরত আইয়্যুব আ.'র দরজায় এসে জিজ্ঞাসা করল এই ঘরটি কার? এতে কে বসবাস করে? লোকেরা বলল, এখানে আল্লাহর পয়গাম্বর হযরত আইয়্যুব আ. থাকেন। তারা বলল তিনি যদি আল্লাহর নেক বান্দা হন তবে তিনি এই মুসিবতে পতিত হবে কেন? নিশ্চয় হয়ত তিনি আল্লাহর নিকট কোন অপরাধ করেছেন। তিনি তাদের একথা শুনে অঝোর নয়নে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন আর বলতে লাগলেন। নিশ্চয় তারা সত্য বলেছে। আল্লাহর নিকট কি গুণাহ করেছি হয়ত আমার জানা নেই। তখন তিনি কুরআনে বর্ণিত দোয়া করেন। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁর রোগ মুক্তির ব্যবস্থা বাতলিয়ে দিলেন।

হযরত আইয়্যুব আ.'র আরোগ্য লাভঃ

ইবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আইয়্যুব আ.'র দোয়া কবুল হওয়ায় তাঁকে আদেশ করা হয়েছে পায়ের গোড়ালী দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার স্বচ্ছ শীতল পানির ঝর্ণা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তদ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হযরত আইয়্যুব আ. তদ্রূপই করলেন। ঝর্ণার পানি দিয়ে গোসল করা মাত্র ক্ষত জর্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমিষের মধ্যে রক্ত মাংস ও কেশমণ্ডিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ তাঁর জন্যে জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি জান্নাতী পোশাক পরিধান করত; আবর্জনার স্তুপ থেকে একটু সরে গিয়ে একপাশে বসে রইলেন। স্ত্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর সেবা যত্ন করার জন্য আগমণ করলেন। কিন্তু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। একপাশে উপবিষ্ট হযরত আইয়্যুব আ.কে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন আপনি জানেন কি? এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন? কুকুর ও ব্যাঘ্র কি তাঁকে খেয়ে ফেলেছে? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি তাঁর সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে হযরত আইয়্যুব আ. বললেন, আমিই আইয়্যুব। কিন্তু স্ত্রী তখনও তাঁকে চিনতে না পেরে বললেন, আপনি কি আমার সাথে পরিহাস করছেন? হযরত আইয়্যুব আ. আবার বললেন, ভাল করে লক্ষ্য করে দেখ, আমি আইয়্যুব। আল্লাহ তায়ালা আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এর পর আল্লাহ তায়ালা ধন-দৌলত ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান সন্ততিও। শুধু তাই নয় সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করলেন।[৩৯২]

[৩৯২]. আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪ হিজরী, কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা. ২৩৩

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, হযরত আইয়্যুব আ.'র সাতপুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন তখন সন্তানদেরকে পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্ত্রীর গর্ভে নতুন সন্তানও এই পরিমাণ জন্মগ্রহণ করে। একেই কুরআনে أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাসীরের মতে হযরত আইয়্যুব আ.'র যে স্ত্রী সর্বদা তাঁর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন তিনি ছিলেন রাহমাহ।

যাহহাক র. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা রাহমাহর যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং পূর্বের চেয়ে বাড়িয়ে দিলেন। এমনকি তার গর্ভে হযরত আইয়্যুব আ.'র চাব্বিশজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। হযরত আইয়্যুব আ. আরোগ্য লাভের পরে সত্তর বছর বেঁচেছিলেন। তিনি রোমে সত্যধর্মের উপর ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি দ্বীনে ইব্রাহীমে রূপান্তরিত হন।[৩৯৩]

হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে–

عن النبي ﷺ لَمَّا عَافَى اللهُ أَيُّوبَ عليه السلام أَمْطَرَ عَلَيْهِ جَرَادًا مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَأْخُذُ مِنْهُ بِيَدِهِ وَيَجْعَلُ فِي ثَوْبِهِ قَالَ فَقِيْلَ لَهُ يَا أَيُّوبُ أَمَا تَشْبَعُ ؟ قَالَ يَا رَبِّ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ ؟ নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত আইয়্যুব আ. কে রোগ থেকে মুক্তি দিলেন, তখন স্বর্ণের পঙ্গপাল বৃষ্টির ন্যায় তাঁর উপর পতিত হল। তিনি তা হাতে নিয়ে তাঁর কাপড়ে সংরক্ষণ করতে লাগলেন। তখন তাঁকে বলা হলে হে আইয়্যুব! তুমি কি (আমি যা দিয়েছি তাতে) পরিতৃপ্ত নও? তিনি উত্তর দিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার রহমত থেকে কি পরিতৃপ্ত হওয়া যায়?[৩৯৪]

অপর হাদিসে আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে,

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ لَا غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, একদা হযরত আইয়্যুব আ. নগ্নদেহে গোসল করেছিলেন। এমন সময় তাঁর উপর স্বর্ণের এক ঝাঁক পঙ্গপাল

[৩৯৩]. আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪ হিজরি, কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, খণ্ড- ১, পৃ. ২৩৩

[৩৯৪]. ইমাম হাকেম র. আল মুস্তাদরাক, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা : ৫৮২, সূত্র কাসাসুল আম্বিয়া।

পতিত হল। তিনি সেগুলো দু'হাতে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আইয়্যুব! তুমি যা দেখতে পাচ্ছ তা থেকে কি আমি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেইনি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ আমার প্রতিপালক কিন্তু আমি আপনার বরকতের অমুখাপেক্ষী নই।[৩৯৫]

হযরত আইয়্যুব আ. সুস্থতা লাভ করার পর পূর্বে স্ত্রীর উপর অসন্তোষ হয়ে যে শপথ করেছিলেন তা পূর্ণ করার মনস্থ করলেন। অর্থাৎ একশত বেত্রাঘাত করতে হবে। অথচ স্ত্রী ছিলেন নির্দোষ। তাই আল্লাহ তায়ালা হযরত আইয়্যুব আ. কে এমন কৌশল বলে দিলেন যাতে তাঁর শপথও পূর্ণ হয় এবং স্ত্রীও যুলুমের স্বীকার না হয়। আল্লাহ বললেন– وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا হে আইয়্যুব! তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও, তদ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করনা। আমি তাকে ধৈর্য্যশীল পেয়েছিলাম।

এর পদ্ধতি হল শপথকারী এমন একটি ঝাড়ু নিবেন যাতে একশটা শলা থাকে এবং ঐ ঝাড়ু দিয়ে যাকে প্রহার করার শপথ করেছিলেন তাকে একবার প্রহার করবেন। এতে তার শপথ পূর্ণ হয়ে যাবে। ওই যুগে শপথের কাফফারার কোন বিধান ছিল না। শপথের কাফফারার বিধান আমাদের শরীয়তে প্রবর্তিত হয়েছে। আল্লাহ এরশাদ করেন– قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের শপথগুলো থেকে অব্যহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যে সব ক্ষেত্রে তোমাদের শপথ ভঙ্গ করা আবশ্যক হয় অথবা উত্তম বিবেচিত হয়, আল্লাহ সে সবক্ষেত্রে কাফফারা আদায় করার পথ করে দিয়েছেন।[৩৯৬]

আল্লাহ তায়ালা হযরত আইয়্যুব আ. কে "হীলা" তথা কৌশল শিখিয়ে দিলেন যাতে শপথও পূর্ণ হয় এবং উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন অসমীচীন অথবা মাকরুহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরীয়ত সম্মত কোন কৌশল অবলম্বন করা জায়েয। তবে কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কৌশল অবলম্বন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কেউ কোন অনুচিত, অবৈধ কিংবা শরীয়ত বিরোধী কোন কাজের শপথ করলে শপথ হয়ে যাবে তবে সেই শপথ ভঙ্গ করে কাফফারা আদায় করতে হবে। অবৈধ শপথ পূর্ণ করা জরুরী নয় বরং গুনাহ।

---

[৩৯৫]. ইমাম বুখারী র., ২৫১ হিজরি, সহীহ বুখারী শরীফ, পারা : ১৩, হাদিস নং– ৩১৫৩

[৩৯৬]. সূরা তাহরীম, আয়াত : ২

ইবনে জারির র. সহ ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত আইয়্যুব আ. তিরান্নব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি আরো বেশী হায়াত পেয়েছিলেন। সিফরে আইয়্যুবে বর্ণিত আছে যে, হযরত আইয়্যুব আ. আরোগ্য লাভের পর একশত চল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন এবং তিনি নিজের ছেলে ও নাতি-নাতনী মোট চার অধঃস্তন পর্যন্ত দেখেছিলেন। তারপর দীর্ঘ জীবনের পর ইন্তেকাল করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত আইয়্যুব আ.কে সুখের সময় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী এবং দুঃখের সময় ধৈর্যশীল পেয়েছেন। হযরত আইয়্যুব আ. শয়তানের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণিত করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন আর আল্লাহর পক্ষ থেকে ধৈর্যশীল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করলেন।

এ প্রসঙ্গে তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ বর্ণনা করেছেন, হযরত আইয়্যুব আ. ছিলেন রোম দেশের অধিবাসী। তাঁর উর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আ.'র সঙ্গে তাঁর বংশধারা মিলিত হয়েছে এভাবে-আইয়্যুব ইবনে আহরাস ইবনে রাযেখ ইবনে রোম ইবনে ঈ'স ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম। আর তাঁর মাতা ছিলেন হযরত লুত বিন হারানের বংশোদ্ভুতা। হযরত আইয়্যুব আ. ছিলেন আল্লাহর নবী ও পূণ্যবান। আল্লাহ তাঁর জন্য পৃথিবীকে প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁকে দেয়া হয়েছিলো একটি বিশাল প্রান্তর ও একটি পাহাড়ের মালিকানা। তাঁর মালিকানায় আরো ছিলো অনেক উট, গাভী, ষাঁড়, মহিষ, মেষ, ছাগল, ঘোড়া ও গাধা। এছাড়া চাষাবাদের জন্য ছিলো পাঁচ জোড়া ষাঁড়। সেগুলোর প্রতিটি জোড়া দেখাশুনা করার জন্য ছিলো একজন করে খাদেম। ওই ক্রীতদাস খাদেমদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিও ছিলো। প্রতি জোড়া ষাঁড়ের কৃষি উপকরণ বহনের জন্য ছিলো একটি করে গাধা। প্রতিটি গাধার শাবকও ছিল। কোনোটির দু'টি, কোনোটির তিনটি, কোনোটির চারটি এবং কোনোটির পাঁচটি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দান করেছিলেন পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি। তিনি ছিলেন নেককার, পরহেজগার, দরিদ্র-দরদী, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানকারী, এতিম ও বিধবাদের পরিচর্যাকারী ও অতিথিপরায়ণ। সম্বলহারা মুসাফিরকেও তিনি অর্থ দান করতেন। এসকল নেয়ামতের কারণে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন এবং নিরবচ্ছিন্নরূপে আদায় করে যেতেন আল্লাহর হক। আল্লাহ তাঁকে বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে নিরাপদে রেখেছিলেন। শয়তান সাধারণতঃ বিত্তশালী ও অভিজাতদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন রাখে। কিন্তু তিনি ছিলেন শয়তানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তিনজন বিশিষ্ট উম্মত ছিলো তাঁর-ইয়াকীন, ইয়ালিদ এবং সাফের। ইয়াকীন ছিলো

ইয়েমেনের অধিবাসী। আর ইয়ালিদ ছিলো তাঁর প্রতিবেশী। তাঁরা তিনজনই ছিলো মধ্যবয়সী মানুষ। ওই সময় ইবলিসের ছিলো প্রচণ্ড দৌরাত্ম্য। আকাশ পর্যন্ত ছিলো তার গমনাগমন। আকাশের যে কোনো স্থানে সে অবস্থান করতে পারতো। হযরত ঈসা আ.'র আবির্ভাবের পরে তার আকাশগমনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শেষ রসুল মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ'র আবির্ভাবের পরে তাকে করা হয়েছে আরো বেশী নিয়ন্ত্রিত।

হযরত আইয়্যুব আ. অধিকাংশ সময় আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা ও যিকিরে মগ্ন থাকতে ভালবাসতেন। একবারের ঘটনা-তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে আল্লাহর যিকির ও প্রশংসা বর্ণনা করলেন। ফেরেশতারা তখন সম্মিলিতভাবে তাঁর উপরে বিশেষ রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করলো। এই দৃশ্য দেখে ইবলিস ক্রোধ ও হিংসায় জ্বলে উঠলো। সোজা উঠে গেলো আকাশে। আল্লাহর কাছে নিবেদন করলো, হে আমার স্রষ্টা! আমি তোমার বান্দা আইয়্যুবকে পরীক্ষা করে দেখেছি। সে কিন্তু তোমার খাঁটি বান্দা নয়। তুমি তাকে পার্থিব সুখ সম্পদ দান করেছো বলেই সে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততি দান করেছো বলেই বর্ণনা করে তোমার প্রশংসা। তুমি যদি তাঁর নিকট থেকে এ সকল নেয়ামত ছিনিয়ে নাও তবে দেখবে, সে আর তোমার ইবাদত বন্দেগী করছে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হলো, অবশ্যই আইয়ুব আমার খাঁটি বান্দা। যাও, তার সম্পদের উপর তোমাকে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা দেয়া হলো। তুমি শত চেষ্টা করলেও তাঁকে আমার ভালোবাসা থেকে পৃথক করতে পারবে না। ইবলিস আকাশ থেকে জমিনে নেমে এলো। তার অনুসারীদেরকে একত্র করে বললো, আমাকে আইয়্যুবের সম্পদের উপরে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমি পূর্ণরূপে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করবো এবং তার উপরে আপতিত হবে কঠিন মুসিবত। তখন তার ধৈর্যধারণ করা হয়ে পড়বে অসম্ভব। এখন তোমরা বলো, এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারবে? এক শয়তান বললো, আমি আগুনের গোলা হয়ে যেতে পারি। তখন আমার গমন পথের সবকিছুকে আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারি। ইবলিস বললো, ঠিক আছে, আইয়ুবের উটের পাল যখন চারণভূমিতে বিচরণ করবে তুমি সেগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করো। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই শয়তানটি হয়ে গেলো একটি গোলাকার অগ্নিকুণ্ড। হযরত আইয়ুব আ.'র উটের পাল তখন ছিলো চারণভূমিতে। সে আর দেরী না করে ওই উটের পালকে দ্রুতবেগে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে গেলো। ইবলিস তখন একটি উটে চড়ে উট চালক রূপে গিয়ে উপস্থিত হলো হযরত আইয়্যুব আ.'র বহির্বাটিতে। হযরত আইয়্যুব আ.

তখন নামায পাঠ করছিলেন। উট চালকরূপী শয়তান বললো, হে গৃহস্বামী! আপনার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। আপনার রাখাল ও উটের পাল আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে। হযরত আইয়্যুব আ. বলে উঠলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তিনিই আমাকে ওগুলো দান করেছিলেন, আবার তিনিই এখন তা প্রত্যাহার করে নিলেন। এমনিতেই তো ওগুলো ছিলো ধ্বংসশীল। ইবলিস বললো, আপনার প্রভুপালকই আকাশ থেকে আগুন পাঠিয়ে ওগুলো ভস্মীভূত করে দিয়েছেন। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলো চতুর্দিকে। বিস্মিত হলো সকলে। কেউ কেউ বললো, এতো দিন ধরে আইয়্যুব আ. আসলে কারো উপাসনাই করতো না। বরং প্রতারণায় লিপ্ত ছিল সে এতোদিন ধরে। কেউ বললো, আল্লাহই এই আগুন পাঠিয়েছেন যেনো আইয়্যুব আ.'র দুশমনেরা আনন্দিত হয় এবং ব্যথিত হয় বন্ধুবর্গ। কেউ কেউ আবার বললো, আইয়্যুব আ.'র প্রভুপালক যদি শক্তিমান হতো, তবে তাঁর উটের পালগুলোকে রক্ষা করতে পারতো। হযরত আইয়্যুব আ. এ সকল কিছুই শুনলেন। তারপর বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! যিনি দিয়েছেন, তিনিই তো তা ফিরিয়ে নিয়েছেন। সর্বাবস্থায় তিনিই প্রশংসার যোগ্য। আমি মাতৃউদর থেকে পৃথিবীতে এসেছিলাম নগ্ন হয়ে। সেভাবেই পৃথিবী পরিত্যাগ করবো এবং সেভাবেই আবার পুনরুত্থিত হবো। আল্লাহ প্রদত্ত বিপদ উপেক্ষা করার অধিকার ও ক্ষমতা কারোরই নেই। বিপদে হা-হুতাশ করা অনুচিত। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করতে সক্ষম। তিনিই আমাদের সকলের একক সৃজয়িতা ও পালনকর্তা। সুতরাং হে মানুষ! অধিকতর কল্যাণকর সিদ্ধান্ত তো ছিলো শহীদ হওয়া। কিন্তু এখনো তো আমি বর্তমান। তাই মনে হচ্ছে আল্লাহ হয়তো আমাকে মন্দই ভেবেছেন। তাই ভস্মীভূত করেছেন আমার উটের পালকে, কিন্তু আমাকে রেখেছেন অক্ষত। হযরত আইয়্যুব আ.'র এরকম মনোভাব ও কথোপকথন শুনে ইবলিস অপদস্থ ও হতাশ হয়ে গেলো। বিমর্ষ বদনে সে ফিরে গেলো তার সাথীদের কাছে। তাদেরকে বললো, আশ্চর্য! আইয়ুবকে তো আমি হতোদ্যম করতে পারলাম না। এক শয়তান বলে উঠলো, বিকট আওয়াজ সৃষ্টি করতে পারি আমি। ওই আওয়াজ তুললে শেষ হয়ে যাবে আইয়ুবের সকল মেষ, বকরী ও সেগুলোর রাখাল। ইবলিস বললো, তবে এক্ষুণি যাও, চিৎকার করে আইয়্যুব আ.'র সকল ছাগল, মেষ ও তাদের রাখালকে মেরে ফেলো। হুকুম পেয়ে সে ছুটে গেলো অন্য চারণভূমিতে বিচরণরত রাখাল ও তাদের মেষ ও বকরীর পালের নিকটে। বিকট আওয়াজ তুলল সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল সকল মেষ, ছাগল ও তাদের রাখাল। তখন ইবলিশ রাখালের বেশে হাজির হল আল্লাহর যিকররত হযরত আইয়্যুব আ.'র নিকট। বলল, গিয়ে দেখুন, আপনার মেষ ও ছাগল সব মরে পড়ে আছে। আইয়্যুব আ. আগের মতোই উত্তর দিলেন,

আলহামদুলিল্লাহ! আমার কোনো অনুযোগ নেই। ইবলিস বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেলো তার সঙ্গী-সাথীদের কাছে। বললো, আইয়্যুবকে তো কাবু করতে পারলাম না। এবার বলো কী করা যায়। এক শয়তান বললো, আমি ইচ্ছে করলে প্রচণ্ড ঝড় হয়ে সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। ইবলিস বললো, তবে তাই করো। তার চাষাবাদের জন্য ব্যবহৃত ষাঁড় ও ক্ষেতের ফসল উড়িয়ে নিয়ে যাও। শয়তানটি তাই করলো। প্রচণ্ড তুফান হয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলো হযরত আইয়্যুব আ.'র ক্ষেতের ফসল ও ষাঁড়গুলো। পড়ে রইলো শূন্য মাঠ। এবার ইবলিস ক্ষেতের ব্যবস্থাপকের বেশ ধরে হযরত আইয়্যুব আ.'র নিকটে গিয়ে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা জানালো। হযরত আইয়্যুব আ. তবুও নির্বিকার। আগের মতো একই জবাব দিয়ে তিনি নামায পাঠে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর অতুলনীয় সহিষ্ণুতা দেখে ক্ষোভে দুঃখে জর্জরিত হতে লাগলো ইবলিস। সে পুণরায় উঠে গেলো আকাশে। বললো, হে আল্লাহ! আইয়্যুব ভালো করে একথা জানে যে, তুমি তার পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকে যেহেতু অক্ষত রেখেছো, সেহেতু তাদের জীবিকার ব্যবস্থাও তুমি করবে। এবার তুমি আমাকে কর্তৃত্ব দান করো তার সন্তান-সন্ততিদের উপর। দেখবে সে আর ধৈর্য রাখতে পারবে না। তাকে বলা হলো, যাও, এ ক্ষমতাও তোমাকে দেয়া হলো। আকাশ থেকে ফিরে এসে ইবলিস দেখলো, হযরত আইয়্যুব আ.'র সন্তান-সন্ততিরা একটি প্রাসাদের অভ্যন্তরে বিদ্যাভ্যাস করছে। সে প্রচণ্ড আঘাতে ধসিয়ে দিলো প্রাসাদটি। ছাদ চাপা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করলো নিষ্পাপ বালক-বালিকারা। এবার সে ধারণ করলো শিক্ষকের বেশ। মুখে, হাতে, শরীরে রক্ত লাগিয়ে নিয়ে নামাযপাঠরত হযরত আইয়্যুব আ.'র কাছে বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, আপনি এখানে কী করছেন? গিয়ে দেখুন, আপনার আদরের ছেলেমেয়েদের অবস্থা। ছাদ ধসে পড়ে কী হাল হয়েছে তাদের। কারো নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে গিয়েছে। কারো বের হয়েছে মাথার ঘিলু। ওই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখলে আপনি আর স্থির থাকতে পারবেন না। এবার হযরত আইয়্যুব আ.'র হৃদয় বিগলিত হলো। তিনি কেঁদে ফেললেন। এক মুঠো মাটি মাথায় রেখে বললেন, আক্ষেপ! আমাকে যদি সৃষ্টিই না করা হতো। ইবলিস এবার খুশী হলো। হযরত আইয়্যুব আ.কে ধৈর্যহারা হতে দেখে হৃষ্টচিত্তে সে উঠে গেলো আকাশে। হযরত আইয়্যুব আ. পরক্ষণেই সম্বিত ফিরে পেলেন। নিজের উক্তির জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন মহান আল্লাহর দরবারে। সে ক্ষমাপ্রার্থনা সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেলো আল্লাহ সকাশে। ইবলিস যথাস্থানে উত্থিত হওয়ার আগেই এভাবে ক্ষমাপ্রাপ্তির ঘটনা ঘটতে দেখে ইবলিস অপদস্থ হলো আর একবার। বললো, হে আল্লাহ! তুমি তো আইয়্যুবকে এখনো

সুস্থ রেখেছো। সে তাই বিশ্বাস করে, শারীরিক সুস্থতার কারণে তুমি তাকে পুনরায় দান করবে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই সে এখনো তোমার কথা মনে রেখেছে। তুমি আমাকে এবার তার শারীরিক সুস্থতায় হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দাও। দেখবে, তোমার প্রতি সে হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ বিমুখ। জবাবে তাকে জানানো হলো, যাও, এ ক্ষমতাও তোমাকে দেয়া হলো। কিন্তু তাঁর হৃদয় ও রসনার উপর তোমার কোনো প্রভাব খাটবে না। ইবলিস খুশী হলো খুব। আকাশ থেকে নেমে সোজা হযরত আইয়্যুব আ.'র গৃহে গিয়ে দেখলো, তিনি সেজদাবনত। সেজদা থেকে মাথা ওঠাতে না ওঠাতেই ইবলিস তাঁর নাসিকায় দিলো এক অশুভ ফুৎকার। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আইয়্যুব আ.'র সারা শরীরে জ্বালা-পোড়া শুরু হয়ে গেলো। শরীরের বিভিন্ন স্থানে দেখা দিলো ফোসকা। তিনি সেগুলো চুলকাতে শুরু করলেন। চুলকাতে চুলকাতে খসে পড়লো হাতের নখ। এরপর তিনি সেগুলো চুলকাতে শুরু করলেন অমসৃণ চটের সাহায্যে। সে চটও টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়লো। তারপর তিনি তাঁর শরীরের ক্ষত স্থানগুলো চুলকাতে শুরু করলেন ভগ্ন মৃৎপাত্রের টুকরো দিয়ে। আবার কখনো প্রস্তরখণ্ড দিয়ে। খসে খসে ঝড়ে যেতে লাগলো শরীরের গোশত। সমস্ত শরীর থেকে নির্গত হতে লাগলো দুর্গন্ধ। প্রতিবেশীরা তখন তাঁকে গ্রাম থেকে বের করে দিলো। দূরে একটি ঝুপড়ি নির্মাণ করে দিলো তাঁর জন্য। সম্পর্কচ্ছেদ করলো সকলে। তখন তাঁর সঙ্গে রইলো কেবল তাঁর সাধ্বী ও পতিঅন্তঃপ্রাণা সহধর্মিনী রহমত বিনতে আফরাইম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ছিল রহিমা এবং তিনি ছিলেন হযরত ইউসুফ আ.'র কন্যা। তিনি ওই ঝুপড়ির মধ্যে দিনের পর দিন নীরবে সেবা করে যেতে লাগলেন তাঁর স্বামীর। প্রথম দিকে ইয়াকিন, ইয়ালিব ও সাফের শিথিল সম্পর্ক রক্ষা করলেও শেষে তারাও সম্পর্কচ্ছেদ করলো হযরত আইয়্যুব আ.'র সঙ্গে। তারা হযরত আইয়্যুব আ.'র ধর্ম ত্যাগ করলো না, কিন্তু একথা মনে করতে শুরু করলো যে, নিশ্চয় কোনো গোনাহর কারণে তাঁকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তাই তারা সম্পর্কচ্ছেদের পূর্বে বললো, এ হচ্ছে পাপের শাস্তি। সুতরাং আপনি তাওবা করুন।

এক বর্ণনাকারীর বর্ণনায় এসেছে, ওই বসতিতে ছিলো একজন যুবক ঈমানদার। তিনি হযরত আইয়্যুব আ. সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার অপমন্তব্য শুনতে পেয়ে বসতির সকলকে সমবেত করে বললেন, হে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ! গুরুজন হওয়ার কারণে আপনারা বিভিন্ন মন্তব্য করার অধিকার রাখেন। কিন্তু আপনারা পূণ্যবান আইয়্যুব আ. সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য করে চলেছেন, তা অযথার্থ।

তাঁর প্রতি আপনাদের যেমন অধিকার আছে, তেমনি আপনাদের প্রতিও রয়েছে তাঁর অধিকার। তাঁর প্রতি আপনাদের কিছু দায়িত্বও তো রয়েছে। অথচ সে দায়িত্ব পালন না করে আপনারা তাঁকে ক্রমাগত অসম্মান করে চলেছেন। আপনারা কি একথা জানেন না যে, তিনি আল্লাহর নবী ও পূণ্যবান? আপনারা কি তাঁকে কখনো কোনো প্রকার অন্যায় করতে দেখেছেন? তবে এখন ভালো করে জেনে নিন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা। এ যুগের সকল মানুষের চেয়ে তিনি আল্লাহ তায়ালার অধিকতর প্রিয়ভাজন। প্রিয় পয়গম্বরের প্রতি আল্লাহ কখনো অপ্রসন্ন হন না। প্রদত্ত সম্মান কখনো ছিনিয়েও নেন না। আপনারা ভাবছেন, আল্লাহ তাঁকে অপমানিত করেছেন। কখনোই নয়। তিনি তাঁর প্রিয় পয়গম্বর, সিদ্দিক, শহীদ ও পূণ্যবানগণকে এভাবেই বিভিন্ন দুঃখকষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। এমতো পরীক্ষার মাধ্যমে একথা কখনো প্রমাণিত হয় না যে, তাঁরা আল্লাহর বিরাগভাজন। বরং এই দুঃখকষ্টই হয় তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির এক একটি দুর্লভ কারণ। আরো ভেবে দেখুন, তিনি আপনাদের স্বজন, ভ্রাতৃতুল্য। সুতরাং নবী হিসেবে আপনারা যদি তাঁকে না-ও মানেন, তবে তিনি যে আপনাদের স্বজন ও সুহৃদ, সে কথা কি আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন? বিবেকবানেরা কি কখনো বিপদের সময় তাদের বন্ধুকে পরিত্যাগ করে? তিরস্কার করে? অভিসম্পাত দেয়? তিনি তো এখন রোগক্লিষ্ট ও বেদনাহত। এমতো অবস্থায় তিনি কি হতে পারেন আপনাদের দোষারোপের পাত্র? অথচ তাঁর কোনো দোষের কথা আপনাদেরও জানা নেই। অতএব হে শ্রদ্ধার্হ গুরুজনগণ! আপনারা আপনাদের অপউক্তি প্রত্যাহার করুন। সংশোধন করুন আপনাদের মনোবৃত্তি ও আচরণ। প্রদর্শন করুন সহমর্মিতা ও ভালোবাসা। অশ্রুপাত করুন তাঁর বেদনায় ও বিরহে। আপনারা আপনাদের বিবেককে প্রশ্ন করে দেখুন, এরকমই জবাব মিলবে। হে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিত্ববৃন্দ! আল্লাহর মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করুন। স্মরণ করুন মৃত্যুকে। এ পৃথিবীর মায়া তো একদিন সকলকেই ছিন্ন করতে হবে। আপনাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহর কোনো কোনো বান্দা সহৃদয়, জ্ঞানী, স্পষ্টভাষী ও বাগ্মী। কিন্তু আল্লাহর ভয় তাঁদেরকে নিশ্চুপ করে রেখেছে। তাঁরা আল্লাহর পরাক্রমের কথা স্মরণ করে শিহরিত হন। হয়ে যান হুঁশহীন ও অনুভূতিহারা। আল্লাহর রোষতপ্ত মহিমা বা জালালিয়াত অবলোকন করেই তাঁরা এরকম হন। নিজেকে তখন তাঁদের মনে হয় সর্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী। এধরনের ব্যক্তিবর্গই প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানবান ও আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদায় মর্যাদান্বিত।

অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে প্রদত্ত যুবক ঈমানদারের ভাষণ দূরের ঝুপড়িতে থেকেও শুনতে পেলেন হযরত আইয়্যুব আ.। বললেন, আল্লাহ কখন কাকে কীভাবে যে তাঁর বিশেষ রহমত ও হেকমত প্রদানে ধন্য করেন, তা বোঝা যায় না। যাকে তিনি দয়া করে দান করেন বিশেষ প্রজ্ঞা, তাঁর রসনা থেকেই নিঃসৃত হয় অভিজ্ঞানের অমিয় প্রবাহ। বয়স একটি গৌণ ব্যাপার। আল্লাহ কাউকে কাউকে বাল্যবেলাতেই প্রদান করেন দুলর্ভ জ্ঞান। তারা তাই বুঝতে পারে সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের অধিকার রয়েছে কেবল আল্লাহর।

এই ঘটনার পর থেকে হযরত আইয়্যুব আ. পৃথিবীবাসীদের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কায়মনোবাক্যে নিরত হলেন আল্লাহর আরাধনায়। নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভু পালনকর্তা! আমি তো জানি না তুমি আমাকে কিসের জন্য সৃষ্টি করেছো! হায়! তুমি যদি আমাকে অস্তিত্বায়িতই না করতে। আক্ষেপ! আমি যদি জানতে পারতাম, কী আমার অপরাধ। প্রিয় প্রভুপালক আমার! আমি কী এমন করেছি, যার জন্য তুমি আমার উপরে আপতিত করেছো তোমার বৈমুখ্য। পাপী যদি হই, তবে তুমি তো আমাকে মৃত্যুদান করতে পারতে। আমি নিশ্চিন্তে মিলিত হতাম আমার পিতৃপুরুষগণ সঙ্গে। মৃত্যুই কি এখন আমার জন্য অধিক উপযুক্ত নয়? হে আমার আপনতম সৃজয়িতা! আমি কি পথিকদের জন্য বিশ্রামাগার এবং পিতৃহীন অসহায়দের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করে দিই নি? দুঃস্থ জনতার তত্ত্বাবধানে ও বৈধব্যগ্রস্থাদের দেখা শুনা কি আমি করিনি? হে আমার দয়াময় প্রভুপালক! আমি তো তোমারই বান্দা। তুমি যদি আমাকে নিরাময় করো, তবে তা হবে তোমার একান্ত দয়া। কিন্তু আমাকে দুঃখকষ্ট দেয়ার অধিকারও তোমার রয়েছে। তুমি তো আমাকে বানিয়েছ বহ্নিমান বেদনার নির্দশন। বিশাল পর্বতও তো এ বেদনা বহন করতে পারবে না। আমি তো রক্তমাংসের গড়া দুর্বল মানুষ। বলো, কীভাবে আমি এতো দুঃখ সহ্য করি। দলিত মথিত, ছিন্ন ভিন্ন তৃণগুচ্ছের মতো এই শরীর নিয়ে বলো, আমি এখন কোথায় যাই। কেবল প্রার্থনা করি, তুমি আমার হৃদয় ও রসনাকে সচল, সজীব ও জাগ্রত রাখো। আমি যেনো তোমার ভালোবাসা, নিবেদন ও স্মরণ দ্বারা নিরবচ্ছিন্নভাবে রাখতে পারি আমার হৃদয় ও রসনা। এটাই এখন আমার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপহার। তুমি আমাকে দেখো। কিন্তু আমি তো তোমাকে দেখি না। তুমি আমার কথা শোন, কিন্তু আমি তো তোমার কথা শুনি না। আমার প্রতি রয়েছে তোমার সার্বক্ষণিক দৃষ্টিপাত। কিন্তু আমি তো তোমাকে দেখি না। তোমার নৈকট্য আনুরূপ্যবিহীন। তাই হৃদয়ে সর্বক্ষণ যেনো পাই তোমার নৈকট্যের অপার্থিব সৌরভ। রসনায় যেনো পাই যথার্থ নিবেদনের ভাষা। প্রার্থনায় সস্মিত উচ্চারণ।

ওদিকে যুবক ঈমানদারের বক্তৃতা শুনে বসতির লোকেরা অনুতাপজর্জরিত মনে সকলে জড়ো হলো হযরত আইয়্যুব আ.'র ঝুপড়িতে। গিয়ে দেখলো হযরত আইয়্যুব আ. তাঁর দীর্ঘ প্রার্থনা শুরু করেছেন। প্রার্থনা শেষে দেখা গেলো উর্ধ্বাকাশে ছায়া বিস্তার করছে এক খণ্ড মেঘ। কেউ কেউ ধারণা করলো, এ আবার আযাবের কোনো মেঘ নয় তো? কিন্তু তাদের ধারণা চূর্ণ করে দিয়ে মেঘ থেকে আওয়াজ উত্থিত হলো- হে আইয়্যুব! আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, আমি তোমার সমীপবর্তী। আর আমার এই সামীপ্য তোমার সার্বক্ষণিক সহচর! ওঠো, প্রকাশ করো তোমার বাসনা ও বিচ্ছেদের কথা। শোনো আমার সঙ্গে কারো বাদ-প্রতিবাদ চলে না। কারণ আমি চির অসমকক্ষ ও চির অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হে আমার প্রিয়ভাজন আইয়্যুব! তোমার প্রবৃত্তি কি মনে করে, স্বেচ্ছায় সে তার উদ্দেশ্যে উপনীত হতে পারবে? কোথায় তুমি ছিলে সেদিন, যেদিন আমি সৃষ্টি করেছিলাম আকাশ ও পৃথিবী? বিস্তৃত ও বাসযোগ্য করে তুলেছিলাম পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ। তুমি কি জানো, কোন উপকরণ দিয়ে কীভাবে আমি সৃষ্টি করেছি এই মহাবিশ্বকে? পানি কি তোমার নির্দেশে পৃথিবীর মৃত্তিকাকে উপরে ঠেলে তুলেছে? তোমার প্রজ্ঞা কি করতে পেরেছে মৃত্তিকাকে পানির আচ্ছাদন? তখন তুমি ছিলে কোথায়, যখন আমি আকাশকে বহু উঁচুতে স্থাপন করেছিলাম উদ্দাম বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কায়, যে আকাশ কোনো রশির সাহায্যে ঝুলন্ত নয়, অথবা স্থাপিত নয় কোনো স্তম্ভের উপর। তুমি কি তোমার ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এমতো বিন্যাস নির্মাণ করতে পারো? আমি আকাশকে ভাসিয়ে দিয়েছি আলোয়। সেখানে পরিচালিত করেছি অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জকে। বলো তোমার অঙ্গুলি হেলনে কি দিবস-বিভাবরী বিবর্তিত হয়? যখন আমি মৃত্তিকা ছেদন করে সৃষ্টি করেছি তরঙ্গবিক্ষুব্ধ মহাসাগর, বলতো, কোথায় ছিলে তুমি তখন? তোমার পরিকল্পনায় কি উদ্বেলিত হয় জলধি তরঙ্গ? কে থামিয়ে রেখেছে ওই বিক্ষুব্ধতাকে? মৃত্তিকার প্রাচীর দিয়ে আমিই তো ঠেকিয়েছি সেই উন্মত্ত তরঙ্গের আঘাত-প্রত্যাঘাত। আর স্থলভাগকে অচঞ্চল করেছি তার পৃষ্ঠদেশে পবর্তমালার পেরেক গেঁথে। ছিলে কোথায় তখন তুমি বলো? তুমি কি জানো, ভারসাম্যের কোন পরিমাপ দিয়ে আমি সুস্থির করে রেখেছি মৃত্তিকাস্থিত পাহাড়গুলোকে। এ সকল কিছুর তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা ও নিয়মায়ন কি তোমার পক্ষে সম্ভব? বলো, হে আমার প্রিয় নবী! মেঘপুঞ্জ কীভাবে সৃষ্টি হয়? কীভাবে আকাশে উত্থিত হয় বায়বীয় জলাধার? কীভাবে ঝরে মন্দ-মধুর ও ক্ষিপ্ত-ক্ষিপ্র বৃষ্টিপাত? বলো, বরফ সৃষ্টি হয় কেমন করে? পর্বতায়নের উৎস কোথায়? কীভাবে দিবসের বক্ষে রাত্রি এবং রাত্রির বক্ষে দিবস প্রতিনিয়ত আশ্রয়ায়িত হয়? বলো, বাতাসই বা আসে কোথা থেকে? বৃক্ষরাজি কথা বলে কোন অচেনা ভাষায়? কে সৃষ্টি করেছে মানুষ,

বিবেক, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা? কে সৃষ্টি করেছে শ্রুতি ও দৃষ্টির অদৃশ্য আচ্ছাদন? ফেরেশতারা কার কর্তৃত্বাগত? কে তার সর্বত্রগামী শক্তিমত্তা দিয়ে চির পরাভূত করে রেখেছে সমগ্র সৃষ্টিকে? আর কে দান করে সকলকে রহস্যময় জীবনোপকরণ?

হযরত আইয়্যুব আ. নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালক! তুমি আমার পরিচয় আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছো। আমি নির্বাক, ভীত ও অভিভূত। আমি বুঝেছি, আমি কেউ নই, কোনো কিছুই নই। আমার রসনা রুদ্ধ। বুদ্ধি অবদমিত। হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তা! তোমার অপার প্রজ্ঞাময়তা ও অনির্ণেয় শক্তিমত্তা প্রকাশ পেয়েছে তোমার বক্তব্যে। তোমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে আমি যা ধারণা করতে সক্ষম, তার চেয়েও তুমি অনেক বড়, মহিমাময়। কোনো সৃষ্টি তোমাকে উপেক্ষা করতে পারে না। কোনো কিছু তোমার কাছ থেকে থাকতে পারে না গোপন। হে মহাবিশ্বের মহা অধিকর্তা! পীড়ার তীব্রতা আমাকে নিরুপায় করে ফেলেছে। রোগ যন্ত্রণা আপনা আপনি ভাষা পেয়েছে আমার রসনায়। হায় আক্ষেপ! যদি মৃত্তিকা বিদীর্ণ হতো, আর আমি প্রোথিত হতে পারতাম মৃত্তিকাভ্যন্তরে, তবে হয়তো আমি তোমার মর্যাদার সান্নিধ্যে এরকম কথা উচ্চারণ করতে পারতাম না। নির্মাণ করতে পারতাম না তোমার অপ্রসন্নতার ন্যূনতম কোনো কারণ। মৃত্যুও তো এর চেয়ে উত্তম। অন্তরঙ্গ প্রার্থনা উপস্থিত করাই ছিলো আমার ব্যাকুল প্রাণের একান্ত উদ্দেশ্য। তাই কখনো আমি আর্তনাদ করে উঠেছি, যাতে তুমি আমার নিবেদন কবুল করে নাও। আবার কখনো নিশ্চুপ থেকেছি, যেনো আমার উপরে আপতিত হয় তোমার দয়া। হে আমার প্রভুসৃজয়িতা! যা বলার আমি তাতো বলেছিই। আর কখনো এমতো অনুযোগ তোমার পবিত্র দরবারে উপস্থাপন করবো না। এই আমি হাত রাখলাম আমার মুখে। জিহ্বা সংলিপ্ত করলাম দন্তরাজিতে। আর মুখমণ্ডলে মাখলাম মৃত্তিকা। আজ কেবল আমি পরিত্রাণার্থী। প্রতীক্ষমান তোমার প্রবলতম রহমতের। সুতরাং আমাকে আশ্রয় দাও। ক্ষমা করো। তোমারই সকাশে আমি আজ একাগ্রচিত্ত প্রার্থী। সাহায্যপ্রার্থী। আমার সকল নির্ভরতা এখন তুমি। আমার উদ্দেশ্য সফল করো। বাঁচাও। মাফ করে দাও। তোমার প্রসন্নতাবিরোধী কোনো কিছু আমি আর কোনদিনই করবো না।

আল্লাহ বললেন, আমি সর্বজ্ঞ। আমি জানি তুমি কে। কী। তুমি তো আমারই মনোনীত নবী। আর আমার রহমত আমার গজব অপেক্ষা প্রবল। তুমি ক্ষমা প্রাপ্ত। রহমতপ্রাপ্ত। পৃথিবীর সকল আকর্ষণ থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করেছি। আর তোমাকে করেছি সকল বিপদগ্রস্তদের জন্য উপদেশ। তোমাকে দেখে যেনো সকলে বুঝে নেয়, ধৈর্যশীলতাই হচ্ছে সম্মান লাভের সোপান।

এবার তোমার পায়ের গোড়ালী দ্বারা মাটিতে আঘাত করো। দেখবে সেখান থেকে উৎসারিত হচ্ছে স্বচ্ছ ও সুপেয় সলিল। ওই সলিল পান করো। গোসল করো ওই অলৌকিক জলস্রোতে। এর মধ্যে রয়েছে তোমার নিরাময়। নিরাময়ের পর তোমার সঙ্গীদের পক্ষ থেকে কোরবানী করো। ক্ষমা প্রার্থনা করো তাদের জন্য। তারাই তোমার সম্পর্কে আমার বিরাগভাজন হয়েছে। অসৎ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমাকে পরিত্যাগ করেছে।

হযরত আইয়্যুব আ. তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন। তীব্র তেজে উত্থিত হলো পানির প্রসবন। সকৃতজ্ঞ চিত্তে তিনি ওই পানি পান করলেন এবং তাতে অবগাহনও করলেন। দূর হয়ে গেলো সকল দুঃখ-কষ্ট, রোগ-যন্ত্রণা। ইত্যবসরে তাঁর সহধর্মিনী উপস্থিত হলেন সেখানে। প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের জন্য যেখানে তাঁকে রেখে গিয়েছিলেন, সেখানে এসে খুঁজতে থাকলেন তাঁকে। পেলেন না। কাছাকাছি এক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! এখানে যে পীড়িত লোকটি পড়ে ছিলো, তার সম্পর্কে তুমি কি কিছু জানো? ওই সুস্থ ও সুঠাম ব্যক্তিটিই ছিলেন নিরাময় প্রাপ্ত হযরত আইয়্যুব আ.। তিনি বললেন, হ্যাঁ। চিনবো না কেন? একথা বলে তিনি মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, দেখো তো ভালো করে। মৃদু হাসি দেখেই তাঁকে চিনতে পারলেন তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণী। আনন্দে আলিঙ্গন করলেন আল্লাহর নবীকে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী সেই পবিত্র সত্তার শপথ! হযরত রহিমা হযরত আইয়্যুব আ.কে ততক্ষণ পর্যন্ত জড়িয়ে ধরে ছিলেন, যতক্ষণ না হযরত আইয়্যুব আ.'র ধ্বংস হয়ে যাওয়া সন্তান-সন্ততি ও পশুপাল পুনর্জীবিত হয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিলো।

দুঃখ কষ্টের কাল ও প্রার্থনার সময় ঃ বাগভী লিখেছেন, হযরত আনাস রা. থেকে সুপরিণত সূত্রে জুহরী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, হযরত আইয়্যুব আ. দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিলেন আঠারো বছর ধরে। ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, পূর্ণ তিন বছর এর একদিনও বেশী নয়। হযরত কা'ব আহবার বলেছেন, সাত বছর। এক বর্ণনায় এসেছে সাত বছর সাত মাস সাত দিন। হাসান বসরী বলেছেন, তিনি সাত বছর সাত মাস পীড়িত হয়ে পড়ে ছিলেন বনী ইসরাঈল জনপদের পাশের এক জঙ্গলে। তাঁর শরীর ছিলো কীটের বিচরণভূমি। ওই সময় হযরত রহিমা ছাড়া তাঁর কাছে কেউ থাকতো না। হযরত রহিমা তাঁর আহার্য সংগ্রহ করে আনতেন এবং একান্ত দরদ দিয়ে সেবাযত্ন করতেন। অসহনীয় রোগযন্ত্রণা নিয়েও হযরত আইয়্যুব আ. আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করতেন। ওই সময় হযরত রহিমাও অংশগ্রহণ করতেন তাঁর সঙ্গে। ইবলিস ওই

দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠতো এবং তার সকল সঙ্গী-সাথীদেরকে একত্র করে বলতো, আল্লাহর এই বান্দা তো আমাকে একেবারে অক্ষম করে দিলো। তাঁর সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়ে গেলেও সে ধৈর্যধারণ করেছিলো। এখনও তো দেখছি সে প্রকাশ করে চলেছে অধিকতর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। একদিন সে সকলকে সমবেত করে বললো, এখন তোমারই বলো, কীভাবে সাহায্য করতে পারো আমাকে? সঙ্গীরা বললো, আপনি আদমকে জান্নাত থেকে বের করে এনেছিলেন কীভাবে? ইবলিস বলল, আমি তার স্ত্রীকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলাম। সাথীরা বললো, তাহলে এখনো তো আপনি সেরকম কিছু করতে পারেন। চেষ্টা করে দেখুন না। সে তার স্ত্রীর বিপরীত কিছু করতে পারবে না। আর তার স্ত্রী ব্যতীত তার কাছে কেউ যায়ও না। ইবলিস বললো, ঠিক বলেছো তোমরা। এরপর সে এক পুরুষের আকৃতিতে উপস্থিত হলো হযরত রহিমার সামনে। বললো, হে আল্লাহর দাসী! তোমার স্বামী কোথায়? তিনি বললেন, ঝুপড়ির মধ্যে। তিনি তো কঠিন রোগে আক্রান্ত। সারা শরীরে তাঁর ফোঁড়া। তাই সারাক্ষন শরীর চুলকাতে হয়। আর সেখানে সারাক্ষণ বিচরণ করে অসংখ্য কীট। ইবলিস একথা শুনে মনে মনে প্রীত হলো। খুঁজে পেলো ধৈর্যহীনতার গন্ধ। আশা পোষণ করলো, এই ধৈর্যহীনতার সূত্র ধরে হয়তো তাকে কাবু করা যাবে। সে তখন বলতে শুরু করলো, হায় কতো কিছু ছিলো তোমার স্বামীর। ক্ষেত, খামার, পশুপাল, সুদৃশ্য বসতবাটী, আর শরীর ভরা যৌবন। কী নিদারুণ অদৃষ্ট! আজ যে সেগুলোর কোনো কিছুই নেই। কে জানে আর কখনো শেষ হবে কিনা এই ঘোর দুঃখের অমানিশা।

হাসানের বর্ণনায় এসেছে, ইবলিসের কথাগুলো শুনে পতি অন্তঃপ্রানা রহিমা আর্তনাদ করে উঠলেন। শয়তান তাঁর আর্তনাদ শুনে বুঝতে পারলো, এই রমণীর ধৈর্য এখন টলটলায়মান। সে আশাধারী হয়ে একটি বকরির বাচ্চা পূণ্যবতী রহিমাকে এনে দিয়ে বললো, আইয়্যুবকে বলো, সে যেনো এই বাচ্চাটি গায়রুল্লাহর নামে জবাই করে। এরকম করলেই সে সুস্থ হয়ে যাবে। স্বামীর সুস্থতার কথা শুনে রহিমা আশান্বিত হলেন। স্বামীর কাছে পৌঁছানোর আগেই দূর থেকে বলতে শুরু করলেন, আমি তো বুঝতে পারছি না, আর কতদিন আপনার প্রভুপালক আপনাকে দুঃখ-কষ্টে রাখবেন। কোথায় গেলো আপনার সম্পদ, সন্তানাদি, বন্ধুবান্ধব, সুদর্শন অবয়ব ও সুঠাম দেহ? সুতরাং আমার কথা শুনুন। এই বকরির বাচ্চাটিকে গায়রুল্লাহর নামে জবাই করুন। আপনার দুঃখ কষ্ট আর থাকবে না। আপনি হয়ে যাবেন সবল ও সুস্থ। হযরত আইয়্যুব আ. বললেন, বুঝতে পেরেছি আল্লাহর দুশমন ইবলিস তোমার কাছে এসেছিলো।

তোমার উপরে সে প্রভাব বিস্তার করেছে। তোমার অকল্যাণ হোক। বলো, সম্পদ, সন্তানাদি, পশুপাল তোমাকে কে দিয়েছিলো? তাঁর স্ত্রী বললেন, আল্লাহ। হযরত আইয়্যুব আ. বললেন, কতোদিন ধরে আমরা সেগুলো ভোগ করেছি? রহিমা বললেন, আশি বছর ধরে। হযরত আইয়্যুব আ. বললেন, দুঃখ-কষ্ট চলছে কতোদিন ধরে? রহিমা বললেন, সাত বছরের অধিক কাল। হযরত আইয়্যুব আ. বললেন, যেহেতু সুখ ছিলো আশি বছর, সেহেতু দুঃখও তো আশি বছর হওয়াই সমীচীন। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যদি আমাকে আরোগ্য দান করেন, তবে আমি তোমাকে আশিটি বেত্রাঘাত করবো। তুমি আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কোরবানী করতে বলো। যাও, তোমার আনীত আহার্যদ্রব্য আজ থেকে আমার জন্য হারাম। এখন থেকে তুমি ও আমি পৃথক। আমাকে আর তোমার মুখ দেখিয়ো না। এভাবে হযরত আইয়্যুব আ. তাঁর স্ত্রীকে বের করে দিলেন। বিরহবিধুরা পুণ্যবতী রহিমা অবনতমস্তকে প্রস্থান করলেন সেখান থেকে। হযরত আইয়্যুব আ. হয়ে পড়লেন নিঃসঙ্গ। তিনি দেখলেন, পানাহারের ব্যবস্থা, সেবাযত্ন করার লোক, বন্ধু-বান্ধব কোনো কিছুই তাঁর নেই। তিনি তখন সেজদায় লুটিয়ে পড়ে বললেন, হে আমার প্রভুপালক! আমি দুঃখকষ্টে পড়েছি, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে উপস্থাপিত প্রার্থনায় হযরত আইয়ুব সোজাসুজি আল্লাহর কাছে কিছু চাননি। কেবল তাঁর দূরববস্থার কথা বলেছেন এভাবে-আমি দুঃখকষ্টে পড়েছি। তারপর আকুণ্ঠচিত্তে আল্লাহর দয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন এভাবে- তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

এর পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে- 'তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং আমার নিকট থেকে দয়া ও ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ তার দুঃখকষ্ট দূরীভূত করে দিলাম।'

হযরত আইয়্যুব আ.কে তখন নির্দেশ দেয়া হলো, পায়ের গোড়ালী দিয়ে মাটিতে আঘাত করো। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। সহসা সেখান থেকে উদগত হলো একটি উচ্ছলিত ঝর্ণা। পুনঃনির্দেশ দেয়া হলো, গোসল করো। তিনি ওই পানিতে গোসল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রোগমুক্ত হয়ে গেলো তাঁর শরীরের বহিরাবরণ। সম্মুখে অগ্রসর হলেন তিনি। চল্লিশ কদম যেতেই পুনঃনির্দেশ ঘোষিত হলো, পায়ের গোড়া দিয়ে মাটিতে আঘাত করো। এ নির্দেশটিও তিনি যথারীতি পালন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে উদগিরিত হলো শীতলসলিলবিশিষ্ট আর একটি নহর। আদেশ ঘোষিত হলো, পান করো। তিনি ওই ঝর্ণার পানি পান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে গেলো তাঁর শরীরের

অভ্যন্তর ভাগ। তিনি পরিণত হলেন সুন্দর অবয়বধারী ও সুঠাম দেহবিশিষ্ট এক যুবকে। উত্তম পরিচ্ছেদ পরিধান করলেন তিনি। ডানে বামে দৃষ্টিপাত করে হয়ে গেলেন অভিভূত। সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর পুনর্জীবনপ্রাপ্ত সন্তান-সন্ততি, প্রাসাদ, ক্ষেতখামার, ফসল, পশুপাল সবকিছুকে আল্লাহ করে দিয়েছেন দ্বিগুণ। ঝর্ণার পানি তখনো ছিটকে পড়ছিলো তাঁর বক্ষের উপর। তিনি দেখলেন আর এক বিস্ময়। পানির প্রতিটি ফোঁটা হয়ে যাচ্ছে একেকটি স্বর্ণের ফড়িঙ। ফড়িঙগুলোকে ধরবার জন্য হস্ত প্রসারিত করলেন তিনি। আল্লাহ প্রত্যাদেশ করলেন, আইয়্যুব! আমি কি তোমাকে বিত্তশালী করিনি? তিনি বললেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! অবশ্যই। কিন্তু এ যে তোমার অতিরিক্ত দান। এরকম অতিরিক্ত দান থেকে মুখ ফিরায় কে? দাতা তো তুমিই। তোমার দান থেকে বিমুখ হওয়া কি শোভন? হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল ﷺ বলেছেন, নবী আইয়্যুব তখন গোসল করেছিলেন নগ্ন হয়ে। আর সোনার ফড়িঙগুলো ওই সময় পতিত হচ্ছিলো তাঁর উপরে। তিনি সেগুলোকে ধরে ধরে পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে ভরে রাখতে শুরু করলেন। ঘোষিত হলো-আইয়্যুব! তোমাকে তো আমি অনেক দিয়েছি। তবুও এগুলো সংগ্রহ করছো কেনো? হযরত আইয়্যুব আ. বললেন, তোমার মাহাত্ম্যের শপথ! তুমি আমাকে অবশ্যই অনেক দিয়েছো। কিন্তু তুমি এখন যা দান করেছো সেই দান থেকে আমি তো অমুখাপেক্ষী হতে পারি না।

হাসান বর্ণনা করেছেন, নিরাময় লাভের পর হযরত আইয়্যুব আ. গিয়ে বসলেন একটি উঁচু স্থানে। ওদিকে তাঁর পুণ্যবতী সহধর্মিনী অনেক দূরে চলে যেতে গিয়েও পারলেন না। ভাবলেন, আল্লাহর নবীর আহার্যের ব্যবস্থা করবে কে? সেবাশুশ্রূষা করতেই বা কে এগিয়ে আসবে? অরণ্যের হিংস্র প্রাণীরা যদি আক্রমণ করে বসে? এসকল কিছু ভেবে তিনি পুনরায় ফিরে গেলেন ওই ঝুপড়ির দিকে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলেন তিনি নেই। ঝুপড়িটিরও কোনো চিহ্ন নেই। কেমন যেনো পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে সব। কোনো কিছু বুঝতে না পেরে তিনি অশ্রুপাত করতে লাগলেন অঝোর ধারায়। নিকটেই উঁচু টিলায় উপবিষ্ট হযরত আইয়্যুব আ. সব কিছু দেখছিলেন। তাঁর পরনে তখন শোভা পাচ্ছে অতিসুন্দর একটি পোশাক। আর নিজেও তখন সুন্দর ও সুঠামদেহী এক যুবক। হযরত রহিমা তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কিন্তু চিনতে পারলেন না। ভয়ে কোনো প্রশ্নও করতে পারলেন না। হযরত আইয়্যুব আ. তখন তাঁকে কাছে ডাকলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর দাসী! কী চাও তুমি? কাঁদছো কেনো? হযরত রহিমা বললেন, আমি এখানে একজন পীড়িত ব্যক্তিকে রেখে গিয়েছিলাম। তিনি

আমার স্বামী। আমি তাঁকেই খুঁজছি। হযরত আইয়্যুব আ. জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্বামী তাহলে নিহত হয়েছেন? হযরত রহিমা একথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। হযরত আইয়্যুব আ. বললেন, তাকে দেখলে কি তুমি চিনতে পারবে? হযরত রহিমা বললেন, কেউ কি তার স্বামীকে না চিনে পারে? একথা বলে তিনি ভয়ে ভয়ে হযরত আইয়্যুব আ.'র দিকে একবার ভালো ভাবে দৃষ্টিপাত করলেন। বললেন, তিনি যখন সুস্থ ছিলেন, তখন তাঁর চেহারা ছিলো আপনার মতো। হযরত আইয়্যুব আ. বললেন, আমিই তো আইয়্যুব। তুমি আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কোরবানী করার পরামর্শ দিয়েছিলে। কিন্তু সে শয়তানী প্ররোচনার দিকে আমি ভ্রূক্ষেপও করিনি। আমি আল্লাহর কাছে নিরাময় চেয়েছিলাম! তিনি আমার প্রার্থনা কবুল করেছেন। এই দেখো, আমি এখন কেমন সুস্থ ও সবল।

ওহাব বর্ণনা করেছেন, হযরত আইয়্যুব আ. বেশ কয়েক বছর ধরে দুঃখ যাতনা ভোগ করেছিলেন। ইবলিস প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো তাঁর ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি, ক্ষেতখামার ও শরীরের উপর। কিন্তু এতো কিছু করেও সে যখন হযরত আইয়্যুব আ.কে আল্লাহর জিকির থেকে টলাতে পারলো না, তখন সে সুন্দর একটি ঘোড়ায় চড়ে দেখা করলো তাঁর পূণ্যবতী স্ত্রীর সঙ্গে। সে-ও ধারণ করলো আকর্ষণীয় রূপ। সে প্রথমে দাঁড়িয়ে রইলো বিবি রহিমার গমনপথের পাশে। কিছুক্ষণ পর তাঁকে আসতে দেখে বললো, তুমিই কি আইয়্যুব আ.'র হতভাগিনী স্ত্রী? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইবলিস বললো, তুমি কি আমাকে চেনো? তিনি বললেন, না। ইবলিস বললো, আমি পৃথিবীর দেবতা। আমিই আইয়্যুব আ.'কে পীড়িত করে রেখেছি।

কারণ সে আমাকে ছেড়ে আকাশের আল্লাহর উপাসনা করে যাচ্ছিলো। আমি তার প্রতি খুবই অপ্রসন্ন। এখনও সময় আছে, সে যদি আমাকে মাত্র একবার সেজদা করে, তবে আমি ফিরিয়ে দিবো তার হারিয়ে যাওয়া সম্পদ ও সন্তানাদি। ওগুলো আমার কাছেই জমা আছে। ওই দ্যাখো, একথা বলে সে পাশের মরুভূমির দিকে বিবি রহিমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি দেখলেন, সেখানে চরে বেড়াচ্ছে হযরত আইয়্যুব আ.'র পশুপাল, আর দাঁড়িয়ে আছে মৃত সন্তান-সন্ততিরা। ওহাব আরো বর্ণনা করেছেন, একথাও আমার নিকটে এসেছে যে, ইবলিস তখন বলেছিলো, তোমার স্বামী যদি আহার গ্রহণের সময় বিসমিল্লাহ না বলে, তবে তাকে সুস্থ করে দেয়া হবে।

কোনো কোনো গ্রন্থে রয়েছে, ইবলিস বললো, হে আইয়্যুব পত্নী! তুমি যদি আমাকে একবার সেজদা করো, তবে আমি তোমার স্বামীকে সুস্থ করে দিবো। ফিরিয়ে দিবো ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। হযরত রহিমা পীড়িত স্বামীর কাছে

এসে একথা জানালেন। হযরত আইয়্যুব বললেন, তুমি তো পড়েছো আল্লাহর দুশমনের পাল্লায়। আমিও শপথ করছি, আল্লাহ আমাকে সুস্থ করে দিলে আমি তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করবো। হযরত আইয়্যুব আ. এরকম বলেও স্বস্তি পেলেন না। তিনি আশংকা করলেন, ইবলিস যদি এভাবে তাঁর স্ত্রীকে ঈমানহারা করে দেয়। এই আশংকার কারণেই তিনি সেজদাবনত হয়ে বলে উঠলেন, হে আমার প্রভুপালক! আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি, তুমি তো দয়াবানগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। আল্লাহ তখন পূণ্যবতী ও সেবাপরায়ণা রহিমার কারণে হযরত আইয়ুব আ.কে সুস্থ করে দিলেন এবং তাঁকে জানিয়ে দিলেন, তার প্রতি কঠোর হয়ো না। একশত ছোট ডাল একত্র করে একবার মৃদু আঘাত করো তার শরীরে। এরকম করলেই তোমার শপথ পূর্ণ হয়ে যাবে। তুমিও তখন আর শপথ ভঙ্গের দায়ে দায়ী হবে না।

অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, ইবলিস একটি বাক্সে কিছু ঔষুধপত্র ভর্তি করে চিকিৎসকের বেশে বিবি রহিমার গমনপথে এসে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পর তিনি সেখানে এসে অচেনা চিকিৎসককে দেখতে পেয়ে বললেন, আপনি তো মনে হয় চিকিৎসক। আমার স্বামী অসুস্থ। আপনি তাঁকে সুস্থ করে দিতে পারবেন? ইবলিস বললো, তা পারবো। তবে সুস্থ হওয়ার পর তাকে একথা স্বীকার করতে হবে যে, আমিই তাকে সুস্থ করে দিয়েছি। বিবি রহিমা স্বামীর কাছে গিয়ে একথা জানালেন। হযরত আইয়ুব আ. বললেন, লোকটি ইবলিস। সে তোমাকে ধোকা দিয়েছে। আমি শপথ করলাম, সুস্থ হলে আমি তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করবো।

ওহাব ও অন্যান্যের বর্ণনায় এসেছে, পতিপ্রাণা রহিমা শ্রমের বিনিময়ে যা উপার্জন করতেন, তাই দিয়ে তাঁদের দু'জনের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা চলতো। এই নিয়ে লোকেরা নানা কথা বলতে শুরু করলো। তিনি ছোঁয়াচে রোগীর কাছে থাকেন, তাই তার দ্বারা কাজ করানো ঠিক নয়-এরকম মন্তব্য করতে শুরু করলো অনেকে। অবস্থা এমন পর্যায়ে দাঁড়ালো যে, শেষে কেউ আর তাঁকে কাজ দিতে চাইলো না। সবাই তাঁকে দেখলেই দূরে সরে যায়। নিরুপায় রহিমা তাই একদিন তাঁর কেশ কর্তন করে তার বিনিময়ে সংগ্রহ করে আনলেন একটি রুটি। হযরত আইয়ুব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাথার চুল কী হলো? রহিমা খুলে বললেন সব। হযরত আইয়ুব তৎক্ষণাৎ সেজদায় লুটিয়ে পড়ে বললেন, হে আমার প্রভুপালয়িতা! আমি পড়েছি ঘোর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে। আর তুমি তো দয়ার্দ্রচিত্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক দয়াময়। কেউ কেউ বলেছেন, যখন তাঁর ক্ষতস্থানগুলোর কীট চড়াও হলো তাঁর বক্ষাভ্যন্তরে ও রসনায়, তাঁর জিকির বন্ধ হয়ে যায় কিনা, এই আশংকাতেই তিনি তখন ওরকম করে বলেছিলেন।

হাবিব বিন সাবেত বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের এই বক্তব্যটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তখন, যখন তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিলো তিনটি ঘটনা- ১. একদিন তাঁর দু'জন সুহৃদ এসে দেখলো, তাঁর সারা শরীর রক্তাক্ত, চোখ দু'টিও নষ্ট হওয়ার পথে। তখন তারা বললো, আল্লাহর কাছে তোমার কোনো মর্যাদা থাকলে তোমার এ অবস্থা কখনো হতো না। ২. উপায়ন্তর না দেখে তাঁর স্ত্রী নিজের মাথার চুলের বিনিময়ে সংগ্রহ করে আনলেন কিছু খাদ্য। ৩. ইবলিস বললো, আমি তাকে নিরাময় করে দিতে পারি কিন্তু তাকে বলতে হবে, আমিই তার আরোগ্যদাতা।

এরকমও বলা হয়েছে যে, ইবলিস একদিন হযরত আইয়্যুব আ.কে এই মর্মে কুমন্ত্রণা দিলো যে, তোমার স্ত্রী অসতী, তাই মানুষ শাস্তিস্বরূপ তার চুল কেটে নিয়েছে। হযরত আইয়্যুব আ. তখন উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, আমি তোমাকে দান করবো একশত বেত্রদণ্ড। তারপর তিনি পেশ করেছিলেন, তাঁর দুঃখ কষ্টের কথা।

আলেমগণ বলেন, 'আমি দুঃখ কষ্টে পড়েছি' কথাটির অর্থ হবে এখানে- মানুষের অবজ্ঞা ও আনন্দ আমাকে ফেলে দিয়েছে অধিকতর দুঃখকষ্টের মধ্যে।

এক বর্ণনায় এসেছে, আরোগ্য লাভের পর একবার আল্লাহর প্রিয় নবী আইয়্যুব আ.কে জিজ্ঞেস করা হলো, রোগ ভোগকালে আপনি সবচেয়ে বেশী কষ্ট পেতেন কখন? তিনি বললেন, যখন শত্রুরা আমার দুর্দশা দেখে আনন্দিত হতো।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, একদিন হযরত আইয়্যুব আ. দেখলেন, ক্ষতস্থানের একটি পোকা মাটিতে পড়ে গেলো। তিনি সেটিকে উঠিয়ে পুনঃ স্থাপন করলেন তাঁর উরুদেশে। বললেন, আল্লাহ্ আমার শরীরে রেখেছেন তোমার আহার। তুমি চলে যাচ্ছো কেনো? একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পোকাটি দংশন করতে শুরু করলো দ্বিগুণ শক্তিতে। হযরত আইয়্যুব আ. সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলেন-হে আমার প্রভুপালনকর্তা। আমি দুঃখকষ্টে নিপতিত হয়েছি।

একটি রহস্যঃ হযরত আইয়্যুব আ. ছিলেন সাবেরশ্রেষ্ঠ। অথচ আলোচ্য আয়াতে দেখা যাচ্ছে, তিনি তাঁর দুঃখকষ্টের কথা বলে ধৈর্যহারার পরিচয় দিচ্ছেন। এরকম ধৈর্যচ্যুতি প্রকাশক বক্তব্য এসেছে অন্য আয়াতেও। যেমন- শয়তান তো আমাকে ফেলেছেন কষ্ট ও যন্ত্রণায় (সুরা সোয়াদ)। এর রহস্য কী?

রহস্যভেদঃ এগুলো তাঁর কোনো অভিযোগ ছিলো না। তাই তাঁর এমতো বক্তব্যে ধৈর্যভঙ্গের কোনো প্রভাব নেই। বরং ওগুলো ছিলো তাঁর প্রার্থনা। তাই এখানে বলা হয়েছে- আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। অর্থাৎ তার দোয়া কবুল করলাম। আল্লাহর কাছে তাঁর বান্দা দুঃখকষ্টের কথা জানাবেই। প্রিয়তমজনকে

নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা জানানোতে কোনো দোষ নেই। এরকম বক্তব্য অভিযোগ নয়, বরং আপনজনোচিত অনুযোগ। এরকম অনুযোগের কথা বিবৃত হয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন-'আমি আল্লাহর কাছে আমার অভ্যন্তরীণ কষ্ট ও দুশ্চিন্তার অনুযোগ করি।'

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে এবং তার দুঃখ-বেদনার কথা অপর কাউকে না জানিয়ে কেবল জানায় আল্লাহকে, সে ধৈর্যহীন নয়। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল ﷺ'র পীড়িতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল আ. আবির্ভূত হয়ে বললেন, কেমন আছেন? তিনি ﷺ বললেন, চিন্তাযুক্ত ও অস্থির। আমি বলি, ইবনে জওজীও এরকম বর্ণনা এনেছেন হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে, যেখানে বলা হয়েছে, জিবরাঈল আ. আবির্ভূত হয়ে রোগগ্রস্ত রসুলকে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে সালাম প্রেরণ করেছেন এবং জিজ্ঞেস করতে বলেছেন, আপনি কেমন আছেন?

এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল ﷺকে রোগযন্ত্রণায় কাতর হতে দেখে একসময় জননী আয়েশা রা. বলে উঠলেন, হায় আমার মাথা! রসুল ﷺ বললেন, আয়েশা! তোমার মাথা, না আমার মাথা? আমার মস্তক যে যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। ইবনে ইসহাক ও ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা রা. বলেছেন, জান্নাতুল বাকী কবরস্থান থেকে ফিরে এসে শয্যাগ্রহণ করলেন আল্লাহর রসুল। আমার তখন প্রচণ্ড মাথা ধরেছিলো। তাই বললাম, হায় আমার মাথা! তিনি বললেন, আয়েশা! আমার মাথাও যে যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে।

মৃত পরিবার পরিজনবর্গের পুর্নজীবন লাভঃ

আল্লাহপাক হযরত আইয়্যুব আ.'র মৃত পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকে পুনর্জীবিত করে দিয়েছিলেন, না তাদের মতো অবিকল অন্যান্য পরিজন ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে যথেষ্ট মতপ্রভেদ রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে মাসউদ রা., কাতাদা, হাসান এবং অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, আল্লাহপাক তাঁর মৃত পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকেই পুনরায় জীবিত করে দিয়েছিলেন। আলোচ্য বাক্যের প্রকাশ্য ব্যাখ্যা এরকমই।

হাসান বলেছেন, মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করা হয়নি। বরং তাঁকে দেয়া হয়েছিলো পূর্ববর্তীদের সমসংখ্যক নতুন পরিবার পরিজন। জুহাকের এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আল্লাহ তাঁর স্ত্রীকে পুণরায় যৌবনবতী করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর উদর থেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলো ছাব্বিশটি সন্তান। ওহাব বলেছেন, জন্মগ্রহন করেছিলো সাত কন্যা ও তিন পুত্র। ইবনে ইয়াসার বলেছেন, সাত পুত্র ও সাত কন্যার কথা।

সুপরিণত সূত্রে হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা এসেছে, হযরত আইয়্যুব আ.'র শস্যক্ষেত্র ছিলো দু'টি। একটি গমের, আর অন্যটি যবের। আল্লাহর হুকুমে দু'জন ফেরেশতা ওই বিরান শস্যক্ষেত্র দু'টোর একটিতে স্বর্ণের বৃষ্টি বর্ষণ করলো এবং আরেকটিতে করলো রৌপ্যের বৃষ্টিপাত।

এক বর্ণনায় এসেছে, তখন হযরত আইয়্যুব আ.'র কাছে এক ফেরেশতা এসে বললো, অভূতপূর্ব ধৈর্যাবলম্বনের কারণে আল্লাহ আপনাকে সালাম প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন, বাইরে বেরিয়ে শস্যাগারের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে। নির্দেশানুসারে তিনি গৃহের বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, শস্যাগারের উপরে উড়ছে স্বর্ণের ফড়িং। হযরত আইয়্যুব আ. একটি উড়ন্ত ও ছুটন্ত ফড়িংকে ধরে ফেললেন। ফেরেশতা বললো, এরকম অনেক ফড়িং তো আপনার শস্যাগার পরিপূর্ণ করেছে। ওগুলোই কি যথেষ্ট ছিলো না? হযরত আইয়্যুব আ. বললেন, এতো আমার প্রভুপালক প্রদত্ত বরকত। আমি তাঁর বরকতের প্রতি আকৃষ্ট হবো না কেনো?

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তাঁর পরিবার পরিজন ও পশুপালকে পুনর্জীবিত করেন নি। বরং নতুন করে তাঁদের অনুরূপ পরিবার পরিজন তাঁকে দান করেছিলেন। ইকরামা বলেছেন, হযরত আইয়্যুব আ.কে বলা হয়েছিলো, তোমার মৃত সন্তান-সন্ততিকে তুমি পাবে আখেরাতে। তবে তুমি যদি চাও, তবে আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই ফিরিয়ে দিবো। আর যদি না চাও, তবে আমি তোমাকে দান করবো সমসংখ্যক ও সমআকৃতি বিশিষ্ট নতুন সন্তান-সন্ততি। এই বর্ণনাটিকে গ্রাহ্য করা হলে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে-আমি আইয়্যুব আ.'র মৃত সন্তান-সন্ততি রেখে দিয়েছিলাম আখেরাতের জন্য এবং তাদের অনুরূপ সন্তান-সন্ততি তাকে দিয়েছিলাম দুনিয়ায়। এখানে 'আহল' শব্দটির অর্থ হবে সন্তান-সন্ততি।[৩৯৭]

১৫. হযরত যুলকিফল আ.

পরিচিতি: হযরত যুলকিফল আ.'র বংশপরিচয় নিয়ে ওলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে তিনি ছিলেন হযরত আইয়্যুব আ.'র ছেলে। তাঁর পরেই যুলকিফল আ. নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর নাম হল বিশর। এমতানুযায়ী তাঁর বংশপরিক্রমা হয় বিশর ইবনে আইয়্যুব ইবনে আমুস ইবনে রাযেহ ইবনে আইস ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আ.।[৩৯৮] কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন হযরত ইয়সা আ.'র চাচাতো ভাই।

[৩৯৭]. ছানাউল্লাহ পানিপথি র. তাফসীরে মাযহারী, বাংলা, খণ্ড- ৭, পৃ. ৬১৪-৬৩০
[৩৯৮]. তারীখে তাবারী, খণ্ড ১, পৃ. ১৬৪, সূত্র, জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৩৯৮

তাঁর এ নামে নামকরণের কারণ:

১. মুহাককেকীনের অভিমত হল- তিনি তাঁর সমকালীন আম্বিয়াগণের দ্বিগুণ আমল করতেন। তাঁর জন্য প্রতিদানও ছিল দ্বিগুণ। এ কারণেই তাঁকে যুলকিফল বলা হত।[৩৯৯]

২. তাঁর নিকট বনী ইস্রাঈলের একশত বন্দী তাশরীফ নিয়েছিলেন। তিনি সবাইকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং সকলের দায়িত্ব নিজের উপর নিয়েছিলেন। তাই তাঁর নাম হল যুলকিফল।[৪০০]

৩. কেউ কেউ বলেন, হযরত যুলকিফল আ. বাদশাহ'র ঘনিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ওই বাদশাহ'র সাথে বনী ইস্রাঈলদের প্রচণ্ড শত্রুতা ছিল। তিনি একের পর এক বনী ইস্রাঈলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে হত্যা ও লাঞ্ছিত করত। একদা তাঁর সৈন্যবাহিনী বনী ইস্রাঈলকে পরাজিত করে একশত নেককার ওলামাকে বন্দী করে বাদশাহ'র নিকট পাঠিয়ে দিল। বাদশাহ তাদের সকলকে হত্যা করার মনস্থ করলেন। বাদশা'র ইচ্ছার কথা শুনে যুলকিফল আ. বাদশাহ'র কাছে গিয়ে বললেন, তাদেরকে আমার নিকট সোর্পদ করুন। আমিই তাদের কফিল হবো। আগামীকাল সকালে আমি তাদেরকে আপনার বরাবরে সোর্পদ করবো। বাদশাহ তাদেরকে তাঁর নিকট সোর্পদ করলেন। হযরত যুলকিফল আ. তাদের সকলকে তাঁর শহরে নিয়ে গেলেন রাতারাতি এবং শিকল মুক্ত করে তাদেরকে রাতের বেলায় পরিতৃপ্ত সহকারে পানাহার করিয়ে তিনি আযাদ করে দিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বাদশাহ'র আক্রোশ থেকে মুক্ত রেখেছেন। এরপর থেকে ইহুদীদের মধ্যে তাঁর উপাধি হল যুলকিফল।[৪০১]

৪. তিনি গরীব, ইয়াতীম ও বিধবাদের প্রতি সাহায্য করতেন। তাদের প্রয়োজনাদির যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। অসহায়দের লালন-পালন করতেন বলে তাঁর নাম হল যুলকিফল।[৪০২]

৫. হযরত মুজাহিদ র. বলেছেন, নবী আল ইয়াসা যখন বয়োবৃদ্ধ হলেন, তখন নির্বাচন করতে চাইলেন তাঁর স্থলাভিষিক্তজনকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন জীবদ্দশায় প্রতিনিধিকে দায়িত্ব দিয়ে তিনি দেখবেন, তাঁর অনুসারীগণের সঙ্গে সে কেমন ব্যবহার করে। একথা ভেবে তিনি তাঁর অনুসারীগণকে একত্র

[৩৯৯]. ইমাম রাযী র. তাফসীরে কবীর, খণ্ড ১১, ২১২, সূত্র প্রাগুক্ত
[৪০০]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র. ১২২৫ হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড ৭, পৃ.
[৪০১]. তাযকারাতুল আম্বিয়া, কৃত, আমীর আলী, পৃ. ৪২৩, সূত্র জামে কাসাসুল আম্বিয়া উর্দু, পৃ. ৩৯৯
[৪০২]. তাযকারাতুল আম্বিয়া, কৃত আব্দুর রাজ্জাক, পৃ. ৩৩৪, সূত্র প্রাগুক্ত।

করলেন। বললেন, আমার তিনটি কথা পালনের অঙ্গীকার যে করবে, তার উপর আমি আমার কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে অবসর গ্রহণ করব। শর্ত তিনটি হল- ১. দিনে রোযা পালন করতে হবে ২. নিশি রাতে নামায আদায় করতে হবে এবং ৩. বিচার শালিশে ঠাণ্ডা মাথায় রাগবিহীনভাবে মীমাংসা করবে।

এ কথা শুনে এক ক্ষীণকায় ব্যক্তি উঠে বলল, এ বিষয়ে আমি অঙ্গীকার করতে আগ্রহী। কিন্তু হযরত ইয়াসা আ. তাকে পছন্দ করলেন না। কিছুদিন পর তিনি এক জনসমাবেশে পুণরায় তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। সেদিনও ওই ক্ষীণকায় যুবকটি উঠে বললেন, আমি প্রস্তুত। হযরত আল ইয়াসা আ. এবার তার কথা গ্রহণ করলেন। তাকে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। ইবলীস তা দেখে সহ্য করতে পারল না। সে সাঙ্গ-পাঙ্গদের ডেকে বলল, তোমরা এমন কোন পন্থা খুঁজে বের কর, যেন প্রতিনিধি তার কৃত ওয়াদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে না পারে। অতঃপর শয়তানেরা অনেক চেষ্টা করেও সক্ষম হয়নি তাকে তার ওয়াদা থেকে বিরত রাখতে। এখন ইবলীস বলল, এ কাজের দায়িত্ব আমি নিজেই নেবো।

প্রতিনিধির দস্তুর ছিল যে, তিনি কেবল দুপুরে সামান্য কায়লুলা করতেন। সারা রাত বিনিদ্রাযাপন করে নামায পড়তেন আর দিনের বেলায় বিচারকার্য সমাধা করতেন।

একদিনের ঘটনা। দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম গ্রহণের জন্য সবেমাত্র তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছেন। সাথে সাথে দরজায় কে যেন করাঘাত করল। মানুষের বেশধারী ওই আগন্তুক ছিল ইবলিস। ভিতর থেকে প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করলেন কে? ইবলিস বলল, আমি এক মযলুম বৃদ্ধ। প্রতিনিধি দরজা খুলে বাইরে এলেন। বৃদ্ধ বলল, আমার ও আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়েছে। এই বলে সে তার কাল্পনিক বিবাদ-বিসম্বাদের দীর্ঘ ফিরিস্তি দিতে শুরু করল। ফলে অতিক্রান্ত হল তাঁর বিশ্রামের সময়। প্রতিনিধি বললেন, তোমার কথা শুনতে শুনতে তো অনেক সময় অতিক্রান্ত হল। ঠিক আছে কাল সন্ধ্যায় এসো, তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করব। বৃদ্ধ চলে গেল। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় সে আর এল না। প্রতিনিধি এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করে তাকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু সমাবেশের কোথাও তাকে দেখা গেল না। পরদিনও বিচারের জন্য এল না সে। এল দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামের সময়। আগের মত বাইরে দরজায় খট খট আওয়ায তুলল। প্রতিনিধি দরজা খুলে বাইরে এলেন এবং বললেন, আমি যখন মজলিসে বসি তখন তুমি আসনা কেন? বৃদ্ধ বলল, লোকগুলো খুব খারাপ। আপনি এজলাসে বসলে তারা বলে, আমরা তোমার প্রাপ্য দিয়ে দেব। আর

আপনি যখন এজলাস ছেড়ে চলে আসেন তখন বলে, যাও আমরা তোমাকে কিছুই দেব না।

প্রতিনিধি বললেন, এখন যাও, আগামী দিন বিচারের সময় উপস্থিত হইও। এভাবে বৃদ্ধের সাথে কথাবার্তা বলতে বলতে সেদিনও বিশ্রামের সময় চলে গেল। প্রতিনিধি পরদিন বিচারালয়ে উপস্থিত হয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে বৃদ্ধটিকে খুঁজলেন। কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পেলেন না। উল্লেখ্য যে, ওই প্রতিনিধি সারারাত নামায পড়তেন আর সারাদিন রোযা রাখতেন। সামান্য সময়ের জন্য নিদ্রা যেতেন কেবল দুপুরের সময়। পরপর দু'দিন বিশ্রাম বিঘ্নিত হওয়ার কারণে সেদিন তিনি তাঁর এজলাসে বসেই তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। তাই তৃতীয় দিবসে তিনি তাঁর গৃহপরিচারককে নির্দেশ দিলেন, আমার চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। এখন আমার নিদ্রা ও বিশ্রামের সময়। এ সময় কাউকে তুমি আমার ঘরের কাছে আসতে দিও না। একথা বলে তিনি তাঁর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করলেন। তখন এল ওই বৃদ্ধ। কিন্তু পরিচারক তাকে কাছে যেতে দিল না। নিরুপায় হয়ে সে ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখল আলো-বাতাস আসার জন্য ঘরের দেয়ালে রয়েছে একটি ছিদ্রপথ। পরিচারকের অগোচরে গোপনে ওই ছিদ্রপথে সে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। দেখল, প্রতিনিধি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাঁকে জাগিয়ে তুলবার জন্য সে তখন দরজার ভিতর দিক থেকে করাঘাত করল। ঘুম ভেঙ্গে গেল প্রতিনিধির। তিনি তাঁর পরিচারককে জোরে ডেকে বললেন, তোমাকে কি বলিনি, এখানে কাউকে আসতে না দিতে? বাইরে থেকে পরিচারক উচ্চস্বরে বলল, এদিক থেকে তো কেউ প্রবেশ করেনি। দেখুন না, দরজা তো এখনো বন্ধ। প্রতিনিধি দেখলেন, সত্যই তাই। দরজা বন্ধ। অথচ ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই রহস্যময় বৃদ্ধ। সে বলল, বিচার প্রার্থীরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর আপনি ঘুমাবেন? প্রতিনিধি এবার তাকে চিনতে পেরে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুই তো ইবলিস। ইবলিস বলল, আপনি তো আমাকে পরাস্ত করলেন। আপনাকে ক্রোধান্বিত করবার জন্য আমি এত কিছু করলাম, কিন্তু আমার সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে গেল। সত্যিই আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যুলকিফল বা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। ওই যুবক প্রতিনিধি ছিলেন যুলকিফল আ.। তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করেছিলেন।[৪০৩]

যুলকিফল নবী ছিলেন না ওলী ছিলেন?

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. ও হযরত মুজাহিদ র.'র মতে যুলকিফল নবী ছিলেন না বরং একজন আবেদ ওলী ছিলেন। তবে হযরত হাসান র. সহ অধিকাংশ ওলামাগণের মতে তিনি নবী ছিলেন। এটিই বিশুদ্ধ মত। কারণ পবিত্র

---

৪০৩. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫ হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড ৭, পৃ. ৬৩১-৬৩৩

কুরআনে দুই স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ হয়েছে। আর উভয় স্থানে নবীগণের সাথেই তাঁর নাম উল্লেখিত হয়েছে। এক. সূরা আম্বিয়া। যেমন- وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ . وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ . অর্থ: এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ করুন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সবরকারী। আমি তাঁদেরকে আমার রহমত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছিলাম। তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ।

দুই. সূরা ছোয়াদ। যেমন- وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ অর্থ: আর স্মরণ করুন ইসমাঈল, ইয়াসা ও যুলকিফলকে আর এদের প্রত্যেকই ছিলেন সৎ লোকের অন্তর্ভূক্ত।

উল্লেখ্য যে, সূরা আম্বিয়ায়ে যাঁদের নাম উল্লেখ হয়েছে, তাঁরা সকলেই নবী। কারণ এ সূরার নামই সূরা আম্বিয়া।[৪০৪]

কেউ বলেছেন, যুলকিফল দ্বারা উদ্দেশ্য হল হযরত ইলিয়াছ আ.। কেউ বলেছেন, হযরত ইউশা ইবনে নূন আবার কেউ বলেছেন, হযরত যাকারিয়া আ. উদ্দেশ্য।[৪০৫] কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁর ব্যাপারে বলেছেন- وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

নবুয়ত লাভ ও সময়কাল:

তিনি ত্রিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং তিনি 'নহরে খারবুর' নামক এলাকাকে নিজের দ্বীন প্রচারের কেন্দ্র বানিয়েছেন। তাঁর সময়কাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯৪ বলে ধারণা করা হয়ে থাকে।[৪০৬]

মৃত্যু: আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলূসী র. বলেন, হযরত যুলকিফল আ. সিরিয়ায় জীবন-যাপন করেন এবং পচাত্তর বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সন্তান আবদানকে অসিয়ত করেন।[৪০৭]

একটি সন্দেহের অপনোদন:

ইমাম আহমদ র. হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ'র একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, 'কিফল' নামক এক ব্যক্তি এক গরীব সুন্দরী মহিলাকে অর্থের বিনিময়ে যিনা করার ইচ্ছে করল। মহিলার খোদাভীতি দেখে কিফল ভীত হয়ে পাপ কাজ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করল। তবে

---

[৪০৪]. ইমাম রাযী র. তাফসীরে কবীর, খণ্ড ১১, পৃ. ২১২, সূত্র জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৪০০
[৪০৫]. জামে কাসাসুল আম্বিয়া, কৃত আল্লামা যুলফিকার আলী সাকী, উর্দু, পৃ. ৪০০
[৪০৬]. তাযকারাতুল আম্বিয়া, কৃত, আমীর আলী, পৃ. ৪৯১
[৪০৭]. তাফসীরে রুহুল মায়ানী, খণ্ড ২৩-২৪, পৃ. ২১১, সূত্র জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৪০১

এই ঘটনার সাথে জড়িত 'কিফল' নবী হযরত যুলকিফল নন বরং অন্য কোন 'কিফল' নামক ব্যক্তি। কারণ হাদিসে বর্ণিত ব্যক্তির নাম 'কিফল' আর কুরআনে বর্ণিত নবীর নাম হল যুলকিফল।[৪০৮]

১৬. হযরত ইউনুস আ.

হযরত ইউনুস আ. আল্লাহর একজন মনোনীত নবী ছিলেন। পবিত্র কুরআনে ছয়টি সূরায় তাঁর আলোচনা এসেছে। সূরা নিসা, আয়াত ১৬৩, সূরা আনআম, আয়াত: ৮৭, ৩. সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৮, ৪. সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৭-৮৮, ৫. সূরা সাফফাত আয়াত: ১৩৯-১৪৮ এবং ৬. সূরা কলম, আয়াত ৪৮-৫০। তন্মধ্যে প্রথম চারটি সূরায় নাম উল্লেখ্য হয়েছে আর শেষ দু'টি সূরায় 'যুন্নুন' এবং 'সাহেবিল হূত' গুণবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। উভয়টির অর্থ হল মাছওয়ালা। যেহেতু তিনি মাছের পেটে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছিলেন বলে তাকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সূরা নিসা ও সূরা আনআমে আম্বিয়ায়ে কিরামগণের তালিকায় কেবল তাঁর নাম উল্লেখ আছে। কোন ঘটনা বলা হয়নি। বাকী সূরা সমূহে তাঁর জীবনে সংঘটিত ঘটনা সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত হয়েছে।

নাম ও বংশ :

নাম: ইউনুস, পিতার নাম: মাত্তা। তিনি বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ইস্রাঈলী পয়গম্বর ছিলেন। ইমাম বুখারী র., বুখারী শরীফে 'কিতাবুল আম্বীয়া' এ আম্বিয়া আ.'র বর্ণনায় তাঁর গবেষণা মতে হযরত ইউনুস আ. কে হযরত মুসা আ., হযতর শোয়াইব আ.'র পরে এবং হযরত দাউদ আ.'র পূর্বে উল্লেখ করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে হযরত ইউনুস আ. হযরত হুদ আ.'র বংশধর ছিলেন। তিনি আটাশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ আর নিশ্চয়ই ইউনুস প্রেরিত নবীদের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ আর আমি তাঁকে (ইউনুস আ.) এক লক্ষ অথবা আরো বেশী লোকের জন্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছি।[৪০৯]

কারো মতে তিনি মাছের ঘটনার পরে রাসূল হন। তবে পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতদ্বয় মতে এবং অনেক রেওয়ায়েত মতে তিনি মাছের ঘটনার পূর্বেই রাসূল পদে অভিষিক্ত ছিলেন। মাছের ঘটনা পরে সংঘটিত হয়েছে।

---

[৪০৮]. কাসাসুল আম্বিয়া, কৃত, ইবনে কাসীর, পৃ. ৪৮৯, সূত্র: প্রাগুক্ত
[৪০৯]. সূরা সাফফাত; আয়াত; ১৩৯ ও ১৪৭

উপরে বর্ণিত ১৪৭ নং আয়াতে হযতর ইউনুস আ. কে যে এলাকা বা যে জনপদে প্রেরণ করা হয়েছিল আল্লাহ তায়ালা তার সংখ্যা এক লক্ষ কিংবা ততোধিক বলেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল আকেল ও বালেগ সকলকে হিসাবে আনলে তখন এক লক্ষ হয়। আর ছোট-বড়, বালেগ-নাবালেগ সবাইকে হিসাব আনলে তখন এক লক্ষের বেশী হয়। অথবা আল্লাহ তায়ালা কথাটি একজন মানুষের দৃষ্টিকোণে এরূপ বলেছেন।

তাছাড়া মানুষের সংখ্যা গণনা অনুমানভিত্তিক করা হয়। নিখুঁত সংখ্যা সবসময় একরকম থাকে না। কারণ প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে মানুষ জন্মগ্রহণ করতেছে এবং মৃত্যুবরণ করতেছে। আর জন্ম-মৃত্যু যেহেতু সমান থাকে না সেহেতু এর নিখুঁত হিসাবও সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা এরূপ বলেছেন নতুবা আল্লাহর নিকট কোন প্রকারের সন্দেহ ও সংশয় নেই।

হযরত ইউনুস আ.'র ঘটনা:

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউনুস আ.কে মুসাল এলাকার নীনুয়া অঞ্চলের লোকদের হেদায়েতের জন্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেন। নীনুয়াবাসীরা ছিল মূর্তি পুজারী ও খোদাদ্রোহী। হযরত ইউনুস আ. দীর্ঘদিন যাবৎ তাদেরকে সৎপথে এনে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হেদায়েত তো দূরের কথা বরং তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে লাগল এবং শিরক ও কুফুরীর উপর অটল রইল। সর্বোপরি তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তিনি অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে আল্লাহর আযাব আসার সংবাদ দিলেন। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, এ পর্যন্ত হযরত ইউনুস আ. কখনো কোন ভুল ও মিথ্যা কথা বলেন নি। তাঁর এ সংবাদটিও মিথ্যা হবে না। দেখ, যদি তিনি রাতে এখানে অবস্থান করেন, তবে ভয়ের কোন কারণ নেই। পক্ষান্তরে যদি তিনি রাতে এখানে অবস্থান না করেন, তবে নিশ্চিতভাবে বুঝে নিতে হবে যে, আযাব অবশ্যই আসবে। রাতেই তিনি এলাকা ছেড়ে চলে গেলেন। সকাল হতেই আযাবের নমুনা প্রকাশিত হল। আকাশে কাল রঙের ভয়ানক ধরনের মেঘমালা এসে গেল এবং চর্তুদিকে প্রচুর পরিমাণ ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল। সমগ্র শহর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এই দৃশ্য দেখে তারা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, আযাব শ্রীঘ্রই আসন্ন। তারা হযরত ইউনুস আ.কে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। তারা তাঁকে না পেয়ে আরো ভীত হয়ে পড়ল। তারা দ্রুত শিরক ও কুফর থেকে তাওবা করল এবং জনপদের সব আবাল-বৃদ্ধবনিতা জঙ্গলের দিকে চলে গেল। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরও সঙ্গে নিয়ে গেল এবং বাচ্চাদেরকে তাদের থেকে আলাদা করে দিল। মোটা কাপড় পরিধান করে তাওবা করল এবং ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করল এবং কাকুতি-মিনতি

সহকারে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগল। মানুষ এবং জন্তুদের বাচ্চাদেরকে তাদের মা'দের কাছ থেকে পৃথক করে দেয়ার কারণে বাচ্চারা উচ্চস্বরে শোরগোল করতে থাকে। তারা বলতে লাগল হযরত ইউনুস আ. যা নিয়ে এসেছেন তাতে আমরা ঈমান এনেছি এবং সত্যিকারের তাওবা করছি। ইতিপূর্বে যেসব যুলুম-অত্যচার তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল সেগুলোর ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। অন্যের সম্পদ যা তারা ভোগ করেছিল তা ফেরৎ দিয়েছে। এমনকি একটি পাথর কিংবা ইটও যদি অন্যায়ভাবে কারো দেয়ালে স্থাপন করেছিল, সেই দেয়াল ভেঙ্গে ঐ পাথর বা ইট খুলে প্রকৃত মালিককে ফেরৎ দিয়েছিল। এভাবে ইসলামের সাথে ক্ষমার প্রার্থনা করলে আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে তাদের দোয়া কবুল করলেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিলেন।

এদিকে হযরত ইউনুস আ. ভেবেছিলেন যে, এতক্ষণ আযাব আসার ফলে তাঁর সম্প্রদায় সম্ভবত ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি বরং তাঁর সম্প্রদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিনযাপন করছে। তখন তিনি চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন যে, এখন আমাকে সম্প্রদায়ের লোকেরা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে। তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, যদি কোন বিষয়ে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এর ফলে হযরত ইউনুস আ.'র প্রাণনাশেরও আশংকা দেখা দিল। তাই তিনি নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফেরৎ আসার পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরতের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে একটি নদী পড়ল। তিনি একটি মালবাহী নৌকায় আরোহন করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা নদীর মাঝপথে গিয়ে আটকে গেল সম্মুখ দিকে যাচ্ছিল না। এমন কি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, সমুদ্রের বৃহৎ আকারের অসংখ্য মাছ এসে নৌকার গতি পথ আটকে রাখল আর নৌকায় আঘাত করতে লাগল। ফলে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। নৌকা থেকে অনেক খাদ্য বস্তুর বস্তা নদীতে নিক্ষেপ করা হল মাছের খাবার হিসেবে। কিন্তু কোন কাজ হল না। মাঝিরা বলল, হয়তো এই নৌকার আরোহীদের মধ্যে আল্লাহর অবাধ্য কোন গোলাম রয়েছে। তাকে নদীতে ফেলে না দেয়া পর্যন্ত নৌকা চলবে না। নতুবা সকলকে নদীতে ডুবে মরতে হবে। তখন ইউনুস আ. মনে মনে ভাবলেন, আমিই তো আল্লাহর অবাধ্য বান্দা। তাঁর নির্দেশের পূর্বেই অধৈর্য হয়ে আমি নিজের ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে হিজরতের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তখন তিনি নিজেই দাঁড়িয়ে বললেন, আমিই মুনিবের অবাধ্য গোলাম। আমাকে নদীতে নিক্ষেপ করুন। আরোহীরা বলল,

আপনি একজন সৎ ও বুযুর্গ ব্যক্তি, আপনাকে আমরা কিভাবে নদীতে ফেলতে পারি। এখন এই সমস্যা সমাধানের জন্য আরোহীদের মধ্যে লটারী করা হল। ঘটনাচক্রে লটারীতে হযরত ইউনুস আ.'র নাম উঠল। কিন্তু আরোহীরা তাঁকে নদীতে নিক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানাল। পুনরায় লটারী করা হল। এবারও তাঁর নাম উঠল। আরোহীরা এবারও তাঁকে নিক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লটারী করা হল। এবারও হযরত ইউনুস আ.'র নাম উঠল। তখন হযরত ইউনুস আ. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ তায়ালা সবুজ সাগরে এক মাছকে আদেশ দিলেন যে, সাগরের পানি চিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছে যায় এবং হযরত ইউনুস আ.কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ তায়ালা মাছকে আদেশ দেন যে, হযরত ইউনুস আ.'র অস্থি-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয়। সে তার খাদ্য নয় বরং তার উদর কয়েক দিনের জন্যে তাঁর কয়েদখানা।

হযরত ইউনুস আ. মাছের পেটে যখন নিজেকে জীবিত পেলেন তখন আল্লাহর দরবারে তিনি লজ্জিত হলেন। কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসার পূর্বেই নীনুয়া বাসীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি কওমকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনি তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন। একটি ছিল রাতের অন্ধকার, দ্বিতীয়টি হল মাছের পেটের অন্ধকার আর তৃতীয়টি হল সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকার। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার পর মাছটি সর্বদা মুখ খোলা রাখত। ফলে মাছের পেটে আলো বাতাস পৌঁছত যা হযরত ইউনুস আ.'র জন্য স্বস্তির কারণ ছিল।

মাছের পেটে হযরত ইউনুস আ. কতদিন ছিলেন তা নিয়ে ওলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান বলেছেন, তিন দিন ছিলেন। আতা বলেছেন, একদিন। দ্বাহহাক্ব র. বিশদিন বলেছেন। তবে সুদ্দী, কালবী এবং মুকাতিল ইবনে সুলাইমান বলেছেন, চল্লিশ দিন ছিলেন। ইমাম শা'বী র. বলেন, হযরত ইউনুস আ. কে মাছে সকালে গিলেছিল এবং সন্ধ্যায় বের করে দিয়েছিল।[৪১০]

মাছের পেট থেকে মুক্তিলাভ:

হযরত ইউনুস আ. আল্লাহর মর্জি মতে সর্বনিম্ন একদিন থেকে আরম্ভ করে মতান্তরে চল্লিশদিন যাবৎ মাছের পেটে অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ও তিনি আল্লাহর যিকর ও ইবাদতে নিজেকে মশগুল রেখেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা

[৪১০]. আল্লামা দুমাইরী র., (৮০৮ হিঃ) হায়াতে হায়ওয়ান, উর্দু, খণ্ড ২, পৃ. ২১৭

এরশাদ করেন- فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ . لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . ইউনুস আ. যদি আল্লাহর তাসবীহ পাঠ না করতেন, তবে তাঁকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হতো।[৪১১]

বর্ণিত আছে যে, মাছটি হযরত ইউনুস আ.কে নিয়ে সাত সমুদ্র ভ্রমণ করে সমুদ্রে আল্লাহর কুদরত পরিদর্শন করায়েছেন। চল্লিশ দিন পর তিনি নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে আল্লাহকে স্মরণ করেছেন- فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ . অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহবান করলেন, আপনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই, আপনি পুত-পবিত্র নিশ্চয় আমি সীমালংঘনকারী।

তিনি উপরোক্ত দোয়া পাঠ করে যখন নিজের অপরাধ স্বীকার করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ অতঃপর আমি তার আহবানে সাড়া দিলাম অর্থাৎ তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং তাঁকে দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম।[৪১২]

একদিকে মাছের পেটে অবস্থানরত সময়ের দোয়া অপর দিকে নীনুয়া অধিবাসীরা আল্লাহর গযব থেকে মুক্ত হয়ে হযরত ইউনুস আ.'র উপর ঈমান এনে তাঁকে খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে তাঁর সন্ধান লাভের জন্য তারা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তায়ালা মাছকে নির্দেশ দিলেন যেন কোন বৃক্ষহীন স্থানে হযরত ইউনুস আ.কে পেট থেকে বের করে দেয়। তখন মাছটি তাঁকে সমুদ্রের তীরে বৃক্ষহীন প্রান্তরে পেট থেকে বের করে দেয়। দীর্ঘদিন যাবৎ মাছের পেটে থাকার কারণে তিনি রুগ্ন ও দুর্বল হয়ে গেলেন। তাঁর শরীরে কোন লোমও অবশিষ্ট ছিল না। তিনি সদ্য নবজাতক পাখির ছানার ন্যায় লোমবিহীন হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা রোদ থেকে রক্ষা করার জন্যে কাণ্ডবিহীন বড় বড় পাতা বিশিষ্ট ও লতা বিশিষ্ট লাউগাছ উদগত করে দিয়েছিলেন। যাতে তিনি প্রচণ্ড রোদের প্রখরতা থেকে মুক্ত থাকে এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে জঙ্গলের একটি হরিণ কিংবা পালের একটি ছাগল এসে তাঁকে আল্লাহর হুকুমে দুধ পান করায়ে যেত। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পূর্ণ সুস্থ করে তুলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নির্দেশ দিলেন যেন তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে

[৪১১]. সূরা সাফফাত, আয়াত: ১৪৩-১৪৪

[৪১২]. সূরা আম্বীয়া, আয়াত : ৮৮

যান। কারণ তারা নিষ্ঠাবান ঈমানদার হয়ে তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইউনুস আ. তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হল এবং হযরত ইউনুস আ.'র অনুসারী হয়ে জীবন-যাপন করতে লাগল। একত্রিশ বছর যাবৎ তিনি তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন অতঃপর ইন্তেকাল করেন।

হযরত ইউনুস আ. সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে-

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ অর্থ: সুতরাং কোন জনপদ কেন এমন হল না যা ঈমান এনেছে অত:পর তার সে ঈমান গ্রহণ হয়েছে কল্যাণকর? অবশ্য ইউনূসের সম্প্রদায়ের কথা আলাদা! তারা যখন ঈমান আনে, তখন আমি তুলে নেই তাদের উপর থেকে অপমানজনক আযাব–পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে কল্যাণ পৌছাই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।[৪১৩]

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ . অর্থ: এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন, তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অত:পর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না। অত:পর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন: তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গোনাহগার। অত:পর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।[৪১৪]

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ . إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ . فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ . فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ . فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ . لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ . وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ . وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ . فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ . অর্থ: আর ইউনূসও ছিলেন পয়গম্বরগণের একজন, যখন পালিয়ে তিনি বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। অত:পর লটারী করালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। অত:পর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল, তখন তিনি অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। যদি তিনি আল্লাহর তসবীহ

[৪১৩]. সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৮

[৪১৪]. সূরা আম্বীয়া, আয়াত: ৮৭-৮৮

পাঠ না করতেন, তবে তাঁকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। অত:পর আমি তাঁকে এক বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন তিনি ছিলেন রুগ্ন। আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদগত করলাম। এবং তাঁকে, লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম। তারা বিশ্বাস স্থাপন করল অত:পর আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।[৪১৫]

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ . لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ . فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ . অর্থ: আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালা ইউনূসের মত হবেন না, যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল। যদি তাঁর পালনকর্তার অনুগ্রহ তাঁকে সামাল না দিত, তবে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হত। অত:পর তার পালনকর্তা তাঁকে মনোনীত করলেন এবং তাঁকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভূক্ত করে নিলেন।[৪১৬]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হযরত ইউনুস আ. কোন গুনাহ করার কারণে মাছের পেটে থাকতে হয়েছে-এরূপ মনে করা মারাত্মক অপরাধ। কারণ সকল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সর্বপ্রকার পাপ থেকে মা'সুম হওয়ার বিষয়টি সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য দ্বারা সাব্যস্ত। এ বিষয়েও কারো দ্বিমত নেই যে, নবী রাসূলগণের কেউ রেসালাতের দায়িত্ব পালনে কোন রকম শৈথিল্য করেন নি।

কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত মূলনীতি এবং নবীগণের নিষ্পাপত্ব সম্পর্কে সর্বসম্মত বিশ্বাসের পরিপন্থী বাহ্যিক কোন কথা যদি কুরআন হাদিসেও কোনখানে পাওয়া যায়, তবে সেক্ষেত্রে সর্বসম্মত মূলনীতির ভিত্তিতে এর এমন ব্যাখ্যা ও অর্থ অনুসন্ধান করা কর্তব্য, যাতে তা কুরআন-হাদিসের অকাট্য প্রামাণ্য মূলনীতির বিরোধী না হয়। সুতরাং ইউনুস আ. নবুয়তের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যতা প্রদর্শন করেছেন এরূপ কথা মোটেই বলা যাবে না, যা পাপিষ্ঠ মাওলানা মওদুদী তাফহীমুল কুরআনের ২য় খণ্ডে ৩১২ পৃষ্ঠায় বলেছে। সে বলেছে, 'কুরআনের ইঙ্গিত এবং ইউনুস আ.'র গ্রন্থের বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি পরিস্কার জানা যায় যে, ইউনুস আ.'র দ্বারা রেসালাতের দায়িত্ব পালনে যৎসামান্য ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল এবং হয়তো তিনি অধৈর্য হয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের অবস্থান ছেড়ে দিয়েছিলেন।' (নাউযুবিল্লাহ)

[৪১৫]. সূরা সাফফাত; আয়াত; ১৩৯-১৪৮

[৪১৬]. সূরা কলম; আয়াত; ৪৮-৫০

তাছাড়া নির্ভরযোগ্য কোন তাফসীরকারকগণ কোথাও এ ধরনের মন্তব্য পেশ করেন নি। কারণ খোদা প্রদত্ত রেসালতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করা নবীগণের জন্য মহাপাপ। অথচ নবীগণ সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত ও মাসুম। বরং সকল প্রামাণ্য গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস আ. যখন আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তিনদিন পর আল্লাহর আযাব আসার দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেন এবং ঐশী নির্দেশে নিজের অবস্থান ত্যাগ করে বাইরে চলে যান। কিন্তু পরে জানতে পারলেন যে আযাব আসেনি। তখন তাঁর মনে এ ভাবনা চেপে বসল যে, আমি সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে গেলে তারা আমাকে মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করবে। তাছাড়া এ সম্প্রদায়ের নিয়ম ছিল যে, কেউ মিথ্যুক প্রমাণিত হলে তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। সুতরাং এমতাবস্থায় অন্য দেশে হিযরত করা ছাড়া বিকল্প কোন পথই ছিল না তাঁর জন্য। তবে এতে খেলাফে আউলা তথা উত্তমের বিপরীত কাজ হয়েছে বটে। তা হল নবী-রাসূলগণ আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া নিজের ইচ্ছায় হিযরত করেন না। তিনি মহান আল্লাহর একজন নবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে কখন কোথায় হিযরত করবেন সেই নির্দেশ আসার পূর্বেই নিজের ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহন করেন। বিষয়টি কোন পাপ না হলেও নবী রাসূলগণের রীতির পরিপন্থী ছিল। এটাকে সর্বোচ্চ উত্তমের বিপরীত বলা যাবে। কোন অবস্থাতেই পাপ বলা যাবে না। বরং পাপ বলাটাই হবে মহাপাপ।

বর্ণিত আছে যে, ছয়জন নবীকে আল্লাহ তায়ালা কঠিন মুসিবতে লিপ্ত করেছেন। এতদসত্ত্বেও তাঁরা স্রষ্টার ইবাদত পরিত্যাগ করেন নি। আল্লাহ তায়ালা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের ফেরেশতা ও বনী আদমকে দেখালেন এবং সাবধান করেছেন যে, দেখ, কি মারাত্মক বালা-মুসিবতে পতিত হওয়া সত্ত্বেও আমার বান্দা আমাকে ভুলেনি বরং পূর্বের চেয়ে অধিক হারে আমাকে স্মরণ করেছে। তাই আমি তাদেরকে ওই মুসিবত থেকে মুক্তি দিয়েছি। তন্মধ্যে প্রথম নবী হলেন হযরত নূহ আ.। তিনি তাঁর উম্মতের কারণে জলোচ্ছ্বাস ও তুফানের মুসিবতে পতিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নাজাত দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় নবী হলেন হযরত ইব্রাহীম আ.। তাঁকে নমরুদে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আগুনকে শীতল করে দিয়ে তাঁকে সুরক্ষা করেছেন। তৃতীয় নবী হলেন হযরত ইউনুস আ.। তিনি দীর্ঘদিন সমুদ্র গর্ভে মাছের পেটে ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকেও মুক্তি দিলেন। চতুর্থ নবী হলেন হযরত ইউসুফ আ.। তিনিও অন্ধকূপে, দাসত্বে এবং জেলখানায় বন্দী ছিলেন। এসব বিপদকালে তিনি আল্লাহকে স্মরণ করেছিলেন বিধায় আল্লাহ তাঁকে নাজাত দান করেছেন। পঞ্চম নবী হলেন হযরত

আইয়্যুব আ.। তিনি দীর্ঘদিন এমন রোগে আক্রান্ত হলেন যাতে সমস্ত শরীরে পঁচন ধরেছিল এবং শরীরে কীট জন্মেছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি ইবাদতে ত্রুটি করেন নি। ফলে আল্লাহ তাঁকেও মুক্তি দিলেন এবং পূর্বের সব নিয়ামত ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি মৃত সন্তানদের পর্যন্ত আল্লাহ জীবিত করে দিলেন। ষষ্ঠ নবী হলেন আমাদের নবী মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ। তায়েফবাসীরা আঘাত করে সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিল। ওহুদ যুদ্ধে নিজের দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছিল এবং শোয়াবে আবি তালেবে নির্বাসিত হয়েছিলেন কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর আনুগত্য পরিত্যাগ করেন নি। কারো জন্য বদদোয়া করেন নি। বরং উম্মতের কল্যাণের জন্য সর্বদা স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করতেন। ফলে সমস্ত বিপদে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সফলতা দান করেছেন।[৪১৭]

হাদিস শরীফে হযরত ইউনুস আ.'র আলোচনা:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ .

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, কোন বান্দার জন্য এমন কথা বলা শোভনীয় নয় যে, নিশ্চয়ই আমি (মুহাম্মদ) ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে উত্তম। আর নবী করিম ﷺ তাঁকে তাঁর (ইউনুস আ.'র) পিতার দিকে সম্পর্কিত করেছেন।[৪১৮]

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ এই রাসূলগণ আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। আবার নবী করিম ﷺ বলেছেন, لَا تفضلوا بين الانبياء তোমরা নবীগণের মধ্যে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিও না।

আরো বলেছেন, لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى তোমাদের মধ্যে কেউ যেন না বলে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম।

তাছাড়া সূরা বাকারাহ এ মু'মিনের শান বর্ণনা করা হয়েছে, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ মু'মিনরা রাসূলগণের কারো মধ্যে পার্থক্য করো না।

[৪১৭]. মাওলানা গোলাম নবী, খোলাসাতুল আম্বিয়া, উর্দু পৃ: ১৫৮-১৬৪, মাওলানা হেফযুর রহমান, কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু খণ্ড ২, পৃ. ১৯৭-২০৭, আল্লামা নঈমউদ্দিন মোরাদাবাদী র., ১৩৬৭ হি. তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান, উর্দু, সূরা ইউনুস, আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী খণ্ড ১, পৃ. ২৪৫-২৫১

[৪১৮]. সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, পৃ. ৪৮৫, হাদিস নং ৩১৭৪, অনুরূপ হাদিস হযরত আব্দুল্লাহ রা., হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকেও বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হাদিস নং ১৩৭৩, ১৩৭৫ ও ১৩৭৬।

উপরোক্ত কুরআন ও হাদিসে বাহ্যত দ্বন্দ্ব মনে হচ্ছে। মূলত কোন দ্বন্দ্ব নেই। কুরআনের تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এক নবীকে অন্য নবীর উপর মর্যাদা দান করেছেন, মূলগতভাবে না। অর্থাৎ নবী-রাসূল হিসাবে সবাই সমান। এর মধ্যে কোন তারতম্য বা পার্থক্য নেই। لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ আয়াত দ্বারা এটিই বুঝানো হয়েছে।

হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী র. এ বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

قال العلماء فى نهيه ﷺ عن التفضيل بين الانبياء انها نهى عن ذالك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل او من يقوله بحيث يودى الى التنقيص المفضول او يؤدّى الى خصومة والتنازع او المراد لا تفضلوا بجميع انواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة فا لامام مثلًا اذا قلنا انه افضل من المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة الى الاذان وقيل النهى عن التفضيل انما هو فى حق النبوة نفسها كقوله تعلى لانفرق بين احدٍ من رسله ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض لقوله تعا' تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. অর্থ: নবী করিম ﷺ নবীগণের মাঝে কাউকে কারো উপর ফযিলত দিতে যে নিষেধাজ্ঞা করেছেন-উলামাগণ সে ব্যাপারে বলেন, এমন ফযিলত নিষেধ যা নিজের মত দ্বারা দেয়া হয়। ঐ ফযিলত প্রদান করা নিষেধ নয় যা শরীয়তের দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। অথবা, ঐ ধরনের ফযিলত প্রদান করা নিষেধ যার উপর ফযিলত দেয়া হচ্ছে তাঁর শান নষ্ট করে অন্যকে ফযিলত দেয়া। কিংবা প্রতিপক্ষের সাথে ঝগড়া-বিবাদের সময় যে ফযিলত দেয়া হয় তা নিষেধ। কারণ এ সময় বির্তকের কারণে রাগের বশে নিজের পক্ষের নবীকে ফযিলত দিতে গিয়ে অন্য নবীর মানহানী করা হয়। অথবা কোন নবীর জন্য এমনভাবে সমস্ত ফযিলত ও গুণাবলী সাব্যস্ত করা যেন অন্য নবীর মধ্যে এগুলোর কিছুই নেই। এই ধরনের ফযিলত দেয়া নিষেধ। তবে হ্যাঁ, উদাহরণস্বরূপ, এ ধরনের ফযিলত দেয়া বৈধ যেমন-কেউ যদি বলে মুয়াযিযনের উপর ইমামের ফযিলত বেশী। এতে মুয়াযিযনের মানহানী হবে না।

উপরোক্ত বিষয়ের সমাধানকল্পে একটি দুর্বল বক্তব্যও আছে। আর তাহল তোমরা মূল নবুয়তের বেলায় কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিও না। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ। তবে কোন কোন নবী

রাসূলকে অন্যের উপর সত্ত্বাগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে প্রাধান্য দেয়া নিষেধ নয়। আল্লাহ তায়ালা تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

وقال الحليمى الاخبار الواردة فى النهى عن التخيير انما هى فى مجادلة اهل الكتاب وتفضيل بعض الانبياء على بعض بالمخايرة لان المخايرة اذا وقعت بين اهل دينين لا يؤمن ان يخرج احدهما الى الازدراء بالاخر فيفضى الى الكفر فاما اذا كان التخيير مستندًا الى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل فى النهى. হালিমী বলেন, যেসব হাদিসে নবীগণের মধ্যে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা ঐসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন আহলে কিতাবীদের সাথে আম্বিয়াগণের ব্যাপারে ঝগড়া কিংবা বির্তক হয়। কেননা, এক্ষেত্রে যখন দুই ধর্মের লোকের মধ্যে বির্তক সৃষ্টি হয়ে যায় তখন মুখ থেকে এমন কথা বেরিয়ে যায় যা অন্য নবীর শানে আঘাত হানে। ফলে একজন নবীর মানহানী করার কারণে সে কাফির হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি উদ্দেশ্য এটি হয় যে, এই ফযিলত দ্বারা কোন নবীর হাকীকী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তবে তা নিষিদ্ধ নয়।[৪১৯]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর অসংখ্য নবী-রাসূলগণের মধ্যে মাত্র কয়েকজন বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত পয়গাম্বরগণকে اولو العزم বলা হয়। এঁদের সংখ্যা পাঁচ। এক. হযরত নূহ আ. দুই. হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ আ. তিন. হযরত মুসা কলিমুল্লাহ আ., চার. হযরত ঈসা রুহুল্লাহ আ. ও পাঁচ. হযরত মুহাম্মদ ﷺ।[৪২০]

হযরত ইউনুস আ.'র কাহিনীটি তাফসীরে মাযহারীতে ভিন্নরূপে বর্ণিত হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকের জ্ঞাতার্থে তা নিম্নে বর্ণিত হল।

আওফীর বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও জুহাক বলেছেন, হযরত ইউনুস আ. তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবাস করতেন ফিলিস্তিনে। সেখানে বসবাস করত তাদের বারটি গোত্র। একবার এক অত্যাচারী রাজা তাদের জনপদের উপরে চড়াও হল। বন্দী করে নিয়ে গেল তাদের সাড়ে নয়টি গোত্রকে। অবশিষ্ট রইল, আড়াইটি গোত্র। আল্লাহ তখন নবী শা'ইয়ার কাছে প্রত্যাদেশ

---

[৪১৯]. আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী র., ৮৫২হি., ফতহুল বারী, খণ্ড ৬, ৩৪৬, সূত্র কাসাসুল কুরআন, খণ্ড ২, পৃ. ২২৩

[৪২০]. আল্লামা দুগাইরী র., ৮০৮ হি., হায়াতে হাইওয়ান, উর্দু, খণ্ড ১, পৃ. ১৯৯

করলেন, তুমি সম্রাট হারকিয়ার কাছে যাও এবং বল, সে যেন তার রাজ্যের কোন একজন শক্তিশালী নবীকে ওই অত্যাচারী রাজার কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর ওই নবী যেন বলেন, বনী ইস্রাঈলদেরকে মুক্ত করে দাও। ওই রাজার অন্তরে আমি বন্দী মুক্তির ধারণা সৃষ্টি করে দেব। প্রত্যাদেশানুসারে হযরত শা'ইয়া সম্রাটের দরবারে গিয়ে আল্লাহর নির্দেশ জানালেন। তখন সেই সম্রাটের রাজ্যে পাঁচজন নবী ছিলেন। আল্লাহর নির্দেশ শুনে সম্রাট হযরত শা'ইয়াকে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি বলেন? কাকে পাঠাব? হযরত শা'ইয়া বললেন, নবী ইউনুস আ.কে পাঠালেই ভাল হয়। তিনি শক্তিশালী ও আমানতদার। সম্রাট হযরত ইউনুস আ.কে দরবারে ডেকে আনলেন এবং ফিলিস্তিন গমণের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। হযরত ইউনুস আ. বললেন, আল্লাহ কি আমাকেই নির্দিষ্ট করে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন? সম্রাট বললেন, না। হযরত ইউনুস আ. বললেন, তাহলে আমার দাবী হচ্ছে অন্য কোন শক্তিমান পয়গাম্বরকে প্রেরণ করা হোক। কিন্তু দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ হযরত ইউনুস আ.'র কথা মানল না। সকলে মিলে তাঁকেই পীড়াপীড়ি করতে লাগল ফিলিস্তান গমনের জন্য। হযরত ইউনুস আ. তখন সম্রাট ও পরিষদবর্গের উপরে রাগান্বিত হয়ে অন্য এক অঞ্চলের দিকে যাত্রা করলেন। চলতে চলতে উপস্থিত হলেন এক সমুদ্রের কিনারায়। দেখলেন, যাত্রীবাহী এক নৌকা যাত্রীর জন্য অপেক্ষমান। তিনি ওই নৌকায় উঠে বসলেন।

হাসান বলেছেন, আল্লাহ হযরত ইউনুস আ.কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মানুষকে সত্য ধর্মে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানাও এবং বল, এই আমন্ত্রণ গ্রহণ না করলে আল্লাহর শাস্তি অনিবার্য। হযরত ইউনুস আ. বললেন, হে আমার প্রভুপালক! যখন তোমার শাস্তি নেমে আসবে, তখন আমাকে যথাপ্রস্তুত গ্রহণের মাধ্যমে প্রস্থানের সুযোগ দিও। আল্লাহ বললেন, বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রস্থান করতে হবে খুব দ্রুত। হযরত ইউনুস আ. নিবেদন করলেন, আমার যেন অন্তত: জুতা পরিধানের অবকাশ থাকে। কিন্তু এ অনুমতি তাঁকে দেয়া হল না, তাই তিনি হলেন অভিমানাহত। একসময় আল্লাহর শাস্তির নির্দশন প্রকাশ পেতে শুরু করলে অভিমানাহত নবী অতি দ্রুত প্রস্থান করলেন সেখান থেকে।

ওহাব বলেছেন, হযরত ইউনুস আ. ছিলেন পূণ্যবান। তাঁর উপরে যখন নবুয়তের ভার অর্পণ করা হল, তখন তিনি ভয়ে ও আনন্দে হয়ে পড়লেন অভিভূত। এত বড় বোঝা স্কন্ধে নিয়ে তিনি সুস্থিত হতে পারলেন না। তাই আল্লাহ তাঁর প্রতি আর উলুল আযম পয়গাম্বরের দায়িত্ব প্রদান করলেন না। সে কারণেই আল্লাহ রাসুল ﷺ'কে সম্বোধন করে বলেছেন, আপনি উলুল আযম পয়গাম্বরের মত ধৈর্য অবলম্বন করুন। মৎস্যওয়ালার মত হবেন না।

হাসান বলেছেন, আমি এ বিষয়ে যা জেনেছি তা হচ্ছে, হযরত ইউনুস আ. যখন অভিমানাহত হয়ে অন্যত্র যাত্রা করলেন, তখন শয়তান আল্লাহ এবং তাঁর মাঝে অনড় ব্যবধান রচনা করার উদ্যোগ গ্রহন করল। কিন্তু হযরত ইউনুস আ. ছিলেন প্রকৃত অর্থে পূণ্যবান ও উপাসনাপ্রিয়। তাই আল্লাহ তাঁকে শয়তানের পরিকল্পনার আওতা থেকে মুক্ত করে প্রবেশ করালেন মাছের উদরে। এভাবে দীর্ঘ চল্লিশদিন ধরে হযরত ইউনুস আ. মৎস্য উদরে সময়াতিপাত করতে বাধ্য হলেন। আতা বলেছেন, তিনি মাছের পেটে ছিলেন সাতদিন। কেউ কেউ বলেছেন, তিন দিন। এরকমও বলা হয়েছে যে, মাছ তাঁকে উদরে ধারণ করে নিয়ে গিয়েছিল ছয় হাজার বছরের দূরত্বে। অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে মাছটি তাঁকে নিয়ে নিমজ্জিত হয়েছিল পৃথিবীর সপ্তম স্তরের তলদেশ পর্যন্ত। ওই অবস্থায় তিনি আল্লাহ সকাশে উপস্থিত করেছিলেন অনুতাপ জর্জরিত গভীর, গভীরতর প্রার্থনা।

সুপরিণত সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে ইমাম বগভী র. বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ ওই মৎস্যকে তখন নির্দেশ দিলেন, ইউনুসকে গলধঃকরণ কর। কিন্তু সাবধান! তার গাত্রচর্ম ও অস্থিতে যেন কোন আঁচড় কিংবা আঘাত না লাগে। বলাবাহুল্য, মৎস্য তাই করল। উদরে আল্লাহর নবীকে নিয়ে চলে গেল অনেক গভীরে। রহস্যময় অন্ধকারে বসে তিনি শুনতে পেলেন, চর্তুদিক থেকে ধ্বনিত হচ্ছে তাসবীহ পাঠের আওয়ায। বিস্মিত হলেন তিনি। দরিয়ার অচেনা তলদেশে এভাবে মুর্হুমুহ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে কারা? প্রত্যাদেশ হল, এ আওয়ায সমুদ্রবাসী প্রাণীদের। হযরত ইউনুস আ.ও তখন তাসবীহ পাঠ শুরু করলেন সকলের সঙ্গে। সেখানকার ফেরেশতারা নতুন কণ্ঠের উচ্চারণ শুনে বিস্মিত হল। বলল, হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা! আমরা তো পৃথিবীবাসীর মত ক্ষীণকণ্ঠে তাসবীহ পাঠ শুনেছি সাগরের অতলে। এক বর্ণনায় এসেছে, ফেরেশতারা তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা চেনা কণ্ঠের আওয়ায শুনেছি অচেনা জায়গায়। আল্লাহ বললেন, এ হচ্ছে আমার ইউনুসের আওয়ায। সে আমার প্রতি প্রকাশ করেছিল তার ক্ষোভ-অভিমান। তাই আমি তাকে বন্দী করেছি মৎস্য উদরে। ফেরেশতারা বলল, এতো তোমার সেই প্রিয়ভাজন বান্দা, যার উসীলায় প্রতিদিন কিছু লোকের পূর্ণ্যকর্ম তোমার দরবারে উপনীত হত। আল্লাহ বললেন, তোমরা ঠিক বলেছ। তখন ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে হযরত ইউনুস আ.'র পক্ষে সুপারিশ করতে শুরু করল। মাছের প্রতি প্রত্যাদেশ হল, ইউনুসকে উগরে দাও। মৎস্য সমুদ্রোপকূলে উপনীত হয়ে উগরে দিল হযরত ইউনুস আ.কে।[৪২১]

[৪২১]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫ হি., তাফসীরে মাযহারী, বাংলা, খণ্ড ৭, পৃ. ৬৩৪-৬৩৮

উল্লেখ্য যে, হযরত ইউনুস আ. যে দোয়া-তাসবীহ্ বা দোয়াটি পাঠ করেছিলেন মাছের পেটে তা হল- لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ এটাকে তাঁর দিন নিসবত করে দোয়া ইউনুসও বলা হয়। পরবর্তী আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেছেন, وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ আমি যেভাবে হযরত ইউনুস আ.কে দুশ্চিন্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মু'মিনকেও করে থাকি, যদি তারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, নবী যুননূনের ওই সময়ের দোয়া ছিল, لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ এই দোয়া সহযোগে কেউ যদি তার প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে পেশ করে, তবে তার সে প্রার্থনা কবুল করা হয়।[৪২২]

ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে হাকেমের বর্ণনায় এসেছে এভাবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ওই দোয়াটির কথা জানাবো যা পাঠ করলে আল্লাহ অবশ্যই দূর করে দেন ওই দোয়া পাঠকারীর মুসিবত? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর বাণীবাহক! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, সেই দোয়াটি হচ্ছে لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ।[৪২৩]

তাছাড়া তাসবীহ, এস্তেগফার ও দোয়া দ্বারা মানুষের বিপদাপদ দূর হয়। এর সমর্থনে কুরআন ও হাদীসের অনেক প্রমাণ রয়েছে। এর ভিত্তিতে বুর্যুগানে দ্বীনের চিরাচরিত রীতি এই যে, তাঁরা ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত বিপদাপদের সময় সোয়া লাখ তথা একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার দোয়া ইউনুস শরীফ পাঠ করে থাকেন। এর বরকতে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে বিপদ মুক্ত করে দেন। এটা বহু পরীক্ষিত ও প্রমাণিত সত্য। ওরফে এটাকে খতমে ইউনুস বলা হয়।

আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন, লাউগাছ জন্মানোর অনেক হেকমত রয়েছে।

১. লাউ গাছের পাতা অত্যন্ত নরম এবং আকারে বড় হওয়াতে ছায়াদার ছিল। হযরত ইউনুস আ.কে রোদের প্রচণ্ড তাপ থেকে ছায়া দিয়ে রক্ষা করত।

২. মশা-মাছি লাউ গাছের ধারে-কাছে আসে না। যেহেতু তিনি দীর্ঘদিন মাছের পেটে থাকার কারণে তাঁর শরীরের ত্বক নবজাতক পাখির শাবকের ন্যায়

[৪২২]. ইমাম আহমদ, তিরমিযি ও হাকেম, সূত্র, তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড ৭, পৃ. ৬৩৮
[৪২৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৯।

নরম ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাতে মশা-মাছি বসার সম্ভাবনা ছিল বেশী। তাই মশা-মাছির উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য লাউগাছ জন্মানো হয়েছিল।

৩.লাউয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খাওয়া যায়। কাঁচা ও রান্না উভয়ভাবে খাওয়া যায়। এর সিলকা ও দানাসহ খাওয়া যায়।

৪. মানুষের সুস্থতার জন্য বড় উপকারী লাউ। বুদ্ধি বৃদ্ধি সহ শরীরের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহের শক্তি যোগায়।[৪২৪]

ইমাম বগভী র. বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউনুস আ.কে দুধ পান করানোর জন্য একটি ছাগল সৃষ্টি করেছেন। ছাগলটি যমিন থেকে ঘাস খেত আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁকে দুধ পান করাত।[৪২৫]

সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাওয়া:

হযরত ইউনুস আ.কে ছায়াদানকারী লাউবৃক্ষ যখন শুকিয়ে গেল তখন তিনি তার জন্য আফসোস করতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, ইউনুস! একটি বৃক্ষ শুকিয়ে যাওয়াতে তুমি আফসোস করতেছ অথচ এক লক্ষের বেশী লোকের ধ্বংসের জন্য তোমার কোন আফসোস নেই। বরং ওদের ধ্বংসের জন্য দোয়া করেছ।

তখন তিনি লজ্জিত হলেন এবং সম্প্রদায়ের লোকের নিকট চলে যাওয়ার মনস্থ করলেন। তিনি এক গোলামের সাক্ষাত পেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? তোমার পরিচয় কি? সে বলল, আমি হযরত ইউনুস আ.'র সম্প্রদায়ের একজন। তিনি তাকে বললেন, তুমি যখন তোমার সম্প্রদায়ের লোকের নিকট যাবে তখন বলবে যে, আমার সাথে ইউনুস আ.'র সাক্ষাত হয়েছে। গোলাম বলল, আপনি অবগত আছেন যে, আমাদের এখানে নিয়ম হল যে, প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বললে তাকে হত্যা করা হয়। আমার কাছে যদি এরূপ কোন দলীল না থাকে তবে আমাকেও হত্যা করা হবে।

ইউনুস আ. বললেন, এই যমিনের টুকরা ও লাউবৃক্ষ তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। তখন ইউনুস আ. যমিন ও লাউ বৃক্ষকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যখন এই গোলাম সাক্ষ্য তলব করতে আসবে তখন তোমরা সাক্ষ্য দিও। তারা বলল, ঠিক আছে।

গোলাম তাদের সম্প্রদায়ের বাদশাহকে গিয়ে ইউনুস আ.'র সাক্ষাতের কথা বললে বাদশাহ তাকে হত্যা করার আদেশ জারি করে দিলেন। গোলাম বলল,

[৪২৪]. কাসাসুল আম্বিয়া, কৃত ইবনে কাসীর, পৃ. ৫১২, সূত্র. জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু পৃ. ১১৪
[৪২৫]. তাফসীরে রুহুল মায়ানী, খণ্ড ২৩-৩৪, পৃ. ১৪৬, সূত্র প্রাগুক্ত।

হুযুর! আমার কাছে এর পক্ষে দলীল রয়েছে। আপনি আমার সাথে আপনার লোক প্রেরণ করুন। বাদশাহ কিছু লোককে তার সাথে দিলেন। তারা ঐ যমিন ও লাউ বৃক্ষের নিকট আসলে উভয়েই গোলামের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। তারা গিয়ে বাদশাহকে সাক্ষ্যর কথা বললে বাদশা ঐ গোলামের হাত ধরে স্বীয় সিংহাসনে বসালেন এবং বললেন, তুমিই আমার এই বিশাল সিংহাসনের অধিক যোগ্য। এই যুবক গোলাম চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন।[৪২৬]

হযরত ইউনুস আ.'র উপর যখন পুনরায় নীনুয়া এ ফিরে যাওয়ার হুকুম হল তখন নীনুয়াবাসীকে হেদায়েত করার উদ্দেশ্যে তিনি সেদিকে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে নীনুয়ার সীমানায় একজন রাখালের সাক্ষাত পেলেন। তিনি তার থেকে দুধ চেয়েছেন। রাখাল বলল, যেদিন থেকে আমাদের প্রিয় নবী ইউনুস আ. অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেদিন থেকে আমাদের দেশে বিন্দুমাত্রও বৃষ্টি হয়নি। ফলে আমাদের ছাগলপালের দুধের স্তন শুকিয়ে গেছে। আমাদের বাদশাহ ঘোষণা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর সংবাদ দিবে তার হাতে রাজত্ব সোপর্দ করে তিনি নিজেই দায়িত্ব থেকে সরে যাবেন।

তখন তিনি ছাগলপালের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। সাথে সাথেই ছাগলের স্ত ন দুধে পূর্ণ হয়ে গেল। রাখাল বুঝে গেল যে ইনিই আমাদের নবী ইউনুস আ.। তখন সে দৌড়ে গিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট এ সংবাদ দিলে লোকেরা আনন্দে উল্লাসে এগিয়ে এসে তাঁকে নীনুয়া নিয়ে যায় অতি সম্মানের সাথে। অতঃপর সকল নীনুয়াবাসী সত্যের আহবানে সাড়া দিয়ে ঈমানদার হয়ে গেল।[৪২৭]

১৭. হযরত শোয়াইব আ.

নাম ও বংশ:

আল্লামা তাবারী র.'র মতে হযরত শোয়াইব আ.'র নাম ও বংশ পরম্পরা হল তাইরুন ইবনে সাইফুন ইবনে আইফা ইবনে সাবিত ইবনে মাদয়ান ইবনে ইব্রাহীম।[৪২৮]

কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর বংশপরম্পরা হল শোয়াইব ইবনে ইয়াশকুর ইবনে লাভী ইবনে ইয়াকুব আ.। কেউ কেউ বলেন, শোয়াইব ইবনে নওবত ইবনে আনাকা ইবনে মাদয়ান ইবনে ইব্রাহীম আ.।

তাঁর মা ছিলেন হযরত লূত আ.'র কন্যা। আবার কারো মতে, তাঁর দাদী ছিলেন লূত আ.'র কন্যা।

---

[৪২৬]. তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড ৫, পৃ. ৮১, সূত্র জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৪১৫
[৪২৭]. মু'জিযাতে আম্বিয়া, কৃত আমীর আলী, পৃ. ৪৫৫, সূত্র. প্রাগুক্ত
[৪২৮]. তারীখে তাবারী, খণ্ড ১, পৃ. ১৬৭

হযরত শোয়াইব আ. হযরত ইব্রাহীম আ.'র প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের একজন ছিলেন। তাঁর সাথে দামেস্কে হিযরত করেছেন।

ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেন, হযরত শোয়াইব আ. এবং মুলগাম ঐ দিনই হযরত ইব্রাহীম আ.'র প্রতি ঈমান এনেছিলেন, যেদিন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং উভয় যুবক তাঁর সাথে সিরিয়ায় হিযরত করেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম আ. হযরত শোয়াইব ও মুলাগমের সাথে হযরত লূত আ.'র দু'কন্যার সাথে বিবাহ করিয়ে দিয়েছিলেন। এই মতটি ইবনে কুতাইবার, এতে কিছুটা আপত্তি আছে।[৪২৯]

তাঁর মায়ের নাম হল মাইকা কিংবা কামঈল বিনতে লূত।[৪৩০]

তিনি আনাযাহ গোত্রের লোক ছিলেন। একদা হযরত সালমা ইবনে আনাযী রাসূলুল্লাহ ﷺ'র দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেকে আনাযা গোত্রের বলে পরিচয় দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, আনাযা খুবই উত্তম গোত্র। কারো সাথে অবিচার হলে তারাই তাকে সাহায্য করত। এই গোত্র হল হযরত শোয়াইব আ.'র গোত্র এবং হযরত মুসা আ.'র শ্বশুর বাড়ী।[৪৩১]

তাঁর উপাধি ছিল খতীবুল আম্বিয়া ও শায়খুল আম্বিয়া। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে অত্যন্ত উত্তম পন্থায় তাওহীদের প্রতি আহবান করতেন।[৪৩২]

তিনি সুমধুর বানী, সুন্দর সম্ভাষণ, বর্ণনা পদ্ধতি এবং বাকচাতুর্যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।

হযরত শোয়াইব আ.'র বয়স যখন বিশ বছরে উপনীত হল তখন তাঁকে মাদয়ান বাসীর প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের ধ্বংসের পর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে 'আইকা' বাসীদের নিকট প্রেরণ করেন। অধিকাংশ মুফাসসিরীনগণের মতে তিনি দুই জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। প্রথমে মাদয়ানবাসীর নিকট পরে আইকাবাসীর নিকট। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا আমি মাদয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইবকে প্রেরণ করেছি।[৪৩৩]

অন্যত্র বলা হয়েছে, كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ . إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ . إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ . আইকাবাসীরা তাদের নিকট প্রেরিত রাসূলদেরকে

---

[৪২৯]. ইবনে কাসীর র., ৭৭৫ হি. কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, পৃ. ৩৬৪, সূত্র জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৪১৮
[৪৩০]. তাফসীরল আযকীয়া, খণ্ড ৬, পৃ. ৪৫৬, সূত্র প্রাগুক্ত।
[৪৩১]. আল্লামা সুয়ূতীর দূরের মনসুর, খণ্ড ৩, পৃ. ১৯২, সূত্র: প্রাগুক্ত
[৪৩২]. ইবনে কাসীর র., কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৬৯, সূত্র: প্রাগুক্ত।
[৪৩৩]. সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৮৫

মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল যখন তাদেরকে শোয়াইব আ. বলেছিলেন তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রাসূল।[৪৩৪]

আইকা অথবা মাদয়ানবাসীর চরিত্র:

মাদয়ানবাসীরা ছিল কাফের সম্প্রদায়। পথে-ঘাটে ডাকাতি করাটা তাদের দৈনন্দিনের ব্যাপার ছিল। তারা সবর্দা পথিকদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখত। আইকার পূজা করত যা একটি বিরাট বৃক্ষ ছিল এবং যার চর্তুদিকে ছিল ঘনজঙ্গল। তারা লেনদেনে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক ছিল। ওজনে কম দেওয়া তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তারা নেওয়ার সময় বেশী নিত আর দেবার সময় কম দিত। তারা কখনো দাঁড়িপাল্লার কাটা সোজা হতে দিত না বরং কৌশলে ঝুঁকে রাখতো। সবর্দা দাঙ্গা ফাসাদে লিপ্ত থাকত।

তাদের ওজনে কম দেওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. অর্থ: অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না এবং ভূপৃষ্ঠের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এই হল তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।[৪৩৫]

وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ.

অর্থ: আর মাদয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন- হে আমার কওম! আল্লাহ্র বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া আমাদের কোন মাবুদ নাই। আর পরিমাপে ওজনে কম দিও না, আজ আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থায়ই দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের উপর এমন একদিনের আযাবের আশঙ্কা করছি যেদিনটি পরিবেষ্টনকারী। আর হে আমার জাতি! ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনরূপ ক্ষতি করো না, আর পৃথবীতে ফাসাদ করে বেড়াবে না। আল্লাহ্ প্রদত্ত উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা ঈমানদার হও, আর আমি তো তোমাদের উপর সদা পর্যবেক্ষণকারী নই।[৪৩৬]

[৪৩৪]. সূরা শোয়ারা, আয়াত: ১৭৬-১৭৮

[৪৩৫]. সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৮৫

[৪৩৬]. সূরা হুদ, আয়াত : ৮৪-৮৬

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত শোয়াইব আ.'র সম্প্রদায় অবাধ্য ও যালেম ছিল। রাস্তায় চুপটি মেরে বসে থাকত আর পথিকদের থেকে সব হাতিয়ে নিত। তাদের নিকট কোন নুতন লোক আগমন করলে তার থেকে উন্নত মানের দেরহাম নিয়ে বলত, "তোমার এই দেরহাম অচল" তারপর তার ভাল দেরহাম রেখে দিয়ে বিনিময়ে অচল দেরহাম দিয়ে বিদায় করত।[৪৩৭]

আল্লাহ তায়ালা আরো এরশাদ করেন,

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ. অর্থ: বনের অধিবাসীরা পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন শো'আইব তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। সোজা দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন কর। মানুষকে তাদের বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না। ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন।[৪৩৮]

তাদের দ্বিতীয় অপরাধ হল তারা রাস্তায় বসে পথিককে হযরত শোয়াইব আ.'র বিরুদ্ধে উচকিয়ে দিত। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, মাদয়ানের এক লোক তাদের জনপদের প্রধান সড়কের মাথায় বসে থাকত। হযরত শোয়াইব আ.'র নিকট গমনকারী লোকদেরকে বাধা দিত। সে বলত, ওদিকে যেয়েও না। শোয়াইব তো মিথ্যাবাদী। তোমাদেরকে ধর্মচ্যুত করতে চায়। লোকটি হযরত শোয়াইব আ.'র বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দকেও বিভিন্নভাবে ভয় দেখাত। হত্যার হুমকি দিত।[৪৩৯]

[৪৩৭]. রুহুল মায়ানী, খণ্ড ৭-৮, পৃ. ১৭৭, সূত্র : জামে কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪২৩

[৪৩৮]. সূরা শোআরা, আয়াত : ১৭৬-১৮৪

[৪৩৯]. তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড ৪, পৃ. ৫১৪-৫১৫

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ . وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ . অর্থ: তোমরা পথে ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে হুমকি দিবে, আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের। আর যদি তোমাদের একদল ঐ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং একদল বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে ছবর কর যে পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা না করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।[৪৪০]

সম্প্রদায়ের সর্দারদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান:

প্রায় সকল নবীগণের বেলায় দেখা যায় যে, প্রথমে সম্প্রদায়ের নেতারাই নবীগণের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। হযরত শোয়াইব আ.'র বেলায়ও অনুরূপ ঘটল। তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা বলল, হে শোয়াইব! তুমি এবং তোমার অনুসারীরা আমাদের ধর্মে ফিরে না আসলে আমরা তোমাদেরকে শহর থেকে বহিস্কার করে দেবো। তিনি বললেন, আমরা অপছন্দ করলেও কি বাধ্য করবে? এরূপ কখনো হতে পারে না। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ . قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا অর্থ: তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা বলল: হে শোয়ায়েব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে। শোয়ায়েব বলল: আমরা অপছন্দ করলেও কি? আমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, অথচ তিনি আমাদেরকে এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের

[৪৪০]. সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৮৬-৮৭

কাজ নয় এ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যদি চান। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ্র প্রতিই আমরা ভরসা করেছি।[৪৪১]

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ . قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ . অর্থ: তারা বলল– হে শোয়ায়েব! আপনার নামায কি আপনাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাস মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক। শোয়ায়েব আ. বললেন– হে দেশবাসী, তোমরা কি মনে কর। আমি যদি আমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীলের উপর কায়েম থাকি আর তিনি যদি নিজের তরফ হতে আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, (তবে কি আমি তাঁর হুকুম অমান্য করতে পারি?) আর আমি চাই না যে তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হব, আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহ্র মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই।[৪৪২]

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ . قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ . অর্থ: তারা বলল– হে শোয়ায়েব! আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি নাই, আমরা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দূর্বল ব্যক্তিরূপে মনে করি। আপনার ভাই-বন্ধুরা না থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি নন। শোয়ায়েব আ. বললেন– হে আমার জাতি! আমার ভাই-বন্ধুরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র চেয়ে প্রভাবশালী? আর তোমরা তাকে বিস্মৃত হয়ে পেছনে ফেলে রেখেছ, নিশ্চয় তোমাদের কার্যকলাপ আমার পালনকর্তার আয়ত্তে রয়েছে।[৪৪৩]

[৪৪১]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৮৮-৮৯
[৪৪২]. সূরা হুদ, আয়াত : ৮৭-৮৮
[৪৪৩]. সূরা হুদ, আয়াত: ৯১-৯২

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. অর্থ: তার সম্প্রদায়ের কাফের সর্দাররা বলল: যদি তোমরা শোয়ায়েবের অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।[৪৪৪]

কাফের কর্তৃক আযাব আসার দাবী:

হযরত শোয়াইব আ.কে তাঁর সম্প্রদায়ের অবাধ্য নেতা ও কাফেররা বলতে লাগল আপনি একজন যাদুকর, আমাদের ন্যায় একজন সাধারণ মানুষ, আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। যদি আপনি আপনার দাবীতে সত্যবাদী হন তবে আকাশ থেকে বিপদ নিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. অর্থ: তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্যতম। তুমি আমাদের মত মানুষ বৈ তো নও। আমাদের ধারণা–তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভূক্ত। অতএব, যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের কোন টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও।[৪৪৫]

তখন তিনি আল্লাহর দরবারে আযাব নাযিলের দোয়া করলেন এভাবে–

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী।[৪৪৬]

মাদয়ানবাসী কাফিরদের উপর আযাব:

হযরত শোয়াইব আ. যখন উপরোক্ত দোয়া করেছিলেন তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন এবং মাদয়ান ও আইকাবাসী কাফেরদেরকে বিভিন্ন প্রকারের আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেন। বিভিন্ন প্রকারের আযাব বলতে কুরআনে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা বিভিন্ন প্রকারের আযাবের প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন ভূমিকম্প, প্রচণ্ড শব্দ, ছায়াদান দিবসের আযাব।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন- হযরত শোয়াইব আ.'র সম্প্রদায়ের উপর প্রথমে এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেয়া হয়, যেন জাহান্নামের দরজা তাদের দিকে খুলে দেয়া হয়েছিল। ফলে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে। ছায়া এমন কি পানিতেও তাদের জন্যে শান্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ট

[৪৪৪]. সূরা আ'রাফ: আয়াত : ৯০
[৪৪৫]. সূরা শোআরা, আয়াত; ১৮৫-১৮৭
[৪৪৬]. সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৮৯

হয়ে ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে প্রবেশ করে দেখল, সেখানে আরো বেশী গরম। অতঃপর অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। সেখানে আল্লাহ তায়ালা একটি ঘন কাল মেঘ পাঠিয়ে দিলেন, যার নীচে শীতল বাতাস বইছিল। তারা সবাই গরমে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে মেঘের নীচে এসে ভীড় করল। তখন মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হল। এভাবে তাদের উপর ভূমিকম্প ও ছায়ার আযাব উভয়টিই নাযিল হয়েছিল।[৪৪৭]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. অর্থ: আর আমার হুকুম যখন এল, আমি শোয়ায়েব ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে রক্ষা করি আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন পতিত হলো। ফলে ভোর না হতেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করে নাই। জেনে রাখ, সামুদের প্রতি অভিসম্পাতের মত মাদয়ানবাসীর উপরেও অভিসম্পাত।[৪৪৮]

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ অর্থ: অনন্তর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে তারা সকাল বেলায় গৃহ মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।[৪৪৯]

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. অর্থ: অত:পর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে দিল। ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করল। নিশ্চয় সেটা ছিল এক মহাদিবসের আযাব।[৪৫০]

হযরত শোয়াইব আ.'র ইন্তেকাল ও কবর শরীফ:

হযরত শোয়াইব আ. প্রায় সাতান্ন বা আটান্ন বছর কাল স্বীয় সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেছিলেন। তাঁর সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার সাতবছর চার মাস পর তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল দুইশত বিশ বছর। এক বর্ণনা মতে, তাঁর বয়স হয়েছিল একশত চল্লিশ বছর এবং অপর এক বর্ণনা মতে দুইশত বছর।[৪৫১]

[৪৪৭]. তাফসীরে বাহরে মুহীত ও তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড ৪, পৃ. ৫২১
[৪৪৮]. সূরা হুদ, আয়াত, ৯৪-৯৫
[৪৪৯]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৯১
[৪৫০]. সূরা শুআরা, আয়াত; ১৮৯
[৪৫১]. ইবনে আসাকির, খণ্ড ২৩, পৃ. ৮৫, সূত্র, জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৪৩৬

হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত শোয়াইব আ. মক্কা মোকাররমায় ইন্তেকাল করেছিলেন। মক্কার পশ্চিম দিকে দারুন নাদওয়া ও বাবে বনি সাহমের মধ্যখানে তাঁর কবর শরীফ অবস্থিত।[৪৫২]

কারো মতে তাঁর কবর 'হাযারা মাউত' শহরে। এখানেই তিনি বসবাস করেন এবং ইন্তেকাল করেন।[৪৫৩]

বনী ইস্রাঈলের পরিচয়

ইস্রাঈল শব্দটি হিব্রু শব্দ। এর অর্থ আল্লাহর বান্দা। ইসরা অর্থ বান্দা আর ঈল অর্থ আল্লাহ। এটি হযরত ইয়াকুব আ.'র উপনাম। তাঁর বংশধরগণকে বনী ইস্রাঈল বলা হয়। তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম আ. বাবেল শহরের 'কাসদিউন' এলাকায় অবস্থান করতেন। সেখান থেকে ইব্রাহীম আ.'র পিতা তারেখ, ইব্রাহীম আ., দৌহিত্র লূত আ. এবং হযরত ইব্রাহীম আ.'র স্ত্রী সারাহকে নিয়ে দক্ষিণে অবস্থিত 'হারা' নামক স্থানে এসে বসবাস শুরু করেন। তারেখ সেখানেই ইন্তেকাল করেন। অত:পর ইব্রাহীম আ. সেখান থেকে স্ত্রী সারাহ এবং লূত'কে নিয়ে কেনআনে এসে 'জীতুন' এলাকায় 'খিবরু' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। হযরত ইব্রাহীম আ.'র দুই স্ত্রী ছিলেন। বড় স্ত্রী হলেন হযরত সারাহ আর ছোট স্ত্রীর নাম ছিল হাজেরা আ.। ইব্রাহীম আ.'র মোট আট জন সন্তান ছিল। হযরত সারাহ আ. থেকে এক সন্তান আর হযরত হাজেরা আ.'র সাত সন্তান যাদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল আ. ছিলেন সবার বড়। বাকী ছয়জন হলেন যামরান, ইয়াসকান, মারান, মাদ্দিয়ান, আসবাক, সুখ। এদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল আ. আরবে বসতি স্থাপন করেন এবং এর বংশ থেকেই মুহাম্মদ ﷺ তাশরীফ আনেন। তবে হযরত ইসহাক আ. কেনআনে বসবাস করেন। তিনি হযরত লূত আ.'র কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং একসাথে তার থেকে দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। একজনের নাম আয়দ অপর জনের নাম ইয়াকুব। ইসহাক আ. শেষ বয়সে তারা উভয়কে সাজ্জাদানশীন করেন আর ইয়াকুব আ.'র জন্য দোয়া করলেন যেন তার বংশ থেকে নবুয়ত চালু থাকে। আর আয়াদকে বললেন, তোমার বংশ থেকে বাদশাহী চালু থাকবে। তারপর হযরত ইয়াকুব আ.কে নিজের খলীফা নিয়োগ দিয়ে তিনি পরলোক গমন করেন। আয়দ বড় সম্পদশালী হয়েছিল কিন্তু ইয়াকুব আ. গরীব রয়ে গেলেন। তাঁর মাতা তাঁকে বললেন, তুমি এখানে থাকা সমুচিত নয় বরং তুমি তোমার মামা লাইয়্যানের নিকট চলে যাও। সে সম্পদশালী ব্যক্তি, তোমার লালন- পালন ভাল করে করবে।

[৪৫২]. তাফসীরুল আযকীয়া, খণ্ড ২, পৃ. ৪৫৯, সূত্র: প্রাগুক্ত

[৪৫৩]. মা'ওলানা হেফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, খণ্ড ১, পৃ. ৩০৬, সূত্র. প্রাগুক্ত

হয়তো সে তার কন্যাকে তোমার সাথে বিবাহও দিতে পারে। ইয়াকুব আ. মায়ের কথা মতে মামার ঘরে পৌঁছলে মামা খুবই খুশী হলেন এবং কিছুদিন পর স্বীয় কন্যাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এর থেকে চার সন্তান জন্ম হয়। রাদবীল, শমউন, লাওয়া ও ইয়াহুদা। এরপর ইয়াকুব আ.'র স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। লাইয়্যান তাঁর দ্বিতীয় কন্যাকে তাঁর নিকট বিবাহ দেন। এর থেকে দুই সন্তান জন্ম হয়। এরপর এই স্ত্রীও ইন্তেকাল করেন এবং লাইয়্যান তাঁর তৃতীয় কন্যাকেও ইয়াকুব আ. কে বিবাহ দেন। এর থেকে কয়েক জন সন্তান জন্ম লাভের পর তিনিও ইন্তেকাল করলে লাইয়্যানের চতুর্থ কন্যাও তাঁর বিবাহে আসেন যার নাম ছিল রাহীল। তার থেকেই হযরত ইউসুফ আ. এবং বিনইয়ামীন জন্মলাভ করেন। ইয়াকুব আ.'র বয়স যখন চল্লিশ বছর হয় তখন তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন আর কেনআনে গিয়ে দ্বীন প্রচারের হুকুম হল। লাইয়্যান স্বীয় জমাতার নবুয়ত প্রাপ্তিতে খুশী হয়ে ইয়াকুব আ., তাঁর স্ত্রী রাহিল এবং সন্তানদের সহ বিদায় দিলেন আর সঙ্গে পাঁচশত ছাগল, পাঁচশত গরু, পাঁচশত উট এবং পাঁচশত খচ্চর প্রস্তুত করে দেন। তাছাড়া অনেক গোলাম, জোড়া জোড়া পশু-পাখি সহ অনেক টাকা পয়সার ব্যবস্থা করেন দেন। তিনি যখন এই সব সরঞ্জাম নিয়ে কেনআনে পৌঁছেন তখন আয়দ্ব তাদেরকে স্বাগতম জানান এবং তাদের আগমনে উৎসব উদযাপন করেন। তিনি ইয়াকুব আ.'র নিকট আরয করলেন যেন তার বংশেও নবীর আগমন হয়। ইয়াকুব আ. বললেন, তোমার বংশধরের মধ্যে আইয়ুব আ. ও যুলকারনাইন আগমন করবে।

ইউসুফ আ.'র বয়স দু'বছর হলে তাঁর ছোট ভাই বিনইয়ামীন জন্ম লাভ করে আর তাঁর জন্মের সময়ই তাঁর মাতা রহিল ইন্তেকাল করেন। লাইয়্যান যখন এ মৃত্যু সংবাদ শুনলেন তখন সর্বকনিষ্ট কন্যাকেও ইয়াকুব আ.'র সাথে বিবাহ দেন। ইনি হযরত ইউসুফ আ. ও বিনইয়ামীনকে উত্তম ভাবে লালন পালন করেন। ইয়াকুব আ.'র মোট বারটি সন্তান ছিল। তারা হলেন ১. রাদবীল, ২. শমউন, ৩. লাদা, ৪. ইয়াহুদা, ৫. ইসকার, ৬. যাবলুন, ৭. ওয়ান, ৮. তা'তাল, ৯. জাদ্দ, ১০. আশর, ১১. ইউসুফ ও ১২. বিনইয়ামিন। এই বার সন্তানের বহু আওলাদ ছিল আর তাদের এই বার জনের নামে বারটি সম্প্রদায় (কাবীলা) প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এদের থেকে অনেক বড় বড় নবী-রাসূল আগমন করেছেন। যেমন- হযরত মুসা আ. হযরত দাউদ আ., হযরত সুলায়মান আ., হযরত ঈসা আ. প্রমুখ। এদের সম্প্রদায়কেই বনী ইস্রাঈল বলা হয়।[৪৫৪]

[৪৫৪]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১ হি., তফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড ১ পৃ. ৩১১

ফেরাউনের পরিচয়:

ফেরাউন নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নাম নয়। বরং তৎকালীন প্রতাপশালী বাদশাগণের উপাধি। আমালিকা সম্প্রদায়ের উপনাম ছিল ফেরাউন। হযরত মুসা আ.'র সময়ে যে ফেরাউন রাজত্ব করত তার নাম ছিল ওলীদ বিন মাসআব বিন রাইয়্যান। রাইয়্যান ছিল হযরত ইউসুফ আ.র যুগের ফেরাউন। মাসআব ও রাইয়্যানের রাজত্ব কালের ব্যবধান ছিল চারশত বছর।

ইব্রাহীম আ.'র পরে ইয়াকুব আ. পর্যন্ত তাদের আওলাদগণ কেনআনে বসবাস করেন। ইউসুফ আ. তাঁর ভাইদের ষড়যন্ত্রে শিকার হয়ে দৃশ্যগত গোলাম হয়ে মিসরে আসেন। এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কল্পনাতীত উন্নতি দান করেন। কেনআনে মারাত্মক দূর্ভিক্ষ দেখা দিলে ইয়াকুব আ. সকল সন্তানগণ নিয়ে মিসরে চলে আসেন। এদের বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে মিসরে লক্ষাধিক লোকের বসতি হল। ইউসুফ আ.'র যুগের ফেরাউন রাইয়্যান অনেক পূর্বেই মারা গিয়াছে এবং মিসরে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় আর আইন কানুনের অধঃপতন ঘটে।

মুসা আ.'র যুগের ফিরাউন মাসআব অত্যন্ত গরীব অথচ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিল। সে অনেক ঋণ গ্রহীতা হয়ে ইস্পাহান থেকে পালিয়ে সিরিয়া চলে গেল। কিন্তু সেখানে জীবন উপকরণের কোন ব্যবস্থা না পেয়ে জীবন ধারণের জন্য মিসরে চলে আসে। এখানে দেখল যে, মিসরের গ্রামে তরবুজ খুবই সস্তা দামে বিক্রি হয় কিন্তু শহরে তা ছিল চড়া মূল্য। মনে মনে ভাবল এটাই হবে লাভজনক ব্যবসা। অতএব সে গ্রাম থেকে তরবুজ কিনে চড়া মূল্যে বিক্রির উদ্দেশে শহরে রওয়ানা হয়। কিন্তু আইন-কানুন না থাকায় পথে পথে টেক্স দিতে দিতে বাজারে পৌঁছা পর্যন্ত মাত্র একটি তরবুজ বাকী রইল। শহরে কোন শাহী ব্যবস্থাপনা নেই বরং যে চায় সে হাকেম হয়ে ইচ্ছামত কাজ করে। এ সময় মিসরে কোন মারাত্মক মরণ ব্যাধি হয়েছিল। যার ফলে অসংখ্য লোক মারা যেতে লাগল। ওলীদ কবরস্থানে বসে গেল এবং নিজেকে বাদশাহী প্রতিনিধি দাবী করে ফরমান জারী করল যে, এই কবরস্থানে কোন মুর্দা দাফন করলে মুর্দা প্রতি পাঁচ দেরহাম টেক্স দিতে হবে। এভাবে সে অল্প সময়ে অনেক টাকার মালিক হয়ে গেল। ঘটনাক্রমে একদা একজন প্রভাবশালী লোককে দাফন করতে কবরস্থানে নিলে সে তার ওয়ারিশগণের নিকট টাকা দাবী করলে তারা তাকে গ্রেফতার করে বাদশার নিকট নিয়ে গেল এবং সব ঘটনা বাদশাকে অবিহিত করা হল। বাদশা তাকে জিজ্ঞাসা করল তুমি এ কাজ কেন করলে ? ওলীদ বলল আমি আপনি পর্যন্ত পৌঁছার জন্য বাহানা করেছি। কারণ আপনার রাজ্যে যে অনিয়ম ও আইন শৃংখলার অবনতি ঘটেছে তা আপনাকে বলা প্রয়োজন। আমি মাত্র তিন মাসে

অন্যায় ভাবে এত টাকা অর্জন করেছি। এখন আপনি অনুভব করতে পারেন অন্যান্য প্রভাবশালী লোকেরা কী করতে না পারেন ? সে তার সব টাকা বাদশার সম্মুখে পেশ করল আর বলল, যদি আপনি রাজ্যের শৃংখলা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেন তবে আমি শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবো। বাদশার কাছে তার কথা পছন্দ হল এবং তাকে পরীক্ষা মূলক ভাবে সাধারণ একটি দায়িত্ব দেয়া হল। সে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করল যাতে বাদশা ও জনগণ উভয়ই খুশী থাকে। ফলে ধীরে ধীরে তাকে সেনা প্রধানের দায়িত্ব অর্পণ করা হল এবং রাজ্যের আইন শৃংখলা উন্নতি হল। মিসরের বাদশা মৃত্যুবরণ করলে জনগণ ওলীদকে বাদশাহীর সিংহাসনে আসীন করেছিল। সে সিংহাসনে আসীন হওয়া মাত্র ঘোষণা করে দিল যেন সকলেই তাকে সিজদা করে। সর্বপ্রথম তার উযির হামান তাকে সিজদা করল। অতরপর অন্যান্যরা সিজদা করল এবং বিভিন্ন গোত্র নেতাদের মাধ্যমে সে নিজেকে সিজদা করাতো। দূরবর্তীদের জন্য নিজের নামে মূর্তি তৈরী করে এলাকায় এলাকায় পাঠিয়ে দিত, যেন লোকেরা সেই মূর্তিকে সিজদা করে। সকল মিসরবাসী তার পূজায় লিপ্ত হল, কেবল বনী ইস্রাঈল এর বিরোধিতা করল। ফেরাউন বনী ইস্রাঈল এর নেতাদের ডেকে অনেক হুমকি ধমকি দিয়ে চেষ্টা করল। কিন্তু তারা কিছুতেই সম্মতি হলোনা বরং তারা বলে দিল আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবো না। তোমার যা ইচ্ছে কর। ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে গরম ডেক্সিতে যায়তুন তেল এবং বারুদ দিয়ে প্রজ্বতিল করে অনেক বনী ইস্রাইলকে সেখানে নিক্ষেপ করে শহীদ করল। তবুও তারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়নি এবং ফেরাউনকে সিজদা করেনি। এভাবে বহু বনী ইস্রাঈলকে আগুনে শহীদ করার পর হামান পরামর্শ দিল যে, তাদেরকে এভাবে হত্যা না করে বরং পৃথিবীতে তাদেরকে অপদস্ত করে রাখা হোক। অত:পর হত্যা বন্ধ করে তাদের উপর বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন ও কঠোরতা আরম্ভ করেছিল। শ্রমিক হিসাবে প্রাসাদ তৈরীর কাজ, মালপত্র বহনের কাজ, চাষাবাদের কাজ করাতো এবং তাদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করত। মেয়েদের দিতো সুতো কাটার কাজ।

ঐ সময় সে একটি ভয়ানক স্বপ্ন দেখল যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের দিক থেকে একটি প্রজ্জলিত আগুন এসে সকল কিবতী ও ফেরাউনের অনুসারীদের ভস্মীভূত করে ফেলল কিন্তু ইস্রাঈলদের কোন ক্ষতি করল না। আরো দেখল যে, বনী ইস্রাঈলের এলাকা থেকে একটি বিরাট সর্প বের হয়ে ফেরাউনকে তার আসনের নিচে ফেলে দিল। সে স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতাদের ডেকে এর ব্যাখ্যা চাইলে তারা বলল, হে ফেরাউন! বনী ইস্রাঈল থেকে একজন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে,

যিনি আপনার বাদশাহী ধ্বংস করে দিবেন। সে তৎক্ষনাত শহরের কতোয়ালকে ডেকে আদেশ দিল যে, এক হাজার সশস্ত্র সৈন্য এবং এক হাজার ধাত্রী বনী ইস্রাঈলের মহল্লায় নিযুক্ত করে দাও। যার ঘরে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তাকে যেন হত্যা করা হয়। কয়েক বছরের মধ্যে বনী ইস্রাঈলের বার হাজার অপর বর্ণনা মতে সত্তর হাজার নবজাতক সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে আর নব্বই হাজার মহিলার গর্ভপাত ঘটানো হয়েছে। আল্লাহর কী শান! এ সময় বনী ইস্রাঈলের বৃদ্ধ লোকেরাও দ্রুত মৃত্যুবরণ করতে লাগল। তখন কিবতীরা ফেরাউনকে অনুরোধ করল বনী ইস্রাঈলের মধ্যে মৃত্যুহার বেড়ে গিয়েছে। অপরদিকে তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আমরা সেবক ও কর্মচারী কোথায় পাবো ? অত:পর ফেরাউন আদেশ দিল যে, এক বছর সন্তান হত্যা করা হবে আর এক বছর জীবিত রাখা হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় জীবিত রাখার বছরে হযরত মুসা আ.'র বড় ভাই হযরত হারুন আ. জন্মলাভ করেন আর হত্যার বছর হযরত মুসা আ. জন্মলাভ করেন।[৪৫৫]

বর্ণিত আছে যে, ফেরাউন যখন মিশরের বাদশাহীর পদে অধিষ্ঠিত হল তখন তার মন্ত্রীবর্গকে সহ সকল জনগণকে তাকে সিজদা করার আদেশ জারি করল। তার ছবি অঙ্কন করে রাজ্যের সর্বস্থানে পাঠিয়ে দিল যেন লোকেরা তার ছবিকে সিজদা করে। সে তার ছবিকে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী করে একটি তখতে স্থাপন করে এর এক কোণায় একটি বিশেষভাবে তৈরী পাখি এমনভাবে বসিয়ে রাখত যে, যখন ফেরাউনের লোকে গোপনে নাড়া দিত তখন তার ছবিগুলো থেকে এই আওয়ায বের হত- "আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় খোদা। হে মিসরীগণ! আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা আমাকে সিজদা কর।" এই শব্দ শুনা মাত্র গ্রামের লোকেরা তার ছবিকে সিজদা করত। কিন্তু বনী ইস্রাঈলের লোকেরা সিজদা করত না। এই সংবাদ শুনে ফেরাউন বনি ইস্রাঈলের সর্দারগণকে ডেকে বলল, তোমাদের লোকেরা আমাকে সিজদা করেনা। তোমরা যদি সিজদা না কর তবে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবো। এতদসত্ত্বেও তারা ফেরাউনকে সিজদা করল না। কিন্তু ফেরাউনের উযির হামান পরামর্শ দিল যে, তারা ধীরে ধীরে আপনার আনুগত্য মেনে নেবে ।

এ সময় নীল নদের পানি শুকিয়ে গেল। কিছু লোক ফেরাউনের নিকট গিয়ে বলল, যদি সত্যিই আপনি খোদা হয়ে থাকেন তাহলে নীল নদের পানি প্রবাহিত

[৪৫৫]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র. (১৩৯১ হি.) তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড ১ পৃ. ৩৪৮ সূত্র: তাফসীরে রুহুল বয়ান, তাফসীরে আযিযী, তাফসীরে মাযহারী ও খাযায়েনুল ইরফান

করে দিন। ফেরাউন তাদের কথা শুনে একাকী একটি পাহাড়ের গর্তে নেমে স্বীয় গলায় লোহাড় বেড়ি বেঁধে আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে এই প্রার্থনা করল- "হে বিশ্বের প্রতিপালক! আজ আপনি আমার মান-সম্মান রক্ষা করুন। আমি আপনার কাছে পরকালের জন্য কিছুই চাচ্ছি না। আমাকে যা কিছু দেওয়ার এই জগতেই দিয়ে দিন।" ফেরাউনের প্রার্থনা শেষ হতে না হতেই হযরত জিব্রাঈল আ. একজন বয়স্ক লোকের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে বললেন- আমি একজন ফরিয়াদি, ফরিয়াদ নিয়ে এসেছি। ফেরাউন বলল- এটা কি ফরিয়াদের সময়? ইত্যবসরে নীল নদের পানি প্রবাহিত হয়ে গেল। ফলে ফেরাউন আনন্দিত হয়ে বলল, বল কী ফরিয়াদ নিয়ে এসেছ? হযরত জিব্রাঈল আ. বললেন, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কী শাস্তি দেবে- যে তার মাওলার অবাধ্য হবে অথচ এতদসত্ত্বেও মাওলা তাকে সুখ-শান্তি ও মান-সম্মান দান করেন। উত্তরে ফেরাউন বলল- এমন ব্যক্তিকে নীল নদে ডুবিয়ে মারা উচিত। তখন জিব্রাঈল আ. বললেন, তোমার নিজের এই বিধানকে লিখে রেখো। ফেরাউন বলল, আমার কাছে তো কলম, দোয়াত ও কালি নেই। জিব্রাঈল আ. বললেন, এইসব নাও আর লিখে রাখ। অতপর জিব্রাঈল আ. অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এরপর ফেরাউন পরপর তিন রাত স্বপ্ন দেখল যে, একটি আগুন সৃষ্টি হয়ে তা মিশরের কিবতীদের বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে পুরে ধ্বংস করে দিল কিন্তু বনি ইস্রাঈলের কোন এলাকা জ্বালাচ্ছে না। আরো স্বপ্ন দেখল যে, বনি ইস্রাঈলের মহল্লা থেকে বৃহদাকারের সর্প বের হয়ে ফেরাউনের উপর আক্রমণ করল আর তার বাদশাহী আসন উল্টে দিল। সকালে উঠে সে তার রাজ্যের বড় বড় যাদুকর ও স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীদেরকে ডেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইল আর সমূহ এই বিপদ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিল। তারা ফেরাউনকে বলল, বনি ইস্রাঈল থেকে একজন নবী আসবেন যিনি আপনার ও আপনার বাদশাহী ধ্বংসকারী হবেন। তিনি অমুক মাসের জুমা'র রাতে স্বীয় পিতার ঔরস থেকে মায়ের গর্ভে স্থানান্তরিত হবেন। তারা আরো বলল, আগামী চল্লিশ দিনের মধ্যে এটি হবে। ফেরাউন তার উযিরদের কাছে জানতে চাইল যে, যার গর্ভে এই সন্তান হবে তা আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো যাতে তাকে প্রথমে হত্যা করতে পারি। উযিরগণ বলল, এটি প্রতিরোধের একমাত্র পন্থা হল জুমা'র রাতে যেন কোন স্বামী নিজের স্ত্রীর নিকট না যায়। তখন ফেরাউন সকল বনি ইস্রাঈলকে এক জায়গায় একত্রিত করে ঐ রাতে কোন ব্যক্তিকে তাদের ঘরে স্ত্রীর নিকট যেতে দেয়নি। ওদিকে গণকদেরকে আদেশ দিল যেন তারা সারা রাত আকাশে তারকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। যদি কোন কিছু পরিলক্ষিত হয় তবে যেন দ্রুত অবহিত করা হয়।

এদিকে ফেরাউন ইমরান (মুসা আ.'র পিতা) ও বিশেষ সঙ্গীদের নিয়ে মিশরে গমণ করল। সকল সৈন্যরা শহরের বাইরে পাহারা দিচ্ছে। ফেরাউন জানত না যে, ইমরান বনি ইস্রাঈলের লোক। তাই তাকে বলল, তুমি আজ রাতে আমার মহলের দরজায় পাহারা দেবে এবং কোন অবস্থাতেই স্থান ত্যাগ করবে না। রাতের বেলায় ইমরান ফেরাউনের দরজায় পাহারারত ছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে ইমরানের স্ত্রী তার কাছে গোপনে এসে মিলন করলে মুসা আ. মায়ের গর্ভে স্থানান্তরিত হন। ইমরান তার স্ত্রীকে বলল, যদি আজ রাতে তুমি গর্ভবতী হয়ে যাও তবে একথা যেন গোপন থাকে। যে সন্তানের জন্মের ভয়ে ফেরাউন ভীত সম্ভবত এটিই হবে সে সন্তান।

অর্ধরাতে গণকরা যখন জানতে পারল যে, সেই সন্তান মায়ের গর্ভে এসে গেল তখন তারা মর্মাহত হয়ে পড়ল। পরের দিন সকলেই মলিন চেহারা নিয়ে নিজের কাপড় চিড়ে আফসোস করতে করতে ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল- এত কিছুর পরেও কোন কাজ হল না। আপনার প্রাণের দুশমন মায়ের গর্ভে চলে গিয়েছে। ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে বলল- এই সন্তানের মা যখন তাকে জন্ম দেবে তখন তার মাকে সহ তাকে হত্যা করে দেবো। অত:পর যখন মুসা আ. জন্মলাভ করলেন তখন গণকরা ফেরাউনকে অবহিত করল যে, আপনার প্রাণের দুশমন জন্মগ্রহণ করেছে। তখন ফেরাউন আদেশ দিল যে, বনি ইস্রাঈলের সকল নবজাতক পুরুষ শিশুকে হত্যা করা হোক আর নারী শিশুকে বাঁচিয়ে রাখা হোক। এই আদেশের ফলে বনি ইস্রাঈলের প্রায় নব্বই হাজার পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হয়েছিল।[৪৫৬]

১৮ ও ১৯ হযরত মুসা আ. ও হযরত হারুন আ.

হযরত মুসা আ.'র জন্ম:

লাদী ইবনে ইয়াকুব আ.'র বংশধরগণের মধ্যে হযরত ইমরান ইবনে কাহাত ঐ সময় স্বীয় সম্প্রদায়ের সর্দার ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল আয়েয কিংবা ইউকাবদ। মুসা আ.'র মায়ের নাম নিয়ে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তাফসীরে রূহুল মায়ানী প্রনেতার মতে ইউহানিব, আল ইতকান প্রণেতার মতে লাহইয়ানা বিনতে ইয়াসমাদ ইবনে লাভী। আবার কেউ কেউ 'বারেখা' অথবা বাযা বলেছেন। মুসা আ. তারই গর্ভে জন্মলাভ করেন। হযরত আয়েয যখন গর্ভবতী হলেন তখন ফেরাউনের ধাত্রী তার ঘরে আর সৈন্যরা দরজায় আসা-যাওয়া

[৪৫৬]. কাযী হেফজুর রহমান, হযরত মুসা আ. ও ফেরাউন, উর্দু, পৃ. ৭-১২, দিল্লী।

করতে লাগল। প্রসব সময় ঘনিয়ে আসলে এক ধাত্রী তার ঘরে অবস্থান করতে লাগল। মুসা আ. রাতের বেলায় জন্মলাভ করেন। ফেরাউনের ধাত্রী তাঁকে দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আশেক হয়ে গেল। কেননা আল্লাহ তায়ালা মুসা আ.কে সর্বসাধারণের প্রিয়ভাজন করে দিয়েছিলেন। তাঁকে যেই দেখতো আশেক হয়ে যেতো। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي আমি তোমার উপর আমার পক্ষ থেকে মহাব্বত ঢেলে দিয়েছি। ধাত্রী মুসা আ.'র মাতাকে বলল, যে কোন প্রকারে তাঁকে হত্যা থেকে রক্ষা কর। এ কথা বলে একটি ছাগল ছানা যবেহ করে একটি হান্ডিতে ভর্তি করে ধাত্রী সৈন্যাদের বলল, এই ঘরে একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে আমি যবেহ করে দিয়েছি। দেখ আমি জঙ্গলে দাফন করতে নিয়ে যাচ্ছি। সৈন্যরা তার কথায় বিশ্বাস করে কোন তদারকী করেনি। মুসা আ. স্বীয় ঘরে লালিত পালিত হচ্ছেন। ওদিকে গণৎকারগণ ফেরাউনকে সংবাদ দিল যে, বনী ইস্রাঈলের সেই সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। এ সংবাদে ফেরাউন অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল আর কতোয়ালকে কঠোর হুশিয়ারী দিয়ে সিপাহীদের থেকে কৈফিয়ত তলব করলে তারা বলল, আমরা খুবই সাবধানতার সাথে বনী ইস্রাঈলের সন্তানদেরকে হত্যা করেছি কিন্তু ইমরানের সন্তানকে নিজ হাতে হত্যা করিনি, কেবল ধাত্রীর কথায় বিশ্বাস করে। কতোয়াল বলল, এক্ষুনি ঐ ঘরে তল্লাশী কর। সিপাহীরা বেপরোয়া ভাবে ইমরানের ঘরে প্রবেশ করল। এ সময় মুসা আ. ছিলেন তাঁর বড় বোন মরয়মের কোলে। মরয়ম সিপাহীদের আগমন দেখে মুসা আ.কে জলন্ত আগুনের চুলায় সিপাহীদের অগোচরে রেখে আসে। মরয়ম চিন্তা করল যে, যদি সিপাহীরা মুসা আ.কে দেখতে পায় তাহলে তাঁকে সহ পরিবারের সকলকে হত্যা করবে। সিপাহীরা ঘরে তল্লাশী চালিয়ে কিছুই না পেয়ে ফিরে গেল। মাতা মরয়মকে বললেন, মুসা আ. কোথায় ? সে ঘটনা বর্ণনা করলে মা বিচলিত হয়ে পড়েন আর দ্রুত চুলায় গিয়ে দেখেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে চুলা থেকে কিন্তু মুসা আ. স্বাভাবিক অবস্থায় নিরাপদ রয়েছেন। এটি মুসা আ.'র নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ববর্তী প্রকাশিত মু'জিযা। মুসা আ.'র বয়স যখন চল্লিশ দিন হল তখন মা চিন্তা করলেন যে, মুসা আ.'র জীবন সংকটপূর্ণ। তাঁকে কোন নৌকায় আরোহণ করায়ে নীল নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া উত্তম হবে। হয়তো কোন দূরবর্তী স্থানে পৌঁছে কোন অচিন লোকে তুলে নিয়ে তাঁর লালন পালন করবে।[৪৫৭]

[৪৫৭]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-১, পৃ. ৩৪৯-৩৫০।

ফেরাউনের ঘরে মুসা আ.'র লালন-পালন:

অবশেষে পরিবারের সদস্যবর্গের পরামর্শক্রমে মহল্লার 'সানুম' নামক এক বৃদ্ধার দ্বারা একটি সিন্ধুক তৈরী করা হয় এবং তার থেকে এ কথা গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়। ওদিকে ফেরাউনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল যে, যে কেউ বনী ইস্রাঈলের ঘরে জন্মকৃত সন্তানের সংবাদ দেবে তাকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে। বৃদ্ধা সানুম লোভের বশীভূত হয়ে সংবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে দরজায় পৌঁছলে তার পাদ্বয় গিরা পর্যন্ত মাটি গ্রাস করে ফেলল আর অদৃশ্য থেকে আওয়ায আসল, যদি এই গোপন তথ্য তুমি ফাঁস করে দাও তবে তোমাকে মাটিতে দাফন করে দেয়া হবে। সানুম ভীত হয়ে সিন্ধুক ইমরানের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসল এবং আবেদন করল আমাকে এই পবিত্র সন্তানকে একটু দেখান। মাতা তাকে সন্তানের দর্শন করালেন আর সানুম সন্তানের কদমে নিজেকে সপে দিয়ে ঈমান আনল। অতএব মুসা আ.'র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রথম মুমিন হলো এই সানুম। সিন্ধুক তৈরীর বিনিময়ও সে নিল না।

মা আয়েষ মুসা আ.কে গোসল করায়ে, উত্তম পোশাক পরিধান করায়ে সুগন্ধি লাগিয়ে কান্নার জলে বুক বাসিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে সিন্ধুকে রেখে নীল নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। নীল নদী থেকে একটি খাল কেটে ফেরাউনের বাগানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যার নাম ছিল "আইনুস শামস"। খোদার কুদরতী লীলায় সেই সিন্ধুকটি সেই নদী দিয়ে প্রবেশ করে ফেরাউনের বাগানে পৌঁছে গেল। এ সময় ফেরাউন তার স্ত্রী হযরত আসিয়া ও অন্যান্য বিশেষ ব্যক্তিবর্গসহ বাগান ভ্রমণে বের হল। তারা সিন্ধুকটি নদী থেকে তুলে ফেরাউনের নিকট নিয়ে আসল। সিন্ধুকটি খোলা হলে সেখানে একটি ফুটফুটে সুন্দর সন্তান দেখে ফেরাউন বলে উঠল এটি সেই ছেলে যার সম্পর্কে আমাকে গণকরা সংবাদ দিয়েছিল। আমার সৌভাগ্য যে সে অমনি আমার নিকট পৌঁছে গেছে। সে দ্রুত তাঁকে হত্যার আদেশ দিল। কিন্তু স্ত্রী হযরত আসিয়া সন্তানের সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে ফেরাউনকে বললেন, আপনি কেবল ধারণার বশীভূত হয়ে সহস্র নিষ্পাপ সন্তানকে হত্যা করাইয়াছেন। একে হত্যা করাবেন না। হতে পারে এটি বনী ইস্রাঈলের সন্তান নয় বরং অন্য কোথাও থেকে এসেছে। আমার কোন সন্তান নেই। হয়তো আল্লাহ আমার উপর দয়া করেছেন। তাই আমি একে সন্তান বানিয়ে নেবো। ফেরাউন স্ত্রীর কথা মেনে নিল। ওদিকে মুসা আ.'র বোন মরয়ম তার মাকে সংবাদ দিল যে, মুসা আ. ফেরাউনের ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। মা সংবাদ শুনে অস্থির হয়ে পড়লেন কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে এই বলে শান্তনার ইঙ্গিত আসল যে, তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ তোমাদের বাচ্চা তোমরাই লালন-পালন করবে।

হযরত আসিয়া রা. শহরের প্রসিদ্ধ ধাইমা যারা পারিশ্রমিক নিয়ে বাচ্চাদের দুধ পান করায় তাদের ডেকে এনে বাচ্চাকে দুধ পান করাতে দিলেন। কিন্তু বাচ্চা কারো দুধ পান করলনা। ফলে আসিয়া চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সেখানে মুসা আ.'র বড় বোন মরয়মও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, উত্তম দুধ বিশিষ্ট একজন ধাইমা শহরে অবস্থান করেন। আপনি বললে আমি তাকে নিয়ে আসতে পারি। ফেরাউন বলল, যাও তাকে এক্ষুনি নিয়ে এসো। সে তার মাকে নিয়ে আসলে বাচ্চা তার দুধ পান করল আর শান্তিতে কোলে চুপ হয়ে গেল। ফেরাউন এই ধাইমার জন্য দৈনিক একটি করে আশরফী পারিশ্রমিক ধার্য্য করল আর বলল, এই বাচ্চাকে তুমি লালন-পালন কর। খোদার কী কুদরতী শান! যার ভয়ে ফেরাউন বার হাজার কিংবা সত্তর হাজার সন্তান যবেহ করে হত্যা করায়েছে এখন তাঁকে সেই নিজেই লালন-পালন করছে। আসিয়া রা. মুসা আ.'র জন্য স্বর্ণের দোলনা তৈরী করালেন এবং বহু শান-শওকতের সহিত তাঁর লালন-পালনের ব্যবস্থা করেন। এভাবে দীর্ঘ দুই বছর পর্যন্ত মায়ের কোলে মুসা আ. লালিত-পালিত হন। এরপর একটি খচ্চরের বোঝা সমপরিমাণ স্বর্ণ এবং বহু উটের বোঝা পরিমাণ মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে আয়েষকে বিদায় করে দেন।[৪৫৮] এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ . فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ . وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ . وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ . وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ . فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

অর্থ: আমি মুসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অত:পর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব। অত:পর ফেরাউন–

---

৪৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০-৩৫১।

পরিবার মুসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন খবর ছিল না। সকালে মুসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মুসা জনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্বাসীগণের মধ্যে। তিনি মুসার ভগিনীকে বললেন, তার পেছন পেছন যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকে দেখে যেতে লাগল। পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে মুসা থেকে বিরত রেখেছিলাম। মুসার ভগিনী বলল, 'আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের জন্যে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙ্ক্ষী? অত:পর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না।[৪৫৯]

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى . إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى . أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي . إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ অর্থ: আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। যখন আমি তোমার মাতাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যা বর্ণিত হচ্ছে যে, তুমি (মুসাকে) সিন্দুকে রাখ, অত:পর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, অত:পর দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেবে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও। যখন তোমার ভগিনী এসে বলল: আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব কে তাকে লালন-পালন করবে? অত:পর আমি তোমাকে তোমার মাতার কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং দুঃখ না পায়।[৪৬০]

[৪৫৯]. সূরা কাসাস, আয়াত: ৭-১৩।
[৪৬০]. সূরা ত্বোয়াহা, আয়াত: ৩৭-৪০।

এরপর থেকে আসিয়া রা. নিজেই সন্তানের লালন-পালন আরম্ভ করলেন। আর ফেরাউনও সন্তানকে ভালবাসতে শুরু করল। যখন মুসা আ.'র বয়স তিন বছর হল তখন একদা ফেরাউন মুসা আ.কে কোলে নিয়ে খেলতে লাগল। হঠাৎ মুসা আ. ফেরাউনের দাঁড়ি ধরে গালে একটি থাপ্পর মেরে দিলেন। ফেরাউন তেলে বেগুনে রেগে গিয়ে বলল, হে আসিয়া! মনে হয় এটি সেই ছেলে যে আমার পরম শত্রু, সে আমাকে অপমান করল। আসিয়া বললেন, বাচ্চা এখনো অবুঝ, তার আচরণে আপনি বিচলিত হবেন না। সে তো আগুনেও হাত না বুঝে দিয়ে ফেলে। ফেরাউন বলল, আচ্ছা, বুঝে করেছে কি না বুঝে করেছে পরীক্ষা করা হোক। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একটি পাত্রে স্বর্ণ ও অপর পাত্রে আগুন রেখে তার সামনে রাখা হোক। যদি সে আগুনে হাত দেয় তবে তোমার কথা সত্য অর্থাৎ অবুঝ। আর যদি স্বর্ণের পাত্রে হাত দেয় তবে বুঝব সে বুঝে শুনে আমাকে অপদস্থ করেছে। ফলে তাকে হত্যা করা হবে। অতপর এরূপ করা হলো। আর মুসা আ. স্বর্ণের দিকে হাত বাড়াতে চাচ্ছিলেন এ সময় হযরত জিব্রাঈল আ. এসে তাঁর হাত আগুনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি আগুনের পাত্রে হাত দিয়ে আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ হাতে নিয়ে মুখে রাখলেন। যার কারণে তাঁর জিহ্বা পুড়ে গিয়েছিল ফলে তাঁর মুখে কথা আটকে যেতো। এতে আসিয়ার কথায় ফেরাউনের আস্থা আসল। মুসা আ.'র লালন-পালনের সময়কালে ফেরাউন তাঁর অনেক মু'জিযা দেখেছিল। একদা তিনি মুরগকে তাসবীহ পড়ায়েছেন। আর একবার রান্না করা মুরগকে জীবিত করেছেন, যার ফলে ফেরাউনের অন্তরে তাঁর প্রতি ভীতি সৃষ্টি হল কিন্তু ভালবাসা ও স্ত্রী আসিয়ার কারণে হত্যা থেকে বিরত ছিল।

মুসা আ. যখন যৌবনে পা দিলেন তখন তার অন্তরের আকর্ষণ বনী ইস্রাঈলের প্রতি বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি তাদের সাথে মেলা-মেশা করতে লাগলেন। ফেরাউনীদের চোখে তা সহ্য হল না কিন্তু তাদের করার কিছুই ছিল না। তাঁর বয়স যখন বাইশ বছর হল তখন বনী ইস্রাঈলের কয়েকজন নেতাকে পৃথক করে গোপনে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমাদের উপর ফেরাউনের নির্যাতন কতদিন যাবৎ? তারা বলল- দীর্ঘদিন থেকে। তিনি বললেন, এটি তোমাদের গুনাহের কারণে হচ্ছে। তোমরা মানত কর, যদি আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে মুক্তি দেন তবে তোমরা মানত পূর্ণ করবে। তারা বলল, কী মানত করবো? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর অনুগত হওয়ার মানত কর। ফলে তারা সবাই আল্লাহর আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি করল।[৪৬১]

[৪৬১]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-১, পৃ. ৩৫১-৩৫২।

মুসা আ.'র মিশর ত্যাগ:

মুসা আ.'র বয়স যখন ত্রিশ বছরে উপনীত হল তখন একদা পথে এক কিবতী ও ইস্রাঈলীর মধ্যে ঝগড়া হল। কিবতী লোকটি ইস্রাঈলী লোকটিকে লাকড়ির বোঝা বহন করতে বাধ্য করছিল কিন্তু ইস্রাঈলী লোকটি তা অস্বীকার করল। ইস্রাঈলী লোকটি মুসা আ.কে সাহায্যের জন্য আহ্বান করলে তিনি গিয়ে কিবতীকে অন্যায়ভাবে বাধ্য করতে নিষেধ করলেন কিন্তু সে বিরত রইল না। ফলে মুসা আ. তাকে ঘুষি মারলে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কিবতী লোকটি মারা যায়। ইস্রাঈলী লোকটি নিজের ঘরে চলে গেল। মুসা আ. কিন্তু কিবতীকে হত্যার উদ্দেশ্যে মারেন নি বরং কেবল ইস্রাঈলীকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মেরেছিলেন। এটা অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু, যার কেসাস নাই। তাছাড়া কিবতী ছিল হারবী কাফের যাকে হত্যা করা পাপ নয়। এ সংবাদ ফেরাউনের নিকট পৌছলে সে বলল এরূপ কাজ মুসা করতে পারেনা।

দ্বিতীয় দিন ঐ ইস্রাঈলী লোকটি অন্য কিবতীর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল। মুসা আ.কে দেখে লোকটি পুনরায় তাঁকে সাহায্যের জন্য ডাকল। তিনি গিয়ে ইস্রাঈলীকে ধমক দিয়ে কিবতীকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে ইস্রাঈলী লোকটি চিৎকার করে বলতে লাগল– হে মুসা! গতকাল তুমি কিবতীকে হত্যা করেছ আজকে আমাকে হত্যা করতে এসেছ? একথা লোকেরা শুনে গেল আর ফেরাউনের নিকট গিয়ে সাক্ষ্য দিল। কিবতী নেতারা ফেরাউনের কাছে দাবী করল যে, আপনি মুসাকে আমাদের নিকট সোপর্দ করে দিন আমরা তার থেকে আমাদের লোকের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবো। ফেরাউন চিন্তা করতে লাগল। উক্ত মজলিসে হিযকীল নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যিনি গোপনে মুসা আ.'র উপর ঈমান এনেছিলেন। তিনি গিয়ে মুসা আ.কে সংবাদ দিলেন যে, আপনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হচ্ছে, আপনি অন্য কোথাও চলে গেলে মঙ্গল হবে। মুসা আ. অপ্রস্তুত অবস্থায় কোন প্রকারের পাথেয় ছাড়া মাদয়ান'র দিকে রওয়ানা হয়ে যান। সেখানে হযরত শোয়াইব আ.'র ঘরে অবস্থান করেন এবং তাঁর কন্যা সফুরা রা.কে বিবাহ করেন। সেখানে তিনি দশ বছর অবস্থান করেছিলেন। অতপর পুনরায় মিশরে তাশরীফ আনেন। এ সময় পথিমধ্যে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন। এরপর মিশরে চল্লিশ বছর যাবৎ ফেরাউনের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করেন এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রচার কাজ চালিয়ে যান।[৪৬২]

[৪৬২]. আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী র., ১২৩৯হি., তাফসীরে আযিযী, সূত্র: মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৩৫২।

এ ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ . قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ . فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ . فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ . وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ . فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ .

অর্থ: যখন মুসা যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পরিণত বয়স্ক হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম! এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি! তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এবং অন্য জন তাঁর শত্রু দলের। অত:পর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মুসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মুসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্ত কারী। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি তো নিজের উপর যুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। অত:পর তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহরে ভীত-শংকিত অবস্থায়। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকল্য যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে চীৎকার করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। মুসা তাকে বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। অত:পর মুসা যখন উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, তখন সে বলল, গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, সে রকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চাচ্ছ এবং সন্ধি

স্থাপনকারী হতে চাও না! এসময় শহরের প্রান্ত থেকে একব্যক্তি ছুটে আসল এবং বলল, হে মুসা! রাজ্যের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব, তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। অত:পর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর।[৬৬৩]

মাদায়নে হযরত শুয়াইব আ.'র সাক্ষাত:

মাদায়ন মিশর থেকে প্রায় আট মনযিল দূরে অবস্থিত। এই শহরটি আবাদ করেছিলেন হযরত মাদয়ন ইবনে ইব্রাহীমের বংশধরগণ। আর হযরত মুসা আ. ছিলেন হযরত ইসহাক ইবনে ইব্রাহীমের বংশধর। সম্ভবত: এই বংশীয় সম্পর্কের কারণেই হযরত মুসা আ. মাদায়নের দিকে যাওয়ার মনস্ত করেছিলেন।

হযরত মুসা আ. মিশর থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় কোন সফরসঙ্গী, পথপ্রদর্শক এবং কোন পাথেয় ছিলনা। এমনকি পায়ের জুতাও ছিলনা। পুরো সফরে তাঁর খাবার ছিল বৃক্ষ ও লতা-পাতা। খালি পায়ে চলতে চলতে তাঁর পায়ের নিচের চামড়া পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। এমন পেরেশান অবস্থায় তিনি মাদায়নে প্রবেশ করে দেখতে পান যে, একটি কূপে জীব-জন্তুর ভীড়। রাখালেরা তাদের পশুকে পানি পান করাচ্ছে। কিন্তু কিছুটা দূরে দু'জন সম্ভ্রান্ত নারী দাঁড়িয়ে তাদের পশুগুলোকে কূপের পানির দিকে যাওয়া থেকে বারণ করছে। তিনি বুঝে গেলেন এখানেও সবলরা দূর্বলের উপর যুলুম চালাচ্ছে। এই শক্তিশালী লোকদের পশুগুলো পানি পান করে চলে যাওয়ার পর যৎ সামান্য পানি থাকবে কেবল তা-ই এই দুর্বলদের পশুর ভাগ্যে জুটবে। অত:পর তিনি অগ্রসর হয়ে নারীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন- তোমরা কেন পানি পান করাচ্ছ না, পিছে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তারা উত্তর দিল- আমরা দুর্বল ও অক্ষম। আর আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ। তাঁর এতটুকু শক্তি নাই যে, এদের যুলুম-অত্যাচার প্রতিরোধ করবে। ওরা পানি পান করায়ে চলে গেলে অবশিষ্ট পানি আমরা পান করাবো। আর এটাই আমাদের দৈনন্দিন নিয়মে পরিণত হয়েছে। তাদের করুণ কাহিনী শুনে হযরত মুসা আ. জোশে এসে সকল ভীড় ভেদ করে কূপের নিকট পৌছে কূপের বড় বালতি নিয়ে একাই পানি তুলে নারীদ্বয়ের পশুপালকে পানি পান করান। তাঁর জোশ ও শক্তি দেখে যালেমরা ভয়ে ভীত হয়ে গেল এবং তাঁকে বাঁধা দেয়ার সাহস করল না।

অবশেষে নারীদ্বয়ের পশুপাল যখন পানি পান করল তখন তারা ঘরে চলে গেল। এই নারীদ্বয় ছিলেন হযরত শুয়াইব আ.'র কন্যা। এরা অন্যান্য দিনের

[৬৬৩]. সূরা কাসাস, আয়াত: ১৪-২১।

চেয়ে আজ তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসলে তাদের পিতা আশ্চর্য হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তারা সমস্ত ঘটনা খুলে বললে, পিতা বললেন, তোমরা দ্রুত গিয়ে তাঁকে আমার নিকট নিয়ে এসো।

ওদিকে হযরত মুসা আ. পানি পান করানোর পর নিকটে একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসে অপেক্ষা করতেছেন এবং মুসাফির, গরীব, অভূক্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় প্রার্থনা করলেন- হে প্রভু! এই অসহায় অবস্থায় তুমি যৎসামান্য আমার জন্য অবতরণ কর, আমি তার দিকে মুখাপেক্ষী। মেয়ে দ্রুত ঐ স্থানে গিয়ে দেখে যুবকটি কূপের নিকটে লজ্জামাখা চেহারায় চোখ দু'টি নিম্ন দিক করে বসে আছে। মেয়েটি বলল, আপনি আমাদের ঘরে চলুন, পিতা আপনাকে ডেকেছেন। তিনি আপনাকে এই এহসানের প্রতিদান দেবেন। মুসা আ. এটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সুযোগ মনে করে ডাকে সারা দিলেন আর মেয়েটির সঙ্গে চলতে লাগলেন। তিনি মেয়েকে বললেন, তুমি আমার সামনে সামনে নয় পেছনে পেছনে চলবে তবে ইশারা-ইঙ্গিতে আমাকে পথ দেখাবে। এভাবে চলতে চলতে হযরত শোয়াইব আ.'র সাথে সাক্ষাত হল। তিনি তাঁকে প্রথমে পানাহারের ব্যবস্থা করেন তারপর তাঁর থেকে আদ্য-পান্ত পুরো ঘটনা শ্রবণ করেন। তিনি তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন, এখন আল্লাহর শোকর কর, তিনি তোমাকে যালিমদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এখন তোমার কোন ভয় নেই।

হযরত মুসা আ. ও হযরত শোয়াইব আ.'র মধ্যে কথোপকথন চলছে। যেই মেয়েটি মুসা আ.কে ডাকতে গিয়েছিল সে পিতাকে বলল, হে পিতা! আপনি এই মেহেমানকে আমাদের পশু চরানো এবং পানির ব্যবস্থা করার জন্য মজদুর হিসাবে রেখে দিন। কেননা মজদুর হিসাবে সেই উত্তম হয় যেই শক্তিশালী হয় এবং আমানতদারও হয়।

পিতা জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি এই মেহেমানের শক্তি ও আমানতদারী সম্পর্কে কিভাবে জানলে? মেয়ে উত্তর দিল- আমি মেহেমানের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হলাম যখন তিনি কূপের বিরাটাকারের বালতি একাই টেনে তুললেন। আর আমানতদারীর পরীক্ষা এভাবে হল যে, যখন আমি তাঁকে ডাকতে গেলাম তখন তিনি আমাকে দেখে চক্ষু অবনির্মিত করে ফেললেন এবং কথাবার্তার মধ্যে একবারও আমার দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। আর যখন এখানে আসতে লাগলেন তখন আমাকে পেছনে চলতে বললেন এবং নিজে আগে আগে চলেছেন।

হযরত শোয়াইব আ. মেয়ের কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন আর হযরত মুসা আ.'কে প্রস্তাব দিলেন- যদি তুমি আট বছর পর্যন্ত আমার নিকট থাক এবং

আমার ছাগল চরাও তবে আমি আমার এই মেয়েকে তোমাকে বিবাহ দেবো। যদি আরো দু'বছর বাড়িয়ে দশ বছর কর তবে তা আরো ভাল। এটাই হবে এই মেয়ের মাহর। মুসা আ. এই শর্ত মেনে নিলেন আর বললেন- এটা আমার উপর ছেড়ে দিন যে, এই উভয় সময়ের যে কোন একটি আমি পূর্ণ করবো। আপনার পক্ষ থেকে আমাকে জোর জবরদস্তী করা যাবেনা। এই শর্ত মোতাবেক নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হওয়ার পর হযরত শোয়াইব আ. তাঁর সাফুরা নামক মেয়েকে হযরত মুসা আ.'র নিকট বিবাহ দেন।[৪৬৪]

এই ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ . وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ . فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ . فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ . قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ . قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ .

অর্থ: যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। অত:পর মুসা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করালেন। অত:পর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী। অত:পর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে

[৪৬৪]. মাওলানা হেফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৩৭৯-৩৮৬।

ডাকছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করবেন। অত:পর মুসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। বালিকাদ্বয়ের একজন বলল পিতা:! তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। পিতা মুসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার বিবাহে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকুরী করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ চাহেন তো তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে। মুসা বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হল। দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, তাতে আল্লাহ্র উপর ভরসা।[৪৬৫]

হযরত মুসা আ.'র নবুয়ত লাভ:

হযরত মুসা আ. মাদয়ানে মতান্তরে দশ/বিশ বছর অবস্থান করার পর একদা পরিবার-পরিজন সহ ছাগল চরাতে চরাতে মাদয়ান থেকে অনেক দূরে চলে গেলেন। তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মৌসুম ছিল। তিনি আগুনের খোঁজে বের হয়ে আগুন খুঁজতে খুঁজতে সীনা পর্বত পর্যন্ত পৌছে গেলেন যা মিশরের পথে অবস্থিত ছিল। অনেকের মতে মুসা আ. মাদয়ানে দীর্ঘদিন অবস্থান করার পর মাতৃভূমি মিশর যাওয়ার মনস্থ করলেন। তিনি হযরত শোয়াইব আ. থেকে অনুমতি ও দোয়া নিয়ে স-পরিবারে মিশরের পথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে শাম অঞ্চলের শাসকদের পক্ষ থেকে বিপদাশংকা ছিল। তাই তিনি পরিচিত পথ পরিত্যাগ করে অপরিচিত পথ অবলম্বন করলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন অন্ত:সত্ত্বা এবং তার প্রসবকাল ছিল অতি নিকটবর্তী। ওদিকে রাস্তা ছিল অপরিচিত। তাই তিনি পথ হারিয়ে তূর পর্বতের পশ্চিম-ডান দিকে চলে গেলেন। রাতের বেলা গভীর অন্ধকার, কনকনে শীত আর বরফ সিক্ত মাটি এহেন দুর্যোগ মুহূর্তে স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়ে গেল। মুসা আ. শীতের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য আগুন জ্বালাতে চাইলেন তবে ব্যর্থ হলেন। এই হতবুদ্ধি অবস্থায় তিনি তূর পর্বতে আগুন দেখতে পেলেন। মূলত সেটা নূর। তিনি পরিবারবর্গকে বললেন- তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি আগুন দেখেছি। দেখি, আগুন আনা যায় কিনা। সম্ভবত: আগুনের পাশে কোন পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও পেতে পারি।

[৪৬৫]. সূরা কাসাস, আয়াত: ২২-২৮।

মুসনাদে আহমদ-এ ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ থেকে বর্ণিত আছে যে, মুসা আ. আগুনের কাছে পৌছে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, এটি একটি বিরাট আগুন, যা একটি সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের উপর দাউ দাউ করে জ্বলছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে, আগুনের কারণে বৃক্ষের কোন ডাল-পাতা পুড়ছে না, বরং আগুনের কারণে বৃক্ষের সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঐজ্জ্বল্য আরো বেড়ে গেছে। তিনি কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখলেন আর আগুন নিতে সামনে অগ্রসর হলে আগুন পিছনে সরে যায়। এই দৃশ্য দেখে তিনি কিছুটা বিস্ময়বোধ করলেন আর নৈরাশ হয়ে যখন চলে আসতে চাইলেন তখন আগুন সামনে নিকটে এসে গেল এবং মুসা আ. অদৃশ্য থেকে একটি আওয়ায শুনতে পান। তা হল- يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ হে মুসা! আমি আল্লাহ, বিশ্ব পালনকর্তা।[৪৬৬]

বাহ্‌রে মুহীত ও রূহুল মায়ানী ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে- হযরত মুসা আ. এই অদৃশ্যের আওয়ায চতুর্দিক থেকে শুনতে পেয়েছিলেন এবং কেবল কানে নয় বরং শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। এর ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটি কোন মানব-দানবের আওয়ায নয় বরং মহান আল্লাহর আওয়ায। আর এই আওয়াযের মর্মার্থ ছিল যে, হে মুসা! তুমি যা দেখছ তা মূলত আগুন নয় বরং তা আল্লাহর নূর, আর আমি আল্লাহই সমগ্র পৃথিবীর পালনকর্তা।[৪৬৭] আল্লামা নঈম উদ্দিন মোরাদাবাদী র. বলেন- ঐ বৃক্ষের নাম হল 'ইনাব' অথবা 'আউসাজ্জ'।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى . إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى . فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى . إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى . অর্থ: হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনার কাছে কি মুসা'র বৃত্তান্ত পৌছেছে? তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত: আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারবো অথবা আগুনের নিকট পৌছে কোন পথপ্রদর্শক পাবো। অত:পর তিনি যখন আগুনের কাছে পৌছলেন, তখন আওয়ায আসল- হে মুসা! আমিই আপনার পালনকর্তা।

[৪৬৬]. সূরা কাসাস, আয়াত: ৩০।

[৪৬৭]. কাযী মাওলানা হেফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, পৃ. ৩৯২, আল্লামা ইবনে কাসীর র., কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, খণ্ড-১, পৃ. ২৬৫।

অতএব আপনি জুতা খুলে ফেলুন। নিশ্চয় আপনি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছেন।[৪৬৮]

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ . فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . অর্থ: যখন মুসা তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন: 'আমি অগ্নি দেখেছি, এখন আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর আনতে পারব অথবা তোমাদের জন্যে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। অত:পর যখন তিনি আগুনের কাছে আসলেন, তখন আওয়ায হল, ধন্য তিনি, যিনি আগুনের স্থানে আছেন এবং যারা আগুনের আশেপাশে আছেন। বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত। হে মুসা! আমি আল্লাহ্, প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৪৬৯]

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ . فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ . অর্থ: অত:পর মুসা আ. যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তূর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত: আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। যখন সে তার কাছে পৌছল, তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যাকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাঁকে আওয়ায দেয়া হল, হে মুসা! আমি আল্লাহ, বিশ্ব পালনকর্তা।[৪৭০]

উল্লেখ্য যে, তুয়া উপত্যকাটি তূর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। এটি পৃথিবীতে পবিত্র স্থান সমূহের অন্যতম। মুসা আ.কে জুতা খোলার আদেশ দেয়ার কারণ হল এটি সম্মান প্রদর্শনের স্থান। আর জুতা খুলে ফেলা আদব প্রদর্শনের অন্তর্ভূক্ত। দ্বিতীয় কারণ হল- বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে- রাসূল ﷺ

[৪৬৮]. সূরা ত্বো-য়াহা, আয়াত: ৯-১২।

[৪৬৯]. সূরা নামল, আয়াত: ৭-৯।

[৪৭০]. সূরা কাসাস, আয়াত: ২৯-৩০।

এরশাদ করেন- كانتا من جلد حمار ميت মুসা আ.'র পাদুকাদ্বয় মৃত গাধার চামড়া দ্বারা নির্মিত , অর্থাৎ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে পবিত্র করা হয়নি, তাই জুতা খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা তুয়া উপত্যকায় হযরত মুসা আ.কে নবী হিসেবে মনোনীত করার নিদর্শন প্রকাশ করেন এবং তাঁর মাতৃভূমি মিশরে গিয়ে ফেরাউনের নিকট একত্ববাদের দাওয়াত পৌছানোর দায়িত্বভার অর্পন করলেন। নবী-রাসূলগণকে নবুয়ত ও রিসালতের দায়িত্ব দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সত্যের প্রমাণস্বরূপ কিছু অলৌকিক ক্ষমতা তথা মু'জিযা দান করেন। নবী-রাসূলগণের মধ্যে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ 'র পর হযরত মুসা আ.ই সবচেয়ে বেশী মু'জিযার অধিকারী ছিলেন। যেহেতু মুসা আ.'র যুগে যাদুর প্রভাব ছিল বেশী সেহেতু তাঁকে সর্বপ্রথম যাদু সাদৃশ্য মু'জিযা দেয়া হয়েছে।

হযরত শোয়াইব আ. থেকে উপহার প্রাপ্ত মুসা আ.'র নিকট দুই ডাল বিশিষ্ট একটি অলৌকিক লাঠি ছিল। তুয়া উপত্যকায় আগুন আনতে যাওয়ার সময় তা তাঁর ডান হাতে ছিল। তিনি আগুনের কারিশমা ও অদৃশ্যের আওয়ায শুনে হতভম্ব হয়ে যান তখনই তাঁর ভীতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তায়ালা জিজ্ঞেসা করেন- . وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى হে মুসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি? উত্তরে তিনি বললেন, هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى . এটা আমার লাঠি। আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগলপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে অন্যান্য কাজও চলে।[৪৭১]

হযরত মুসা আ. প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপ না করে দীর্ঘ করার কারণ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, আল্লাহ্র সাথে কথা বলার দূর্লভ সুযোগকে সৎ ব্যবহার করেছেন আর এটিই প্রকৃত আশেকের পরিচয়। আল্লাহ্ তায়ালা এই লাঠির মাধ্যমে মুসা আ.'র মু'জিযা প্রকাশের উদ্দেশ্যে বললেন- হে মুসা! এই লাঠি আপনি মাটিতে নিক্ষেপ করুন। আল্লাহর আদেশ মতে লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করা মাত্র লাঠি সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। মুসা আ. প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন- তুমি তাকে ধর এবং ভয় পেয়োনা, আমি এক্ষুনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেবো। মুসা আ. সাহস করে হাত দ্বারা ধরামাত্র সাপ পুনরায় পূর্বের মত লাঠি হয়ে গেল।

[৪৭১]. সূরা ত্বোহা, আয়াত: ১৭-১৮।

এই সাপ সম্পর্কে কুরআন মজীদে সূরা নামাল ও সূরা কাসাসে এসেছে جَانٌّ 'জান্নুন' তথা ছোট, সরু ও দ্রুতগামী সাপ, সূরা আ'রাফ এ ثُعْبَانٌ 'সু'বানুন' তথা মোটা ও বৃহৎ অজগর সাপ। তবে সূরা ত্বাহা-এ حَيَّةٌ 'হায়াতুন' বলা হয়েছে যা ছোট-বড় সব ধরণের সাপকে বুঝায়। এটি স্থান ও অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ ধারণ করত বলে কুরআনের ভাষায়ও ভিন্নতা এসেছে।

অতপর দ্বিতীয় মু'জিযা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুসা আ.কে বললেন- وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى হে মুসা! আপনি আপনার হাত আপনার বগলে রাখুন, তা কোন দোষ ছাড়াই নির্মল উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে। এটি অন্য এক নিদর্শন তথা দ্বিতীয় মু'জিযা।[৪৭২] অর্থাৎ তাঁর ডান হাত বাম বগলের নীচে রেখে বের করলে তা সূর্যের ন্যায় উজ্জল ও ঝলমল করত। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন- হযরত মুসা আ.'র হাত থেকে দিবা-রাত্রি সূর্যের আলোর ন্যায় আলো বিকিরণ হত। এটি তাঁর অন্যতম মু'জিযার অন্তর্ভূক্ত ছিল। যখন তিনি পুনরায় হাত বগলের নীচে রেখে বাহুর সাথে মিলাতেন তখন হাত মোবারক পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক হয়ে যেতো।[৪৭৩]

আল্লাহ্ তায়ালা মুসা আ.কে দু'টি মু'জিযা দান করার পর বললেন- হে মুসা! তুমি এখন ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট যাও। সে বড় উদ্ধত হয়ে গিয়েছে। তাকে এবং তার সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন কর। তখন মুসা আ. আল্লাহর নিকট পাঁচটি আবেদন জানালেন। প্রথম আবেদন- তিনি বললেন- رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي হে পরওয়ারদিগার! আমার বক্ষ উন্মোচন ও প্রশস্ত করে দিন যাতে নবুয়তের ভার ও অহী'র জ্ঞান বহন করতে পারি। দ্বিতীয় আবেদন হল- وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي আমার কাজকে আমার জন্য সহজ করে দিন। কারণ নবুয়তের দায়িত্ব অনেক কঠিন ও ভারী। আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজ করে দেয়া না হলে এ দায়িত্ব পালন করা কারো নিজের পক্ষে সম্ভব নয়। তৃতীয় আবেদন হল- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। কারণ মুসা আ.'র জিহ্বায় সামান্য জড়তা ছিল যার কারণে তাঁর কথা কম বুঝা যেতো। অথচ দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে ভাষা সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধভাষী হওয়া আবশ্যক। এই জড়তার কারণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে

[৪৭২]. সূরা ত্বোহা, আয়াত: ২২।
[৪৭৩]. আল্লামা নঈম উদ্দিন মোরাদাবাদী র., ১৩৬৭হি., খাযায়েনুল ইরফান, উর্দু, প্রান্ত টীকা, পৃ. ৩৭৮।

যে, একদা মুসা আ. শিশুকালে ফেরাউনের ঘরে হযরত আছিয়া রা. কাছে থাকা অবস্থায় ফেরাউন তাঁকে আদর করতে চাইলে ফেরাউনের দাড়ি ধরে গালে চপেটাঘাত করেন। এতে ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। স্ত্রী আছিয়া বললেন- এই অবুঝ শিশুর আচরণে আপনি ক্রোধান্বিত হবেন না। সে এখনো আপন-পর এবং ভাল-মন্দ বুঝতে পারেনা। ফেরাউনকে শান্ত করা আর মুসা আ.কে অবুঝ প্রমাণের উদ্দেশ্যে একটি পাত্রে জ্বলন্ত অঙ্গার ও অপর একটি পাত্রে মণিমুক্তা এনে মুসা আ.'র সামনে রাখা হল। মুসা আ. মণিমুক্তার দিকে হাত বাড়ালে হযরত জিব্রাঈল আ. তাঁর হাত ধরে জ্বলন্ত অঙ্গারে রেখে দিলেন আর মুসা আ. জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে মুখে দিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর জিহ্বা পুড়ে যায়। এতে ফেরাউন বুঝল যে, মুসা অবুঝ। কেবল শিশুসুলভ আচরণের কারণেই এরূপ করেছিল। এ কারণেই মুসা আ.'র জিহ্বায় জড়তা সৃষ্টি হয়েছিল। আর এটি দূর করার জন্যই তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন।

চতুর্থ আবেদন হল- وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي আমার পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্য উযীর নিয়োগ করুন। এতে তিনি প্রথমে নিজের পরিবার থেকে অনির্দিষ্টভাবে একজন উযীর চেয়েছেন। পরক্ষণে তিনি নির্দিষ্ট করে তাঁর বড় ভাই হযরত হারুন আ.কে উযীর বানাতে চান যেন তিনি তাঁর কাজে সাহায্য করেন। তাছাড়া হযরত হারুন আ. সম্পর্কে মুসা আ. বলেছেন- هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا তিনি (হারুন) আমার চেয়ে অধিক বিশুদ্ধভাষী। তাই মুসা আ. হারুনকে উযীর নিয়োগ দিতে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেন। পঞ্চম আবেদন হল- وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي আর তাঁকে আমার কাজে অংশীদার করুন। অর্থাৎ তাঁকেও নবুয়ত দান করুন যেন তিনি আমার সাথে একযোগে নবুয়তের দায়িত্ব পালন করে আমাকে সহযোগিতা করতে পারেন। এই পাঁচটি আবেদন শেষ হলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর আবেদন কবুল হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করে বলেন- قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى হে মুসা! তোমার সব আবেদন তোমাকে প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষত: তাঁর মুখের জড়তা দূরীভূত হল এবং হযরত হারুন আ.কে তার সহকারী করা হল, সর্বোপরি আল্লাহ্ তাঁকে নবুয়তও দান করেন। হারুন আ. হযরত মুসা আ.'র তিন/চার বছরের বড় ছিলেন এবং মুসা আ.'র তিন বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন। মুসা আ. যখন এই দোয়া করেন তখন হারুন আ. ছিলেন

মিশরে। সেখানেই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবুয়ত প্রদান করেন এবং ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। মুসা আ.কে যখন ফেরাউনকে দাওয়াত দেয়ার জন্য মিশরে প্রেরণ করা হয় তখন হারুন আ. মিশরের বাইরে এসে মুসা আ.কে অভ্যর্থনা জানান এবং দু'জন একসাথে ফেরাউনের নিকট যান।

ফেরাউনের দরবারে তাওহীদের দাওয়াত:

হযরত মুসা আ. ও হযরত হারুন আ. নবুয়ত লাভের পর পরিবারের সকলের সাথে সাক্ষাত করে আল্লাহর নির্দেশে উদ্ধত ফেরাউনের দরবারে গিয়ে সরাসরি তাকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহ্বান করার মনস্থ করলেন। কারণ এটাই হল নবী-রাসূলগণের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। আর ফেরাউন নিজেকে পালনকর্তা মনে করত। অত:পর তাঁরা দু'জন ফেরাউনের মহলে পৌছে আল্লাহর নির্দেশ মতে নির্ভয়ে অত্যন্ত ভদ্রতা ও সহনশীলতার সহিত প্রথমত: নিজেদের নবুয়ত প্রাপ্তির কথা বললেন। সাথে খোদা প্রদত্ত বিস্ময়কর দু'টি মু'জিযার কথাও উল্লেখ করলেন। দ্বিতীয়ত: বনী ইস্রাইল যাদেরকে সে দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালিয়ে আসছে আর দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছে- তিনি তাদের মুক্তি চেয়েছেন। কারণ বান্দার দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ হওয়া আল্লাহর দাসত্বের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমেই তিনি ফেরাউনকে তাওহীদের দাওয়াত না দিয়ে নিজের রেসালতের দাবী করার কারণ হল- ইতিপূর্বে হযরত মুসা আ. ফেরাউনের ঘরে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। ফেরাউন পরিবারের ইহসান তাঁর উপর ছিল। ফেরাউনও তাঁকে সাধারণ লোক মনে করে কথা অগ্রাহ্য করার সম্ভাবনা ছিল। তাই তিনি প্রথমে নিজের নতুন পরিচয় তুলে ধরেন। তা ছাড়া তাওহীদের দাওয়াত রেসালতের মধ্যে নিহিত আছে। কেননা রেসালতকে স্বীকার করার মাধ্যমে যদি তাওহীদ স্বীকার করা হয় তবেই তা গ্রহণযোগ্য অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যান যোগ্য।

হযরত মুসা আ.'র দাবী ও দাওয়াত শ্রবণে ফেরাউন রাগান্বিত না হয়ে মুসা আ.'র উপর তার অবদানের কথা এবং মিশরী কিবতি হত্যার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে একাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা চালায়। যেমন সুচতুর প্রতিপক্ষ সাধারণত যখন আসল বিষয়ের উত্তর দিতে অক্ষম হয় তখন অপর পক্ষের দুর্বলতা খোঁজে এবং তা বর্ণনা করে যাতে জনমনে তার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় আর লজ্জিত হয়ে দাবী পরিত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু মুসা আ. নির্বিঘ্নে এসব কথা স্বীকার করে বললেন- তাই বলে কি আমার একজনের ব্যক্তিগত কারণের জন্য বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায়কে তুমি গোলাম বানিয়ে রাখবে? এটাতো তাদের উপর অন্যায় ও যুলুম। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ বর্ণিত হয়েছে-

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ . অর্থ: আর মুসা বললেন, হে ফেরাউন! আমি বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত রসূল। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। আমি তোমাদের পরওয়ারদেগারের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলদেরকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও।[৪৭৪]

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ . قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ . وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ . قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ . فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ . وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ . অর্থ অতএব তোমরা ফেরআউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রসুল। যাতে তুমি বনী-ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও। ফেরআউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। তুমি সেই তোমরা অপরাধ যা করবার করেছ। তুমি হলে কৃতঘ্ন। মুসা বলল, আমি সে অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি আত্মভোলা ছিলাম। অত:পর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম। এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে পয়গাম্বর করেছেন। আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী–ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ।[৪৭৫]

হযরত মুসা আ.'র যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের উত্তর দিতে অক্ষম হয়ে ফেরাউন প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল- হে মুসা! আমিই তোমাকে লালন-পালন করেছি সুতরাং আমিই তোমার পালনকর্তা। আমি ছাড়া কি তোমার অন্য কোন পালনকর্তা আছে? যাকে তুমি 'রাব্বুল আলামীন' বলছ! উত্তরে মুসা আ. বললেন, হ্যাঁ, তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পূর্ব-পশ্চিম ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা। ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে উদ্দেশ্য করে বলল– তোমরা কি শুনছ না একি বলছে? তিনি বললেন- আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রকৃত পালনকর্তা। অবশেষে

[৪৭৪]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১০৪-১০৫।

[৪৭৫]. সূরা শু'আরা, আয়াত: ১৬-২২।

ফেরাউন মুসা আ.কে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষে পাগল বলে আখ্যায়িত করল। কাফির সম্প্রদায়ের স্বভাবই এরূপ- তারা নবী-রাসূলগণের সাথে অপারগ হয়ে পরিশেষে পাগল, যাদুকর ইত্যাদি বলে থাকে, যেমন মক্কার কাফেররাও আমাদের সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ ﷺ'র বেলায় বলেছিল।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ . قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ . قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ . قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ . قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ . অর্থ: ফেরাউন বলল, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কি? মুসা বলল, তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শুনছ না? মুসা বলল, তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও পালনকর্তা। ফেরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসুলটি নিশ্চয়ই বদ্ধ পাগল। মুসা বলল, তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বোঝ।[৪৭৬]

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى . قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى . قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى . قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى . الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى . অর্থ: সে বলল: তবে হে মুসা! তোমাদের পালনকর্তা কে? মুসা বললেন: আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অত:পর পথপ্রদর্শন করেছেন। ফেরাউন বলল: তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি? মুসা বললেন: তাদের খবর আমার পালনকর্তার কাছে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা ভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন না। তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।[৪৭৭]

[৪৭৬]. সূরা শু'আরা, আয়াত: ২৩-২৮।

[৪৭৭]. সূরা তোয়াহা, আয়াত: ৪৯-৫৩।

মিশরে প্রবেশ:

হযরত মুসা আ. নবুয়ত লাভে ধন্য হয়ে স্ত্রীকে নিয়ে রাতের বেলায় মিশরে পৌছেন। গোপনে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে মায়ের কাছে একজন মুসাফিরের পরিচয় দেন। ইত্যবসরে হযরত হারুন আ. ওখানে পৌছেন এবং ইতিপূর্বে তাঁকেও নবুয়ত প্রদান করে ধন্য করা হয়েছে। তিনি এসে মাকে মুসা আ.'র পরিচয় দিয়ে আদ্যপান্ত সব কথা খুলে বললে সকলেই আনন্দিত হন।

এই সব ঘটনা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে-

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى . إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى . فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى . إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى . وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى . إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي . إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى . فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى . وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى . قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى . قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى . فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى . قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى . وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى . لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى . اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى . قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي . وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي . وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي . وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي . هَارُونَ أَخِي . اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي . وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي . كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا . وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا . إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا . قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى .

অর্থ: আপনার কাছে মুসার বৃত্তান্ত পৌছেছে কি? তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন পরিবারবর্গকে বললেন: তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত: আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা আগুনে পৌছে পথের সন্ধান পাব। অত:পর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন, তখন আওয়ায আসল হে মুসা! আমিই তোমার পালনকর্তা, অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছ। এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা শুনতে থাক। আমিই আল্লাহ্ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর। কেয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ

করে। সুতরাং যে ব্যক্তি কেয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে। নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। হে মুসা! তোমার ডানহাতে ওটা কি? তিনি বললেন: এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। আল্লাহ্ বললেন: হে মুসা! তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। অত:পর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। আল্লাহ্ বললেন: তুমি তাকে ধর এবং ভয় করো না, আমি এখনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব। তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অন্য এক নিদর্শনরূপে; কোন দোষ ছাড়াই। এটা এজন্যে যে, আমি আমার বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই। ফেরাউনের নিকট যাও, সে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে। মুসা বললেন: হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন। আমার ভাই হারুনকে। তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন। এবং তাঁকে আমার কাজে অংশীদার করুন। যাতে আমরা বেশী করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি। এবং বেশী পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি। আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন। আল্লাহ্ বললেন: হে মুসা! তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল।[৪৭৮]

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ . فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ . إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ .

অর্থ: যখন মুসা তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন: 'আমি অগ্নি দেখেছি, এখন আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্যে কোন খবর আনতে পারব অথবা তোমাদের জন্যে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। অত:পর যখন তিনি আগুনের কাছে আসলেন, তখন আওয়ায হল, ধন্য তিনি, যিনি আগুনের স্থানে

---

[৪৭৮]. সূরা ত্বোহা, আয়াত: ৯-৩৬।

আছেন এবং যারা আগুনের আশেপাশে আছেন। বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত। হে মুসা! আমি আল্লাহ্, প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি।' অত:পর যখন তিনি তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলেন, তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং পেছন দিকে ফিরেও দেখলেন না। হে মুসা! ভয় করবেন না। আমি যে রয়েছি, আমার কাছে পয়গম্বরগণ ভয় করেন না। তবে যে বাড়াবাড়ি করে এরপর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে। নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আপনার হাত আপনার বগলে ঢুকিয়ে দিন, সুশুভ্র হয়ে বের হবে নির্দোষ অবস্থায়।' এগুলো ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।[৪৭৯]

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ . وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ . اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ . قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ . وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ .

অর্থ: যখন সে তার কাছে পৌছল, তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়ায দেয়া হল, হে মুসা! আমি আল্লাহ্, বিশ্ব পালনকর্তা। আরও বলা হল, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অত:পর যখন সে লাঠিকে সর্পের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং পেছন ফিরে দেখল না। হে মুসা! সামনে এস এবং ভয় করো না। তোমার কোন আশংকা নেই। তোমার হাত বগলে রাখ। তা বের হয়ে আসবে নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে এবং ভয় হেতু তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এই দু'টি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। মুসা বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। কাজেই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। আমার ভাই হারুন, সে আমা অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব, তাঁকে আমার সাথে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।[৪৮০]

---

[৪৭৯]. সূরা নামল, আয়াত: ৭-১২।
[৪৮০]. সূরা কাসাস, আয়াত: ৩০-৩৫।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى . إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى . اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى .

অর্থ: মুসার বৃত্তান্ত আপনার কাছে পৌছেছে কি? যখন তার পালনকর্তা তাকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহ্বান করেছিলেন, ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে।[৪৮১]

ফেরাউনের উঁচু প্রাসাদ:

হযরত মুসা আ.'র যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের কোন উত্তর দিতে সক্ষম না হয়ে ফেরাউন বলল- হে আমার পরিষদবর্গ! আমি তো আমাকে ব্যতিত তোমাদের অন্য কোন খোদা দেখছি না। অথচ মুসা বলছে- আমি ব্যতিত আমার এবং তোমাদের নাকি অন্য একজন পালনকর্তা রয়েছে। উপস্থিত লোকদের বোকা বানিয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ফেরাউন তার পরামর্শদাতা উযির হামানকে বলল, হে হামান! তুমি ইট পুরে আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে উঠে আমি মুসার উপাস্যকে দেখতে পারি। বস্তুত আমি তো তাকে মিথ্যাবাদি মনে করি।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ বর্ণিত হয়েছে।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ . وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ .

অর্থ: ফেরাউন বলল, হে পারিষদবর্গ! আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। হে হামান! তুমি ইট পোড়াও, অত:পর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মুসার উপাস্যকে উকি মেরে দেখতে পারি। আমার তো ধারণা এই যে, সে একজন মিথ্যাবাদী। ফেরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না।[৪৮২]

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ . أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ .

অর্থ: ফেরাউন বলল, হে হামান! তুমি আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, হয়তো আমি পৌছে যেতে পারব আকাশের

---

[৪৮১]. সূরা আন্-নাযিআত, আয়াত: ১৫-১৭।
[৪৮২]. সূরা কাসাস, আয়াত: ৩৮-৩৯।

পথে, অত:পর উঁকি মেরে দেখব মুসার আল্লাহকে। বস্তুত: আমি তো তাকে মিত্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে সুশোভিত করা হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে এবং সোজা পথ থেকে তাকে বিরত রাখা হয়েছিল, ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ারই ছিল।[৪৮৩]

ফেরাউন অংহকার ও দাম্ভিকতায় বশীভূত হয়ে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামি সুলভ কাজ করতে বলল। সে তার উযির হামানকে কাঁচা ইট পুরে শক্ত করে গগনচুম্বী সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করতে আদেশ দেয়, যাতে তাতে আরোহন করে মুসা আ.'র খোদাকে দেখতে পায়। ইতিপূর্বে পাকা ইটের প্রচলন ছিলনা। ফেরাউনেই সর্বপ্রথম এটা আবিস্কার করেছে।

ঐতিহাসিক রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে, হামান এই প্রাসাদ নির্মাণের জন্যে পঞ্চাশ হাজার রাজমিস্ত্রি জোগাড় করল। মজুর-কাঠ ও লোহার কাজ যারা করত তাদের সংখ্যা ছিল আরো বেশী। হামান এই বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করল যে, তৎকালে এত উঁচু প্রাসাদ আর ছিল না। পরে আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিব্রাঈল আ. এক আঘাতে একে ত্রিখণ্ডিত করে ভূমিস্যৎ করে দিলেন, ফলে ফেরাউনের সহস্র সিপাহী নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারায়।[৪৮৪]

ফেরাউনের বোকামি:

মানুষ জিদের বশে অনেক সময় হাস্যকর কাজ করে ফেলে। ফেরাউনের বেলায়ও অনুরূপ হয়েছিল। সে মুসা আ.'র উপর রাগ করে তাঁর খোদাকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করল। কারণ সে মনে করেছিল মুসা'র খোদাকে শেষ করতে পারলেই সব শেষ হয়ে যাবে। সে আরো মনে করেছিল খোদা রক্তে-মাংসের তৈরী। তাঁকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করা যাবে। তাই তীর-কামান নিয়ে সে সুউচ্চ প্রাসাদে আরোহন করে উপরে আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করল। আল্লাহ তায়ালা তীরের মাথায় রক্ত লাগিয়ে দেন। রক্ত মাখা তীর ফেরৎ আসলে ফেরাউন খুশীতে আত্মহারা হল। কারণ সে মনে করেছিল এই তীর খোদাকে বিদ্ধ করে ফিরে এসেছে আর মিশরবাসীকে বলতে লাগল দেখ, আমি মুসা'র খোদাকে খতম করে দিয়েছি। সুতরাং এখন আমি ছাড়া আর কোন খোদা অবশিষ্ট নেই।

ফেরাউনের দরবারে মুসা আ.'র মু'জিযা:

হযরত মুসা আ.'র সাথে বিতর্কে পরাজিত হয়ে ফেরাউন ধমকি দিয়ে বলল- হে মুসা! তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে খোদা বলে স্বীকার কর তবে

---

৪৮৩. সূরা মু'মিন, আয়াত: ৩৬-৩৭।

৪৮৪. তাফসীরে কুরতুবী।

আমি তোমাকে বন্দীদের অন্তর্ভূক্ত করে দেবো। মুসা আ. বললেন, যদি আমি তোমার নিকট কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসি? অর্থাৎ যদি আমি আমার স্বপক্ষে কোন মু'জিযা প্রমাণ স্বরূপ তোমার সামনে পেশ করি যা দেখে তোমার সন্দেহ দূরীভূত হবে তবে কি মানবে? ফেরাউন বাধ্য হয়ে বলল, ঠিক আছে, তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ দেখাও।

মুসা আ. সামনে অগ্রসর হয়ে হাত থেকে লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করা মাত্র লাঠি বিরাট এক সাপে পরিণত হল যা দেখে ফেরাউন হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর মুসা আ. স্বীয় হাত বগলে লাগিয়ে বের করলে তা উজ্জ্বল তারকার ন্যায় শুভ্র ও আলোকিত হয়ে গেল।

হযরত মুসা আ.'র এই দুই মু'জিযা দেখে ফেরাউন ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল আর মুসা আ.কে বড় যাদুকর বলে আখ্যায়িত করল। আর বলল, হে মিশরবাসী! মুসা তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছে। সুতরাং তার সম্পর্কে কী করা যায় পরামর্শ দাও। তারা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করল যে, যেহেতু মুসা একজন যাদুকর, তাই দেশের শ্রেষ্ঠ যাদুকরগণকে একত্রিত করে মুসা'র মোকাবেলা করতে হবে। অত:পর মুসা আ.কে বলল, তুমি প্রস্তুত থাক আমাদের যাদুকরদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য। দেখ ভয়ে পলায়ন করবে না। মুসা আ. বললেন, ঠিক আছে- আমি প্রস্তুত আছি তবে এই দিনটি হবে মিশরবাসীদের সবচেয়ে বড় খুশীর দিন যা "ওফাউন্নীল" নামে খ্যাত। এদিন মিশরবাসীরা সবাই একত্রিত হয়ে ঈদ উদযাপন করে। আর সময় নির্ধারণ হল পূর্বাহ্ন। কেউ বলেন, এই দিনটি ছিল ফেরাউন বংশীয়দের একটা ঈদের দিন। সেদিন তারা সাজ-সজ্জার পোশাক পরিধান করে শহরের বাইরে এক জায়গায় সমবেত হত। কেউ বলেন- এটি ছিল নববর্ষের দিন। কেউ বলেন, এটি শনিবার দিন ছিল, যাকে তারা সম্মান করত। আবার কারো মতে এটা আশুরার তথা মুহররমের দশম দিবস ছিল। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে করীমে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ . قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ . قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ .

অর্থ: ফেরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব। মুসা বলল, আমি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আগমন করলেও কি? ফেরাউন বলল, তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর।[৪৮৫]

---

৪৮৫. সূরা শু'আরা, আয়াত: ২৯-৩১।

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ . فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ . وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ . قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ . يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ . قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ . يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ . অর্থ: সে বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থিত কর যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। তখন তিনি নিক্ষেপ করলেন নিজের লাঠিখানা এবং তৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আর বের করলেন নিজের হাত এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। ফেরাউনের সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলতে লাগল, নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ–যাদুকর। সে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদের কি মত? তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন এবং শহরে বন্দরে লোক পাঠিয়ে দিন লোকদের সমবেত করার জন্য– যাতে তারা পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন বিজ্ঞ যাদুকরদের এনে সমবেত করে।[৪৮৬]

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى . فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى . قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى . অর্থ: সে বলল: হে মুসা! তুমি কি যাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্যে আগমন করেছ? অতএব আমরাও তোমার মোকাবেলায় তোমার নিকট অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর, যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না একটি পরিষ্কার প্রান্তরে। মুসা বলল: তোমাদের ওয়াদার দিন উৎসবের দিন এবং পূর্বাহ্নে লোকজন সমবেত হবে।[৪৮৭]

উল্লেখ্য যে, হযরত মুসা আ. দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। ঈদের দিনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই একস্থানে সমবেত হয়। সময় নির্ধারণ করেছেন পূর্বাহ্ন, যা সূর্য বেশ উপরে উঠার পর হয়। তা ছাড়া এ সময় সবাই প্রাথমিক কাজ সমাধা করে ময়দানে উপস্থিত হয়। তা ছাড়া এ সময়টি আলো প্রকাশের উত্তম সময়। সংঘটিত ঘটনা নিজ চোখে ভালভাবে ভ্রমহীনভাবে দেখতে পারে। আর এ সময়ের সমাবেশ থেকে মানুষ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সমাবেশের বিষয়বস্তু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে

৪৮৬. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১০৬-১১২।

৪৮৭. সূরা ত্বোয়া, আয়াত: ৫৭-৫৯।

প্রচারিত হয়। সেদিন ফেরাউনের যাদুকরদের পরাজয় এবং হযরত মুসা আ.'র বিজয় সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র শহরে বরং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌছে যায়।

অত:পর সেই নির্ধারিত দিন এসে গেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেরাউন সহ বড় বড় অসংখ্য যাদুকর ময়দানের একপাশে সারিবদ্ধ হয়ে বড় গর্ব ও অহংকারের সহিত অবস্থান নেয়। হযরত ইবনে আব্বাস রা.'র মতে যাদুকরের সংখ্যা বাহাত্তর জন। তবে এর সংখ্যা চারশ' থেকে নয় লাখ পর্যন্ত উল্লেখ আছে। তারা শামউন নামক জনৈক সরদারের নির্দেশ মতে কাজ করত। কথিত আছে যে, তাদের সরদার ছিল একজন অন্ধ ব্যক্তি।[৪৮৮]

অপরদিকে আল্লাহর দু'জন সত্যের ধারক-বাহক পয়গাম্বর হযরত মুসা ও হযরত হারুন আ. বিনয়ের সহিত দণ্ডায়মান।

ফেরাউনের যাদুকররা ফেরাউনকে বলল– আমরা যদি মুসাকে পরাজিত করি আর আমরা বিজয়ী হই তবে আমাদের পুরস্কার কী? উত্তরে ফেরাউন বলল- তবে তোমরা আমার নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবে। এখানে নির্দিষ্ট কোন পুরস্কারের কথা না বলে নৈকট্য অর্জনের কথা বলার কারণ হল– কোন রাজা-বাদশাহ'র নৈকট্য অর্জন করতে পারলেই বাকী সমস্ত ধন-সম্পদ তার পদচুম্বন করবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে,

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ . قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ . অর্থ: বস্তুত: যাদুকররা এসে ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হল। তারা বলল, আমাদের জন্য কি কোন পারিশ্রমিক নির্ধারিত আছে, যদি আমরা জয়লাভ করি? সে বলল, হ্যাঁ। এবং অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবে।[৪৮৯]

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ . وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ . لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ . فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ . قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ . অর্থ: অত:পর এক নির্দিষ্ট দিনে জাদুকরদেরকে একত্রিত করা হল। এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হল, তোমরাও সমবেত হও, যাতে আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি–যদি তারাই বিজয়ী হয়। যখন জাদুকররা আগমণ করল, তখন ফেরআউনকে বলল,

৪৮৮. কুরতুবী।

৪৮৯. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১১৩-১১৪।

যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আমরা পুরস্কার পাব তো? ফেরাউন বলল, হ্যাঁ এবং তখন তোমরা আমার নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত হবে।[৪৯০]

হযরত মুসা আ. ও যাদুকরদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনা:

অবশেষে ফেরাউনের যাদুকররা হযরত মুসা আ.'র সাথে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হল। তারা যাদু প্রদর্শনের জন্য লাঠি ও দড়ির এক বিরাট স্তুপ সঙ্গে এনেছিল যা তিনশ উটের বোঝাই ছিল।

হযরত মুসা আ. প্রথমে তাদেরকে পয়গাম্বর সুলভ উপদেশ দিলেন। বিশেষ করে যাদুকরদের সর্দারের সাথে আলোচনা করলেন যে, যদি আমি জয়লাভ করি তবে তোমরা ঈমান আনবে কি? সে বলল– আমাদেরকে পরাজিত করার প্রশ্নই উঠেনা। কারণ দেশের সবচেয়ে বড় যাদুকরদের সমেবত করেছি। অগত্যাই যদি তুমি জয়ী হও আর আমরা পরাজিত হই তবে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে সকলের সামনে তোমার প্রতি ঈমান আনবো।

অত:পর যাদুকররা হযরত মুসা আ.কে বলল– হে মুসা! প্রথমে যাদু আপনি প্রদর্শন করবেন না আমরা করবো? এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল- স্বীয় যাদুর প্রতি আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। অর্থাৎ আমরা যেহেতু বিজয়ী হবো সেহেতু আপনি আরম্ভ করুন কিংবা আমরা আরম্ভ করি এতে কিছু যায় আসেনা। আর যখন প্রতিপক্ষকে দূর্বল মনে করে এবং নিজেকে সবল মনে করে তখনই এরূপ উদ্ধতপূর্ণ কথা বলে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন- যাদুকররা হযরত মুসা আ.'র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে এরূপ বলেছিল।

মুসা আ. নিজের মু'জিযা'র উপর পূর্ণ আস্তার দরুন বলেছিলেন- বরং তোমরাই প্রথমে যাদু নিক্ষেপ কর। তখন যাদুকররা তাদের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল, তখন দর্শকদের নজরবন্দি করে দিল। ফলে লাঠি ও দড়িগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে মনে হলো। অসংখ্য সাপের দৌড়া-দৌড়িতে উপস্থিত দর্শকরা ভীত হয়ে পড়ল। এমনকি হযরত মুসা আ.ও সামান্য বিচলিত হয়ে পড়লেন। কারণ তিনি ভাবলেন যাদুকরদের এই ভিল্কীবাজিকে যদি দর্শকরা বাস্তব মনে করে বসে তাহলে তাদের প্রকৃত সত্য বুঝাতে কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে। ওদিকে আল্লাহ বললেন- হে মুসা! তুমি ভয় পেয়োনা। কারণ তুমি জয়ী হবে। তোমার ডান হাতের লাঠিখানা মাটিতে নিক্ষেপ কর। হযরত মুসা আ. আল্লাহর নির্দেশ মতে লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করা মাত্র লাঠি এক বিরাট সাপে রূপান্তরিত হয়ে যাদুকরদের মিথ্যা ও বানোয়াট সাপগুলোকে নিমিষেই খেয়ে ফেলল।

---

[৪৯০]. সূরা শূ'আরা, আয়াত: ৩৮-৪২।

সমগ্র দেশ থেকে নিয়ে আসা সেরা যাদুকররা যখন দেখল যে মুহূর্তের মধ্যেই তাদের সব শক্তি শেষ হয়ে হযরত মুসা আ.'র নিকট পরাজিত হল তখন তারা বুঝতে পারল যে, মুসা আ. কোন যাদুকর নয় বরং তিনি খোদায়ী বলে বলীয়ান এবং আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তাই সকল যাদুকর তাদের নেতার নেতৃত্বে সিজদায় পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। আর তাদের দেখা-দেখিতে ফেরাউন সম্প্রদায়ের ছয় লক্ষ লোক হযরত মুসা আ.'র প্রতি প্রকাশ্যে ঈমান এনেছিল। এতে ফেরাউন বিচলিত হয়ে পড়ল আর অপবাদ মুলকভাবে যাদুকরদেরকে বলল, তোমরা মুসা আ.'র সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে একাজটি করেছ, নিজের দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। তারপর হুমকি দিয়ে বলল- তোমরা আমার অনুমতির পূর্বেই ঈমান এনেছ। এর শাস্তি স্বরূপ আমি তোমাদের হাত-পা বিপরিত দিক থেকে কেটে শূলীতে চড়াবো। কিন্তু ফেরাউনের এই হুমকি-ধমকি কোন কাজে আসল না। কারণ ঈমান ও ইসলামের স্বাদ যে একবার পায় সে ঈমান ও ইসলামের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। যে কোন উৎপীড়ন-নিপীড়ন মাথা পেতে নেয়। যেই যাদুকররা একটু আগেও ফেরাউনকে নিজেদের খোদা বলে মানত এখন তারা ফেরাউনের সামনেই মুসা আ.'র খোদাকে খোদা বলে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করল না। এমনকি ফেরাউনের মারাত্মক হুমকিকে উপেক্ষা করে বলে দিল– হে ফেরাউন! তুমি আমাদেরকে হত্যা করতে পার, তাতে আমাদের কিছু যায়-আসেনা। আমরা আমাদের পালনকর্তার নিকট চলে যাবো। বিস্ময়কর ব্যাপার হল যে, এদেরকে ইসলামের কোন তালিম বা শিক্ষা এখনো দেয়া হয়নি তবু ঈমান আনার সাথে সাথে এতটুকু আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা কিভাবে আসল তাদের মধ্যে? এর উত্তরে বলা যায়- বান্দা যখন খালেস নিয়তে কোন আল্লাহর মকবুল বান্দার নিকট তাওবা করে তখন তার অতীতের সমুদয় পাপ মার্জিত হয়ে যায় এবং সে আল্লাহর অশেষ কৃপায় একজন পরিপূর্ণ মু'মিনের মর্যাদা লাভ করে।

উল্লেখ্য যে, ফেরাউন মুসা আ.'র বিস্ময়কর মু'জিযা দেখে এতই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, সে মুসা আ.কে কোন দোষারোপ না করে বরং নিজের পক্ষের যাদুকরদের ভর্ৎসনা করতে লাগল। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রা. বলেন- হযরত মুসা আ.'র প্রতি ফেরাউনের ভীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, যখনই সে মুসা আ.কে দেখত, তখন অবচেতন অবস্থায় তার পেশাব বেরিয়ে যেতো। ফলে ফেরাউন সম্প্রদায় বলতে বাধ্য হল যে, أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ হে ফেরাউন! আপনি কি মুসা আ. এবং তাঁর সম্প্রদায়কে কোন শাস্তি ছাড়া এমনি ছেড়ে দিবেন, যাতে আপনাকে এবং আপনার

উপাস্যদিগকে পরিত্যাগ করে দেশব্যাপী দাঙ্গা-ফ্যাসাদ করতে থাকবে? ফেরাউন বাধ্য হয়ে তাদের উত্তরে বলল- আমি অচিরেই তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করবো আর নারীদেরকে জীবিত রাখবো। ফলে অল্প দিনের মধ্যে তারা পুরুষহীন হয়ে পড়বে আর নারীরা হবে আমাদের সেবাদাসী। ফেরাউন এই পরিকল্পনা তৈরী করে বনী ইস্রাঈলের উপর আযাব চাপিয়ে দিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনকে ধ্বংস করে তার যুলুম-অত্যাচার থেকে বনী ইস্রাঈলকে রক্ষা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ . قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ . فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ . قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ . وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ . فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ . قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ . قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ .

অর্থ: তারা বলল: হে মুসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি। মুসা বললেন: বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। অত:পর মুসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন। আমি বললাম: ভয় করো না, তুমি বিজয়ী হবে। তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না। অত:পর যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। তারা বলল: আমরা হারুন ও মুসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। ফেরাউন বলল: আমার অনুমতি দানের পূর্বেই তোমরা কি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? দেখছি সেই তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলে চড়াব এবং তোমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পারবে

আমাদের মধ্যে কার আযাব কঠোরতর এবং অধিক স্থায়ী। যাদুকররা বলল: আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অতএব তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে। আমরা আমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি– যাতে তিনি আমাদের পাপ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ, তা মার্জনা করেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।[৪৯১]

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ . فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ . وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ . قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ . يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ . قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ . يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ . وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ . قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ . قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ . قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ . وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ . فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ . وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ . قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ . رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ . قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ . لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ . قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ . وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ . وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ . قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ . قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ . وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ .

অর্থ: সে বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থিত কর যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। তখন তিনি

---

৪৯১. সূরা ত্বোহা-আয়াত: ৬৫-৭৩।

নিক্ষেপ করলেন নিজের লাঠিখানা এবং তৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আর বের করলেন নিজের হাত এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। ফেরাউনের সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলতে লাগল, নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ-যাদুকর। সে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদের কি মত? তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন এবং শহরে বন্দরে লোক পাঠিয়ে দিন লোকদের সমবেত করার জন্য– যাতে তারা পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন বিজ্ঞ যাদুকরদের এনে সমবেত করে। বস্তুত: যাদুকররা এসে ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হল। তারা বলল, আমাদের জন্য কি কোন পারিশ্রমিক নির্ধারিত আছে, যদি আমরা জয়লাভ করি? সে বলল, হ্যাঁ। এবং অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবে। তারা বলল, হে মুসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি। তিনি বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকদের চোখগুলোকে ধাঁধিয়ে দিল, ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহাযাদু প্রদর্শন করল। তারপর আমি ওহীযোগে মুসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল। সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল, এবং যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা বিশ্বের পরওয়ারদেগারের প্রতি। যিনি মুসা ও হারুনের পরওয়াদেগার। ফেরাউন বলল, তোমরা কি (তাহলে) আমার অনুমতি দেয়ার আগেই ঈমান নিয়ে আসলে–এটা যে প্রতারণা, যা তোমরা এ নগরীতে প্রদর্শন করলে। যাতে করে এ শহরের অধিবাসীদিগকে শহর থেকে বের করে দিতে পার। সুতরাং তোমরা শীঘ্রই বুঝতে পারবে। অবশ্যই আমি কেটে দেব তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে। তারপর তোমাদের সবাইকে শূলীতে চড়িয়ে মারব। তারা বলল, আমাদেরকে তো মৃত্যুর পর নিজেদের পরওয়াদেগারের নিকট ফিরে যেতেই হবে। বস্তুত: আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পরওয়াদেগারের নিদর্শন সমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হে আমাদের পরওয়াদেগার! আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দান কর। ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, তুমি কি এমনি ছেড়ে দেবে মুসা ও তার সম্প্রদায়কে। দেশময় হৈ-চৈ করার জন্য এবং তোমাকে ও তোমার দেব-দেবীকে বাতিল করে দেবার জন্য। সে বলল, আমি এখনি হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদিগকে; আর জীবিত রাখব মেয়েদেরকে। বস্তুত: আমরা তাদের উপর প্রবল। মুসা বললেন তাঁর কওমকে,

সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট এবং ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। তারা বলল, আমাদের কষ্ট ছিল তোমার আসার পূর্বে এবং তোমার আসার পরে। তিনি বললেন, তোমাদের পরওয়াদেগার শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর। তারপর আমি পাকড়াও করেছি– ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দূর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[৪৯২]

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ . فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَـٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ . قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَـٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ . قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ . وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ . فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ . فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ . وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ . فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ . وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ . فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

অর্থ: অত:পর তাদের পেছনে পাঠিয়েছি আমি মুসা ও হারুনকে ফেরাউন ও তার সর্দারের প্রতি স্বীয় নির্দেশনাবলী সহকারে। অথচ তারা অহংকার করতে আরম্ভ করেছে। বস্তুত: তারা ছিল গোনাহগার। তারপর আমার পক্ষ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য বিষয় উপস্থিত হল, তখন বলতে লাগলো, এগুলো তো প্রকাশ্য যাদু। মুসা বলল, সত্যের ব্যাপারে একথা বলছ, তা তোমাদের কাছে পৌঁছার পর? এ কি যাদু? অথচ যারা যাদুকর, তারা সফল হতে পারে না। তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদেরকে? আর যাতে তোমরা দুইজন

---

[৪৯২]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১০৬-১৩০।

এদেশের সর্দারী পেয়ে যেতে পার? আমরা তোমাদেরকে কিছুতেই মানব না। আর ফেরাউন বলল, আমার কাছে নিয়ে এস সুদক্ষ যাদুকরদিগকে। তারপর যখন যাদুকররা এল, মুসা তাদেরকে বলল, নিক্ষেপ কর, তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করে থাক। অত:পর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মুসা বলল, যাকিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু, এবার আল্লাহ্ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নি:সন্দেহে আল্লাহ্ দুষ্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না। আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে যদিও পাপীদের তা মন:পুত নয়। আর কেউ ঈমান আনল না মুসার প্রতি তাঁর কওমের কতিপয় বালক ছাড়া, ফেরাউন ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোন বিপদে ফেলে দেয়। ফেরাউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল। আর সে তার হাত ছেড়ে রেখেছিল। আর মুসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাক, তবে তারই উপর ভরসা কর যদি তোমরা ফরমাবরদার হয়ে থাক। তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এ যালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করিও না। আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে ছাড়িয়ে দাও এই কাফেরদের কবল থেকে।[৪৯৩]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ . إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ . فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ . অর্থ: আমি আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মুসাকে প্রেরণ করেছি ফেরাউন, হামান ও কারুনের কাছে। অত:পর তারা বলল, সে তো জাদুকর, মিথ্যাবাদী। অত:পর মুসা যখন আমার কাছ থেকে সত্যসহ তাদের কাছে পৌঁছল; তখন তারা বলল, যারা তার সঙ্গী হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা কর, আর তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ। কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থই হয়েছে।[৪৯৪]

ঈমানদারগণের প্রতি মুসা আ.'র উপদেশবাণী:

হযরত মুসা আ.'র প্রতি যারা ঈমান এনে মুসলমান হয়েছিল তারা ফেরাউনের হুমকি শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা মুসা আ.কে বলতে লাগল- হে মুসা! আপনার উপর ঈমান আনার পূর্বে যেরূপ ফেরাউন কর্তৃক নির্যাতিত ও নিপীড়িত ছিলাম আপনার উপর ঈমান আনার পরও সেই নির্যাতন বহাল রইল। আমাদের মুক্তির কোন উপায় দেখছি না। তখন হযরত মুসা আ.

[৪৯৩]. সূরা ইউনুস, আয়াত: ৭৫-৮৬।

[৪৯৪]. সূরা গাফের, আয়াত: ২৩-২৫।

তাদেরকে ধৈর্য্যধারণ করতে এবং আল্লাহর নিকট সাহার্য্য প্রার্থনা করার উপদেশ দেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে,

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ . قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ . অর্থ: মুসা বললেন তাঁর কওমকে, সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট এবং ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এই পৃথিবী আল্লাহ্‌র। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। তারা বলল, আমাদের কষ্ট ছিল তোমার আসার পূর্বে এবং তোমার আসার পরে। তিনি বললেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর।[৪৯৫]

সাধারণত: কোন জাতির উপর ঈমান আনার পূর্বে আমল আবশ্যক হয়না। ঈমান আমলের পূর্বশর্ত। হযরত মুসা আ.'র প্রতি যারা ঈমান এনেছিল আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সর্বপ্রথম সালাত আদায়ের নির্দেশ দেন। আর সালাত আদায়ের জন্য তাদের ঘরগুলো কিবলামুখী করে নির্মাণ করবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন-

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ . অর্থ: আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মুসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কেবলামুখী করে এবং নামায কায়েম কর আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর।।[৪৯৬]

ফেরাউন কর্তৃক হযরত মুসা আ.কে হত্যার হুমকি:

হযরত মুসা আ.'র মু'জিযা দেখে ফেরাউন ভীত হয়ে মুসা আ. সম্পর্কে কোন কথা বলেনি কেবল বনী ইস্রাঈলকে আযাব দেয়ার হুমকি দিয়েছিল। পরবর্তীতে সে বুঝতে পারল যে, কেবল বনী ইস্রাঈলকে নয় বরং মুল নায়ক মুসা আ.কে শেষ করে দিতে হবে। তবেই সমস্যার সমাধান হবে। তাই একদা ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে ডেকে বলল, আমার ভয় হয় যে, একদিন মুসা আ.

[৪৯৫]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১২৮-১২৯।

[৪৯৬]. সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮৭।

তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করে সমগ্র দেশে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে। সুতরাং আমি তাঁকে হত্যা করবো।

উক্ত মজলিসে ফেরাউন বংশের একজন মু'মিন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যে নিজের ঈমান গোপন রেখেছিলেন। তিনি তার সম্প্রদায়কে একাজ থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। তিনি অতীতে সংঘটিত অনেক উদাহরণ তাদের সামনে তুলে ধরলেন। কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা এবং পরকালের শাস্তির কথা উল্লেখ করেন। ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গ যখন এই মর্দে মু'মিনের কথা শুনল তখন তারা প্রথমে তাঁকেই হত্যা করার পরিকল্পনা করল। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ . يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ . وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ . مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ . وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ . يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ . الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ .

অর্থ: ফেরাউন গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখত, সে বলল, তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ্, অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট আগমন করেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যাবাদিতা তার উপরই চাপবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তির কথা বলছে, তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর পড়বেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীকে পথপ্রদর্শন করেন না। হে আমার কওম! আজ এদেশে তোমাদেরই রাজত্ব, দেশময় তোমরাই বিচরণ করছ; কিন্তু আমাদের আল্লাহর শাস্তি এসে গেলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল, আমি যা বুঝি,

তোমাদেরকে তাই বোঝাই, আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই। সে মুমিন ব্যক্তি বলল: হে আমার কওম! আমি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মতই বিপদসঙ্কুল দিনের আশংকা করি। যেমন, কওমে নূহ, আদ, সামুদ ও তাদের পরবর্তীদের অবস্থা হয়েছিল। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করার ইচ্ছা করেন না। হে আমার কওম! আমি তোমাদের জন্যে প্রচণ্ড হাঁক-ডাকের দিনের আশংকা করি, যেদিন তোমরা পেছনে ফিরে পলায়ন করবে; কিন্তু আল্লাহ থেকে তোমাদেরকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, অত:পর তোমরা তার আনীত বিষয়ে সন্দেহই পোষণ করতে। অবশেষে যখন সে মারা গেল, তখন তোমরা বলতে শুরু করলে, আল্লাহ্ ইউসুফের পরে আর কাউকে রসূলরূপে পাঠাবেন না এমনিভাবে আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী, সংশয়ী ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করেন। যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের একাজ আল্লাহ্ ও মু'মিনদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক। এমনিভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক অহংকারী-স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর এঁটে দেন।[৪৯৭]

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ . يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ . مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ . وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ . تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ . لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ . فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ . فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ .

অর্থ: মু'মিন লোকটি বলল: হে আমার কওম, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করব। হে আমার কওম, পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ। যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে পুরুষ অথবা নারী মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিযিক দেয়া হবে। হে আমার কওম!

[৪৯৭]. সূরা মু'মিন, আয়াত: ২৮-৩৫।

ব্যাপার কি, আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও জাহান্নামের দিকে তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও, যাতে আমি আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে শরীক করি এমন বস্তুকে, যার কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে। এতে সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে যার দিকে দাওয়াত দাও, ইহকালে ও পরকালে তার কোন দাওয়াত নেই। আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌র দিকে এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামী। আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে রয়েছে। অত:পর আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল।[৪৯৮]

ফেরাউনের খোদা দাবী:

বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায় যদিও নবী হযরত ইয়াকুব আ.'র বংশধর এবং অনেক নবী-রাসূলের ধারক-বাহক তবুও তাদের চরিত্রে ধৈর্য্য, দৃঢ়তা ও স্থিরতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফেরাউন সেই সুযোগকে কাজে লাগায়। সে তাদেরকে নিজের ক্ষমতা ও শক্তির কথা উল্লেখ করে বলল, আমি কি মিশরের রাজাধিরাজ নই, আমার অধিনে কি এই নদীগুলো প্রবাহিত হয়না? আমিই তো শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি থেকে, যে নিজের কথাগুলোও স্পষ্ট করে বলতে পারে না। তার এসব কথায় বনী ইস্রাঈল ধীরে ধীরে পুনরায় তার প্রতি অনুগত হতে লাগল। অবশেষে তার দাম্ভিকতা বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে সে বলল, انا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى আমিই তোমাদের প্রধান প্রতিপালক। অর্থাৎ সে নিজেকে প্রধান খোদা দাবী করে বসল যা প্রকাশ্য শিরক ও মার্জনাহীন সবচেয়ে বড় মহাপাপ। মূলত হযরত মুসা আ.'র সাথে তার বিরোধের প্রধান কারণ হল তিনি তাকে পালনকর্তা মানতেন না।

কিবত্তিদের উপর আযাব:

হযরত মুসা আ. ফেরাউন, ফেরাউনের পরিষদবর্গ ও কিবতিদের প্রতি উপদেশ দেয়ার সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকার আযাব আসার কথা বলেছিলেন। তারা একথা বিশ্বাস করত না বরং ঠাট্টা-বিদ্রোপ করত। আর মুসা আ.'র উসিলায় যখন কোন কল্যাণ লাভ করত তখন বলত 'এটা আমাদের প্রাপ্য', আবার নিজেদের কৃতকর্মের জন্য কোন অকল্যাণ আসলে বলত 'এটা মুসা ও তাঁর সঙ্গীদের কারণে এসেছে'। এভাবে তাদের অত্যাচার, নির্যাতন ও

[৪৯৮]. সূরা মু'মিন, আয়াত: ৩৮-৪৫।

বিদ্রোপের সীমা যখন অতিক্রম করল তখন মুসা আ. তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুত আযাব নাযিলের বদদোয়া করলেন আর আল্লাহ্‌ তাদের উপর একের পর এক বিভিন্ন প্রকারের আযাব দিতে লাগলেন।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَـٰذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. অর্থ: তারপর আমি পাকড়াও করেছি–ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। অত:পর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে যে, এটাই আমাদের জন্য উপযোগী। আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয় তবে তাতে মুসার এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। শুনে রাখ তাদের অলক্ষণ যে, আল্লাহ্‌রই এলেমে রয়েছে, অথচ এরা জানে না। তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের উপর জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনছি না। সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা গর্ব করতে থাকল। বস্তুত: তারা ছিল অপরাধপ্রবণ।[৪৯৯]

হযরত মুসা আ. মিশরে দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেন। এ সময় আল্লাহ তায়ালা নয়টি মু'জিযা মুসা আ.কে দান করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল একদিকে মুসা আ.'র কথার সত্যতা প্রমাণ অপরদিকে ফেরাউন সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্য পথে আনা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَـٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. অর্থ: আপনি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, আমি মুসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দান করেছি। যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, ফেরাউন তাকে বলল:

[৪৯৯]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৩০-১৩৩।

হে মুসা! আমার ধারণায় তুমি তো জাদুগ্রস্ত। তিনি বললেন: তুমি জান যে, আসমান ও যমীনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফেরাউন! আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছ।[৫০০]

ফেরাউন সম্প্রদায় এতই অবাধ্য জাতি ছিল যে, আল্লাহর আযাব নেমে আসলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সাধু সেজে মুসা আ.'র নিকট দোয়া'র জন্যে চলে আসত আর কাকুতিমিনতি করে তাওবা করার শর্তে মুসা আ.'র দোয়ার উসিলায় নিজেদেরকে আযাব মুক্ত করে নিত। আর যখনি আযাব চলে যেতো তারা পুনরায় কুফুরী ও অবাধ্যতার দিকে ফিরে যেতো। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা পর্যায়ক্রমে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের আযাব অবতরণ করেন।

এই নয়টি মু'জিযা'র মধ্যে দু'টির কথা প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে। একটি লাঠি মোবারক আর দ্বিতীয়টি হল হাতের শুভ্রতা। এ দু'টি মুসা আ. ফেরাউনের দরবারে যাদুকরদের বিরুদ্ধে প্রকাশ করে তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন। তৃতীয়টি হল দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি। এই আযাবের ফলে গ্রাম্য লোকদের ক্ষেত খামারগুলোর ফসল এবং শহুরে লোকদের বাগানগুলোর উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ফলে তারা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মুসা আ.'র মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তিলাভের দোয়া করায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে পুনরায় নিজেদের ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হয় এবং বলতে থাকে 'এই দুর্ভিক্ষ তো মুসা আ. ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের অলক্ষণের কারণেই আপতিত হয়েছিল। চতুর্থ থেকে অষ্টম পর্যন্ত পাঁচটি মু'জিযা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে– فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ অর্থাৎ অত:পর আমি প্রেরণ করেছি তাদের উপর প্লাবন, পঙ্গপাল, ঘূণ পোকা কিংবা উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত।[৫০১]

ইবনে মুনযির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উপরোক্ত প্রতিটি আযাব ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর সাতদিন করে স্থায়ী হয়। শনিবার দিন শুরু হয়ে দ্বিতীয় শনিবারে রহিত হয়ে যেতো এবং পরবর্তী আযাব আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহের অবকাশ দেয়া হতো। এভাবে এক মাসে একটি আযাবের সম্মুখীন হতো।

চতুর্থটি হল তুফান। পানির তুফান তথা জ্বলোচ্ছ্বাস। আল্লাহ্ এমন বৃষ্টি দিলেন যে, ফেরাউনীদের ঘরে পানি গলায় গলায় হয়েছে। যারা বসছিল তারা ডুবে গেল,

[৫০০]. সূরা বনী ইস্রাঈল, আয়াত: ১০১–১০২।

[৫০১]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৩৩।

যারা দাঁড়ানো ছিল তাদের গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেল। না আছে তাদের কোথাও শোয়া-বসার জায়গা আর না আছে জমিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা। আশ্চর্যের বিষয় হল ফেরাউনীদের বাড়ী-ঘর ও জমি-জমা ছিল বনী ইস্রাঈলদের পাশাপাশি। অথচ তাদের বাড়ী-ঘর ও জমি-জমা ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ ও পানিমুক্ত। পক্ষান্তরে ফেরাউনীদের বাড়ী-ঘর ও জমি-জমা ছিল অথৈ পানির নীচে।

এই জ্বলোচ্ছ্বাসে ভীত হয়ে ফেরাউন সম্প্রদায় হযরত মুসা আ.'র নিকট এসে প্রার্থনা করল যে, আপনার পালনকর্তার নিকট দোয়া করুন যাতে এ আযাব রহিত হয়ে যায়, তবে আমরা ঈমান আনবো এবং বনী ইস্রাঈলদেরকে মুক্ত করে দেবো। মুসা আ. দোয়া করলে জ্বলোচ্ছ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। তারপর তাদের শস্য-ফসল ও ক্ষেত-খামার পুনরায় অধিকতর সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠল। তখন তারা বলতে লাগল যে, মূলত এই তুফান ও জ্বলোচ্ছ্বাস কোন আযাব-গজব ছিলনা, বরং আমাদের কল্যাণের জন্যেই এসেছিল। যার ফলে আমাদের জমির উর্বরতা বেড়ে গেল এবং শস্য ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল। এসব অকৃতজ্ঞ মূলক কথাবার্তা বলে মুসা আ.'র সাথে কৃত প্রতিজ্ঞার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে আরম্ভ করল।

এভাবে প্রায় এক মাস যাবৎ আযাব মুক্ত অবস্থায় সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। এ সময়টি আল্লাহ তাদের চিন্তা-ভাবনার অবকাশ দান করলেন যাতে মুসা আ.'র সত্যতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হল না বরং উদ্ধত্যপূর্ণ স্বভাব বৃদ্ধি পেল। তখন পঞ্চম আযাব পঙ্গপাল তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হল। এই পঙ্গপাল তথা ফড়িং দল তাদের সমস্ত শস্য, ফসল ও বাগানের ফল-ফলারী, মাল-সামগ্রী এমনকি কাঠের দরজা-জানালা, ছাদ, পেরেক প্রভৃতিসহ ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। এই আযাবও কেবল কিবতীদের ক্ষেত-খামারে ও ঘর-বাড়ীতে ছেয়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি ইস্রাঈলীদের ঘর-বাড়ী, শস্য ভূমি ও বাগ-বাগিচা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ছিল। এবারও তারা হযরত মুসা আ.'র দরবারে এসে ঈমান গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করল এবং দোয়া করে আযাব মুক্ত করার আবেদন করল। মুসা আ.'র দোয়ার উসিলায় আল্লাহ তায়ালা এক সপ্তাহ পর আযাব তুলে নিলেন। আযাব তুলে নেয়ার পর একমাস আরামে কাটল কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না। এরপর তাদের উপর ষষ্ঠ আযাব স্বরূপ ঘূণ পোকা কিংবা উকুন'র শাস্তি আসল। এই কীটগুলো ফেরাউনীদের খাদ্য শস্য এমনকি তাদের শরীর পর্যন্ত চেটে খেতে লাগল।

এই ঘূণ পোকার কারণে দশ বস্তা গম চাক্কিতে পেষণের জন্য নিয়ে গেলে তিন সের আটাও হত না, আর উকুন তাদের চুল–ভ্রূ পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল।

পরিশেষে আবার ফেরাউন সম্প্রদায় কাঁদতে কাঁদতে হযরত মুসা আ.'র দরবারে এসে ফরিয়াদ করল- এবার আর ওয়াদা ভঙ্গ করবো না, আপনি দোয়া করুন। হযরত মুসা আ.'র দোয়ায় এবারও আযাব চলে গেল। কিন্তু যাদের ভাগ্যে ধ্বংসই অনিবার্য তাদের সংশোধনের আশা দূরাশা মাত্র। আযাব থেকে অব্যাহতি পাওয়া মাত্র সব প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল এবং অস্বীকার করে বসল।

তারপর আযাব মুক্ত অবস্থায় একমাস অবকাশ যাপন করল। যখন এই অবকাশেরও কোন সুযোগ নিল না, তখন সপ্তম আযাব হিসাবে ব্যাঙের উপদ্রব আরম্ভ হল। এত অধিক সংখ্যক ব্যাঙ জন্মাল যে, যেখানেই ফেরাউনী বসত সেখানেই ব্যাঙ এসে ভরে যেতো। ব্যাঙের স্তূপ তাদের গলা পরিমাণ হয়ে যেতো। শুইতে গেলে ব্যাঙের স্তূপের নীচে তলিয়ে যেতে হতো, পাশ ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়তো। খানার মধ্যে, পানির মধ্যে, রান্নার হাড়ির মধ্যে, চুলার মধ্যে, চাক্কির মধ্যে, আটা-চালের মটকার মধ্যে ব্যাঙে ভরে যেতো। এই আযাবও এক সপ্তাহ ছিল। অবশেষে সবাই বিলাপ করতে করতে মুসা আ.'র নিকট এসে দোয়া করার আবেদন জানাল। তাঁর দোয়ায় এই আযাব থেকেও তারা মুক্তি পেল। এবারও ব্যতিক্রম হলো না পূর্বের ন্যায় আযাব মুক্ত হওয়ার পর তাদের হঠকারিতা আরো বেড়ে গেল। তারা বলতে লাগল- এবার আমরা নিশ্চিত হলাম যে, মুসা একজন দক্ষ মহা যাদুকর, আর এসবই তাঁর যাদুর কীর্তি-কাণ্ড।

অত:পর তারা একমাস যাবৎ আযাব মুক্ত থাকল কিন্তু তারা এরও কোন সুযোগ নিয়ে তাওবা করলনা তখন এলো অষ্টম আযাব "রক্ত", তাদের সমস্ত পানাহারের বস্তু রক্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কূপের মধ্যে, ঝরণার মধ্যে, তরকারী-রুটি সব কিছুর মধ্যে তাজা রক্তে ভরে গেল। এ আযাব থেকেও ইস্রাঈলীরা ছিল মুক্ত। তাই ফেরাউন নির্দেশ দিল কিবতীরা যেন ইস্রাঈলীদের সাথে এক দস্তরখানায় বা একপাত্রে খায়। তাতেও কোন ফল হলনা। একি পাত্র থেকে লোকমা কিবতীর হাতে গেলে তা রক্তে রূপান্তরিত হয়ে যেতো। ইস্রাঈলী পাত্র থেকে পানি কিবতীর পাত্রে ঢালতেই তা রক্ত হয়ে যেতো। নিরূপায় হয়ে কিবতীরা ইস্রাঈলীদের মুখ থেকে তাদের মুখে কুলি নিক্ষেপ করাল। তখন ইস্রাঈলীদের মুখের পানি কিবতীদের মুখে গেলে তা রক্ত হয়ে যেতো। এই আযাবও পূর্বের ন্যায় সাতদিন ছিল। অত:পর তারা আবারো হযরত মুসা আ.'র দরবারে এসে কান্না-কাটি করে বিনীত ভাবে ফরিয়াদ করল এবং অধিকতর মজবুতভাবে প্রতিজ্ঞা করল। মুসা আ.'র দোয়ার ফলে এবারও আযাব দূরীভূত হলো কিন্তু হতভাগা জাতি গোমরাহীতে স্থীর রইল। এই অবশেষে নবম আযাব হিসাবে "প্লেগ রোগ" এ আক্রান্ত হল কিবতীরা। এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে সত্তর হাজার কিবতীর মৃত্যু ঘটেছিল। তখন তারা আবারো

হযরত মুসা আ.'র নিকট দোয়া করার নিবেদন করলে তিনি দোয়া করেন। আর তাঁর দোয়ার উসিলায় এ আযাব থেকেও মুক্তি পেল। কিন্তু তারা যথারীতি ওয়াদা ভঙ্গ করে। ক্রমাগত এতবার পরীক্ষা ও অবকাশ দেয়ার পরও যখন তারা সংশোধন হয়নি তখন নিজেদের বসত-ভিটা, জমি-জমা, বাড়ী-ঘর, আসবাবপত্র সব কিছু ছেড়ে হযরত মুসা আ. ও ইস্রাঈলীদের ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আযাবে পতিত হয়ে সমস্ত গর্ব-অহংকার বিলীন হয়ে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিল।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ . فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ . فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ . অর্থ: আর তাদের উপর যখন কোন আযাব পড়ে তখন বলে, হে মুসা! আমাদের জন্য তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট সে বিষয়ে দোয়া কর যা তিনি তোমার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এ আযাব সরিয়ে দাও, তবে অবশ্যই আমরা ঈমান আনব তোমার উপর এবং তোমার সাথে বনী–ইসরাঈলদেরকে যেতে দেব। অত:পর যখন আমি তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত- যেখান পর্যন্ত তাদেরকে পৌছানো উদ্দেশ্য ছিল, তখন তড়িঘড়ি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। সুতরাং আমি তাদের কাছ থেকে বদলা নিয়ে নিলাম–বস্তুত: তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং তৎপ্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল।[৫০২]

ইস্রাঈলীদের নিয়ে মুসা আ.'র মিশর ত্যাগ:

হযরত মুসা আ. মিশরে চল্লিশ বছর যাবৎ ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে হেদায়ত করার চেষ্টা চালায়। এ সময় অনেক বিস্ময়কর মু'জিযা প্রদর্শন করেন যেন তারা ঈমান আনে। কিন্তু তাতে কোন সুফল আসলনা। অবশেষে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন- "হে আল্লাহ্! যে কোন উপায়ে আপনি কিবতীদের হাত থেকে বনী ইস্রাঈলকে রক্ষা করুন যাতে তারা নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে আপনার ইবাদত করতে পারে। আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করলেন আর নির্দেশ দিলেন- হে মুসা! আপনি বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে রাতেই যাত্রা শুরু

[৫০২]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৩৪-১৩৬।

করুন। ফেরাউন যদি আপনার পিছু নেয় তবে তাকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। তখন তিনি গোপনে ইস্রাঈলদের খবর দিলেন এবং তারা একত্রিত হতে শুরু করল। ফেরাউনের সন্দেহ হলে জিজ্ঞাসা করল- এই সমাবেশের কারণ কি? ইস্রাঈলীরা উত্তরে বলল- আমাদের মহররমের উৎসবের দিন আসন্ন। এইদিন হযরত আদম আ. জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এটি আমাদের ঈদের দিন। আমরা চাই যে, শহরের বাইরে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবো এবং সেখানে ঈদ উদযাপন করবো। ফেরাউন শান্ত হয়ে বাধাদান থেকে বিরত রইল। উৎসব পালনার্থে ইস্রাঈলীরা কিবতীদের থেকে মূল্যবান গয়না ও উন্নত পোশাক ধার নিয়ে শহরের বাইরে গিয়ে তাবু স্থাপন করল মহররমের নয় তারিখ বৃহস্পতিবারে। এ সময় হযরত মুসা আ.'র বয়স হয়েছিল আশি বছর আর হযরত হারুন আ.'র বয়স হয়েছিল তিরাশি বছর। পরের দিন সকাল হওয়ার পূর্বেই তারা সমস্ত মাল-পত্র নিয়ে মিশর ত্যাগের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হারুন আ. ছিলেন কাফেলার সামনে আর হযরত মুসা আ. ছিলেন পেছনে। বনী ইস্রাঈলের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ সত্তর হাজার। এই সত্যের পথে যাত্রা মযলুম কাফেলা কিছুদূর যাওয়ার পর পথ ভুলে গেল।[৫০৩]

হযরত ইউসুফ আ.'র লাশ মোবারকঃ

মিশর ত্যাগকারী কাফেলা আল্লাহর ইচ্ছায় রাস্তা ভুলে গেলে মুসা আ. বয়স্ক লোকদেরকে বললেন- তোমরা অভিজ্ঞ লোক, এই পথ তোমাদের অনেকদিনের পরিচিত তবুও তোমরা পথের সন্ধান খুঁজে পাচ্ছনা কেন? তারা আরজ করল- হযরত ইউসুফ আ. মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করেছিলেন যে, যখন আমার জাতি বনী ইস্রাঈল মিশর থেকে এই জনপদ দিয়ে যাবে, তখন আমার 'তাবুত' কবর থেকে বের করে যেন সঙ্গে নিয়ে যায় আর আমার পূর্ববর্তী বুযুর্গদের কবরস্থানে আমাকে দাফন করে। আমরা সেই অসিয়ত পূর্ণ করিনি। একারণেই আমরা পথ ভুলে গিয়েছি। মুসা আ. জানতে চাইলেন তার কবর কোথায়? তারা বলল, আমাদের জানা নেই। তখন তিনি ঘোষণা দিলেন যে, কাফেলার মধ্যে যে ইউসুফ আ.'র কবর সম্পর্কে জ্ঞাত সে যেন তা আমাকে সংবাদ দেয়। এক বৃদ্ধা মহিলা বলল, আমি জানি তবে যদি আপনি ওয়াদা করেন যে আমি যা চাইবো তা পাবো তবে আমি সন্ধান দেবো। মুসা আ. চিন্তিত হলেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসল যে, হে মুসা! আপনি ওয়াদা করুন, বৃদ্ধা যা চাইবে তা তাকে দিন। তিনি বৃদ্ধার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হলেন। বৃদ্ধা বলল, আমি চাই যে, জান্নাতে আমি আপনার সাথে থাকতে। তিনি তা কবুল করলেন। তখন বৃদ্ধা বলল,

[৫০৩]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৩৫৪।

ইউসুফ আ.'র কবর শরীফ নীল নদে ডুবে গিয়েছে। যদি নদীর অমুক স্থান থেকে পানি সরিয়ে মাটি খনন করা হয় তবে ওখান থেকে ইউসুফ আ.'র সিন্দুক বের করা সম্ভব হবে। বৃদ্ধার কথা মতে মুসা আ. বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে ঐ স্থান থেকে সিন্দুক বের করলেন। এটি মরমর পাথরের তৈরী সিন্দুক ছিল যার ভিতর হযরত ইউসুফ আ.'র লাশ মোবারক রক্ষিত ছিল। মুসা আ. ইউসুফ আ.'র লাশ রক্ষিত সিন্দুক কাফেলার সম্মুখে রাখলে এর বরকতে পথের সন্ধান পাওয়া গেল এবং আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে অল্প সময়ে বহুদূর পথ অতিক্রম করল।

মিশর থেকে ফিলিস্তিন যাওয়ার দু'টি পথ আছে। একটি স্থলপথ আরেকটি জলপথ। স্থলপথ যদিও সহজ ও কাছের কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় মুসা আ. জলপথ অবলম্বন করলেন। আর এই জলপথ হল 'বাহরে কুলযুম' তথা লোহিত সাগর। মুসা আ. কাফেলা নিয়ে কুলযুম নদীর তীরে মহররমের দশ তারিখ সকালবেলা মনযিল করলেন।

ওদিকে ফেরাউনের গুপ্তচররা সকালে তাকে সংবাদ দিল যে, ইস্রাঈলীরা গতকাল যেখানে সমাবেশ করেছিল, সেখান থেকে রাতেই চলে গিয়াছে। এই সংবাদ শুনে ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে তৎক্ষণাৎ আদেশ দিল যে, উন্নত ও দ্রুতগামী ঘোড়া এবং শ্রেষ্ঠ আরোহীদের নিয়ে বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে ইস্রাঈলীদের পশ্চাদাবলম্বন করার। আদেশ মতে এমন এক বিশাল বাহিনী পিছু নিল যাদের কেবল সম্মুখ ভাগে ছিল সত্তর হাজার ঘোড়া সাওয়ার তথা আরোহী যোদ্ধা। তাফসীরে রূহুল বয়ানের মতে সত্তর লক্ষ ঘোড়া সাওয়ার ছিল। তাফসীরে আযিযীর মতানুযায়ী এই সৈন্য বাহিনীর মধ্যে একলক্ষ তীরান্দায, একলক্ষ নীযেবায এবং একলক্ষ গুরুযবায ছিল। সাথে ফেরাউনও ছিল। তারা অতি দ্রুত ইস্রাঈলীদের অবস্থান স্থলে পৌঁছে গেল। ইস্রাঈলীরা পেছন দিকে ফেরাউন বাহিনীকে দেখে ভীত হয়ে পড়ল আর বলল- হে মুসা! এখন আমাদের কী হবে? মিশরে কি কবরস্থানের অভাব ছিল আমাদের মারার জন্য এই অনাবাদী স্থানে নিয়ে এসেছ? আমরা তোমাকে বলেছিলাম আমাদেরকে মিশর থেকে বের করোনা। আমরা ফেরাউনীদের গোলামী করবো। এই জঙ্গলে মরার চেয়ে মিশরে কিবতীদের গোলামী করাই মঙ্গল ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইস্রাঈলীরা অস্থির প্রকৃতির লোক ছিল। ধৈর্য্য-সহ্য বলতে তাদের মোটেই ছিলনা।

তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হযরত মুসা আ. তাদের সান্ত্বনা ও সাহস দেয়ার চেষ্টা করেন। তিনি বললেন, তোমরা নৈরাশ হইও না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই মুক্তি দেবেন এবং তোমরাই সফল হবে। অত:পর হযরত মুসা আ. আল্লাহর দরবারে দোয়া

করলেন। ওহী আসলো হে মুসা! আপনি নদীতে আপনার লাঠি দ্বারা আঘাত করুন। এতে নদী ফেটে দ্'ভাগ হয়ে আপনাকে রাস্তা করে দেবে। আদেশ মত্তে তিনি কুলযুম নদীতে স্বীয় লাঠি দ্বারা আঘাত করা মাত্র নদীর পানি ফেটে দু'ভাগ হয়ে পাহাড়ের মত জমে স্থীর হয়ে বারটি রাস্তা হয়ে গেল। প্রচণ্ড বাতাসে রাস্তা শুকিয়ে গেল এবং মুসা আ.'র নির্দেশে ইস্রাঈলী বার সম্প্রদায় বারটি রাস্তা ধরে নেমে যাত্রা শুরু করল। প্রথমে হযরত ইউশা আ. নিজের ঘোড়া নিয়ে অবতরণ করলেন। তারপর হযরত হারুন আ. ইস্রাঈলীদের নিয়ে অবতরণ করেন এবং সর্বশেষে ছিলেন হযরত মুসা আ.।

ইস্রাঈলীরা নদী পথে কিছু দূর যাওয়ার পর এক পথের পথিকরা বলতে লাগল- হে মুসা! আমরা তো নিরাপদে পার হয়ে যাচ্ছি, তবে আমাদের অন্য পথের পথিকদের কি অবস্থা আমরা জানিনা, তারা কোন ডুবে যাচ্ছে কিনা? তখন মুসা আ. পানির দেয়ালে লাঠি দ্বারা আঘাত করলে পানির দেয়াল জালি বা আয়নার মত হয়ে গেল। ফলে এক পথের পথিক অপর পথের পথিকদের দেখতে লাগল আর কথা বলতে বলতে কুলযুম নদী পার হয়ে গেল।[৫০৪]

ফেরাউনের ধ্বংসের ঘটনাঃ

হযরত মুসা আ. ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসা আ.'র মু'জিযার উসিলায় নদী পার হয়ে গেল, তাদের সাওয়ারীদের পায়ে পানি পর্যন্ত লাগেনি। তাদেরকে ধরে নিতে ইত্যবসরে ফেরাউন বাহিনী নদীর তীরে পৌছে গেল। ফেরাউন দেখল যে, নদীতে রাস্তা এবং পানি স্বস্থানে দেয়ালের ন্যায় দণ্ডায়মান। তা দেখে ফেরাউন হতভম্ব হয়ে পড়ল কিন্তু সৈন্যদেরকে বলল- আমার আগমণে নদীতে রাস্তা হল, যাতে পলায়নকারী গোলামদেরকে জীবিত বন্দী করতে পারি। যদি এই ইস্রাঈলী নদীতে ডুবে মরে যেতো তাহলে আমরা গোলাম কোথায় পেতাম? তবে বিচক্ষণ উযির হামান এসে ফেরাউনের কানে কানে বলল- নদীতে পা রাখবেন না অন্যথায় খোদায়ী কৌশল বুঝতে পারবেন। দ্রুত নৌকা-কিশ্তির ব্যবস্থা করে নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করুন। হামানের কথা শুনে ফেরাউন ঘোড়া থামিয়ে নিল। এ সময় হযরত জিব্রাঈল আ. মানুষের বেশে একটি ঘোড়ির উপর আরোহী হয়ে ফেরাউনের ঘোড়ার সামনে দিয়ে নদীতে নেমে পড়লেন। ফেরাউনের ঘোড়া ঘোড়ির গন্ধ পেয়ে ফেরাউনের শত বাধা সত্ত্বেও নদীতে নেমে পড়ল। সৈন্যরা যখন দেখল যে, ফেরাউন নদীতে নেমে পড়ল তখন তারাও সম্মিলিতভাবে নদীতে নেমে পড়ে। এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন

৫০৪. মুফতি আহমদ ইয়ারখান নঈমী র., ১৩৯১ হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-১ম, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬।

যে, বনী ইস্রাঈলের সামেরী নামক এক বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিল। সে দেখল যে, জিব্রাঈল আ.'র ঘোড়ির পা বালুচরের যেখানে পড়ছে সেখানে সবুজ ঘাস উৎপন্ন হচ্ছে। সে বুঝল যে, এই কদমের নীচের মাটির মধ্যে জীবন দানের ক্ষমতা রয়েছে। তাই সে কিছু মাটি নিয়ে নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রেখেছে।

এভাবে যখন সকল ফেরাউনী সৈন্য নদীর মধ্যখানে এসে পৌছল তখন নদীর প্রতি আল্লাহর হুকুম হল যেন পানি মিলে যায়। সাথে সাথে দাঁড়িয়ে থাকা পানি মিলে গেল, ফলে ফেরাউন সহ সবাই ডুবে মরল। ফেরাউন যখন ডুবতে লাগল আর মরণ নিশ্চিত বুঝতে পারল তখন সে চিৎকার করে বলে উঠল "আমি একক আল্লাহর উপর ঈমান আনতেছি যার উপর বনী ইস্রাঈল ঈমান এনেছিল। কিন্তু তখন তার ঈমান ও তাওবা কবুলের সময় অতিক্রম হয়ে গিয়েছে। ফলে তা প্রত্যাখ্যান হয়েছিল। বরং উত্তরে বলা হয়েছিল- فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً আজকে আমি তোমার শরীরকে সুরক্ষিত রেখে নিদর্শন বানিয়ে রাখবো ওদের জন্য যারা তোমার পরবর্তীতে আসবে। আর এই ধ্বংসের ঘটনা ইস্রাঈলীরা নদীর অপর পাড় থেকে স্বচক্ষে অবলোকন করছে। এই দিনটি ছিল মহররমের দশ তারিখ শুক্রবার দুপুরের সময়। ঐদিন মুসা আ. শোকরিয়া স্বরূপ রোযা রেখেছিলেন। বনী ইস্রাঈল ফেরাউনের ধ্বংসের ঘটনা নিজ চোখে দেখার পরও বিশ্বাস করতে পারছে না। কারণ এমন শক্তিধর বাদশা এভাবে ধ্বংস হওয়া তাদের নিকট অবিশ্বাস্য ছিল। তাই ফেরাউনের এবং আরো কতিপয় লোকের লাশকে নদী প্রকাশ করে দিল। তাদের লাশ দেখে ইস্রাঈলীরা নিশ্চিত হল যে, আসলে ফেরাউন ধ্বংস হয়েছে। ফেরাউন যেমনি ইস্রাঈলীদের পুরুষদের হত্যা করতো আর নারীদের জীবিত রাখতো তেমনি আল্লাহ তায়ালাও ফেরাউনী পুরুষদেরকে নদীতে নিমজ্জিত করেছেন কিন্তু তাদের বাড়ী-ঘর, বাগ-বাগিচা এবং তাদের নারী-শিশুরা নিরাপদ ছিল মিশরে।[৫০৫]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে–

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ . فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ . وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ . অর্থ: আমি মুসার প্রতি এই মর্মে ওহী করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্যে সমুদ্রে শুষ্কপথ

৫০৫. মুফতি আহমদ ইয়ারখান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭।

নির্মাণ কর। পেছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয় করো না। অত:পর ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল। ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছিল এবং সৎপথ দেখায়নি।[৫০৬]

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ . فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ . إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ . وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ . وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ . فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ . وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ . كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ . فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ . فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ . قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ . فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ . وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ . وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ . ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ . وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ .

অর্থ: আমি মুসাকে আদেশ করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও; নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। অত:পর ফেরাউন শহরে শহরে সংগ্রাহকদেরকে প্রেরণ করল, নিশ্চয় এরা (বনী–ইসরাঈলরা) ক্ষুদ্র একটি দল। এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। এবং আমরা সবাই সদা শংকিত। অত:পর আমি ফেরআউনের দলকে তাদের বাগ–বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহ থেকে বহিস্কার করলাম এবং ধন-ভাণ্ডার ও মনোরম স্থান সমূহ থেকে। এরূপই হয়েছিল এবং বনী ইসরাঈলকে করে দিলাম এসবের মালিক। অত:পর সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মুসার সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম। মুসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। অত:পর আমি মুসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। আমি সেথায় অপর দলকে পৌছিয়ে দিলাম। এবং মুসা ও তাঁর সংগীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। অত:পর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম। নিশ্চয় এতে একটি নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। আপনার পালনকর্তা অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।[৫০৭]

৫০৬. সূরা ত্বোহা, আয়াত: ৭৭-৭৯।
৫০৭. সূরা শু'আরা, আয়াত: ৫২-৬৮।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ . وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ .

অর্থ: সুতরাং আমি তাদের কাছ থেকে বদলা নিয়ে নিলাম–বস্তুত: তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং তৎপ্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল। আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকেও আমি উত্তরাধিকার দান করেছি এ ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের যাতে আমি বরকত সন্নিহিত রেখেছি এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত কল্যাণ বনী–ইসরাঈলদের জন্য তাদের ধৈর্যধারণের দরুন। আর ধ্বংস করে দিয়েছি সে সবকিছু যা তৈরী করেছিল ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ করেছিল।[৫০৮]

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ . فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ .

অর্থ: আর বনী–ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন বলল, এবার বিশ্বাস করেছি যে, কোন মা'বুদ নেই তিনি ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী–ইসরাঈলরা। বস্তুত: আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভূক্ত। এখন একথা বলছ! অথচ তুমি ইতিপূর্বে নাফরমানী করছিলে! এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভূক্ত ছিলে। অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না।[৫০৯]

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ . فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ .

অর্থ: ফেরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে,

৫০৮. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৩৬-১৩৭।
৫০৯. সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯০-৯২।

তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। অত:পর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তৎপর আমি তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখ, যালেমদের পরিণাম কি হয়েছে।[৫১০]

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ . أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ . وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ . وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ . وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ . فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ . فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ . وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ . كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ . وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ . وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ . كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ . فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ . وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ . مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ . অর্থ: তাদের পূর্বে আমি ফেরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের কাছে আগমন করেছেন একজন সম্মানিত রসূল, এই মর্মে যে, আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে অর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত বিশ্বস্ত রসূল আর তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না। আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করছি। তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরবর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্যে আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হয়েছি। তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে আমার কাছ থেকে দূরে থাক। অত:পর সে তার পালনকর্তার কাছে দোয়া করল যে, এরা অপরাধী সম্প্রদায় তাহলে তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিবেলায় বের হয়ে পড়। নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। এবং সমুদ্রকে অচল থাকতে দাও। নিশ্চয় ওরা নিমজ্জিত বাহিনী। তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবন, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য স্থান, কত সুখের উপকরণ, যাতে তারা খোশগল্প করত। এমনিই হয়েছিল এবং আমি এগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। তাদের জন্যে ক্রন্দন করেনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তারা অবকাশও পায়নি। আমি বনী ইসরাঈলকে অপমানজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করেছি। ফেরাউন সে ছিল সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।[৫১১]

. সূরা কাসাস, আয়াত: ৩৯-৪০।
. সূরা দুখান, আয়াত: ১৭-৩১।

فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا . وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا . অর্থ: অত:পর সে বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইল, তখন আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের সবাইকে নিমজ্জিত করে দিলাম। তারপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম: এ দেশে তোমরা বসবাস কর। অত:পর যখন পরকালের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদেরকে জড়ো করে নিয়ে উপস্থিত হব।[৫১২]

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ . فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ . فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ . অর্থ: এবং নিদর্শন রয়েছে মূসার বৃত্তান্তে; যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। অত:পর সে শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল: সে হয় যাদুকর, না হয় পাগল। অত:পর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সে ছিল অভিযুক্ত।[৫১৩]

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ . وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ . অর্থ: আর স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তি দান করেছি ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে যারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দিত; তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে জবাই করত এবং তোমাদের স্ত্রীদেরকে রেহাই দিত। বস্তুত তাতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মহা পরীক্ষা আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি, অত:পর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরাউনের লোকদেরকে অথচ তোমরা দেখছিলে।[৫১৪]

বনী ইস্রাঈলের আবেদন ও গোবৎস পূজা:

বনী ইস্রাঈল যখন কুলযুম সাগর নিরাপদে পার হয়ে গেল এবং তাদের নিজের চোখে ফেরাউন ও তার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ও তাদের লাশ নদীর কিনারে ভাসতে দেখল তখন তারা খুবই আনন্দিত হল। আনন্দে মহিলা দফ বাজিয়ে গান করে উৎসব করতে লাগল। মুসা আ. তাদের বললেন, আল্লাহ তায়ালা

[৫১২]. সূরা বনী ইস্রাঈল, আয়াত: ১০৩-১০৪।
[৫১৩]. সূরা আয্-যারিয়াত, আয়াত: ৩৮-৪০।
[৫১৪]. সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৯-৫০।

তোমাদেরকে দাসত্বের বড় বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

মুসা আ. আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে নিয়ে তূর পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত 'সীনা'র দিকে রওয়ানা হন। যাত্রা পথে তারা এক সম্প্রদায়কে গাভী পূজা করতে দেখে মুসা আ.'র নিকট আবেদন করল যে, আমাদের জন্য পালনকর্তার একটি আকৃতি (মুর্তি) তৈরী করে দিন, যাতে ওটাকে সামনে নিয়ে আমরা তাঁর ইবাদত করবো। এতে আমাদের মনযোগ বিচ্যুতি হবেনা। মুসা আ. তাদের এই মুশরেকী আবেদন শুনে রাগান্বিত হলেন এবং তাদেরকে সাবধান করে দিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ সামেরী বুঝে নিল যে, ইস্রাঈলীদের মধ্যে ফেরাউনীদের ন্যায় সৃষ্টিকে পূজা করার মানসিকতা রয়ে গেছে।

আল্লাহ্ তায়ালা মুসা আ.কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী ইস্রাঈলকে রেখে তূর পর্বতে চলে এসো। আমি তোমাকে আমার বিধান সম্বলিত তাওরাত দান করবো। কিন্তু তাওরাত লাভের পূর্বে তোমাকে ত্রিশদিন ত্রিশ রাত রোযা সহকারে সাধনা করতে হবে। এরপর আরো দশদিন বৃদ্ধি করে মোট চল্লিশ দিন করে দেয়া হল। মুসা আ. বনী-ইস্রাঈল থেকে ত্রিশ দিনের জন্য তূর পর্বতে রওয়ানা হলেন এবং সেখানে গিয়ে পহেলা যিলক্বদ থেকে রোযা ও ই'তিকাফ রইলেন। দীর্ঘদিন রোযা রাখার ফলে মুখে সামান্য দুর্গন্ধ হয়েছে মনে করে ত্রিশে যিলক্বদ তিনি মিসওয়াক করেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন দুর্গন্ধযুক্ত মুখ নিয়ে তাওরাত নেওয়ার জন্য আল্লাহর সামনে কিভাবে যাবেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা আরো দশদিন বৃদ্ধি করে দিলেন। তিনি যাওয়ার সময় তাদের মধ্যে হযরত হারুন আ.কে প্রতিনিধি হিসাবে রেখে যান।

ওদিকে ত্রিশ দিন অতিক্রম করতে না করতেই তারা অস্থীর হয়ে উঠল। প্রথমে তারা হযরত হারুন আ.কে জিজ্ঞাসা করল, যে সমস্ত অলংকার কিবতীদের থেকে নিয়েছিল তা কি করবে? তৎকালে গণিমতের মালের হুকুম ছিল তা কোন স্থানে একত্রিত করে রাখবে আর আকাশ থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে। তাই হারুন আ. বললেন, ঐগুলো কোন গর্তে ফেলে আগুন জ্বালিয়ে ছাই করে ফেল আর এই ছাইগুলো মাটিতে দাফন করে দাও।

মুনাফিক সামেরী ইস্রাঈলীদেরকে বলতে লাগল, মুসা আ. তোমাদের মতই একজন মানুষ। কেবল লাঠির চমক দেখিয়ে তোমাদেরকে অবাক করে দিচ্ছে। তোমাদের সমস্ত অলংকার আমাকে দিয়ে দাও। আমি তাঁর চেয়ে অধিক আশ্চর্যজনক জিনিস করে দেখাবো, যার ফলে মুসা আ.'র প্রয়োজন তোমাদের আর হবে না। সে আরো বলেছিল যে, মুসা আ. মৃত্যুবরণ করেছে, আর ফিরে আসবেনা। কারণ ত্রিশ দিনের জন্য গিয়েছিলেন অথচ ত্রিশ দিন অতিক্রম হয়ে গেল এখনো ফিরে আসেননি।

ইস্রাঈলীরা সমস্ত অলংকার সামেরীর হাতে অর্পন করল। সে ঐগুলো থেকে জাওহার ও ইয়াকুত পাথর সমূহ পৃথক করে নিয়ে কেবল স্বর্ণগুলো গলিয়ে একটি সুসজ্জিত গো বৎস তৈরী করল এবং জাওহার ও ইয়াকুত সমূহ গো বৎসের কান, নাক, রান ও পায়ে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে জুড়িয়ে দিয়ে সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি করে দিল। জিব্রাঈল আ.'র ঘোড়ির পায়ের নীচের সংগৃহীত মাটি এর মুখে প্রবেশ করে দিল। যাতে গো বৎসটি আওয়ায করতে লাগল এবং একটু একটু নড়াচড়া করতেও লাগল। সামেরী বলল, দেখ, খোদা এই গো বৎসের মধ্যে প্রবেশ করেছে। মুসা আ. তাঁকে ওখানে খুঁজতেছেন অথচ খোদা আমাদের কাছে চলে এসেছেন। ইস্রাঈলীরা তার প্রতারণায় প্রতারিত হয়ে এক বিরাট তাঁবু স্থাপন করে, যেখানে গো বৎসটি স্থাপন করে চর্তুদিকে গালিচা বিছায়ে গান-বাজনা ও আনন্দ উল্লাস শুরু করল। তাদের নারী-পুরুষ সকলেই গোবৎসের পূজা করতে লাগল। কেবল হারুন আ. ও তাঁর অনুসারী মাত্র বার হাজার ব্যতিত সবাই শিরকে লিপ্ত হয়ে গেল।

এই পেক্ষাপটে বনী ইস্রাঈল তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এক. যারা গো বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। দুই. হারুন আ. ও তাঁর অনুসারীরা। তারা পূজারীদেরকে বারণ করতে মশগুল ছিলেন। তিন. যারা পূজারীও ছিল না আবার বারণকারীও ছিল না।

ওদিকে দশ যিলহজ্ব দুপুরের সময় আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা আ.কে তখতে লিখিত তাওরাত শরীফ দান করলেন আর বনী ইস্রাঈলের গোবৎস পূজার সংবাদও দেন। এই সংবাদ শুনে মুসা আ. চিন্তিত ও রাগান্বিত হয়ে খুব দ্রুত চলে আসেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের এই অবস্থা দেখে খুবই মর্মাহত হন। এমনিও মুসা আ. রাগী ছিলেন। রাগের বশে হাত থেকে তাওরাত লিখিত তখতা পড়ে গেল অথবা রাগের বশে হাত থেকে নিক্ষেপ করল আর বড় ভাই হযরত হারুন আ.কে মারতে লাগলেন। হারুন আ. বনী ইস্রাঈলের অবাধ্যতার কথা বলে মুসা আ.কে শান্ত করলেন। তাওরাত শরীফ মোট সাত খণ্ড ছিল। মুসা আ.'র হাত থেকে পড়ে ছয় খণ্ড ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেবল একখণ্ড অবশিষ্ট ছিল যার মধ্যে জরুরী মাসায়েল ছিল।

অত:পর মুসা আ. ইস্রাঈলীদের থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এ কাজ কেন করেছ? উত্তরে তারা বলল, সামেরী আমাদের প্রতারিত করেছে। সামেরীকে জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিল যে, আমার মনে এরূপ করার ইচ্ছা জেগেছে। তখন মুসা আ. বনী ইস্রাঈলকে তাওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর সামেরীর জন্য বদ্দোয়া করলেন এবং গো বৎসকে জ্বালিয়ে ছাই করে ছাইগুলো নদীতে নিক্ষেপ করলেন। কোন কোন ইস্রাঈলী পূজারীদের অন্তরে গো বৎসের প্রতি

এতই ভালবাসা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তারা তাবারুক মনে করে ছাই নিক্ষিপ্ত নদীর পানি গোপনে পান করল। এতে তাদের ঠোঁট কালো বর্ণের এবং পেট ফুলে গেল। এদের তাওবা কবুল হয়নি।[৫১৫]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ . إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ . অর্থ: বস্তুত: আমি সাগর পার করে দিয়েছি বনী–ইসরাঈলদিগকে। তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌছাল, যারা স্বহস্তনির্মিত মূর্তিপূজায় নিয়োজিত ছিল। তারা বলতে লাগল, হে মুসা! আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে। এরা যে কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করেছে তা যে ভুল! তিনি বললেন, তাহলে কি আল্লাহকে ছাড়া তোমাদের জন্যে অন্য কোন উপাস্য অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদিগকে সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[৫১৬]

হযরত মুসা আ. বনী ইস্রাঈলের সাথে তাওরাত আনার জন্য ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাতের ওয়াদা করেছিলেন। তিনি ত্রিশ দিন ই'তিকাফ সহ রোযা রেখেছিলেন। মধ্যখানে কোন ইফতার করেন নি। ত্রিশদিন পর ইফতার করে রোযা ভঙ্গ করে তূর পর্বতের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হলো যে, রোযাদারের মুখের বিশেষ গন্ধ আল্লাহ তায়ালার নিকট খুবই পছন্দনীয়, কিন্তু আপনি মিসওয়াক করে তা দূর করে দিয়েছেন। কাজেই আরো দশ দিন রোযা রাখুন যাতে সে গন্ধ আবার সৃষ্টি হয়।

এখানে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে, হযরত মুসা আ. হযরত হিযির আ.'র সন্ধানে বের হয়েছিলেন তখন অর্ধ দিনের মধ্যেই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সফরসঙ্গীকে বলেছিলেন- آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا আমাদের নাস্তা নিয়ে এসো। কারণ ভ্রমণ আমাদেরকে পরিশ্রান্তির সম্মুখীন করে দিয়েছে। অথচ তূর পর্বতে তিনি ক্রমাগত ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত ইফতার বিহীন রোযা রেখেছিলেন কিন্তু ক্লান্ত হন নি কেন? এর উত্তরে বলা যায়- প্রথমোক্ত সফর ছিল একজন সৃষ্টির সন্ধানে তাই ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েন পক্ষান্তরে তূর পর্বতের

[৫১৫]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৩৬১-৩৬৩।

[৫১৬]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৩৮-১৪৩।

সফর ছিল সৃষ্টি থেকে পৃথক হয়ে স্রষ্টার অন্বেষণে, যার ফলে জৈবিক চাহিদা গৌণ হয়ে পানাহারের প্রয়োজনীয়তা বিলুপ্ত হয়েছিল।

চল্লিশ সংখ্যার তাৎপর্য:

তাওরাত শরীফ পাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা আ.কে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সাধনা করার হেকমত হলো চল্লিশ সংখ্যার একটি বিশেষ গুরুত্ব ও প্রভাব রয়েছে। মাতৃগর্ভে অবস্থিত সন্তানের জন্ম প্রক্রিয়া প্রতি চল্লিশ দিনে পরিবর্তন হয়। চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি পরিপক্ক হয়। তাই অধিকাংশ নবী-রাসূলগণের নবুয়ত প্রকাশ হয়েছিল চল্লিশ বছর বয়সে, তাছাড়া মানুষের বয়স চল্লিশ পার হলে বার্ধক্যে উপনীত হয়।

হাদীস শরীফেও বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি লাগাতার চল্লিশ ওয়াক্ত নামায যদি জামাতে আদায় করে তবে সে নিয়মিত নামাযী হয়ে যাবে। এ কারণেই মদীনা শরীফে হাজীগণ অন্তত আটদিন অবস্থান করে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায জামাতে আদায় করার চেষ্টা করেন।

অনেক বুযুর্গানে দ্বীনও চল্লিশ দিন যাবৎ বিশেষ ইবাদতে মশগুল হন। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে চল্লিশ দিন যাবৎ আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহ্ তার অন্তরের জ্ঞান ও হেকমতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দেন।[৫১৭] আবার অনেক মুহাদ্দিসীনে কিরামগণও কেবল চল্লিশখানা হাদীস দিয়ে কিতাব রচনা করেছেন। কারণ পবিত্র হাদীস শরীফে এর ফযিলতের উপর রাসূল ﷺ'র পবিত্র বাণী বিদ্যমান।

সামেরীর পরিচয়:

সামেরী এটা বংশীয় নাম। তার প্রকৃত নাম ইয়াহিয়া অথবা মুসা ইবনে যফর। সে বনী সামের গোত্রের লোক ছিল বলে তাকে সামেরী বলা হত। কেউ কেউ বলেন, সে ফেরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। হযরত মুসা আ.'র প্রতিবেশী এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিল। কারও মতে সে বনী ইস্রাঈলেরই সামেরা গোত্রের নেতা ছিল। ইবনে যোবায়ের রা. বলেন, সে পারস্য বংশোদ্ভূত লোক কিরমানের অধিবাসী ছিল। ইবনে আব্বাস রা.'র মতে সে গো বৎস পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মিশরে এসে বনী ইস্রাঈলীদের ধর্মে দীক্ষা লাভ করে। মোটকথা হলো সে মূর্তি পূজারী একজন মুনাফিক ছিল।

হযরত ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, মুসা ইবনে যফর সামেরী যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ফেরাউনের পক্ষে ইস্রাঈলী

[৫১৭]. রূহুল বয়ান।

ছেলে-সন্তানদের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল। ফেরাউনী সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে স্বীয়পুত্র হত্যার ভয়ে তার জননী তাকে একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে আসে, উপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাঈল আ.কে শিশুর হেফাজত ও পানাহারের কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তাঁর এক অঙ্গুলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে মাখন এবং অপর অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে দিতেন। অবশেষে এভাবে সে গর্তের মধ্যেই লালিত-পালিত হয়ে বড় হল এবং কুফুরী ও শিরকে লিপ্ত হয়ে বনী ইস্রাঈলকে পথভ্রষ্ট করল।

গো বৎস পূজার শাস্তি:

হযরত মুসা আ. অবশেষে আল্লাহর দরবারে আরয করলেন- হে প্রভু? বনী ইস্রাঈলের এই অপরাধের শাস্তি বা তাদের তাওবার পদ্ধতি কিরূপ হতে পারে যা করে তারা পাপমুক্ত হবে? আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুসা আ. তাদেরকে বললেন- তোমাদের মার্জনার একমাত্র পদ্ধতি হল তোমরা পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করবে। তারা তাতে সম্মতি হল। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যে, অপরাধীরা সম্পূর্ণ হাতিয়ার ও প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম বিহীন বাহিরে এসে নিজ নিজ ঘরে দরজায় দু'জানু হয়ে এমনভাবে বসবে যাতে রান পেটের সাথে মিলে যায় এবং মাথা হাঁটুর উপর রাখবে আর তলোয়ার স্বীয় কাঁধে ঝুলে রাখবে। কেউ এর ব্যতিক্রম করবে না। আর যদি কেউ স্বীয় হত্যাকারীর দিকে তাকায় কিংবা হাত-পা দ্বারা তলোয়ারের আঘাত প্রতিহত করে তবে তার তাওবা কবুল হবে না। সবাই যখন এভাবে প্রস্তুতি নিল তখন হযরত মুসা আ. হযরত হারুন আ.কে বললেন, ঐ বার হাজার ইস্রাঈলীকে আদেশ দিন, যারা গোবৎস পূজায় লিপ্ত ছিল না, তারা উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে এই বাঁধা অপরাধীদের হত্যা করে। এই আদেশ দেয়ার পর হযরত মুসা আ. উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন যে, হে অপরাধীরা! তোমাদের ভাইয়েরাই এখন তোমাদেরকে হত্যা করতে আসতেছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর ধৈর্যধারণ কর। হত্যা করার আদেশ প্রাপ্ত লোকেরা যখন হত্যার উদ্দেশ্যে কাছে গেল তখন স্বগোত্রীয় লোকের প্রতি ভালবাসার কারণে তারা হত্যা করতে সক্ষম হলোনা, কেননা এদের মধ্যে কেউ তাদের ভাই, কেউ ভাতিজা কেউ পুত্র আবার কেউ পৌত্র। তারা বলল, আমাদের নিজের হাতে নিজেদের আপনজনকে কিভাবে হত্যা করবো? তখন তাদের উপর একখণ্ড কালো মেঘ এসে সমস্ত ময়দানকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিল। ফলে এখন আর কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। তখন আদেশ হল- যাও এখন হত্যা কর। কেননা চেহারা না দেখলে দয়া আসবে না এবং কে কাকে হত্যা করছে বুঝতে পারবে না। অতএব একদিনে কোন কোন বর্ণনা মতে

তিনদিনে সত্তর হাজার বনী ইস্রাঈল হত্যা হলো। তখন বনী ইস্রাঈলের শিশু ও নারীরা হযরত মুসা আ.'র নিকট এসে কান্না-কাটি করে নিবেদন করে বলল, হে মুসা! আপনি পালনকর্তার নিকট দয়া ও ক্ষমার আবেদন করুন। হযরত মুসা ও হারুন আ. খালি মাথায়, বিনয়ের সহিত ক্রন্দন করে ময়দানে এসে আরয করলেন, হে প্রভু! বনী ইস্রাঈল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আপনি দয়া করুন। তখন মেঘ চলে গেল আর হুকুম হলো- এখন হত্যা বন্ধ কর, সবার তাওবা কবুল হয়েছে, আমি সবাইকে জান্নাত দান করবো।[৫১৮]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে–

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ . وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ . وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ . ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ . وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . অর্থ: আর (স্মরণ করুন) সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তিদান করেছি ফেরাআউনের লোকদের কবল থেকে যারা তোমাদিগকে কটিন শাস্তি দান করত; তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে জবাই করত এবং তোমাদের স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত। বস্তুত: তাতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে, মহা পরীক্ষা। আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি, অত:পর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে অথচ তোমরা দেখছিলে। আর যখন আমি মুসার সাথে ওয়াদা করেছি চল্লিশ রাত্রির অত:পর তোমরা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মুসার অনুপস্থিতিতে। বস্তুত: তোমরা ছিলে যালেম। তারপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও। আর (স্মরণ করুন) যখন আমি মুসাকে কিতাব এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য বিধানকারী নির্দেশ দান করেছি, যাতে তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতে পার। আর যখন মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদেরই ক্ষতিসাধন করেছ এই গোবৎস নির্মাণ

[৫১৮]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৩৬৮।

করে। কাজেই এখন তওবা কর স্বীয় স্রষ্টার প্রতি এবং নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের স্রষ্টার নিকট। তারপর তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করা হল। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত মেহেরবান।[৫১৯]

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. অর্থ: সুস্পষ্ট মু'জেযাসহ মুসা তোমাদের কাছে এসেছেন। এরপর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা গোবৎস বানিয়েছ। বাস্তবিকই তোমরা অত্যাচারী।[৫২০]

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. অর্থ: আর সে সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছি; তারা তোমাদেরকে দিত নিকৃষ্ট শাস্তি, তোমাদের পুত্র–সন্তানদের মেরে ফেলত এবং মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখত। এতে তোমাদের প্রতি তোমাদের পরওয়ারদেগারের বিরাট পরীক্ষা রয়েছে। আর আমি মুসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরো দশ দ্বারা। বস্তুত: এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মুসা তাঁর ভাই হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক। তাদের সংশোধন করতে থাক এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চলো না।[৫২১]

قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. অর্থ: (পরওয়াদেগার) বললেন, হে মুসা! আমি তোমাকে আমার বার্তা পাঠানোর এবং কথা বলার মাধ্যমে লোকদের উপর বিশিষ্টতা দান করেছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম, গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক। আর আমি তোমাকে পটে লিখে দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ ও বিস্তারিত সব বিষয়। অতএব, এগুলোকে দৃঢ়ভাবে

৫১৯. সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৯–৫৪।

৫২০. সূরা বাকারা, আয়াত: ৯২।

৫২১. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৩৮–১৪১।

ধারণ কর এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাব কাফেরদের বাসস্থান।[৫২২]

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. অর্থ: আর বানিয়ে নিল মুসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা একটি বাছুর তা থেকে বেরুচ্ছিল 'হাম্বা হাম্বা' শব্দ। তারা কি একথাও লক্ষ্য করল না যে, সেটি তাদের সাথে কথাও বলছে না এবং তাদেরকে কোন পথও বাতলে দিচ্ছে না! তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল। বস্তুত: তারা ছিল যালেম। অত:পর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং বুঝতে পারল যে, আমরা নিশ্চিতই গোমরাহ হয়ে পড়েছি, তখন বলতে লাগল, আমাদের প্রতি যদি আমাদের পরওয়ারদেগার করুণা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। তারপর যখন মুসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়, তখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কি নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বটাই না করেছ! তোমরা নিজ পরওয়াদেগারের হুকুম থেকে কি তাড়াহুড়া করে ফেললে এবং সে তখতীগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন। ভাই বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র! লোকগুলো যে আমাকে দুর্বল মনে করল এবং আমাকে যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। সুতরাং আমার উপর আর শত্রুদের হাসাইও না। আর আমাকে যালিমদের সারিতে গণ্য করো না। মুসা বললেন, হে আমার পরওয়াদেগার! ক্ষমা কর আমাকে আর আমার ভাইকে এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভূক্ত কর। তুমি যে

৫২২. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৪৪-১৪৫।

সর্বাধিক করুণাময়। অবশ্য যারা গোবৎসকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উপর তাদের পরওয়াদেগারের পক্ষ থেকে পার্থিব এ জীবনেই গযব ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে। এমনি আমি অপবাদ আরোপকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। আর যারা মন্দ কাজ করে, তারপরে তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তবে নিশ্চয়ই তোমার পরওয়ারদেগার তওবার পর অবশ্য ক্ষমাকরী, করুণাময়। তারপর যখন মূসার রাগ পড়ে গেল, তখন তিনি তখতীগুলো তুলে নিলেন। আর যা কিছু তাতে লেখা ছিল, তা ছিল সে সমস্ত লোকের জন্য হেদায়েত ও রহমত যারা নিজেদের পরওয়াদেগারকে ভয় করে।[৫২৩]

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى . قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى . قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ . فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي . قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ . فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ . أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا . وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي .قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى . قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا . أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي . قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي . قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ . قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي . قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا . إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا . অর্থ: হে মুসা, তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে তুমি ত্বরা করলে কেন? তিনি বললেন: এই তো তারা আমার পেছনে আসছে এবং হে আমার পালনকর্তা! আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। বললেন: আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার পর এবং সামেরী

[৫২৩]. সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ১৪৮-১৫৪।

তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। অত:পর মুসা তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায়। তিনি বললেন: হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে? তারা বলল: আমরা তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; কিন্তু আমাদের উপর ফেরআউনীদের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। অত:পর আমরা তা নিক্ষেপ করে দিয়েছি। এমনিভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে। অত:পর সে তাদের জন্য তৈরী করে বের করল একটা গো-বৎস-একটা দেহ, যার মধ্যে গরুর শব্দ ছিল। তারা বলল: এটা তোমাদের উপাস্য এবং মুসারও উপাস্য, অত:পর মুসা ভুলে গেছে। তারা কি দেখে না যে, এটা তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না? হারুন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিলেন: হে আমার কওম! তোমরা তো এই গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছ এবং তোমাদের পালনকর্তা দয়াময়। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। তারা বলল: মুসা আমাদের কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা সদাসর্বদা এর সাথেই সংযুক্ত হয়ে বসে থাকব। মুসা বললেন: হে হারুন! তুমি যখন তাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেখলে, তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে? তবে তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করেছ? তিনি বললেন: হে আমার জননী-তনয়! আমার শ্মশ্রু ও মাথার চুল ধরে আকর্ষণ করো না; আমি আশঙ্কা করলাম যে, তুমি বলবে: তুমি বনী-ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা স্মরণে রাখনি। মুসা বললেন: হে সামেরী! এখন তোমার ব্যাপার কি? সে বলল: আমি দেখলাম যা অন্যেরা দেখেনি। অত:পর আমি সেই প্রেরিত ব্যক্তির পদচিহ্নের নীচ থেকে এক মুঠি মাটি নিয়ে নিলাম। অত:পর আমি তা নিক্ষেপ করলাম। আমাকে আমার মন এই মন্ত্রণাই দিল। মুসা বললেন: দূরহ, তোর জন্য সারা জীবন এ শাস্তিই রইল যে, তুই বলবি: 'আমাকে স্পর্শ করো না' এবং তোর জন্যে একটি নির্দিষ্ট ওয়াদা আছে, যার ব্যতিক্রম হবে না। তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তুই ঘিরে থাকতি। আমরা সেটি জ্বালিয়ে দেবই। অত:পর একে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দেবই। তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সব বিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিধিভূক্ত।[৫২৪]

[৫২৪]. সূরা ত্বোহা, আয়াত: ৮৩-৯৮।

তূর পর্বত উত্তোলন:

বনী ইস্রাঈল 'কুলযুম নদী' পার হওয়ার পর ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্ত হলে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের মাধ্যমে জীবন-যাপনের জন্য একটি ঐশী গ্রন্থের প্রয়োজন দেখা দিল। তারাও খোদায়ী বিধি-বিধান সম্বলিত একটি আল্লাহর কিতাবের আবেদন করেছিল মুসা আ.'র নিকট। হযরত মুসা আ.ও তাদের থেকে পালনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে আল্লাহর নিকট থেকে তূর পর্বতে গিয়ে পবিত্র তাওরাত শরীফ ইস্রাঈলীদের নিকট নিয়ে আসলেন। কিন্তু তারা তাওরাতের বিধি-বিধান কঠিন মনে করে তা মানতে অস্বীকৃতি জানাল। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুদরতী শক্তিদ্বারা সম্পূর্ণ বিশাল আকারের তূর পর্বতকে তাদের মাথার উপর উত্তোলন করে তাদের মাথার উপর থেকে নিক্ষেপ করার উপক্রম করেছেন। যাতে তারা অন্তত: ভীত হয়েও তাওরাত শরীফ মেনে নেয়।

কেউ বলেছেন তূর পর্বত উত্তোলন কেবল সেই সত্তর জন ইস্রাঈলী সর্দারের উপর হয়েছিল যাদেরকে মুসা আ. সাক্ষী হিসাবে তূর পর্বতের পাদদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। আবার অধিকাংশ ওলামাদের মতে মুসা আ. তাওরাত নিয়ে ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের কাছে আসলে তারা তা দেখে অস্বীকার করার কারণে সমগ্র ইস্রাঈলী সম্প্রদায়ের উপর সংঘটিত হয়েছিল এই ঘটনা। তাদের অবাধ্যের অভিযোগ করে হযরত মুসা আ. আল্লাহর দরবারে দোয়া করলে হযরত জিব্রাঈল আ. আল্লাহর নির্দেশে তূর পর্বতকে স্বমূলে তুলে এনে বনী ইস্রাঈলের মাথার উপর আদম আ.'র শরীর মোবারকের সমপরিমাণ দূরত্বে সামিয়ানার ন্যায় ঝুলন্ত অবস্থায় রাখেন। আর তাদেরকে বলা হলো যে, তোমরা হয়তো তাওরাত কবুল কর, না হয় এই বিশাল পর্বত মাথার উপর ফেলে মাটিতে মিশিয়ে দেবো। ভয়ে তারা কালবিলম্ব না করে সিজদায় পতিত হয়ে তাওবা করে মানবে বলে প্রতিজ্ঞা করল। তবে তারা সিজদা পূর্ণ কপাল দিয়ে করেনি বরং কপালের একপাশ মাটিতে লাগিয়ে সিজদা করল আরেক পাশ উঁচু করে পর্বতের দিকে তাকাচ্ছে কোন মাথার উপর পড়বে কিনা।[৫২৫]

উল্লেখ্য যে, এ ঘটনায় পবিত্র কুরআনে পর্বত উত্তোলনের কথা বলা হয়েছে এটি বাস্তব, কোন রূপক অর্থ গ্রহণের সুযোগ নেই। কেননা এটি সম্পূর্ণ আল্লাহর কুদরতী ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। যারা রূপক অর্থ নেয়, তাদের মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাস নেই বলে ধরে নিতে হবে। অথচ আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

[৫২৫]. মুফতি আহমদ ইয়ারখান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৪১৫।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন–

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ . অর্থ: আর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদিগকে যে কিতাব দেয়া হয়েছে তাকে ধর সুদৃঢ়ভাবে এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা মনে রেখো যাতে তোমরা ভয় কর। তারপরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ। কাজেই আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী যদি তোমাদের উপর না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে।[৫২৬]

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . অর্থ: আর যখন আমি তুলে ধরলাম পাহাড়কে তাদের উপরে সামিয়ানার মত এবং তারা ভয় করতে লাগল যে, সেটি তাদের উপর পড়বে, তখন আমি বললাম, ধর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি দৃঢ়ভাবে এবং স্মরণ রেখো যা তাতে রয়েছে, যেন তোমরা বাঁচতে পার।[৫২৭]

ইস্রাঈলীদের মাথায় তূর পর্বত তুলে আল্লাহ তায়ালা বললেন- তোমরা তাওরাত কিতাব মজবুতভাবে গ্রহণ করো এবং পরিপূর্ণভাবে শ্রবণ কর। অর্থাৎ মনোযোগ দিয়ে শুন অত:পর সে মতে আমল কর। কিন্তু তাদের অন্তর সমূহ এতই কঠিন হয়ে গিয়েছে যে, তারা বাহ্যিক ভাবে মুখে বলেছিল যে, "আমরা শুনেছি" আর অন্তরে বলেছিল যে, এই বিপদ থেকে মুক্ত হলে আমরা আর মানবো না বরং অবাধ্য হয়ে যাবো। যেহেতু বাহ্যিক বা যাহের অবস্থা ধর্তব্য, সেহেতু আল্লাহ তায়ালা এবারও তাদেরকে মুক্তি দিলেন কিন্তু অতীতের ন্যায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অবাধ্য হয়ে গেল।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন– وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . অর্থ: আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের উপর তুলে ধরলাম যে, শক্ত করে ধর, আমি যা তোমাদের দিয়েছি আর শোন। তারা বলল, আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি। কূফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎসপ্রীতি পান

[৫২৬]. সূরা বাকারা, আয়াত: ৬৩-৬৪।
[৫২৭] সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৭১।

করানো হয়েছিল। বলে দিন, তোমরা বিশ্বাসী হলে, তোমাদের সে বিশ্বাস মন্দ বিষয়াদি শিক্ষা দেয়।[৫২৮]

উল্লেখ্য যে, পর্বত উত্তোলনের ঘটনা ময়দানে তীহ যাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

ইস্রাঈলী প্রতিনিধিদের মৃত্যু ও জীবিত হওয়ার ঘটনা:

যখন গো বৎস পূজার অপরাধের কাফ্ফারা স্বরূপ সত্তর হাজার ইস্রাঈলী হত্যা হলো তখন হযরত মুসা আ. তাদের থেকে সত্তর জন নেতৃত্বস্থানীয় লোক নির্বাচিত করে তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হলেন। তখন তারা আবেদন করল- হে মুসা! আমাদেরকেও পালনকর্তার কালাম শুনাবেন। তিনি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলে আল্লাহ তা কবুল করলেন। যখন তূর পর্বতে পৌছল তখন মুসা আ. বললেন, তোমরা গোসল করে নিজেদের সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা কর এবং তিনদিন রোযা পালন কর আর তাসবীহ ও তাহলীল আদায়ে মশগুল থাক। তিনি পাহাড়ের নীচে তাদেরকে দণ্ডায়মান রেখে নিজে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করেন। নীচ থেকে তারা দেখল যে, নূরানী শুভ্র মেঘের রঙের একটি স্তম্ভ প্রকাশিত হয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি সমস্ত পাহাড় পরিবেষ্টন করে নিল। মুসা আ. সেখানে পড়ে গেলেন আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে কথা বললেন। ঐ সত্তর জন লোক নীচ থেকে কালামে এলাহী শুনতে পাচ্ছে। তারা বলল, এই কথা-বার্তা কেবল মুসা আ.'র সাথে হচ্ছে। আমাদেরকেও মেহেরবাণী করুন, আমাদের সাথেও কিছু কালাম করুন। তখন হঠাৎ নূরের তাজল্লী তাদের দিকে চমকে উঠল আর তাদের কর্ণ কুহরে আওয়ায আসল اِنِّیۡ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا ذوبكة اخرجكُم من ارض مصر فاعبُدونى ولا تعبُدواغيرى অর্থাৎ আমি আল্লাহ, আমি ব্যতিত কোন মা'বুদ নাই, আমি মক্কার মালিক। আমি তোমাদেরকে মিশর থেকে বের করে এনেছি, তোমরা কেবল আমারই ইবাদত করবে, অন্য কারো নয়। অত:পর যখন এই মেঘমালা সরে আকাশ পরিস্কার হয়ে গেল মুসা আ. নীচে তাশরিফ আনলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন- তোমরা পালনকর্তার কালাম শুনেছ? উত্তরে তারা বলল, কালাম তো শুনেছি কিন্তু কে জানে এটা কার কালাম ছিল, আমরা কি পালনকর্তাকে দেখেছি? শুধু আপনি বলেছেন যে, এগুলো পালনকর্তার কালাম। আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না বরং আপনি আমাদেরকে পরিস্কারভাবে তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি দেখালে আমরা মানবো। তাদের এই অন্যায় ও অযৌক্তিক আবেদন শুনে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের

[৫২৮]. সূরা বাকারা, আয়াত: ৯৩।

উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের প্রতি এক প্রচন্ড শব্দ সহকারে আগুনের আযাব প্রেরণ করলেন যার ফলে তারা সবাই মৃত্যুবরণ করল। একদিন একরাত তারা মৃত অবস্থায় পড়ে থাকল। মুসা আ. আরয করলেন, হে মাওলা! এখন আমি বনী ইস্রাঈলকে কি জবাব দেবো? তারা বলবে- আপনি আমাদের সত্তর হাজার লোককে এখানে হত্যা করায়েছেন আরো সত্তর জন্য নেতাকে পাহাড়ে নিয়ে না জানি কিভাবে হত্যা করেছেন। হে আল্লাহ! আমার বদনামী হবে। আমি তো তাদেরকে নিজের সাক্ষী বানিয়ে এনেছিলাম। এখন এদের কী হয়ে গেল? আল্লাহ্! আপনি এদেরকে জীবিত করে দিন। তাঁর দোয়ায় এরা সবাই জীবিত হল আর মুসা আ. তাদেরকে নিয়ে লোকালয়ে ফিরে আসলেন।[৫২৯]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ . ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . অর্থ: আর যখন তোমরা বললে, হে মুসা! কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে (প্রকাশ্য) দেখতে পাব। বস্তুত: তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। তারপর মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি জীবিত করেছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও।[৫৩০]

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, হযরত মুসা আ. যখন তূর পর্বত থেকে তাওরাত শরীফ নিয়ে আসলেন আর বললেন যে, এটি আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব যাতে তোমাদের জীবন-যাপনের বিধি-বিধান বিদ্যমান। তখন কিছু সংখ্যক উদ্ধত লোক বললো, যদি স্বয়ং আল্লাহ আমাদেরকে বলে দেন যে, এটি তাঁর কিতাব, তবে আমরা বিশ্বাস করবো। তখন আল্লাহ্র নির্দেশে বনী ইস্রাঈলের নির্বাচিত সত্তর জন লোক নিয়ে মুসা আ. তূর পর্বতে গমণ করলেন। তখন উপরে বর্ণিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ . وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ

[৫২৯]. মুফতি আহমদ ইয়ারখান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৩৭৩।
[৫৩০]. সূরা বাকারা, আয়াত: ৫৫-৫৬।

تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ .

অর্থ: তারপর যখন মুসার রাগ পড়ে গেল, তখন তিনি তখতীগুলো তুলে নিলেন। আর যা কিছু তাতে লেখা ছিল, তা ছিল সে সমস্ত লোকের জন্য হেদায়েত ও রহমত যারা নিজেদের পরওয়ারদেগারকে ভয় করে। আর মুসা বেছে নিলেন নিজের সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোক আমার প্রতিশ্রুত সময়ের জন্য। তারপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তখন বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! তুমি যদি ইচ্ছা করতে, তবে তাদেরকে আগেই ধ্বংস করে দিতে এবং আমাকেও। আমাদেরকে কি সে কর্মের কারণে ধ্বংস করছ, যা আমার সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা করেছে? এসবই তোমার পরীক্ষা; তুমি যাকে ইচ্ছা এতে পথভ্রষ্ট করবে এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথে রাখবে। তুমি যে আমাদের রক্ষক, সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের উপর করুণা কর। তাছাড়া তুমিই তো সর্বাধিক ক্ষমাকারী।[৫৩১]

মান্না ও সালওয়া অবতরণ:

হযরত মুসা আ. ইস্রাঈলী সরদারকে জীবিত করে মিশরে নিয়ে গেলেন তখন আল্লাহর আদেশ আসল যে, হে মুসা! বনী ইস্রাঈলকে মিশর থেকে যাত্রা করে সিরিয়া চলে যাও। কেননা ওখানে হযরত ইব্রাহীম আ.'র দাফনস্থল এবং ওখানেই বায়তুল মোকাদ্দাস। এটাকে এক যালিম প্রবল শক্তিশালী জাতি বনী আমালেকা জবরদখল করে রেখেছে। তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও। আর সেখানেই তোমরা বসতি স্থাপন কর। এ আদেশে তারা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কারণ তারা দীর্ঘদিন দাসত্বের জীবন-যাপন করতে করতে যুদ্ধকে চরম ভয় পেতো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা মুসা আ.'র সাথে সিরিয়ার পথে বের হলেও কথায় কথায় মুসা আ.'র বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতো আর লেগামহীন কথা-বার্তা বলে মুসা আ.কে বিরক্ত করতো। যখন মিশর ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থান 'তীহ' নামক ময়দানে পৌছল তখন তারা জানতে পারলো যে, যেই বনী আমালেকার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করতে যাচ্ছে তারা প্রবল শক্তিশালী এবং যুদ্ধবাজ বীর জাতি। তাদের শরীর লম্বায় প্রায় সাতশ গজ। এসব তথ্য শুনে সাহস হারিয়ে ফেলে আর মুসা আ.কে বলল, আপনি ও আপনার প্রভূ গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করুন, আমরা যাবো না বরং এখানেই বসে থাকবো। আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে এখানে চল্লিশ বছর ভবঘুর অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। এই ময়দানের আয়তন ছিল বার কিংবা দশ মাইল এলাকা বিশিষ্ট একটি ভূ-ভাগ। সেখানে তারা হয়রান পেরেশান হয়ে ঘুরতে থাকে বের হওয়ার সন্ধান মিলেনি তাদের।

[৫৩১]. সুরা আ'রাফ, আয়াত: ১৫৪-১৫৫।

বর্ণিত আছে যে, এরা নিজেদের বাসস্থান মিশরে ফিরে যাওয়ার জন্য সারাদিন চলার পর রাতে কোন মঞ্জিলে অবস্থান করতো, আর ভোরে উঠে দেখত- যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানেই রয়ে গেছে। এভাবে চল্লিশ বছর যাবৎ এ প্রান্তরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থায় বিচরণ করছিল।

এখানে প্রচন্ড গরম ছিল, পানির কোন চিহ্নও ছিলনা ফলে ইস্রাঈলীরা ভীত হয়ে পড়ল আর মুসা আ.'র কাছে পানির আবেদন করল। তাঁর দোয়ায় ও আল্লাহর নির্দেশে তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করা মাত্র বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হল যা থেকে তাদের বার গোত্রের লোকেরা পৃথক পৃথক ভাবে পানি পানের ব্যবস্থা হল। তখন তারা মুসা আ.কে বলল, পানির তো ব্যবস্থা হল। কিন্তু এটি তো যথেষ্ট নয়। আমাদের খাবার প্রয়োজন অথচ এখানে খাবার বস্তুর কোন নিশানাও দেখতি পাচ্ছি না। আমাদের প্রচন্ড ক্ষুধা লেগেছে। মুসা আ. দোয়া করলেন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দোয়ার বরকতে মান্ন ও সালওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তা এভাবে যে, সূর্য উঠার পূর্বে শুভ্র রঙের অত্যন্ত সুস্বাদু হালুয়া আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতো। প্রতি জনের জন্য দৈনিক এক সা' তথা প্রায় চার সের পরিমাণ আসতো যা একজনের সারা দিনের জন্য যথেষ্ট ছিল। জুমা'র দিন দ্বিগুণ পতিত হতো, যাতে শনিবারের জন্যও যথেষ্ট হয়। এটি মধু ও ঘি এর মিশ্রিত সাধের হালুয়া ছিল। এই মিষ্টি জাতীয় খাবারে তুষ্ট না হয়ে তারা মুসা আ.'র নিকট লবণাক্ত খাবারের আবেদন করল। তখন প্রতিদিন আসরের পর বাতাসের বেগে এক জাতীয় ছোট ছোট সামুদ্রিক পাখি দলে দলে এসে মাটিতে বসে পড়ত। ইস্রাঈলীরা ওগুলো সহজে ধরে ভুনে কাবাব বানিয়ে খেত। এটিই হল 'সালওয়া'।

এভাবে উভয় প্রকারের খাবার প্রতিদিন বিনা পরিশ্রমে পেয়ে যেতো। তবে তাদের সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যেন দিনের খাবার দিনেই খেয়ে ফেলে পরের দিনের জন্য যেন রেখে না দেয়। কারণ পরিপূর্ণভাবে যেন আল্লাহর উপর ভরসা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা ছিল না বিধায় তারা অমান্য করে পরের দিনের জন্য খাবার অতিরিক্ত নিয়ে রেখে দিত। ফলে কাবাব নষ্ট হয়ে দুর্গন্ধ হয়ে গেল এবং ঐ দুর্গন্ধ লোকের জন্য কষ্টকর হতে লাগল। তাই এগুলোর আগমন বন্ধ হয়ে গেল। অত:পর ইস্রাঈলীরা প্রচন্ড গরমের অভিযোগ করলে মুসা আ.'র দোয়ায় তাদের উপর মেঘের ছায়া'র ব্যবস্থা করা হল। তারা যেদিকে যায় মেঘ সেদিকে গিয়ে তাদেরকে ছায়া দান করত।

উল্লেখ্য যে, এই ঘটনার পূর্বে খাবার নষ্ট হতো না। সর্বপ্রথম এদের কারণে খাবার নষ্ট হওয়া আরম্ভ হল। হাদিস শরীফে আছে- যদি বনী ইস্রাঈল না হতো তবে খাবার নষ্ট হতো না।[৫৩২]

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . অর্থ: আর মুসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে। অত:পর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক খাও, পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাংগা-হাংগামা করে বেড়িও না।[৫৩৩]

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ . অর্থ: আর আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না' ও 'সালওয়া'। সেসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুত: তারা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে।[৫৩৪]

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ . وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ . অর্থ: বস্তুত: মুসার সম্প্রদায়ে একটি দল রয়েছে যারা সত্যপথ নির্দেশ করে এবং সে মতেই বিচার করে থাকে। আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি তাদের বার জন পিতামহের সন্তানদেরকে বিরাট বিরাট দলে, এবং নির্দেশ দিয়েছি মুসাকে, যখন তার কাছে তার সম্প্রদায় পানি চাইল যে, স্বীয় যষ্টির দ্বারা আঘাত কর এ পাথরের উপর। অত:পর এর ভেতর থেকে ফুটে বের হল বারটি প্রস্রবণ! প্রতিটি গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ ঘাঁটি। আর আমি ছায়া দান করলাম তাদের উপর

[৫৩২]. মুফতি আহমদ ইয়ারখান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৩৭৯ ও মাওলানা হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।

[৫৩৩]. সূরা বাকারা, আয়াত: ৬০।

[৫৩৪]. সূরা বাকারা, আয়াত: ৫৭।

মেঘের এবং তাদের জন্য অবতীর্ণ করলাম মান্না ও সালওয়া। যে পরিচ্ছন্ন বস্তু জীবিকারূপে আমি তোমাদের দিয়েছি, তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর। বস্তুত: তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি, বরং ক্ষতি করেছে নিজেদেরই।[৫৩৫]

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى . كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى . وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى . অর্থ: হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছি, তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেছি এবং তোমাদের কাছে 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করেছি। বলেছি: আমার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং এতে সীমালংঘন করো না, তা হলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে এবং যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে ধ্বংস হয়ে যায়। আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অত:পর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল।[৫৩৬]

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ . قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ . قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ . অর্থ: হে আমার সম্প্রদায়! পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তারা বলল: হে মুসা! সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব। খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন: তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর। অত:পর তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

[৫৩৫]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৫৯-১৬০।

[৫৩৬]. সূরা ত্বোহা, আয়াত: ৮০-৮২।

তারা বলল: হে মুসা! আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম।[৫৩৭]

হযরত মুসা আ.'র পাথর:

হযরত মুসা আ. যে পাথরে লাঠি নিক্ষেপ করে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলেন সে পাথর নিয়ে ওলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন- এটি সাধারণ পাথর। তবে কারো কারো মতে সেই বিশেষ পাথর যেটি মুসা আ.'র কাপড় নিয়ে পালিয়েছিল যা সূরা আহযাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত জিব্রাঈল আ. মুসা আ.কে বলেছিলেন- এটি আপনি থলের মধ্যে যত্ন করে রেখে দিন, এটির থেকে মু'জিযা প্রকাশিত হবে। কেউ বলেন, এটি তূর পর্বতের পাথর ছিল। আবার কারো মতে এটি লাঠির ন্যায় জান্নাতি পাথর ছিল যেটিকে হযরত আদম আ. সঙ্গে এনেছিলেন। এটি আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে আসতে আসতে হযরত শোয়াইব আ. পর্যন্ত পৌছেছে। তিনি মুসা আ.কে লাঠির সাথে এই পাথর খানাও দিয়েছিলেন। এটি মরমর পাথরের মত একগজ দৈর্ঘ্য এবং একগজ প্রস্তবিশিষ্ট ছিল। অনেকের মতে এটি অনির্দিষ্ট সাধারণ পাথর। অর্থাৎ যে পাথরেই তিনি লাঠি দিয়ে আঘাত করতেন সে পাথর থেকেই পানি প্রবাহিত হত।[৫৩৮]

হযরত মুসা আ.'র কাপড় নিয়ে যাওয়ার ঘটনা:

সহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ বহু গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيرًا لَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا مَا يَسْتَتِرُ هَذَا التَّسَتُّرَ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُدْرَةٌ وَإِمَّا آفَةٌ وَإِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى فَخَلَا يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

[৫৩৭]. সূরা মায়েদাহ, আয়াত: ২১-২৪।

[৫৩৮]. মুফতি আহমদ ইয়ারখান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৩৯২-৩৯৩।

تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا} রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, হযরত মুসা আ. অত্যন্ত লজ্জাশীল হওয়ার কারণে সর্বদা তাঁর দেহ ঢেকে রাখতেন। তাঁর শরীর কেউ দেখত না। তিনি পর্দার আড়ালে গোসল করতেন। অথচ তাঁর সম্প্রদায় বনী ইস্রাঈলের মধ্যে সকলের সামনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং পরস্পর পরস্পরের লজ্জাস্থান দেখা-দেখি করত। কিন্তু মুসা আ. কারো সামনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করতেন না। এ কারণে বনী ইস্রাঈলরা বলতে লাগল যে, নিশ্চয় তাঁর দেহে কোন দোষ আছে- হয় তিনি কুষ্ঠারোগী, না হয় একশিরা রোগী নতুবা তিনি অন্য কোন ব্যাধিগ্রস্ত। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা আ.কে বনী ইস্রাঈলের অভিযোগ থেকে মুক্ত করার অর্থাৎ নির্দোষ প্রমাণ করার ইচ্ছা করলেন। একদা হযরত মুসা আ. নির্জনে গোসল করার জন্যে কাপড় খুলে একখণ্ড পাথরের উপর রাখলেন। গোসল শেষে হাত বাড়িয়ে কাপড় নিতে চাইলে পাথরটি (আল্লাহর নির্দেশে) নড়ে উঠল এবং কাপড় সহ দৌড়াতে লাগল। মুসা আ. তাঁর লাঠি নিয়ে পাথরের পেছনে পেছনে "আমার কাপড়, আমার কাপড়" বলতে বলতে দৌড়তে লাগলেন। কিন্তু পাথরটি থামল না- দৌড়তেই লাগল। এভাবে পাথরটি বনী ইস্রাঈলের এক সমাবেশে পৌছে থেমে গেল। তখন লোকেরা মুসা আ.কে উলঙ্গ অবস্থায় দেখে নিল। এবং দেহ নিখুঁত, নির্দোষ ও সুস্থ দেখতে পেল। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বনী ইস্রাঈলের মিথ্যারোপ থেকে নিখুঁত প্রমাণিত করলেন। পাথরটি থেমে গেলেই তিনি তাঁর কাপড় তুলে নিয়ে পরে নিলেন আর লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করতে লাগলেন। আল্লাহর শপথ, মুসা আ.'র আঘাতের কারণে পাথরের গায়ে তিন, চার অথবা পাঁচটি দাগ বসে গিয়েছিল।[৫৩৯]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا. অর্থ: হে মুমিনগণ! মুসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। তারা যা বলেছিল, আল্লাহ্ তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্র কাছে ছিলেন মর্যাদাবান।[৫৪০]

[৫৩৯]. ইমাম বুখারী র., বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃ. ৪৮৩, হাদিস নং ৩১৬৫ ও ইমাম মুসলিম র., ২৬১হি., মুসলিম শরীফ, কিতাবুল হায়েয, হাদিস নং ৬৭৮ এবং আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বিয়া, খণ্ড-২, পৃ. ৩৫৩।

[৫৪০]. সূরা আহযাব, আয়াত: ৬৯।

গরু যবেহের ঘটনাঃ

বনী ইসরাঈলে আবীল নামক জনৈক ধনাঢ্য নিঃসন্তান ব্যক্তি ছিল। তার চাচাত ভাই তাকে সম্পত্তির লোভে হত্যা করেছে। অথবা মুল্লা আলী কারী র. মিরকাত গ্রন্থে বলেছেন এই হত্যাকাণ্ডের কারণ ছিল বিবাহ জনিত। জনৈক ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির কন্যার পানি গ্রহণ করার প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং এই পানিপ্রার্থী কন্যার পিতাকে হত্যা করে গা ঢাকা দেয়। ফলে হত্যাকারী কে? তা জানা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

অতঃপর হত্যাকারী হত্যা করে লাশ অপর বস্তি এলাকার কপাটে ফেলে আসে। আর সকালে গিয়ে নিজেই অভিভাবক সেজে হযরত মুসা আ.'র নিকট হত্যার বিচার দাবী করল এবং ঐ এলাকা বাসীকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করল। এমনকি তাদের হত্যার বদলে হত্যা দাবী করল। হযরত মুসা আ. এলাকাবাসীর নিকট জানতে চাইলে তারা অস্বীকার করল এবং মুসা আ. কে বলল, আপনি দোয়া করুন যাতে এর প্রকৃত ঘটনা আল্লাহ তায়ালা উদঘাটন করে দেন।

অতঃপর তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা গাভী যবেহ করার নির্দেশ দেন। আর এই গাভী যবেহের রহস্য হল- হযরত মুসা আ. নিজে হত্যাকারীর পরিচয় দিলে হয়তো এই অবাধ্য বনী ইসরাঈল তা মানতনা। এই জন্য মু'জিযার মাধ্যমে মুর্দাকে জীবিত করে সে নিজেই যেন তার হত্যাকারীর নাম বলে দেয়। তাছাড়া কেসাস নেওয়ার জন্য ওয়ারিশের দাবীর প্রয়োজন হয়। তিনি চাইলেন যে, মুর্দা নিজেই কেসাসের দাবীদার হয়। এ ছাড়াও আরো একটা বড় রহস্য হল যে, আল্লাহ তায়ালা মুসা আ.'র মাধ্যমে একটি বড় মু'জিযা প্রদর্শন করা। আর তা হল মৃত গাভী দ্বারা মৃত লাশকে জীবিত করা।

তারপর তার অভাবনীয় অধিক মূল্য দিয়ে কাঙ্খিত সেই গাভী ক্রয় করে যবেহ করে তার জিহ্বা, লেজ কিংবা অন্য কোন একটি অংশ সেই মৃতলাশের উপর নিক্ষেপ করা মাত্র লাশ জীবিত হয়ে স্পষ্ট ভাষায় নিজের হত্যাকারীর নাম বলে দিয়ে পুনরায় মৃত্যুবরণ করল।[৫৪১]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ . قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

[৫৪১]. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:১ম, পারা:১ম, পৃ:৪২৩ ও ৪৩৮

فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ . قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ . قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ . قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ . وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ . فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .

অর্থ: যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করতে বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? তিনি বললেন, মুর্খদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তারা বলল, তুমি তোমার পালন কর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, সেটা হবে একটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়, বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের। এখন আদিষ্ট করে ফেল। তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর যে, তার রং কিরূপ হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী- যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। তারা বলল, তুমি তোমার প্রভূর কাছে প্রার্থনা কর যেন তিনি বলে দেন যে, সেটা কিরূপ? কেননা; গরু আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হয়। ইনশাল্লাহ এবার আমরা অবশ্যই পথপ্রাপ্ত হব। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন যে, এ গাভী ভূকর্ষণ ও পানি সেচনের শ্রমে অভ্যস্থ নয়- হবে নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত। তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটা যবেহ করল, অথচ যবেহ করবে বলে মনে হচ্ছিলনা। যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিল। যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেয়া ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়। অতঃপর আমি বললাম, গরুর একটি খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন- যাতে তোমরা চিন্তা কর।[৫৪২]

বনী ইস্রাঈলের নির্বুদ্ধিতা :

'তীহ' প্রান্তরে হযরত মুসা আ.'র দোয়ার বরকতে আল্লাহ তায়ালা বনী ইস্রাঈলের জন্যে বিনা পরিশ্রমে সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কেবল

[৫৪২]. সূরা বাকারা', আয়াত: ৬৭-৭৩

মিষ্টি জাতীয় খাবারে তারা তুষ্ট হতে পারেনি। তাই তারা হযরত মুসা আ.কে বলল যে, হে মুসা! আমরা একই ধরণের খাদ্যে কখনো ধৈয্যধারণ করবো না। সুতরাং আপনি আপনার পালনকর্তার নিকট আমাদের জন্যে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের জন্যে এমন বস্তু সামগ্রী উৎপাদন করেন, যা জমিতে উৎপন্ন হয়। যেমন তরকারী, কাকড়ি, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি। এর পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল যে, যতই ভাল খাবার হোক না কেন, দীর্ঘদিন যাবৎ খেতে থাকলে এক সময়ে তা বিরক্তকর হয়ে পড়ে। অথবা তাদের যুক্তি ছিলো- আমরা পূর্ব থেকেই এই ধরণের খাবারের অভ্যস্থ ছিলাম না। তাছাড়া আমরা মাটিতে বসবাসকারী মানুষ সুতরাং মাটি থেকে উৎপন্ন খাবার আমাদের চাই। অথবা এর কারণ হলো একই মানের খাবার ধনী-গরীব সবার জন্যে এরূপ হতে পারেনা বরং ধনী-গরীবের ভেদাভেদ অনুযায়ী খাবারের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিত যাতে বড়-ছোট ও ধনী-গরীব পার্থক্য হয়ে যায়। তখন হযরত মুসা আ. তাদের উদ্দেশ্যে বললেন- তোমরা কি উত্তম বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু নিতে চাও? এখানে আল্লাহ তায়ালা 'মান্ন ও সালওয়া'কে উত্তম খাবার বলেছেন। কারণ এ দু'টি আসমানী খোদাপ্রদত্ত বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত খাবার। এগুলো সম্পূর্ণ দূষণ ও রোগমুক্ত পবিত্র খাবার। পক্ষান্তরে তাদের চাহিদা বস্তু সমূহ মাটি, পানি ও পরিশ্রম দ্বারা সৃষ্ট, যার মধ্যে অনেক প্রকারের রোগ-ব্যাধি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া এগুলোর জন্য পরিশ্রম করে গেলে ইবাদতের সময় হ্রাস হয়ে যায় ইত্যাদি কারণে এগুলোকে এ দু'টির তুলনায় নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। মুসা আ. তাদেরকে অনেক বুঝিয়েছেন এসব চাহিদা পরিত্যাগ করতে কিন্তু তারা তাদের চাহিদায় অটল রইল। ফলে মুসা আ. বললেন, ঠিক আছে, তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, সেখানে তোমরা কষ্ট করে চাষাবাদ কর তবেই তোমাদের কাম্য বস্তু পেয়ে যাবে। তবে মেহনত করলে পাবে নতুবা বঞ্চিত হবে। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর বাড়তি কষ্ট ও লাঞ্চনা নিয়ে নিল। তাদের উপর আল্লাহর অসংখ্য রহমত, নিয়ামত অবতীর্ণ হওয়ার পরও তারা আল্লাহর অনুগত না হয়ে অবাধ্য, নাফরমান ও সীমালজ্ঞনকারী হয়েছিল। ফলে পরমুখাপেক্ষীতা তাদের উপর চেপে দেয়া হল এবং আল্লাহর রোষানলে পতিত হল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন–

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ

بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ. অর্থ: আর তোমরা যখন বললে, হে মুসা! আমরা একই ধরনের খাদ্য-দ্রব্যে কখনও ধৈর্যধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন বস্তুসামগ্রী দান করেন, যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারী, কাকড়ী, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি। মুসা আ. বললেন, তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম? তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে যা তোমরা কামনা করছ। আর তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। এমন হলো এজন্য যে, তারা আল্লাহর বিধি-বিধান মানতো না এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমালংঘনকারী।[৫৪০]

কারূনঃ

কারূন হযরত মুসা আ.'র আপন চাচত ভাই। মুসা আ.'র চাচা ইয়াসহারের পুত্র। সে প্রথমে মুসা আ.'র উপর ঈমান এনেছিল। সে অত্যন্ত সুন্দর দেহের অধিকারী এবং তাওরাতের বড় আলেম, কারী ও তাওরাতের হাফিয ছিলেন। সে অত্যন্ত সুশ্রী, বিনয়ী ও সচ্চরিত্র লোক ছিল। সম্পদশালী হয়েই সামেরীর ন্যায় মুনাফিক হয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা তাকে এতই ধন-ভাণ্ডার দান করেছেন যে, তার ধন-ভাণ্ডারের চাবি বহন করা হতো চল্লিশটা খচ্চরের পিঠে করে। কিন্তু সে সম্পদের মোহে পড়ে আল্লাহর দয়া ও দানকে অস্বীকার করে বসল। সে বলতে লাগল এই সম্পদের দাবীদার আমি নিজেই। এখানে অন্য কারো কোন করুণা কিংবা সাহার্য্যের কৃতিত্ব নেই। সব কৃতিত্ব আমার নিজের। নিজের জ্ঞান ও পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সম্পদ অর্জিত হয়েছে। এখানে জ্ঞান বলতে হয়তো তাওরাতের জ্ঞান অথবা রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞান বুঝানো হয়েছে যা সে হযরত মুসা আ. থেকে শিখেছিল। সে রাঙ্গতাকে (এক প্রকারের নরম ধাতু) রূপা এবং তামাকে স্বর্ণ বানিয়ে ফেলতো। অথবা ব্যবসা সংক্রান্ত জ্ঞান কিংবা কৃষি বিষয়ক জ্ঞান বা অন্য কোন পেশার জ্ঞান উদ্দেশ্য। সে ধন-দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী ইস্রাঈলের সাথে অহংকার করতো এবং তাদের লাঞ্চিত ও হেয় প্রতিপন্ন করতো। সে তার সম্পদের যাকাত দিতনা এবং গরীব-মিসকীনদের হক আদায় করতো না।

প্রথমে একদল বিশ্বাসী তাকে উপদেশ দিয়ে বলল, আমরা তোমার ধন-সম্পদ নষ্ট হোক তা চাইনা বরং এগুলো যেন চিরস্থায়ী হয় তাই কামনা করছি, তবে তুমি অহংকার পরিত্যাগ কর, আল্লাহর দয়া স্বীকার কর এবং গরীব-

---

[৫৪০]. সূরা বাকারা, আয়াত: ৬১।

মিসকীনদের হকও আদায় কর। এতে তোমার সম্পদ ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে তোমার উপকারে আসবে। কিন্তু দৌলতের মোহ তাকে এমন অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে যে, তার শুভাকাঙ্খীদেরকে অপদস্ত করল আর বলল, তোমাদের পরামর্শ তোমাদের কাছে রাখ যাতে কোন সময় তোমাদের কাজে আসবে। আমাকে পরামর্শ দেয়ার প্রয়োজন নাই, কারণ আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। সে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের আরো অধিক লজ্জা দেয়ার উদ্দেশ্যে একবার শনিবারে খুবই জাঁকজমকের সহিত এমনভাবে বের হলো যে, সে নিজে সাদা রঙের খচ্চরের উপর আরোহণ করেছিল। সোনালী যীনের উপর খুবই মূল্যবান ও উন্নতমানের পোশাক পরিহিত ছিল। তার সাথে তার নব্বই হাজার দাস-দাসী সুন্দর সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়ে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের পোশাক ছিল রেশমের, ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। অর্থাৎ অতি শানদার শোভাযাত্রা বের করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল তার ধন-সম্পদ এবং মান-মর্যাদা বনী ইস্রাঈলের গরীব লোকদের সামনে পেশ করে তাদেরকে হেয় করা আর নিজেকে শ্রেষ্ঠ বিত্তবান প্রকাশ করা। তার এই শানদার শোভাযাত্রা দেখে দূর্বল বিশ্বাসীরা বলল, হ্যায়, আমরাও যদি তেমনি ধন-দৌলত পেতাম যেমনি পেয়েছে কারুন! নিশ্চয় সে বড় সৌভাগ্যবান।

অবশেষে হযরত মুসা আ. গিয়ে তাকে যাকাত দিতে এবং গরীব-মিসকীনের হক আদায় করার আহ্বান জানালেন। কিন্তু সে সম্পদের মোহে অন্ধ হয়ে মুসা আ.'র কথা রাখলনা বরং তাঁর বিরুদ্ধে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও মিথ্যা অপবাদ দিতে লাগল। সে বলতে লাগল হে মুসা! আপনি আমার কষ্টার্জিত সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। এভাবে ধন-সম্পদ ব্যয় করে সে মুসা আ.'র বিরুদ্ধে লোকজনকে ক্ষেপিয়ে তোলার অপচেষ্টায় লিপ্ত হলো। অত:পর মুসা আ. আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন তাকে সৎপথে আনতে সক্ষম হলেন না বরং তার বিরুদ্ধাচরণ ও অপকৌশল বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন মুসা আ. আল্লাহর দরবারে তার ধ্বংসের জন্য দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা তার ধ্বংসের ব্যবস্থা করলেন।

কারূনের ধ্বংসের ঘটনা:

কারূনের ধন-সম্পদ সহ ধ্বংসের ঘটনা ঐতিহাসিকগণ এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত মুসা আ. বনী ইস্রাঈলকে নদী পার করে নিয়ে যাওয়ার পর কুরবানীর তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে ছিলেন হযরত হারূন আ.কে। বনী ইস্রাঈল নিজ নিজ কুরবানীর জিনিস সমূহ হযরত হারুন আ.'র নিকট নিয়ে আসতো আর তিনি তা 'মাযবাহ' তথা কুরবানীর স্থানে রাখতেন। আসমান থেকে আগুন এসে তা খেয়ে ফেলতো। হারুন আ.'র এই মর্যাদা দেখে কারূনের অন্তরে ঈর্ষা

আসলো। কারূন হযরত মুসা আ.কে বলল, নবুয়ত রিসালত তো আপনার ভাগ্যে জুটেছে, কুরবানীর সর্দারী হযরত হারুন আ. পেয়েছেন। আমার ভাগ্যে কিছুই জোটলনা অথচ আমি তাওরাতের একজন উত্তম কারী বা পাঠক। আমি এটা সহ্য করতে পারবো না। মুসা আ. বললেন, হারুন আ.কে এই দায়িত্ব আমি দেইনি বরং আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। কারূন বলল, আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ না আমাকে এর প্রমাণ দেখাবেন। হযরত মুসা আ. বনী ইস্রাঈলের নেতৃত্বস্থানীয় লোকদের একত্রিত করে বললেন, তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের লাঠি সমূহ নিয়ে এসো। তিনি লাঠি সমূহ নিজের তাঁবুতে রাখলেন। বনী ইস্রাঈলা সারা রাত ঐ লাঠিসমূহ পাহারা দিল। সকালে হযরত হারুন আ.'র লাঠি সবুজ-শ্যামল হয়ে জীবন্ত বৃক্ষ হয়ে পাতা বের হয়ে আসল। হযরত মুসা আ. কারুনকে বললেন, হে কারুন! তুমি কি এই ঘটনা দেখেছ? সে বলল, হ্যা, দেখেছি তবে এটি আপনার যাদুর চেয়েও আশ্চর্যজনক নয়। হযরত মুসা আ. তাকে মানাতে চেষ্টা করতে লাগলেন আর সে তাঁকে সর্বদা কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে। তার অবাধ্যতা, অহংকার এবং হযরত মুসা আ.'র সাথে দুশমনী দিন-দিন বাড়তেই আছে। সে একটি মহল নির্মাণ করল, যার দরজা ছিল স্বর্ণের আর দেয়ালের উপর স্বর্ণের তখত স্থাপন করা ছিল। বনী ইস্রাঈল সকাল সন্ধ্যা তার কাছে আসতো, খাবার খেতো আর খোশালাপ করে তাঁকে নিয়ে হাসাতো। যখন যাকাতের বিধান নাযিল হলো তখন কারূন মুসা আ.'র নিকট এসে বলল, আমি দেরহাম, দীনার, জন্তু ইত্যাদির হাজার ভাগের একভাগ হিসাবে যাকাত দেবো। কিন্তু ঘরে গিয়ে হিসাব করে দেখল যে, এ হিসাবেও অনেক বড় অংশ সম্পদ হয়ে যাচ্ছে। তখন তা দিতেও তার সাহস হলো না। অত:পর সে বনী ইস্রাঈলের আপন লোকজনকে একত্রিত করে বলল, তোমরা মুসা আ.'র প্রত্যেক কথার অনুসরণ করেছ। এখন তিনি তোমাদের সম্পদ হস্ত গত করে তোমাদেরকে ফকীর বানাতে চাচ্ছেন। এ ব্যাপারে তোমরা কি বল? তারা উত্তরে বলল, আপনি আমাদের মুরুব্বী, আপনি যা বলবেন আমরা তা করবো। সে বলল, তোমরা এমন কোন তদ্‌বীর করো যাতে হযরত মুসা আ.'র সম্ভ্রম ও আস্থা বনী ইস্রাঈলের হৃদয় থেকে নি:শেষ হয়ে যায়।

পরিশেষে হযরত মুসা আ.কে লোক সমাগমে যিনার অপবাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। সে মতে এক সুন্দরী মহিলাকে সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা নগদ দিয়ে এবং বহু ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি দিয়ে অপবাদ দেওয়ার জন্য তৈরী করে নিল। পরদিন বনী ইস্রাঈলের লোকজনকে জমায়েত করে হযরত মুসা আ.কে ওয়াযের বাহানা করে ডেকে আনলো। তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে ওয়ায করলেন এবং বিভিন্ন অপরাধের শাস্তির

কথা উল্লেখ করে বললেন, যিনাকারী যদি কুমার হয়, তবে তাকে একশত চাবুক মারা হবে, আর যদি বিবাহিত হয়, তবে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে।

এ বক্তব্য শুনে কারূন বলল, এ বিধান কি সকলের জন্য, এমনকি আপনার জন্যও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার জন্যও একই বিধান। সে বলল, বনী ইস্রাঈলের ধারণা যে, আপনি অমুক বদ অভ্যস্থ নারীর সাথে যিনা করেছেন। তিনি বললেন, ওই নারীকে ডাক। মহিলা আসলে হযরত মুসা আ. বললেন, তোমাকে সেই খোদার শপথ, যিনি বনী ইস্রাঈলের জন্য সমুদ্রে পথ করে দিয়েছিলেন এবং তাওরাত নাযিল করেছেন, সত্য করে বল আসল ঘটনা কি? মহিলা বলল, কারূন যা বলতে চাচ্ছে আল্লাহর কসম তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং সে আপনার উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার জন্য আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে। সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর হযরত মুসা সিজদায় পড়ে কারূনের বিরুদ্ধে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমি যদি আপনার সত্য রাসূল হয়ে থাকি তবে আমার কারণে আপনি তাকে গজব দিন। সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা ওহী নাযিল করে বললেন, হে মুসা! আমি মাটিকে আপনার অনুগত করে দিয়েছি, আপনি মাটিকে যা আদেশ করবেন মাটি তা পালন করবে। তিনি সিজদা থেকে শির তুলে বললেন, যারা কারূনের সাথী তোমরা তার সাথে তার স্থানে অবস্থান করো আর যারা আমার সাথী হবে তারা পৃথক হয়ে যাও। তখন কেবল দু'জন ব্যক্তি ছাড়া বাকী সবাই পৃথক হয়ে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করল। হযরত মুসা আ. মাটিকে নির্দেশ দিলেন, হে মাটি! এদেরকে গ্রাস করো। সাথে সাথে তারা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে ধ্বসে গেলো। এরপর পুনরায় একই আদেশ করলে তারা কোমর পর্যন্ত ধ্বসে গেলো। অত:পর আবারো নির্দেশ দিলে তারা গলা পর্যন্ত ধ্বসে গেলো। তখন কারূন মুসা আ.'র নিকট অনেক আবেদন-নিবেদন করল এবং আত্মীয়তার দোহাই দিল কিন্তু হযরত মুসা আ. তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করেননি। এভাবে কারূন সম্পূর্ণ মাটিতে ধ্বসে গেলো আর মাটি সমান হয়ে গেলো। হযরত কাতাদাহ রা. বলেন, সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটিতে ধ্বসতে থাকবে। বনী ইস্রাঈলরা বলতে লাগল যে, মুসা আ. কারূনের ধন-সম্পদ, বাড়ী-ঘর হস্তগত করার উদ্দেশ্যে এই বদদোয়া করেছিলেন। তাদের একথা শুনে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন– হে মাটি! তুমি কারূনের ধন-সম্পদ, বাড়ী-ঘর সহ গ্রাস করো। সুতরাং মাটি ওইসব সহ তাদেরকে গ্রাস করে নিল।[৫৪৪]

[৫৪৪]. আল্লামা নঈমুদ্দিন মোরাদাবাদী র., খাযায়েনুল ইরফান, পৃ. ৪৬৯।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ . وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ . قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ . فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ . وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ . فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ . وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ . تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ .

অর্থ: কারূন ছিল মুসার সম্প্রদায়ভূক্ত। অত:পর সে তাদের প্রতি দুষ্টামি করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধন–ভাণ্ডার দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে ভালবাসেন না। আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান–গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধন-সম্পদে অধিক প্রাচুর্যশীল? পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। অত:পর কারূন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল, হায়, কারূন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেয়া হত। নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে, যারা ঈমানদার এবং সৎকর্মী, তাদের জন্যে আল্লাহর দেয়া সওয়াবই উৎকৃষ্ট। এটা তারাই পায়, যারা সবরকারী।

অত:পর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না। গতকল্য যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা প্রত্যুষে বলতে লাগল, হায়, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন ও হ্রাস করেন। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। হায়, কাফেররা সফলকাম হবে না। এই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। খোদাভীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম।[৫৫৫]

হযরত মুসা আ. ও খিযির আ.:

সহীহ বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও জামে তিরমিযী গ্রন্থ সমূহে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, একদিন হযরত মুসা আ. বনী ইস্রাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জৈনক ব্যক্তি প্রশ্ন করল যে, মানুষের মধ্যে বড় জ্ঞানী কে? হযরত মুসা আ. ছিলেন ওহীর ধারক-বাহক। যিনি এরূপ হন তিনিই সমকালের বড় জ্ঞানী হয়ে থাকেন। সে মতে তিনি বলেছিলেন, আমিই সবার চেয়ে বড় জ্ঞানী। এ উত্তর আল্লাহর পছন্দ হলো না। একজন জলিলুল কদর নবী হিসাবে এবং আল্লাহর প্রতি আদব রক্ষার্থে বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। তাঁর বলা উচিৎ ছিল- এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছিলেন সবচেয়ে বড় জ্ঞানী কে, তা আমি জানি না। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসল যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চেয়েও অধিক জ্ঞানী। একথা শুনে হযরত মুসা আ. আবেদন করলেন, তাহলে তো জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে আমাকে সফর করে তাঁর কাছে যাওয়া উচিত। হে আল্লাহ্! আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ্ বললেন, থলের মধ্যে পাথেয় হিসাবে একটি মাছ নিয়ে নিন আর দুই সমুদ্রের সঙ্গম স্থলের দিকে ভ্রমণ করুন। যেখানে পৌছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাক্ষাত পাবেন। হযরত মুসা আ. আল্লাহর নির্দেশ মতে থলের মধ্যে একটি ভূনা মাছ নিয়ে রওয়ানা হলেন। সফরসঙ্গী হিসাবে তাঁর খাদেম হযরত ইউশা ইবনে নূনকেও সঙ্গে নিলেন। পথিমধ্যে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর মাথা রেখে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে

[৫৫৫]. সূরা কাসাস, আয়াত, ৭৬-৮৩।

হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তায়ালা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের ন্যায় হয়ে গেল। হযরত ইউশা ইবনে নূন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করছিল। এ সময় মুসা আ. নিদ্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন তখন ইউশা' ইবনে নূন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা মুসা আ.কে বলতে ভুলে গেলেন এবং সে স্থান থেকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত ভ্রমণ করার পর সকাল বেলায় মুসা আ. খাদেমকে বললেন, আমাদের নাস্তা আন, এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তখন ইউশা' ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। তিনি ভুলে যাওয়ার ওযর পেশ করে বললেন, শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। ইউশা' ইবনে নূন মাছের আশ্চার্যজনকভাবে চলে যাওয়ার কথা বললে মুসা আ. বললেন, সেটিই তো আমাদের লক্ষ ও গন্তব্যস্থল। তখন তারা তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পূর্বের পথ ধরে সে স্থানটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং প্রস্তর খণ্ডের পাশে পৌছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদর আবৃত অবস্থায় শুয়ে আছেন। মুসা আ. সালাম করলে খিযির আ. বললেন, এই নির্জন প্রান্তরে সালাম দিল কে? মুসা আ. বললেন, আমি মুসা। খিযির আ. প্রশ্ন করলেন, বনী ইস্রাঈলের মুসা! তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমিই বনী ইস্রাঈলের মুসা। আমি আপনার কাছ থেকে সেই বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত খিযির আ. বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য্যধারণ করতে পারবেন না। আল্লাহ্ আমাকে এমন জ্ঞান (তাকভীনী ইলম) দান করেছেন, যা আপনার কাছে নেই, পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান (তাশরীয়ী ইলম) দান করেছেন, যা আমার কাছে নেই। মুসা আ. বললেন, ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি আপনার কোন কাজে বিরোধিতা করবো না।

হযরত খিযির আ. বললেন, আপনি যদি আমার সাথে থাকতেই চান তবে, কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে এর রহস্য বলে দেই। হযরত মুসা আ. শর্ত মেনে নেয়ার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা আসলে তারা সমুদ্র পার হওয়ার মনস্থ করলেন। মাঝিরা হযরত খিযির আ.কে চিনে ফেলল এবং কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই খিযির আ. কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তখ্‌ত তুলে ফেললেন অর্থাৎ নৌকা ছিদ্র করে দিলেন। এতে হযরত মুসা আ. বললেন, তারা কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে

নৌকায় তুলে নিয়েছে। অথচ আপনি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন যাতে সবাই ডুবে যায়? এটি বড় মন্দকাজ করলেন আপনি। খিযির আ. বললেন, আমি আগেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য্যধারণ করতে পারবেন না। হযরত মুসা আ. ওযর পেশ করে বললেন, আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার উপর রাগ করবেন না। রাসূল ﷺ এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, হযরত মুসা আ.'র প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল। ইতিমধ্যে একটি পাখি এসে নৌকার একপ্রান্তে বসে সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি ঠোঁটে তুলে নিল। খিযির আ. হযরত মুসা আ.কে বললেন, আমার এবং আপনার জ্ঞান উভয়ে মিলে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের মোকাবিলায় এমন তুলনাও হয়না, যেমনটি এই বিশাল সমুদ্রের পানির সাথে এই পাখীর এক চঞ্চু পানি।

অত:পর তারা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ হযরত খিযির আ. একটি সুন্দর বালককে অন্যান্য বালকের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিযির আ. দেয়ালের আড়ালে নিয়ে নিজ হাতে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। ফলে বালকটি মরে গেল। হযরত মুসা আ. বললেন, আপনি একটি নিষ্পাপ শিশুকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এটি মস্তবড় পাপ। প্রথম ঘটনা নৌকা মেরামত করলে ঠিক হয়ে যায় কিন্তু এটিতো আরো বড় সমস্যা। কারণ মৃত ব্যক্তিকে তো জীবিত করা যায়না। খিযির আ. বললেন, আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য্য ধরতে পারবেন না। হযরত মুসা আ. দেখলেন যে, এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই বললেন, এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওযর চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে।

অত:পর পুনরায় চলতে চলতে এক গ্রাম দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁরা গ্রামবাসীর কাছে কিছু খাবার চাইলেন। কিন্তু গ্রাম বাসীরা খাবার দিতে অস্বীকার করে দিল। হযরত খিযির আ. এই গ্রামে একটি প্রাচীর পতনোন্মুখ দেখে নিজ হাতে তিনি প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। হযরত মুসা আ. অবাক হয়ে বললেন, আমরা তাদের কাছে সামান্য খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ বিনা পরিশ্রমে করে দিলেন? ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক এদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারতেন। খিযির আ. বললেন, এখন শর্ত পূরণ হয়ে গেছে, এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

এরপর হযরত খিযির আ. উপরোক্ত ঘটনাত্রয়ের রহস্য বর্ণনা করলেন হযরত মুসা আ.'র নিকট। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা আমার

ভাই মুসা আ.'র উপর রহম করুন, যদি তিনি এতটুকু ধৈর্যধারণ করতেন, তবে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই এগুলোর রহস্য বর্ণনা করে দিতেন।

প্রথম ঘটনার রহস্যঃ

হযরত খিযির আ. যে নৌকাটি ছিদ্র করে দিয়েছিলেন, তা ছিল এমন দরিদ্রদের, যারা ছিল দশ ভাই। তন্মধ্যে পাঁচ ভাই ছিল বিকলাঙ্গ। বাকী পাঁচ জন মেহনত-মজুরী করে সকলের জীবিকার ব্যবস্থা করত, নদীতে নৌকা চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের মজুরী।

নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন যালিম বাদশাহ এই পথে চলাচলকারী সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। এই বাদশাহর নাম হলো জালন্দী ইবনে কাব্‌কার। সে স্পেনের বস্তি কর্ডোবার বাদশাহ ছিল। খিযির আ. নৌকার একটি তক্তা উপড়ে দেন, যাতে যালিম বাদশাহ'র লোকেরা নৌকা ভাঙ্গা দেখে ছিনিয়ে না নেয় বরং ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়। তবে মু'জিযার কারণে হোক কিংবা খিযির আ. কতৃক কিছুটা মেরামতের কারণে হোক নৌকায় কোন পানি প্রবেশ করেনি। ইমাম বগভী র.'র বর্ণনা মতে এই তক্তার স্থানে হযরত খিযির আ. একটি কাঁচ লাগিয়ে দেন, যা দিয়ে ছিদ্র দেখা গেলেও পানি প্রবেশ করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনার রহস্যঃ

হযরত খিযির আ. যে বালকটিকে হত্যা করেছিলেন, তার রহস্য হলো– তার প্রকৃতিতে কুফর ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল। অর্থাৎ সে বড় হয়ে কুফুরী করবে আর পিতা-মাতাকে কষ্ট দেবে। অথচ তার পিতা-মাতা ছিল সৎকর্মপরায়ন লোক। খিযির আ. ওহীর মাধ্যমে অবহিত হলেন যে, সে বড় হয়ে সৎকর্মপরায়ন পিতা-মাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কুফুরীতে লিপ্ত হয়ে পিতা-মাতার জন্য ফিৎনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালবাসায় পিতা-মাতার ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই তিনি তাকে হত্যা করলেন। তিনি আরো ইচ্ছে করলেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা এই পিতা-মাতাকে এ ছেলের পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম সন্তান দান করুক, যার চরিত্র হবে পবিত্র এবং পিতা-মাতার হক আদায় করবে। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা সেই পিতা-মাতাকে একজন সচ্চরিত্রবান কন্যা সন্তান দান করেন যার গর্ভে দু'জন নবী জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে, ওই নেককার কন্যা সন্তান একজন নবীর বিবাহাধীন হন, যার গর্ভে সত্তরজন নবী হয়েছে। আর ছেলেটির নাম 'যায়সূর' মায়ের নাম ছিল 'সাহওয়া' এবং পিতার নাম ছিল 'যোবায়ের'।

হযরত মুসা আ. হযরত খিযির আ.'র সাথে নিষ্পাপ ছেলে হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে হযরত খিযির আ. ছেলের গর্দানে চামড়া তুলে মহরাঙ্কিত লেখা দেখালেন যে, "এ কাফের, কখনো ঈমান আনবেনা।"

তবে এই ঘটনার উপর অনুমান বা ভিত্তি করে কোন কাফির বা পাপী ব্যক্তিকে হত্যা করা কারো জন্যে জায়েয নয়। এটা কেবল হযরত খিযির আ.'র জন্য বিশেষ কারণে বৈধ ছিল।

তৃতীয় ঘটনার রহস্যঃ

প্রাচীরটি ছিল ইনতাকীয়া নগরের দু'জন ইয়াতীম ছেলের। যাদের নাম হলো 'আহ্‌রাম' ও 'হারাম'। তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ন। তারা বড় হয়ে মীরাসী সম্পত্তি গ্রহণ করার নিমিত্তে ওই প্রাচীরের নীচে স্বর্ণ-রৌপ্যের গুপ্তধন রক্ষিত করে রেখেছিল। এই প্রাচীরের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে গেলে তা উন্মুক্ত হয়ে যাবে আর লোকেরা লুটে নিয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তায়ালা হযরত খিযির আ.'র মাধ্যমে তা সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন।

উক্ত আয়াত দ্বারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ইনতাকীয়া বাসীগণ অতিথি পরায়ন নয় বলে বদনামীর ভাগী হয়েছে। তাফসীরে রূহুল বয়ানে তাফসীরে কবীরের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ আয়াত নাযিল হবার পর ইনতাকীয়া বাসীগণ রাসূল ﷺ'র দরবারে বহু স্বর্ণ আনলো আর আরয করল, হুযূর! এই স্বর্ণগুলো কবুল করুন এবং কুরআনে বর্ণিত فَـأبَوْا (যার অর্থ ইনতাকীয়া বাসীরা মেহেমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানাল) এর ب অক্ষরকে ت বানিয়ে فَـأتَوْا করে দিন। যাতে এর অর্থ হয়- ইনতাকীয়া বাসীগণ আতিথ্য নিয়ে এসেছিল। এতে আমাদের বদনামী মুছে যাবে। কিন্তু তাদের আবেদন নামঞ্জুর হলো আর রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন এটা আল্লাহর কালামের বিকৃতি সাধনের শামিল।

উক্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন সৎ লোকের কারণে তার সন্তানরা এবং আত্মীয় স্বজনরাও উপকৃত হয়। যেমন- নেক্কার পিতার উসিলায় ইয়াতীম নাবালেগের সম্পদ আল্লাহ তায়ালা খিযির আ.'র মাধ্যমে রক্ষা করলেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির র. বলেন, এক বান্দার সৎকর্মপরায়নতার কারণে আল্লাহ্ তায়ালা তার পরবর্তী সন্তান-সন্ততি, বংশধর ও প্রতিবেশীদের রক্ষা করেন।[৫৫৬]

হযরত শিবলী র. বলতেন, আমি এই শহর এবং সমগ্র এলাকার জন্যে শান্তির কারণ, তাঁর ওফাতের পর তাঁর দাফন সমাপ্ত হওয়া মাত্র দায়লামের কাফিররা দাজলা নদী পার হয়ে আক্রমণ করে বাগদাদ নগরী দখল করে নেয়। তখন

৫৫৬. হযরত ছানাউল্লাহ পানিপথি র., তাফসীরে মাযহারী।

সবাই বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ চেপে বসেছে। অর্থাৎ একটি হযরত শিবলী র.'র ওফাত ও অপরটি কাফিরদের হাতে বাগদাদের পতন।[৫৫৭]

অত:পর হযরত খিযির আ. মুসা আ.কে বললেন, وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا আর এসব কিছু আমি নিজ থেকে করিনি। এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা ওই সব বিষয়ের, যেগুলোর উপর আপনার ধৈর্যধারণ করা সম্ভবপর হয়নি।

একথা বলে হযরত খিযির আ. নিম্নলিখিত উপদেশগুলো দিয়ে হযরত মুসা আ.কে বিদায় দেন।

১. আপনি সৃষ্টির হিতকাঙ্খী হোন, ক্ষতিকারক হবেন না। ২. সর্বদা হাসিমুখে থাকবেন, চেহারা কুঞ্চিৎ করে রাখবেন না। ৩. মানুষের তোষামোদ করবেন না। ৪. বিনা কারণে কোথাও যাবেন না। ৫. বেশী হাসবেন না। ৬. কোন গুনাহগারকে তাওবা করার পর লজ্জা দেবেন না। ৭. সব সময় নিজের ভুলের জন্য কান্নাকাটি করুন। ৮. আজকের কাজ আগামী কালের জন্য রেখে দেবেন না। ৯. আখিরাতের জন্য চিন্তা করুন।

হযরত মুসা আ. ও হযরত খিযির আ. সম্পর্কীয় ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا . فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا . فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا . قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا . قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا . فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا . قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا . قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا . وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا . قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا . قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا . فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا . قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا . قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ

৫৫৭. ইমাম কুরতুবী র., তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড-১১, পৃ. ২৯।

وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا . فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا
زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا . قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا .
قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا . فَانْطَلَقَا حَتَّى
إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ
فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا . قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا
لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا . أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ
أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا . وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ
فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا . فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا
. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي
ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا .

অর্থ: যখন মুসা তাঁর যুবক (সঙ্গী)-কে বললেন: দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। অত:পর যখন তাঁরা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। অত:পর মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি করে নেমে গেল। যখন তাঁরা সেস্থানটি অতিক্রম করে গেলেন, মুসা সঙ্গীকে বললেন: আমাদের নাশতা আন। আমরা এই সফরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। সে বলল: আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তরখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। মুসা বললেন: আমরা তো এ স্থানটিই খুঁজছিলাম। অত:পর তাঁরা নিজেদের চিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। অত:পর তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম ও আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। মুসা তাঁকে বললেন: আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? তিনি বললেন: আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। যে বিষয় বোঝা আপনার আয়ত্তাধীন নয়, তা দেখে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে? মুসা বললেন: আল্লাহ্ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য

করব না। তিনি বললেন: যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি। অত:পর তারা চলতে লাগল: অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল, তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন। মুসা বললেন: আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে এতে ছিদ্র করে দিলেন? নিশ্চয়ই আপনি একটি গুরুতর মন্দ কাজ করলেন। তিনি বললেন: আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারবেন না? মুসা বললেন: আমাকে আমার ভুলের জন্যে অপরাধী করবেন না এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করবেন না। অত:পর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাত পেলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মুসা বললেন: আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। তিনি বললেন: আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। মুসা বললেন: এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। আপনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগ মুক্ত হয়ে গেছেন। অত:পর তারা চলতে লাগল, অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইল, তখন তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অত:পর তারা সেখানে একটি পতনোম্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন, সেটি তিনি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মুসা বললেন: আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন। তিনি বললেন: এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি, আমি তার তাৎপর্য বলে দিচ্ছি। নৌকাটির ব্যাপার-সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেই। তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। বালকটির ব্যাপার-তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। অত:পর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে মহত্তর, তার চাইতে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক।[৫৪৮]

এবং ঘটনাটি বুখারী শরীফে ৪৮২পৃ. ৩১৬২নং হাদিসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

---

৫৪৮. সূরা কাহাফ, আয়াত: ৬০-৮২।

হযরত খিযির আ.'র পরিচয়ঃ

খিযির আ. যদিও এনামে প্রসিদ্ধ তবে এটি তাঁর নাম নয়। খিযির শব্দের অর্থ হলো- সবুজ-শ্যামল। যেহেতু তিনি যেখানে বসতেন শুষ্ক মাটি হলেও সেখানে সবুজ তাজা ঘাস জন্মে যায়, তাই তিনি এ নামে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর নাম হচ্ছে– বালিয়া ইবনে মালিকান ইবনে ফালেখ ইবনে আমের ইবনে শালেখ ইবনে আরফাখশাদ ইবনে সাম ইবনে নূহ আ.। তাঁর উপনাম আবুল আব্বাস এবং উপাধি খিযির। তিনি ওই চার পয়গাম্বরের একজন, যাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত আপন জীবদ্দশায় থাকবেন। দু'জন যমিনের উপর ১. হযরত ইলিয়াছ আ., ২. হযরত খিযির আ.। আর দু'জন আসমানে- ১. হযরত ইদ্রীস আ. ও ২. হযরত ঈসা আ.। তবে কেউ কেউ তাঁকে ওলী বলে দাবী করলেও অধিকাংশের মতে তিনি নবী ছিলেন। তাঁর জীবন-মৃত্যু নিয়েও ওলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও জীবিত থাকার মতটিই প্রাধান্য পায়, কারণ যুগে যুগে অনেক আধ্যাত্মিক সাধকগণ তাঁর সাক্ষাত লাভে ধন্য হওয়ার ঘটনা প্রমাণিত আছে। এ প্রসঙ্গে তাফসীরে মাযহারীতে হযরত সানাউল্লাহ পানিপথি র. বলেন, হযরত সৈয়্যদ আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী র. তাঁর কাশফের মাধ্যমে যে সমাধান দিয়েছেন তার মধ্যে সব বিতর্ক নিস্পত্তি হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি নিজে কাশফ জগতে হযরত খিযির আ.কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, আমি ও ইলিয়াস আ. জীবিত নই। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এরূপ ক্ষমতা দান করেছেন যে, আমরা জীবিত মানুষের বেশ ধারণ করে বিভিন্নভাবে মানুষকে সাহায্য করতে পারি।

হযরত মুসা আ.কে বিশেষ তথা ত্বরীকতের জ্ঞানার্জনের জন্য হযরত খিযির আ.'র কাছে পাঠানো দ্বারা খিযির আ. মুসা আ. থেকে বড় হওয়া মোটেই প্রমাণিত হয়না। বরং অনেক সময় আংশিক কিছু শিখার জন্যে নিজের চেয়ে ছোটদের কাছে যেতে হয়। হযরত মুসা আ. হযরত খিযির আ.'র নিকট গিয়েছিলেন ইলমে শরীয়ত শিক্ষার জন্য নয় বরং ইলতে ত্বরীকত শিক্ষার জন্য। নতুবা আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাঈল আ.'র মাধ্যমে ওহী নাযিল করে শিক্ষা দিতেন। তাছাড়া ইলমে শরীয়ত মৌখিকভাবে শেখানো হয় পক্ষান্তরে ইলমে ত্বরীকত সঙ্গ (সুহবত) ও অন্তর দৃষ্টি দিয়ে শেখানো হয়।

হযরত মুসা ও ইউশা' আ. যে মাছটি সঙ্গে নিয়েছিলেন তা ছিল ভাজা মাছ। এটাকে পথের পাথেয় হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন নাকি মু'জিযা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিয়েছিলা তা সুস্পষ্ট নয়। তবে বুখারীর বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় তা আল্লাহর নির্দেশে থলে করে নেয়া হয়েছিল। তবে অনেকের মতে তা খাওয়ার

জন্য নেয়া হয়েছিল এবং তা থেকে তারা একাংশ খেয়েও ছিলেন আর অবশিষ্ট অংশ জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে গেল।

হযরত আবু হামেদ অন্দুলিসী র. বলেন, আমি 'সিবতাহ' শহরের নিকটে এই মাছের বংশদ্ভোব একটি মাছ দেখেছি, যার কিছু অংশ হযরত মুসা ও ইউশা' আ. খেয়েছিলেন। অবশিষ্ট অর্ধাংশকে আল্লাহ তায়ালা জীবিত করে দিলেন আর সেটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গ করে চলে গিয়েছিল। এই মাছের বংশ এখনো নদীতে বিদ্যমান। এটির প্রস্ত এক বিগত আর দৈর্ঘ্য একগজ। এর এক পাশে মাংস আছে অপর পাশে মাংস নেই। কান ও চোখ একটি এবং মাথা আছে অর্ধেক। লোকেরা এটিকে তাবাররুক মনে করে দূর-দূরান্তে হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে যেতো। ইবনে আতিয়্যাহ র. বলেন, আবু হামেদ আন্দুলিসী যে মাছের কথা বলেছেন, আমিও অনুরূপ মাছ দেখেছি।

এই মাছ সম্পর্কে ইমাম বুখারী র. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, মাছটি জীবিত হওয়ার কারণ হলো ঐ স্থানে 'আবে হায়াত' এর কূপ বিদ্যমান ছিল। ঐ কূপের পানি এই মাছের গায়ে লেগেছে তাই মাছ জীবিত হয়ে গেছে। কেননা এই পানির বৈশিষ্ট্য হলো কোন মুর্দা বস্তুতে ঐ কূপের পানি লাগলে তা জীবিত হয়ে যেতো।

হযরত কালবী র. বলেন, হযরত ইউশা' আ. 'আবে হায়াত' কূপ থেকে পানি দিয়ে উযূ করেছেন এবং উযূ'র অতিরিক্ত পানি ঐ মাছের গায়ে ছিটিয়ে দিলেন যা থলের মধ্যে ভাজা করে রাখা হয়েছিল। তখন ঐ মাছটি জীবিত হয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে পানিতে চলে গেল।

কেউ কেউ বলেছেন যে, এই মাছ পানিতে যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে শুষ্ক রাস্তা হয়ে যাচ্ছিল আর মুসা আ. মাছের পিছনে পিছনে সেই রাস্তা ধরে চলতে চলতে এক উপদ্বীপ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলেন। সেই দ্বীপেই তিনি হযরত খিযির আ.'র সাক্ষাত লাভ করেন।[৫৪৯]

দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল দ্বারা পারস্য সাগর ও রোম সাগরের মিলনস্থল বুঝানো হয়েছে। অথবা উরদূন সাগর ও কুলযূম সাগর উদ্দেশ্য। দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে হযরত মুসা আ. হযরত খিযির আ.'র মিলনের বা সাক্ষাতের হেকমত হলো– এরা দু'জনই হলেন জ্ঞানের সাগর। হযরত মুসা আ. হলেন, ইলমে জাহেরী তথা শরীয়তের জ্ঞানের সাগর আর হযরত খিযির আ. হলেন ইলমে বাতেনী তথা ত্বরীকতের জ্ঞানের সাগর। অর্থাৎ যেখানে দু'টি পানির সমুদ্রের মিলন হয়েছে সেখানে দু'জন জ্ঞানের সাগরের মিলন বা সাক্ষাত হলো।

---

[৫৪৯]. আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী র., ৮০৮হি., হায়াতে হাইওয়ান, উর্দু, খণ্ড-২, পৃ. ২২০।

ইমাম সুহাইলী র. বলেন, হযরত খিযির আ.'র পিতা একজন বাদশাহ ছিলেন এবং তাঁর মায়ের নাম ছিল 'আলহা'। তিনি তাঁকে একটি পাহাড়ের গর্তে জন্ম দিয়েছিলেন। সেখানে এক গ্রাম্য ব্যক্তির ছাগল পালের একটি ছাগল প্রতিদিন তাঁকে দুধ পান করাতো। পরে ঐ গ্রাম্য লোকটি যখন তাঁর সন্ধান পেল তখন তাকে গর্ত থেকে তুলে আনলো এবং লালন-পালন করলো। যখন খিযির আ. জওয়ান হলেন তখন তাঁর পিতা বাদশাহ'র একজন কাতেবের (লিখকের) প্রয়োজন হলো, যিনি হযরত শীষ ও ইব্রাহীম আ.'র উপর নাযিলকৃত সহীফা (আসমানী গ্রন্থ সমূহ) লিপিবদ্ধ করবেন। দেশের খ্যাতনামা বহু লিখক বাদশাহ'র দরবারে উপস্থিত হলো, যাদের মধ্যে খিযির আ.ও ছিলেন। অথচ কেউ জানতো না যে, তিনি বাদশাহ'র ছেলে। এমনকি তিনি নিজেও জানতেন না যে, তিনি বাদশাহ'র ছেলে। তবে সকলের মধ্যে বাদশাহ'র কাছে হযরত খিযির আ.'র লেখাই বেশী পছন্দ হলো। তাঁকে কাতেব হিসাবে নিয়োগ দেয়ার পূর্বে তাঁর বংশ পরিচয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার নির্দেশ দেন। অবশেষে তাঁর জন্ম কাহিনী প্রকাশ হলো এবং সাব্যস্ত হলো যে, তিনি বাদশাহ'রই সন্তান। এতে বাদশাহ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তাঁকে জনগণের দেখাশুনা করার দাযিত্ব অর্পণ করা হলো। কিছুদিন পর সে দায়িত্ব ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে যান এবং দেশে-দেশে, মাঠে-ময়দানে এবং পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরাফেরা করতে লাগলেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদা 'আবে হায়াত' নামক কূপে পৌঁছে গেলেন এবং এর পানি পান করলেন। এভাবে তিনি স্থায়ী বা দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। সুতরাং তিনি এখনো জীবিত এবং দাজ্জালের আগমণ পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। তিনি বাদশাহ যুল কারনাইনের খালত ভাই ছিলেন। ইমাম নববী র. সহ জমহুর ওলামা, সুফি এবং মা'রিফাতের অধিকারীগণের মতে তিনি আদৌ জীবিত আছেন।

বি:দ্র:- হযরত মুসা আ. ও হযরত খিযির আ.'র পুরো ঘটনা বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই পুরো ঘটনা সাজিয়ে লিখতে গিয়ে কোন নির্দিষ্ট কিতাবের উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে তাফসীরে রূহুল বয়ান, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান, তাফসীরে নঈমী, তাফসীরে নূরুল ইরফান, কাসাসুল কুরআন ও হায়াতে হাইওয়ান প্রভৃতি কিতাব থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

হযরত হারুন আ.'র মৃত্যুঃ

হযরত মুসা আ.'র আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত হারুন আ.কে নবুয়ত দান করেন। হযরত মুসা আ. নবী ও রাসূল উভয়ের অধিকারী ছিলেন

পক্ষান্তরে হযরত হারুন আ. ছিলেন কেবল নবী। তবে তিনি সর্বদা হযরত মুসা আ.কে সহযোগিতা দিয়েছেন। তিনি মুসা আ.'র তিন বছর বড় ছিলেন।

বনী ইস্রাঈল 'তীহ' প্রান্তরে ঘুরতে ঘুরতে 'হাউর' নামক পাহাড়ের চূড়ায় পৌছল তখন হারুন আ.'র মৃত্যুদূত আগমণ করল। হযরত হারুন ও মুসা আ. উক্ত পর্বত চূড়ায় প্রথমে কিছুদিন ইবাদতে মশগুল ছিলেন। যখন হযরত হারুন আ. ইন্তেকাল করলেন, তখন হযরত মুসা আ. তাঁর কাফন-দাফন সমাপ্ত করে নীচে এসে বনী ইস্রাঈলকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, হযরত মুসা আ. হযরত হারুন আ.'র মৃত্যুর সংবাদ দিলে বনী ইস্রাঈলরা বলল, তুমিই নিজের ভাই হারুন আ.কে হত্যা করেছ। অত:পর হযরত মুসা আ.'র দোয়ার বরকতে এবং তাঁকে নির্দোষ সাব্যস্ত করার লক্ষে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা কতৃক তাঁর লাশ বনী ইস্রাঈলের সামনে এনে দিয়েছিলেন। তারা তাঁর মধ্যে কোন আঘাত বা হত্যার চিহ্ন না দেখে মুসা আ.'র উপর অর্পিত অভিযোগ তুলে নিল।[৫৫০]

সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা মুসা আ.কে প্রত্যাদেশ করলেন– 'আমি হারুনকে মৃত্যু দান করতে চাই, তুমি তাঁকে অমুক পাহাড়ে নিয়ে এসো। হযরত মুসা আ. নির্দেশানুসারে হযরত হারুনকে নিয়ে নির্ধারিত পাহাড়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন, একটি বিস্ময়কর বৃক্ষ ও প্রাসাদ। প্রাসাদের অভ্যন্তরে রয়েছে একটি সুন্দর সিংহাসন। মনোরম ফরাশ বিছানো সেই সিংহাসন থেকে ছড়িয়ে পড়ছে অপার্থিব সুবাস। হারুন আ. সিংহাসনটিকে খুবই পছন্দ করলেন। বললেন, মুসা! আমি এই সিংহাসনে শয়ন করতে চাই। মুসা আ. বললেন, বেশতো, শয়ন করুন। হারুন আ. বললেন, গৃহকর্তা যদি অপ্রসন্ন হোন। হযরত মুসা আ. বললেন, আমি গৃহকর্তাকে বুঝিয়ে বলবো। হারুন আ. বললেন, আপনিও আমার পাশে শয়ন করুন। গৃহকর্তা যদি অপ্রসন্ন হোন তবে আমাদের দু'জনের প্রতিই অপ্রসন্ন হবেন (আমরা তখন সম্মিলিতভাবে জবাবদিহি করতে পারবো)। নবী ভ্রাতৃদ্বয় সিংহাসনে শয়ন করলেন। শয়ন করার সঙ্গে সঙ্গে হযরত হারুন আ. বুঝলেন, তিনি এবার মৃত্যুর মুখোমুখি। বললেন, মুসা! আমার চোখ দু'টো বন্ধ করে দিন। একথা বলার পরক্ষণেই ইন্তেকাল করলেন হারুন আ.। আর বৃক্ষ, প্রাসাদ এবং সিংহাসনসহ হযরত হারুন আ. উঠে গেলেন আকাশে। নিঃসঙ্গ হযরত মুসা আ. ভ্রাতৃবিরহে ভারাক্রান্ত হয়ে ফিরে এলেন আপন সম্প্রদায়ের নিকট। তাঁকে একাকী দেখে

---

৫৫০. কাযী হেফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৫৩৭।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে, হযরত মুসা আ. মৃত্যুকে পছন্দ করতেন না। আল্লাহ্পাক চাইলেন মুসা আ. যেনো মৃত্যুকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন। তিনি তাই ইউশা ইবনে নূনকে নবী নির্ধারণ করলেন। তিনি সকাল বিকাল মুসা আ.'র নিকট গমন করতেন। মুসা আ. একদিন বললেন, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ্পাক কি আপনার নিকট কোনো নতুন পয়গাম প্রেরণ করেছেন? হযরত ইউশা আ. বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমিতো দীর্ঘদিন ধরে আপনার পবিত্র সংসর্গে রয়েছি। আমি কখনোই নতুন প্রত্যাদেশ এসেছে কিনা সে সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি। আপনি সব সময় আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রত্যাদেশ প্রচার করেছেন। একথা শুনে মুসা আ. জীবনের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে পড়লেন। মৃত্যুর প্রতি তাঁর আসক্তি গেলো বেড়ে।

হযরত আবু হোরায়রা রা.'র বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতা একদিন হযরত মুসা আ.'র নিকটে এসে বললেন, আপনার প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দিন। হযরত মুসা আ. তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর ফেরেশতা হযরত আযরাঈলকে সজোরে চপেটাঘাত করলেন। এর ফলে তাঁর একটি চক্ষু বিনষ্ট হয়ে গেলো। তিনি আল্লাহ্পাকের দরবারে গিয়ে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আপনি আমাকে আপনার এমন এক বান্দার নিকট পাঠিয়েছেন- যে মরতে চায় না। আপনার সেই রোষান্বিত প্রেমিক আমার দৃষ্টিশক্তিকে বিনষ্ট করেছেন। আল্লাহ্পাক হযরত আজরাঈলের চোখ ভালো করে দিয়ে বললেন, তুমি পুনরায় তার নিকট গমন করো। তাকে বলো, পৃথিবীর জীবনই যদি আপনার পছন্দ হয়, তবে আপনার হাত কোনো গাভীর পৃষ্ঠদেশে রাখুন। আপনার হাত ওই গাভীর যতোগুলো পশম স্পর্শ করবে, ততো বৎসর আপনাকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে দেয়া হবে। হযরত আযরাঈল আল্লাহর এই পয়গাম পৌছে দিলেন মুসা আ.'র নিকটে। তিনি বললেন, ঠিক আছে তা না হয় করলাম। তারপর? হযরত আযরাঈল বললেন, তারপর তো মৃত্যুবরণ করতেই হবে। মুসা আ. বললেন, তাহলে আর বিলম্ব করে কী লাভ। তিনি প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভু প্রতিপালক! আমাকে পবিত্র ভূমির (আরযাল মুকাদ্দাসের) অতি সন্নিকটে পৌছে দিন। রাসূল ﷺ বলেছেন, সেখানে উপস্থিত হলে আমি তোমাদেরকে ওই লাল টিলার সন্নিকটে রাস্তার পাশে হযরত মুসার সমাধি দেখিয়ে দিতে পারবো।[৫৫২]

ওহাবের বর্ণনায় রয়েছে, একবার হযরত মুসা কোনো এক কাজের উদ্দেশ্যে পথ চলছিলেন। পথ চলতে চলতে একস্থানে দেখলেন, ফেরেশতাদের একটি

---

৫৫২. বুখারী, মুসলিম।

দল একটি কবর খনন করে চলেছে। তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। এতো সুন্দর কবর তিনি আর কখনো দেখেননি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর ফেরেশতাবৃন্দ! এই কবর কার জন্য খনন করা হয়েছে? ফেরেশতারা বললেন, আল্লাহর এমন এক বান্দার জন্য যিনি আল্লাহর নিকট অত্যধিক সম্মানার্হ। মুসা আ. বললেন, সত্যি তাই। এতো অপরূপ শয়নকক্ষ আমি আর কখনও দেখিনি। ফেরেশতারা বললেন, হে কলিমুল্লাহ্! এই শয়নকক্ষটি কি আপনার মনে ধরেছে? হযরত মুসা আ. বললেন, হ্যাঁ। ফেরেশতাগণ বললেন, তবে এখানে শয়ন করুন এবং আপনার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবদ্ধ করুন। হযরত মুসা আ. নির্দ্বিধায় শুয়ে পড়লেন কবরে। পরিপূর্ণরূপে মনোনিবেশ করলেন আল্লাহ্র প্রতি। ধীরে ধীরে তাঁর নিঃশ্বাস হয়ে এলো শ্লথ। আল্লাহ্পাক তাঁর মহান প্রেমিকের প্রাণ হরণ করলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। ওই সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো একশত বিশ বছর।[৫৫৩]

বলআম বাউর ঘটনাঃ

বলআম বাউর ছিল ইহুদী সম্প্রদায়ের একজন আধ্যাত্মিক সাধক। কেউ কেউ বলেছেন, সে ছিল বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের লোক। সে আমালিকাদের রাজ্যে বসবাস করতো। তার সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রা., মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এবং সুদ্দী যে বিবরণ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ।

হযরত মুসা আ. নির্দেশপ্রাপ্ত হলেন– আমালেকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। তাদেরকে উৎখাত করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বনী ইস্রাঈলকে। তখন তিনি বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে অবস্থান করছিলেন, কেনান অঞ্চলের দিকে, সেখানকার এক শহরে বাস করতো বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক বলআম বাউর। ইসমে আ'যম জানতো সে। সকল দোয়াই কবুল হতো তার। কেনআনের লোকেরা উপায়ন্তর না দেখে সমবেত হলো তার দরবারে। সবাই করজোর করে বলল, হে মহা সাধক! আমরা বিপদগ্রস্ত। মুসা নবী তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে আমাদের রাজ্যে আক্রমণ করার উদ্যোগ নিচ্ছে। শুনেছি সে খুবই উগ্র ও কঠোর। সে আমাদেরকে এ রাজ্য থেকে উৎখাত করে বনী ইস্রাঈলদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমাদের সকলকে সে নাকি হত্যা করে ফেলবে। এখন আপনার সাহায্য ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। আপনি আমাদের পক্ষে এবং মুসা নবীর বিপক্ষে যদি দোয়া করেন, তবেই কেবল আমাদের জীবন রক্ষা হয়।

---

৫৫৩. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., তাফসীরে মাযহারী, বাংলা, খণ্ড-৩, পৃ. ৪৭০-৪৭২।

বলআম বলল, রে হতভাগার দল! মুসা তো নবী। তাঁর সঙ্গে রয়েছে ঈমানদার লোকেরা এবং ফেরেশতারা। আমি কীভাবে তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করবো। তোমরা নিতান্ত অজ্ঞ বলেই এরকম বলতে পারলে। তোমাদের আবদার শুনলে আমার দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই ধ্বংস হয়ে যাবে।

আগন্তুক জনতা কিন্তু নিরস্ত হলো না। তারা কাকুতি-মিনতি করে একই নিবেদন জানাতে লাগলো বার বার। তাদের করুণ নিবেদন শুনে কিছু নরম হলো বালআম বাউর মন। বলল, ঠিক আছে- আমি তাহলে এস্তেখারা করে দেখি। এস্তেখারা না করে কোন দিন দোয়া করতো না সে। এস্তেখারার পর স্বপ্নে নির্দেশের অপেক্ষা করতো। স্বপ্নে দোয়া করতে বলা হলেই কেবল দোয়া করতো। তার এবারের এস্তেখারা কিন্তু অনুকূল হলোনা। স্বপ্নযোগে তাকে হযরত মুসা আ.'র বিরুদ্ধে দোয়া করতে পরিস্কারভাবে নিষেধ করে দেয়া হলো। সে অপেক্ষামান জনপ্রতিনিধিদেরকে জানিয়ে দিলো একথা। কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা। তারা বলআমকে অনেক উপঢৌকন দিলো। তারপর বলল, দয়া করে বিপদগ্রস্তদেরকে রক্ষা করুন। এতে বৃদ্ধি পাবে আপনারই মহানুভবতা। বলআম বলল, ঠিক আছে, দেখি আরো একবার এস্তেখারা করে। পুনরায় এস্তে খারা করলো সে কিন্তু এবার স্বপ্নযোগে কোন প্রকার নির্দেশ সে পেলোনা। সে লোকদেরকে জানালো, আমাকে যে এবার হ্যাঁ, না কোন কিছুই বলা হলোনা। লোকেরা বলল, এতে বুঝা যাচ্ছে যে, দোয়া করতে আপনাকে নিষেধ করা হয়নি। নতুবা আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে দোয়া করতে নিষেধ করতেন। সুতরাং আপনি কালবিলম্ব না করে আমাদের জন্য দোয়া করুন।

জনাতর অনুনয় বিনয় ও তাদের দেয়া উপঢৌকনের কারণে গলে গেল বলআম। প্রশংসা ও পার্থিব প্রভাবে সে হারিয়ে ফেললো তার বিশ্বাস ও শুভ বিবেচনা। একটি খচ্চরে আরোহণ করে সে রওয়ানা দিলো হিতান পর্বতের দিকে। লোকেরাও চলল তার সঙ্গে। উদ্দেশ্য, পর্বত শিখরে আরোহন করে সে দেখে নেবে হযরত মুসা'র বাহিনীকে, বুঝতে চেষ্টা করবে তাদের শক্তিমত্তাকে। কিন্তু পাহাড়ের নিকটে গিয়ে খচ্চর থেমে গেল। খচ্চরকে প্রহার করল সে, কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হওয়ার পর পুনরায় থেমে গেল। সে খচ্চরকে বার বার প্রহার করতে লাগলো। আল্লাহর ইচ্ছায় খুলে গেল খচ্চরের বাকশক্তি, খচ্চরটি বলল, হতভাগ্য বলআম! কোথায় চলেছো তুমি? দেখতে পাচ্ছো না ফেরেশতারা বার বার আমার পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে। আর তুমি চলেছো আল্লাহর সত্য ও ঈমানদারদের বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করতে।

বলআম বাউর তবুও চললো হিতান পাহাড়ের দিকে, উঠে পড়লো পাহাড়ের চূড়ায়। সাথে তার সঙ্গীরাও উঠলো। সে দোয়া শুরু করলো। কিন্তু যা উচ্চারণ করতে চাচ্ছিলো তা পারছিলো না। উচ্চারণগুলো হয়ে যাচ্ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত। শত চেষ্টা করেও সে রসনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলো না। লোকেরা বলল, আপনি তো দেখি বনী ইস্রাঈলদের জন্যেই দোয়া করছেন। আর আমাদের জন্য করছেন বদ দোয়া। সে বলল, আমি তো চেষ্টা করছি। কিন্তু যা চাচ্ছি উচ্চারণ করছি তার বিপরীত। আমাকে এরকম করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

বলআমের বদদোয়ার উদ্যোগটি ছিল আল্লাহ তায়ালার অসন্তোষের কারণ। সেই অসন্তোষের ফল পেলো সাথে সাথে। তার জিহ্বা ঝুলে পড়লো বুক পর্যন্ত। সে লোকদেরকে বললো, দেখো, তোমাদের জন্য আমার দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই বরবাদ হলো। তোমাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধি হলো না, এখন কৌশল ও ষড়যন্ত্র ছাড়া তোমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই। তোমরা তোমাদের কতিপয় সুন্দরী রমণীদেরকে পসরা সাজিয়ে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করার ছল করে বনী ইস্রাঈলদের নিকট পাঠিয়ে দাও। তাদের সৈন্যদের কেউ যদি তাদের সম্ভোগ করতে চায়, তবে তারা যেন তাদের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করে। এভাবে তাদের একজন সৈন্যকেও যদি তোমরা ব্যভিচারে লিপ্ত করাতে পারো, তবে তারা আর তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। লোকেরা খুবই পছন্দ করলো পরিকল্পনাটি। তারা পণ্য পসারনীর ছলে কিছু সুন্দরী ও সুসজ্জিত রমণীকে ছেড়ে দিলো বনী ইস্রাঈল বাহিনীর দিকে। রমণীদের মধ্যে একজন ছিলো খুবই সুন্দরী। নাম ছিল তার কিসতি বিনতে সুর। সে গমন করছিল যামরী বিন শালুম নামের এক গোত্রীয় নেতার সামনে দিয়ে। সে ছিল শামউন গোত্রের নেতা। কিসতির চোখ ধাঁধানোরূপ দেখে মোহিত হয়ে গেল যামরী। তার হাত ধরে ফেললো সে। তারপর তাকে নিয়ে উপস্থিত হলো হযরত মুসা আ.'র নিকট। বলল, আমার ধারণা, আপনি বলবেন, এই সুন্দরী নারী আমার জন্য হারাম। হযরত মুসা আ. বললেন, হ্যাঁ, ওকে ছেড়ে দাও। ওই মহিলা তোমার জন্য হালাল নয়। যামরী বলল, আল্লাহর কসম! এই রমণী আমাকে উন্মাদ করে দিয়েছে। সুতরাং আপনার নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতে আমি অপারগ। একথা বলেই সে মেয়েটিকে টেনে নিয়ে ঢুকে পড়লো তার তাবুতে। চরিতার্থ করলো তার কামনা। কিন্তু রতিকর্ম শেষ হতে না হতেই প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলো বনী ইস্রাঈল জনতা। অল্প সময়ের মধ্যে মারা গেল সত্তর হাজার লোক।

য়ায়হাজ বিন আয়জার বিন মারঅন ছিলেন বনী ইস্রাঈলদের আর এক গোত্রপতি। হযরত মুসা আ. তাকে দিয়েছিলেন সৈনিকদের বিচারকের দায়িত্ব।

তিনি তখন ঘটনাস্থলে ছিলেন না। নিজ তাঁবুতে ফিরে এসেই তিনি দেখলেন, মহামারী প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। শুনলেন, যামরীর কারণেই আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন এই গজব। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্পূর্ণ লৌহনির্মিত তীক্ষ্ণ বর্শাটি নিয়ে ছুটে গেলেন যামরীর তাঁবুর দিকে। ঢুকেই দেখলেন, তখনো তারা পরস্পর লগ্ন। যায়হাজ বর্শা ছুঁড়লেন। একই বর্শায় বিদ্ধ হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনী। তিনি বর্শাবিদ্ধ অবস্থায় দু'জনকে ঊর্ধ্বে উঠিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর কনুই তখন লেগে গেলো পাঁজরে। আর পাপিষ্ঠ লাশ দু'টো লেগে গেলো তাঁর চোয়ালের সাথে। এভাবে লাশ দু'টোকে শূন্যে তুলে ধরে তিনি কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে লাগলেন– হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! তোমার নাফরমানদের জন্য এই পরিণতিই শোভনীয়। ফলে ধীরে ধীরে অপসারিত হলো গজব। নেমে এলো আল্লাহর অফুরন্ত রহমত। প্লেগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেলো অবশিষ্ট জনতা। তখন থেকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ বনী ইস্রাঈলরাও পশু জবাই করলে পশুর চোয়াল ও সামনের পাঁজরের পা দিতে শুরু করলো যায়হাজকে। পরবর্তী সময়েও রয়ে গেল তাদের ওই প্রচলনটি। প্লেগের মূল হোতাকে বধ করেছিলেন বলেই যায়হাজকে এভাবে সম্মান করতো তারা।[৫৫৪]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ অর্থ: আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সে লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছে।[৫৫৫]

এক বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস রা.'র উক্তিরূপে এসেছে যে, উক্ত আয়াতটি বনী ইস্রাঈলের বাসুলাম নামক এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এই লোকটিকে তিনটি দোয়ার অধিকার দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ তাকে জানানো হয়েছিলো যে, তোমার তিনটি দোয়া কবুল করা হবে। লোকটি ছিল স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। তার স্ত্রী একদিন বললো, তুমি আমার জন্য দোয়া করো যেনো আল্লাহ আমাকে বনী ইস্রাঈলদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী করে দেন। বাসুলাম এরূপই দোয়া করলো। সঙ্গে সঙ্গে দোয়া কবুল হলো আর তার স্ত্রী হয়ে গেলো সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী রূপসী। কিন্তু রূপসী স্ত্রী তখন স্বামীকে নিজের অনুপযুক্ত মনে করতে লাগলো। স্বামীর প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন শুরু করলো। বাসুলাম এতে মনোক্ষুন্ন হলো। সে আর ধৈর্য্য রাখতে পারলো না। দোয়া করলো, হে

[৫৫৪]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., তাফসীরে মাযহারী, বাংলা, খণ্ড-৪, পৃ. ৬২৩-৬২৬।

[৫৫৫]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৭৫।

আল্লাহ! একে কুকুর বানিয়ে দাও। দ্বিতীয় দোয়াটিও কবুল হলো আর স্ত্রী সাথে সাথেই কুকুর হয়ে গেল। অন্যান্য কুকুরের ন্যায় সারাক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করতে থাকলো। বাসুলামের ছেলে-মেয়েরা মহা বিপাকে পড়লো। মায়ের এই দুরাবস্থা তারা সহ্য করতে পারলো না। পিতাকে বললো, লোকেরা আমাদেরকে নিয়ে বিরোপ মন্তব্য করে, হেয় প্রতিপন্ন করে লজ্জা দেয়। আপনি তাড়াতাড়ী দোয়া করে আমাদের মাকে পূর্বের ন্যায় করে দিন। বাসুলাম পুনরায় দোয়া করলে স্ত্রী পূর্বের ন্যায় সুস্থ মানুষ হয়ে গেলো। এভাবে অতিমূল্যবান তিনটি দোয়াই তার বিফলে গেল।[৫৫৬]

শিক্ষা: উপরোক্ত বিষয়াদি থেকে শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে– দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ পাওয়া বড় নিয়ামত। এ তিনটি দোয়া তিনি ইহকালীন ও পরকালীন অনেক মূল্যবান বস্তুর জন্য ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তা অযথা কাজে ব্যবহার করে বরবাদ করে দিয়েছে। সুতরাং আমাদেরও উচিত যে কোন সুযোগকে ভালো ও উত্তম কাজে ব্যবহার করা।

২০. হযরত ইউশা' ইবনে নূন আ.

পরিচিতি:

হযরত ইউশা' আ. বনী ইস্রাঈলের বংশধর। তাঁর বংশনামা হলো- ইউশা' ইবনে নূন ইবনে ফারাহীম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম আ.। তিনি ছিলেন হযরত মুসা আ.'র ভাগিনা, খাদেম ও পরবর্তীতে তাঁর খলীফা এবং উপযুক্ত শাগরিদও।

আল্লাহর কুদরতী লীলা যে, হযরত ইউসুফ আ.'র বদন্যতায় 'কেনআনের' সত্তর জন লোক সম্মানের সহিত 'কেনআন' থেকে হিজরত করে মিশরে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন। তাদেরই বংশধর হযরত ইউশা' আ.'র নেতৃত্বে তাঁর পূর্ব পুরুষের মাতৃভূমিতে মর্যাদার সাথে প্রবেশ করেছেন। অর্থাৎ 'তীহ' প্রান্তরে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ায় আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউশা' আ.কে আদেশ দিলেন যে বনী ইস্রাঈলের এই বিশাল কাফেলাকে নিয়ে কেনআন, আরীহা, আরদে মুকাদ্দাস এবং ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হও এবং ওখানকার যালেম সম্প্রদায় আমালেকা সহ অন্যান্য অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত কর, আমার সাহার্য্য তোমার সাথে থাকবে।

হযরত ইউশা' আ. বনী ইস্রাঈলকে আল্লাহর আদেশ শুনালেন এবং তাদেরকে নিয়ে কেনআনের প্রথম শহর আরীহার দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের

[৫৫৬]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., তাফসীরে মাযহারী বাংলা, খণ্ড-৪, পৃ. ৬২৮-৬২৯।

সাথে যুদ্ধ করেন। এতে তারা পরাজিত হল। এভাবে বনী ইস্রাঈল হযরত ইউশা' আ.'র নেতৃত্বে সম্পূর্ণ আরদে মুকাদ্দাস জয় করলো এবং অত্যাচারী সম্প্রদায়কে এই পবিত্র ভূমি থেকে বের করে দিয়ে পূর্ব পুরুষদের মাতৃভূমিকে দখল করে এর মালিকানা লাভ করল। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে হযরত মুসা আ. ইন্তেকাল করেছিলেন। তিনি ইন্তেকালের পূর্বেই হযরত ইউশা' আ.কে আরদে মুকাদ্দাস আক্রমণ করার জন্যে তাকে সেনাপতি নিয়োগ করে দায়িত্ব দিয়ে যান।

বনী ইস্রাঈলকে বলা হলো বিজয়ী হয়ে অহংকারী হয়ে এই শহরে প্রবেশ করিও না বরং কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের ন্যায় বিনয়ের সহিত প্রবেশ কর আর মুখে বল حطة অর্থাৎ ক্ষমা করো। কিন্তু তারা আদেশ অমান্য করে অহংকারীর ন্যায় মাথা উঁচু করে حطة এর স্থলে حنطة অর্থ: 'গম দাও' বলে বলে প্রবেশ করল। মাগফিরাত কামনার আদেশ ছিল কিন্তু তারা খাবার চাইতে চাইতে প্রবেশ করলো। ফলে তাদের উপর আসমানী গযব নাযিল হল। এ গযব কি ছিল তা কুরআনে উল্লেখ নেই। তবে এই আযাব ছিল তাউনরূপী মহামারী, যার কারণে মুহূর্তের মধ্যে চব্বিশ হাজার ইস্রাঈলী মৃত্যুমুখে পতিত হলো। কয়েকদিন যাবৎ এই মহামারী ছিল যাতে সর্বমোট সত্তর হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, হঠাৎ মৃত্যুর আযাব এসেছিল যাকে বর্তমানে হার্টফেল তথা হৃদরোগ বলা হয়।[৫৫৭]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ . فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ . অর্থ: আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে যেখানে খুশী খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে থাক এবং দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার সময় সেজদা করে ঢুক, আর বলতে থাক– 'আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও'– তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মশীলদেরকে অতিরিক্ত দানও করব। অত:পর যালেমরা কথা পাল্টে দিয়েছে যা কিছু তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল তা থেকে। তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি যালেমদের উপর আযাব আসমান থেকে নির্দেশ লংঘন করার কারণে।[৫৫৮]

---

[৫৫৭]. মাওলানা হেফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, খণ্ড-২, পৃ. ১২ ও মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-১, পৃ. ৩৮৭।

[৫৫৮]. সূরা বাকারা, আয়াত: ৫৮–৫৯।

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ . فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ . অর্থ: আর যখন তাদের প্রতি নির্দেশ হল যে, তোমরা এ নগরীতে বসবাস কর এবং খাও তা থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা এবং বল, আমাদের ক্ষমা করুন। আর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর প্রণত অবস্থায়। তবে আমি ক্ষমা করে দেব তোমাদের পাপসমূহ। অবশ্য আমি সৎকর্মীদিগকে অতিরিক্ত দান করব। অনন্তর যালেমরা এতে অন্য শব্দ বদলে দিল তার পরিবর্তে, যা তাদেরকে বলা হয়েছিল। সুতরাং আমি তাদের উপর আযাব পাঠিয়েছি আসমান থেকে তাদের অপকর্মের কারণে।[৫৫৯]

২১. হযরত ইলিয়াছ আ.

হযরত ইলিয়াছ আ.'র নাম পবিত্র কুরআনে দু'স্থানে উল্লেখ হয়েছে। এক. সূরা আনআমে, দুই. সূরা সাফফাতে। সূরা আনআমে কেবল অন্যান্য আম্বিয়াগণের সাথে তাঁর নামও উল্লেখ হয়েছে। তাঁর কোন ঘটনা উল্লেখ হয়নি। তবে সূরা সাফ্‌ফাতে তিনি যে মুরসালীন তথা প্রেরিত রাসূলগণের অন্তর্ভূক্ত এবং তাঁর দ্বীনি দাওয়াত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এসেছে।

কেউ কেউ হযরত ইলিয়াছ ও হযরত ইদ্রিস একই ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তা সঠিক নয়। কুরআনে করীমে হযরত ইদ্রিস আ. এবং হযরত ইলিয়াছ আ.'র যে বর্ণনা এসেছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সূরা আনআম ও সূরা সাফ্‌ফাতে হযরত ইলিয়াছ আ.'র যে বর্ণনা এসেছে তাতে কোথাও ইঙ্গিতও নেই যে, হযরত ইলিয়াছ আ.কে ইদ্রিসও বলা হয়। এভাবে সূরা আম্বিয়াতে হযরত ইদ্রিস আ.'র যে বর্ণনা এসেছে তাতেও এমন কোন ইশারা নেই যে, ইদ্রিস আ. ও ইলিয়াছ আ. একই ব্যক্তি।

তাছাড়া ঐতিহাসিকগণ হযরত ইদ্রিস আ. ও হযরত ইলিয়াছ আ.'র যে বংশনামা বর্ণনা দিয়েছেন তা সম্পূর্ণভাবে পৃথক পৃথক। তাদের দু'জনের কালের ব্যবধানও অনেক। হযরত ইদ্রিস আ. হযরত নূহ এবং হযরত ইব্রাহীম আ.'র মাঝামাঝি সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। পক্ষান্তের হযরত ইলিয়াছ আ. হলেন ইস্রাঈলী নবী এবং হযরত মুসা আ.'র পরে প্রেরিত হয়েছিলেন। হযরত ইলিয়াছ আ. হযরত আল ইসায়া আ.'র চাচত ভাই ছিলেন এবং হযরত হিযকীল আ.'র পরে নবুয়তপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

---

[৫৫৯]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৬১–১৬২।

বংশনামা: অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণের মতে হযরত ইলিয়াছ আ. হযরত হারূন আ.'র বংশধর ছিলেন। সে মতে তাঁর বংশনামা হবে- ইলিয়াছ ইবনে ইয়াসীন ইবনে ফাতহাছ ইবনে ইয়াযার ইবনে হারূন অথবা ইলিয়াছ ইবনে আযের ইবনে ইয়াযার ইবনে হারূন আ.।

নবুয়ত লাভের সময় ও স্থান:

হযরত ইলিয়াছ আ. কখন এবং কোথায় প্রেরিত হয়েছিলেন, কুরআন ও হাদিস দ্বারা তার কোন উল্লেখ নেই। তবে ঐতিহাসিকগণ প্রায় একমত যে, তিনি হযরত হিযকীল আ.'র পরে এবং হযরত আলইয়াসা আ.'র পূর্বে বনী ইস্রাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এ সময়ে হযরত সোলায়মান আ.'র স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের অপকর্মের কারণে নবী ইস্রাঈলের সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক অংশকে 'ইয়াহুদা' কিংবা 'ইয়াহুদিয়্যাহ' বলা হত। এর রাজধানী ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত। আর অপর অংশের নাম ছিল 'ইসরাঈল'। এর রাজধানী তৎকালীন সামেরাহ এবং বর্তমান নাবলুসে অবস্থিত ছিল। হযরত ইলিয়াছ আ. জর্দানে 'অলআদ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখনকার ইসরাঈলের শাসনকর্তার নাম বাইবেলে আখিয়াব এবং আরবী ইতিহাসে আজিব অথবা আখিব বলে উল্লেখিত রয়েছে। তার স্ত্রী ইযাবীল 'বা'আল' নামক এক দেব মূর্তির পূজারী ছিল। সে ইসরাঈলে বা'আলের নামে এক সুবিশাল বধ্যভূমি নির্মাণ করে বনী ইসরাঈলকে মূর্তি পূজায় আকৃষ্ট করেছিল। হযরত ইলিয়াছ আ. আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এ ভূখণ্ডে তাওহীদ প্রচার করার এবং বনী ইসরাঈলকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত রাখার নির্দেশ লাভ করেন।[৫৬০]

দ্বীনি দাওয়াত:

হযরত ইলিয়াছ আ.'র দ্বীনি দাওয়াত সম্পর্কিত ঘটনাটি তাফসীরে মাযহারীতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে বিধায় নিম্নে তা প্রদত্ত হল।

প্রথমে বলা হয়েছে- 'ইলিয়াছও ছিলো রসুলদের একজন'। একতার অর্থ- হে আমার প্রিয়তম রসুল! এবার শুনুন ইলিয়াসের বৃত্তান্ত। তিনিও ছিলেন আমা কর্তৃক প্রেরিত পুরুষগণের একজন।

হযরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, হযরত ইলিয়াস ও হযরত ইদ্রিস নাম দু'টো একই রসুলের। তাঁর নিকট সংরক্ষিত কুরআনের অনুলিপিতে লেখা ছিলো 'ওয়া ইন্না ইদ্রিসা লামিনাল মুরসালীন'। অর্থাৎ 'ইলিয়াস' এর স্থলে ছিলো 'ইদ্রিস'।

[৫৬০]. তাফসীরে ইবনে জারির, ইবনে কাসীর, মাযহারী

ইকরামার অভিমতও এরকম। কিন্তু অন্যান্য বিদ্বজ্জনের অভিমত হচ্ছে, হযরত ইলিয়াস ছিলেন বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের একজন রসুল। তিনি 'ইদ্রিস' নন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, হযরত ইলিয়াস আ. ছিলেন হযরত ইয়াসা আ.'র চাচাতো ভাই। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক তাঁর বংশানুক্রমকে উপস্থাপন করেছেন এভাবেঃ ইলিয়াস ইবনে বশরি ইবনে কাইহাস ইবনে ইরায ইবনে হারুন ইবনে ইমরান।

বর্ণনাকারী সাহাবীগণের উদ্ধৃতি দিয়ে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাস বর্ণনা করেছেন, হযরত ইলিয়াসের পূর্ববর্তী নবীর মহাপ্রয়াণের পর বনী ইসরাঈলদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো বিভিন্ন রকমের নতুন নতুন ধর্মবিরোধী কর্মকাণ্ড। মূর্তিপূজার মতো ঘৃণ্যকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো অনেকেই। এভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর তাদের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরিত হন হযরত ইলিয়াস আ.। তিনি ছিলেন হযরত মুসা আ.'র পরবর্তী যুগের একজন নবী। উল্লেখ্য, হযরত মুসা আ.'র পরবর্তী নবীগণের মূল দায়িত্ব ছিলো তওরাতের অনুশাসনগুলোকেই নতুন করে প্রাণবন্ত করে তোলা। নতুন কোনো বিধান প্রবর্তন করা নয়। তখন বনী ইসরঈলেরা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো সিরিয়ায়। তারা সিরিয়া অধিকার করতে পেরেছিলো তাদের পূর্বসূরী নবী হযরত ইউশা ইবনে নুনের নেতৃত্বে। তারা ছিলো বেশ কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত। তার মধ্যে একটি গোত্রের বসবাস নির্ধারিত হয়েছিল বাআ'লাবাক ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। হযরত ইলিয়াস আ. ছিলেন ওই গোত্রভূত। আর আপন গোত্রের পথপ্রদর্শনের নিমিত্তেই প্রেরণ করা হয়েছিলো তাঁকে। ওই সময় বাআ'লাবাকের বাদশাহ ছিলো উজুব। সে তার গোত্রের লোকদেরকে মূর্তিপূজা করতে বাধ্য করেছিলো। সে নিজেও ছিলো ঘোর পৌত্তলিক। সে পূজা করতো বাআল নামক এক মূর্তির। ওই মূর্তির মুখ ছিলো চারটি। হযরত ইলিয়াস আ. আল্লাহর নির্দেশে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এক আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে আহ্বান জানালেন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করলো না। বাদশাহর কাছেও বিষয়টি ছিলো গুরুত্বহীন। আর তার স্ত্রী আজবিল ছিলো চরম নবীবিদ্বেষিণী। বাদশাহর উপরে ছিলো তার একচ্ছত্রপ্রভাব। বাদশাহ কোনো যুদ্ধে গেলে পুরুষের বেশে রাজ্যশাসন করতো সে-ই। বলা হয়ে থাকে, নবী ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়াকে শহীদ করিয়ে ছিলো এই আজবিলই। তার ছিলো এক বিচক্ষণ মুখপাত্র। তিনি ছিলেন ঈমানদার। কিন্তু তিনি বাইরে কখনো তা প্রকাশ করতেন না। তিনিই কৌশলে বিভিন্ন কথা বলে প্রায় তিন শত নবীকে আজবিলের জিঘাংসার আগুন থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আবার শত চেষ্টা করেও কাউকে কাউকে রক্ষা করতে সমর্থ

হননি। বহুপুরুষের সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধা হয়েছিলো সে। সাত জন নবীও ছিলেন তাদের মধ্যে। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, তার ছেলে-মেয়ে ছিলো সত্তরটি।

বাদশাহ উজুবের নিকট প্রতিবেশী ছিলেন মাযদাকী। তিনি ছিলেন এক আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসী। তিনি মূর্তিপূজারী বাদশাহর সংশোধন কীভাবে হয়, তাই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। রাজপ্রাসাদের সন্নিকটেই ছিলো তার একটি মনোমুগ্ধকর বাগান। বাদশাহ উজুব ও বেগম আজবিল দু'জনেই বাগানটি পছন্দ করতো। তারা ফুরসত পেলেই ওই বাগানে এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো, গোসল-পানাহার করতো। উজুব মাযদাকীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করতো। কিন্তু আজবিল করতো হিংসা। কিন্তু তা বাইরে প্রকাশ করতো না। মাঝে মাঝে কেবল উজুবকে বলতো, বাগানটা দখল করে নিলে হয় না। উজুব তার একথায় পাত্তা দিতো না বলে মনে বিভিন্ন ফন্দি ফিকির আঁটতো সে। একবার উজুবকে বেরিয়ে যেতে হলো এক যুদ্ধযাত্রায়। আজবিল ভাবলো এই তো সুযোগ। সে দু'জন মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা ঠিক করলো। তাদেরকে বললো, তোমরা সাক্ষ্য দিয়ো, মাযদাকী বাদশাহকে গালি দিয়েছে। আর সে কথা তোমরা স্বকর্ণে শুনেছো। তখন ওই রাজ্যের বিধান ছিলো, বাদশাহকে যদি কেউ গালি দেয়, তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যাহোক, সাক্ষ্যদাতাদেরকে প্রস্তুত করে সে ডেকে পাঠালো মাযদাকীকে। বললো, আমি শুনতে পেলাম, তুমি বাদশাহকে গালি দিয়েছো। মাযদাকী অভিযোগ অস্বীকার করলেন। তখন উপস্থিত করানো হলো মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাদ্বয়কে। তারা মাযদাকীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলো। এভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করে আজবিল হত্যা করলো মাযদাকীকে এবং দখল করে নিলো তার সুদৃশ্য বাগান। উজুব যুদ্ধযাত্রা থেকে ফিরে এসে এ ঘটনা শুনে মর্মাহত হলো। উজুব বললো, কাজটা তুমি ভালো করোনি। মনে হচ্ছে এর পরিণাম হবে অত্যন্ত অশুভ। সে ছিলো সৎ ও ভদ্র প্রতিবেশী। ছিলো আমার প্রিয়ভাজন। আজবিল বললো, তোমার বিধান অনুযায়ীই তো আমি তার বিচার করেছি। সে তোমাকে গালি দিয়েছিলো বলেই তো আমি গোস্বা সম্বরণ করতে পারিনি। উজুব তবুও আশ্বস্ত হলো না। কিছুকাল পরেই আর্বিভূত হলেন নবী ইলিয়াস আ.। তিনি বাদশাহ উজুব ও তার রাজ্যের জনতার কাছে ঘোষণা করলেন, মাযদাকী ছিলেন আল্লাহর ওলী। তাঁকে হত্যা করায় আল্লাহ অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েছেন। তিনি জানাচ্ছেন, কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা না করলে এবং মাযদাকীর উত্তরাধিকারকে তার বাগান প্রত্যর্পন না করলে নেমে আসবে ভয়ংকর আযাব। ওই বাগানেই পড়ে থাকবে বাদশাহ-বেগমের ছিন্ন ভিন্ন লাশ। আল্লাহ তায়ালা একথা জানিয়েছেন শপথ করে।

এরকম ঘোষণা শুনে উজুব রেগে গেলো। নবী ইলিয়াসের কথা তার বিশ্বাস হলো না। তাকে ডেকে এনে বললো, মনে হচ্ছে তোমার বক্তব্য অযথার্থ। পৃথিবীতে আরো অনেক বাদশাহ তো রয়েছে। যারা দেদারছে করে চলেছে মূর্তিপূজা। করে চলেছে অনেক অন্যায়। তবুও তাদের উপরে শাস্তি অবতীর্ণ হয়নি। আমি তো তাদের মতো অতো বেশী পাপ করিনি। তাহলে আমার উপরে আযাব আসবে কেনো? শেষ পর্যন্ত উজুব সিদ্ধান্ত নিলো, ইলিয়াসকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে হত্যা করতে হবে। হযরত ইলিয়াস আ. উজুবের এমতো নির্দয় মনোভাবের কথা বুঝতে পেরে আত্মগোপন করলেন। আশ্রয় নিলেন এক দুর্গম পর্বতের নির্জন গুহায়। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, তিনি ওই নিভৃত গুহায় অতিবাহিত করেছিলেন সাতটি বছর। খাদ্য ছিলো তাঁর তৃণ ও অরণ্যের ফল। উজুব অনেক গুপ্তচর-সিপাই-শান্ত্রী লাগিয়েও তাঁর সন্ধান বের করতে পারেনি।

সাত বছর পর বাদশাহ উজুবের সবচেয়ে প্রিয় এক পুত্র হয়ে পড়লো পীড়িত। সে শরণাপন্ন হলো তার পরম পূজনীয় প্রতিমা বাআলের। বাআল প্রতিমাটির সেবা যত্নের জন্য উজুব নিয়োজিত করেছিলো চারশত কর্মচারী। বাআল মূর্তিটির পেটে শয়তান ঢুকে কথা বলতো। আর ওই চারশত পাণ্ডা তা কান লাগিয়ে শুনতো। কিন্তু এবার ঘটলো বিপত্তি। তারা শত চেষ্টা করেও মূর্তির অভ্যন্তর থেকে কোনো আওয়াজ শুনতে পেলো না। শেষে এক পাণ্ডা বললো, সম্রাটপ্রবর! মনে হয় বাআল আপনার প্রতি অতুষ্ট। উজুব বললো, কেনো, আমি তো তার একনিষ্ঠ উপাসক। পাণ্ডা বললো, যে ইলিয়াস বাআল কে অস্বীকারকারী, সে ইলিয়াসকে তো আপনি এখন পর্যন্ত বধ করতে পারেননি। উজুব বললো, তাকে হত্যা তো করতামই। কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেলো না যে। চেষ্টা এখনো চলছে। কিন্তু এখন আমার পুত্র রোগভোগে জর্জরিত। এখন তাঁর নিরাময় কামনা ছাড়া অন্য কোনো দিকে আমি মনোযোগই বা দেই কী করে? আগে আমার সন্তান সুস্থ হোক। তারপর তো বাআ'লকে আমি পরিতুষ্ট করবোই। এক পাণ্ডা প্রস্তাব দিলো, সিরিয়ায় রয়েছে বেশকিছু জাগ্রত দেবীমূর্তি। তাদের কাছে এব্যাপারে সুপারিশের আবেদন করা যেতে পারে। প্রস্তাবটি উজুবের মনোপুত হলো। সে তার চারশ পাণ্ডাকেই পাঠিয়ে দিলো সিরিয়ায়। ইত্যবসরে হযরত ইলিয়াস আ. প্রত্যাদেশ পেলেন, এবার তুমি আত্মপ্রকাশ করো। জনসমক্ষে হাজির হও। ভয় নেই। আমি স্বয়ং তোমার রক্ষক। এবার তাদের উপরে আমি প্রতিষ্ঠিত করবো তোমার প্রতাপ ও প্রভাব।

নির্দেশ পেয়ে লোকালয়ে নেমে এলেন হযরত ইলিয়াস আ.। দেখলেন একদল লোক কোথাও যাচ্ছে। তিনি তাদেরকে বললেন, থামো। তারা থামলো।

তিনি বললেন, তোমরা যারা এখন আমার সম্মুখে উপস্থিত এবং যারা উপস্থিত নয়, তাদের সকলের প্রতি আমার একই নির্দেশ। তা হচ্ছে- তোমরা তোমাদের বাদশাহ'র কাছে যাও। তাকে বলো, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনিই বনী ইসরাঈলসহ সকল মানুষের স্রষ্টা। তিনিই সকলের রিজিকদাতা এবং জীবন-মৃত্যু প্রদাতা। তাকে একথাও জানিয়ে দিয়ো- হে উজুব! তোমার সন্তানের আরোগ্য ভিক্ষা করো কেবল আল্লাহর কাছে। তিনিই একমাত্র আরোগ্যদাতা। সুতরাং তুমি অংশীবাদী হয়ো না। প্রার্থনা কোরো না গায়রুল্লাহর কাছে। যদি তুমি এরকম না করো, তবে তোমার পুত্রের রোগভোগ হবে আরো অধিক অসহনীয় ও প্রলম্বিত। এভাবে মৃত্যুই হবে তার অশুভ পরিণাম। এভাবেই একথা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, আল্লাহই একমাত্র আরোগ্যদাতা এবং জীবন-মৃত্যুপ্রদাতা।

হযরত ইলিয়াসের একথা পাণ্ডাদের কানেও পৌঁছলো। তারা উজুবের কাছে গিয়ে বললো, আমরা ইলিয়াসের দেখা পেয়েছি। সে আমাদেরকে তেজস্বীভাষায় সংযত হবার নির্দেশ দিলো। আর আপনাকে জানালো এই এই নসিহত। আমরা সংখ্যায় ছিলাম অনেক। তবুও তার কথার উপরে আমরা কোনো কথাই বলতে পারলাম না। ভয়ে আতংকে কেমন যেনো চুপসে গেলাম সকলে। অতচ সে এক শীর্ণকায় দীর্ঘদেহী মানুষ। তার মাথার চুল ঝরে পড়েছে। গায়ের চামড়াও কেমন অমসৃণ। পরনে কেবল একটি পশমী কোর্তা এবং জীর্ণ পাজামা। কাঁটা দিয়ে সেলাই করা ছিলো তার কোর্তার সম্মুখভাগ। তাদের কথা শুনে উজুবও আতংকিত হয়ে পড়লো। তাঁর উপরে শক্তিপ্রয়োগের কথা ভাবতেও পারলো না। পাণ্ডাদেরকে বললো, বুঝলাম। শক্তিপ্রয়োগ আর চলবে না। এবার খাটাতে হবে কৌশল। তোমরা এবার গিয়ে তাকে লোভ দেখাও। বলো, আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আমাদের জনপদবসীরাও আপনাকে দেখে আপনার উপরে ঈমান আনতে চায়। সুতরাং চলুন আমাদের সঙ্গে। দেখবে, একথা বললে সহজেই তিনি তোমাদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিবেন। আর সেই সুযোগ তোমরা তাকে এনে হাজির করতে পারবে আমার সামনে।

উজুবের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে সোৎসাহে বেরিয়ে পড়লো পাণ্ডারা। গিয়ে উপস্থিত হলো ওই পাহাড়ের গুহায়, যেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন হযরত ইলিয়াস আ.। তারা ডাকতে লাগলো, হে আমাদের নবী! দয়া করে বের হয়ে আসুন। আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আপনি সত্যি সত্যিই আল্লাহর পয়গম্বর। আমাদের বাদশাহ এবং রাজ্যের সকলেই আপনার উপরে ঈমান এনেছে। তারা আপনাকে সালাম বলেছে। এখন সকলেই আপনার সঙ্গ লাভের

জন্য উন্মুখ। সুতরাং আপনি নির্জনবাস পরিত্যাগ করুন। বসবাস শুরু করুন আপনার অনুগত জনতার সঙ্গে। এখন আমাদের জীবন যাপিত হবে আপনার সদয় আদেশানুসারে।

হযরত ইলিয়াস আ. তাদের কথা বিশ্বাস করলেন। ভাবলেন, এখন তাদের কথা না শুনলে হয়তো আল্লাহ অতুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হলো, আল্লাহর বিনা অনুমতিতে তিনি স্থান ত্যাগই বা করবেন কেমন করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এখনো তো এ বিষয়ে কোনো নির্দেশ এলো না। তিনি তাই প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভু পালনকর্তা! ওদের কথা যদি সত্য হয়, তবে তুমি আমাকে স্থানত্যাগের অনুমতি দান করো। আর যদি তারা অসত্যভাষী হয়, তবে তাদের উপর আপতিত করো অগ্নিবৃষ্টি। তাঁর এমতো প্রার্থনা শেষ হতে না হতেই বাইরে শুরু হল অগ্নিবৃষ্টি এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলো সকলে।

উজুব ও তার সঙ্গী-সাথীরা যথাসময়ে এ সংবাদ পেলো। কিন্তু তবু তারা তাদের কুমতলব পরিত্যাগ করলো না। পুনরায় প্রতারণার মাধ্যমে কার্যোদ্ধার করতে চাইলো। এবার সে প্রস্তুত করলো আরো বেশী ধূর্ত ও ফন্দিবাজের একটি দল। তারা গিয়ে উপস্থিত হলো হযরত ইলিয়াসের বসতগুহার কাছাকাছি। বলতে শুরু করলো, হে আল্লাহর নবী! আমরা আল্লাহর ক্রোধ ও কর্তৃত্ব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইতোপূর্বে যারা আপনার কাছে এসেছিলো, আমরা তাদের মতো নই। তারা ছিলো ভণ্ড, প্রতারক। আমাদেরকে কোনো কিছু না জানিয়েই তারা আপনার কাছে এসেছিলো। আমরা যদি তাদের অসৎ উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারতাম, তবে তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতাম। আপনার কাছে তাদেরকে ঘেঁষতেই দিতাম না। ভালোই হয়েছে, আল্লাহ নিজেই আপনার ও আমাদের পক্ষ থেকে তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইলিয়াস আ. এবারও দোয়া প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপরেও শুরু হলো অগ্নিবৃষ্টি।

এদিকে উজুবের পুত্রের অসুখ দিন দিন বেড়েই চললো। দুই দুইবার কৌশল ব্যর্থ হওয়াতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো আরো বেশী। একবার তার মনে হলো, এবার নিজেই গিয়ে তাকে শেষ করে দিয়ে আসবে। কিন্তু পুত্রের পীড়া-যন্ত্রণা তার উদ্যমকে বার বার প্রতিহত করতে লাগলো। শেষে সে ঠিক করলো, এবার পাঠাতে হবে রাণীর ওই মুখপাত্রটিকে, যে প্রকৃতই সাধু ও সজ্জন, সম্ভবত ইলিয়াসের উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারীও। হয়তো একে পাঠালে তার সঙ্গে ইলয়াসও পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে নেমে আসবে। লোকটি বিচক্ষণ, দক্ষ ও

বিশ্বস্ত। নয়তো এরকম সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে উজুব অনেক আগেই পরিত্যাগ করতো। উজুবের মনে হলো. তাকে পরিত্যাগ না করে একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। এবার তার দ্বারাই উদ্দেশ্যপূর্ণ হওয়া নিশ্চিত। উজুব তাঁকে ডেকে এনে বললো, তুমি ইলিয়াসকে জানাও, তার সঙ্গে কোনো খারাপ আচরণ করার ইচ্ছা আমার নেই। একথা বলে তাঁর সঙ্গে দিলো কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরীকে। তাদেরকে একান্তে ডেকে বুঝিয়ে দিলো, রাণীর মুখপাত্রের কথা শুনে যদি ইলিয়াস চলে আসে, তো ভালোই। যদি না আসতে চায়, তবে তোমরা তাকে জোরজূর্বক ধরে এনো। আর মুখপাত্রকে বললো, দুই দুইবার আমার লোকজন ভস্মীভূত হলো। এদিকে আমার প্রিয় পুত্রের অবস্থা করুণ। এমতাবস্থায় ক্ষমাপ্রার্থনা করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নাই। আমি বুঝতে পারলাম ইলিয়াস নবীর অসন্তোষ ও অপপ্রার্থনার ফলেই আমি আজ বিপদকবলিত। এখন আমরা তাঁর আনীত ধর্মাদর্শই গ্রহণ করতে চাই। পরিত্যাগ করতে চাই পৌত্তলিকতাকে। কিন্তু তিনি যদি আমাদের মাঝে না আসেন, তাহলে আমরা কী করে পাবো সৎপথ ও শুভ নির্দেশনা।

মুখপাত্র ও তার সঙ্গের সান্ত্রীরা গিয়ে উপস্থিত হলো পর্বত-গহ্বরবাসী হযরত ইলিয়াসের কাছে। মুখপাত্র তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করলেন। তিনি কণ্ঠের আওয়াজ শুনেই তাঁকে চিনতে পারলেন। 'ত্যাদেশ হলো, হে ইলিয়াস! এবার বাইরে এসো। তোমার সত্যবাদী ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাত করো। তোমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ককে করো পুনরুজ্জীবিত। হযরত ইলিয়াস আ. বাইরে এলেন। সালাম বিনিময় ও করমর্দন করলেন তাঁর সঙ্গে। মুখপাত্র বললেন, আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে এই অবাধ্য ও অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মহাদুরাচার রাজা। এখন যদি আপনি আমার সঙ্গে যেতে সম্মত না হন, তবে সে আমাকে হত্যা করবে। এখন আপনার যেমন ইচ্ছে, তেমনই আদেশ করুন আমাকে। যদি রাজদবার পরিত্যাগ করে আপনার সঙ্গে থেকে যেতে বলেন, তবে আমি তাই করবো। আর যদি আমার মাধ্যমে ওই দুরাচারকে কোনো সংবাদ দিতে চান, তবে তাও আমি পৌঁছে দিতে প্রস্তুত। আবার যদি চান, আমি আপনার পক্ষাবলম্বী হয়ে রাজদ্রোহী হই, তবে তা-ও পালন করবো আমি প্রফুল্লচিত্তে। অথবা যদি ইচ্ছা হয়, তবে আপনার মহান প্রভুপালকের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হোন, যেনো তিনিই এই জটিল সমস্যা থেকে আমাদের পরিত্রাণের পথকে করে দেন সুগম।

আল্লাহ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় নবীকে জানালেন, বাদশাহর সকল পরিকল্পনা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। সে তোমাকে কব্জা করতে চায়। কিন্তু এখনকার এই প্রতিনিধিদলটিকে ফিরিয়ে দিয়ো না। যদি ফিরিয়ে দাও, তবে বাদশাহ তাদেরকে দায়িত্ব অবহেলা করার দায়ে অবিশ্বাস করবে ও হত্যা করে

ফেলবে। সুতরাং এবার তুমি রাজদরবারে যাও। বাদশাহ তোমার এবং ওই মুমিনের (মুখপাত্রের) কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি তার পুত্রের রোগ আরো বাড়িয়ে দিবো। শেষে মৃত্যুকেও বিজয়ী করে দিবো তার উপর। ফলে সে এমনভাবে শোকগ্রস্ত হবে যে, অন্য কোনোকিছু আর তার মনেই থাকবে না। সুতরাং বাদশাহপুত্রের মৃত্যুর পর তুমি নির্বিঘ্নে স্বআবাসে আবার ফিরে আসতে পারবে।

হযরত ইলিয়াস আ. নির্ভয়ে নেমে এলেন লোকালয়ে। নিশঙ্কচিত্তে সাক্ষাত করলেন বাদশাহর সঙ্গে। কিন্তু বাদশাহর মনের অবস্থা তখন শোচনীয়। পুত্র মৃত্যুপথযাত্রী। সে পুত্র ছাড়া অন্যদিকে ভালো করে মনোযোগই দিতে পারলো না। কিছুকালের মধ্যেই তার পুত্রবিয়োগ ঘটলো। ফলে আরো বেশী শোকাকুল হয়ে গেলো সে এবং তার অনুচরেরা। মৃতের সৎকার ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলো সকলে। হযরত ইলিয়াস আ. নির্বিঘ্নে ফিরে গেলেন তাঁর আপন ডেরায়।

ক্রমে শোক প্রশামিত হলো সম্বিত ফিরে এলা তাদের। বাদশাহরও মনে পড়লো, নবী ইলিয়াস তো এসেছিলেন। অথচ তার ব্যাপারে কিছুই করা হলো না। মুখপাত্রকে ডেকে সে এবারে জিজ্ঞাসাবাদ করলো। মুখপাত্র বললেন, রাজপুত্রের বিরহে আমরা তো সকলেই তখন ছিলাম শোকমগ্ন। জানি না, সবার অলক্ষ্যে কখন যেনো স্থান ত্যাগ করেছেন তিনি। আর একথাও আমার জানা নেই যে, আপনি এখন তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেন কিনা।

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলো। হযরত ইলিয়াস আ. ভাবলেন, এখন থেকে তার লোকালয়ে বসবাস করাই উত্তম। আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতিও মিললো এ ব্যাপারে। তিনি লোকালয়ে নেমে এলেন। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলেন এক বনী ইসরাঈলী রমণীর বাড়ীতে। পরবর্তীতে ওই রমণীই হয়েছিলেন মৎসোদরবাসী নবী ইউনুসের মাতা। নবী ইউনুস তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু। প্রায় ছয় মাস ওই বাড়ীতে অতিবাহিত করলেন হযরত ইলিয়াস আ.। ইউনুসজননীর সেবাযত্নে কোনো ত্রুটি ছিলো না। কিন্তু সুদীর্ঘ দিবস ধরে পর্বতের নিভৃত গুহায় বসবাসে অভ্যস্ত হযরত ইলিয়াস আ. লোকালয়ে বসবাস করতে স্বস্তিবোধ করছিলেন না। তাই কাউকে কিছু না জানিয়েই একদিন ফিরে গেলেন তাঁর পাহাড়ী আবাসে।

তিনি চলে যাওয়ায় ইউনুসজননী হয়ে পড়লেন চিন্তিত ও ভীত। কিছুদিনের মধ্যেই দুধ ছাড়ালেন শিশু ইউনুসকে। এর কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হলো শিশুপুত্র। তিনি হয়ে গেলেন উন্মাদিনী প্রায়। হযরত ইলিয়াসকে খুঁজতে বেরুলেন তিনি। অনেক বন-বাদাড় খুঁজে খুঁজে দেখা পেলেন

হযরত ইলিয়াস আ.'র। বললেন, আপনি চলে আসার পর থেকেই আমি বিপদাপন্না। আমার শিশুপুত্রটি আর নেই। আমার এই একটিই সন্তান। তার শোক যে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। তাকে আমি দাফন করিনি। তার মৃত্যুসংবাদও কাউকে জানাইনি। এখন আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ যেনো তাকে পুনর্জীবন দান করেন। হযরত ইলিয়াস আ. বললেন, আমি তো আল্লাহর আদেশের একান্ত বাধ্যগত বান্দা। কারো পুনর্জীবনপ্রার্থনার অনুমতি তো আমি পাইনি। ইউনুস জননী আর কিছু বলতে পারলেন না। নীরবে রোদন করতে লাগলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইলিয়াসের অন্তরে সৃষ্টি করলেন ইউনুস জননীর জন্য অনাবিল মমতা। তিনি তাই জিজ্ঞেস না করে পারলেন না, তোমার পুত্রবিয়োগ ঘটেছে কবে? ইউনুস জননী বললেন, সাত দিন আগে। হযরত ইলিয়াস আ. বললেন, চলো বাড়ীর দিকে যাই। দু'জনে পথ চলতে শুরু করলেন। সাতদিন একটানা পথ চলার পর তারা উপস্থিত হলেন ওই বাড়ীতে। হযরত ইলিয়াস আ. ওজু করলেন। পূর্ণ মনোযোগ ও মহব্বতের সঙ্গে নামাজ পাঠ করলেন। তারপর রত হলেন প্রার্থনায়। প্রার্থনা গৃহীত হলো। আল্লাহ জীবিত করে দিলেন ইউনুস ইবনে মাতাকে। এরপর সেখানে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলেন না হযরত ইলিয়াস আ.। চলে গেলেন তাঁর সেই পাহাড়ী ডেরায়।

সময় গড়িয়ে চললো। হযরত ইলিয়াস আ. তাঁর পাহাড়ী আবাসে বসে ইবাদত বন্দেগীতে সময় কাটান এবং নিরবচ্ছিন্নরূপে প্রার্থনা করতে থাকেন তাঁর পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের পথ প্রাপ্তির জন্য। কিন্তু তাদের বোধোদয় ঘটে না। রয়ে যায় পূর্ববৎ ভ্রষ্ট ও নষ্ট। হযরত ইলিয়াসের হৃদয় ভরে যায় ব্যথায়-বেদনায়। এভাবে সাত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন প্রত্যাদেশ হলো- হে ইলিয়াস! তুমি এতো বিষণ্ণ হও কেনো? তুমি তো আমা কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি, সুস্পষ্ট প্রত্যাদেশবাহী প্রেরিত পুরুষ। সুতরাং তোমার যা প্রয়োজন তা আমার কাছে চাও। আমি দান করবো। আমি তো অসীম দয়ালু, সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। হযরত ইলিয়াস আ. বললেন, হে আমার পরম প্রেমময় প্রভুপালয়িতা! তুমি আমাকে মৃত্যু দাও। মিলিয়ে দাও আমাকে আমার সম্মানিত পূর্বপুরুষগণের সঙ্গে। বনী ইসরাঈলদের পথভ্রষ্টতা দেখে আমার হৃদয় বেদনা-জর্জরিত। আমিও হয়েছি তাদের চক্ষুশূল। অন্তর্দহনের আগুনে জ্বলছি নিরন্তর। আল্লাহ বললেন, সে সময় এখনো আসেনি, যখন তোমার মতো মানুষ থেকে আমি পৃথিবীকে শূন্য করবো। মনে রেখো, তোমার মতো নির্বাচিত জন যারা, তাদের বরকতেই আমি রক্ষা করে চলেছি পৃথিবীর অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব। তাই তোমরা সংখ্যায় কম, কিন্তু

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং মৃত্যু নয়, অন্য কিছু চাও। আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করবো। হযরত ইলিয়াস আ. বললেন, তাহলে পথভ্রষ্টদের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা আমাকে দাও। আল্লাহ বললেন, কী রকম? হযরত ইলিয়াস আ. বললেন, আমি চাই সাত বছরের বৃষ্টিপাতের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, যেনো আমার অনুমতি ব্যতিরেকে আকাশে মেঘ না জমে। নামেনা এক ফোঁটা বৃষ্টিও। আমি ধারণা করি, এরকম ক্ষমতা আমার হাতে থাকলে, তারা আমার নির্দেশানুগত না হয়ে পারবে না। আল্লাহ জানালেন, ওহে ইলিয়াস! আমি যে আমার সৃষ্টির প্রতি অপরিসীম দয়াপরবশ, তারা পাপে ও অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও। হযরত ইলিয়াস আ. বললেন, তাহলে বৃষ্টির নিয়ন্ত্রণাধিকার দাও ছয় বৎসরের। আল্লাহ বললেন, তা হয় না। হযরত ইলিয়াস আ. বললেন, তা হলে পাঁচ বৎসরের জন্য। আল্লাহ বললেন, এই সময়ও আমার করুণানুকূল নয়। তবে অবাধ্যদের প্রতি প্রতিশোধ প্রয়োগার্থে তোমার নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হলো তিন বৎসরের বৃষ্টির নিয়ন্ত্রণাধিকার। তুমি ইচ্ছা করলে এবার তিন বৎসর যাবত বৃষ্টিপাত বন্ধ রাখতে পারো। তিনি বললেন, তাহলে আমি জীবিত থাকবো কীভাবে? আল্লাহ জানালেন, একদল পাখিকে আমি তোমার সেবায় নিয়োজিত রাখবো। তারা সুদূরের কোনো সুজলা সুফলা জনপদ থেকে তোমার জন্য বহন করে আনবে ফল-ফসল ও পানীয়। এরপর থেকে বন্ধ হলো বৃষ্টিপাত। মাঠঘাট ফেটে চৌচির হলো। খরায় পুড়ে গেলো তৃণ ও উদ্ভিদ। পানীয় জল ও খাদ্যের অভাবে মরে গেলো গৃহপালিত ও বন্য জীবজন্তুরা। মানুষের জীবনযাপন হয়ে পড়লো দুর্বিষহ। হযরত ইলিয়াস আ. পূর্ববৎ নিজেকে গোপন করে রাখলেন। তাঁর পানাহারের সরবরাহ ছিলো সুনিশ্চিত। কখনো কখনো তিনি নেমে আসতেন সমতলভূমির কোনো একান্ত ভক্তের বাড়িতে। লোকেরা যখন টের পেতো সেই বাড়ি থেকে রুটির গন্ধ ভেসে আসছে, তখন বুঝতো, নিশ্চয় সেখানে হযরত ইলিয়াসের আগমন ঘটেছে। তখন সেই বাড়িতে হামলা করতো তারা, কিন্তু তাঁকে না পেয়ে দুর্ব্যবহার করতো ওই বাড়িওয়ালার সঙ্গে।

হযরত ইলিয়াস আ. তাঁর মুষ্টিমেয় অনুচরদের মাধ্যমে একথা প্রচার করে দিয়েছিলেন যে, তিন বৎসর ধরে বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকবে। এর মধ্যে শত চেষ্টা করলেও কেই দুর্ভিক্ষের কবল থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না। একদিন তিনি এক বৃদ্ধার বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি কোনো খাদ্যদ্রব্য আছে? বৃদ্ধা বললো, হ্যাঁ। আমার কাছে রয়েছে সামান্য কিছু আটা এবং যৎসামান্য জয়তুন তেল। তিনি বললেন, আমার সামনে সেগুলো হাজির করো। বৃদ্ধা তাই করলো। তিনি সেগুলোর উপর হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বরকতের

জন্য দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার আটার বস্তা আটায় পরিপূর্ণ হয়ে গেলো এবং পূর্ণ হয়ে গেল তার তেলের পাত্র। তিনি স্থান ত্যাগ করবার পর রবকতময় খাদ্যের গন্ধ পেয়ে লোকেরা জড়ো হলো সেখানে। বৃদ্ধাকে বললো, কী ব্যাপার! এতো কিছু তুমি কোথায় পেলে? বৃদ্ধা খুলে বললো সব। সকলেই তখন বুঝতে পারলো বৃদ্ধার কাছে যিনি এসেছিলেন, তিনি হযরত ইলিয়াস ছাড়া অন্য কেউ নন। তারা তখন হন্যে হয়ে তাঁকে খুঁজতে শুরু করলো। এক স্থানে পেয়েও গেলো তাঁকে। কিন্তু সেখান থেকে অতি দ্রুত পলায়ন করলেন হযরত ইলিয়াস আ.। আশ্রয় নিলেন জনৈকা বনী ইসরাঈল মহিলার বাড়ীতে। ওই মহিলা তাঁকে তার গৃহমধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। তার পুত্র আল ইয়াসা ইবনে উখতুব তখন অসুস্থ। হযরত ইলিয়াস আ. তার রোগমুক্তির জন্য দোয়া করলেন। ফলে সে সুস্থ হয়ে গেলো এবং হয়ে গেলো হযরত ইলিয়াসের একান্ত অনুরক্ত ও সার্বক্ষণিক সহচর।

কিছুকাল পর প্রত্যাদেশ হলো- হে ইলিয়াস! বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিয়ে তুমি সৃষ্টিকুলকে ধ্বংস করে ফেলছো। ইতোমধ্যেই জীবনহানি ঘটেছে অনেক পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ ও গাছ-পালার। ওরা তো কোনো পাপ করেনি। হযরত ইলিয়াস আ. নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালক! এবার আমাকে সম্মতি দাও, আমি সকলের জন্য দোয়া করি, যেনো এই চরম সংকট থেকে তারা মুক্তি পায়। হয়তো এবার অংশীবাদী জনতার চৈতন্যোদয় ঘটবে। বুঝতে পারবে সত্যের স্বরূপ। প্রত্যাদেশ হলো, সম্মতি দেওয়া হলো। একথা শোনার পর পর হযরত ইলিয়াস আ. উপস্থিত হলেন জনতার সামনে। বললেন, শোনো হে জনতা! একথা সত্য যে, তোমরা খাদ্যাভাবে কষ্ট পাচ্ছো। কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করো, এ হচ্ছে তোমাদের পাপের ফল। তোমাদের পাপের কারণেই দেখো ইতোমধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়েছে কতো পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ-তৃণ-উদ্ভিদ। এখনো সময় আছে। বাঁচতে যদি চাও, তবে পরিহার করো পৌত্তলিকতা। ওই মূর্তিগুলো তো জড়প্রতিমা মাত্র। কারো উপকার অপকার করার ক্ষমতা তাদের এতটুকুও নেই। প্রমাণ যদি চাও, তবে মূর্তিগুলোকে এনে এক জায়গায় জড়ো করো। তাদেরকে বলো, অবসান ঘটাক বৃষ্টিহীনতার। যদি তা তারা না পারে, তবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে তোমরা এতদিন উপাসক ছিলে মিথ্যা মাবুদের। তাই আমি বলি, এই মুহূর্তে পরিত্যাগ করো অংশীবাদিতা। আমি তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে বৃষ্টিপ্রার্থনা করবো। আশা করি তিনি তোমাদের বিপদাপদ দূর করে দিবেন। জনতা জবাব দিলো, হে ইলিয়াস! আপনি ঠিকই বলেছেন। একথা বলেই তারা তাদের পূজ্যপ্রতিমাগুলোকে এনে এক জায়গায় জড়ো করলো। তাদের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করলো। কিন্তু কোনো সাড়া পেলো না। বাধ্য হয়ে তারা শরণাপন্ন হলো হযরত ইলিয়াসের। হযরত দোয়া করলেন।

তাঁর সঙ্গে শরীক হলো আলইয়াসা। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের দিক থেকে উত্থিত হলো এক টুকরা মেঘ। মেঘখণ্ডটি প্রসারিত হতে লাগলো ধীরে ধীরে। অল্পক্ষণের মধ্যে সারা আকাশ ঢেকে গেলো মেঘে। শুরু হলো মুষলধারায় বৃষ্টি। প্রাণ ফিরে পেলো বিশুষ্ক মৃত্তিকা। তা থেকে উদগত হলো তৃণগুল্ম উদ্ভিদ। শুরু হলো শস্যের সম্ভাবনা, সমারোহ। এভাবে আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করলেন ওষ্ঠাগতপ্রাণ বনী ইসরাঈল জনগোষ্ঠীকে। কিন্তু তারা আল্লাহর এই বিশেষ দানের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো না। গ্রহণ করলো না হযরত ইলিয়াস আ. কর্তৃক আনীত ধর্মমতকে। পুনরায় নিমজ্জিত হলো ঘোর পৌত্তলিকতায়।

হযরত ইলিয়াস আ. মর্মাহত হলেন। নিবেদন জানালেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! এই দুর্বৃত্তদের হাত থেকে এবার আমাকে মুক্তি দাও। জবাব এলো, এতো তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করো। ওই নির্দিষ্ট তারিখে অমুক স্থানে গমন কোরো। দেখবে, সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে একটি বাহন। কাল বিলম্ব না করে ওই বাহনে আরোহণ কোরো।

নির্দিষ্ট তারিখ এসে পড়তেই হযরত ইলিয়াস আ. আল ইয়াসাকে সঙ্গে নিয়ে উক্ত স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অকস্মাৎ তাঁর সামনে উপস্থিত হলো একটি অগ্নিবর্ণের ঘোড়া। হযরত ইলিয়াস আ. এক লাফে তার উপর উঠে পড়লেন। ঘোড়াটিও চলতে শুরু করলো সঙ্গে সঙ্গে। আল ইয়াসা চিৎকার করে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার জন্য আপনার কী আদেশ? ঘোড়াটি তখন হযরত ইলিয়াসকে নিয়ে মহাশূন্যের দিকে উড়াল দিয়েছে। উড়ন্ত অবস্থায় হযরত ইলিয়াস আ. নিচের দিকে ছুঁড়ে দিলেন একটি স্বলিখিত দলিল। আল ইয়াসা সেটিকে তুলে নিলেন। দেখলেন, তাতে লেখা রয়েছে- তোমাকে বনী ইসরাঈলদের পরবর্তী পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করা হয়েছে। দু'জনের মধ্যে সেটাই ছিলো শেষ সাক্ষাত। এরপর আল্লাহ তায়ালা হযরত ইলিয়াসকে দান করলেন ফেরেশতাদের স্বভাব। পানাহারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত করে দিলেন তাঁকে। দান করলেন ফেরেশতাদের মতো উড়ালপ্রবণ ডানা। তিনি হলেন একই সঙ্গে মৃত্তিকানির্মিত মানুষ এবং ডানা বিশিষ্ট আকাশচারী ফেরেশতা।

এদিকে আল্লাহতায়ালা এক অজ্ঞাত প্রতাপশালী রাজাকে চড়াও করে দিলেন বাদশাহ উজুব ও তার সম্প্রদায়ের লোকদের উপর। ওই রাজা প্রথমেই বাদশাহ্ ও তার পত্নীকে হত্যা করে ফেলে রাখলো শহীদ মাযদাকীর বাগানে। সেখানেই পচে গলে মাটিতে মিশে গেলো তাদের লাশ। আল্লাহপাক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আল ইয়াসাকে জানালেন, তুমিই বনী ইসরাঈলদের বর্তমান নবী। এতোদিনে বোধদয় ঘটলো দুর্বিনীত বনী ইসরাঈল জনগোষ্ঠীর। এবার তারা সর্বান্তঃকরণে

মেনে নিলো নতুন নবী আল ইয়াসাকে। তাঁর মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত তারা অনড় রইলো তাঁর আনীত ধর্মাদর্শের উপর।

আবদুল আজিজ ইবনে আবু দারদার উদ্ধৃতি দিয়ে সারাই ইবনে ইয়াহ্ইয়া বর্ণনা করেছেন, হযরত ইলিয়াস এবং হযরত খিজির বায়তুল মাকদিসে উপস্থিত হয়ে প্রতি রমজানে রোযা রাখেন এবং একে অপরের সঙ্গে মিলিত হন হজের সময়ে। এরকমও বলা হয়ে থাকে যে, হযরত ইলিয়াস বিরাণ মরুভূমির জনশূন্য অরণ্যের এবং হযরত খিজির সমুদ্রের দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ একজন পথ দেখান মরুচারী ও অরণ্যচারী বিভ্রান্ত পথিককে এবং বিপন্ন সমুদ্রচারীকে উদ্ধার করেন অপর জন।[৫৬১]

হযরত ইলিয়াস আ. বর্তমান জীবিত না মৃত্যু:

হযরত ইলিয়াস আ. বর্তমান জীবিত আছেন না মৃত্যুবরণ করেছেন তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে ইমাম বগভীর উদ্বৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, ইলিয়াস আ.কে অগ্নিঅশ্বে সওয়ার করায়ে আকাশে তুলে নেয়া হয় এবং তিনি হযরত ঈসা আ.'র মতই জীবিত রয়েছেন। আল্লামা সূয়ুতী ও ইবনে আসাকির হাকেম প্রমুখের বরাত দিয়ে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন- যাতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইলিয়াস আ. জীবিত আছেন।

وقال مكحول عن كعب اربعة انبياء احياءٌ اثنان فى الارض الياس والخضر واثنان فى السماء ادريس وعيسى عليهما السلام ইমাম মকহুল কা'ব আহবার থেকে বর্ণনা করেন, চার নবী জীবিত আছেন। দু'জন পৃথিবীতে। আর তারা হলেন- হযরত ইলিয়াস ও খিযর আ.। দু'জন আসমানে জীবিত আছেন। এরা হলেন- হযরত ইদ্রিস আ. ও হযরত ঈসা আ.।[৫৬২]

ইবনে আসাকির ইবনে আবি রাওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন- الياس والخضر يصومان شهر رمضان ببيت المقدس وَيُحَجَّان فى كل سنةٍ ويشربان من ماء زمزم شربة واحدةً تكفيهما الى مثلها من قابل হযরত ইলিয়াস ও হিযর আ. রমযান মাসে বায়তুল মোকাদ্দাসে রোযা রাখেন এবং প্রতি বছর হজ্ব করেন আর উভয়েই যমযম কূপ থেকে একবারই পানি পান করেন যা পরবর্তী বছর পর্যন্ত যথেষ্ট হয়ে যায়।[৫৬৩]

---

৫৬১. ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-১০, পৃ. ১১৪-১২৪।

৫৬২. আল্লামা ইবনে কাসীর, ৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, খণ্ড ২, পৃ. ৩৮৮

৫৬৩. প্রাগুক্ত. পৃ ৩৮২

ইমাম বায়হাকী র. দালায়েলুন নবুয়্যত গ্রন্থে হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ'র সাথে এক সফরে ছিলাম। আমরা এক জায়গায় মনযিল করলাম। হঠাৎ আমরা উপত্যকায় এক ব্যক্তি কে বলতে শুনলাম- اَللّٰهُمَّ اجعلنى من امّة محمدٍ صلى الله عليه وسلم المرحومة المغفور لها المتاب عليها অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে দয়া ও ক্ষমা প্রাপ্ত মুহাম্মদ ﷺ'র উম্মতের অন্তর্ভূক্ত করুন। তিনি (আনাস রা.) বলেন, আমি উপত্যকার উপরে উঠে দেখি তিনশ হাতের অধিক লম্বা একজন মানুষ। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? আমি বললাম, আমি রাসূল ﷺ'র খাদেম-আনাস। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আপনি তাঁকে গিয়ে আমার সালাম বলবেন। বলবেন- আপনার ভাই ইলিয়াস আপনাকে সালাম দিচ্ছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নবী করিম ﷺ'র নিকট গিয়ে এই সংবাদ দিলাম। অতপর তিনি এসে তার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং কোলাকুলি ও সালাম কালাম করলেন। এরপর বসে তাঁরা উভয়ে কথোপকথন করেন। ইলিয়াস আ. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বছরে একবার ব্যতিত খাবার গ্রহণ করিনা। আর আজই হল ইফতারের তথা খাওয়ার দিন। আসুন, আজ আমি এবং আপনি একসাথে খাব। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের জন্য আসমান থেকে খাবার পাত্র অবতীর্ণ হয়েছে যাতে রয়েছে রুটি, মাছ, সবজি। তারা তা খেলেন আমাকেও খাওয়ালেন এবং আমরা আসরের নামাজ পড়েছি। অত:পর তিনি বিদায় নিলেন আর দেখলাম তিনি মেঘে আরোহণ করে আসমানের দিকে চলে গেলেন।[৫৬৪]

সারকথা হল ইলিয়াস আ.'র জীবিত থাকার বিষয়টি কোন নির্ভর যোগ্য ইসলামী রেওয়ায়েত দ্বারা প্রামাণ্য নয়। বরং ইস্রাঈলী রেওয়ায়েত দ্বারা বর্ণিত। সুতরাং এ বিষয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়। وهو من الاسرائيلات الّتِي لَا تصدق ولا تكذب অর্থাৎ এটি ইস্রাঈলী রেওয়ায়েত যাকে সত্যও বলা যাবেনা এবং মিথ্যাও বলা যাবেনা।

হযরত ইলিয়াস আ. সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ . اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ . اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ . اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ . فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ . اِلَّا

---

৫৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ . وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ . سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ . إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ . অর্থ: নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল রসূল। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল: তোমরা কি ভয় কর না? তোমরা কি 'বাআল' দেবতার এবাদত করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে যিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা? অত:পর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার খাঁটি বান্দাগণ নয়। আমি তার জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, ইলিয়াসের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক! এভাবেই আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত।[৫৬৫]

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ . অর্থ: আরও যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৫৬৬]

২২. হযরত আল ইয়াসা আ.

পরিচিতি:

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতে هو اليسع بن اخطوب অর্থাৎ তিনি হলেন আখতুবের পুত্র আলইয়াসা। ইবন আসাকিরের মতে তিনি হযরত ইয়াকুব আ.'র বংশধর ছিলেন। তার মতে বংশনামা হবে- আল ইয়াসা ইবনে আদি ইবনে শাউলতম ইবনে আফরাঈম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আ.।

তিনি ছিলেন হযরত ইলিয়াস আ.'র চাচত ভাই। হযরত ইলিয়াস আ.'র পরেই তিনি নবুয়ত লাভ করেন। মূলত তিনি হযরত ইলিয়াস আ.'র সঙ্গী ছিলেন পর্বতে হযরত ইলিয়াস আ.'র সাথে আত্মগোপন কালে তিনিও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ইলিয়াস আ. চলে যাওয়ার সময় হযরত আল ইয়াসা আ.কে তাঁর প্রতিনিধি ও খলীফা নিয়োগ করে যান এবং তাঁর দ্বীনি কার্যক্রম চালিয়ে যাবার জন্যে অসিয়ত করে যান।

হযরত আল ইয়াসা আ. কতদিন যাবৎ হায়াত পেয়েছিলেন কিংবা তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম কিভাবে সর্ম্পন্ন করেছেন কুরআন-হাদিসে তার কোন উল্লেখ নেই। তবে এতটুকু বলা যায় যে, আল্লাহর যতদিন ইচ্ছে ততদিন তিনি হযরত ইলিয়াস আ.'র মিশন ও শরীয়ত মতে মানুষকে হিদায়ত করেছিলেন। তিনি যে নবী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৫৬৭]

---

[৫৬৫]. সূরা সাফ্ফাত, আয়াত: ১২৩-১৩২

[৫৬৬]. সূরা আনআম, আয়াত: ৮৫

[৫৬৭]. আল্লামা ইবনে কাসীর, ৭৭৪হি. কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী খণ্ড-২, পৃ.৩৯০ ও মাওলানা হিফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, খণ্ড-২, পৃ. ৩৫

পবিত্র কুরআনে দু'স্থানে কেবল তাঁর নাম অন্যান্য নবীগণের সাথে উল্লেখ আছে। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে কোথাও কোন উল্লেখ নেই বিধায় ঐতিহাসিকগণ তা উল্লেখ করেননি। সূরা আনআমে আছে–

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ . অর্থ: এবং ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনূস, লূত- প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি।[৫৬৮]

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ . অর্থ: স্মরণ করুন, ইসমাঈল, আল ইয়াসা ও যুলকিফলের কথা। তারা প্রত্যেকেই গুণীজন।[৫৬৯]

২৩. হযরত শামুঈল আ.

নাম ও বংশ : নাম, শামুঈল অথবা আশমুঈল। ঐতিহাসিকগণ বলেন, শামুঈল আ. হযরত হারূন আ.'র বংশধর। তাঁর বংশনামা হল- শামুঈল ইবনে হান্নাহ ইবনে আকের।[৫৭০]

মুকাতিল'র বর্ণনামতে বংশনামা হল- আশমুঈল ইবনে বালী ইবনে আলকামা ইবনে ইয়ারখাম ইবনে ইয়াহু ইবনে তাহু ইবনে সাউফ ইবনে আলকামা ইবনে মহিছ ইবনে আমূসা ইবনে আযরায়া। মুজাহিদ বলেন, তিনি হলেন আশমুঈল ইবনে হালফাকা। তাঁর বংশনামা এর উপরে কেউ বর্ণনা করেননি।

হযরত শামুঈল আ.'র ঘটনা:

হযরত মুসা আ.'র পরে হযরত ইউশা আ. তাঁরপরে হযরত কালেব ইবনে ইউহান্না এবং তাঁর পরে হযরত হিযকীল আ. খলীফা বা প্রদিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন । এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সমকালে তাওরাত শরীফেরে বিধি-বিধান চালু রেখেছিলেন এবং বনী ইস্রাঈলকে হেদায়েত ও সংশোধন করতেন। হযরত হিযকীল আ.'র পরে বনী ইস্রাঈলের অবস্থা খুবই করুন হয়ে পড়েছিল। তারা প্রকাশ্যে মূর্তিপূজা আরম্ভ করে দিল। তখন হযরত ইলিয়াস আ. প্রেরিত হন। তিনি বনী ইস্রাঈলের আজান নামক এক বাদশাহর সহযোগিতায় কিছুটা সংশোধন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পর পুনরায় বনী ইস্রাঈলের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল। তখন হযরত আলইয়াসা আ. প্রেরিত হন। তিনিও তাওরাতের বিধান

---

[৫৬৮]. সূরা আনআম, আয়াত: ৮৬

[৫৬৯]. সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ৪৮

[৫৭০]. তাফসীরে রূহুল মায়ানী, খণ্ড-২, পৃ. ১৪২, সূত্র কাসাসুল কুরআন, খণ্ড-২, পৃ. ৩৯।

তাদের মধ্যে পুণ:প্রচলন করেন। উল্লেখ্য যে, হযরত হিযকীল আ.'র পরে বনী ইস্রাঈলের এক বংশের মধ্যে খিলাফত ও সালতানাত ছিল আর অন্য বংশের মধ্যে ছিল নবুয়ত। অর্থাৎ লাভী ইবনে ইয়াকুব আ.'র বংশে ছিল নবুয়ত আর ইয়াহুদ ইবনে ইয়াকুব আ.'র বংশে ছিল সালতানাত। অর্থাৎ লাভীর আওলাদগণের মধ্যে থেকে নবী হতেন আর ইয়াহুদার আওলাদগণের মধ্য হতে বাদশা হতেন।

হযরত আল ইয়াসা আ.'র পর থেকে বনী ইস্রাঈলের অবাধ্যতা সীমাতিক্রম করার ফলে তাদের থেকে রাজত্বও কেড়ে নেয়া হল এবং আম্বিয়া আগমনের ধারাবাহিকতাও বন্ধ হয়ে গেল। আর তাদের উপর ফেরাউনের ন্যায় জালূত নামক একজন অত্যাচারী বাদশা নিযুক্ত হল। সেই আমালেক ইবনে আদ'র বংশ এবং অত্যন্ত নিষ্টুর ও যালিম বাদশা ছিল। এর ফলে আমালেকা গোত্রের লোকেরা কিবতীদের ন্যায় বনী ইস্রাঈলের উপর বিভিন্ন প্রকারের যুলুম-অত্যচার শুরু করে দিল।

আমালেকারা তাদের শহর দখল করে নিল এবং তাদের অনেক লোককে গ্রেফতার করল। এভাবে সীমাহীন কঠোরতা প্রদর্শন করতে লাগল। এই জালুতী তথা আমালেকা সম্প্রদায় মিশর ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী রোম সাগরের নিকটে বসবাস করত। এখন বনী ইস্রাঈলে না আছে কোন নবী আর না আছে কোন বাদশাহ। তবে বনী ইস্রাঈলের নবুয়ত প্রাপ্ত বংশের কেবল একজন অন্ত:সত্ত্বা নারী অবশিষ্ট ছিলেন। তিনি এবং বনী ইস্রাঈল সর্বদা দোয়া করত যেন আল্লাহ তায়ালা তার গর্ভ থেকে কোন একজন নবী পয়দা করেন। যার দ্বারা আমাদের করুণ অবস্থা পরিবর্তন হবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের দোয়া কবুল করেছেন এবং তার গর্ভ থেকে হযরত শামুঈল আ. জন্ম গ্রহণ করেন।

শামুঈল শব্দটি اشمو এবং ایل থেকে গঠিত। ইব্রানী ভাষায় اشمو অর্থ শুনেছেন অর্থ ایل অর্থ আল্লাহ। তাঁর মাতা পুত্র সন্তানের জন্য অনেক প্রার্থনা করেছিলেন। যখন তিনি জন্মলাভ করেন তখন তাঁর মা বলেছিলেন। اشمویل অর্থাৎ আল্লাহ আমার প্রার্থনা শুনেছেন। সুতরাং সেটিই তাঁর নাম হয়ে গেল। যে ভাবে হযরত ইব্রাহীম আ. সন্তানের জন্য অনেক দোয়া করেছিলেন এবং সর্বদা দোয়ার শেষে বলতেন اِسْمَعْ يَا اِيْلُ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার প্রার্থনা শুনুন। যখন সন্তান জন্ম লাভ করল তখন সেই দোয়াকে স্মরণীয় করনার্থে তাঁর নাম রাখা হল ইসমাঈল। বর্তমান যেভাবে দোয়ায় আমীন বলা হয় সেকালে اسمع ایل বলা হত।

নবুয়ত লাভ :

যখন হযরত শামুঈল আ. বড় হলেন তখন তাঁকে বায়তুল মোকদ্দাসে একজন আলেমের নিকট সোপর্দ করা হল। তিনি তাঁকে নিজের সন্তান বানিয়ে নিলেন এবং তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি তাকে তাওরাত মুখস্থ করালেন এবং দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা দিলেন।

যখন তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হলেন তখন একরাতে তিনি সেই আলেম ব্যক্তির পাশে ঘুমাচ্ছিলেন। হযরত জিব্রাঈল আ. ঐ আলেমের কণ্ঠে ডাকদিলেন হে শামুঈল! তিনি ঘুম থেকে দ্রুত উঠে আলেম ওস্তাদের কাছে গিয়ে বললেন, হুযুর! আমাকে কেন ডেকেছেন? ওস্তাদ মনে মনে চিন্তা করলেন যে, যদি তাঁকে আমি ডাকিনি বলি তবে সে ভয় পেয়ে যাবে। তাই তিনি বললেন, তুমি শুয়ে যাও। তিনি শুয়ে গেলেন। পুনরায় তিনি সেই শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি পুনরায় ওস্তাদের নিকট গিয়ে বললেন, হুযুর! আমাকে কেন ডেকেছেন? তিনি এবারও বললেন, যাও শুয়ে যাও। এবার যদি আমি তোমাকে ডাকি তবে তুমি না বলবে। তখন তিনি গিয়ে শুয়ে গেলেন। তৃতীয়বার হযরত জিব্রাঈল আ. প্রকাশিত হয়ে তাঁর সামনে গিয়ে বললেন, হে শামুঈল! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে নবী নির্বাচিত করেছেন। স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট যান আর দ্বীনের তাবলীগ ও বিধি-বিধান চালু করুন। অত:পর তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট গেলেন। বনী ইস্রাঈল পূর্বে থেকে নবীগণকে হত্যা ও অমান্য করার অভ্যস্থ জাতি ছিল। ফলে তারা তাঁকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগল আর বলতে লাগল আপনি কি এত দ্রুত নবী হয়ে গেলেন? আচ্ছা যদি আপনি নবী হয়ে থাকেন তবে আমাদের জন্য একজন বাদশা নিয়োগ দিন, যার সাথে আমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যালেমদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব।

মনে রাখতে হবে যে, তৎকালে-নবীগণই ফতোয়া দিতেন বাদশা নিয়োগ দিতেন। অর্থাৎ সৃষ্টির হাকেম হতেন সুলতান বা বাদশা আর সুলতানের হাকেম হতেন নবী। এমনকি নবীই বাদশা নির্বাচন করতেন।

তালুত বনী ইস্রাঈলের বাদশা নির্বাচিত হলেন:

অতঃপর বনী ইস্রাঈলের আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত শামুঈল আ. আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন হে আল্লাহ ! এদের জন্যে একজন বাদশা নিযুক্ত করুন। তখন তাঁকে একটি লাটি প্রদান করা হল আর বলা হল, এই লাঠি দিয়ে ইস্রাঈলীদের মেপে দেখুন। যার দৈর্ঘ এই লাঠির সমান হবে সেই হবে বাদশা। আরো বলা হল যে, বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে একটি শিশিরে তেল ভরে নিন এবং ভাল করে ডাকনি দিয়ে শিশিরের মুখ বন্ধ করে রাখুন। যে ব্যক্তির প্রবেশে এই

শিশিরের তেল উথলিয়ে উঠে ডাকনি খুলে পড়ে যাবে সেই হবে বাদশা। তিনি এই নিদের্শিত পন্থায় সবাইকে পরিমাপ করে দেখেছেন, কাউকে লাঠির সমান পাওয়া গেলনা।

তালুত নামক জনৈক ব্যক্তি যার পিতা চামড়ার ব্যবসা করতেন। কারো মতে পানি পান করাতেন। ঘটনাক্রমে তার একটি গাধা হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি তার ছেলে তালুত ও অন্য একজন গোলামকে গাধার খোঁজে প্রেরণ করলেন। পথিমধ্যে হযরত শামুঈল আ.'র বাড়ী ছিল। গোলাম তালুতকে বলল, আসুন আমরা এই নবীর কাছে জিজ্ঞাসা করি আমাদের গাধা কোথায়? কেননা নবীগণের নিকট কোন কিছু গোপন থাকেনা। তিনিও বললেন, চলো। তারা উভয় যখন ঘরে প্রবেশ করলেন এবং হারিয়ে যাওয়া গাধা সম্পর্কে জানতে চাইলেন, হঠাৎ শিশিরে ভর্তি তেল জোশ মেরে উপচে উঠল এবং ডাকনি অনেক দূরে গিয়ে পড়ল। তখন শামুঈল আ. উভয়কে লাঠি দিয়ে মেপে দেখলেন। তালুতের দৈর্ঘ্য লাঠির সাথে বরাবর মিলে গেল। তখন শামুঈল আ. সেই তেল তালুতের মাথায় মাখলেন এবং বললেন, হে তালুত! আমি আল্লাহর হুকুমে তোমাকে বনী ইস্রাঈলের জন্য বাদশা নিযুক্ত করলাম। এখন যাও বনী আমালেকার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্যে সৈন্য তৈরী কর। সুবহানাল্লাহ! হযরত মুসা আ. তূর পর্বতে আগুন আনতে গিয়ে নূর তথা নবুয়ত নিয়ে এসেছেন আর তালুত গাধা খোঁজতে গিয়ে সালতানাত তথা বাদশাহী নিয়ে এসেছেন।

তালুত আরয করল, আমিতো কোন শাহী খান্দানের লোক নই। বংশ ও পেশা গত দিক দিয়ে উত্তম নই। বনী ইস্রাঈল আমাকে ভাল চোখে দেখবেনা। শামুঈল আ. বললেন, এখন তুমি আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত। তালুত বলল, তাহলে তার প্রমাণ কি? নবী বললেন, তার প্রমাণ হল, তুমি গিয়ে দেখবে যে, তোমার গাধা অমনি তোমার ঘরে পৌঁছে গেছে। অতঃপর তিনি বনী ইস্রাঈলের নিকট তালুতকে তাদের বাদশা হিসাবে ঘোষণা করলেন। তখন তারা আপত্তি তুলল যে, সে কিভাবে আমাদের বাদশা হবে। অথচ বাদশা হওয়ার জন্য তার চেয়ে আমরাই অধিক হকদার। কারণ সে বিত্তশালী নয় বরং একজন গরীব ব্যক্তি। তখন নবী বললেন, আল্লাহই তাকে বাদশা নির্বাচিত করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিকে তাকেই প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকেই রাজত্ব দান করেন।[৫৭১]

[৫৭১]. দুররে মনছুর, খাযায়েনুল ইরফান, খাযেন ও রুহুল মায়ানী, সূত্র তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-২, পৃ. ৬০৬-৬১৫ আল্লামা ইবনে কাসীর, ৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী খণ্ড-২, পৃ.৩৯৮

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ . وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

অর্থ: মূসার পরে তুমি কি বনী–ইসরাঈলের একটি দলকে দেখেনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্ নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অত:পর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ্ তাআলা জালেমদের ভাল করেই জানেন আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ্ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর! অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন– নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুত: আল্লাহ্ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ্ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত।[৫৭২]

তালুতের বংশনামা হল সাওল (তালুত) ইবনে কায়েশ ইবনে আফীল ইবনে ছারু ইবনে তাহুরাত ইবনে আফীহ ইবনে আনীম ইবনে বিনইয়ামিন ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আ.।[৫৭৩]

[৫৭২]. সূরা বাকারা, আয়াত: ২৪৬-২৪৭

[৫৭৩]. আল্লামা ইবনে কাসীর, ৭৭৪হি., আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া খণ্ড-২, পৃ. ৬, সূত্র: কাসাসুল কুরআন, খণ্ড-২, পৃ. ৪০।

তালুত শব্দটিও জালুত ও দাউদ এর ন্যায় ইবরানী শব্দ। علم ও عجمه হওয়ার কারণে غير منصرف হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এটি আরবী শব্দ। অর্থ লম্বা। যেহেতু তিনি অনেক দীর্ঘ দেহী ছিলেন বলে তাকে এনাম রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষ হাত উঁচু করে তাঁর মাথা স্পর্শ করতে পারতো।

বনী ইস্রাঈলরা তালুতকে বাদশাহ হিসাবে মানতে অস্বীকৃত জানার কারণ হল প্রথমত: তৎকালে নবুয়ত প্রাপ্ত হত লাভী ইবনে ইয়াকুব আ.'র বংশধর হতে আর বাদশাহী প্রাপ্ত হত ইয়াহুদ ইবনে ইয়াকুব আ.'র বংশধর থেকে। আর তালুত এ দু' বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা বরং তিনি ছিলেন বিনইয়ামিন ইবনে ইয়াকুব আ.'র বংশের লোক। তাই তারা বলল, বাদশাহী তো ইয়াহুদা বংশের প্রাপ্ত সুতরাং তালুতকে আমরা বাদশাহ হিসাবে মানতে পারিনা।

দ্বিতীয়ত: তাদের ধারণা ছিল যে, বাদশাহ হওয়ার জন্য সম্পাদশালী হওয়া আবশ্যক। অথচ তালুত একজন গরীব ঘরের লোক। তারা ভেবেছিল তালুতের মধ্যে বংশীয় মর্যাদা না থাকলেও অন্তত সম্পদশালী হলেও চলত। যাতে লোকের নিকট তার হুকুমত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। যখন তার মধ্যে এ দু'য়ের একটি গুণও বিদ্যমান ছিলনা তখন তারা তাকে বাদশাহ হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। হযরত শামুঈল আ. তাদের মিথ্যা ধারণার বিপক্ষে এবং তালুতের পক্ষে শক্তিশালী জওয়াব পেশ করেছেন। এক. তিনি বলেছেন ان الله اصطفه عليكم নিশ্চয় তাকে তোমাদের উপর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহর নির্বাচনে কোন ভুল হতে পারেনা। যোগ্যতার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তাকে আল্লাহই নির্বাচন করেছেন। দুই. তিনি বলেছেন- وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ- তাকে আল্লাহ স্বাস্থ্য ও জ্ঞানে প্রশস্ততা দান করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাকে শরিয়তের জ্ঞান এবং রাজনৈতিক জ্ঞান উভয়টা দান করেছেন যা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তাঁকে দৈর্ঘ, সুটাম দেহের অধিকারী শক্তিশালী এবং সৌন্দর্য্য দান করেছেন যা শত্রুর প্রতি ভীতি সঞ্চার করে। রাজ্য পরিচালনার জন্য জ্ঞান-বুদ্ধি এবং শক্তির অধিক প্রয়োজন কেবল সম্পদ নয়। তিন. তিনি বলেছেন وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ আল্লাহ তাঁর রাজ্য যাকে ইচ্ছে তাকে দান করেন। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর দয়া ও ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল। ধন-দৌলত, বংশ ইত্যাদি যোগ্যতা হিসেবে বিবেচ্য নয়।

চার. তিনি বলেছেন وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় জ্ঞাত। অর্থাৎ তিনি ফকীরকে ধনী করেন। তিনি যখ। তাকে রাজত্ব দান করেছেন, তখন সম্পদের মালিকও বানিয়ে দেবেন। আর তিনিই ভাল জানেন কে বাদশাহীর উপযুক্ত আর কে অনুপযুক্ত। এভাবে শামুঈল আ. বনী ইস্রাঈলকে তালুতের বাদশাহী মেতে নিতে সম্মত করাতে চেষ্টা করেন।[৫৭৪]

এখানে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন বনী ইস্রাঈলরা তালুতকে বাদশাহ হিসাবে মেনে নিতে না চাওয়ার কারণ হল- তিনি ইয়াহুদা বংশের ছিলেন না। এমনিভাবে আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ'কেও ইহুদীরা অস্বীকার করার কারণ হল তিনি বনী ইস্রাঈল তথা ইহুদী বংশের ছিলেন না বরং তিনি বনী ইসমাঈল আ.'র বংশধর।[৫৭৫]

তাবুতে সকীনা তথা প্রশান্তিলাভের সিন্ধুক :

বনী ইস্রাঈল হযরত শামুঈল আ.'র সমস্ত বক্তব্য শ্রবণ করে বলল, তালুত বাদশাহ নিযুক্ত হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমান দেখান যাতে সকলের মনে প্রশান্তি আসে। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ হল তোমাদের পূর্বপুরুষ কতৃক প্রাপ্ত বরকত মণ্ডিত যে সিন্ধুকটি ইতিপূর্বে যালিম বাদশাহ জালুত ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেটি তোমাদের নিকট কুদরতীভাবে ফিরে আসবে। উক্ত সিন্ধুকে হযরত মুসা আ. ও হযরত হারূন আ.'র রেখে যাওয়া কিছু বরকত মণ্ডিত বস্তু সামগ্রী ছিল।

সিন্ধুকটি শামশাদ বৃক্ষের কাঠ দ্বারা নির্মিত ছিল, যার উপর স্বর্ণের ছাদর ছড়ানো ছিল। এর দৈর্ঘ ছিল তিন হাত আর প্রস্ত ছিল দু'হাত। এটি আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আ.'র প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। তাতে আম্বিয়া কিরাম এবং তাদের ঘর-বাড়ীর ছবি ছিল। হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং লাল রঙ্গের ইয়াকুত পাথরের নির্মিত তাঁর ঘরের ছবিও তোলা ছিল।

হযরত মুসা আ. তাওরাত শরীফ সেই সিন্ধুকে রাখতেন এবং নিজের বিশেষ সরঞ্জামাদিও তাতে রাখতেন। তাওরাতের কিছু তখতের টুকরা, তাঁর লাঠি, পাগড়ি, কাপড় এবং জুতা মোবারকও তাতে ছিল। হযরত হারূন আ.'র পাগড়ি, লাঠি এবং সামান্য 'মান' যা বনী ইস্রাঈলের জন্য অবতীর্ণ হত তাতে ছিল। হযরত মুসা আ. যুদ্ধের সময় সেই সিন্ধুকটিকে অগ্রে রাখতেন এবং এর বরকতে যুদ্ধে জয়লাভ করতেন। এর দ্বারা বনী ইস্রাঈল প্রশান্তি লাভ করত। হযরত মুসা

---

[৫৭৪]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রা., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-২, পৃ. ৬১৩

[৫৭৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৪-১৫

আ.'র পর এই সিন্ধুকটি বংশপরম্পরায় বনী ইস্রাঈলের মধ্যে একের পর এক পরিবর্তীত হয়ে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। যখনই তাদের সামনে কোন বালা-মুসিবত আসত তখনই তারা সেটাকে সামনে রেখে দোয়া করত এবং সফলকাম হত। এটির বরকতে শত্রুর মোকাবেলায় জয়ী হত।

যখন তাদের বদআমল সীমালঙ্ঘন করল তখন আমালেকা সম্প্রদায়কে তাদের উপর চেপে দেয়া হল। সে ইস্রাঈলীদের থেকে সিন্ধুকটিও ছিনিয়ে নিল এবং ওটাকে অপবিত্র ও অসম্মান করে নাপাক স্থানে রেখে দিল। এই বেয়াদবী ও বেহুরমতির কারণে আমালেকা গোত্র কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় এবং বিভিন্ন মুসিবতে পতিত হয়। যে কেউ সেই সিন্ধুকে পেশাব করত কিংবা থুথু নিক্ষেপ করত তারা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হত, যে এলাকায় রাখত তাতে মহামারী দেখা দিত। এভাবে আমালেকা গোত্রের পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে গেল। তখন তারা নিশ্চিত হল যে, এই সিন্ধুকের বেহুরমতির কারণে এসব বিপদ হচ্ছে। অবশেষে তারা অতিষ্ট হয়ে একটি গরুর গাড়িতে সিন্ধুকটি রেখে গরু দু'টিকে হাকিয়ে দিল। ওদিকে হযরত শামুঈল আ. বনী ইস্রাঈলকে সংবাদ দিলেন যে, তালুতের নিকট তাবুত আসতেছে। ফেরেশতারা গরু দু'টিকে হাঁকিয়ে তাবুত সহ গরুর গাড়িকে তালুতের নিকট নিয়ে গেল। তখনই তারা তাবুত দেখে খুশী হল ও যুদ্ধে জয়লাভের ক্ষেত্রে নিশ্চিত হল এবং তালুতকে বাদশাহ হিসাবে মেনে নিল।[৫৭৬]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন বর্ণিত হয়েছে– وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . অর্থ: বনী ইসরাঈলীদেরকে তাদের নবী আরো বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্ত। আর তাতে থাকবে মূসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে।[৫৭৭]

---

[৫৭৬]. তাফসীরে কবীর, খাযায়েনুল ইরফান, রূহুল মায়ানী, রূহুল বয়ান, জুমাল ও খাযেন সূত্র- তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-২, পৃ. ৬২৩-৬২৪

[৫৭৭]. সূরা বাকারা, আয়াত: ২৪৮

পবিত্র তাওরাত গ্রন্থে এই তাবুতে সকীনাহ ফিরে আসার ঘটনাটি বড় মনপুত করে আকর্ষণীয় ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তা হল ফিলিস্তিনীরা বনী ইস্রাঈলদের আক্রমণ করে তাদের থেকে বরকত মণ্ডিত তাবুতে সকীনাহটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ফিলিস্তিনীরা তাদের প্রসিদ্ধ মন্দির 'বাইতে দাজুন'-এ সিন্ধুকটি রেখেছিল। তাদের সর্ববৃহৎ মূর্তি 'দাজুন'-এর নামে এ মন্দিরের নাম করণ করা হয়েছে। সিফরে শমুঈল-এ বর্ণিত আছে যে, যখন থেকে ফিলিস্তিনীরা পবিত্র সিন্ধুকটি 'বাইতে দাজুনে' রেখেছিল তখন থেকে এই দৃশ্য দেখতে পেত যে, সকালে যখন তারা তাদের 'দাজুন' মূর্তির পূজা করতে যেত, তারা মূর্তির মুখ পড়ে থাকতে দেখত। সকালে তারা পুনরায় মূর্তিটিকে ঠিক করে রাখলে রাতের বেলায় সেটি আবার মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত। এরপর আরো একটি নতুন বিপদ দেখতে পেল। ঐ শহরে এতবেশী ইঁদুরের জন্ম হল যে, তাদের অর্জিত সমস্ত খাদ্য সম্ভার খেয়ে ফেলে এবং ধ্বংস করে দেয়। তাছাড়া এক প্রকারের গিলটি, তাদের সেখানে সৃষ্টি হল, যা তাদের প্রাণ নাশের কারণ হয়ে দাড়াল। ফিলিস্তিনীরা যখন কোনভাবে এসব বিপদ থেকে মুক্তি পাচ্ছিলনা তখন চিন্তা-ভাবনা করে বলতে লাগল, মনে হয় আমাদের উপর অর্পিত যাবতীয় মুসিবত এই সিন্ধুকের কারণেই হচ্ছে। সুতরাং এটা এখান থেকে সরিয়ে নিতে হবে।

অতঃপর ফিলিস্তিনীরা তাদের গণকদেরকে একত্রিত করে তাদের কাছে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে পরিত্রাণের পরামর্শ চাইল। গণকরা বলল, এই বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হল, যে ভাবেই হোক এই সিন্ধুকটি এখান থেকে বের করে দাও। আর তা এভাবে করতে হবে স্বর্ণ দিয়ে সাতটি ইঁদুর এবং সাতটি গিলটি তৈরী করে একটি গাড়িতে সিন্ধুকসহ রেখে দিবে। তারপর এমন দু'টি গাভী গাড়ীতে জুড়ে দিতে হবে যে গাভীদ্বয় দুধ দিচ্ছে। আর গাড়ীকে বস্তির বাইরে নিয়ে সড়কে ছেড়ে দিতে হবে। যেদিকে গাভী দু'টির ইচ্ছে সে দিকে নিয়ে যাবে।

অতএব, ফিলিস্তিনীরা তাই করল। কিন্তু খোদার কি কুদরত। গাভীদ্বয় গাড়ীটি বনী ইস্রাঈলের বস্তির দিকে নিয়ে গেল। যেতে যেতে বনী ইস্রাঈলের একটি ক্ষেতে গিয়ে থামল যাতে ইস্রাঈলী কৃষকরা ফসল কাটতেছে। ইস্রাঈলীরা যখন তাদের হারিয়ে যাওয়া বরকত মণ্ডিত সিন্ধুক দেখতে পেল খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ল এবং দৌড়তে দৌড়তে শহরে 'বাইতে শামস'-এ গিয়ে সংবাদ দিল। এরপর 'বাইতে ইয়ামার' এর ইহুদী এসে এটাকে খুবই সম্মান ও আদবের সাথে টিলায় অবস্থিত 'ইন্ধাবের' ঘরে সংরক্ষিত করে রাখল।[৫৭৮]

---

[৫৭৮]. কাযী হেফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, খণ্ড-২, পৃ. ৪৪-৪৫

তালুত ও জালুতের মধ্যে যুদ্ধ ও বনী ইস্রাঈলের পরীক্ষা:

বনী ইস্রাঈল যখন অব'শেষে তালুতকে বাদশাহ হিসাবে মেনে নিল তখন তিনি জালুতের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বনী ইস্রাঈলকে প্রস্তুতি নিতে ঘোষণা করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং যার অন্তর দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত তারা যেন এযুদ্ধে আমার সাথে না যায়। সুতরাং যারা ঘর নির্মাণ করতেছে কিংবা যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত বা যারা ঋণগ্রস্ত, এবং যারা সবেমাত্র বিবাহ করেছে তারা যেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে। কেবল মাত্র যারা সম্পূর্ণ মুক্ত এবং সুস্থ নওজোয়ান তারাই সৈন্যদলে যোগদান করবে। যাতে তারা নি:শ্চিন্তায় যুদ্ধ করতে পারে। অতঃপর তিনি এরূপ লোক বাছাই করে আশি হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন। এটি তাফসীরে রূহুল বয়ান গ্রন্থে বর্ণিত সংখ্যা। দুররে মনছুর গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে এ সৈন্য দলের সংখ্যা ছিল তিনলক্ষ তিন হাজার তিন শত তের জন। কারণ তিনি চেয়েছেন যে, আমার সাথে কেবল ধৈর্যশীলরাই যাবে, কোন কাপুরুষ ও অধৈর্যব্যক্তি সমাগম যেন না হয়। কেননা, কখনো কখনো এরূপ অসংখ্য ব্যক্তি হলেও পরাজয়ের কারণ হয়ে যায়। সুতরাং যুদ্ধের পূর্বে বনী ইস্রাঈলকে ধৈর্য ও আনুগত্যের পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন মনে করেছিলেন তিনি। তাই আল্লাহর হুকুমে তিনি ঘোষণা করলেন, সামনে ঠাণ্ডা পানির একটি নদী আসতেছে। এটি উরদুন নদী। আল্লাহ তায়ালা এই নদীর মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। কেউ যেন সেই নদীর পানি পান না করে। বেশী প্রয়োজন হলে কেবল এক ক্রোশ পানি পান করার অনুমতি আছে। যে ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম করবে তাকে দল থেকে বহিস্কার করা হবে আর যে আদেশ মানবে সেই দলের অর্ন্তভুক্ত হবে। মৌসুম ছিল প্রচণ্ড গরম। লোকেরা পানির পিপাসায় অস্থির ও কাতর হয়ে পড়েছে। ঠিক দুপুরের সময় নদী পার হতে যাচ্ছিল। পরীক্ষা আরম্ভ হল। তিনশত তের জন্য ব্যতিত বাকীরা সবাই প্রাণভরে ইচ্ছে মত পানি পান করেছে। তাদের মধ্যে যারা নিদের্শ মতে এক ক্রোশ পানি পান করেছে তাদের জন্য এক ক্রোশ পানি নিজের এবং ঘোড়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে যারা ইচ্ছে মত পানি পান করেছে তারা যতই পানি পান করে ততই তাদের পিপাসা বাড়তে থাকে। তাদের ঠোঁট কাল হয়ে গিয়েছিল এবং পেট ফুলে গিয়েছিল।

অতঃপর যারা পানি পান করেনি কিংবা এক ক্রোশ পান করেছিল তারা বীরের ন্যায় নদী পার হয়ে গেল আর যারা ইচ্ছেমত পানি করেছিল তারা দূর্বল হয়ে নদীতেই রয়ে গেল। নদী পার হওয়া তিনশত তের জন সৈন্য সামনে

অগ্রসর হয়ে অস্ত্রহীন অল্পসংখ্যক মুজাহিদরা যখন জালুত ও তার যুদ্ধ সরঞ্জামে সজ্জিত সুবিশাল সৈন্য দল দেখে তখন তারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এক দলের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি হল। তারা বলতে লাগল, এই বিশাল সৈন্য দলের বিরোদ্ধে লড়াই করার শক্তি-সামর্থ আমাদের নেই। যেই তাদের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে, সেই হাতের তালুতে প্রাণ নিয়ে শাহাদাত লাভের জন্য যাবে। কেননা তারা সংখ্যাঘরিষ্ঠ আর আমরা সংখ্যালঘিষ্ট। তাদের নিকট প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম আর আমাদের নিকই কিছুই নেই। তারা বাহাদুর আর আমরা দুর্বল। এদের কথায় সকলের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করার সম্ভাবনা ছিল তাই তাদের অপর দল যারা বীর-বাহাদুর ছিল, তারা বলল- যাদের মধ্যে আল্লাহর সাওয়াব ও সাহার্য্যের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে তারা একথা বলতে পারে না। অনেক সময় ছোট দলও বৃহৎ দলের উপর বিজীয় হয়। বিজয় তো আল্লাহর দয়া ও সাহার্য্যে হয় সংখ্যাধিক্য কিংবা বেশী অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা নয়। ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ আছেন এবং তাদেরকে তিনি সাহার্য্য করেন। উল্লেখ্য যে, তালুতের সৈন্যছিল মাত্র তিনশত তেরজন পক্ষান্তরে জালুতী সৈন্য ছিল এক লক্ষ মতান্তরে তিন লক্ষ।

নিষ্ঠাবান মু'মিন সৈন্যরা যখন জালুত ও তার সৈন্যদের মোকাবিলায় ময়দানে আসল এবং যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হচ্ছিল তখন তারা আল্লাহর নিকট তিনটি দোয়া করেছেন। তাঁরা বললেন- رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. অর্থ: (১) হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দিন (২) আমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়পদ রাখুন ও (৩) আমাদেরকে সেই কাফের সম্প্রদায়ের বিরোদ্ধে বিজয়ী দান করুন।[৫৭৯]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন বর্ণিত হয়েছে-

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

---

৫৭৯. তাফসীরে কবীর ও রূহুল মায়ানী, সূত্র: তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-২, পৃ.৬৩০-৬৪০, আল্লামা ইবনে কাসীর, ৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, খণ্ড-২, পৃ. ৩৯৯

الْكَافِرِينَ ۔ অর্থ: অত:পর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অত:পর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালূত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন। আর যখন তালূত ও তার সেনাবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ- আর আমাদের সাহায্য কর সে কাফের জাতির বিরুদ্ধে।[৫৮০]

দাউদ আ. কর্তৃক জালুতকে হত্যা:

জালুত আমালেকা ইবনে আদীর বংশধর ছিল। সে দীর্ঘ দেহ বিশিষ্ট যুবক ছিল। তার দেহের ছায়া একমাইল পর্যন্ত লম্বা হত। সে একজন বাহাদুর যলিম যুদ্ধা ছিল। তিনশত রিতল ওজনের লোহার টুপি যুদ্ধের সময় মাথায় পরিধান করত এবং একাই বিপক্ষ দলের সৈন্যদেরকে হটিয়ে দিত। এ কারণেই তাকে জালুত বলা হত। ইসলামী সৈন্য দলের মধ্যে হযরত দাউদ ইবনে ঈশাও ছিলেন। যিনি খাছরুন ইবনে ফারিদ্ব ইবনে ইয়াহুদা ইবনে ইয়াকুব আ.'র বংশধর ছিলেন। ঈশা'র সাত জন সন্তান ছিল। কোন কোন বর্ণনায় তেরজন বলা হয়েছে। তন্মধ্যে হযরত দাউদ আ. ছিলেন সর্বকনিষ্ট। তিনি ছাগল চরাতেন। ঈশা এবং তার ছয় সন্তান উর্দুন নদী অতিক্রম করে জালুতের বিরুদ্ধে সৈন্যদলে যোগদান করেন। এ সময় দাউদ আ. অসুস্থ ছিলেন। তাঁর গায়ের রং ছিল হলুদ বর্ণের।

জালুত যখন যুদ্ধের ময়দানে এসে হাঁক-ডাক দিয়ে তার মোকাবেলা করার জন্যে তালুত বাহিনীকে আহবান করল, জালুতের শৌর্য-বীর্য ও শারিরিক শক্তি-সামর্থ দেখে তালুত বাহিনী ভীত হয়ে পড়ল। কেউ তার মোকাবেলায় যেতে

৫৮০. সূরা বাকারা, আয়াত, ২৪৯-২৫০

সাহস পাচ্ছে না। তখন তালুত ঘোষণা দিলেন যে, যে জালুতকে হত্যা করবে আমি তার সাথে আমার কন্যার বিবাহ দেব এবং অর্ধেক রাজ্যের মালিক বানিয়ে দেব। তবুও কেউ এগিয়ে আসল না। তখন তালুত হযরত শামুঈল আ.কে বললেন, আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন। তিনি দোয়া করলেন এবং ওহীর মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হল যে, দাউদ আ.ই জালুতকে হত্যা করবে। তালুত হযরত দাউদ আ.কে অনুরোধ করলেন এবং পুরস্কারের কথাও উল্লেখ করলেন। তিনি সম্মতি প্রকাশ করলেন। তালুত তাঁকে যুদ্ধের পোশাক পরিয়ে দিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করায়ে জালুতের দিকে পাঠালেন। কিছুদূর যাওয়ার পর মনে মনে খেয়াল আসল যে, যদি আল্লাহ সাহার্য্য করেন তার এসব অস্ত্র-হাতিয়ারের প্রয়োজন কেন? অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়াও তিনি বিজয় লাভ করতে পারেন। এই খেয়াল আসা মাত্র তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছন দিকে ফিরে আসলেন। এই দৃশ্য দেখে জালুত তার সঙ্গী-সাথীদের বলতে লাগল, দেখ, এই বাচ্চার মধ্যে আমার ভীতি সঞ্চার হয়েছে। ফলে পালিয়ে গিয়েছে। দাউদ আ. তালুতকে বললেন, যুদ্ধের এসব সরঞ্জাম আপনার কাছেই রাখুন। আমি আমার ইচ্ছে মত যুদ্ধ করব। অতএব ঘোড়া তলোয়ার, তীর, টুপি ইত্যাদি ব্যতিত কেবল একটি 'গৃপন' (রশি নির্মিত এক প্রকারের অস্ত্র। রশির অগ্রভাগে পাথর বেঁধে ঘুরাতে ঘুরাতে জোরে নিক্ষেপ করার যন্ত্র।) এবং রাস্তা থেকে তিনটি পাথর উঠিয়ে নিলেন যার একটি ছিল মুসা আ.'র পাথর অপরটি ছিল হারূন আ.'র পাথর। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে- পাথর তিনটি ডাক দিয়ে বলেছিল, হে দাউদ! আপনি আমাদেরকে নিন। আমাদের দ্বারা জালুতের মৃত্যু হবে। হযরত দাউদ আ. এই বিশেষ যন্ত্র ব্যাবহারে খুবই পারদর্শী ছিলেন। এটি দিয়ে তিনি বাঘ, সিংহ পর্যন্ত শিকার করতে সক্ষম হতেন।

তিনি জালুতের মোকাবেলায় যখন উপস্থিত হলেন, সে বলল, তুমি আমার মোকাবেলা করার জন্য তিনটি এমন পাথর নিয়ে এসেছে, যা দিয়ে কুকুর মারা যাবে মাত্র। তিনি বললেন, তুই তো কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট। সে বলল, অচিরেই তোমার গোশত-মাংস চীল-কাকে খাবে। তিনি বললেন, আমার নয় বরং তোমার গোশত-মাংস খাবে। তাঁর এই সাহস দেখে জালুত কিছুটা ভীত হয়ে পড়ল। আর বলতে লাগল, হে কচি বাচ্চা। তোমার অল্প বয়স্ক ও বাল্য জীবনের প্রতি আমার মায়া হয়। বরং তুমি চলে যাও আর শক্তিমান কাউকে আমার মোকাবেলায় প্রেরণ কর। তিনি বললেন, এখন কথা বলার সময় নয়, কাজের সময়, সাবধান হও, এক্ষুনি তোমার প্রতি আঘাত হানছি। এই বলে তিনি পাথর তিনটি 'গৃপন' নামক বিশেষ যন্ত্রে স্থাপন করে ঘুরিয়ে যখন নিক্ষেপ করলেন

তখন পাথর জালুতের কপালে গিয়ে পড়ল। আল্লাহই ভাল জানেন যে, সেগুলি কি পাথর ছিল নাকি আবাবিলের কংকর ছিল। পাথরগুলি জালুতের মাথায় পরিহিত তিনশত রিতল ওযনের লোহার টুপি ভেদ করে মগজ ছিদ্র করে মাথার পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং পিছন দিকে অবস্থানকারী জালুত বাহিনীর আরো ত্রিশ জনকে ভেদ করে হত্যা করেছে। মুহূর্তের মধ্যে জালুত ঘোড়া থেকে পড়ে গেল এবং তার সৈন্য বাহিনী বিচ্ছিন্নভাবে পালিয়ে গেল।

দাউদ আ. জালুতকে কুকুরের ন্যায় মাটিতে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে তালুতের নিকট নিয়ে গেলেন। মুসলমানদের খুশীর সীমা ছিলনা। তালুত ওয়াদা মতে নিজের কন্যাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন এবং অর্ধেক রাজ্যের সুলতান বানিয়ে দেন। তিনি এমনভাবে তাঁর রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন, প্রজারা তাঁর জন্যে নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করত না। তাঁর প্রতি জন সাধারণের আনুগত্য ও সমর্থন দেখে তালুতের ঈর্ষা হল। গোপনে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন কিন্তু সফল হননি। পরবর্তীতে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি লজ্জিত হয়ে তাওবা করলেন এবং আরো কিছুকাল পর ইন্তিকাল করেন। এরপর হযরত দাউদ আ. সমগ্র রাজ্যের পরিচালনা করেন।

উল্লেখ্য যে, জালুতের হত্যার পর তালুত চল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন আর তালুতের ইন্তেকালের পর হযরত দাউদ আ. সত্তর বছর বাদশাহী করেছিলেন। তাফসীরে কবীরে বলা হয়েছে, যে, জালুতকে হত্যা করার সাত বছর পর হযরত দাউদ (আ.) নবুয়ত প্রাপ্ত হন।[৫৮১]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. অর্থ: তারপর ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে জালুতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শেখালেন। আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়।[৫৮২]

[৫৮১]. তাফসীরে রূহুল বয়ান, তাফসীরে কবীর, রূহুল মায়ানী, দুররে মনছুর, খাযায়েনুল ইরফান, সূত্র. তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-২, পৃ. ৬৪০-৬৪২

[৫৮২]. সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫১।

কথিত আছে যে, হযরত দাউদ আ. একদিন তাঁর পিতার নিকট বললেন, হে পিতা! আমি রাতে একটি স্বপ্ন দেখলাম, আমি একটি বাঘের উপর সওয়ার হয়ে চলেছি। সে একটি অনুগত খচ্চরের ন্যায় আমাকে পিঠে নিয়ে চলল। আমার মনেই হলনা যে, আমি একটি বাঘের পিঠে চড়েছি। আমি দু'হাতে তার দু'কান মলেছিলাম। আর সে ভয়ে অস্থির হয়ে আমার ইচ্ছেমত যেদিকে চালাতাম সে সেদিকেই চলত। তাঁর পিতা স্বপ্নটির কথা শুনে বললেন, তোমার স্বপ্নের মর্মে বুঝ যাচ্ছে আল্লাহ তোমার শত্রুদের মধ্যে কোন বড় বীরকে তোমা দ্বারা পরাভূত করাবেন। হযরত দাউদ আ. আরেকদিন তাঁর পিতার কাছে বললেন, হে পিতা! আমি আজ ভ্রমণ করতে করতে একটি পাহাড়ী এলাকায় গমণ করছিলাম। ঐ সময় আমি অস্পষ্ট আওয়াযে আল্লাহর নামের তাসবীহ পাঠ করছিলাম। হঠাৎ আমার কানে গুণ গুন আওয়ায ভেসে এল। তখন আমি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলাম, উক্ত এলাকার পাহাড়গুলো আমার সাথে তাসবীহ পাঠ করছে। এ স্বপ্ন শুনে পিতা বললেন, তোমার এ ঘটনায় বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ পৃথিবীতে তোমার বুযুর্গী ও কারামাত বাড়িয়ে দিবেন। ও দিকে আল্লাহ তায়ালা নবী হযরত শামুঈল আ. কে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বনী ইস্রাঈলের দাউদ নামক এক ব্যক্তির হাতে জালুত নিহত হবে। হযরত শামুঈল আ. দাউদ আ.কে খুঁজে বের করে তাঁর থেকে তাঁর সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলেন। তিনি তাঁর পিতার নিকট বর্ণিত স্বপ্ন এবং তাঁর সাথে একযোগে পাহাড়ের তাসবীহ পড়ার ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাছাড়া তিনি আরো একটি ঘটনা প্রকাশ করলেন। তা হল- তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! একদিন আমি পথ চলছিলাম। পথি পাশের একটি পাথর আমাকে বলল, হে দাউদ! আমি এক কালে কিছু সময়ের জন্য হযরত মুসা আ.'র ভাই হযরত হারূন আ.'র হাতে ছিলাম। তিনি তাঁর শত্রুর মাথায় আমাকে নিক্ষেপ করেই তার নিপাত ঘটিয়েছিলেন। আপনি আমাকে তুলে নিজের কাছে রাখুন। সম্ভবত: আমি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি। পাথর খণ্ডের কথা শুনে আমি ভাবলাম আমার কাজে আসুক বা না আসুক, সে আল্লাহর একজন নবীর পবিত্র হাতের স্পর্শ লাভ করেছে, তখন অন্তত বরকত হাসিলের নিয়তেও তাকে সাথে রাখা ভাল। এরূপ খেয়াল করে উক্ত পাথরটি আমার থলের মধ্যে ভরে রেখেছি।

আর একদিন পথ চলাকালে একখানি পাথর আমাকে লক্ষ্য করে বলল, হে দাউদ! আমি এক সময় হযরত মুসা আ.'র হাতে নিক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর এক বেদ্বীন শত্রুকে ধ্বংস করেছিলাম। আপনি আমাকে তুলে নিজের কাছে রাখুন, হয়ত কখনো আমার দ্বারা আপনারও কোন কাজ হতে পারে। আমি পূর্বের পাথর

খণ্ডের মত সেটিকেও তুলে থলের ভিতর রেখে দিলাম। তারপর আর একদিন একখণ্ড পাথর আমাকে বলল, হে দাউদ! এক সময়ে আপনাকে জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে হবে। আপনি আমাকে তুলে নিজের কাছে রাখুন। আমার আঘাতেই তার জীবন শেষ হবে। এ সময় আমার থলের ভিতর হতে পূর্বের পাথর দু'খানা বলে উঠল, হ্যাঁ, সে সত্য কথাই বলছে, তাকে আপনি তুলে নিন। আমরা তো আপনার সঙ্গেই আছি। আপনি যখন জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবেন তখন আমরাও তার সহায়তা করব।

আমি এ পাথরখানও তুলে থলিয়ায় রেখে দিলাম। এরপর আল্লাহর কুদরতে ঐ তিন খণ্ড পাথর এক খণ্ড পাথরে পরিণত হল। এ সব কথা শুনে হযরত শামুঈল আ. বললেন, হে দাউদ! তুমি আমাকে খুবই আনন্দের কথা শুনালে। এ সব কথা কারো নিকট না বলে থাকলে কখনও বলিও না। এ সকল ঘটনা নিশ্চয়ই তোমার নবুয়ত প্রাপ্তির লক্ষণ। নিঃসন্দেহে তুমি আল্লাহর নবী হবে। আর আমালেকা গোত্রের বিশাল দেহী বাদশা জালুতের মত বীর পাহলাওয়ানকে হত্যা করার গৌরবও আল্লাহ তোমাকেই দান করবেন।[৫৮৩]

হযরত শামুঈল আ. মৃত্যু ও দাফন:

হযরত শামুঈল আ. নব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটে দাফন করা হয়।[৫৮৪]

ঐতিহাসিক ইবনে নাজ্জারের মতে হযরত শামুঈল আ. কবর হল বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে 'রসলা' যাওয়ার পথে হাত্তেডানে একটি পাহাড় অবস্থিতি।[৫৮৫]

তালুতের মৃত্যু:

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তালুত প্রথমত দাউদ আ.'র সাথে কৃত ওয়াদা পালন করেন নি। অর্থাৎ মেয়ের বিবাহ ও রাজত্ব দান করেননি। দাউদ আ.ও অভিমান বশত: তালুতের কন্যার সাথে বিবাহ থেকে বিরত ছিলেন। তালুতের মৃত্যুর পরেই তার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং রাজত্বের মালিক হয়েছিলেন।

ঘটনার বিবরণ:

দাউদ আ. জালুতকে বীরত্বের সাথে হত্যা করার পর থেকে তালুতের সৈন্যদল ও সাধারণ জনগণ দাউদ আ.'র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগল।

[৫৮৩]. মাওলানা তাহের সুরাটি, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ.৪০৯

[৫৮৪]. তাফরীহুল আযকিয়া, খণ্ড-২, পৃ. ৫৪২

[৫৮৫]. আল্লামা নাজ্জার , কাসাসুল আম্বিয়া, সূত্র জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ.৬৪০

তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে তালুতের মনে আশংকা হল যে, এরূপ চলতে থাকলে হয়ত একদিন রাজত্ব আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। তখন তালুত দাউদ আ.কে হত্যা করার ইচ্ছা করলেন। দাউদ আ. তা বুঝতে পেরে পর্বতের পাশে গিয়ে মসজিদ নির্মাণ করে ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে আরো সত্তরজন আবেদ ও আলেম সাথে যোগ দেন। বনী ইস্রাঈলরা তালুতকে বলল, দাউদ আ.'র সাথে বহু আবেদ একত্রিত হয়েছেন। এরা দোয়া করলে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব এবং রাজত্বও চলে যাবে। এ কথা শুনে তালুত বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে দাউদ আ.কে হত্যার জন্য সেই পর্বতমালার দিকে যাত্রা করলেন এবং সেখানে পৌঁছে রাতের বেলায় তাদেরকে মসজিদে প্রবেশ করে হত্যার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তালুত ও তার বাহিনীর মধ্যে এমন ভাবে প্রবল নিদ্রার প্রভাব পড়ল যাতে তারা সবাই অঘোর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ল। হযরত দাউদ আ. মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখলেন যে, তালুত তার সৈন্যদলসহ ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন তিনি তালুতের হাত থেকে উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে একটি পাথরে আঘাত করে পাথরকে দু'টুকরা করে তলোয়ার, পাথর এবং একটি কাগজে লিখে তালুতের পেটের উপর রেখে বাতি নিভিয়ে দিলেন। সেই কাগজে লিখেছেন তিনি- হে তালুত! এটি তোমার তলোয়ার, পাথরে আঘাত করে পাথরকে দু'টুকরা করে দিয়েছি। যদি এটি দিয়ে তোমার পেটে আঘাত করতাম, তবে তুমিও দু'টুকরা হয়ে যেতে। সুতরাং তোমার জন্য উত্তম হবে যে, তুমি এখান থেকে উঠে চলে যাও আর আবেদগণকে হত্যার ইচ্ছে মন থেকে বাদ দাও। সকাল বেলা তালুত জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, তার পেটের উপর স্বীয় তলোয়ার, এক টুকরা কাগজ এবং দু'টুকরা পাথর। এগুলো পেয়ে এবং কাগজের লেখা পড়ে তালুত ভীত হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস চলে গেলেন আর দাউদ আ. স্বীয় ইবাদতে মশগুল হলেন।

কিছু দিন পর তালুত পুনরায় কিছু সংখ্যক সৈন্য পাঠিয়ে রাতের বেলায় হঠাৎ আক্রমণ করে দাউদ আ. কে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। সৈন্যরা যখন ইবাদত খানায় পৌঁছে ঘটনাক্রমে তখন হযরত দাউদ আ. কোন প্রয়োজনে ইবাদত খানার বাইরে গিয়েছিলেন। সৈন্যরা ইবাদত খানায় প্রবেশ করে আবেদগণকে শহীদ করে ফেলল। তালুত যখন জানতে পারলেন যে, দাউদ আ. বেঁচে গেছেন তখন তিনি ভীত হয়ে পড়লেন এবং দাউদ আ.'র কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, আপনি আসুন। আপনার সাথে আমার মেয়ের বিবাহ দেব এবং কৃত পাপের অনুশোচনা করব। প্রেরিত দূত হযরত দাউদ আ.'র কাছে গিয়ে বলল, তালুত বাদশাহ আপনাকে ডেকেছেন। আপনি আমাদের সাথে চলুন।

তিনি আপনার কাছে স্বীয় অন্যায়ের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। দাউদ আ. তাদের কথা শুনে বললেন, তালুত কবীরা গুনাহ করেছে। নিষ্পাপ আবেদগণকে হত্যা করেছে এবং আমাকেও হত্যা করার ইচ্ছা করেছে। যেই পর্যন্ত সেই কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে প্রতিজন আবেদের বিনিময়ে একজন একজন কাফিরকে হত্যা করবে না সেই পর্যন্ত আমি তার কাছে যাব না। দূতগণ এসে তালুতকে যখন এই প্রস্তাব পেশ করল, তখন তালুত নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হলেন এবং দাউদ আ.'র কথামতে যুদ্ধে গিয়ে সত্তরজন কাফিরকে হত্যা করেছেন। অবশেষে হঠাৎ একটি তীর এসে তার বক্ষে বিদীর্ণ হলে তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। দাউদ আ. এই সংবাদ শুনে তালুতের ঘরে গিয়ে তার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং পুরো রাজ্যের মালিক হলেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ আ.কে রাজত্ব এবং নবুয়ত উভয়টি দান করেছেন।[৫৮৬]

উপরোক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষানীয় বিষয়ঃ

১. নবুয়ত, বেলায়েত, ইমামত এবং সালতানাত তথা বাদশাহী এগুলো কোন মীরাসী বস্তু নয় কিংবা যোগ্যতা বলে দাবী করা যায়না বরং এগুলো সম্পূর্ণ খোদা প্রদত্ত নিয়ামত। তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে দান করেন। এগুলো বাহুবল কিংবা কোন সাধনা বলে লাভ করা যায় না।

২. আম্বিয়া কিরামগণ ইলমে গায়ব সম্পর্কে অবহিত হন। যখন যা প্রয়াজন আল্লাহ তায়ালা তখন তাদেরকে জ্ঞাত করেন।

৩. বাদশাহীর জন্য জ্ঞান ও শক্তি প্রয়োজন বংশ ও সম্পদের প্রয়োজন গৌণ।

৪. আলেমের মর্যদা অজ্ঞ আবেদ এবং অজ্ঞ উচ্চ বংশ অপেক্ষা উত্তম।

৫. বুযুর্গদের তাবার্‌রুকাত থেকে বরকত হাসিল করা এবং এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সুন্নতে আম্বিয়া।

৬. বুযুর্গদের তাবার্‌রুকাত দ্বারা বালা-মুসিবত দূরীভূত হয়, অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয়। যেমন হযরত খলিদ বিন ওয়ালিদ রা.'র টুপিতে রাসূল ﷺ'র চুল মোবারক ছিল যার বদৌলতে তিনি যুদ্ধে জয়ী হতেন। হযরত আয়েশা রা.'র নিকট রাসূল ﷺ'র জুব্বা মোবারক ছিল। এটির ধোয়া পানি রোগীকে ঔষধ হিসাবে পান করাতেন এবং রোগী আরোগ্য লাভ করত। রোমের বাদশাহ হযরত ওমর রা.'র নিকট মাথা ব্যথার অভিযোগ করলে হযরত ওমর রা. রাসূল ﷺ'র

[৫৮৬]. মাওলানা গোলাম নবী, খোলাসাতুল আম্বিয়া, উর্দু. পৃ. ২৬৪-২৬৬

চুল মোবারক একটি টুপিতে সেলাই করে দিয়ে প্রেরণ করলেন। এতে সম্রাটের মাথা ব্যথা উপশম হল। আমীরে মুয়াবিয়া রা. মৃত্যুকালে অসিয়ত করেছেন যে, রাসূল ﷺ'র চুল ও নখ মোবারক কবরে তাঁর ঠোঁটে যেন রাখা হয় আর তাহবন্দ মোবারক যেন তাঁর মাথায় রাখা হয়। এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

৭. তাবার্‌রুকাতের প্রতি অবজ্ঞা ও বেআদবী করা কাফেরের আলামত এবং ধ্বংসের কারণ।

৮. কোন বরকত মণ্ডিত বস্তু হারিয়ে যাওয়া বালা-মুসিবত আগমনের নিদর্শন। হযরত ওসমান রা.'র হাত থেকে রাসূল ﷺ'র আংটি মোবারক হারিয়ে যাওয়াতে রাজ্যে বিশৃখলা সৃষ্টি হয়। হযরত সোলায়মান আ.'র আংটি হারিয়ে যাওয়া তাঁর কষ্টের কারণ হয়েছিল।কোন বস্তু কোন বুযুর্গ ব্যক্তির দিকে সম্পর্কিত হলে সেটি বরকত মণ্ডিত হয়ে যায়। উর্দুতে বলা হয়- নিসবত ছে আযমত মিলতী হ্যায়। অর্থাৎ সম্পর্কের কারণে সম্মানপ্রাপ্ত হয়। হযরত মুসা আ.'র লাঠি পাগড়ি, জুতা, হযরত ইউসুফ আ.'র জামা ইত্যাদি বরকত মণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল।

৯. ধৈর্যে বরকত হয় আর অধৈর্যে অপরিতৃপ্ত হয়। যেমন তালুতের সৈন্যদের মধ্যে যারা ধৈর্যধারণ করে পানি পান করেন নি কিংবা মাত্র এক ক্রোশ পানি পান করেছেন তাদের তৃষ্ণা মিটে গেল পক্ষান্তরে যারা ইচ্ছেমত পান করেছিল তারা অতৃপ্তই রয়ে গেছে।

১০. নবীগণের আদেশে অনেক সময় হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যায় আবার কখনো হারামও হালাল হয়ে যায়। যেমন ইচ্ছে মত পানি পান করা হালাল হওয়া সত্ত্বেও তালুত বাহিনীর জন্য তা হারাম করে দিয়েছিলেন হযরত শামুঈল আ.। হযরত ফাতেমা রা.'র জীদ্দশায় হযরত আলী রা.'র জন্য অন্য কোন স্ত্রী বিবাহ করা হারাম ছিল এবং জানাবত অবস্থায়ও তাঁর জন্য মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয ছিল।

১১. যুদ্ধে জয়লাভের জন্য একনিষ্ট, চিন্তামুক্ত, ত্যাগী মুজাহিদের প্রয়োজন। এরূপ মুজাহিদ বাহিনী সংখ্যালঘিষ্ট হলেও যুদ্ধে জয়লাভের নিশ্চয়তা থাকে প্রবল। পক্ষান্তরে কাপুরুষ ও মুনাফিক সৈন্যের সংখ্যাঘরিষ্ট হলেও পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকে বেশী।

১২. সৎ ও নেক কাজে অনেক ক্ষেত্রে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। যেমন হযরত দাউদ আ. জালুতকে হত্যার বিনিময় গ্রহণ করেছিলেন। তবে নিয়্যত বিশুদ্ধ হতে হবে। অর্থাৎ কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হতে হবে।

১৩. বুযুর্গদের নিয়ম হল তারা সম্পদ দেখে মেয়ে বিবাহ দিতেন না বরং ছেলের গুণ দেখে মেয়ে বিবাহ দিতেন। যেমন তালুত দাউদ আ.'র গুণ দেখে মেয়ে বিবাহ দিয়েছেন এবং হযরত শোয়াইব আ. নিজের কন্যা সাফুরাকে হযরত মুসা আ.'র সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন গুণ দেখে। গাউছে পাকের পিতা আবু ছালেহ জঙ্গী র.কে বাগানের মালিক তার সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে দিয়েছিলেন গুণ দেখে দৌলত দেখে নয়।

১৪. নবীগণের স্বপ্ন সত্য ও বাস্তবে পরিণত হয়।

১৫. নবীগণ নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও ঝড়পদার্থের কথা বুঝতেন এবং এদের সাথে কথপোকথন করতেন। আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ'র সাথে এরূপ অসংখ্য ঘটনা নির্ভরযোগ্য কিতাবে বর্ণিত আছে।

২৪. হযরত দাউদ আ.

হযরত শামুঈল আ.'র পরে হযরত দাউদ আ. নবুয়ত লাভ করেন। জালুতের হত্যায় তাঁর বীরত্ব, সাহসিকতা দেখে বনী ইস্রাঈলরা তাঁর প্রতি আস্তাশীল হয়ে উঠল এবং তাঁকে সম্মান ও সমর্থন দিয়েছিল। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে রাজত্ব, নবুয়ত ও জ্ঞান দান করলেন। এমনকি তাঁকে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে খলীফা বা আল্লাহর প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। পবিত্র কুরআনে আম্বিয়ায়ে কেরামগণের মধ্যে কেবল হযরত আদম আ. ও হযরত দাউদ আ.'র জন্য খলীফা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত দাউদ আ.ই প্রথম নবী যাঁর মধ্যে রাজত্ব ও নবুয়ত উভয়টি একত্রিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি একসাথে বাদশাহও ছিলেন এবং নবীও ছিলেন। তিনি বনী ইস্রাঈলকে হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন।

বংশনামা:

দাউদ ইবনে ঈশা, ইবনে উবেদ ইবনে আবের ইবনে সালমুন ইবনে নাহশুন ইবনে উনিয়াযিব ইবনে ইরম ইবনে হাছরুন ইবনে ফারেদ্ব ইবনে ইয়াহুদা ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আ.।

তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রেরিত হয়েছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ থেকে বর্ণনা করেন– كان داود عليه السلام قصيرًا ارزق العينين قليل الشعرطاهر القلب ونقيه অর্থ: হযরত দাউদ আ. ছিলেন খাট প্রকৃতির। চোখ দু'টি ছিল নীল বর্ণের। চুল ছিল কম তবে অন্তর ছিল পূত:পবিত্র।[৫৮৭]

[৫৮৭]. আল্লামা ইবনে কাসীর, ৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, খণ্ড-২, পৃ. ৪০১।

পবিত্র কুরআনে হযরত দাউদ আ.'র আলোচনা:

নয়টি সূরায় সাতষট্টিটি আয়াতে তাঁর আলোচনা এসেছে– ১. সূরা বাকারাতে ২৫১নং আয়াতে, ২. সূরা নিসায় ১৬৩নং আয়াতে, ৩. সূরা মায়েদায় ৭৮নং আয়াতে, ৪. সূরা আনআমে ৮৪নং আয়াতে, ৫. সূরা আসরাতে ৫৫নং আয়াতে, ৬. সূরা আম্বিয়াতে ৭৮–৮০নং আয়াতে, ৭. সূরা নামালে ১৫–১৬নং আয়াতে, ৮. সূরা সাবা-এ ১০নং আয়াতে এবং ৯. সূরা ছোয়াদ-এ ১৭–২৬নং এবং ৩০ নং আয়াতে।

হুকুমত ও নবুয়ত:

হযরত দাউদ আ.ই প্রথম ব্যক্তি যিনি একসাথে বাদশা ও নবী ছিলেন। তাঁর পূর্বে বনী ইস্রাঈলের এক বংশে ছিল হুকুমত আর অপর বংশে ছিল নবুয়ত ও রিসালাত। ইয়াহুদার বংশে ছিল নবুয়ত ও রিসালাত আর আফরাঈম'র বংশে ছিল হুকুমত তথা বাদশাহী। হযরত দাউদ আ.কে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তায়ালা এ উভয় নিয়ামত একত্রিত করে দিয়েছেন। তিনি জালুতকে হত্যা করে প্রথমে রাজত্বের মালিক হয়েছেন। চল্লিশ বছর পরে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে নবুয়ত দান করেছিলেন।

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত দাউদ আ.'র জন্য তাঁর রাজত্বকে সুদৃঢ় করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন- وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম। অর্থাৎ প্রজা সাধারণের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলাম তাঁর সুশাসনের প্রতি ভয় ও ভক্তি আর রাজত্ব শক্তিশালী করেছিলাম বিপুল সংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য দ্বারা। ইমাম বগভী র. লিখেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আল্লাহ অন্য সকল রাজা অপেক্ষা নবী দাউদ আ.কে অধিকতর কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি দিয়েছিলেন। প্রতি রাতে তাঁর রাজপ্রাসাদ পাহারা দিত ছত্রিশ হাজার সৈন্য।

ইমাম বগভী র. আরো লিখেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, একদা বনী ইস্রাঈলের এক লোক বিরাট প্রভাবশালী এক লোকের বিরুদ্ধে দাউদ আ.'র নিকট অভিযোগ উত্থাপন করল। বলল, এই লোকটি আমার একটি গাভী জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে। দাউদ আ. বললেন, সাক্ষী উপস্থিত কর, কিন্তু সে তার পক্ষে কোন সাক্ষীই উপস্থিত করতে পারল না। তিনি বললেন, ঠিক আছে এখন যাও, আমি ভেবে দেখি কিভাবে এর মীমাংসা করা যায়। লোকটি চলে গেল। তিনি রাতে স্বপ্ন দেখলেন, তাঁকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা কর। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে তিনি ভাবলেন, স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে বিষয়টির মীমাংসা করা ঠিক হবেনা। দ্বিতীয় রাতেও তিনি একই স্বপ্ন দেখলেন। তবুও স্বপ্নাদেশ পালন করলেন না। তৃতীয় রাতে পুন: আদেশ দেয়া হল, অভিযুক্তকে হত্যা কর অথবা কঠিন শাস্তি

দাও। নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ার পর দাউদ আ. আর বিলম্ব করলেন না অভিযুক্ত ওই প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ডেকে এনে বললেন, আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। লোকটি বলল, আপনি কি সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই আমাকে হত্যা করবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! আমি স্বপ্নাদেশ অবশ্যই পালন করব। উপায়ন্তর না দেখে লোকটা আসল ঘটনা খুলে বলল। বলল, হে আল্লাহর নবী! যে অভিযোগ আপনার কাছে উথাপন করা হয়েছে সে কারণে নয় বরং অন্য একটি কারণে আমাকে পাকড়াও করা হয়েছে। কারণটি হল- আমি অভিযোগ কারীর পিতাকে প্রতারণাপূর্বক গোপনে হত্যা করেছিলাম। প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে তিনি বিলম্ব করলেন না। স্বপ্নাদেশ কার্যকর করলেন সঙ্গে সঙ্গে। ওই ঘটনার পর থেকে জনসাধারণের অন্তরে হযরত দাউদ আ.'র ভীতি সঞ্চার হয়। কারণ তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করত যে, হযরত দাউদ আ. থেকে কিছুই গোপন করা যাবেনা এবং কোন বিষয়ে তাঁর নিকট মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যাবে না, কারণ প্রত্যাদেশ দ্বারা তিনি আসল ও সত্য ঘটনা জানতে সক্ষম ছিলেন। এর দ্বারা তাঁর শাসন ব্যবস্থা পূর্বাপেক্ষা আরো সুদৃঢ়, মজবুত ও শক্তিশালী হয়ে উঠে।[৫৮৮]

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে শক্তি ও সাহসও দান করেছিলেন। ফলে পৃথিবীর কোন রাজা-বাদশাহ তাঁর সাথে কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার সাহস করত না। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন– وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ অর্থ: হে হাবীব! আপনি স্মরণ করুন আমার প্রিয় বান্দা দাউদকে, যিনি ছিলেন শক্তিশালী। নিশ্চয় তিনি (আমি আল্লাহর) দিকে প্রত্যাবর্তন কারী।[৫৮৯]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায ছিল দাউদ আ.'র নামায। সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা ছিল দাউদ আ.'র রোযা। তিনি অর্ধ রাত্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ এবাদত করতেন এবং পুনরায় রাত্রির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন। আর তিনি একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনো পশ্চাদপসরণ করতেন না। নি:সন্দেহে দাউদ আ. আল্লাহর দিকে খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত দাউদ আ.'র উপর যবুর শরীফ নাযিল করেন। সূরা নিসায় আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا আমি দাউদকে যবুর

৫৮৮. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, বাংলা, খণ্ড-১০, পৃ. ১৬১, কাযী হেফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, খণ্ড-২, পৃ. ৬০।

৫৮৯. সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ১৭।

দান করেছি। সূরা আসরাতে আল্লাহ এরশাদ করেন, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا আর নিশ্চয় আমি কোন কোন নবীকে অন্য নবীর উপর ফযিলত দান করেছি এবং দাউদকে যবুর দান করেছি।

বনী ইস্রাঈলের হেদায়েতের জন্যে মূলত ঐশী গ্রন্থ হল তাওরাত। তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং কালের আবর্তনে হযরত দাউদ আ.কে যবুর কিতাব দান করেছেন আল্লাহ তায়ালা। যবুর কিতাবের মূল বিধান ছিল তাওরাতের বিধান সমূহ। হযরত দাউদ আ. হযরত মুসা আ.'র নিভে যাওয়া শরীয়তকে পুন:প্রজ্জলিত করেছেন। যবুর কিতাবের বেশীর ভাগই ছিল আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তনে পূর্ণ এবং ছন্দবদ্ধ লিখিত। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত দাউদ আ.কে এমন সুন্দর কণ্ঠ দান করেছেন যে, তিনি যখন মধুর সূরে সুললিত কণ্ঠে যবুর পাঠ করতেন তখন জ্বিন-ইনসান, পশু-পাখি, তরু-লতা, গাছ-পালা এমনকি বাতাস পর্যন্ত থেমে গিয়ে তাঁর কণ্ঠে যবুর শরীফের তিলাওয়াত শুনত। সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তীরে এসে তাঁর তিলাওয়াত শুনত। আজও দাউদ কণ্ঠ সমগ্র পৃথিবীতে উপমা হয়ে আছে।

মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ যখন হযরত আবু মুসা আশআরী রা.'র কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনতেন তখন বলতেন, আবু মুসাকে আল্লাহ্ তায়ালা লাহনে দাউদ দান করেছেন।[৫৯০]

যবুর শব্দের অর্থ খণ্ড এবং টুকরা। যেহেতু এটি মূলত তাওরাতের পরিপুরক হিসাবে এর অংশবিশেষ হিসাবে নাযিল হয়েছে তাই এর নামকরণ করা হয়েছে যবুর করে। মূলত: যবুর এমন কতিপয় কবিতা এবং পরিপূর্ণ বাক্য সমষ্টি, যাতে রয়েছে আল্লাহর প্রশংসা, মানুষের উবুদিয়ত এবং মানুষের অক্ষমতার স্বীকারোক্তি। আর ছিল অনেক উপদেশ, নসিহত এবং কিছু বিধান। মুসনাদে আহমদ-এ বর্ণিত আছে যে, যবুর শরীফ পবিত্র রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছিল আর এটি অনেক ওয়ায-নসিহত এবং হেকমতের সমষ্টি ছিল।[৫৯১]

যবুর কিতাবে অনেক ভবিষ্যৎ বাণীও বিদ্যমান ছিল যা পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়েছে। যবুর গ্রন্থে আমাদের শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি পয়গাম্বর হওয়ার সাথে সাথে দেশ ও সাম্রাজ্যের অধিকারীও হবেন। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তারই প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ "আর নিশ্চয় আমি

৫৯০. আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি., আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-২, পৃ. ১১, সূত্র: কাসাসুল কুরআন উর্দু, খণ্ড-২, পৃ. ৬২।

৫৯১. কাযী হেফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, খণ্ড-২, পৃ. ৬২।

যবুর গ্রন্থে উপদেশের পরে এটাও লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি যে, আমার সৎ বান্দারাই পৃথিবীর মালিক হবে।"[৫৯২]

ইমাম বগভী র. বলেছেন, যবুর আল্লাহর কিতাব, যা হযরত দাউদ আ.'র উপর নাযিল হয়েছে। এতে পঞ্চাশটি সূরা রয়েছে এবং প্রত্যেকটি সূরা দোয়া, হামদ ও গুনকীর্তনে পরিপূর্ণ। এগুলোতে হালাল-হারাম এবং ফরয কর্তব্যাদির বর্ণনা নেই।

হযরত দাউদ আ.'র বৈশিষ্ট্য বা মু'জিযা:

আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক নবী-রাসূলগণকে নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ কিছু বৈশিষ্ট্য কিংবা মু'জিযা দান করেন। সেই ধারাবাহিকতায় উলুল আ'যম পয়গাম্বর হযরত দাউদ আ.কেও আল্লাহ তায়ালা বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ও মু'জিযা দান করেছেন। তন্মধ্যে কিছু নিম্নে বর্ণিত হল:-

১. খেলাফত, হুকুমত ও নবুয়ত:

তালুতের জীবদ্দশায় হযরত দাউদ আ. অল্প বয়সেই হুকুমত তথা রাজত্বের অধিকারী হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে আল্লাহ্ তাঁকে নবুয়ত দান করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ আল্লাহ হযরত দাউদ আ.কে রাজ্য এবং প্রজ্ঞা দান করেছেন আর শিক্ষা দিয়েছেন তাঁকে যতটুকু আল্লাহ চেয়েছেন।[৫৯৩]

অন্যত্র বলেছেন- يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে খলীফা নিয়োগ করলাম। সুতরাং তুমি লোকের মধ্যে ইনসাফের সহিত ফায়সালা কর।

অর্থাৎ হযরত দাউদ আ.কে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, হে দাউদ! তুমি কোন বাদশাহী খান্দানের সদস্য নও বরং একজন অপ্রসিদ্ধ রাখাল ছিলে। আমিই নিজের দয়ায় তোমাকে বনী ইস্রাঈলের জন্য পথ প্রদর্শক এবং খেলাফত ও সালতানাতের মালিক বানিয়ে দিয়েছি। আর এই এহসানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হবে এভাবে যে, তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার করবে। নিজের ইচ্ছেমত বিচার কার্য সম্পাদন করবে না।

২. মীমাংসার ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা:

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ 'আমি তার (দাউদ আ.) রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।'[৫৯৪]

---

[৫৯২]. তাফসীরে হক্কানী।
[৫৯৩]. সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫১।
[৫৯৪]. সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ২০।

উক্ত আয়াতে হেকমত অর্থ নবুয়ত আর فَصْلَ الْخِطَابِ অর্থ মীমাংসাকারী, বাগ্মিতা। ইবনে মাসউদ রা., হাসান, কালবী ও মুকাতিল র. বলেছেন- কথাটির অর্থ হচ্ছে- মীমাংসার ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা। ইবনে আব্বাস রা.'র মতে এর অর্থ সুস্পষ্ট কথা। তাঁর বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট, অলংকার শাস্ত্রসম্মত, শিল্প সুষমমণ্ডিত, ন্যূনতা ও বাহুল্য বিবর্জিত।

হযরত দাউদ আ. উচ্চ স্তরের সুবক্তা ছিলেন। বক্তৃতায় হামদ ও সালাতের পর اما بعد শব্দ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন- এর অর্থ হল সর্বোত্তম বিচারশক্তি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ঝগড়া-বিবাদ মিটানো ও বাদানুবাদ মীমাংসা করার শক্তি দান করেছিলেন।

৩. পাহাড়-পর্বত ও পক্ষীকুল তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ:

হযরত দাউদ আ. যখন আল্লাহ্‌র যিক্‌রে মশগুল হতেন এবং যাবুর কিতাব পাঠ করতেন তখন তাঁর আওয়ায এতই সুন্দর, সুমধুর ও এতই অন্তরস্পর্শী ছিল যে, পাহাড়-পর্বত তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর সাথে যিকরে শামিল হত। এমনকি উড়ন্ত পাখি থেমে গিয়ে তাঁর চর্তুপাশে পরিবেষ্টিত হয়ে বসে তাঁর আওয়াযের সাথে আওয়ায মিলিয়ে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করত।

ইমাম বগভী র. বলেন, দাউদ আ. যাবুর পাঠকালে উড্ডীয়মান পাখিরা পক্ষ বিস্তার করে স্থির হত তাঁর মাথার উপরে এবং তাঁর তাসবীহ পাঠে শামিল হত।

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ . وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ . আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে তাসবীহ পাঠ করত। আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার সাথে সমবেত হত। সকলেই ছিল তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল।[৫৯৫]

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেছেন- وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম, এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল! তোমরাও।[৫৯৬]

---

[৫৯৫]. সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ১৮-১৯।
[৫৯৬]. সূরা সাবা, আয়াত: ১০।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন– وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ আমি পর্বত ও পক্ষী সমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম।[৫৯৭]

পর্বতমালা ও পক্ষীকুল হযরত দাউদ আ.'র সাথে তাসবীহ পাঠে অংশগ্রহণ করা এটি তাঁর অন্যতম একটি মু'জিযা। সুতরাং এটি অসম্ভব কিছু নয়। তাছাড়া পবিত্র কুরআনে আছে– وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ অর্থ: জগতের সব কিছুই আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা তাসবীহ পাঠ করে। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বোঝনা।[৫৯৮]

তবে দাউদ আ.'র সাথে পর্বতমালা ও পক্ষীকুল যে তাসবীহ পাঠ করত তা অন্যান্য সাধারণ বস্তুর তাসবীহ পাঠের ন্যায় ছিলনা। যদি তা-ই হত তাহলে তা তাঁর বিশেষ মু'জিযা হিসাবে উল্লেখ করা হত না। বরং এই তাসবীহ সাধারণ শ্রোতারাও শুনত এবং বুঝত।

তাছাড়া মু'জিযার জন্য পক্ষীকুল ও পর্বতমালার মধ্যে জীবন ও চেতনা থাকা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক অচেতন বস্তুর মধ্যেও মু'জিযা হিসাবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে।

৪. সুমিষ্ট ও সুউচ্চ কণ্ঠস্বর:

হযরত দাউদ আ.কে আল্লাহ্ তায়ালা এক বৈশিষ্ট্য বা মু'জিযা দান করেছিলেন, তা তাঁর সুমিষ্ট ও সুউচ্চ কণ্ঠস্বর। কথিত আছে যে, তিনি যখন সুউচ্চ স্বরে যাবুর গ্রন্থ পাঠ করতেন, তাঁর আওয়ায অন্তত: চল্লিশ ক্রোশ পর্যন্ত পৌছে যেত। আর তাঁর কণ্ঠস্বরের ঘটনা ছিল আরো বিস্ময়কর। তাতে যেন অভূতপূর্ব যাদুর প্রভাব নিহিত ছিল। তিনি যখন কোন পাহাড়ী এলাকায় কিংবা বন-জঙ্গলের নিকট মধুর কণ্ঠে যাবুর কিতাব পাঠ করতেন, তখন তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে পার্বত্য ও বন্য এলাকার সকল জীব-জন্তু মুগ্ধ হয়ে তা শুনতে থাকত। হিংস্র জীব-জন্তুগুলো পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে তা শ্রবণে মুগ্ধ হত। এমনকি ওগুলো তাঁর নিকটে এসে বসে যেত আর তিনি ওগুলোর গর্দানে হাত বুলিয়ে দিতেন।

আর যখন তিনি কোন নদীর তীরে যাবুর পাঠ করতেন, তখন তাঁর পাঠ শ্রবণের জন্য সমুদ্রের মাছ এবং জলচর জীবগুলো কিনারে এসে যেত এবং তাঁর মধুর কণ্ঠে

[৫৯৭]. সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৭৯।

[৫৯৮]. সূরা বনী ইস্রাঈল, আয়াত: ৪৪।

যাবুর পাঠ উপভোগ করত। এসময় তারা এমনভাবে তন্ময় এবং আকৃষ্ট হত যে, কোন দিকেই তাদের খেয়াল থাকত না। তীরে সমবেত মাছগুলোকে ঐ সময় কেউ স্পর্শ করলে কিংবা তুলে নিলেও তারা নড়াচড়া করত না।

হযরত দাউদ আ. প্রতি সপ্তাহে একদিন নদীর ধারে যাবুর পাঠ করতেন। ফলে তা শুনার জন্য নদীর মাছ তীরে চলে আসত। তখন ইচ্ছে করলে বড় বড় মাছগুলোকে অনায়সে ধরে ফেলা যেত। কিন্তু তাতে মাছগুলো বিনাশের সম্ভাবনা ছিল। এ কারণেই সেকালে বনী ইস্রাঈলদের প্রতি ঐদিন তথা শনিবারে মাছ ধরা নিষেধ ছিল।

তাফসীরে মাযহারীতে বগভীর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ আ. জনপদ থেকে দূরে অরণ্যের নিকটে দাঁড়িয়ে যাবুর পাঠ করতেন। বনী ইস্রাঈলের আলেমগণ তখন তাঁর পশ্চাতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াত। তাদের পিছনে দাঁড়াত সাধারণ জনতা এবং তাদের পিছনে থাকত জ্বিনরা। পাহাড়ি পশুরাও সেখানে সমবেত হয়ে তিলাওয়াত শুনে বিমোহিত হয়ে যেত। উপরে সমবেত হত উড়ন্ত পক্ষিকুল। হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেছেন, রাসূল ﷺ একবার আমাকে বলেছেন, আমি রাতে তোমার কুরআন তিলাওয়াত তোমার অগোচরে শুনেছিলাম। তোমার কণ্ঠস্বর দাউদ নবীর কণ্ঠস্বরের মত সুন্দর। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! একথা জানলে আমি অনেক সময় ধরে কুরআন তিলাওয়াত করতাম।[৫৯৯]

وقَال الاوزاعى حدثنى عبدالله بن عامر قَالَ أَعْطِيَ دَاوُدَ مِن حُسْنِ الصَّوْتِ مَالَمْ يُعْطِ اَحَدُ قَطُّ حَيَ اِنْ كَانَ الطَّيْرُ وَالْوحُوْشُ يَنْعَكِفُ حَوْلَهُ حَتَّى يَمُوْتَ عَطَشًا وَجُوْعًا وَ حَيَ اِنَّ الاَنْهَارَ لَتَقِفُ. ইমাম আওযাঈ র. বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আমের রা. হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত দাউদকে যে সু-মধুর কণ্ঠস্বর দেওয়া হয়েছে তা কখনো কাউকে দেওয়া হয়নি। এমনকি (তাঁর কণ্ঠ শুনে) পক্ষীকুল ও অন্যান্য জীব-জন্তু তাঁর চতুর্দিকে অবস্থান করত। ক্ষুধা ও পিপাসায় মরে গেলেও নড়াচড়া করত না। এমনকি নদী ও নদীর জীব-জন্তু পর্যন্ত থেমে যেতো।

ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন- এ সব জীব-জন্তু ও পশু-পাখি তাঁর যিকর ও তিলাওয়াত শ্রবণকালে ওজদে এসে যেত। তিনি যখন যবুর শরীফ পাঠ করতেন তখন জ্বিন, ইনসান, পক্ষীকুল ও জীব-জন্তু তাঁর কণ্ঠ শুনার জন্য দাড়িয়ে যেত এমনকি কোন কোনটি ক্ষুধায় মরে যেত তবুও স্থান ত্যাগ করে ক্ষুধা নিবারণের জন্য চলে যেত না।[৬০০]

[৫৯৯]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৩, পৃ. ৩৫০।

[৬০০]. আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, খণ্ড-২, পৃ. ৪০৩।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ يَقْرَأُ فَقَالَ لَقَدْ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ হযরত আবু মুসা আশআরী রা.' কণ্ঠস্বর কণ্ঠস্বর শুনেছেন। তিনি কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তখন তিনি বললেন, আবু মুসাকে দাউদ আ.'র সু-মধুর কণ্ঠ প্রদান করা হয়েছে।[৬০১]

৫. লোহা নরম হয়ে যাওয়াঃ

আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ আ.কে এমন এক মু'জিযা দান করেছিলেন যে, তিনি কঠিন লোহা হাত দ্বারা স্পর্শ করা মাত্র মোমের মত নরম হয়ে যেত। তাই তিনি লোহাকে আগুনে পোড়ানো ছাড়াই হাতে টিপে যে কোন ধরণের অস্ত্র সহজেই তৈরী করতে পারতেন। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ অর্থ আমি লোহাকে তার জন্য নরম করে দিয়েছি।[৬০২]

অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে- وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ আর আমি (আল্লাহ্) স্বয়ং তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম।[৬০৩]

হযরত দাউদ আ.কে যখন বনী ইস্রাঈলের বাদশাহ নিযুক্ত করা হল তখন তিনি ছদ্মবেশে বাইরে গিয়ে লোকদের থেকে জিজ্ঞাসা করত যে, তোমাদের বাদশাহ কেমন লোক? তাঁর সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? লোকেরা তাঁর অনেক প্রশংসা ও গুণকীর্তন করত। একদা আল্লাহ তায়ালা মানবাকৃতি দিয়ে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। দাউদ আ. নিয়মানুযায়ী তার কাছে গিয়ে বাদশাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে ফেরেশতা বলল, দাউদ খুবই ভাল মানুষ, তবে তার একটি কাজ সুন্দর নয়। দাউদ আ. একথা শুনে বিচলিত হয়ে উঠলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন- সেটি কি? ফেরেশতা বলল, তিনি বায়তুল মাল থেকে নিজে এবং নিজের পরিবার পরিজনের জন্য অংশ নিয়ে ভরণ-পোষণ করেন। তখনই তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন- হে প্রভু! এমন কোন উপায় আমাকে সৃষ্টি করে দিন যাতে বায়তুল মাল থেকে আমি অমুখাপেক্ষী হতে পারি এবং নিজেই রোজগার করে নিজের এবং পরিবারের সকলের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর হাতে লোহা নরম হয়ে যাওয়ার বিশেষ মু'জিযা দান করেন। সাথে সাথে লোহা দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র এবং যুদ্ধ পোশাক তৈরীর জ্ঞানও দান করেছেন।

---

[৬০১]. ইমাম আহমদ, মুসনাদে আহমদ, খণ্ড-৬, পৃ. ১৭৬, সূত্রঃ আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, খণ্ড-২, পৃ. ৪০৩।

[৬০২]. সূরা সাবা, আয়াতঃ ১০।

[৬০৩]. সূরা আম্বিয়া, আয়াতঃ ৮০।

হযরত দাউদ আ.'র পূর্বে যুদ্ধ পোশাক লৌহ বর্ম ছিল অনেক ভারী। যে কেউ এটি পরিধান করতে সক্ষম হত না। সর্বপ্রথম হযরত দাউদ আ.ই লৌহ বর্মকে হাল্কা-পাতলা এবং সকলের পরিধানযোগ্য করে নির্মাণ করেছিলেন। তিনি নিজ হাতে লৌহা দ্বারা নির্মিত বস্ত্র সামগ্রী বিক্রি করে জিবীকা নির্বাহ করতেন। প্রতিদিন তিনি নির্মাণ করতেন একটি বর্ম এবং তা বিক্রি করতেন ছয় হাজার দিরহামে। দুই হাজার দিরহাম ব্যয় করতেন সংসারের জন্য আর বাকী চার হাজার বিলিয়ে দিতেন দুস্থ প্রজাসাধারণের মধ্যে।

হযরত মিকদাদ ইবনে মাদী কারাব রা. থেকে বুখারী ও আহমদ বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, স্বহস্ত উপার্জন অপেক্ষা উত্তম জীবনোপকরণ আর নেই। আল্লাহর নবী দাউদ ভক্ষণ করতেন স্বহস্ত উপার্জনলব্ধ আহার্য। বগভী র.'র বর্ণনায় এসেছে, তিনি স্বপোর্জিত আহার্য ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষণ করতেন না।[৬০৪]

৬. দ্রুত যাবুর শরীফ পাঠ করাঃ

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত দাউদ আ.কে যাবুর শরীফ দ্রুত পাঠ করার মু'জিযা দান করেছিলেন। তিনি অতি দ্রুত যাবুর শরীফ পাঠ করে শেষ করতেন কিন্তু প্রতিটি শব্দ সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام الْقُرْآنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, দাউদ আ.'র জন্য কুরআন (যাবুর) তিলাওয়াত সহজ করে দেয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর যানবাহনের পশুর উপর গদি বাঁধার আদেশ করতেন, তখন তার উপর গদি বাঁধা হতো। তারপর তাঁর যানবাহনের পশুটির উপর গদি বাঁধার পূর্বেই তিনি যাবুর তিলাওয়াত করে শেষ করে ফেলতেন। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করেই খেতেন।[৬০৫]

৭. ইবাদত বন্দেগীতে নিয়মানুবর্তিতাঃ

হযরত দাউদ আ. এক বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র একজন প্রভাবশালী সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় অনাড়ম্বর ও ভোগ-বিলাসহীন জীবন-যাপন করতেন। ইবাদত-বন্দেগীতে নিয়মানুবর্তিতা পুরোপুরি ভাবে পালন

---

[৬০৪]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৯, পৃ. ৫৯৫।

[৬০৫]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী র., ২৫৬হি., সহীহ বুখারী, পৃ. ৪৮৫, হাদিস নং-৩১৭৭।

করতেন। প্রতিটি দিবা-রাত্রির সামান্য কিছু অংশ বিশ্রাম করতেন। কিছু অংশ ব্যয় করতেন যাবুর অধ্যয়নে। কিছু অংশ ব্যয় করতেন লোকদেরকে দ্বীনের পথে আহ্বান করার জন্যে। আর কিছু অংশ ব্যয় করতেন শাসন সম্পর্কিত কাজ-কর্মে আর বাকী অংশ আল্লাহর ইবাদত ও তাসবীহ পাঠে ব্যয় করতেন।

বুখারী শরীফে ২০৩৫নং পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে–

بَاب أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا- قَالَ عَلِيٌّ وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا দাউদ আ.'র পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা এবং তাঁর পদ্ধতিতে রোযা পালন করা আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়। তিনি রাতের প্রথমার্ধে ঘুমাতেন আর এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন এবং বাকী ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। তিনি একদিন রোযা রাখতেন আর একদিন বিরতি দিতেন। আলী ইবনে মদীনী র. বলেন, এটাই আয়েশা রা.'র কথা যে রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা সাহরীর সময় আমার কাছে নিদ্রায় থাকতেন।[৬০৬]

عَنْ عَبْدِاللهِ بِن عَمْرٍ وقَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَ يُفْطِرُ يَوْمًا وَاَحَبُّ الصَّلَاةِ اِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثُهُ وَيَنَامُ سُدُسُهُ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন, আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় রোযা হল দাউদ আ.'র পদ্ধতিতে রোযা পালন করা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন আর একদিন বিরতি দিতেন। আল্লাহর কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায হল দাউদ আ.'র পদ্ধতিতে নামায (নফল) আদায় করা। তিনি রাতে প্রথমার্ধে ঘুমাতেন, রাতের এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন আর বাকী ষষ্ঠাংশ আবার ঘুমাতেন।[৬০৭]

হযরত সাবিত র. থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ আ. নিজের পরিবার-পরিজনের জন্যে রাত-দিন ইবাদত করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাত ও দিনে এমন কোন সময় থাকত না যাতে তাঁর পরিবারের কেউ না কেউ ইবাদতে তথা সালাত আদায়ে মশগুল থাকতেন না।

---

৬০৬. ইমাম বুখারী র., ২৫৬হি., সহীহ বুখারী, খণ্ড-১ম, পৃ. ৪৮৬, বাব নং-২০৩৫।
৬০৭. প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩১৮০।

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- হাশর ময়দানে এক ব্যক্তি এই বলে আওয়ায দিবে যে, হযরত দাউদ আ. সকল ইবাদতকারীগণের চেয়ে অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ছিলেন আর হযরত আইয়ুব আ. ইহ ও পরকালে ধৈর্যশীল ব্যক্তি।[৬০৮]

৮. কুদরতী শিকল:

হযরত দাউদ আ.'র যামানায় আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে ফেরেশতাগণ জান্নাতী একটি শিকল দাউদ আ.'র মসজিদের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। ঐ শিকলটির রঙ সূর্যের মত উজ্জল ছিল। আর তার মধ্যে কতগুলো অলৌকিক গুণ ছিল। কোন কারণে পৃথিবীতে বালা-মুসিবত নাযিল হওয়ার পূর্বক্ষণে ঐ শিকলে একটি অপূর্ব আওয়ায হত। তা শুনে হযরত দাউদ আ. বুঝতে পারতেন যে, এটি কোন বালা-মুসিবতের পূর্বলক্ষণ। তাছাড়া কোন কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়ে ঐ শিকল স্পর্শ করামাত্র আরোগ্য লাভ করত।

হযরত দাউদ আ.'র ইন্তেকালের পরেও বহুদিন উক্ত শিকল ঐ অবস্থায় ছিল। বনী ইস্রাঈলগণ কোন জটিল মামলার বিচার মীমাংসা করতে অক্ষম হলে ঐ শিকলের মাধ্যমে ফায়সালা করত। এর নিয়মটি ছিল নিম্নরূপ:

প্রথমে বাদীকে বলা হত উক্ত শিকল স্পর্শ করতে। বাদী সত্যবাদী হলে শিকল স্পর্শ করতে সক্ষম হত। আর বাদী সত্যবাদী না হলে শিকল স্পর্শ করতে পারত না। তারপর বিবাদীকে বলা হত শিকল স্পর্শ করতে। বিবাদী যদি সত্যবাদী হত, তবে সে শিকল স্পর্শ করতে সক্ষম হত, আর মিথ্যাবাদী হলে স্পর্শ করতে সক্ষম হত না। এভাবে উক্ত কুদরতী শিকলের মাধ্যমে ন্যায় বিচার পাওয়া যেত। দীর্ঘদিন পর একটা ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরেই উক্ত শিকল আসমানে উঠে গেল। ঘটনাটি ছিল এরূপ–

একজন লোক এক সময়ে তার অনেক মূল্যবান মণি-মুক্তা, হীরা-জহরত প্রভৃতি অন্য এক লোকের নিকট আমানত রাখল। বহুদিন পরে যখন আমানতকারী ঐ লোকটির নিকট তার মালগুলো ফেরৎ চাইল, তখন লোকটি শপথ করে বলল, আমি তো ইতিপূর্বে তোমার মাল তোমাকে ফেরৎ দিয়েছিলাম। তুমি আবার কোন উদ্দেশ্য তা ফেরৎ চাচ্ছ? আমানতকারী বলল, তুমি এরূপ মিথ্যা কথা বলছ কেন, আমি তো তোমার নিকট থেকে কখনও সে মালগুলো নেই নি। দু'জনের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে খুবই ঝগড়া-বিবাদ শুরু হল। মালের মালিক বলল, আচ্ছা, যদি তুমি আমার মাল ফেরৎ দিয়ে থাক, তাহলে চল আমরা অলৌকিক ঝুলন্ত শিকলের নিকট গিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করি।

---

৬০৮. তাফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড-৭, পৃ. ৩২৭, সূত্র: আল্লামা যুলফিকার আলী সাকী, জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৬৪২।

আমানত গ্রহীতা সম্মতি হল না। সে বলল, আমি জীবনে কখনও মিথ্যা বলিনি, বলতেও চাইনা। তবে প্রমাণ করতে আমি কোন কিছুর আশ্রয় নিতে রাজী নই। আমার মুখের কথাই যথেষ্ট। লোকটি এরূপ শক্ত অবস্থান নিলে আমানত দাতা বাধ্য হয়ে বিষয়টি নেতাদের কাছে পেশ করল। তারা তাকে উক্ত কুদরতী শিকলের নিকট যেতে কড়া আদেশ দিল। তখন অনোন্যপায় হয়ে সে যেতে বাধ্য হল।

নির্দিষ্ট তারিখে এ বিচারটি দেখার জন্য মসজিদের সামনে অনেক লোকের সমাগম হল। লোক দু'জন উপস্থিত হলে বিচারকগণ প্রথমে অভিযোগ কারীকেই আদেশ দিল যে, তোমার অভিযোগ সত্য হলে তুমি শিকল স্পর্শ কর। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি শিকলের কাছে গিয়ে হাত দিয়ে শিকল স্পর্শ করে আসল। এরপর বিবাদীকে বলা হল, তোমার দাবী সত্য হলে তুমিও শিকল স্পর্শ কর। সে লোকটি তখন তার হস্তস্থিত লাঠিখানা বাদীর হাতে দিয়ে বলল, তুমি এই লাঠিখানা রাখ। আমি শিকল স্পর্শ করে এসে আবার তা ফিরিয়ে নেব। বাদী লাঠিখানা হাতে নিল। এরপর ঐ বিবাদী লোকটি শিকলের কাছে গিয়ে বলল, 'হে মাবুদ! যে লোকটি তার কিছু মাল আমার নিকট গচ্ছিত রেখেছিল আমি তা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছি। তার ডানহাতখানা বাড়িয়ে দিল। আল্লাহর মর্জি, কুদরতী শিকল বাদীর মত তার হাতেও ধরা দিল। সে শিকল স্পর্শ করে এসে বাদীর নিকট হতে লাঠিখানা নিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে গেল। দর্শক ও বিচারকগণ সকলেই ঐ ঘটনায় অবাক হয়ে গেল যে, বাদী-বিবাদী দু'জনেই শিকল স্পর্শ করতে সক্ষম হল, কাজেই উভয়ই সত্যবাদী প্রমাণিত হল অথচ মালের কোন হদিস নেই। আর এরূপ হবেই বা কি করে। একজন সত্যবাদী হলে অবশ্যই অন্যজন মিথ্যাবাদী হবে। আর মিথ্যাবাদী হলে সে কোন অবস্থাতেই শিকল স্পর্শ করা সম্ভব নয়। অথচ এ ঘটনায় দু'জনই শিকল স্পর্শ করল। সুতরাং নিশ্চয় এখানে কোন নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে।

আসলেই ঘটনাটিতে রহস্য লুক্কায়িত ছিল। আর তা হল– যে লোকটির কাছে মাল আমানত রাখা হয়েছিল, সে লোকটির লাঠি খানার ভিতর অংশ ছিল ফাঁকা। তার নিকট যে মালগুলো আমানত ছিল, সে তা ঐ লাঠির ফাঁকার মধ্যে ভরে লাঠিখানা বাদী তথা আমানতদাতার হাতে দিয়ে তার নিকট গচ্ছিত মালগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিল। তারপর শিকলের নিকট গিয়ে বলল, আমি তার মাল তাকে ফেরৎ দিয়েছি। এ বিষয়ে আমি সত্যবাদী। সে কৌশল অবলম্বন করলেও কথাটি ছিল সত্য। তাই সে শিকল ধরতে সক্ষম হয়েছিল, মূলত এটা ছিল তার একটা প্রতারণা। ফলে ঐ প্রতারক ব্যক্তি শিকল স্পর্শ করার কারণে পরদিন ঐ শিকল আর দেখা গেল না, রাতেই তা অদৃশ্য হয়ে গেল।[৬০৯]

---

[৬০৯]. মাওলানা তাহের সুরাটী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪১৬।

হযরত দাউদ আ.'র চারটি বিচার তাঁর পুত্র সোলায়মান আ. কর্তৃক পুনঃবিচারঃ

এক. ইমাম বগভী র. হযরত ইবনে আব্বাস রা. কাতাদাহ ও যুহরী র. থেকে বর্ণনা করেন, একদা দুইজন লোক হযরত দাউদ আ.'র কাছে বিচারপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক অপর জন ছিল শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার বাগানে চড়াও হয়ে আমার শস্যক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দিয়েছে, কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। সম্ভবতঃ বিবাদী বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্থ ফসলের মূল্যের সমান ছিল, তাই তিনি রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ করুক। বাদী ও বিবাদী উভয়ই রায় মেনে নিয়ে তাঁর আদালত থেকে ফিরে যাচ্ছিল। দরজায় তাঁর পুত্র হযরত সোলায়মান আ.'র সাথে দেখা হয় তাদের। তিনি মোকাদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তাঁকে রায় শুনিয়ে দেয়। তখন সোলায়মান আ. বললেন, আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হত এবং উভয় পক্ষের জন্য তা উপকারী হত।

একথা হযরত দাউদ আ.'র কানে পৌছলে তিনি প্রিয় পুত্র এবং বাদী-বিবাদীকে ডাকলেন এবং বললেন, হে আমার পুত্র সোলায়মান! বল তোমার রায় কি যা দ্বারা উভয়ের কল্যাণ হবে? সোলায়মান আ. বললেন, সাময়িক ভাবে দু'জনের মালিকানা একে অপরকে দিয়ে দেয়া হোক। অর্থাৎ ছাগপাল বাগানের মালিককে দিয়ে দেয়া হোক। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হোক এবং বাগান ছাগপালের মালিককে অর্পন করা হোক। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌছে যাবে, তখন শস্যক্ষেত্র বাগানের মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যার্পন করা হবে। এভাবে বাগানের মালিক ফিরে পাবে তার শস্যক্ষেত্র আর ছাগপালের মালিক ফিরে পাবে তার ছাগপাল। হযরত দাউদ আ. সিদ্ধান্তটি খুবই পছন্দ করলেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিজ পুত্র সোলায়মান আ.'র অধিকতর বিজ্ঞজনোচিত সিদ্ধান্তই বহাল রাখলেন। ঐ সময় হযরত সোলায়মান আ.'র বয়স হয়েছিল মাত্র এগার বছর।[৬১০]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন–

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ

---

[৬১০]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৭, পৃ. ৬০৩।

وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ . অর্থ: হে প্রিয় নবী! স্মরণ করুন, দাউদ ও সোলায়মানকে, যখন তারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়ছিল। তাদের বিচার আমার সামনে ছিল। অত:পর আমি সোলায়মানকে সে ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আর আমি পর্বত ও পক্ষী সমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম।[৬১১]

উল্লেখ্য যে, মুজাহিদ র. বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত শস্যক্ষেত্র সম্পর্কিত সিদ্ধান্তটি হযরত সোলায়মান আ. দিয়েছিলেন আপোষ রক্ষার ভিত্তিতে। আর হযরত দাউদ আ.'র সিদ্ধান্তটি ছিল নির্দেশ নির্ভর। আর একথাও অনস্বীকার্য যে, নির্দেশ নির্ভরতা অপেক্ষা আপোষ উত্তম।

অথবা উভয়জনের সিদ্ধান্তের ভিত্তি ছিল ওহী। কিন্তু সোলায়মান আ.'র সিদ্ধান্তটি ناسخ তথা রহিতকারী পর্যায়ের আর দাউদ আ.'র সিদ্ধান্তটি ছিল منسوخ তথা রহিত পর্যায়ের। অথবা পিতা-পুত্র উভয়ের সিদ্ধান্তটি ছিল ইজতিহাদের ভিত্তিতে। ইজতিহাদে ভুল হলে এক সাওয়াবের অধিকারী হয়। পক্ষান্তরে ইজতিহাদ সঠিক ও নির্ভুল হলে দুই সাওয়াবের অধিকারী হয়। সোলায়মান আ.'র সিদ্ধান্তটি অধিক শুদ্ধ ও উভয় পক্ষের দিকে বিবেচনাপূর্ণ হওয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রশংসা করেন। বুখারী, মুসলিম, আহমদ ও চার সুনান প্রণেতাগণ হযরত আমর বিন আস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, সঠিক ইজতিহাদ করলে বিচারক পাবে দ্বিগুণ সাওয়াব আর ভুল হলে পাবে একগুণ।

কারণ তারা দু'জনেই সত্যোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন এবং উভয়ের চেষ্টা ছিল শুদ্ধ। সত্য অন্বেষণ একটি ইবাদত। সুতরাং শুদ্ধ হলে দ্বিগুণ পাবে। একটি কষ্ট করে গবেষণা করার কারণে দ্বিতীয়টি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারার কারণে। পক্ষান্তরে ভুল হলেও একটি সাওয়াব পাবে। কারণ তিনি কষ্ট করে গবেষণা করে সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন।[৬১২]

দুই. বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ'র নিকট থেকে এই ঘটনা শুনেছি-

[৬১১]. সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৭৮, ৭৯।
[৬১২]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৭, পৃ. ৬০৮।

দুইজন রমণী একস্থানে বসা ছিল। তাদের দু'জনেরই ছিল দুগ্ধপোষ্য শিশু। একদিন একটি বাঘ এসে একটি শিশুকে ধরে নিয়ে গেল। তখন তাদের একজন অপরজনকে ডেকে বলতে লাগল, 'তোমার বাচ্চাকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে, আর এই দেখ আমার বাচ্চা নিরাপদ। অপর রমণীটি একথা অস্বীকার করল। বলল, বাঘে নিয়ে গিয়েছে তোমার বাচ্চাকে। এই যে, এখানে শুয়ে রয়েছে, এ বাচ্চাটিই তো আমার। তাদের দু'জনের মধ্যে তুমুল বিবাদ শুরু হল। দু'জনেই শিশুটিকে দাবী করতে লাগল। তখন তারা বিবাদ মীমাংসার লক্ষ্যে উপস্থিত হল হযরত দাউদ আ.'র দরবারে। তিনি অপেক্ষাকৃত বয়স্কা রমণীকে শিশুর অধিকার দান করলেন। ফেরার পথে হযরত সোলায়মান আ.'র সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হয়। হযরত সোলায়মান আ. তাদের সব কথা শুনে বললেন, কে আছ, একটি ছুরি নিয়ে এসো। দু'জনই যখন শিশুটির দাবীদার, তখন শিশুটিকে দু'টকরো করে দু'জনকেই ভাগ করে দেই। একথা শুনতেই অপেক্ষাকৃত কম বয়স্কা রমণীটি বলে উঠল, আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! আমার সঙ্গিনীকেই শিশুটি দিয়ে দিন। হযরত সোলায়মান তখন শিশুটিকে তারই (কম বয়স্কা রমণীকে) কোলে ফিরিয়ে দিলেন। অর্থাৎ এই রমণীটি সত্যিকারের শিশুটির মা ছিল। তাই শিশুকে দু'টুকরা হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্যে এরূপ বলে শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহ প্রকাশ পেয়েছে। তাই সোলায়মান আ. তাকেই শিশুর অধিকার দান করেছিলেন।[৬১৩]

তিন. একদিন এক বৃদ্ধা প্রবাহিত বাতাসের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ নিয়ে আসল যে, হে আল্লাহর নবী ও রাজ্যের বাদশাহ! আমার আর্জি শুনুন। আমি অত্যন্ত দরিদ্র এক বৃদ্ধা। আমার ঘরে কতিপয় ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রয়েছে। আমি তাদের আহারের জন্য কিছু গম ভাঙ্গিয়ে আটা মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বাতাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে আটাগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল। আমার প্রার্থনা হল- আপনি বাতাসের নিকট হতে আমার আটাগুলো আদায় করে দিন। নতুবা আমার সেই ছেলে মেয়েরা অনাহারে থাকবে।

হযরত দাউদ আ. তার আবেদন শুনে বললেন, হে বৃদ্ধা! বাতাসের উপর আমার কোন অধিকার ও কতৃত্ব নেই যে, তোমার আটা আদায় করে দিব। তবে যেহেতু তুমি অভাবগ্রস্থ মহিলা সেহেতু আমি তোমাকে যে পরিমাণ আটা বাতাসে নিয়েছে তার চারগুণ আটা দিচ্ছি। তুমি তা নিয়ে যাও।

বৃদ্ধা খুব খুশীর সাথেই সম্মত হল। হযরত দাউদ আ. তাকে পূর্ণ এক বস্তা আটা দিয়ে বিদায় করলেন। বৃদ্ধা আনন্দের সাথে আটা নিয়ে ঘরে চলল। কিছু দূর যাবার পর হযরত সোলায়মান আ.'র সাথে বৃদ্ধার সাক্ষাত হল। তিনি

[৬১৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৮–৬০৯।

বাদশাহর দরবারে তার আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বৃদ্ধা সোলায়মানকে আদ্যপান্ত ঘটনা খুলে বলল। হযরত সোলায়মান আ. বৃদ্ধাকে বললেন, তুমি বাদশাহ'র দরবারে ফিরে গিয়ে বল যে, আমি আটার প্রত্যাশী নই, আপনি আমার অভিযোগের বিচার করুন।

এ পরামর্শ অনুযায়ী বৃদ্ধা হযরত দাউদ আ.'র দরবারে গিয়ে পুনঃ বিচারপ্রার্থী হল। হযরত দাউদ আ. বৃদ্ধাকে বললেন, বল তো তোমাকে এ পরামর্শ কে দিয়েছে? বৃদ্ধা অত্যন্ত ভয়াকুল ভাবে বলল, যুবরাজ সোলায়মান আমাকে একথা শিখিয়ে দিয়েছেন। তখন বাদশাহ দাউদ আ. সোলায়মান আ.কে ডেকে এনে বললেন, হে সোলায়মান! তুমি যে বৃদ্ধাকে আমার নিকট ফেরৎ পাঠালে, এখন বলতো দেখি, আমি কিভাবে বাতাসকে উপস্থিত করে তার বিচার করতে পারি?

হযরত সোলায়মান আ. বললেন, হে পিতা! আপনি কেবল রাজ্যের অধিপতি নন, আপনি আল্লাহর মনোনীত মহা সম্মানী একজন নবীও বটে। আপনার দোয়ায় নিশ্চয়ই বাতাস আপনার সামনে হাযির হতে বাধ্য হবে। হে পিতা! আমার ভয় হচ্ছে যে, কিয়ামত দিবসে বৃদ্ধা যখন নালিশ নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে, তখন আপনি পৃথিবীতে তার নালিশের বিচার না করার অপরাধে অপরাধী হবেন।

পুত্রের কথায় তিনি বাতাসকে হাযির করার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ্ বাতাসকে দাউদ আ.'র দরবারে হাযির করলেন। তিনি বাতাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, বৃদ্ধার আটা উড়িয়ে নিয়ে যাবার কারণ কি? উত্তরে বাতাস বলল, আমি আল্লাহর আদেশক্রমেই বৃদ্ধার আটা উড়ায়ে নিয়েছি, নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিনি।

আর এর কারণ হল– একখানা বিরাট জাহাজ বহু মালপত্র এবং যাত্রী নিয়ে বিশাল সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিল। হঠাৎ উক্ত জাহাজখানার তলদেশে একটি ছিদ্র হয়ে ডুবে যাবার উপক্রম হল। তখন জাহাজের যাত্রীরা কান্নাকাটি শুরু করল এবং আল্লাহর নামে এরূপ মানত করল, হে দয়াময় প্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করলে এ জাহাজের মালপত্র আমরা আপনার রাস্তায় বিলিয়ে দিব। তখন আমি আল্লাহ্ তায়ালার ইশারায় এ বৃদ্ধার আটাগুলো উড়িয়ে নিয়ে ঐ জাহাজের ছিদ্রে লাগিয়ে তা বন্ধ করে দিয়েছি। ফলে জাহাজখানা নিশ্চিত বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে।

এর কিছু দিন পর সমুদ্র তীরে একখানা জাহাজ এসে নোঙ্গর করেছে। সংবাদ পেয়ে হযরত দাউদ আ. সেখানে উপস্থিত হলেন। জাহাজের আরোহীগণ

বলল, হুযুর! এ সমস্ত মাল আমরা আল্লাহর পথে দান করব বলে মানত করেছি। আপনি এগুলো গ্রহণ করে যথাযোগ্য জায়গায় দান-খয়রাত করে দিন।

হযরত দাউদ আ. জাহাজের মালগুলো গ্রহণ করে অর্ধেক বৃদ্ধাকে এবং বাকী অর্ধেক অন্যান্য দুঃখী-দরিদ্রের মাঝে বিতরণ করলেন। এরপর উক্ত বৃদ্ধার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, হে বৃদ্ধা! বল তো তুমি এমন কি নেক কাজ করেছ যার বদৌলতে তোমার উপরে আল্লাহর এত রহমত বর্ষিত হল? বৃদ্ধা জবাবে বলল, হে আল্লাহর নবী! আমি তেমন কোন সৎ কাজ তো করিনি, তবে আমার ঘরের দ্বারে কোন ভিক্ষুক আসলে তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে না দিয়ে অবশ্যই কিছু না কিছু দিয়ে খুশী করে দেই, এ জন্যে কোন কোন সময় আমি না খেয়ে থাকি।

সে দিন একজন ভিক্ষুক এসে অনাহারী থাকার কথা জানালে, তাকে তখন কি খেতে দেয়া যায়। ঘরের সবাইর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল শুধু আমারই খাওয়া বাকী ছিল। নিজের জন্য যে দু'খানি রুটি রেখেছিলাম তা তাকে দিয়ে দিলাম। সে রুটি দু'খানি খেয়ে বলল, ক্ষুধা তো নিবৃত্ত হল না, আরো দু'খানি রুটি দিন। ঘরে তখন রুটি তৈরী ছিলনা, এমনকি আটাও ছিলনা যে, রুটি বানিয়ে দিব। তবে ঘরে কিছু গম ছিল। ভিক্ষুককে বললাম, বাবা, একটু অপেক্ষা কর গম ভাঙ্গিয়ে আনছি, একটু পরেই তোমাকে রুটি বানিয়ে দিতে পারব।

তখন ভিক্ষুক অপেক্ষা করল। আমি গিয়ে গম ভাঙ্গিয়ে আটা বানিয়ে বাড়ী আসছিলাম। ইত্যবসরে বাতাস আমার আটাগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল। আমার বুঝতে বাকী রইল না, আল্লাহ্ আমাকে ঐ আটার পরিবর্তেই এ মালগুলো দান করলেন।[৬১৪]

চার. একদা এক সুন্দরী মহিলা তার প্রতি যালেমদের যুলুমের বিরুদ্ধে কাযীর নিকট গিয়ে অভিযোগ করল। উক্ত মহিলার অপূর্ব রূপ ও সৌন্দর্যের এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, দেখা মাত্র যে কেউ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেত। কাযী তাকে দেখে তার সাথে নিজের বিবাহের প্রস্তাব পেশ করল। মহিলা কাযীকে জবাব দিল যে, আমার বিবাহের মনোভাব নেই। এতে কাযী স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা ক্ষুণ্ন হল। মহিলা কাযীর প্রতি আস্থা হারিয়ে অন্য এক কাযীর নিকট বিচারপ্রার্থী হল। এই কাযীও তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল। মহিলা বিরক্ত হয়ে বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করে চলে আসল। এরপর তৃতীয় এক কাযীর নিকট বিচারপ্রার্থী হল। তৃতীয় কাযীও মহিলার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে ভালবাসা ও বিবাহের প্রস্তাব দিল। অবশেষে মহিলা ন্যায় বিচারের আশায় চতুর্থ এক কাযীর শরনাপন্ন হল।

---

[৬১৪]. মাওলানা গোলাম নবী, খোলাসাতুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ২৭২, মাওলানা তাহের সুরাটী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪৩১।

মহিলার ভাগ্য মন্দই ছিল। তাই পূর্বোক্ত তিনজন কাযীর ন্যায় চতুর্থ কাযীও একই প্রস্তাব পেশ করল। তখন মহিলা কাযীদের নিকট থেকে ন্যায় বিচারের আশা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে দুঃখিত মনে নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে গেল।

এদিকে কিন্তু কাযী চতুষ্টয় মহিলাকে অতিশয় দেমাগী ও অহংকারী মনে করে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল এবং তাকে জব্দ করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে লেগে গেল।

একদিন চারজন কাযী এক সাথে হযরত দাউদ আ.'র দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল যে, ঐ মহিলাটি ধর্মীয় বিধান অনুসারে কারও সাথে বিবাহ বসতে রাযী নয়, কিন্তু সে রাতে কুকুরের সাথে এক শয্যায় শয়ন করে।

হযরত দাউদ আ. একথা শুনে চমকে উঠলেন এবং ঘৃণায় নাক কুঞ্চিত করে বললেন, বল কি তোমরা? এমন ঘটনা কখনও তো শুনিনি। আচ্ছা, তোমরা কি মহিলার এ ধরণের অপকর্মের কোন সাক্ষী হাযির করতে পারবে? তারা বলল, আমরা চারজন সাক্ষী আপনার দরবারে অবশ্যই হাযির করব।

দাউদ আ. বললেন, তবে তা কর। তারা গিয়ে চারজন সাক্ষী নিয়ে আসল। সাক্ষীগণ ছিল বেদ্বীন ও অর্থ লোভী। তারা অর্থের লোভে একই সঙ্গে হযরত দাউদ আ.'র দরবারে এসে এক বাক্যে সাক্ষ্যপ্রদান করল যে, সত্যই উক্ত মহিলা রাতে কুকুরকে নিজের বিছানায় শয়ন করায়। এরূপ সাক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়ে হযরত দাউদ আ. কর্মচারীদের প্রতি আদেশ দিলেন যে, এই মহিলাকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে মেরে ফেলা হোক।

হযরত দাউদ আ.'র দরবারে উক্ত মহিলার প্রতি এরূপ দণ্ডাদেশ দানকালে যারা উপস্থিত ছিল তাদের কতেক দরবার হতে বের হয়ে বলাবলি করতে লাগল যে, সাক্ষীগণ অর্থের লোভে মহিলার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে তাকে এরূপ বিপদাপন্ন করেছে। আসলে মহিলা সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং নিষ্কলঙ্ক।

এসব আলোচনা হযরত দাউদ আ.'র পুত্র সোলায়মান আ. শুনে দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে হযরত দাউদ আ.'র কাছে আরয করলেন– হে পিতা! উক্ত মহিলার দণ্ডাদেশ কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রেখে তার বিরুদ্ধে সাক্ষীগণ হতে পুনরায় সাক্ষ্যগ্রহণ করুন তারপর দণ্ডাদেশ কার্যকর করুন।

হযরত দাউদ আ. পুত্রের আবেদন কবুল করে সাক্ষী চতুষ্টয়কে আবার তলব করে পুত্রকে বললেন, বৎস! এবার তুমি এদের সাক্ষ্য গ্রহণ কর। আবার সাক্ষ্যগ্রহণ

অনুষ্ঠান ঐ দরবারেই শুরু হল। হযরত দাউদ আ.ও উপস্থিত ছিলেন। প্রথম সাক্ষীকে হাযির করে বাকী তিন সাক্ষী থেকে পৃথক করে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি উক্ত মহিলার শয্যায় যে কুকুরটি দেখেছ, তার রঙ কিরূপ ছিল? সাক্ষী বলল, তার রঙ ছিল কাল। এরপর ঐ সাক্ষীকে দরবার কক্ষে আবদ্ধ রেখে দ্বিতীয় সাক্ষীকে তলব করলেন সোলায়মান আ.। সে হাযির হলে তাকেও একই প্রশ্ন করা হল। সে উত্তরে বলল, কুকুরটির রঙ ছিল লাল। এভাবে পৃথক পৃথক ভাবে বাকী দু'জন সাক্ষীকেও একই প্রশ্ন করা হলে তারা কুকুরের গায়ের রঙ ভিন্ন ভিন্ন বলল।

এবার হযরত দাউদ আ.'র কাছে ঘটনাটা একেবারে পরিস্কার হয়ে গেল যে, মহিলার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। তখন তিনি পুত্র সোলায়মান আ.'র সাথে একমত হয়ে উক্ত মহিলার পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায়নকারী কাযী চতুষ্টয় এবং সাক্ষী চারজনকেই মাটিতে গেড়ে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার আদেশ দিলেন।[৬১৫]

হযরত দাউদ আ.'র পরীক্ষাঃ

হযরত দাউদ আ. যে সকল ঐশী গ্রন্থ পাঠ করতেন, সেগুলোতে তাঁর পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম আ. হযরত ইসহাক আ., হযরত ইয়াকুব আ.'র উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণিত ছিল। তিনিও সে সব মর্যাদা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁকে জানালেন যে, তারা বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্যাবলম্বন করে উত্তীর্ণ হয়ে ওসব মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমাকে পরীক্ষা করলে, আমিও তাঁদের মত ধৈর্যধারণ করব। আল্লাহ্ জানালেন, ঠিক আছে অমুক তারিখে তোমার পরীক্ষা নেওয়া হবে। তুমি সতর্ক ও সজাগ থেকো।

নির্ধারিত সময় উপস্থিত হল। তা ছিল রজব মাসের সতের তারিখ সোমবার। তিনি তাঁর ইবাদতখানায় যাবুর পাঠে মশগুল হলেন। হঠাৎ সেখানে সোনার কবুতরের আকৃতি নিয়ে হাযির হল শয়তান। তার পালক ছিল বিচিত্র বর্ণের। কবুতরটি দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। হাত বাড়ালেন সেটিকে ধরার জন্য। কিন্তু হাত বাড়াতেই কবুতরটি উড়ে গেল। কবুতর খুঁজতে গিয়ে চোখে পড়ল বাতসা বিনতে শাফী নামক এক সুন্দরী মহিলার প্রতি। এই মহিলা ছিল উরিয়া নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী। কেউ বলেছেন উরিয়ার সাথে তার বিবাহ হয়নি কেবল উরিয়া বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল। এ সময় উরিয়া ছিল এক ধর্ম যুদ্ধে। সেই যুদ্ধে উরিয়া শহীদ হয়। বাতশার ইদ্দত পালন শেষ হলে হযরত দাউদ আ.

---

[৬১৫]. মাওলানা তাহের সুরাটী (ভারত), কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪৩৩–৪৩৪।

তাকে বিবাহ করেন। অথচ হযরত দাউদ আ.'র নিরান্নব্বই জন স্ত্রী ছিল। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, দাউদ আ. উরিয়াকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন বাতশাকে তালাক দিতে কিংবা বিবাহের প্রস্তাব তুলে নিতে। কেননা দাউদ আ.'র শরীয়তে অন্যের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অনুরোধ করা এবং তালাক ও ইদ্দতের পর ঐ মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ ছিল এবং কোন দোষণীয় ছিলনা। তবুও একজন উলুল আযম পয়গাম্বর হিসাবে এটি তাঁর জন্য শোভা পায় না। কারণ কথা আছে যে, সাধারণের নেকীও বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য পাপ সমতুল্য। সুতরাং ব্যাপারটি তাঁর জন্য উত্তমের বিপরীত হয়েছে বিধায় আল্লাহ্ তায়ালা তা অপছন্দ করলেন। যার ফলে ফেরেশতা মারফত কাল্পনিক ঘটনা তৈরী করে দাউদ আ.'র ভুল ধরিয়ে দিয়ে তাওবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

অত:পর উরিয়া প্রস্তাব তুলে নেওয়ার পর কিংবা উরিয়া যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর হযরত দাউদ আ. বাতশাকে বিবাহ করলেন। তবে বাতশা শর্ত দিল যে, আমার গর্ভে আল্লাহ্ তায়ালা কোন পুত্র সন্তান দান করলে তাকে আপনার নবুয়তের প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। দাউদ আ. সেই শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। তারপর বাতশা'র গর্ভে হযরত সোলায়মান আ. জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শর্ত মতে দাউদ আ. তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন।

হযরত দাউদ আ. নিজে নিভৃতে ইবাদত করার জন্য একখানা ইবাদতখানা নির্মাণ করেছিলেন। যতক্ষণ তিনি ঐ ইবাদতখানায় ইবাদতে মশগুল থাকতেন ততক্ষন কোন লোকের প্রবেশের অনুমতি ছিলনা। এ নিয়ম ঠিকমত পালিত হওয়ার জন্য ইবাদতখানার বাইরে বহু সংখ্যক প্রহরী মোতায়েন থাকত। নির্ধারিত সময়ে তিনি ইবাদত খানায় ইবাদতে মশগুল ছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তখন মানুষের বেশে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। তারা প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু প্রহরী তাদেরকে বাধা দিল। তাই তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ইবাদতখানায় প্রবেশ করল। হযরত দাউদ আ. তখন সালাত আদায় করছিলেন। আগন্তুদ্বয়ের উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি ইবাদত সংক্ষেপ করলেন। বাদী-বিবাদীর বেশ ধরে ওই আগন্তুকদ্বয় ছিলেন- হযরত জিব্রাঈল ও হযরত মিকাঈল আ.।

যেহেতু হযরত দাউদ আ.'র মোকাদ্দামার জন্য সময় নির্ধারিত ছিল। এই সময়টি ছিল তাঁর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট। তাছাড়া ফটকে ও দরজায় বহু সংখ্যক প্রহরী থাকা সত্ত্বেও দু'জন আগন্তুক অসময়ে অস্বাভাবিক ভাবে হঠাৎ করে ইবাদতখানায় প্রবেশ করাতে তিনি কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লেন। তারা নিজেদের পরিচয় দেওয়ার পূর্বে এবং মোকাদ্দামা পেশ করার পূর্বেই একজন

নবীর সাথে দৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে কথা-বার্তা শুরু করে। তারা বলল, আপনি ভীত হবেন না। আমরা বিবাদমান দু'টি পক্ষ। একে অপরের প্রতি সীমালংঘন করেছি। অতএব, আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আর আমাদেরকে সঠিক পথ পদর্শন করুন। অসময়ে এভাবে এদের আগমনটাও ছিল দাউদ আ.'র জন্য একটা পরীক্ষা। কারণ অন্য কোন সাধারণ মানুষ হলে রাগান্বিত হয়ে প্রহরী ডেকে তাদেরকে ইবাদতখানা থেকে বের করে দিত এবং এই অপরাধের জন্য শাস্তিও দিত। কিন্তু তিনি এসবের কিছুই করেন নি।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে পরীক্ষা করেছেন যে, তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় তাদের সাথে আচরণ করেন, না কি পয়গাম্বর সুলভ ধৈর্য ও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের কথাবার্তা শুনেন? এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। তিনি ধৈর্য সহকারে তাদের অভিযোগ শুনেন এবং ফায়সালা প্রদান করেন।

আগন্তুকদ্বয়ের একজনে অভিযোগ করল যে, এ আমার ধর্মীয় ভাই। এর কাছে নিরান্নব্বইটি দুম্বা আছে, আর আমার আছে একটি মাদী দুম্বা। তবুও সে বলে, তোমার একটি মাত্র দুম্বাটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে কথা-বার্তায় আমার উপর বলপ্রয়োগ করে। দাউদ আ. বিবাদীকে চুপ থাকতে দেখে তার বিবৃতি না শুনে মন্তব্য করেছেন যে, তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সঙ্গে যুক্ত করবার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুলুম করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি যুলুম করে থাকে। হযরত দাউদ আ.'র এই মীমাংসা শুনে বাদী-বিবাদীদ্বয় একে অপরের দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসির ন্যায় মৃদু হেসে আকাশের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখনই দাউদ আ. বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ্ ফেরেশতা পাঠিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছেন এবং বিষয়টি নিজের বেলায়ই প্রযোজ্য। তাঁরই নিকট নিরান্নব্বই জন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্যের স্ত্রীর আকাঙ্খিত হয়েছেন। অত:পর তিনি সিজদায় লুটে পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে তাওবা করেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তার মর্যাদা সমুন্নত রাখলেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন—

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ . إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ . إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ . قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا

فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ . فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ

. অর্থ: আপনার কাছে দাবীদারদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে এবাদতখানায় প্রবেশ করেছিল। যখন তারা দাউদের কাছে অনুপ্রবেশ করল, তখন সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা বলল: ভয় করবেন না; আমরা বিবদমান দুটি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব, আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। সে আমার ভাই, সে নিরানব্বই দুম্বার মালিক আর আমি মালিক একটি মাদী দুম্বার। এরপরও সে বলে: এটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে কথাবার্তায় আমার উপর বলপ্রয়োগ করে। দাউদ বলল: সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। দাউদের খেয়াল হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অত:পর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল। আমি তার সে ভুল ক্ষমা করলাম। নিশ্চয় আমার কাছে তার জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্তবা ও সুন্দর আবাসস্থল।[৬১৬]

উপরোক্ত পরীক্ষায় হযরত দাউদ আ. উত্তীর্ণ হয়েছেন বটে কিন্তু সামান্য ভুল রয়ে গেল। তা হল তিনি ফায়সালা করার সময় উভয়জনের বক্তব্য না শুনে কেবল বাদীর কথা শুনেই তিনি মন্তব্য করেছেন। অথচ আগে বিবাদীকে বক্তব্য পেশ করতে বলা উচিত ছিল। বিবাদীকে বাদীর বিরুদ্ধে কিছু না বলতে দেখে তিনি এক্ষেত্রে বিবাদীর বক্তব্য শুনেন নি। তাছাড়া তিনি কোন ফায়সালা দেন নি বরং উপদেশের ভিত্তিতে কথাগুলো বলেছিলেন। এ হিসাবে এ ব্যাপারে তাঁর কোন মারাত্মক ভুল হয়নি। তবুও একজন প্রথম সারির নবী হিসাবে আল্লাহর নিকট তা অপছন্দনীয় হল। আর তা তিনি বুঝতে পেরে অবিলম্বে সতর্ক হয়ে গেলেন এবং সিজদায় লুটে পরে আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, আল্লাহ তায়ালাও তাঁকে ক্ষমা করে দেন।[৬১৭]

উল্লেখ্য যে, হযরত দাউদ আ. ও উরিয়া'র ঘটনাটি ইস্রাঈলী রেওয়ায়েত। ঐ ঘটনায় আরো কিছু কথা রয়েছে যেগুলো একজন নবীর শানে আপত্তিকর। তাই মুহাক্কিক ওলামায়ে কিরামগণ এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট বলে

[৬১৬]. সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ২১-২৫।
[৬১৭]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-১০, পৃ. ১৬৫-১৬৯।

আখ্যা দিয়েছেন। এ কারণে অনেকেই তাদের গ্রন্থ সমূহে তা উল্লেখ করেন নি। আবার অনেকেই ঘটনা উল্লেখ করার সাথে সাথে পাঠককে সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে এগুলো বিশ্বাস না করে। তাই আমরা নবীর শানে জঘন্য আপত্তিকর কথাগুলো বাদ দিয়ে মোটামুটি সঙ্গতিপূর্ণ ঘটনাটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আল্লামা নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী র. তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফানে ৫৩৯ পৃষ্ঠায় ১০নং টীকায় আরো সংক্ষিপ্তকারে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

তাফসীরে মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন যে, হযরত দাউদ আ.'র সময়ের সাধারণ রীতি ছিল যে, কেউ কারো স্ত্রীকে বিবাহ করতে চাইলে তাকে সরাসরি তালাক দিতে বলতে পারত। এরকম প্রস্তাব তখন দূষণীয় ছিল না। মদীনার কোন কোন আনসার সাহাবী- মক্কার কোন কোন মুহাজির সাহাবীর জন্য নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। এটা ছিল তাদের ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব ও প্রিয়ভাজনতার চরম বহি:প্রকাশ। হযরত দাউদ আ. ঘটনাক্রমে উরিয়ার স্ত্রীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আর প্রচলিত রীতি অনুসারে তাকে তালাক দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। উরিয়াও হয়ত নবীর প্রতি যথা বিনয়বশত: সে প্রস্তাবে অসম্মত হতে পারেনি। তালাক দিয়েছিল তার স্ত্রীকে। আর হযরত দাউদ আ.ও তার মুক্ত স্ত্রীকে পরিণয়াবদ্ধ করেছিলেন শরীয়ত সম্মতরূপে।

হযরত ছানাউল্লাহ পানিপথী র. বলেন, আমি মনে করি হযরত দাউদ আ. তখন সে রকম পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি, যে রকম পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন আমাদের রাসূল মুহাম্মদ ﷺ। তিনি তো হযরত যায়েদ রা.'র স্ত্রী হযরত যয়নবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কারো কাছে তা প্রকাশ করেন নি। বরং যায়েদ রা.কে পরামর্শ দিয়েছিলেন, "তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত হযরত যায়েদ রা. তাঁর স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে পারলেন না এবং রাসূল ﷺও হযরত যয়নাব রা.কে বিবাহ না করে পারেন নি। কারণ এটা ছিল আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা ও পবিত্র অভিপ্রায়। উল্লেখ্য হযরত দাউদ আ. এরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করলে হয়ত আল্লাহ কর্তৃক ভর্ৎসিত হতেন না। তিনি আল্লাহর ইঙ্গিতের অপেক্ষা না করে নিজে নিজেই বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন।[৬১৮]

মুজাহিদ র. বর্ণনা করেছেন, হযরত দাউদ আ. চল্লিশ দিন ধরে সিজদায় পড়ে বিরতিহীন ভাবে কান্নাকাটি করেছিলেন। তাঁর অশ্রুর সিক্ততা থেকে জন্ম নিয়েছিল তৃণগুচ্ছ। চল্লিশদিন গত হওয়ার পর আওয়ায আসল, হে দাউদ! তুমি

[৬১৮]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-১০, পৃ. ১৭৮।

কি ক্ষুধার্ত? তোমার কি খাদ্যের প্রয়োজন ? তুমি কি পিপাসার্ত? তোমার কি পানির প্রয়োজন? তুমি কি বস্ত্রহীন? তোমার কি বস্ত্রের প্রয়োজন? তুমি না চাইতেই তো এতদিন ধরে তোমাকে আমি এগুলো দিয়ে আসছি। হযরত দাউদ আ. এ কথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কান্নার চোটে জ্বলে উঠল সন্নিকটবর্তী একটি কাষ্ঠখণ্ড। তখনই অবতীর্ণ হল মার্জনার শুভ সমচার সম্বলিত প্রত্যাদেশ।[৬১৯]

ইমাম আওযাঈ র. হযরত দাউদ আ.'র অধিক কান্না সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন সুপরিণত সূত্র পরম্পরা সম্পন্ন একটি হাদিস। সেখানে বলা হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, নবী দাউদের দুই চোখ দিয়ে মশক থেকে পানি গড়িয়ে পড়ার মত করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত সারাক্ষণ। ফলে তাঁর মুখমণ্ডলে সৃষ্টি হয়েছিল নালা।[৬২০]

বি:দ্র:- হযরত দাউদ আ.'র কান্না ও তাওবা কবুল হওয়া সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে আরো বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তা এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়নি। (সংকলক)

বনী ইস্রাঈল বানরে রূপান্তরিত:

হযরত দাউদ আ.'র যামানায় শনিবার দিনটি সাপ্তাহিক ইবাদতের জন্য নির্ধারিত ছিল। ঐদিনে তাদের জন্য মাছ শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল। ঐদিন হযরত দাউদ আ. সমুদ্রের তীরে বসে সুমিষ্টস্বরে যাবুর কিতাব পাঠ করতেন। তাঁর যাবুর পাঠ শুনার জন্য সমুদ্রের মাছগুলো এবং অন্যান্য জলচর জীব-জন্তুগুলো একেবারে তীরের নিকটে এসে তন্ময় হয়ে থাকত। সে সময় কেউ তাদেরকে হাত দিয়ে ধরলেও এতটুকু নড়াচড়া করতনা। এ কারণেই শনিবারে মাছ শিকার করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

বনী ইস্রাঈলের কিছু লোক আইলা অঞ্চলে সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকায় বাস করত। তারা মাছ শিকার করে বিক্রয় করত। শনিবার দিনে মাছ শিকার নিষিদ্ধ হওয়াতে তারা অনেকটা অস্বস্তি এবং অসুবিধাবোধ করত। এ জন্য তারা সমুদ্র হতে কতগুলো খাল কেটে নিয়েছিল। শনিবার দিন যাবুর পাঠ শুনার জন্য আগত কিছু কিছু মাছ ঐ সমস্ত খালের ভিতর ঢুকে পড়ত। এরপর মাছ শিকারী বনী ইস্রাঈলরা ঐ সমস্ত খালের মুখ বন্ধ করে দিয়ে মাছগুলোকে আটকে রাখত। তারপর পরের দিন তারা মাছগুলো শিকার করত। তারা বলত: আমরা তো

[৬১৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

[৬২০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

নিষিদ্ধদিনে মাছ শিকার করছিনা বরং পরের দিন শিকার করছি। অথচ আটকে রাখা আর শিকার করা একই কথা। এভাবে চলতে চলতে এক পর্যায়ে তারা শনিবারেও মাছ ধরা আরম্ভ করে দিল।

ঐ এলাকার বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায় তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এক. যারা শনিবার দিনে মাছ শিকার করত, দুই. যারা নিজেরা শিকার করত এবং যারা শিকার করে তাদেরকে বাধা দিত এবং আল্লাহর আযাব-গযবের ভয় প্রদর্শন করত, তিন. যারা নিজেরা শিকার করতনা বটে তবে শিকারীদের বাধা দিত না বরং বাধাদান কারীদেরকে বলত, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করবেন, তাদেরকে উপদেশ ও বাধা দেওয়ার প্রয়োজন কি?

বাধাদানকারী দল বলল, তোমরা যখন আমাদের বাধা অমান্য করতেছ তখন আর আমরা তোমাদের সাথে বসবাস করব না এই বলে তারা গ্রামকে ভাগ করে মধ্যখানে একটি দেওয়াল তুলে দিল। তাদের আসা-যাওয়ার দরজা ও পথ আলাদা ছিল। হযরত দাউদ আ. নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে দোয়া করেছিলেন। একদিন সকালে উঠে বাধাদানকারীরা দেখল যে, অমান্যকারীরা কেউ ঘরের বাইরে আসল না এবং দরজাও বন্ধ। তাই তারা দেওয়াল টপকিয়ে দেখল যে, তারা সকলেই বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তারা দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলে বানরগুলো তাদের আত্মীয় স্বজনকে চিনতে পারল এবং নিকটে এসে তাদের কাপড়ের ঘ্রাণ নিচ্ছিল কিন্তু তারা বানর গুলোকে চিনতে পারছিল না। বানরগুলোর চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল কিন্তু কথা বলতে পারছিল না। তখন তারা বানরগুলোকে বলেছিল, আমরা কি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম না? বানরগুলো কেবল মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছিল। বাধাদানকারী দল বেঁচে গিয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, যারা বাঁধা দিত না তারাও ধ্বংস হয়েছিল। তবে বিশুদ্ধ মতে তারা বেঁচে গিয়েছিলো। এই বানরগুলো দুই দিন পর তৃতীয় দিন অনাহারী অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

কেউ কেউ মনে করে যে, বর্তমান কালের বানরগুলো বনী ইস্রাঈলের রূপান্তরিত বানর গুলোরই বংশধর। এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল ও অমুলক। কারণ কোন অভিশপ্ত ও বিকৃত সম্প্রদায় বা জীব জন্তু বেশী দিন বাঁচেনা, বংশ বিস্তার করতে পারে না বরং নির্দিষ্ট সময়ের পর মরে যায়।[৬২১]

[৬২১]. আল্লামা নঈম উদ্দিন মোরাদাবাদী র., তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান, টীকা নং-৭, পৃ. ২০৪, আল্লামা দুমাইরী র., ৮০৮হি., হায়াতে হাইওয়ান, উর্দু, খণ্ড-৩, পৃ. ২৯৮, কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৪, পৃ. ৬০৭-৬০৯।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. অর্থ: আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা ছিল নদীর তীরে অবস্থিত। যখন শনিবার দিনের নির্দেশ ব্যাপারে সীমাতিক্রম করতে লাগল, যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর, আর যেদিন শনিবার হত না, আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ, তারা ছিল নাফরমান। আর যখন তাদের মধ্য থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন সে লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা আযাব দিতে চান–কঠিন আযাব? সে বলল, তোমাদের পালনকর্তার নিকট ওযররূপে পেশ করার জন্য এবং এজন্য যেন তারা ভীত হয়। অত:পর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম, গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের নাফরমানীর দরুন। তারপর যখন তারা এগিয়ে যেতে লাগল সে কর্মে যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিল, তখন আমি নির্দেশ দিলাম যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।[৬২২]

হাশরের দিনের বিচার কার্যের নমুনা প্রদর্শন:

একদিন হযরত দাউদ আ.'র কতিপয় উম্মত বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি যদি আমাদেরকে রোজ হাশরের বিচারের নমুনা দেখাতেন তা হলে আমাদের ঈমান আরো দৃঢ় হত এবং আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আমাদের মন আরো বেশী আকৃষ্ট হত। উম্মতের আবেদন শুনে তিনি বললেন, ঠিক আছে, ঈদের দিন তোমরা ময়দানে সমবেত থেকো। সেখানে আমি হাশর ময়দানের বিচারের নমুনা দেখাব।

[৬২২]. সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৬৩-১৬৬।

বর্ণিত আছে যে, বনী ইস্রাঈলের এক গোত্রপতি খুবই সম্পদশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল। তার প্রচুর ধন-সম্পদ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পশুপালন ছিল। এসব সম্পদের মধ্যে একটি গাভী ছিল খুবই আকর্ষনীয়। তা যেমনি সুন্দর তেমনি হৃষ্টপুষ্ট। গাভীটির মালিক গাভীকে মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করাত এবং গলায় মুক্তার মালা পরাত আর শিংয়ের সাথে মূল্যবান জওহারাদির ছড়া ঝুলিয়ে গাভীটিকে মাঠে ছেড়ে দিত। এটি সারাদিন মাঠে চরে সূর্যাস্তের সময় আপন গোহালে ফিরে আসত। প্রভাবশালী ব্যক্তির গাভী বলে কেউ গাভীটির ক্ষতি করার সাহস পেতনা।

বনী ইস্রাঈলের এক বিধবা আবেদাহ মহিলা ছিল। তার একজন নেক্‌কার পুত্র সন্তান ছিল। তারা নির্জন অঞ্চলে এক ময়দানে একটি ঘরে বসবাস করত। তারা একটি ইবাদতখানা তৈরী করে সেখানে মা-ছেলে সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকত। তাদের পানাহারের কোন ব্যবস্থা ছিলনা। কোন কাজ-কর্ম ব্যতিত অলৌকিকভাবে তাদের দৈনন্দিন খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তাদের ঘরের পাশে একটি নদী এবং একটি আনার বৃক্ষ ছিল। আল্লাহর হুকুমে ঐ বৃক্ষে প্রতিদিন দু'টি করে আনার ধরত। মা-ছেলে ঐ আনার দু'টি খেয়ে সবর করত। এভাবে সত্তর বছর যাবৎ ইবাদত-বন্দেগীতে কেটে গেল। দুনিয়ার প্রতি তাদের কোন খেয়ালই ছিল না।

এভাবে সত্তর বছর কেটে যাওয়ার পর একদিন ছেলে বলল, আম্মা! সারাজীবন আমরা শুধু আনার খেয়ে কাটিয়েছি। মানুষ কত রকমের খাদ্য খায়, কিন্তু আমরা অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের স্বাদ কিরূপ তাও কোন দিন বুঝতে পারলাম না। শহরের ভিতরে বাজারে বিভিন্ন রকমের খাদ্য দ্রব্য বিক্রি হয়। ইচ্ছে করে বাজার থেকে কিছু কিনে এনে খেতে। আপনি অনুমতি দিলে তা করতে পারি।

মা বললেন, পুত্র! আল্লাহর দেয়া নিয়ামতে শোকর কর। আমাদের মত বিনাশ্রমে দুনিয়ার অন্য কেউ এভাবে নিয়ামত পাচ্ছে না। আল্লাহ যা দিচ্ছেন তা খেয়ে শোকর কর বেশী কিছুর লোভ করোনা। কারণ লোভ-লালসা খুবই খারাপ জিনিস। পুত্র মায়ের কথা শুনে চুপ থাকল এবং মনের ইচ্ছে ত্যাগ করল।

কিন্তু আল্লাহর কি অপূর্ব ইচ্ছা! পরদিন থেকে আনার বৃক্ষে আর আনার ধরেনা। মা-ছেলে চিন্তিত হয়ে পড়ল। মা বলল, হে পুত্র আমার! রিযিক হিসাবে আল্লাহ্ আমাদের জন্য যা দান করতেন আমাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে তা অদৃশ্য হয়ে গেল। অত:পর একদিন এক রাত পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকল। কিন্তু একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। কোথা হতে একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গাভী এসে তাদের ঘরের আঙ্গিনায় দাড়িয়ে মানুষের ভাষায় বলল, তোমরা ক্ষুধার কষ্ট ভোগ না করে আমাকে যবেহ করে আমার মাংস খাও। আমার মাংস তোমাদের আহার করা সম্পূর্ণ হালাল।

গাভীর মুখে কথা বলতে শুনে তারা অবাক হল; কিন্তু যবেহ করল না। অথচ তারা তিন দিন পর্যন্ত অনাহারে দুর্বল হয়ে পড়ল। মা বলল, হে বৎস! গাভীটি আমাদেরকে গুনাহে লিপ্ত করাতে চায়। তখন তারা গাভীটি তাড়িয়ে দিল। পরের দিন গাভীটি পুনরায় তাদের আঙ্গিনায় এসে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে যবেহ করার জন্য গলাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে শুয়ে গিয়ে বলল, তোমরা আমাকে যবেহ করে ভক্ষণ কর, আমি তোমাদের জন্য হালাল রিযিক। এবারও গাভিটিকে তারা তাড়িয়ে দিল কিন্তু গাভীর এরূপ আচরণে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ল। এর রহস্য তারা বুঝে উঠতে পারল না।

তৃতীয় দিন গাভীটি আবার এসে বলল, তোমরা আমার কথাকে অবহেলা করছ কেন? আমার মাংস তোমরা দু'জনের জন্য হালাল। এ ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে কোন জবাবদিহি করতে হবে না।

এবার মা-ছেলে প্রাণ রক্ষার তাকীদে এবং গাভীর বারংবার অনুরোধে বাধ্য হয়ে তারা গাভীটিকে আল্লাহর নামে যবেহ করে কিছু মাংস রান্না করে আহার করল।

উল্লেখ্য যে, গাভীটি ছিল বনী ইস্রাঈলের প্রভাবশালী সেই বিত্তশালী ব্যক্তির, যার সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

প্রতিদিনের ন্যায় গাভীটি সন্ধ্যা বেলায় মালিকের নিকট গোহালে ফিরে গেল না। তখন প্রভাবশালী মালিক খোঁজা-খুঁজি আরম্ভ করল। পাহাড়ে জঙ্গলে লোক পাঠাল কিন্তু কোথাও গাভীর সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন গাভীর মালিক বুঝতে পারল যে, হয়ত দুষ্ট লোকেরা গাভীটি যবেহ করে খেয়ে ফেলেছে। তবুও সে লোক লাগিয়ে রাখল, যেন গাভীর সন্ধান কিংবা রহস্য উদঘাটন করা যায়।

বনী ইস্রাঈলের এক দালাল মহিলা ছিল। সে বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে জিনিস-পত্র বিক্রি করত। ঘটনাক্রমে ঐ মহিলা সেই মা-ছেলের বাড়ীতে গেলে সেখানে গাভীটির হাড্ডি ও চামড়া দেখতে পেয়ে গাভীর মালিকের কাছে গিয়ে সংবাদ দিল। মালিক ক্রোধে অধীর হয়ে তখনি বৃদ্ধার বাড়ীতে মহা অঘটন ঘটাবার জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজন তাকে পরামর্শ দিল, বিচার নিজের হাতে তুলে না নিয়ে হযরত দাউদ আ.'র কাছেই বিচার দিন। গাভীর মালিক তাই করল। হযরত দাউদ আ. লোক মারফত বৃদ্ধা ও তার পুত্রকে দরবারে হাযির করালেন। এরপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন গাভী যবেহ করে খেয়েছ কি? তারা সত্য ঘটনা খুলে বলল এবং হ্যাঁ বাচক উত্তর দিল।

গাভীর মালিক শুনে বলল, মালিকের অনুমতি ছাড়া গাভী যবেহ করে খেয়েছ আর সুন্দর করে গল্প সাজিয়েছ? পশু কি কথা বলতে পারে? চোরের মত পরের

জিনিস হজম করে এখন পশুর দ্বারা মানুষের মত কথা বলার গল্প সাজিয়েছ? হযরত দাউদ আ. মালিককে ধমক দিয়ে বললেন, চুপ থাক তুমি। আল্লাহ ইচ্ছা করলে শুধু পশুর দ্বারা কেন জড়পদার্থের দ্বারাও কথা বলাতে পারেন।

হযরত দাউদ আ. উক্ত বৃদ্ধা ও তার পুত্রের ধর্মভীরুতা ও তাদের ইবাদত-বন্দেগীর কথা বহুদিন থেকে জানতেন। সুতরাং তারা যে অন্যায়ভাবে গাভীটি এভাবে খেতে পারেনা, এ বিশ্বাস তাঁর অন্তরে ছিল। আর এ জন্যেই তিনি তাদের ঘটনার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থা পোষণ করে গাভীর মালিককে বললেন, এরা যখন তোমার গাভীকে যবেহ করে খেয়ে ফেলেছে, এখন আর এ ব্যাপারে কি করা যায়? এদের কাছে অর্থ-সম্পদ কিছুই নেই যে, তারা গাভীর মূল্য পরিশোধ করবে। কিন্তু তাই বলে তোমার ক্ষতি অস্বীকার করা যায়না। তোমাকে আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে গাভীর মূল্য প্রদান করছি। অতএব, তুমি তাদের বিরুদ্ধে তোমার পেশকৃত মামলা তুলে নাও।

মালিক বলল, আমি গাভীর মূল্য নিতে আসিনি। আমার কথা হল, তারা আমার গাভীটি যবেহ করে খেয়ে ফেলেছে কোন সাহসে? এর মত অন্যায় কাজ হতে পারেনা। আমি এ অন্যায় কাজের বিচার চাই।

লোকটির হৃদয়ের কাঠিন্য দেখে হযরত দাউদ আ. বললেন, দেখ, এদের অন্যায়ের যত বিচারই করা হোক না কেন, তুমি গাভীটিকে আর ফিরে পাবে না। অতএব, আমি তোমাকে আবার বলছি, যবেহ কৃত গাভীটির ক্ষতিপূরণ বাবৎ তার খসানো চামড়াটির ভিতরে যতগুলো স্বর্ণ মোহর বেঁধে লওয়া যায়, আমি তোমাকে সে পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দেব। তুমি তাদের থেকে দাবী প্রত্যাহার কর।

গাভীর মালিক হযরত দাউদ আ.'র কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করল না। সে বলল, গাভীটি আমাকে ফেরৎ দিতে হবে, নতুবা অপরাধের জন্য তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। আমি দরবারে আগামীকাল আবার আসব। তাদেরকেও কাল আসতে বলে দিন। আজ আপনি এ বিচার সম্পর্কে চিন্তা করে দেখবেন। একথা বলে লোকটি দরবার ত্যাগ করল।

ঠিক এ মুহূর্তে ফেরেশতা জিব্রাঈল আ. হযরত দাউদ আ.'র কাছে এসে বললেন, বনী ইস্রাঈলগণ হাশরের ময়দানের বিচারের নমুনা দেখতে চেয়েছে, আপনি কাল ঈদের দিন তা দেখাবেন। সকলেই যেন কাল ঈদের ময়দানে উপস্থিত হয়। একথা তাদের কাছে আজই ঘোষণা করে দিন।

হযরত জিব্রাঈল আ. হযরত দাউদ আ.কে আরও একটি কথা বললেন। আপনি তাকে কাল একথা জিজ্ঞেস করবেন যে, তুমি ইতিপূর্বে এক ধনী-

ব্যবসায়ীর গোলাম ছিলে। তার সাথে সিরিয়া যাওয়ার পথে তুমি যে ঘটনা ঘটিয়েছিলে তা তোমার স্মরণ আছে কি?

জিব্রাঈল আ. হযরত দাউদ আ.কে উক্ত ঘটনাটি বললেন। সে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পূর্বের কথা। এ গাভীর মালিক তখন বনী ইস্রাঈলের এক বড় ধনী সওদাগরের গোলাম ছিল। ঐ সওদাগর একবার পাঁচশত উট বোঝাই পণ্য নিয়ে এ গোলামকে সহ সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়েছিল। পথে এ গোলাম অতর্কিতভাবে উক্ত সওদাগরকে হত্যা করে তার সকল পণ্য ও সম্পদ হস্তগত করল। তারপর সে সিরিয়া না গিয়ে মিশর গমণ করে সমস্ত মাল বিক্রয় করে এ এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেছে। তার এ গুপ্ত ঘটনার কথা কেউই জানে না।

লোকটির জমি-জমা, ধন-সম্পদ যা কিছু রয়েছে, সবই উক্ত নিহত ব্যবসায়ীর সম্পদ। আর যে বিধবা ও তার পুত্র ঐ লোকটির গাভীর মাংস খেয়েছে, সেই বিধবা হল উক্ত নিহত ব্যবসায়ীর স্ত্রী এবং তার পুত্রটি সেই ব্যবসায়ীর সন্তান। এরা যে গাভীটি খেয়েছে তা ঐ লোকটির নয় বরং ঐ বিধবা ও তার পুত্রই এর প্রকৃত মালিক। শুধু গাভী নয় লোকটির যাবতীয় ধন-সম্পদ, বাড়ী-ঘর, জমি-জমা সবকিছুর মালিক ঐ বৃদ্ধা ও তার পুত্র।

এরপর জিব্রাঈল আ. হযরত দাউদ আ.কে বললেন, আমি আপনাকে রহস্যটি জানিয়ে দিলাম, এখন আপনি বিচার করুন। অত:পর জিব্রাঈল আ. চলে গেলেন।

এর পর দিন ছিল ঈদের দিন। হযরত দাউদ আ. ঘোষণা করে দিলেন যে, তোমরা হাশরের দিনের বিচারের নমুনা দেখতে চাইলে আগামীকাল ঈদের ময়দানে উপস্থিত থেকো। ফলে সেদিন বিচারের দৃশ্য দেখার জন্য ময়দানে লোকে লোকারণ্য। গাভীর মালিকও বিচারের আশায় হাযির হল।

হযরত দাউদ আ. লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কখনো কোন ব্যবসায়ীর গোলাম ছিলে? তার পাঁচশত উট বোঝাই পণ্য নিয়ে তার সাথে সিরিয়া যাওয়ার পথে আকস্মিক তাকে হত্যা করে তার ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেছিলে? হযরত দাউদ আ. কর্তৃক এরূপ প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গেল। সে সম্পূর্ণভাবে তা অস্বীকার করল। সে বলল, আপনি এসব কি বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা, কে আপনাকে এসব কথা বলল? আমি কোন দিনই কারও গোলাম ছিলাম না এবং জীবনে কখনও কাউকেও আমি হত্যা করিনি। অন্যায়ভাবে কারও সম্পদ আমি আত্মসাৎ করিনি। আমার পিতা-পিতামহ-ই প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন। আমি উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের ধন-সম্পদের মালিক হয়েছি।

লোকটি যখন এরূপ মিথ্যা কথাগুলো নির্দ্বিধায় বলে যেতে লাগল, তখন হযরত দাউদ আ. তাকে বললেন, তুমি চুপ কর। আর মিথ্যা বলোনা। তোমরা সমস্ত গোপন তথ্য আজ এখানে প্রকাশ পাবে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটির যবান বন্ধ হয়ে গেল। সে মুখ দিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারেনি। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে এসময় তার শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যবান খুলে গেল। তাদের প্রত্যেকের ভাষা ফুটে উঠল। একে একে প্রত্যেকেই তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল।

হাত বলল, এ লোক আমার দ্বারাই তার মুনিবকে হত্যা করেছিল। অমুক সনের অমুক মাসের এত তারিখের অমুক দিন অমুক সময় আমিই অস্ত্রাঘাত দ্বারা তার মুনিবকে হত্যা করেছিলাম। এরপর চোখ বলল, হাত যে সাক্ষ্য প্রদান করল, তা সম্পূর্ণ সত্য। আমার দৃষ্টির সামনেই উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

এভাবে নিজের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই লোকটির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই নয়, মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থানকারী যে সকল ফেরেশতা ঘটনা দেখেছিল, প্রত্যেকে তার বিরুদ্ধে তাদের দৃষ্ট ঘটনা প্রকাশ করে সাক্ষ্য দিল।

এ সময় হযরত দাউদ আ. সমবেত বনী ইস্রাঈলগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা হাশরের দিনের বিচারের নমুনা দেখতে চেয়েছিলে, এই যে ঘটনা তোমরা দেখলে এটাই রোজ হাশরের বিচারের নমুনা। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা প্রদর্শন করে নানা প্রকার অপকর্মে লিপ্ত থাকে হাশরের দিন বিচারকালে আল্লাহর দরবারে অস্বীকার করে বলবে যে, আমরা কখনও এসব অপকর্ম করিনি। তখন এভাবেই আল্লাহ্ সে সব পাপীদের মুখ বন্ধ করে তাদের অন্যান্য সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যবান খুলে দিবেন। তারা তখন তাদের অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সত্য সাক্ষ্যদান করবে। সাথে ফেরেশতাগণও তাদের চোখে দেখা ঘটনা প্রকাশ করবে।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলেছেন– اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰىٓ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থ: আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবো, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।[৬২৩]

এরপর হযরত দাউদ আ. উক্ত বিধবা এবং তার পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এ লোকটি যে নিজেকে বাপ-দাদার ধনে ধনবান বলে দাবী করল, তা তাহা মিথ্যা নিশ্চয় তোমরা তা বুঝেছ। তার সমস্ত ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক

---

৬২৩. সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৬৫।

তোমরা। তাই তা তোমরা মাতা-পুত্রকে প্রদান করা হল। বিধবার পুত্রকে লক্ষ্য করে দাউদ আ. বললেন, তুমি তোমার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কর।

আদেশ পেয়ে পুত্র তরবারী নিয়ে লোকটির মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। এরপর পিতার সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে চলে গেল।[৬২৪]

হযরত দাউদ আ.'র ইন্তেকাল:

হাদীস শরীফে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, হযরত আদম আ.কে আল্লাহ তায়ালা এক হাজার বছর হায়াত দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে তিনি তাঁর সন্তান হযরত দাউদ আ.কে দয়াপরবশ হয়ে চল্লিশ বছর দান করে দিয়েছিলেন। ফলে দাউদ আ.'র বয়স হয়েছিল একশত বছর। নয়শত ষাট বছর পূর্ণ হলে আযরাঈল আ. উপস্থিত হলে আদম আ. বলেছেন, আপনি অগ্রিম আসছেন কেন? আমার আরো চল্লিশ বছর রয়ে গেছে। মালাকুল মাউত বলেছেন, আপনি তো আপনার সন্তান দাউদকে চল্লিশ বছর দান করে দিয়েছিলেন। তখন হযরত আদম আ. তা ভুলে গিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তায়ালা দয়া করে হযরত আদম আ.কে এক হাজার বছর হায়াত দিয়েছিলেন এবং হযরত দাউদ আ.কেও পুরো একশত বছর হায়াত দান করেছেন।[৬২৫]

ইমাম আহমদ র. তাঁর মুসনাদে হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত দাউদ আ. অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি যখন ঘর থেকে কোথাও বাইরে যেতেন, তখন মহলে সব দরজা বন্ধ করে দিতেন। তিনি ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত কেউ তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে পারত না।

একদা তিনি ঘর থেকে বাইরে গেলেন। দরজায় তালা লাগানো ছিল। হঠাৎ করে তাঁর স্ত্রী দেখলেন যে, ঘরের মধ্যে একজন লোক দণ্ডায়মান। স্ত্রী বললেন, ঘরে কে? এই ব্যক্তি ঘরে কিভাবে প্রবেশ করল। দরজা তো বন্ধ। খোদার শপথ! আমরা হযরত দাউদ আ.'র কাছে লজ্জিত হবো।

ইত্যবসরে হযরত দাউদ আ. আসলেন এবং দেখলেন এক ব্যক্তি ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? উত্তর দিল, আমি সেই, যেই

৬২৪. মাওলানা গোলাম নবী, খোলাসাতুল আম্বিয়া, উর্দু, দিল্লী, পৃ. ২৭৪-২৭৬, মাওলানা তাহের সূরাটী (ভারত), কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪২৫-৪৩০।

৬২৫. আল্লামা ইবনে কাসীর, ৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, খণ্ড-২, পৃ. ৪১১।

বাদশাহগণকে ভয় করে না এবং যাকে কোন আড়ালে বাধা দিতে পারে না। তখন দাউদ আ. বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি তো মালাকুল মউত তথা আযরাঈল আ.। তোমাকে স্বাগতম। তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন আর তাঁর রূহ বের করে নেওয়া হল।

কেউ কেউ বলেন, তিনি মেহরাব থেকে নামার সময় মালাকুল মাউত এসে হাযির হল। তিনি মালাকুল মাউতকে বললেন, আমাকে একটু ইবাদত করার সুযোগ দাও। মালাকুল মাউত বলল আপনার হায়াত শেষ। তখন দাউদ আ. তখনই সিজদায় পড়লেন সিঁড়ির ধাপে। সেই সিজদা অবস্থায়ই তাঁর আত্মা বের করে নিল।

ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর জানাযায় সাধারণ মানুষ ছাড়া কেবল চল্লিশ হাজার রাহেব তথা বিশেষ আলেম উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা আলেমানা টুপি পরিহিত ছিলেন। ঐদিন প্রচণ্ড গরমের কারণে অসংখ্য মানুষ কষ্ট পাচ্ছিল। লোকেরা হযরত সোলায়মান আ.কে গরমের অতিষ্ট থেকে মুক্তি লাভের কোন ব্যবস্থা করার আবেদন করল। তিনি বাইরে এসে পক্ষীকুলকে ডেকে আদেশ দিলেন যে, মানুষের উপর স্বীয় ডানা মেলে ছায়া কর। সর্বদিক থেকে পক্ষীকুল এসে স্বীয় পাখা দ্বারা এমনভাবে আবৃত করে ফেলল যে, বাতাস চলাচল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। লোকেরা পুনরায় সোলায়মান আ.কে বলল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আমরা মরে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গেলাম। আপনি বিহিত ব্যবস্থা করুন। তিনি পুনরায় বাইরে এসে পক্ষীকুলকে আওয়ায দিয়ে বললেন, তোমরা সূর্যের দিক থেকে লোকদের উপর ছায়াদান কর আর বাতাস চলাচলের পথ থেকে সরে যাও। তাঁর কথা মতে পক্ষীর তাই করল। ফলে লোকেরা ছায়াও পেল হাওয়াও পেল। লোকেরা এই প্রথমবার হযরত সোলায়মান আ.'র হুকুমতের এই বিশেষ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করল।[৬২৬]

হযরত দাউদ আ.'র মৃত্যু সম্পর্কে অন্য একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যা নিম্নে বর্ণিত হল।

হযরত দাউদ আ.'র জীবনের শেষ লগ্নে একদিন হযরত জিব্রাঈল আ. তাঁর নিকট একটি তালাবদ্ধ সিন্ধুক নিয়ে এসে বললেন, হে নবী! আপনার সকল পুত্রকে ডেকে জনে জনে জিজ্ঞেস করুন, এ সিন্ধুকটির মধ্যে কি আছে? যে বলতে পারবে আপনি তাকে আপনার পরবর্তী বাদশাহ নিযুক্ত করবেন আর আল্লাহ্ তাঁকে নবুয়তও দান করবেন।

৬২৬. আল্লামা ইবনে কাসীর, ৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, খণ্ড-২, পৃ. ৪১১-৪১২।

হযরত দাউদ আ. তার পনের জন সন্তানকে দরবারে ডেকে আনলেন। বনী ইস্রাঈলের অনেক জনসাধারণও উপস্থিত ছিল। এরপর তিনি তাঁর প্রত্যেক পুত্রকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু কেউ বলতে পারল না। কনিষ্ঠ পুত্র সোলায়মানকে তখনও প্রশ্ন করা হয়নি। এবার তিনি অগ্রসর হয়ে বললেন, পিতা! যদি দয়া করে আমাকে অনুমতি দিন, তবে আল্লাহর রহমতে আমি বলতে পারব তার ভিতরে কি রয়েছে। হযরত দাউদ আ. বললেন, হ্যাঁ, তোমাকে অনুমতি দিলাম। বল দেখি এর মধ্যে কি আছে?

তখন হযরত সোলায়মান আ. বললেন, এর মধ্যে একটি আংটি, একটি চাবুক এবং একখানা লিখিত কাগজ রয়েছে। এছাড়া অন্য কিছু নেই। তখন জিব্রাঈল আ. বললেন, বস্তু তিনটি অলৌকিক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আংটিটি বেহেশতে নির্মিত বহুগুণ সম্পন্ন এবং এতে বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতা বিদ্যমান। এই আংটির মধ্যে যে স্বচ্ছ পাথর দেখা যাচ্ছে তার মাধ্যমে এ আংটির অধিকারী দুনিয়ার সব কিছু অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সীমান্তের যে কোন কিছু পরিস্কারভাবে দেখতে পাবে। এ আংটি যে পরিধান করবে, আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টি তথা মানব-দানব, জ্বিন-পরী, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ সমস্ত কিছুই তার তাবেদার হবে। কিছুই তার অবাধ্য হবে না।

তারপর এ চাবুকটি হল দোযখের তৈরী। এতেও বিভিন্ন প্রকার অলৌকিক গুণ বর্তমান। এর ক্ষমতা ও শক্তি কল্পনাতীত। এ চাবুকধারীর শত্রু যতবড় শক্তিশালী হোকনা কেন, চাবুকধারীর সাথে বিরোধীতা করলে চাবুকটিকে আদেশ করা মাত্র সে আপনা-আপনি গিয়ে উক্ত বিরোধী শক্তিকে এমনভাবে ঘায়েল করবে যে, জীবনে সে আর কোন দিন শত্রুতা করবে না। তবে এ চাবুক কোন অত্যাচারী ব্যতীত সৎ লোককে কখনও শাস্তি দেবে না।

এরপর জিব্রাঈল আ. সিন্ধুকে রক্ষিত কাগজখানা নিয়ে হযরত দাউদ আ.কে বললেন, এই কাগজখানায় কি লিখিত আছে, আশা করি আপনার পুত্র সোলায়মান আ. বলতে পারবেন। তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করে দেখুন। হযরত সোলায়মান আ. উক্ত কাগজখানা নিয়ে পাঠ করে বলতে লাগলেন, এতে পাঁচটি বিষয়ের নাম লেখা আছে। বিষয়গুলো হল– ১. ঈমান, ২. প্রেম, ৩. বুদ্ধি, ৪. শালীনতাবোধ ও ৫. শক্তি। হযরত দাউদ আ. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এ বস্তুগুলো তো মানুষের ভিতরে ভিতরেই থাকে, তবে তুমি কি বলতে পার বাবা, এর কোনটির থাকার স্থান শরীরের কোন জায়গায়?

হযরত সোলায়মান আ. বললেন, আল্লাহর রহমতে আমি তা বলতে পারব। ঈমান ও প্রেমে বস্তু দু'টির স্থান অন্তরে, বুদ্ধির স্থান মাথার মগজে, লজ্জা বা

শালীনতার স্থান চোখে আর শক্তির অবস্থান হাড়ের মধ্যে। হযরত জিব্রাঈল আ. শুনে বলে উঠলেন ধন্যবাদ, আপনাকে হে সোলায়মান আ.! আপনার উত্তর সম্পূর্ণ সঠিক হয়েছে।

এরপর জিব্রাঈল আ.'র পরামর্শক্রমে ও নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত দাউদ আ. আংটিটি হযরত সোলায়মান আ.'র আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন, চাবুকখানা তাঁর হাতে তুলে দিলেন এবং বাদশাহী তাজ তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়ে তাঁকে নিজের সিংহাসনে উপবেশন করিয়ে নিজে পার্থিব ব্যাপারাদি থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হলেন।[৬২৭]

২৫. হযরত সোলায়মান আ.

নাম- সোলায়মান, পিতার নাম- দাউদ আ., মায়ের নাম- উরিয়া। বংশ পরিক্রমা হল- সোলায়মান ইবনে দাউদ ইবনে আফসা ইবনে উয়াইদ ইবনে নায়ের ইবনে সালমূন ইবনে ইয়াখসুন ইবনে আমীনাযিব ইবনে ইরম ইবনে খাদ্বরূন ইবনে ফারেছ ইবনে ইয়াহুদা ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্।[৬২৮]

হযরত কা'ব থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত সোলায়মান আ.'র রঙ ছিল শুভ্র, শরীরের গঠন ছিল বিশাল আকারের, চেহারা ছিল উজ্জ্বল এবং অত্যন্ত নম্র স্বভাবের শান্তিশিষ্ট ও বিনয়ী ছিলেন।[৬২৯]

সিংহাসন ও নবুয়ত লাভঃ

হযরত দাউদ আ.'র মৃত্যুকালে তাঁর পনের জন পুত্র ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত সোলায়মান আ. যদিও সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি-চরিত্রের দিক দিয়ে ভাইদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক যোগ্য। এ জন্যে দাউদ আ. মৃত্যুর পূর্বে হযরত সোলায়মান আ.কে সিংহাসেন বসিয়ে যান।

পিতার মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তায়ালা হযরত সোলায়মান আ.কে নবুয়ত দান করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল তের বছর। সূরা নামলে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ অর্থাৎ সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। এখানে উত্তরাধিকারী বলতে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার বুঝানো

[৬২৭]. মাওলানা গোলাম নবী, খোলাসাতুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ২৭৬-২৭৭ ও মাওলানা তাহের সূরাটী (ভারত), কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪৩৫।
[৬২৮]. ইবনে আসাকির, খণ্ড-২২, পৃ. ২৩০, সূত্রঃ জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৬৭৪।
[৬২৯]. রূহুল মায়ানী, খণ্ড-১, অংশ-২, পৃ. ১৮, সূত্রঃ প্রাগুক্ত।

হয়েছে- আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ আমরা পয়গাম্বরগণ উত্তরাধিকার হইনা এবং কেউ আমাদের উত্তরাধিকারীও হয়না। তিরমিযী ও আবু দাউদে হযরত আবুদ্দরদা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ অর্থাৎ আলেমগণ আম্বিয়াগণের উত্তরাধিকারী; কিন্তু আম্বিয়াগণের মধ্যে জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে- আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না।

হযরত সোলায়মান আ.'র সময়কাল:

হযরত সোলায়মান আ.'র জন্ম হয়েছিল ১০৩৫/১০৪৫ বছর খ্রিষ্টপূর্বে। আর মুহাম্মদ ﷺ'র এক হাজার সাতশত বছর পূর্বে।[৬৩০]

হযরত সোলায়মান আ.'র প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত:

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত সোলায়মান আ.কে বহু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করেন। তন্মধ্যে একটি হল তিনি সকল প্রকার পক্ষীকুলের ভাষা বুঝতেন। বিভিন্ন পক্ষী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের শব্দ করে থাকে। তিনি সর্বাবস্থার সব ধরণের শব্দের অর্থ বুঝতে সক্ষম ছিলেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ সোলায়মান আ. বলেছিলেন, হে লোক সকল! আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে।[৬৩১]

ইমাম বগভী র. লিখেছেন, হযরত কা'ব বর্ণনা করেছেন, একবার এক সমাবেশে হযরত সোলায়মান আ. তাঁর লোকজন নিয়ে বসেছিলেন। অদূরে একটি বন্য কবুতর চিৎকার করছিল। তিনি জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, কবুতরটি কী বলছে জান? লোকেরা বলল, না। তিনি বললেন, সে বলছে, মৃত্যুর জন্য জীবনকে এবং ধ্বংসের জন্য গৃহকে প্রস্তুত রাখ। আর একবার চিৎকার করছিল একটি পক্ষী শাবক। তিনি সঙ্গীদেরকে বললেন, জান, সে কী বলছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, সে বলছে, আক্ষেপ! এ বিশাল সৃষ্টিশালা যদি অস্তিত্ব লাভ না করত। ময়ুরের ডাক শুনে একবার তিনি বলেছিলেন, সে বলছে, অপরের জন্য যেমন আচরণ করবে, তেমনি আচরণ পাবে তুমিও। পেঁচকের ডাক শুনে বললেন, পেঁচকটি বলছে, অন্যকে যে করুণা করেনা, সে নিজেও করুণাসিক্ত হয় না। বাজ পাখির চেঁচামেচি শুনে বলেছিলেন, সে বলে, ওহে

[৬৩০]. তাযকারাতুল আম্বিয়া, কৃত. আমীর আলী, পৃ. ৩৫৭ ও তাযকারাতুল আম্বিয়া, কৃত. আব্দুর রাজ্জাক, পৃ. ৩৭৪, সূত্র: প্রাগুক্ত।

[৬৩১]. সূরা নামল, আয়াত: ১৬।

পাপী-তাপীর দল! আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর একদিন তিতিরের কর্কশ স্বর শুনে তিনি বললেন, সে বলছে- প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুপথগামী, আর প্রতিটি নতুন অবক্ষয় প্রবণ। আরেকবার অন্য এক পক্ষীর শব্দ শুনে তিনি বললেন, এ উপদেশ দিচ্ছে, পূর্বাহ্নে পূণ্য প্রেরণ কর, সবটাই পেয়ে যাবে। কবুতরের বাকবাকুম শুনে বলেছিলেন, সে জানাতে চায় যে, আমার সু-মহান প্রভু পালনকর্তার গুণকীর্তন দ্বারা আকাশ-বাতাস পূর্ণ করে দাও। একবার একটি কামারী পাখী শিস দিয়ে উঠল। তিনি বললেন, সে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে- তোমরা আমার মহামহিম প্রভুর মহিমা বর্ণনা কর। তিনি আরো বলেন, এক দশমাংশ কর সংগ্রহকারীকে কাকে অভিশাপ দেয়। আর চিলেরা বলে, আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কিছুই ধ্বংসশীল। ফিঙ্গে বলে, কম কথা বলার লোকেরা নিরাপদ। তোতাপাখি সতর্ক করে দেয়, পার্থিবতা যাদের লক্ষ্য, তাদের পরিণাম অশুভ। ভেক ও তার সঙ্গিনী বলে, বর্ণনা কর আমার সুমহান আল্লাহর পবিত্রতা।

মাকহুল র.'র বর্ণনায় এসেছে, একদা একটা তিতির পাখির ডাক শুনে হযরত সোলায়মান আ. তাঁর সহচরদেরকে বললেন, বুঝতে পারছ তিতিরটি কী বলছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, সে বলছে- الرحمن على العرش استوى 'দয়াময় আল্লাহ্ আরশে অধিষ্ঠিত।' ফরক্কদ সুবহীর বর্ণনায় এসেছে, বৃক্ষ শাখায় বসে একটি বুলবুলি এদিকে ওদিকে তার মস্তক আন্দোলিত করছিল, আর নিজের ভাষায় চিৎকার করছিল। হযরত সোলায়মান আ. সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, সে বলছে, আমি ভক্ষণ করেছি একটি শীষের অর্ধেক। এখন পৃথিবীর দায়িত্ব হল শূন্য অর্ধাংশ পূর্ণ করা।[৬৩২]

হযরত মুকাতিল র. থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত সোলায়মান আ. একস্থানে বসা ছিলেন। উপর দিয়ে একটি পাখি চিৎকার করে করে চলছিল। তিনি তাঁর সাথীগণকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এই পাখি কী বলছে জান? সাথীরা বলল, এ ব্যাপারে আপনিই ভাল জানেন। তিনি বললেন, পাখিটি আমাকে এই বলে সালাম দিচ্ছে- হে বাদশাহ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনাকে বনী ইস্রাঈলের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। আপনাকে সম্মান ভূষিত করা হয়েছে, আপনি শত্রুর উপর জয়ী হবেন। আমি আমার বাচ্চাদের নিকট যাচ্ছি। পুনরায় এপথ দিয়ে আসব। তিনি তার সঙ্গীদের বললেন, পাখিটি অচিরেই আবার আসবে, তোমরা অপেক্ষা কর। তারা অপেক্ষা করল, দেখল পাখিটি পুনরায় আসল। তখন তিনি সঙ্গীদেরকে বললেন, পাখিটি আমাকে সালাম দিয়ে

[৬৩২]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, বাংলা, খণ্ড-৯, পৃ. ২৯-৩০।

বলল, আপনি যদি ভাল মনে করেন, তাহলে আমাকে অনুমতি দিন আমি বাচ্চাদেরকে কিছু আহার দিয়ে আসি তারপর আপনার খেদমতে হাযির হব। এরপর আপনি যা বলবেন তাই হবে। সোলায়মান আ. পাখিটিকে অনুমতি দিলেন।[৬৩৩]

এক বর্ণনায় এসেছে, একবার একদল ইহুদী হযরত ইবনে আব্বাস রা.'র কাছে এসে বলল, আমরা আপনাকে সাতটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই। যদি আপনি প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারেন, তবে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। স্বীকৃতি দেব আপনার জ্ঞানবত্তাকে। ইবনে আব্বাস রা. বললেন, কৌতুহল নিবারণের জন্য প্রশ্ন করতে পার। জিগীর্ষার জন্য নয়। তারা বলল- ১. চণ্ডাল পাখি সুমিষ্ট সুরে কী বলে? ২. ব্যাঙের ডাকের অর্থ কী? ৩. মোরগের ডাকের অর্থ কী? ৪. গর্দভের গর্জনে কী অর্থ প্রকাশ পায়? ৫. অশ্বের হ্রেষাধ্বনির মর্মার্থ কী? ৬. তিতির পাখির গানে কী অর্থ হয় এবং ৭. জর্জরপক্ষীর কুজন কোন অর্থ বহন করে?

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, চণ্ডাল পাখি বলে, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ'র বংশধরগণের প্রতি ঈর্ষা পোষণকারীদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ কর। ভেক বলে, সেই উপাস্যই পবিত্রাতিপবিত্র, প্রোত্তাল পয়োধির গভীর অতলও যার স্মরণে সতত মুখর। কুক্কুট বলে, হে উদাসীন! আল্লাহকে স্মরণ কর। গর্দভের গর্জনে প্রকাশ পায়- হে আল্লাহ্! এক দশমাংশ ওশর সংগ্রাহকদের উপরে অভিশাপ বর্ষণ কর। সমর প্রতিযোগিতায় সমরাশ্যের হ্রেষারবে উচ্চারিত হয় 'সুব্বুহুন কুদ্দুসন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার রূহ।' জর্জর পাখি বলে হে জীবনোপকরণদাতা! তুমি প্রতিদিনের উপজীবিকা দাও প্রতিদিনে এবং তিতির পাখি বলে, আর রাহমানু আলাল আরশিস তাওয়া।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা.'র এভাবে নির্ভুল জবাবে ওই ইহুদীরা মুসলমান হয়েছিলেন। বাকী জীবন মুসলমান হিসাবে পরিচালিত করেন।[৬৩৪]

উল্লেখ্য যে, পশু-পাখির আওয়াযের অর্থসম্বলিত উপরে বর্ণিত বিবরণাবলী ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। ওই বিবরণ সমূহ দৃষ্টে একথা মেনে নেওয়া অত্যাবশ্যক নয় যে, তারা সব সময় এরূপ বলে। বরং বুঝতে হবে যে, তারা হয়তো কখনো কোন কারণে কোন বিশেষ সময়ে ওরকম করে বলে, তাদের সার্বক্ষনিক বুলি ওরকম নয়।[৬৩৫]

---

[৬৩৩]. তাফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড-৬, পৃ. ৪২৫, সূত্রঃ জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৬৭৮।

[৬৩৪]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, বাংলা, খণ্ড-৯, পৃ. ৩০-৩১।

[৬৩৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

দ্বিতীয় নিয়ামত হল– আল্লাহ্ তায়ালা বাতাসকে সোলায়মান আ.'র অনুগত করে দেন। বাতাসকে তিনি যেরূপ. আদেশ করতেন সেরূপ করত। মুহূর্তের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত তাঁর বিশাল সিংহাআসন ও সৈন্য-সামন্ত এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সহ আদেশ মতে বহন করে নিয়ে যেত। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ অর্থ: এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছি।[৬৩৬]

তাফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত সোলায়মান আ.'র সিংহাসন বাতাসে ভর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সোলায়মান আ. কাঠের একটি বিরাট ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পরিষদবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধাস্ত্রসহ এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটাকার বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসান তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হত, সেখানে পৌছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একমাসের দূরত্ব এবং দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একমাসের দূরত্ব অতিক্রম করত। অর্থাৎ একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায্যে অতিক্রম করা যেত।

ইবনে কাসীর হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রা. থেকে বর্ণনা করেন, সোলায়মান আ.'র সিংহাসনের উপর ছয় লক্ষ আসন স্থাপন করা হত। এগুলোতে তাঁর সাথে ঈমানদার মানুষ এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা উপবেশন করত। এরপর সমগ্র সিংহাসনের উপর ছায়াদান করার জন্যে পক্ষীকুলকে আদেশ করা হত, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট পেতে না হয়। পক্ষীকুল এসে সম্মিলিত ভাবে ডানা খুলে দিয়ে সিংহাসনের সাথে উপরে উড়তে থাকত। তারপর সিংহাসনকে বায়ু বহন করে নিয়ে গিয়ে আদেশ অনুযায়ী নামিয়ে দিত। বর্ণিত আছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে সোলায়মান আ. মাথা নত করে আল্লাহর যিকর ও শোকরে মশগুল থাকতেন। ডানে, বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করতেন।

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন– وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ আর আমি সোলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে একমাসের পথ অতিক্রম করত।

---

[৬৩৬]. সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮১।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ 'তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌছাতে চাইত'।[৬৩৭]

হযরত হাসান বসরী র. বলেন, সোলায়মান আ.'র আমলের প্রতিদানে বায়ুকে তাঁর অধীনস্থ করে দেয়া হয়েছিল। একদিন তিনি অশ্ব পরিদর্শনে এতই মশগুল হয়ে পড়েন যে, আসরের নামায কাযা হয়ে যায়। এই অমনোযোগিতার কারণ ছিল অশ্ব। তাই এই কারণ ধ্বংস করার উদ্দেশ্য তিনি অশ্বসমূহ কোরবানী করে দিলেন। তাঁর শরীয়তে অশ্ব কোরবানী জায়েয ছিল। তিনি আল্লাহর ইবাদতের মহব্বতে যেহেতু তাঁর আরোহণের অশ্বগুলো আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী দিলেন সেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়ে আরোহণের জন্য তাঁকে আরো উত্তম বাহন দান করলেন।[৬৩৮]

নিম্নে কতিপয় তাঁর বুদ্ধিমত্ত্বার পরিচায়ক কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করতে প্রয়াস পাচ্ছি।

এক. হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, একদা দু'জন মহিলা তাদের দু'টি সন্তান ছিল। এক বাঘ এসে তাদের একজনের এক ছেলেকে নিয়ে গেল। মহিলা একজন অপরজনকে বলতে লাগল যে, তোমার ছেলেকে বাগে নিয়ে গেছে, এটি আমার ছেলে। তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। ফায়সালার জন্য তারা হযরত দাউদ আ.'র কাছে আসল। তিনি বয়স্ক মহিলার পক্ষে রায় দিলেন। যখন উভয় মহিলা দরবার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন সোলায়মান আ.'র সাথে তাদের সাক্ষাত হল। তারা তাঁকে দাউদ আ.'র ফায়সালা শুনাল। তখন তিনি বললেন, একটি ছুরি আন, আমি এই বাচ্চাকে দু'টুকরা করে দু'জনকে ভাগ করে দেব। কম বয়সী মহিলা বলল, আল্লাহ্ তায়ালা আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, আপনি এরূপ করবেন না, বাচ্চাটি ওকেই দিয়ে দিন। ওটা তারই বাচ্চা। তখন তিনি কম বয়সী মহিলার পক্ষে ফায়সালা দিলেন।[৬৩৯]

বাচ্চাটি তার সন্তান বলেই তাকে দু'টুকরা করার ভয়ে নিজের দাবী পরিত্যাগ করে এই প্রস্তাব দিয়েছিল। পক্ষান্তরে বয়স্কা মহিলা নিজের সন্তান নয় বলে দু'টুকরা করার সিদ্ধান্ত শুনে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হল না। তাই দেখে সোলায়মান আ. সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

---

৬৩৭. সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ৩৬।
৬৩৮. তাফসীরে কুরতুবী।
৬৩৯. মুসলিম শরীফ, খণ্ড-২, পৃ. ৫৮।

দুই. হযরত মুহাম্মদ বিন কা'ব কুরাযী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত সোলায়মান আ.'র খেদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করল যে, আমার এক প্রতিবেশী আমার উয চুরি করেছে। নামাযের সময় তিনি মসজিদে বক্তব্য রাখলেন আর বললেন, তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি প্রতিবেশীর উয চুরি করে মসজিদে প্রবেশ করেছে। তার মাথায় এখনো পলক লেগে আছে। একথা বলার সাথে সাথে চোর ব্যক্তি নিজের মাথা ঝুকিয়ে পলক ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল। তিনি বললেন, একে ধর, এই ব্যক্তিই তোমার জিনিস চুরি করেছে।[৬৪০]

মূলত তার মাথায় কোন পলক ছিলনা। চোর নিজের মনের সন্দেহে মাথা ঝাড়ার চেষ্টা করে ধরা পড়েছিল। এতে সোলায়মান আ.'র তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

তিন. আল্লামা আলূসী র. বর্ণনা করেন, বনী ইস্রাঈলে একজন আবেদাহ, জাহেদাহ মহিলা ছিল। তার সুন্দরী কয়েকজন দাসী ছিল। দাসীরা তাকে অপদস্ত করার উদ্দেশ্যে একবার তার লজ্জাস্থান আবৃত কাপড়ের উপর ডিমের সাদাপানি নিক্ষেপ করল যখন মহিলা সিজদায় ছিল। তারপর মহিলার বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আনল। মুকাদ্দামা হযরত দাউদ আ.'র দরবারে পেশ হল। তখনও ডিমের সাদা পানি তার কাপড়ে বিদ্যমান ছিল। হযরত দাউদ আ. তাকে রজম তথা পাথর নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন। কিন্তু সোলায়মান আ. বললেন, আগুন নিয়ে এসো এবং ঐ কাপড়ের পানিযুক্ত অংশ আগুনে জ্বালাও। যদি তা বীর্য হয় তবে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আর যদি ডিমের পানি হয় তবে তা একত্রিত হয়ে যাবে। যখন কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিল তখন দেখা গেল পানি একত্রিত হয়ে গেল। ফলে দাউদ আ. শাস্তি রহিত করে দিলেন আর সোলায়মান আ.কে অত্যন্ত মহব্বত করতে লাগলেন।[৬৪১]

তৃতীয় নিয়ামত হল- আল্লাহ্ তায়ালা হযরত দাউদ আ.'র ন্যায় হযরত সোলায়মান আ.'র জন্যও পক্ষীকুলকে অনুগত করে দিয়েছিলেন। তিনি একেক পক্ষীকে একেক দায়িত্ব সোপর্দ করেছিলেন। যে পক্ষীর দ্বারা যে কাজ সিদ্ধ হয় তাকে সেই কাজের দায়িত্ব অর্পন করেন। পক্ষীকুলও তাঁর আদেশ মতে কাজ করত। এ ব্যাপারে বিস্তারিত পরে আসবে।

চতুর্থ নিয়ামত হল তিনি পৃথিবীর সব জীব-জন্তুর ভাষা বুঝতেন এবং সকলের সাথে বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন। যেমন কুরআনে বর্ণিত পিপিলিকা,

---

৬৪০. ইবনে আসাকির, খণ্ড-২২, পৃ. ২৮০, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৬৮৪।
৬৪১. তাফসীরে রূহুল মায়ানী, খণ্ড-১৮, পৃ. ৭৪, সূত্র: প্রাগুক্ত।

হুদহুদ পাখি ও তাঁর দাওয়াতে সামুদ্রিক বিশাল মাছের সাথে কথোপোকথন করেছিলেন তিনি। এগুলো আপন স্থানে বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

পঞ্চম নিয়ামত হল– আল্লাহ্ তায়ালা হযরত সোলায়মান আ.'র জন্য তামার ন্যায় শক্ত ধাতুকে পানির ন্যায় তরল পদার্থে পরিণত করে দেন, যা প্রস্রবণের ন্যায় প্রবাহিত হত এবং উত্তপ্তও ছিল। অনায়সেই এর দ্বারা পাত্রাদি তৈরী করা যেত।

কাতাদাহ র. বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা ইয়েমনে সোলায়মান আ.'র জন্য রৌপ্যের একটি নদী প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। সুদ্দী বলেন, বিগলিত এই রৌপ্যের নদী মাত্র তিন দিন পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল। এর মধ্যেই সোলায়মান আ. প্রাসাদ নির্মাণের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ রৌপ্য সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।[৬৪২]

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ইয়ামনে অবস্থিত এই প্রস্রবণের দূরত্ব অতিক্রম করতে তিন দিন তিন রাত্রি লাগত। মুজাহিদ বলেন, ইয়ামনের সান'আ থেকে এই প্রস্রবণ শুরু হয়ে তিনদিন তিন রাত্রির পথ পর্যন্ত পানির ন্যায় প্রবাহিত ছিল।[৬৪৩]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন– وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ 'আর আমি সোলায়মানের জন্য গলিত তামার এক ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম'।[৬৪৪]

ষষ্ঠ নিয়ামত হল- আল্লাহ্ তায়ালা জিন জাতিকেও তাঁর অধীনস্থ করে দিয়েছিলেন। জিনরা তাঁর খেদমতে মশগুল থাকত। কোন জিন তাঁর অবাধ্য হতে পারত না। কেউ অবাধ্য হলে তাদেরকে আগুনের দুররা দিয়ে বেত্রাঘাত করা হত।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ . يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ অর্থ: কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি জ্বলন্ত অগ্নির–শাস্তি আস্বাদন করাব। তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত।[৬৪৫]

[৬৪২]. ইবনে কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮৮১, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৬৮৩।
[৬৪৩]. কুরতুবী।
[৬৪৪]. সূরা সাবা, আয়াত: ১২।
[৬৪৫]. সূরা সাবা, আয়াত: ১২–১৩।

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ অর্থ: এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতককে, যারা তাঁর জন্যে ডুবুরীর কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম।[৬৪৬]

জ্বিনরা সোলায়মান আ.'র ইচ্ছে অনুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কার্য, হাউজ সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেক নির্মাণ করত। তিনি শ্বেত মমর পাথর দিয়ে তৈরী করিয়েছিলেন সুরক্ষিত দুর্গ, নগর-প্রাকার ও অনেক বসতবাটি। বনী ইস্রাঈলেরা ছিল বারটি গোত্রে বিভক্ত। তাদের প্রত্যেক গোত্রের জন্য তিনি জ্বিনদের দ্বারা নির্মাণ করিয়ে নিলেন পৃথক পৃথক সুরক্ষিত নগরী। জ্বিনদের একেক দলের উপর একেকটি দায়িত্ব ছিল। কেউ খনি থেকে পাথর তুলত, কেউ তুলত সোনা-রূপা। কেউ সমুদ্রাভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করে আনত মণি-মুক্তা। কেউ আনত মেশক আম্বর ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য। এভাবে সবগুলো নির্মাণ সামগ্রী মিলে হয়ে গেল বিশাল স্তুপ। সেগুলো গণনা বা পরিমাপ করার সাধ্য কারো ছিল না।[৬৪৭]

সোলায়মান আ. জ্বিনদের দ্বারা তাঁর বিশাল আকারের প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এ প্রাসাদের দৈর্ঘ্য ছিল বাহাত্তর মাইল। এটি নির্মাণ করা হয়েছিল সম্পূর্ণ প্রস্তর দ্বারা। তার উপর আস্তর করা হয়েছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের দ্বারা এবং তার উপর নানা প্রকার মণি-মুক্তা দ্বারা নক্শা করা হয়েছিল।

তাঁর মূল প্রাসাদ ছাড়াও তিনি তাঁর স্ত্রীদের এবং দাসীদের জন্য বহু সংখ্যক কক্ষ বিশিষ্ট একটি প্রাসাদও নির্মাণ করিয়েছিলেন। এ প্রাসাদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছিল চব্বিশ মাইল।

তাঁর সিংহাসন ছিল ছয় মাইল দীর্ঘ ও সমপরিমাণ প্রস্থ। হস্তীদন্ত, ফিরোজা, জমরদ এবং মারওয়ারিদ প্রভৃতি মূল্যবান পাথর সমূহের দ্বারা এটি তৈরী ছিল। সিংহাসনের স্তম্ভসমূহ নির্মাণ করা হয়েছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের ইস্টক দ্বারা। সিংহাসনের কোন কোন জায়গায় কতকগুলো কৃত্রিম গাছ নির্মাণ করা হয়েছিল। তার শাখাগুলো ছিল স্বর্ণ দ্বারা ও পাতাগুলো ছিল সবুজ বর্ণের জমরদ পাথর দ্বারা তৈরী। ঐসকল গাছের শাখায় শাখায় মূল্যবান পাথর দ্বারা অসংখ্য তোতা ও ময়না পাখি তৈরী করা হয়েছিল। সিংহাসনের ডানে ও বামে পাথরের তৈরী দুটি বিরাট বাঘমূর্তি স্থাপিত ছিল।

শাহী মহলের পার্শ্ব হতে কতকগুলো কৃত্রিম স্রোতস্বিনী খনন করে তার উভয় তীরে বিভিন্ন প্রকার মনোরম ফুল ও ফলের গাছ রোপন করে দেয়া হয়েছিল।

[৬৪৬]. সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮২।
[৬৪৭]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, বাংলা, খণ্ড-৯, পৃ. ৫১৮-৫১৯।

গাছগুলো সব সময় ফুলে-ফলে সুশোভিত থাকত। ঐ গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আবার বসে আরাম এবং মুক্ত বায়ু সেবন করার জন্য মূল্যবান স্নিগ্ধ শীতল পাথর দ্বারা বেশ কিছু সংখ্যক আসন তৈরী করা হয়েছিল।[৬৪৮]

সপ্তম নিয়ামত যা আল্লাহ তায়ালা হযরত সোলায়মান আ.কে দিয়েছিলেন, তা হল বিশেষ জ্ঞান, যা দ্বারা তিনি জটিল বিষয়ও সহজে ফয়সালা করতে পারতেন। তাঁর পিতা কতৃক ফায়সালাকৃত অনেক বিচার তিনি পুনবিচার করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এ ধরণের একটি ফায়সালার কথা হযরত দাউদ আ.'র জীবনোলোচনায় বর্ণিত হয়েছে।

বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণঃ

ইমাম বগভী র. বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের নির্মাণ কার্য শুরু করেছিলেন হযরত দাউদ আ.। মসজিদের প্রাচীর যখন মানুষ সমান নির্মাণ করা হল, তখন প্রত্যাদেশ এলো, হে দাউদ! তোমার মাধ্যমে এই মসজিদের নির্মাণ কর্ম সমাপ্ত হওয়া আমার অভিপ্রায় নয়। তোমার উত্তরসূরী সোলায়মানকে আমি দান করব নবুয়ত ও সাম্রাজ্যাধিকার। আর সে-ই সু-সম্পন্ন করবে এই মসজিদের নির্মাণ কার্য। এর কিছুকাল পরেই হযরত দাউদ আ. ইন্তেকাল করলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত সোলায়মান আ. এবং তিনিই সু-সম্পন্ন করলেন বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদের নির্মাণ পর্ব। এতে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন শুভ-অশুভ উভয় প্রকার জ্বিনকে। কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন তিনি তাদেরকে। তাদের কাজের প্রকৃতিও ছিল বিভিন্ন রকম। আর মসজিদ নির্মাণে ব্যবহৃত শ্বেত মর্মর পাথরগুলো তিনি তাদেরকে দিয়ে উত্তোলন করিয়েছিলেন খনি থেকে।

এরপর স্থপতি ও প্রকৌশলীদেরকে ডেকে আনা হল। তারা পাথরগুলোকে মসৃণ ও নির্দিষ্ট পরিমাপের করে নিল। মণি-মুক্তা দিয়ে অংকন করিয়ে নিল বিভিন্ন রকমের নয়নাভিরাম নকশা। দেয়াল ও মেঝে শ্বেত ও পীত বর্ণের মর্মর পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হল। মেঝেতে বিছিয়ে দেয়া হল ফিরোজা বর্ণের গালিচা। এভাবে এক সময় সমাপ্ত হল নির্মাণ কর্ম। দেখা গেল বায়তুল মুকাদ্দাসের মত চিত্তাকর্ষক প্রাসাদ তৎকালীন পৃথিবীতে আর একটিও নেই। ঘোর অন্ধকার রাতেও মসজিদটি সমুদ্ভাসিত হতে লাগল পূর্ণিমার চাঁদের মত। হযরত সোলায়মান আ. বনী ইস্রাঈলদের বিদ্বান ও সুধী সমাবেশে ঘোষণা করলেন, আমি এই সুদৃশ্য মসজিদ ভবনটিকে নির্মাণ করিয়েছি কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে, এর বাইরে ও ভিতরের সমস্ত কিছু একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

[৬৪৮]. মাওলানা তাহের সূরাটী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪৩৮–৪৩৯।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ সমাপনের পর সোলায়মান আ. আল্লাহর সকাশে তিনটি বিষয়ের জন্য দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন দু'টি। সম্ভবতঃ তৃতীয়টিও। ওই তিনটি বিষয় হচ্ছে– ১. আল্লাহ্ যেন তাঁকে দান করেন প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব, যাতে যে কোন জটিলতার সমাধানে তিনি গ্রহণ করতে পারেন ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত। ২. তাঁর সকল সিদ্ধান্ত যেন আল্লাহর অনুকূলে হয়। ৩. তাঁকে যে বিশাল সাম্রাজ্য দেওয়া হয়েছে, এরকম সাম্রাজ্য যেন ভবিষ্যতে আর কেউ না পায়।

তিনি আরো নিবেদন করেছিলেন যে, হে আল্লাহ্! যে আমার এই মসজিদে দুই রাকাত নামায আদায় করবে, তাকে তুমি সদ্যজাত শিশুর মত নিষ্পাপ করে দিও। আমি আশা করি, আল্লাহ্ তাঁর, এই নিবেদনটিও কবুল করে নিয়েছেন।

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, স্বগৃহে পঠিত নামাযের পূণ্য একগুণ। সাধারণ মসজিদে পঠিত নামাযের পূণ্য পঁচিশ গুণ। জামে মসজিদে পাঁচশ গুণ। মসজিদে আকসায় এক হাজার গুণ, আমার এই মসজিদে পঞ্চাশ হাজার গুণ এবং কা'বা গৃহে এক লক্ষ গুণ।[৬৪৯]

হযরত সাঈদ ইবনে মূসাইয়্যেব র. থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন সোলায়মান আ. বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করলেন তখন বনী ইস্রাঈল থেকে দশ হাজার আসমানী গ্রন্থপাঠক নির্বাচিত করেন। পাঁচ হাজার পাঠক দিনে আর পাঁচ হাজার পাঠক রাতে আল্লাহর কালাম পাঠ করতেন তাতে। ৪৫৩ বছর পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাস হযরত সোলায়মান আ.'র ভিত্তির উপর অটুট ছিল। অত:পর বখতনসর যালিম বাদশাহ বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে তছনছ করে দিল। তার মধ্যস্থ স্বর্ণ-রৌপ্য ও অন্যান্য মূল্যবান মণিমুক্তা লুট করে ইরাকে নিয়ে গিয়েছিল। বখতনসরের মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় সত্তর বছর বায়তুল মুকাদ্দাস এই অবস্থায় ছিল।[৬৫০]

হযরত সোলায়মান আ.'র ঘোড়ার ঘটনাঃ

হযরত সোলায়মান আ. দ্বিপ্রহরের নামাযের পর তাঁর জন্য নির্ধারিত আসনে সমাসীন হলেন। তাঁকে দেখানোর জন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতকৃত উন্নতমানের ঘোড়াগুলো তাঁর সামনে নিয়ে আসা হতে লাগল। এভাবে নয় শত ঘোড়া দেখার পর তাঁর আসরের নামাযের কথা মনে পড়ল। দেখলেন, সূর্য ততক্ষণে অস্তমিত

[৬৪৯]. ইবনে মাজাহ, কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, বাংলা, খণ্ড-১, পৃ. ৫৯৮–৫৯৯।
[৬৫০]. তফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড-৭, পৃ. ৩২৩, সূত্রঃ জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৬৮৫।

হয়েছে। নামাযের সময় আর নেই বলে তাঁর মন:ক্ষুন্ন হলেন। তখন তিনি ভাবলেন, এই ঘোড়াগুলোর চিত্তহারী সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার কারণেই যেহেতু আসরের নামায কাযা হয়ে গেল, সেহেতু সেগুলোকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরবানী করাই শ্রেয়। একথা ভেবেই তিনি তাঁর অনুচর বর্গকে আদেশ দিলেন, ওই ঘোড়াগুলোকে পুনরায় আমার কাছে নিয়ে এসো। ঘোড়াগুলো আনা হলে তিনি অশ্বগুলোর পদসমূহ ও কণ্ঠদেশ কর্তন করে দিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর স্মরণচ্যুতির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার ক্ষতিপূরণ, আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশা এবং তাঁরই পরিতোষার্জনের উদগ্র অনুরাগ।

ডুবন্ত সূর্য পুন: উদিত হওয়া:

ইমাম যুহুরীর বর্ণনায় এসেছে, হযরত আলী রা. বলেছেন, হযরত সোলায়মান আ. ঘোড়াগুলোর পা ও গর্দান কর্তনের পর সূর্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন অস্তমিত সূর্যকে পুন:রায় ফিরিয়ে আন, যেন আমি আসরের নামায আদায় করতে পারি। ফেরেশতারা তাই করল এবং তিনি সময়মত আসরের নামায আদায় করে নিলেন।[৬৫১]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. অর্থ: যখন তার সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হল, তখন সে বলল: আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের স্মরণে বিস্মৃত হয়ে সম্পদের মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি–এমনকি সূর্য ডুবে গেছে।[৬৫২]

হযরত সোলায়মান আ.'র পরীক্ষা:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. অর্থ: আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অত:পর সে রুজু হল। সোলায়মান বলল: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে মাফ

[৬৫১]. কাযী ছানা উল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-১০, পৃ. ১৮৭-১৮৮।

[৬৫২]. সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ৩১–৩২।

করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌছাতে চাইত। আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিলাম অর্থাৎ, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকত শৃঙ্খলে।[৬৫৩]

এই পরীক্ষাটি কী ছিল তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, একদিন সোলায়মান আ. বললেন, আজ রাতে আমি আমার নিরান্নব্বই জন স্ত্রীর সাথে অন্য বর্ণনায় একশত জন স্ত্রীর সাথে সহবাস করব। ফলে প্রত্যেকের গর্ভে জন্মলাভ করবে একজন করে নিপুণ অশ্বারোহী মুজাহিদ। ফেরেশতাগণ একথা শুনে বললেন, 'ইনশাআল্লাহ্' বলবেন। কিন্তু তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলতে ভুলে গেলেন। সে কারণেই সে রাতে তিনি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া সত্ত্বেও কেউ গর্ভ ধারণ করলনা। গর্ভবতী হল কেবল একজন। সে কিছুকাল পর জন্ম দিল একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিহীন শিশু। শপথ, সেই পবিত্রতম সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, তিনি যদি 'ইনশাআল্লাহ' বলতেন, তবে তাঁর পত্নীগণ সকলেই সে রাতে গর্ভধারণ করতেন এবং যথাসময়ে তাঁদের উদর থেকে জন্মলাভ করত এক একজন সুদক্ষ অশ্বারোহী ধর্মযোদ্ধা।[৬৫৪]

উল্লেখ্য যে, ওই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিহীন নবজাতককে ধাত্রী নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছিল হযরত সোলায়মান আ.'র সিংহাসনে। সে দিকে ইঙ্গিত করেই উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, 'তার আসনের উপর রাখলাম একটি ধড়।'

তিনি তা দেখামাত্র বুঝতে পারলেন তাঁর ভুল এবং ভবিষ্যতের জন্য তিনি সাবধান হলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, আর কখনো 'ইনশাআল্লাহ' বলা পরিত্যাগ করবেন না।

তিবরানী তাঁর 'আল আউসাত' গ্রন্থে এবং ইবনে মারদুবিয়া শিথিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু হোরায়রা রা. বলেছেন, সোলায়মান আ.'র একপুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। জ্বিনেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল, এই শিশু যদি জীবিত থাকে, তবে পরবর্তী সময়ে এর জবরদস্তীমূলক আনুগত্য থেকে আমরা কিছুতেই রেহাই পাব না। তাই আমাদের উচিত, একে হত্যা করা অথবা পাগল

[৬৫৩]. সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ৩৪–৩৮।

[৬৫৪]. বুখারী-মুসলিম।

বানিয়ে দেওয়া। সোলায়মান আ. তাদের এই দুরভিসন্ধির কথা জানতে পারলেন। তাই শিশুটিকে তিনি লুকিয়ে রাখলেন মেঘপুঞ্জের ভিতর। পরে হঠাৎ একদিন দেখলেন, তাঁর সিংহাসনে পড়ে রয়েছে শিশুটির মৃত দেহ। এটাই ছিল তাঁর জন্য পরীক্ষা, কেননা তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহর উপরে সম্পূর্ণ ভরসা করেননি।[৬৫৫]

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক সূত্রে বাগবী লিখেছেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, হযরত সোলায়মান আ. ছিলেন জল-স্থলের একচ্ছত্র বাদশাহ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা ছিলো তাঁর অনুগত। একদিন তিনি জানতে পারলেন, সম্পূর্ণরূপে দুর্গম সমুদ্রবেষ্টিত সায়দুন নামক এক দ্বীপরাজ্য স্বাধীনভাবে শাসন করে চলেছে এক বিধর্মী রাজা। বাতাস ছিলো হযরত সোলায়মানের নির্দেশানুগত। তাই তিনি একদিন বাতাসবাহী সিংহাসনে সমারূঢ় হয়ে বহুসংখ্যক লোকলস্কর ও জ্বিন সঙ্গে নিয়ে গমন করলেন ওই রাজ্যে। সেখানকার রাজাকে কতল করে গণিমতরূপে লাভ করলেন দ্বীপরাজ্যটির সকল ধনসম্পদ। আরো পেলেন রূপসী রাজকন্যা জারাদাহকে। তাকে আহ্বান জানালেন সত্য ধর্মের দিকে। রাজকন্যা জারাদাহ্ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে আহ্বান কবুল করলো। হযরত সোলায়মান আ. তখন তাকে পরিণয়াবদ্ধ করলেন। তাকে ভালোও বাসতে শুরু করলেন অন্য রাণীদের চেয়ে বেশী। তৎসত্ত্বেও জারাদাহ্ দিনাতিপাত করতো বিষণ্নচিত্ত হয়ে। চোখ থাকতো সারাক্ষণ অশ্রুসজল। তাই নবী সম্রাট সোলায়মান আ. একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, কী কারণে তুমি এতো কষ্ট পাও? জারাদাহ্ বললো, সম্রাটপ্রবর! আমার প্রয়াত পিতা ও তার রাজত্বের কথা যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। তিনি বললেন, কেনো, তুমি তো এখন তার চেয়ে অনেক বিশাল সাম্রাজ্যের স্বনামধন্যা সম্রাজ্ঞী। তদুপরি তুমি পেয়েছ সত্য ধর্মের পরিচয়। এই নেয়ামত তো অতুলনীয়। জারাদাহ্ বললো, সে কথা সত্যি। তবুও পিতার কথা মনে হলে আমি হয়ে পড়ি শোকাকুলা। তাই আমার মিনতি, আপনি জ্বিনদেরকে দিয়ে আমার পিতার একটি মূর্তি তৈরী করিয়ে দিন। আমি সকাল-সন্ধ্যা ওই মূর্তির দিকে তাকালে হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজে পাবো।

হযরত সোলায়মান আ. শিল্পী জ্বিনদেরকে হুকুম করলেন, যতো তাড়াতাড়ি পারো নিখুঁতভাবে সম্রাজ্ঞী জারাদাহের পিতার মূর্তি নির্মাণ করে দাও। জ্বিনেরা হুকুম পালন করলো। জারাদাহ্ তাজ্জব হয়ে দেখলো, মূর্তিটি অবিকল তার বাপের মতো। সে তখন মূর্তিটিকে বস্ত্রাবৃত করলো। মাথায়-বেঁধে দিলো উষ্ণীষ। তার বাপ যেভাবে যে কাপড়ে সাজতো, মূর্তিটিকে সেভাবেই সাজিয়ে

৬৫৫. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি, তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-১০, পৃ. ১৮৯।

দিলো সে। হযরত সোলায়মান আ. যখন তার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন তখন সে দাস-দাসীদেরকে নিয়ে মূর্তির সামনে উপস্থিত হতো। সকাল-সন্ধ্যায় সেটিকে সেজদা করতো। দাস-দাসীদেরকেও এরকম করতে বলতো। এভাবে হযরত সোলায়মানের ঘরেই শুরু হলো মূর্তিপূজা। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি এসব কিছু জানতেই পারলেন না। এ সম্পর্কে প্রথম অবহিত হলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আসফ ইবনে বরখিয়া। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ছিলো তাঁর অবাধ যাতায়াত। তাই মূর্তিপূজার ব্যাপারটি প্রথম অবলোকন করেন তিনিই। সম্রাটকে ডেকে বলেন, আমি এখন শিথিল অস্থিগ্রন্থিসম্পন্ন পরকালাভিমুখী এক বৃদ্ধ। এখন আমার মনে সাধ জেগেছে, জনসমাবেশে আল্লাহ্র নবী-রাসূলগণের বৈশিষ্ট্যাবলীর সম্যক বিবরণ দেই। তাঁদের সম্পর্কে লোকে যা জানে না, তা বলি। হযরত সোলায়মান আ. বললেন, ঠিক আছে। তাই হবে। তিনি তখন লোকজনকে সমবেত হতে বললেন। সকলে সমবেত হলে আসফ বক্তৃতা করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। জনসমক্ষে দিতে শুরু করলেন পূর্ববর্তী যুগের নবীগণের বিভিন্ন গুণবত্তার বিবরণ। শেষে এলো বর্তমান নবী সোলায়মান প্রসঙ্গ। তাঁর প্রসঙ্গে বললেন, সম্রাট সোলায়মানও আল্লাহ্র নবী। বাল্যবেলায় তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ও সহিষ্ণু। তখন তিনি সংযমীও ছিলেন। আর আদেশ দান করতেন বিজ্ঞতার সঙ্গে। নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকেও থাকতেন অনেক দূরে। হযরত সোলায়মান আ. বললেন, আসফ! তুমি তো কেবল আমার বাল্যবেলার কথাই বললে। আমার পরিণত বয়সের কথা কিছুই বললে না। পরে অন্দর মহলে নিয়ে জানালেন তাঁর অসন্তোষের কথা। আসফ বললেন, সম্রাটপ্রবর কি জানেন, একটি নারীর রূপমুগ্ধ হওয়ার কারণে তার ঘরে চল্লিশ দিন ধরে চলেছে প্রতিমাপূজা? তিনি বললেন, কী বলছো তুমি? আমার ঘরে? আসফ বললেন, হ্যাঁ, আপনারই ঘরে। তিনি উচ্চারণ করলেন 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন'। বুঝতে পারছি, তুমি না জেনে শুনে কিছুই বলোনি। একথা বলেই তিনি জারাদাহের ঘরে গেলেন। মূর্তিটি ভেঙ্গে চুরমার করলেন। জারাদাহকে দিলেন কঠিন শাস্তি। তারপর রাজ পোশাক খুলে পরলেন সাধারণ পোশাক, যার সুতা কেটেছিলো ও বয়ন করেছিলো কুমারী মেয়েরা এবং যা প্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারী-পুরুষ দ্বারা ইতোপূর্বে স্পর্শিতও হয়নি। ওই পোশাক পরে তিনি চলে গেলেন জঙ্গলে। সেখানে চুলার ছাই দিয়ে নির্মাণ করলেন বিছানা। তারপর ওই ভস্মশয্যার উপরে লুটিয়ে পড়লেন সেজদায়। ডুকরে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন মহামহিম আল্লাহ্র সমীপে। দিবাবসান হলে সাশ্রুনয়নে স্বআবাসে ফিরে এলেন আল্লাহ্র নবী হযরত সোলায়মান আ.।

এরপর মহাবিপদ দেখা দিলো অন্য দিক থেকে। তাঁর ছিলো এক অতি বিশ্বস্ত ক্রীতদাসী। নাম তার আমিনা। ওই আমিনার কাছেই তিনি গচ্ছিত রাখতেন তাঁর নাম খচিত রাজকীয় মোহরাঙ্কিত আংটি, যখন যেতেন শৌচাগারে অথবা কোনো রাণীর একান্ত সন্নিধানে। প্রয়োজন পূরিত হবার পর পাকপবিত্র হয়ে ওই আংটিটি পুনরায় পরিধান করতেন হাতে। অর্থাৎ অপবিত্র শরীরে ওই আংটিটি তিনি পরিধান করতেন না। একদিন তিনি আংটিটি আমিনার হাতে দিয়ে প্রবেশ করলেন শৌচাগারে। একটু পরে আমিনার সামনে হযরত সোলায়মানের আকৃতি ধরে আবির্ভূত হলো সখর নামের এক সামুদ্রিক জ্বিন। তাকে দেখেই আমিনা আংটিটি দিয়ে দিলো। বুঝতেই পারলো না যে, তিনি হযরত সোলায়মান আ. নন। সখর আংটিটি সঙ্গে সঙ্গে হাতে পরে নিলো। গিয়ে বসলো রাজসিংহাসনে। দরবারে যথারীতি সমবেত হলো মানুষ, জ্বিন ও বিহঙ্গবাহিনী। সকলেই মনে করতে লাগলো, ইনিই মহামান্য সম্রাট সোলায়মান আ.। ওদিকে শৌচাগার থেকে পবিত্র হয়ে বেরিয়ে এলেন হযরত সোলায়মান আ.। তাঁকে দেখেই হতচকিত হলো আমিনা। কিন্তু তার মনে হলো, এ লোক আসল সোলায়মান নন। বললো, কে তুমি? তিনি বললেন, আমি সোনায়মান ইবনে দাউদ। আমিনা বললো, তুমি মিথ্যাবাদী। তিনি তো একটু আগেই তাঁর আংটিটি নিয়ে গিয়েছেন। তিনি এখন স্বসিংহাসনে সমারূঢ়। তাদের কথা কাটাকাটি শুনতে পেয়ে সমবেত হলো অন্দর মহলের লোকেরা। তাদের কাছেও মনে হলো, এ লোক কিছুতেই সোলায়মান ইবনে দাউদ নন। তিনি বুঝতে পারলেন, এবার শুরু হলো তাঁর ভুলের শাস্তি। তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে গেলেন। বনী ইসরাঈল জনতার দ্বারে দ্বারে গিয়ে বললেন, আমিই সোলায়মান ইবনে দাউদ। লোকে মনে করলো, তিনি পাগল। তাই দেখামাত্র তাড়িয়ে দিতে লাগলো তাঁকে। কেউ ঢিল ছুঁড়তে লাগলো। কেউ দিতে লাগলো গালি। বলাবলি করতে লাগলো, দ্যাখো, দ্যাখো। এই পাগলের কাণ্ড দেখে যাও। সে নাকি দাউদপুত্র সোলায়মান। বেগতিক দেখে তিনি লোকালয় ছেড়ে চলে গেলেন সমুদ্রের দিকে। সেখানে চাকরী নিলেন এক মৎস্য ঠিকাদারের অধীনে। তিনি তার মাছের বোঝা বাজারে পৌঁছে দিতেন। মজুরী হিসেবে পেতেন দু'টি মাছ। একটি মাছ আগুনে সেঁকে নিতেন। অপরটি দিয়ে কিনতেন একটি রুটি। দিনের পর দিন ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করতে লাগলেন এভাবে। চল্লিশ দিন তাঁর ঘরে মূর্তিপূজা হয়েছিলো বলে এভাবেই তাঁকে বয়ে বেড়াতে হলো মহাবিড়ম্বনা।

ওদিকে রাজদরবারের নিয়মের পরিবর্তন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠলো আসফ ও অন্যান্য বনী ইসরাঈল দরবারীদের চোখে। আসফ দরবারীদেরকে একান্তে

ডেকে বললেন, তোমরা কি লক্ষ্য করেছো, রাজদরবারের রীতিপ্রকৃতি আর আগের মতো নেই? তারা বললো, হ্যাঁ। সবকিছু যেনো কেমন হয়ে গিয়েছে। আসফ তখন সাক্ষাত করলেন রাজমহিষীগণের সঙ্গে। বললেন, আমরা তো দেখছি রাজা ও রাজদরবার কেমন যেনো বিশৃঙ্খল। আপনারা তেমন কিছু লক্ষ্য করেছেন কী? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। আমরাও তো ভেবে পাচ্ছিনা এমন হচ্ছে কেনো? রাজা যে আমাদেরকে ঋতুবর্তী অবস্থাতেও রেহাই দেয় না। অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য ফরয গোসলও করে না। আসফ উচ্চারণ করলেন 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন'। নিঃসন্দেহে এ যে এক সাংঘাতিক পরীক্ষা। চল্লিশ দিন গত হওয়ার পর শয়তান সখরের কারসাজি এভাবে ধরা পড়লো সকলের দৃষ্টিতে। সকলেই তাকে চিনতে পেরেছে দেখে সখর আর রাজ প্রাসাদে তিষ্ঠাতে পারলো না। পালিয়ে গেলো সমুদ্রের দিকে। হাতের আংটিটি খুলে ফেলে ছুঁড়ে মারলো সমুদ্রের অথৈ পানিতে। সঙ্গে সঙ্গে আংটিটি গিলে ফেললো একটি সামুদ্রিক মাছ। মাছটি আবার ধরা পড়লো এক জেলের জালে। মৎস্য ঠিকাদার অন্য মাছের সঙ্গে সেটিকে কিনে নিলো। সারাদিন কাজ করার পর হযরত সোলায়মান আ. মজুরী হিসেবে ওই মাছটি পেলেন আর একটি সাধারণ মাছের সঙ্গে। সাধারণ মাছটির বিনিময়ে খরিদ করলেন রুটি। আর ওই মাছটি সেঁকে নেওয়ার আগে তার পেট চিরে ফেলতেই পেলেন হারানো আংটিটি। সাথে সাথে সেটি হাতের আঙ্গুলে পরলেন। রাজমহিমাও প্রকাশ পেতে শুরু করলো তৎক্ষণাৎ। তিনি রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। পূর্বের মতো রাজানুগত হয়ে দরবারে আগমন করলো বাধ্যানুগত মানুষ, বশীভূত জ্বিন ও একান্ত অনুরক্ত পক্ষীকুল। হযরত সোলায়মান আ. পুনঃপুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা করতে লাগলেন। প্রকাশ করতে লাগলেন আল্লাহর সকৃতজ্ঞ মহিমা ও পবিত্রতা। জ্বিনদেরকে নির্দেশ দিলেন, দুরাচার সখরকে এক্ষুণি ধরে নিয়ে এসো। তারা যথারীতি নির্দেশ পালন করলো। গভীর সমুদ্র থেকে ধরে নিয়ে এলো সখরকে। তিনি একটি প্রস্তরখণ্ডে গর্ত করে তার ভিতর ঢোকালেন তাকে। তারপর ওই গর্তের উপরে আর একটি প্রস্তরখণ্ড রেখে লোহা ও রাং দিয়ে আটকে দিলেন শক্ত করে। তারপর আদেশ করলেন, প্রস্তরবন্দী সখরকে এবার ফেলে দাও সমুদ্রের গভীর অতলে। ওহাব কর্তৃক বর্ণিত আনুপূর্বিক ইতিবৃত্তটি এরকমই।

সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, হযরত সোলায়মানের স্ত্রী ছিলো একশতজন। তাদের একজনের নাম ছিলো জারাদাহ্। সে ছিলো তাঁর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়ভাজন ও বিশ্বস্ত। তাই তার কাছেই তিনি প্রয়োজন দেখা দিলে আংটিটি গচ্ছিত রাখতেন। একদিন জারাদাহ্ বললো, মহামান্য সম্রাট! আমার ভাইয়ের সঙ্গে অমুক লোকের ঝগড়া বিবাদ আছে। সুতরাং আমার ভাই মোকদ্দমা নিয়ে হাজির হলে আপনি

যেনো তার পক্ষে আপনার সদয় সিদ্ধান্ত দান করেন। তিনি বললেন, আচ্ছা। কিন্তু কার্যত: তিনি তাঁর এ অঙ্গীকার পালন করতে পারেননি। মহাবিপদে তিনি পতিত হয়েছিলেন সেকারণেই।

একদিন তিনি জারাদাহের কাছে মোহরাংকিত অঙ্গুরীয়টি রেখে শৌচাগারে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর আকৃতি ধরে এক জ্বিন উপস্থিত হলো জারাদাহের কাছে। জারাদাহ্ তাঁকে অঙ্গুরীয়টি দিয়ে দিলো। ওই জ্বিন অঙ্গুরীয়টি হাতে পরে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে বসলো সিংহাসনে। এদিকে শৌচাগার থেকে বেরিয়ে নবী সোলায়মান জারাদাহের কাছে গিয়ে বললেন, অঙ্গুরীয়টি দাও। জারাদাহ্ বললো, কী বলছেন আপনি! একটু আগেই তো আপনি অঙ্গুরীয়টি নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, অসম্ভব। পরক্ষণেই বুঝলেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। তিনি তাই আশ্রয় গ্রহণ করলেন নিভৃত প্রকোষ্ঠে। সেখানেও স্বস্তি না পেয়ে বেরিয়ে পড়লেন অজানার উদ্দেশ্যে। ওদিকে ওই জ্বিন শয়তান দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যশাসন করতে লাগলো। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে দেখা দিলো বিশৃঙ্খলা। জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রমাদ গুণলেন। সাধারণ জনতা এর কোনো কারণ ঠাহর করতে পারলো না। একদল বিচক্ষণ লোক সম্রাজ্ঞীদের সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, আপনারা বলুন তো কেনো এমন হচ্ছে? সম্রাটের নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা-সিদ্ধান্ত যে আগের মতো সুসঙ্গত নয়। ইনিই কি আমাদের স্বনামধন্য সম্রাট? যদি তাই হন, তবে তো আমাদের বলতেই হয় যে, তিনি এখন বুদ্ধিভ্রষ্ট। একথা শুনে সম্রাজ্ঞীরা কাঁদতে শুরু করলেন। বিচক্ষণ লোকেরা রাজমহল থেকে ফিরে এসে তওরাত শরীফ পাঠে মগ্ন হলেন। শয়তান সম্রাট বুঝতে পারলো, তার কারসাজি সকলের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে। তাই কোনোমতে চল্লিশ দিন এলোমেলোভাবে রাজ্য চালাবার পর সে বাধ্য হলো পালিয়ে যেতে। সমুদ্রের দিকে ঘোরাঘুরি করতে করতে একসময় তার অঙ্গুরীয়টি হাত ফসকে পড়ে গেলো সমুদ্রে। একটি মাছ সেটিকে গিলে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে। রাজ্যহারা নবী সোলায়মানও তখন মনের দুঃখে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সমুদ্রের পাড়ে। ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করে দিনাতিপাত করছিলেন প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে। তিনি একদল মৎস্য শিকারকে দেখতে পেয়ে বললেন, আমি ক্ষুধার্ত। আমাকে একটি মাছ দিতে পারো? আমি তোমাদের সম্রাট সোলায়মান। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একজন মৎস্যশিকারী তাঁর মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করলো। তাঁর মস্তক হয়ে গেলো রক্তাক্ত। সমুদ্রের পানিতে তিনি রক্ত ধুয়ে ফেলতে লাগলেন। অন্য মৎস্য শিকারীরা তখন দুষ্ট মৎস্য শিকারীটিকে ভর্ৎসনা করলো। নিতান্ত মমতাপরবশ হয়ে তাঁকে দান করলো দু'টো মাছ। তিনি মাছ দু'টো কাটতে গিয়ে একটি মাছের পেটে পেলেন তাঁর হারানো অঙ্গুরীয়টি। সঙ্গে

সঙ্গে পরে নিলেন হাতের আঙ্গুলে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে পেলেন হৃত রাজ্যাধিকার। আগের মতো আবার পূর্ণ অনুগত হয়ে গেলো মানুষ, জ্বিন ও পক্ষীবাহিনী। সকলেই বুঝতে পারলো, ইনিই হচ্ছেন আসল সোলায়মান। ভুল ধারণা ও অযথার্থ আচরণের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো সকলে। তিনি বললেন, তোমাদের কোনো দোষ নেই। যা ভাগ্যে ছিলো তাই ঘটেছে। এরপর নির্দেশ দিলেন, ওই দুরাচার জ্বিনটিকে এক্ষুণি আমার কাছে ধরে আনা হোক, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যেখানেই সে আত্মগোপন করুক না কেনো। সম্রাটের অনুজ্ঞা প্রতিপালিত হলো যথারীতি। তিনি ওই জ্বিনটিকে বন্দী করলেন একটি সিন্দুকের মধ্যে। তারপর তাতে শক্ত তালা এঁটে দিয়ে ফেলে দিলেন গভীর সমুদ্রে। সেখানেই সে বন্দী অবস্থায় এখনো জীবিত।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব র. বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত সোলায়মান আ. তিন দিন ধরে নির্জনে কাটালেন। তখন আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করলেন, তুমি তিন দিন ধরে আত্মগোপন করে রয়েছো, আমার বান্দাদের অভাব অভিযোগের প্রতি মোটেও দৃষ্টি দিচ্ছো না। উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌পাক তাঁর এমতো আচরণ পছন্দ করেননি বলে তাকে পরীক্ষায় নিপতিত করেছিলেন। এ কথাগুলোর আগে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব র. যথারীতি বিবৃত করেছেন মোহরাংকিত অঙ্গুরীয় এবং জ্বিন শয়তানের আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা। হাসান র. বলেছেন, আল্লাহ্ তখন এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, যাতে করে শয়তান তাঁর পত্নীগণের উপরে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বাগবীও এ সকল কিছু বর্ণনা করেছেন।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্'র বরাতে হযরত ইবনে আব্বাসের বিবৃতিরূপে আবদ ইবনে হুমাইদ, নাসাঈ ও ইবনে মারদুবিয়াও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে জারীর এই ঘটনাকে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্'র মতো সুদ্দীর সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের কতিপয় বর্ণনাসূত্রে একথাও এসেছে যে, জ্বিন সখর সিংহাসনে আরোহণ করার পর কেবল হযরত সোলায়মানের সত্তা ও তাঁর পত্নীগণ ব্যতীত অন্য সকল কিছুর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলো। হাসান সূত্রে বাগবীও এরকম ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আরো মন্তব্য করেছেন, আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাঁর প্রিয় নবীর পত্নীগণের উপরে শয়তানকে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দিবেন। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, মোহরাংকিত আংটি হারানো, শাহীমহলে মূর্তিপূজা এসকল কিছুই ইহুদীদের দুরভিসন্ধিমূলক রটনা।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হযরত সোলায়মান আ. যখন বিপদে পতিত হলেন, তখন দেখতে পেলেন মোহরাংকিত আংটিটি হঠাৎ

তাঁর হাত থেকে খুলে পড়ে গেল। আংটিটি উঠিয়ে নিয়ে পুনরায় হাতে পরলেন তিনি। কিন্তু আবার সেটি খুলে পড়ে গেলো। ওই আংটিই ছিলো তাঁর শাসনাধিকারের প্রতীক। তাই তিনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন যে, রাজ্যের শাসনাধিকার আর তার নেই। আসফও বললেন, সম্রাটপ্রবর! আপনি পরীক্ষায় নিপতিত। এ পরীক্ষা চলতে থাকবে চৌদ্দ দিন। তাই এই চৌদ্দদিন আপনি এ আংটি ধারণ করতে পারবেন না। একথা শুনেই হযরত সোলায়মান আ. দ্রুত গিয়ে আত্মগোপন করলেন ভূগর্ভস্থ এক গোপন প্রকোষ্ঠে। আংটিটি পরিধান করলেন আসফ এবং গিয়ে বসলেন রাজসিংহাসনে। তিনি ছিলেন অপ্রকৃত সম্রাট, ঠিক যেনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিহীন শরীর। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে এবং তার আসনের উপরে রাখলাম একটি ধড়'। অর্থাৎ ধড় অর্থ এখানে আসফ। উল্লেখ্য, আসফের রাজত্ব চলে চৌদ্দদিন ধরে। এই চৌদ্দ দিন তিনি সকল কিছু পরিচালনা করতেন হযরত সোলায়মান আ.'র অনুকরণেই। চৌদ্দদিন গত হলে তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। ফিরিয়ে দেন হযরত সোলায়মানের আংটি ও সিংহাসন।

আমার মতে ওয়াহাবের বিবরণ অযথার্থ। কেননা তা কোরআনের বক্তব্যের পূর্ণ অনুকূল নয়। তিনি বলেছেন, সায়দুন নামক সমুদ্র পরিবেষ্টিত ওই দ্বীপে বাতাসবাহী সিংহাসন নিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন তিনি। অথচ ওই সময় পর্যন্ত তিনি বাতাসের নিয়ন্ত্রণাধিকার পানইনি। পেয়েছিলেন বর্ণিত পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার পরে। পরবর্তী আয়াতদ্বয়ের বক্তব্য একথাটিকেই প্রমাণ করে। আর ওয়াহাব বর্ণিত ঘটনাটিকে যদি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনাও করা হয়, তবুও হযরত সোলায়মান আ.কে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে দায়ী করা যায় না। একথাও কিছুতেই বলা যায় না যে, পাপ সংঘটিত হয়েছে তাঁর দ্বারা। কেননা মূর্তি পূজা সকল নবীর শরীয়তে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শরীয়তে মূর্তি নির্মাণ করা অসিদ্ধ ছিলো না। আর রাণী জারাদাহ্ তো মূর্তিপূজা করতো তাঁর অগোচরে। সুতরাং তার জন্য তাঁকে দায়ী করা যেতে পারে না কিছুতেই।[৬৫৬]

হযরত সোলায়মান আ. মক্কা-মদীনা যিয়ারতঃ

হযরত কা'ব রা. থেকে বর্ণিত, একদা হযরত সোলায়মান আ. ইসতাখার থেকে ইয়েমনের দিকে ভ্রমণ করেন। মদীনাতুর রাসূল ﷺ দিয়ে গমন করার সময় তিনি বললেন, هذه دار هجرة النبى أخرالزمان طوبى لمن امـن بـه وطـوبى لـمن اتبعـه এই স্থানটি শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ'র হিজরতের স্থান। সৌভাগ্যবান সেই

৬৫৬. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-১০, পৃ. ১৯০-১৯৫।

ব্যক্তি যেই তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যেই তাঁর অনুসরণ করবে।

তিনি মক্কা দিয়ে গমণের সময় দেখলেন, কা'বা শরীফের চর্তুদিকে মূর্তি, যেগুলোকে পূজা করা হয়। হযরত সোলায়মান আ. কা'বা শরীফ অতিক্রমকালে কা'বা কেঁদে উঠল। আল্লাহ তায়ালা কা'বাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেসা করলেন। উত্তরে কা'বা বলল, হে আমার প্রভু! আমার কান্নার কারণ হল- আপনার এই নবী এবং তাঁর অনুসারী আউলিয়াগণের দল আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন কিন্তু তাঁরা আমার পাশে নামায আদায় করেননি, অথচ আপনাকে বাদ দিয়ে আমার চর্তুদিকে মূর্তিগুলোর পূজা চলছে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা কা'বা'র প্রতি ওহী প্রেরণ করে বললেন, তুমি কেঁদনা, অবশ্যই আমি কিছুকাল পর তোমাকে সিজদাকারী চেহারা দিয়ে পূর্ণ করে দেবো। আমি তোমার এলাকায় নতুন কিতাব কুরআন নাযিল করব, তোমার নিকটে শেষ নবীকে প্রেরণ করব, যিনি আমার নিকট সকল নবীগণ থেকে অধিক প্রিয়। আমি তোমাতে আমার এমন বান্দাগণকে আবাদ করব, যারা কেবল আমার ইবাদত করবে, আমি তাদের উপর একটি ফরয বিধান (হজ্ব) আবশ্যক করে দেবো যাতে তারা এমনভাবে তোমার নিকটবর্তী হবে যেমনি গুদপাখি তার খাবারে, উটনী যেমনি তার শাবকদের, কবুতরী যেমনি স্বীয় ডিমের প্রতি নিকটবর্তী ও আসক্তি হয়। আমি তোমাকে শয়তানদের ইবাদত থেকে মুক্ত ও পবিত্র করব।[৬৫৭]

হযরত সোলায়মান আ. ও পিপিলিকাঃ

মুহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, একশত মাইল পরিসর জুড়ে অবস্থান করত হযরত সোলায়মান আ.'র সেনাবাহিনী। ওই সুবিস্তৃত সেনানিবাসে মানব সেনাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল পঁচিশ মাইল, জ্বিন সেনাদের জন্য পঁচিশ মাইল এবং বিহঙ্গ বাহিনীর জন্য পঁচিশ মাইল। অবশিষ্ট পঁচিশ মাইল ছিল অন্যান্য প্রজাতির সৈন্যদের জন্য। তাঁর রাজ প্রাসাদ ছিল একশত ভবন বিশিষ্ট। তাঁর তিনশত সহধর্মিনী বসবাস করতেন ওই সকল ভবনে। আর তাঁর সাতশত কিংকরী বসবাস করত সাতশত পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠে। তাঁর নির্দেশে তাঁর সুবৃহৎ সিংহাসনকে আকাশে উঠিয়ে নিত বাতাস। তারপর ঝিরিঝিরি বাতাসে এগিয়ে চলত তাঁর নব-সিংহাসন। এভাবে এক আকাশ যাত্রাকালে তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হল, হে সোলায়মান! তোমার ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দিলাম। এখন থেকে তুমি শুনতে পাবে আমার সকল সৃষ্টির আওয়ায, তারা যতদূরেই অবস্থান করুক না

৬৫৭. ইবনে আসাকির, খণ্ড-২২, পৃ. ২৬৫, সূত্রঃ জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৬৯৩ ও তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৯, পৃ. ৩৪-৩৫।

কেন? এক আকাশবিহার শেষে তিনি উপনীত হয়েছিলেন পিপিলিকা অধ্যুষিত এক উপত্যকায়।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহের বর্ণনায় এসেছে, হযরত কা'ব বলেছেন, আকাশ বিহারকালে হযরত সোলায়মান আ.'র সঙ্গে থাকত তাঁর পরিবার-পরিজন, দাস-দাসী ও সিপাহী-সৈনিকের দল। আরো থাকত আহারের আয়োজন, আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র। আহার্য প্রস্তুত করবার জন্য সঙ্গে নেয়া হত বৃহদাকৃতির নয়টি ডেকচি, যার একটিতেই রান্না করা যেত নয়টি উটের গোশত। পশুপালের বিচরণের জন্য সেখানে থাকত নাতি-হ্রস্ব প্রান্তর। এভাবে সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন তিনি আকাশ যাত্রায়। সেখানে আহার্য প্রস্তুতের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকত রাজ-পাচকেরা।

এভাবে তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে আকাশ পথে যাত্রাকালে তায়েফের একাংশ সদীর নামক বিস্তৃর্ণ ভূভাগে অবতীর্ণ হলেন। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন ওই সদীর উপত্যকা রয়েছে সিরিয়ায়। এটি পিপীলিকার অধ্যুষিত এলাকা। পিপীলিকাগুলো ছিল মক্ষিকা সদৃশ। কেউ বলেছেন উষ্ট্রসদৃশ। সোলায়মান আ.'র সাথে কথোপকথনকারী পিপীলিকাটি ছিল অতি ক্ষুদ্র। শাবী বলেছেন পিপীলিকাটির ছিল দু'টি ডানা। এর নাম ছিল মতান্তরে তাহিয়্যা, হজমী। সে ছিল ঐ উপত্যকার পিপিলিকাদের নেতা। সে পিপিলিকা বাহিনীকে বলল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, না হয় সোলায়মান আ. ও তাঁর বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে ফেলবে। কারণ অতিক্ষুদ্র পিপীলিকার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ নাও হতে পারে। নেতা পিপীলিকার এরকম আত্মরক্ষা জ্ঞানবিশিষ্ট বক্তব্য তিন মাইল দূর থেকে শুনে হযরত সোলায়মান আ. মৃদু হাসলেন, অভিভূত ও পুলকিত হলেন। বিস্মিত ও অভিভূত হলেন তাদের আত্মরক্ষার কৌশল দর্শনে। আর পুলকিত হলেন, এই ভেবে যে, পিপীলিকাকুলও তাহলে তাঁর ও তাঁর বাহিনীর ন্যায় নিষ্ঠার কথা জানে। অর্থাৎ তারা জানে যে, জ্ঞাতসারে প্রাণীবধকে তাঁরা সমীচীন মনে করেন না।[৬৫৮]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا

[৬৫৮]. কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৯, পৃ. ৩৪-৩৬।

مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. অর্থ: সোলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল।– জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে, অত:পর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল। যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, 'হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সোলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরক পিষ্ট করে ফেলবে।' তার কথা শুনে সোলায়মান মুচকি হাসলেন এবং বললেন, 'হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্ত র্ভূক্ত কর।[৬৫৯]

ইমাম রাযী র. বলেন, আয়াতে বর্ণিত وهم لايشعرون তাদের অজ্ঞাতসারে- কথাটি দ্বারা পিপীলিকাদের এই জ্ঞান ও বিশ্বাস ছিল যে, নবীগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। জেনে শুনে তারা কোন জীবকে হত্যা করেন না। অজ্ঞাতসারে হলে ভিন্ন কথা। নবীগণ যে নিষ্পাপ হয় এই কথা বিশ্বাস করার জন্য এতে বড় শিক্ষা রয়েছে।

ইমাম রাযী আরো বলেন, আমি কোন কোন গ্রন্থে পেয়েছি যে, নেতা পিপীলিকাটি তার বাহিনীকে গর্তে প্রবেশের নির্দেশ দেয়ার কারণ হল– সোলায়মান আ.'র জাকঝমক পূর্ণ বিশাল বাহিনীকে দেখে পিপীলিকার দল আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়বে। এই আশঙ্কায় সে তার দলকে গর্তে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছিল।[৬৬০]

হুদ হুদ পাখির ঘটনা:

হযরত সোলায়মান আ.'র অনুগত ছিল পক্ষীকুল। বিশেষ পক্ষীর উপর বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব ছিল। তন্মধ্যে হুদহুদ পাখি ছিল অন্যতম। এই পাখির শরীরে বিভিন্ন রঙের রেখা থাকে এবং মাথায় থাকে তাজ। এটি স্বাভাবিক ভাবে বাসা বাঁধে দুর্গন্ধময় জায়গায়। এরা মাটির ভিতরে পানিকে এমনভাবে দেখে যেভাবে মানুষ গ্লাসের ভিতরের পানি দেখে। হুদহুদ পাখির দায়িত্ব ছিল

[৬৫৯]. সূরা নমল, আয়াত: ১৭-১৯।

[৬৬০]. তাফসীরে কবীর, খণ্ড-১২, পৃ. ১৮৯, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৬৯৪।

সোলায়মান আ. সৈন্যবাহিনী নিয়ে কোথাও অবস্থান করলে পানির প্রয়োজন হলে পানির সন্ধান দেওয়া। তার দেওয়া তথ্য মতে জ্বিনরা মাটি খনন করে পানির ব্যবস্থা করে দিত।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হুদহুদ পাখির ঘটনা নিম্নরূপ:-

হযরত সোলায়মান আ.'র তত্ত্বাবধানে এক সময় শেষ হল বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণকাজ। তাঁর হৃদয়ে আগ্রহ হল বায়তুল্লাহ্ শরীফ দর্শনের। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কিছুদিন পর মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে পৌছে কিছুদিন অবস্থান করলেন। প্রতিদিন তিনি সেখানে কোরবানী করতে লাগলেন পাঁচ হাজার উট, পাঁচ হাজার বলদ এবং পাঁচ হাজার মেষ। উপস্থিত জনতাকে একদিন বললেন, এই পবিত্র স্থানেই আর্বিভূত হবেন আরবী নবী। তাঁকে বিজয়ী করা হবে তাঁর প্রতিপক্ষের উপর। তাঁর রোষ প্রভাব বিস্তারক হবে এক মাসের পথের দূরত্বের সমান দূরত্ব জুড়ে। দূর অদূর হবে তাঁর কাছে এক বরাবর। আল্লাহ সম্পর্কীয় বিষয়ে তিনি কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবেন না। উপস্থিত জনতা জানতে চাইল, তিনি কোন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন? সোলায়মান আ. বললেন, আল্লাহর একত্বে, দীনে হানীফে। অভিনন্দন তাঁর প্রতি। আর তার প্রতিও যে ঈমান আনবে তাঁর মহান সান্নিধ্যে। জনতা আরো জানতে চাইল, তাঁর মহা অর্বিভাবের আর কত দেরী? তিনি বললেন, এক হাজার বছর। তোমরা আমার একথা পৌছে দিও অনুপস্থিত জনদের কাছে। অবশ্যই তিনি হবেন রাসূলগণের মহান অগ্রণী এবং সর্বশেষ রাসূল।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত সোলায়মান আ. মক্কা শরীফে পৌছে হজ্ব সম্পাদন করলেন। তারপর যাত্রা করলেন ইয়েমেনের অভিমুখে। 'সলিয়া' নামক স্থানে যখন পৌছলেন, তখন দ্বিপ্রহর বিগত প্রায়। স্থানটি ছিল শস্য-শ্যামল ও নয়নাভিরাম। মনস্থ করলেন এই স্থানেই অবতরণ করবেন তিনি। এখানেই সমাধা করবেন পানাহার ও আসরের নামায। হুদহুদ পাখি কিন্তু অবতরণ করল না। সে ভাবল ইত্যবসরে আরো উর্ধ্বে উঠে পৃথিবীর দৈর্ঘ-প্রস্ত একটু দেখে নেয়া যাক। উর্ধ্বকাশে উড়াল দিল হুদহুদ। সেখান থেকে তার নজরে পড়ল সাবা রাজ্যের নয়ন মুগ্ধকর দৃশ্যাবলী। রাজপ্রাসাদের চিত্তাকর্ষক পুষ্পোদ্যান। কৌতূহল নিবারণের জন্য সেদিকেই ছুটে গেল সে। সেখানে সাক্ষাত হল আর একটি হুদহুদ পাখির সঙ্গে। সোলায়মান আ.'র হুদহুদ পাখিটির নাম ছিল ইয়াফুর আর সাবা রাজ্যের ওই হুদহুদটির নাম ছিল আনফীর। সে পথিক পাখিকে বলল, কোথা থেকে এসেছ? ইয়াফুর বলল, আমি দাউদ তনয় সম্রাট সোলায়মান আ.'র আকাশ ভ্রমণের সঙ্গী। এখন এসেছি সিরিয়া থেকে। আনফীর

বলল, তিনি আবার কে? ইয়াফুর বলল, জাননা, তিনি তো নবী এবং মহা প্রতাপশালী সম্রাট। মানব, দানব, পাখি ও পবন তাঁর অনুগত। এবার বল, তুমি কোন দেশের? আনফীর বলল, এই রাজ্যেই আমার বসবাস। এদেশ রমণী শাসিত। এখানকার রমণীর নাম বিলকীস। বুঝলাম তোমাদের সম্রাটের সাম্রাজ্য সুবিশাল। কিন্তু জেনে রেখো, আমাদের সম্রাজ্ঞীর রাজ্য ও অবিশাল নয়। তাঁর অধীনস্থ সেনা অধিনায়কদের সংখ্যা বার হাজার। আবার তাদের প্রত্যেকের অধীনে আছে একলক্ষ করে সৈন্য। এসো, দেখবে আমাদের রাজ্য কত সুন্দর। ইয়াফুর বলল, না এখন যাই। সম্রাটের এখন নামাযের সময়। পানির খোঁজ করবেন তিনি। তখনই ডাক পড়বে আমার। আনফীর বলল, ভাইয়্যা, এসেছ যখন একটু ভাল করে দেখে যাওনা। রাণী বিলকীসের সংবাদ জানতে পারলে তোমাদের সম্রাট খুশীই হবেন। ইয়াফুর আর অমত করল না। আনফীরের সঙ্গে ঘুরে ফিরে দেখল রাজপ্রাসাদ ও রাজবাড়ীর মনোহর কুসুম কানন। তার পর অতি দ্রুত ফিরে আসতে লাগল সোলায়মান আ.'র সকাশে।

এদিকে ভূমিতে অবতরণের পরক্ষণেই বিহঙ্গ বাহিনীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন হযরত সোলায়মান আ. বিশেষ ভাবে খোঁজ করলেন হুদহুদের। কারণ আসর নামাযের সময় সমাগত প্রায়। পানির একান্ত প্রয়োজন। হুদহুদকে না দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হুদহুদ কোথায়? কোথায় গেল সে? উপস্থিতদের কেউ এর জবাব দিতে পারল না। রাগান্বিত হলেন তিনি, বললেন- তাকে অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভোগ করতে হবে যদি সে তার অনুমতিবিহীন অনুপস্থিতির কৈফিয়ত না দিতে পারে। বিহঙ্গবাহিনীর অধিনায়ককে তলব করে বললেন, এক্ষুনি যাও। যেখান থেকে পাও, সেখান থেকে দ্রুত পাকড়াও করে আন হুদহুদকে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়াল দিল বিহঙ্গধিনায়ক। উর্ধ্বাকাশে উঠতেই দেখল ইয়েমেনের দিক থেকে ছুটে আসছে হুদহুদ। কাছে আসতেই আক্রমণোদ্যত হল তার উপর, শংকিত হুদহুদ অনুনয় জানাল, নেতৃপ্রবর! সদয় হও। আল্লাহর শপথ দিয়ে বলি আমাকে আঘাত কর না। আমাকে নিয়ে চল মহামান্য সম্রাটের দরবারে। সেখানেই হোক আমার বিচার। বিহঙ্গধিনায়ক বলল, হতভাগা, নিপাত যাও। সম্রাট তো শাস্তি দানের জন্য শপথ করেছেন। একথার পর দু'জনে দ্রুত উড়াল দিল ফিরতি পথে। দরবারের কাছাকাছি আসতেই দেখা হল শকুনের সাথে। সে বলল, হে হুদহুদ! তুমি অপরাধী, সম্রাট রোষতপ্ত। মনে হয় এবার তোমার আর রক্ষা নাই। হুদহুদ বলল, তিনি কি শর্তযুক্ত শপথ করেছেন, না শর্তবিমুক্ত? অন্য পাখিরা সমস্বরে বলল, হ্যাঁ, বলেছেন, তোমাকে উপযুক্ত কারণ দেখাতে হবে। না হয় কঠিন শাস্তি অবধারিত। হুদহুদ বলল, তাহলে আশা রাখি আমি রেহাই পেয়ে যাব।

সিংহাসনে সমাসীন সোলায়মান আ.'র সম্মুখে হাযির হল হুদহুদ। জানাল বিনয়াবনত অভিবাদন। কাছে এলে রোষতপ্ত নবী তাকে ধরে ফেললেন শক্ত হাতের মুঠোয়। বললেন, দুরাচার! কোথায় ছিলে এতক্ষণ? উন্মুক্ত হস্তির পদতলে আমি পিষ্ট করব তোমাকে। হুদহুদ বলল, সম্রাট প্রবর! মহাদিবসের বিচারের কথা স্মরণ করুন, যখন আপনি উপস্থিত হবেন জব্বার, কাহ্হার আল্লাহর সকাশে। একথা শোনার পর রোষ অর্ন্তহিত হল নবীর। নম্রকণ্ঠে বললেন, তাহলে বল, কোথায় গিয়েছিলে তুমি? হুদহুদ বলল, মহামান্য নবী! আমি গিয়েছিলাম রমণী শাসিত এক রাজ্যে। সে রাজ্যের নাম সাবা। আমি নিয়ে এসেছি সে রাজ্যের নিশ্চিত সংবাদ, যা আপনি জানেন না।

হুদহুদ বলল, আমি এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে সবই দেওয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে ও তাঁর সম্প্রদায়কে দেখলাম আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করে রেখেছে এবং সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে, ফলে তারা সৎপথ পায়না। হুদহুদের কথা শুনে সোলায়মান আ. বললেন, ঠিক আছে। তোমার কথা তো আমি শুনলাম। কিন্তু আমি পরীক্ষা করে ও ভেবে-চিন্তে দেখব, তোমার কথা সত্য কিনা। নাকি তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভূক্ত।

এরপর হুদহুদ পানির সন্ধান দিল। তার চক্ষু ও নখর চিহ্নিত স্থানে জনতা ও জ্বিনেরা মিলে অল্প সময়ের মধ্যে খনন করল বিশাল ও গভীর এক জলাশয়। প্রয়োজন মতে সকলেই উযূ-গোসল করল। পানি পান করল পরিতৃপ্তির সাথে। পশুপালকেও পরিতৃপ্ত করল। ইত্যবসরে সোলায়মান আ. রাণী বিলকীসের উদ্দেশ্যে একটি পত্র রচনা করলেন এভাবে– আল্লাহর নগন্য সেবক দাউদ তনয় সোলায়মানের পক্ষ থেকে সাবার সাম্রাজ্ঞী বিলকীসের প্রতি। অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করিওনা, বরং আমার আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও।

সোলায়মান আ. সংক্ষিপ্তাকারে পত্র লিখে হুদহুদকে দিয়ে বললেন, তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের নিকট অর্পন কর, অত:পর তাদের নিকট থেকে সরে পড় আর দেখ তারা কী উত্তর দেয়।

হযরত সোলায়মান আ.'র পত্র নিয়ে উড়ে চলল হুদহুদ সাবা রাজ্যের দিকে। রাণী বিলকীস তখন অবস্থান করছিলেন- সানআ থেকে তিন মঞ্জিল দূরে মারেবে। সেখানে গিয়ে হুদহুদ দেখল, রাজ প্রাসাদের সকল তোরণ অর্গলাবদ্ধ। সে অনেক কৌশল করে শেষ পর্যন্ত পৌছতে সমর্থ হল রাণীর শয়ন কক্ষে। দেখল, শয্যায় পৃষ্ঠ স্থাপন করে রাণী বিশ্রামরত। সে চঞ্চুধৃত চিঠিটি ফেলে দিল

রাণীর বুকের উপর। শিথিল সূত্র সংযোগে এরকম বর্ণনা করেছেন আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবি হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে।[৬৬১]

সাবা রাজ্য ও বিলকীসের পরিচয়:

সাবা ছিল ইয়ামন অঞ্চলের একটি জাঁকঝমকপূর্ণ শহর। সানয়া থেকে ওই শহরটির দূরত্ব ছিল মাত্র ছত্রিশ মাইল। সাবার রাণীর নাম ছিল বিলকীস। তার পিতার নাম শুরাহীল। তিনি ছিলেন তার বংশের চল্লিশ তম নৃপতি। তার উর্ধ্বতন উনচল্লিশ পুরুষ সকলেই ছিলেন প্রতাপশালী সম্রাট। রাজত্বের প্রলম্বিত উত্তরাধিকারের কারণে শুরাহীলের ছিল বিশেষ এক ধরণের অহংকার। তাই পাশ্ববর্তী রাজ্যপালদেরকে তিনি তেমন গণ্য করতেন না। তাদের কারো কন্যার পানি গ্রহণকেও তিনি মনে করতেন অবমাননাকর। তাই তিনি এক জ্বিন রমণীকে বিবাহ করেছিলেন। তার নাম ছিল রায়হানা বিনতে সাকান। ওই জ্বিন রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তার প্রিয় কন্যা বিলকীস। বিলকীসের মাতা ছিল কাকবন্ধা। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, বিলকীসের পিতা-মাতার মধ্যে একজন ছিলেন জ্বিন বংশদ্ভুত। শুরাহীলের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরূঢা হলেন বিলকীস। কিন্তু দেশবাসীদের কেউ কেউ ছিল রমণী শাসনের ঘোর বিরোধী। ফলে তার রাজ্য হয়ে গেল দ্বিখণ্ডিত। বিরোধী পক্ষীয়রা নির্বাচন করল নতুন রাজা। তাদের ওই রাজা ছিল দুরাচারী ও চরিত্রহীন। সাধারণ রমণীরাও তার লালসার আগুন থেকে অব্যহতি পেতনা। জনতা ক্ষিপ্ত হল। কিন্তু তাকে উৎখাত করার কোন উপায় খুঁজে পেল না। নারীপীড়ক রাজার প্রতি বিলকীসও ছিলেন ক্ষিপ্ত। তৎসত্ত্বেও তিনি কৌশল অবলম্বনকেই শ্রেয় মনে করলেন। তার নিকট পত্র প্রেরণ করলেন এই মর্মে যে, হে রাজা! তুমি আমার আত্মীয়স্বজনের কাছে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব উথাপন কর। তুমি তো রাজা। সুতরাং এ বিয়েতে আমার আপত্তি থাকতে পারেনা। আর আমাদের বিয়ে হলে দ্বিখণ্ডিত রাজ্য পুনরায় একত্রিত হবে। উৎকণ্ঠা অন্তর্হিত হবে প্রজা সাধারণের জীবন থেকে। আমরাও রাজ্য শাসন করতে পারব নিশ্চিন্তে।

রাজা ভাবল এই তো সুযোগ। যথা সময়ে সে বিলকীসের আত্মীয় স্বজনের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাল। তারা বলল, আমাদের এরকম সাহস নেই। মনে হয় বিলকীস এ প্রস্তাবে কুপিতা হবেন। রাজা বলল, তোমরা তাকে বলেই দেখ না, আমি নিশ্চিত, তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। তাই হল। আত্মীয়-স্বজনদের

---

[৬৬১]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র. ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৯, পৃ. ৪১–৪৮ ও আল্লামা দুমাইরী র., ৮০৮হি., হায়াতে হাইওয়ান, উর্দু, খণ্ড-৩, পৃ. ৪৬২-৪৬৩।

প্রস্তাব খুশী মনে গ্রহণ করলেন বিলকীস। কিছু কালের মধ্যে মহাসমারোহে সম্পন্ন হল তাদের বিবাহ। নববধুকে নিয়ে রাজা ফিরে এল স্বপ্রাসাদে। একান্ত মিলনের প্রাক্কালে বিলকীস তাকে পান করালেন শরাব। রাজাও আনন্দে বিভোর হয়ে বার বার গ্রহণ করতে লাগলেন প্রিয়তমার হাতের মদ্যপূর্ণ পেয়ালা। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে এক সময় সে হয়ে পড়ল ঘোর মাতাল। ওই সুযোগে বিলকীস করলেন তার শিরোচ্ছেদ। কর্তিত মস্তক ঝুলিয়ে দিলেন ঘরের দরজায়। তারপর রাতের অন্ধকারেই চুপি চুপি ফিরে এলেন নিজের রাজ প্রাসাদে। সকাল হল। সকলেই দেখল রাজ গৃহের দরজায় ঝুলছে রাজার ছিন্ন মস্তক। জনতা উৎফুল্ল হল, বুঝল বিয়েটা ছিল সাবার রাণী বিলকীসের একটি ছলনা। এভাবে বিলকীস হয়ে গেলেন সমগ্র রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়িকা। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সব কিছুই দেয়া হয়েছে সাবার রাণীকে। সেনা শক্তির প্রাচুর্য, সম্পদের প্রাচুর্য, রাষ্ট্রের আয়তনের প্রাচুর্য ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাচুর্যের অধকারীনী ছিলেন তিনি। তার সিংহাসনটি ছিল সুবিশাল। ওই সিংহাসন ছিল অলক্তরাগরঞ্জিত, ইয়াকুত শোভিত, জবরজদ-মর্মর খচিত এবং চোখ ধাঁধানো অলংকরণ মুদ্রিত। পায়াগুলো ছিল জমরুদ পাথরের, সাতটি প্রকোষ্ঠ ছিল ওই বৃহৎ সিংহাসনের। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের তোরণ ও বাতায়ন থাকত নিয়ত অর্গলাবদ্ধ। যোবায়ের ইবনে মোহাম্মদের মধ্যস্থতায় ইবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেন, ওই প্রকাশ্য রাজাসনটি ছিল প্রধানত স্বর্ণের। তার সঙ্গে যুক্ত ছিল ইয়াকুত ও জবরজদের সুষম মিশ্রণ। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছিল যথাক্রমে আশি ও চল্লিশ হাত। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, রাণী বিলকীসের সিংহাসনের দৈর্ঘ্য ছিল ত্রিশ হাত প্রস্তও ছিল ত্রিশ হাত।[৬৬২]

ইবনে যায়েদ সূত্রে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বর্ণনা করেছেন, রাণী বিলকীসের একান্ত ব্যক্তিগত প্রকোষ্ঠে ছিল পূর্বমুখী একটি জানালা। তিনি ছিলেন সূর্যপূজারিনী। প্রত্যুষের সূর্য দর্শন ও সূর্যের প্রতি প্রণিপাত করাই ওই গবাক্ষ নির্মাণের উদ্দেশ্য। ওই গবাক্ষ পথেই রাণীর প্রকৌষ্ঠে প্রবেশ করেছিল হুদহুদ। সূর্যোদয়ের পূর্বেই হুদহুদ তার পক্ষ বিস্তার করে ঢেকে দিল বাতায়নটি। ফলে সেদিন রাণীর ঘুম ভাঙ্গল সূর্যোদয়ের পর। সেদিন আর তার প্রথম সূর্যের পূজা করা হল না। ঘুম ভাঙ্গতেই বুঝতে চেষ্টা করল সূর্যদর্শন না হওয়ার কারণ, ত্রস্ত পদে এগিয়ে গেলেন বাতায়নের দিকে। ঠিক তখনি হুদহুদ পত্রটি নিক্ষেপ করল তার শরীরে। রাণী বিলকীস পত্রটি তুলে নিয়ে মেলে ধরলেন চোখের সামনে। সবিস্ময়ে দেখলেন, সংক্ষিপ্ত পত্রটিতে মুদ্রিত রয়েছে সম্রাট সোলায়মান আ.'র

[৬৬২]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৯, পৃ. ৪৩-৪৫।

সিলমোহর ও স্বাক্ষর। অপ্রস্তুত হলেন রাণী। সংকিত হলেন কিছুটা। কারণ পত্রটিতে মুদ্রিত ছিল সম্রাট সোলায়মান আ.'র বিশাল সম্রাজ্যের মানচিত্রও।

বিচলিত রাণী তলব করলেন তার সভাসদদেরকে। একত্রিত করলেন বার হাজার সেনাপতিকে। তারা প্রত্যেকেই ছিল একলক্ষ সুশিক্ষিত সৈনিকের অধিকর্তা। এক বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, রাণীর ছিল একলক্ষ নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রত্যেকের অধীনে আবার ছিল একলক্ষ করে রণনিপুণ যোদ্ধা। কাতাদাহ ও মুকাতিল র. বলেছেন, সাবা-রাজ্ঞীর ছিল তিনশত সদস্য বিশিষ্ট পরামর্শ সভা। ওই সভার প্রত্যেক সদস্যের অধীনে ছিল দশ সহস্র করে সৈনিক।

রাণী বিলকীস পরামর্শ সভায় বললেন, হে পরিষদ বর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। (পত্রটিতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লেখা ছিল বলে রাণী ওটাকে সম্মানিত পত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন।) এ ব্যাপারে তোমরা তোমাদের অভিমত দাও। কারণ আমি যা করি তোমাদের উপস্থিতে এবং তোমাদের পরামর্শ নিয়ে করি। তারা বলল, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেবল আপনারই হাতে। সন্ধি করবেন কি যুদ্ধ করবেন আপনিই সিদ্ধান্ত দেবেন। আপনি যেটা বলবেন আমরা তা-ই করব।

রাণী বললেন, রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে আক্রমণ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করে। মনে হয় ওরাও এরকম হবে। তিনি একথা বলে যুদ্ধ নয় সন্ধির পক্ষেই মত দিয়েছেন। তবে রাণী বিলকীস বললেন, আগে আমি সম্রাট সোলায়মানকে পরীক্ষা করে দেখব। তিনি কি কেবল সম্রাট, না আল্লাহর সত্য নবী। আমি তাঁর কাছে কিছু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাবো। যদি তিনি কেবল সম্রাট হন তবে উপঢৌকন পেয়ে তিনি পরিতুষ্ট হয়ে যাবেন। পরিত্যাগ করবেন যুদ্ধের সংকল্প। আর যদি তিনি সত্যি সত্যিই নবী হন, তবে উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করবেন। কারণ নবীর নিকট পার্থিব বস্তুর চেয়ে বিশ্বাসী আনুগত্যই মূল বিবেচ্য বিষয়।

উপঢৌকন হিসাবে প্রেরিত হল একদল ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, ওই দাস-দাসীদের পোশাক ছিল একই রকম। ফলে চেনা যেতনা কে দাস, আর কে দাসী। মুজাহিদ র. বলেছেন, রাণী বিলকীস পাঠিয়েছিলেন দুইশত দাস এবং দুইশত দাসী। মুজাহিদ ও মুকাতিল বলেছেন, দাসীদেরকে পরানো হয়েছিল দাসের পোশাক, আর দাসদেরকে সজ্জিত করা

হয়েছিল দাসীর পরিচ্ছদ। সাঈদ ইবনে যোবাইর বলেছেন, দাস-দাসীদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল সুবর্ণখণ্ড ও রেশমী বস্ত্রসহ। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সঙ্গে দেয়া হয়েছিল চারটি সুবর্ণ গোলক। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, রাণী বিলকীস দাসদেরকে সাজিয়েছিল দাসীদের বস্ত্রে ও অলংকারে এবং দাসীদেরকে পরিয়েছিলেন দাসের পোশাক। দাসদের বাহুতে বাযুবন্দ, কণ্ঠে কাঞ্চনমালা এবং কর্ণ লতিতে দুল। আর দাসীদের গলায় লোহার বালা ও কটিদেশে পুরুষদের মত কোমরবন্ধ। দাসেরা আরূঢ় ছিল অশ্বের উপর, আর খচ্চরে সমারূঢ় ছিল দাসীরা। ওই বাহনগুলোর বলগা ছিল সুবর্ণ রঞ্জিত এবং তাদের পৃষ্ঠে স্থাপিত আসন ছিল রঙ বেরঙের রেশমী সূত্র গ্রথিত।

দাস-দাসীদেরকে একত্রিত করার পর রাণী হাযির করলেন পাঁচশত রৌপ্য নির্মিত ও মুক্তাখচিত মুকুট। মেশকআম্বর ও চন্দনের একটি কৌটা। তার মধ্যে রাখলেন মহামূল্যবান একটি অক্ষত মুক্তা। কৌটাটি ঢেকে দিলেন একটি বঙ্কিম পুতুল দিয়ে। সোলায়মান আ.'র নিকট একটি পত্রও লিখলেন তিনি। পত্র ও উপঢৌকনাদি অর্পন করলেন মুনজির ইবনে আমর নামক একজনকে। তার সঙ্গে দিলেন সদাসতর্ক প্রহরী দলকে। তারপর তার নেতৃত্বে সকলকে প্রেরণ করলেন বাদশাহ সোলায়মান আ.'র উদ্দেশ্যে। যাত্রার প্রক্কালে মুনজিরকে ডেকে বললেন, তুমি আমার মুখপাত্র। বাদশাহ সোলায়মানের সম্মুখীন হয়ে বলবে, আপনি যদি নবী হন তাহলে দাস-দাসীদেরকে পৃথক করে দিন। আর বলুন- এই কৌটার মধ্যে কী আছে? যদি তিনি বলতে পারেন, তবে বল, কৌটার ভিতরের মুক্তাটির যথাস্থানে ছিদ্র করে দিন। ওই ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিন সুতা। তবে এক জগুলো করবেন আপনি স্বয়ং। কোন মানব-দানবের সাহায্য নিতে পারবেন না। দাসদেরকে বললেন, তোমরা কথা বলবে দাসীর মত। আর দাসীদেরকে বললেন, তোমরা কথা বলবে দাসের মত করে। মুখপাত্রকে পুনরায় বললেন, তুমি কিন্তু লক্ষ্য রেখ, তোমাদের সাথে তিনি কেমন আচরণ করেন- রূঢ় না কোমল। যদি তিনি রোষকষায়িত নেত্রে তোমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে বুঝে নেবে তিনি নবী নন, কেবলই বাদশাহ। এমতাবস্থায় তাঁকে ভয় করার কিছুই নেই। কারণ আমরা তাঁর সমকক্ষ। আর যদি দেখ, তিনি প্রশস্ত ললাটধারী, শিষ্টাচারী ও ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তাহলে বুঝবে তিনি একজন প্রেরিত পুরুষ। তখন তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে, অনুধাবন করতে চেষ্টা করবে। যথাবিহিত সম্মানপ্রদর্শন পূর্বক ভেবে-চিন্তে উত্তর দিবে তাঁর কথার।

এদিকে আড়াল থেকে হুদহুদ পাখি সব কিছু লক্ষ্য করল। দূতবাহিনী পৌছানোর আগেই সে সকল সংবাদ জানাল হযরত সোলায়মান আ.কে। তিনি

তখন জ্বিনদেরকে নির্দেশ দিলেন, সুবর্ণ ইষ্টক প্রস্তুত কর। ওই ইষ্টক দিয়ে নির্মাণ কর সুদীর্ঘ সাতাশ মাইলের রাজপথ। ওই পথ দিয়ে আমার কাছে আসবে রাণী বিলকীসের দূত ও তার বাহিনী। আর সোনার রাজপথ যেখানে এসে শেষ হবে, তৎসন্নিহিত প্রান্তরের সম্পূর্ণটাই ঘিরে ফেল স্বর্ণ ইষ্টক নির্মিত দেয়াল দিয়ে। এরপর তিনি জানতে চাইলেন, জলচর ও ভূ-চর প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র প্রাণী কোনটি? উপস্থিত জনতা বলল, মহামান্য নবী! আমরা অমুক স্থানে দেখেছি একটি বহুবর্ণ চিত্রিত সমুদ্রচারী প্রাণী। দু'টি ডানা রয়েছে তার। আর তার গ্রীবাদেশে রয়েছে মোরগের মত ঝুঁটি। ললাটদেশ পশমাচ্ছাদিত। সোলায়মান আ. বললেন, এক্ষুনি ওই প্রজাতির একটি প্রাণীকে সমুদ্রাভ্যান্তর থেকে ধরে আন। আদেশ প্রতিপালিত হল। ওই বিচিত্র প্রাণীটিকে মনিকাঞ্চনের পটভূমিতে বেঁধে রাখা হল স্বর্ণ-ইট নির্মিত প্রাচীরের একপাশে। তার সামনে রেখে দাও তার পছন্দের খাদ্য-বস্তু। এরপর জ্বিনদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা তোমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দাও রাজপথের দক্ষিণে ও বামে। এই নির্দেশটিও পালিত হল যথারীতি। তিনি তখন গৌরবান্বিত করলেন তাঁর সিংহাসনকে। সিংহাসনের উভয় পাশে স্থাপন করলেন চার হাজার করে মঞ্চ।

রাণী বিলকীসের দূত ও তাঁর বাহিনী যতই নিকটবর্তী হচ্ছিল, ততই হয়ে যাচ্ছিল হতভম্ব ও বিস্ময়াহত। একি অভূতপূর্ব জৌলুস! স্বর্ণ ইষ্টক নির্মিত রাজপথ। দু'পাশে জনতার সুদীর্ঘ সারি। সোনার প্রাচীর ঘেরা প্রান্তর। প্রান্তরের পাশে অদ্ভুত সুন্দর এক প্রাণী। বিশাল নয়নাভিরাম ও সমীহ উদ্রেকক সিংহাসন। দর্শনার্থীদের জন্য রক্ষিত হাজার হাজার মঞ্চ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল রাণী বিলকীসের দূত ও তাঁর পুরো বাহিনী।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, হযরত সোলায়মান আ. যখন স্বর্ণ-রৌপ্যের ইট প্রান্তরে বিছিয়ে দিতে বললেন, তখন খালি রাখতে বললেন, ওই পরিমাণ জায়গা, যা আচ্ছাদন করবার সমপরিমাণ স্বর্ণ ইট নিয়ে এগিয়ে আসছিল রাণী বিলকীসের দূতেরা। তারা যখন আগমন করল, তখন প্রান্তরের ইটশূন্য অংশ দেখে ঘাবড়ে গেল। ভাবল ইট চুরির অপবাদ যেন আবার তাদের ঘাড়ে না পড়ে। তাই তারা ভয়ে ভয়ে আনীত ইটগুলো বিছিয়ে দিল প্রান্তরের ইটশূন্য অংশে। এভাবে কৌশলে দূত বাহিনীকে স্বর্ণ ইট শূন্য করা হল। তারপর রাজপ্রাসাদের দিকে যতই তারা অগ্রসর হতে লাগল ততই তারা হতে লাগল বিস্মিত ও ভীত। কী বিশাল আয়োজন। দু'পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মানুষ, জ্বিন ও হিংস্র পশু। তার সাথে সমবেত রয়েছে হাজার হাজার

পাখির দল। জ্বিনদেরকে দেখেই তারা ভয় পেল বেশী। জ্বিনেরা অভয় দিয়ে বলল, ভয় পাবার কিছুই নেই। তোমরা অতিথি। সামনে অগ্রসর হও। দূতেরা যখন হযরত সোলায়মান আ.'র সকাশে উপস্থিত হল তখন তিনি তাদের উপরে নিক্ষেপ করলেন সদয় দৃষ্টি। বললেন, বল, কী সংবাদ নিয়ে এসেছ? প্রধান দূত অর্পণ করল রাণীর চিঠি ও উপঢৌকন। সোলায়মান আ. চিঠি খুলে পড়লেন। তারপর বললেন, কৌটাটি কোথায়? এবার কৌটাটিও অর্পণ করল প্রধান দূত। তিনি বন্ধ কৌটাটি হাতে নিয়ে নাড়া দিলেন। ইত্যবসরে সেখানে হযরত জিব্রাঈল আ. এসে সোলায়মান আ.কে জানিয়ে দিলেন কৌটায় কী আছে। পরক্ষণই তিনি বললেন, কৌটার মধ্যে আছে একটি অটুট মূল্যবান মুক্তা এবং একটি ছিদ্রযুক্ত পুতুল। দূত বললেন, ঠিকই বলেছেন। এবার আপনি মুক্তাটি ছিদ্র করুন এবং ছিদ্র পথে সুতা ঢুকিয়ে এক সঙ্গে গ্রথিত করুন মুক্তা ও পুতুলকে। সোলায়মান আ. উপস্থিত মানুষ ও ভাল জ্বিনদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মুক্তোটি ছিদ্র করতে পারবে? তারা জবাব দিল, না। তিনি তখন মন্দ জ্বিনদেরকে বললেন, তোমরা পারবে ছিদ্র করতে? তারাও অক্ষমতা প্রকাশ করল। আর বলল, মাহামান্য সম্রাট! ঘুণ পোকা মনে হয় এ কাজ করতে পারবে। ঘুণ পোকাকে ডাকা হল। সে এসে মুক্তাটি ছিদ্র করে ফেলল। তারপর সুতো মুখে নিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিল মুক্তা ও পুতুলের ছিদ্রপথে। ফলে সহজে সূত্র বদ্ধ করা গেল ওই দু'টি বস্তুকে। সোলায়মান আ. বললেন, তুমি কি কিছু চাও? ঘুণ পোকা বলল, হে আল্লাহর নবী! কাঠকে আমার উপজীবিকা নির্ধারণ করে দিন। তিনি বললেন, তথাস্তু।

এরপর সোলায়মান আ. বিলকীসের প্রেরিত দাস-দাসীদেরকে হস্ত-পদ প্রক্ষালনের নির্দেশ দিলেন। পথশ্রান্ত দাস-দাসীরা হাত-মুখ ধুতে শুরু করল। দেখা গেল দাসীরা এক হাতে পানি নিয়ে আর একহাত দিয়ে পানি নিক্ষেপ করছে মুখমণ্ডলে। আর দাসেরা মুখে পানি দিচ্ছে দু'হাত দিয়ে একসঙ্গে। দাসীরা হাতে পানি ঢালছে কনুইয়ের দিক থেকে এবং দাসেরা পানি ঢালছে কব্জির দিক থেকে। এভাবে হাত মুখ ধোয়ার সময় পরিষ্কার বুঝা গেল কারা দাস এবং কারা দাসী। ছদ্মবেশ দিয়ে তারা আর ঢেকে রাখতে পারল না তাদের পরিচয়। তিনি এভাবে কৌশল করে পৃথক করে ফেললেন দাস-দাসীদেরকে। এরপর তিনি ফেরৎ দিলেন আনীত উপঢৌকনাদি।

সোলায়মান আ. দূতদেরকে বললেন, তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও? এসব উপঢৌকনের প্রয়োজন আমার নেই। আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ আমাকে

দিয়েছেন অপার্থিব ও অক্ষয় সম্পদ- সত্য ধর্ম, নবুয়ত, প্রজ্ঞা, তৎসহ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। আর তোমাদের রাণী কেবলই অবক্ষয় প্রবণ পার্থিব মর্যাদা ও চিত্ত-বৈভবের অধিকারিনী। উপঢৌকন পেয়ে তোমরা উৎফুল্ল হতে পার, আমি কদাচ নই। তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে ফিরে যাও। আমি অবশ্যই তাদের নিকট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব লাঞ্ছিতভাবে এবং তারা হবে অবনমিত। একথা বলে তিনি প্রেরিত দূত বাহিনীকে ফেরৎ পাঠালেন।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, দূতগণ ফিরে গিয়ে রাণী বিলকীসকে সবকিছু খুলে বলল। প্রত্যাবর্তিত দূতদের মুখ থেকে হযরত সোলায়মান আ.'র সকল কথা শুনে রাণী তেমন বিচলিত হলেন না। পরিষদ বর্গকে ডেকে বললেন, শপথ আল্লাহর! আমি তো প্রথমেই বুঝেছিলাম, তিনি কোন সাধারণ নৃপতি নন। তিনি প্রেরিত পুরুষ। তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। সুতরাং সমর্পণই শ্রেয়। শেষে এই বলে রাণী সোলায়মান আ.'র নিকটে প্রস্তাব পাঠালেন যে, আমি আমার পরিষদবর্গ ও রাজ্যের নির্বাহী নেতৃবর্গ সহকারে শীঘ্রই আপনার কাছে আসছি। যে ধর্মের প্রতি আপনি আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, সে ধর্মের স্বরূপ কী, তা আমরা স্বচক্ষে যাচাই করে দেখতে চাই।

যাত্রার প্রস্তুতি চলল, রাণী তার সিংহাসন সাতটি প্রকোষ্ঠে সাজিয়ে রেখে প্রকোষ্ঠগুলো তালাবদ্ধ করে দিলেন। অথবা সাতটি পৃথক প্রকোষ্ঠে তিনি সংরক্ষণ করলেন সিংহাসনের বিশেষ বিশেষ অংশ। কিছু সংখ্যক দুর্ধর্ষ নিরাপত্তা প্রহরী নিযুক্ত করলেন সেগুলোর প্রহরায়। নির্দেশ দিলেন, সাবধান। কেউ যেন আমার সংরক্ষিত সিংহাসনগুলোর কাছে ঘেষতে না পারে। রাষ্ট্রীয় ঘোষককে নির্দেশ দিলেন, রাজ্যজুড়ে ঘোষণা করে দাও, আমরা বের হয়েছি এক বিশেষ অভিযানে। এভাবে সব কিছু গোছগাছ করার পর রাণী বিলকীস তার বার হাজার নির্বাহী নেতৃবর্গ নিয়ে যাত্রা করলেন নবী-নৃপতি সোলায়মান আ.'র দরবার অভিমুখে।[৬৬৩]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ . لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا
شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ . فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ

[৬৬৩]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৯, পৃ. ৪১-৫৭।

تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ . إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ . وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ
الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ . أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ
الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ . اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . اذْهَبْ بِكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ
إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ . قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ .
إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ . أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ . قَالَتْ يَا
أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ . قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو
بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ . قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً
أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ . وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ
فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ .
بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ . ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ
مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ .

অর্থ: সোলায়মান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, অত:পর বললেন, 'কি হল, হুদহুদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ। কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে বলল, 'আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে 'সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। আমি এক নারীকে সাবা বাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অত:পর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না। তারা আল্লাহকে সেজদা করে না কেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর। আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি মহা-আরশের মালিক।' সোলায়মান বললেন, 'এখন আমি দেখব তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অত:পর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়।' বিলকীস বলল, হে পারিষদবর্গ! আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। সেই পত্র সোলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই: অসীম দাতা, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু; আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।' বিলকীস বলল, হে পারিষদবর্গ! আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।' তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনি ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন।' সে বলল, 'রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও এরূপই করবে। আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব আনে।' অত:পর যখন দূত সোলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সোলায়মান বললেন, তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ্‌ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক। ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত।[৬৬৪]

পত্র লেখার নিয়ম বা আদব:

কুরআনে পাকে আল্লাহ্‌ তায়ালা মানব জীবনের প্রয়োজনীয় কোন দিক সম্পর্কেও দিক-নির্দেশনা না দিয়ে ছাড়েন নি। চিঠি-পত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকীসের নামে হযরত সোলায়মান আ.'র চিঠির আদ্যোপান্ত কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একজন পয়গাম্বরের চিঠি। কুরআনে পাকে একে উত্তম আদর্শ হিসাবে উদ্ধৃত করেছে। তাই এই পত্রে পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক-নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো মুসলমানদের জন্যেও অনুসরণীয়। আর তা হল- প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে তারপর প্রাপকের। তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, সোলায়মান আ.'র চিঠিটি ছিল নিম্নরূপ:-

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ إِلَى بِلْقِيسَ مَلَكَةِ سَبَا

[৬৬৪]. সূরা নামল, আয়াত: ২০-৩৭।

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام على مَنِ اتَّبَعَ الهُدٰى اَمَّا بَعْدُ !

فَلَا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَأْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ ٠

সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লিখার উপকরিতা হল- পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, কার পত্র পাঠ করছে, পত্র কোথা থেকে আসল এবং প্রেরক কে এরূপ খোঁজাখুজি করার কষ্ট যেন ভোগ করতে না হয়। রাসূল ﷺ'র প্রেরিত সব পত্রেই তিনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

ছোট জন বড়জনকে পত্র লিখলেও অনুরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করা শ্রেয়। কারণ সুন্নতের অনুসরণকে আদবের উপর স্থান দেওয়া উচিত। অধিকাংশ সাহাবী রাসূল ﷺ'র নিকট যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতেও নিজেদের নাম অগ্রে রেখেছেন। রূহুল মায়ানী গ্রন্থে বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে হযরত আনাস রা.'র এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে- مَا كَانَ اَحَدٌ اَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اَصْحَابُهُ اِذَا كَتَبُوْا اِلَيْهِ بَدَأُوْا بِاَنْفُسِهِمْ قُلْتُ وَكِتَابُ عَلَاء الحَضْرَمِى يَشْهَدُ لَهُ عَلَى مَا رَوَى রাসূল ﷺ'র চাইতে অধিক সম্মানযোগ্য কেউ ছিল না; কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম যখন তাঁর কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। আমি বলি রাসূল ﷺ'র নিকট আলা আল হাদ্বরামী রা.'র পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তবে রূহুল মায়ানী গ্রন্থে একথাও বলা হয়েছে যে, এ আলোচনা উত্তম অনুত্তম সম্পর্কে-বৈধতা সম্পর্কে নয়। কেউ যদি নিজের নাম শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে লিখে দেয়, তবে তাও জায়েয।

পত্রের জওয়াব দেওয়াও পয়গাম্বরগণের সুন্নাত। তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, কারও পত্র হস্তগত হলে তার জওয়াব দেয়া সমীচীন। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস রা. পত্রের জওয়াব সালামের জওয়াবের ন্যায় ওয়াজিব মনে করতেন।

পত্র লিখার আর একটি নিয়ম হল পত্রের শুরুতে বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখতে হয়। তবে বিছমিল্লাহ কি প্রেরকের নামের আগে লিখবে না পরে লিখবে? সমাধান হল উভয় পদ্ধতি বৈধ তবে বিছমিল্লাহ আগে লেখাই হল উত্তম। রাসূল ﷺ'র পত্র সমূহ সাক্ষ্য দেয় যে, আগে বিছমিল্লাহ তারপর প্রেরকের নাম। কুরআনে বর্ণিত সোলায়মান আ.'র পত্রে আগে তাঁর নাম পরে

বিছমিল্লাহ লিখিত আছে। এতে বাহ্যত বিছমিল্লাহ পরে লিখার বৈধতা জানা যায়। কিন্তু ইবনে আবি হাতেম ইয়াযিদ ইবনে রূমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সোলায়মান আ. প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্র এভাবে লিখেছেন- بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان بن داؤد الى بلقيس ابنة ذى شرح وقومها- ان لا تعلوا الخ অর্থাৎ তিনি বিছমিল্লাহ আগে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিলকীস তার পরিষবর্গকে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় সোলায়মান আ.'র নাম আগে উল্লেখ করেছেন। কুরআনে পাকে বিলকীসের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। অথবা খামের উপর সোলায়মান আ.'র নাম আগে লিখছিল আর ভিতরে মূল পত্রে বিছমিল্লাহ্ আগে লিখা ছিল। পত্র শোনানোর সময় বিলকীস সোলায়মান আ.'র নাম অগ্রে উল্লেখ করেছেন।

বিলকীসের সুবিশাল সিংহাসন চোখের পলকে নিয়ে আসা:

বিলকীস তার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে হযরত সোলায়মান আ.'র দরবারের কাছাকাছি এসে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করল। সোলায়মান আ. তা তিন মাইল দূর থেকে জানতে পেরেছিলেন। সোলায়মান আ. চেয়েছিলেন যে, রাণী বিলকীস সদলবলে এসে মুসলমান হয়ে আনুগত্য প্রকাশের পূর্বে তাদের সামনে তিনি মু'জিযা প্রকাশ করবেন। তাই তিনি তাঁর পরিষদবর্গকে বললেন, রাণী আত্মসমর্পন করে আমার নিকট আসবার পূর্বে তার সিংহাসনকে আমার সামনে কে এনে দিতে পারবে? ইফরীত নামক এক শক্তিশালী জ্বিন বলল, হে মহামান্যবর নবী! আপনি আপনার স্থান থেকে উঠবার আগেই আমি তা এনে দিব। আপনি এ ব্যাপারে আমার ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততার উপর আস্থা রাখতে পারেন। ওয়াহাব বলেছেন, জ্বিনটির নাম লুজাই। কেউ বলেছেন সাখরজনী, কেউ বলেছেন, জাকোয়ান। তার দেহাবয়ব ছিল পর্বত সদৃশ বিশাল। দৃষ্টির শেষ সীমানায় পড়ত তার প্রতিটি পদক্ষেপ।

সোলায়মান আ. চেয়েছিলেন, সিংহাসনটি আরো দ্রুত তাঁর সামনে আনা হোক। তাই জ্বিনটির প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, এর চেয়ে দ্রুত কে সম্পন্ন করতে পারবে এ কাজ? দরবারে উপস্থিত ছিলেন এক বিস্ময়কর পুরুষ। তিনি আসমানী গ্রন্থের জ্ঞানে সুগভীর। তিনি বলে উঠলেন, আপনি চোখের পলক ফেলার আগেই আমি আপনার সামনে হাযির করতে পারব বিলকীসের সিংহাসনটি। এই বিস্ময়কর পুরুষের নাম হল আসফ ইবনে বরখিয়া। তিনি ছিলেন সিদ্দীক তথা সত্যবাদী এবং তিনি ইসমে আ'যম শরীফ জানতেন। ওই ইসমে আ'যম সহ তিনি দোয়া করলে চোখের পলক পড়ার পূর্বেই তাঁর দোয়া গৃহীত হত। সোলায়মান আ. দৃষ্টিপাত করলেন ইয়ামেনের দিকে আর আসফ প্রার্থনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশে

ফেরেশতারা রাণী বিলকীসের সিংহাসন এনে দিল, মাটির নিচে সুঁড়ঙ্গ পথ নির্মাণ করে সেই পথ দিয়ে, একেবারে সোলায়মান আ.'র সামনে।

কালবী বলেছেন, আসফ সিজদায় পড়ে ইসমে আ'যমের সহায়তায় আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। তৎক্ষণাত সিংহাসনটি মাটির ভিতর দিয়ে লোক চক্ষুর অন্তরালে ছুটে আসতে শুরু করল। শেষে মাটি ফুঁড়ে উপস্থিত হল হযরত সোলায়মান আ.'র আসনের সামনে। রাণী বিলকীসের সিংহাসন থেকে হযরত সোলায়মান আ.'র অবস্থানস্থলের দূরত্ব ছিল দুই মাসের পথের দূরত্বের সমান।

মুজাহিদ র.'র মতে ইসমে আ'যমটি ছিল- يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, কালবী র.'র মতে- يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ইমাম যুহরী র.'র মতে- يَا اِلٰهَنَا وَيَااِلٰهَ كُلِّ شَيْئٍ اِلٰهًا وَاحِدًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اِئْتِنِي بِعَرْشِهَا ।

অত:পর সোলায়মান আ. যখন দেখতে পেলেন বিশাল সিংহাসনটি তাঁর সামনে উপস্থিত, তখন তিনি বললেন, এটি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন- আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ।

তারপর রাণী বিলকীসের বুদ্ধিমত্তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তিনি নির্দেশ দিলেন, সিংহাসনটির আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হোক। যাতে সে নিজের সিংহাসন সহজে চিনতে না পারে। এতে বুঝা যাবে সে কি বিচক্ষণ না বুদ্ধি বিভ্রাটের শিকার। তাঁর নির্দেশ মতে সিংহাসনটির উর্ধ্বাংশ নিম্নে এবং নিম্নাংশ উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছিল। আর লাল ও সবুজ মণিমুক্তাগুলো সন্নিবেশিত হয়েছিল একটি অপরটির স্থানে। এরূপ করার কারণ হল জ্বিনরা সোলায়মান আ.কে বলেছিল বিলকীস ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্না নারী। তার বুদ্ধিমত্তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্য সিংহাসনের রূপ পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে।

রাণী বিলকীস যখন সোলায়মান আ.'র সামনে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাকে বললেন, দেখ, ভাল করে সিংহাসনটি তোমার কিনা? রাণী উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, আমার সিংহাসনই তো মনে হয়। বিলকীস তার বিশাল সিংহাসন যা আসার পূর্বে অতি যত্নসহকারে সংরক্ষিত করে রেখে আসছিলেন, তা তার আসার পূর্বেই সম্রাট সোলায়মান আ.'র দরবারে উপস্থিত দেখে বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, আপনার এরকম অলৌকিকত্ব আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। অর্থাৎ হুদহুদ পাখির মাধ্যমে আমার শয়নকক্ষে প্রাপ্ত পত্র, আমার দূত কর্তৃক প্রেরিত উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান, দূত মারফত প্রেরিত আমন্ত্রণপত্র, ওগুলোই তো ছিল অলৌকিক। তখনই আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আপনি প্রেরিত পুরুষ।[৬৬৫]

[৬৬৫]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৯, পৃ. ৫৮-৬৩।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ . قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ . قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ . قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ . فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ .

অর্থ: সোলায়মান বললেন, হে পরিষদবর্গ! 'তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে? জনৈক দৈত্য-জ্বিন বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি একাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত। কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অত:পর সোলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত কৃপাশীল। সোলায়মান বললেন, বিলকীসের সামনে তার সিংহাসনের আকার-আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভূক্ত, যাদের দিশা নেই? অত:পর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি।[৬৬৬]

বিলকীসের বিরুদ্ধে জ্বিনদের অপবাদ:

হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেন, জ্বিনেরা আশংকা করেছিল যে, হযরত সোলায়মান আ. রাণী বিলকীসকে বিবাহ করবেন। কিন্তু জ্বিনেরা ছিল এর ঘোর বিরোধী। কারণ বিলকীস ছিলেন জ্বিন বংশদ্ভূতার পুত্রী। তার ওই পরীমাতা জ্বিনদের অনেক গোপন রহস্য জানত। সে গোপন রহস্য নিশ্চয় বিলকীসেরও অজানা নয়। আর পরিণয়াবদ্ধ হওয়ার পর হযরত সোলায়মান আ.ও তা জেনে ফেলবে। আবার বিলকীসের সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে-ই হবে পরবর্তী সম্রাট। ফলে সোলায়মান আ.'র মহা অন্তর্ধানের পরেও তাদেরকে অনুগত থাকতে হবে তাঁর পুত্রের। পুরুষানুক্রমে তাদেরকে করতে হবে সোলায়মান আ.'র বংশদ্ভূতদের দাসত্ব। তাই তারা রাণী

[৬৬৬]. সূরা নমল, আয়াত: ৩৮-৪২।

বিলকীস সম্পর্কে সোলায়মান আ.কে ভুল ধারণা দিতে চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, বিলকীস ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্না। তার পা গর্দভের ক্ষুরের মত। আর পায়ের গোছায় রয়েছে রাজ্যের পশম। সেই অপবাদ সঠিক কিনা জানার জন্যে সোলায়মান আ. বিলকীসের সিংহাসনের রূপ পরিবর্তন করেছিলেন। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য সোলায়মান আ. এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। আর তা হল-

হযরত সোলায়মান আ. রাজ প্রাসাদের প্রবেশ পথে জ্বিনদের দ্বারা নির্মাণ করিয়ে নিয়েছিলেন শীশ মহল। স্বচ্ছ কাঁচ নির্মিত ওই প্রবেশ পথটিকে দেখলে মনে হত একটি স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ জলাশায়। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন একটি কাঁচের আলন্দ, যার নিম্নে প্রবাহিত ছিল কাকচক্ষু পানি। ওই পানিতে খেলা করছিল মৎস ও ভেক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ও অলিন্দের পাশে তিনি সভাসদসহ উপবিষ্ট থাকবেন, আর দেখবেন রাণী বিলকীসের পদবিক্ষেপের দৃশ্য। তাই করলেন তিনি। যথাসনে ও যথাস্থানে উপবেশন করলেন তিনি। তাঁকে ঘিরে সমবেত হল মানুষ, জ্বিন ও পশু-পাখিরা। তারপর রাণীকে নির্দেশ দিলেন, অলিন্দ দিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ কর। কারো কারো মতে তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন, কাঁচ বিছানো একটি অঙ্গন। কাঁচের নিচে স্থাপন করিয়েছিলেন মীন, ভেক ও জলজ উদ্ভিদ। তারপর রাণীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন জলভ্রম সম্বলিত অঙ্গন অতিক্রম করতে।

রাণী বিলকীস মনে করলেন, জলাশয় অঙ্গন অতিক্রম করতে গেলে ভিজে যাবে তার পরিধেয় বসন। তাই তিনি পদবিক্ষেপের পূর্ব মুহূর্তে তার বসন গুটিয়ে নিলেন হাঁটু পর্যন্ত। ফলে প্রকাশিত হয়ে পড়ল তার পায়ের গোছা।

এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে একটি দীর্ঘ বিবৃতি উল্লেখ করেছেন ইবনে আবি শায়বা, ইবনে মুনযির, আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম র.।

ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে- হযরত সোলায়মান আ. নির্মাণ করিয়েছিলেন বহু মূল্যবান প্রস্তর ও স্ফটিক সম্বলিত একটি মনোহর প্রাসাদ। ওই প্রাসাদের গমণ পথে নির্মাণ করিয়েছিলেন একটি কৃত্রিম জলাধার। ওই জলাধারটি সম্পূর্ণ আবৃত করেছিলেন স্বচ্ছ কাঁচ দ্বারা। কিন্তু স্বাভাবিক দৃষ্টিপাতে ওই কাঁচের অস্তিত্ব ধরা পড়ত না। মনে হত জলাধারটির উপরিভাগে কোন কিছুই নেই। স্বচ্ছ কাঁচের আবরণ বিশিষ্ট ওই জলাধারের উপর দিয়ে প্রাসাদে গমণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি রাণীকে। রাণী তখন কাপড় ভিজবে বলে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে নিয়ে পদবিক্ষেপ শুরু করেছিলেন। তাঁর গমণ পথের একপাশে এক বিশেষ আসনে উপবিষ্ট হযরত সোলায়মান আ. তখন দেখে নিয়েছিলেন তার পায়ের

গোছা। সুন্দর, কিন্তু লোমশ। একটু পরেই তিনি তাঁর দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে ছিলেন অন্য দিকে। উল্লেখ্য, পরনারীর প্রতি এরকম একবারের দৃষ্টিপাত অসিদ্ধ নয়। বিশেষ করে যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়, তাকে এভাবে দেখা সিদ্ধ।

রাণীর এরকম বিব্রতকর অবস্থা দেখে সোলায়মান আ. বলে উঠলেন, বিব্রত হবার কোন কারণ নেই। শীশ মহলের এই অলিন্দটিও স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত। সুতরাং স্বাভাবিক ছন্দে পদবিক্ষেপ কর। সোলায়মান আ.'র এরকম অভূতপূর্ব অভ্যর্থনার আয়োজন দেখে রাণী বিলকীস হলেন যুগপথ লজ্জিত ও বিস্মিতা। বুঝতে পারলেন আল্লাহর নবীর এমতো বিস্ময়কর আয়োজনের মাহাত্ম। তাই আল্লাহ সকাশে নিবেদন জানালেন যে, হে আমার প্রভু প্রতিপালক! ইতোপূর্বে আমি সূর্য পূজা করে মহাপাপ করেছি। করেছি আত্মত্যচার। সেই জঘন্য বিশ্বাস থেকে আমি বিশুদ্ধ চিত্তে তাওবা করছি। তোমার প্রিয় নবী সোলায়মান আ.'র আনুগত্য স্বীকার করে ঈমান আনয়ন করছি তোমার প্রতি। এভাবে রাণী বিলকীস ঈমান গ্রহণ পূর্বক মুসলমান হয়েছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর বিলকীসের অবস্থা:

কেউ বলেছেন, সোলায়মান আ. বিলকীসকে বিয়ে করেছিলেন। ইবনে আসাকিরের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা র. বলেছেন, সোলায়মান আ. রাণী বিলকীসকে বিবাহ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু তার পায়ের নিম্নাংশে লোমশ দেখে তাঁর আগ্রহে কিছুটা ভাটা পড়েছিল। তা সত্ত্বেও এর একটা বিহিত করা যায় কিনা তা নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন তিনি। এ ব্যাপারে পরামর্শ বিনিময় করলেন কারো কারো সঙ্গে। কেউ কেউ বলল, লোম উৎপাটক অস্ত্র নির্মাণের কথা। কিন্তু রাণী বিলকীস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, লৌহ নির্মিত কোন অস্ত্র আমার শরীর স্পর্শ করতে পারবে না।

সোলায়মান আ.ও প্রস্তাবটিকে ভাল মনে করলেন না। তিনি এবার শুভ জ্বিনদের কাছে জানতে চাইলেন, এ ব্যাপারে তোমরা কি কিছু জান? তারা বলল, না। তখন তিনি অশুভ জ্বিনদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি এ ব্যাপারে কিছু জানা আছে? তারা বলল, হ্যাঁ। আমরা এমন পদ্ধতির কথা জানি যা অবলম্বন করলে রমণীদের ত্বক লোমমুক্ত তো হয়ই, অধিকন্তু হয় শুভ্র ও লাবণ্যময়। এরপর তারা পরামর্শ দিল গোসলখানা নির্মাণের। আর চুন, হরিতাল ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত করে দিল লোমনাশক মলম। সেই থেকে মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে গোসলখানা ও লোমনাশক রসায়নের ব্যবহার। যথা সময়ে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হল। তিনি তাকে রাজ্যচ্যুত করলেন না। ইয়েমেনেই রেখে দিলেন তাকে সে রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হিসেবে। প্রতি মাসে তিনি তিনদিন সেখানে গিয়ে

অবস্থান করতেন। যেতেন সকালবেলা। আসতেনও সকালে। জ্বিনদের দ্বারা সেখানে তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন তিনটি অদৃষ্টপূর্ব দুর্গ। সেগুলোর নাম ছিল সালহুন, মিননুন ও আমাদান। সম্রাজ্ঞী বিলকীস হয়েছিলেন সোলায়মান আ.'র এক পুত্র সন্তানের জননী।

ওয়াহাব বলেছেন, ইতিহাসবেত্তাদের ধারণা হল- সোলায়মান আ. বিলকীসকে অনেক বুঝিয়ে হামাদান গোত্রের অধিপতি জীতারার সঙ্গে বিবাহ করিয়ে দিলেন। ইয়ামেনের শাসনভারও অর্পন করলেন জীতারার উপর। একদল জ্বিনকে নির্দেশ দিলেন, জীতারার রাজ্য রক্ষা করার জন্য। এভাবে জ্বিনেরাই হল জীতারার রাজ্যের প্রধান প্রতিরক্ষা বাহিনী। এভাবে এক বছর অতিবাহিত হবার পর সোলায়মান আ. ইন্তেকাল করলেন। জ্বিনেরা কিন্তু এ সংবাদ পেল আরো এক বছর পর। তারপর তেহামা প্রদেশে আবির্ভূত হল এক অশুভ জ্বিন। সেই কথাটা সেখান থেকে বিকট আওয়াযে ঘোষণা করে দিল এই মৃত্যু সংবাদ। সে বলেছে শুভ সংবাদ, শুভ সংবাদ, সম্রাট সোলায়মানের মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। ভেঙ্গে গিয়েছে তোমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল। তোমরা এখন স্বাধীন। এখন তোমরা পৃথিবীতে যথেচ্ছ ভ্রমণ করতে পার। সেই থেকে শেষ হয়ে গেল মহাপ্রতাপশালী নবী সোলায়মান আ.'র শাসনকাল। একই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল জীতারার ও রাণী বিলকীসের রাজত্বও। প্রমাণিত হল পৃথিবীতে কারো রাজ্য চিরস্থায়ী নয়। না সোলায়মান আ.'র না বিলকীসের। না আদম আ.'র, না ইবলিসের। হে চির অক্ষয় সত্ত্বা! কেবল তোমার রাজত্বই চিরস্থায়ী। তুমি সত্য, তুমি অনিত্য, তুমি অনাদি, তুমি অনন্ত।[৬৬৭]

হযরত সোলায়মান আ.'র মৃত্যুঃ

ইমাম বগভী র. বলেছেন, বিদ্বানগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন, হযরত সোলায়মান আ. বায়তুল মুকাদ্দাসে নির্জন প্রকোষ্ঠে গিয়ে গভীরভাবে ইবাদতে নিমগ্ন হতেন। কখনো কখনো সেখানেই রেখে আসতে হত তাঁর খাদ্য ও পানীয়। বৎসরের পর বৎসর ধরে এটাই ছিল তাঁর নিয়ম। এই নিয়ম পালন করতে করতেই এক সময় তিনি পরপারে পাড়ি দেন। তাঁর পরলোকগমনের বৃত্তান্তটি হল–

প্রতিদিন সকালে বায়তুল মুকাদ্দাসে একটি উদ্ভিদের চারার জন্ম হত। তিনি উদ্ভিদটিকে তার নাম ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। যদি তা বৃহৎ বৃক্ষের

---

৬৬৭. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৯, পৃ. ৬৪-৬৮ ও আল্লামা দুমাইরী র., ৮০৮হি., হায়াতে হাইওয়ান, উর্দু, খণ্ড-৩, পৃ. ১৬১-১৬৬।

অংকুর হত, তবে তিনি তা উঠিয়ে নিয়ে কোন বাগানে লাগিয়ে দিতেন। আর কোন ঔষধি গাছ হলে লিখে রাখতেন তার নাম। একবার তিনি দেখলেন, মসজিদের মেহরাবে উদগত হয়েছে একটি কচি চারা, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? উত্তর দিল, শিশু বৃক্ষ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এখানে বিকশিত হলে কেন? সে বলল, মসজিদ ধ্বংস করবার জন্য। তিনি বললেন, অসম্ভব। আমি বেঁচে থাকতেই কি আল্লাহ এই মসজিদ ধ্বংস করবেন? তবে মনে হয়, আমার পরকাল যাত্রার পর তোমার কারণেই ধ্বংস হবে এই মসজিদ। একথা বলে তিনি চারাটিকে তুলে নিয়ে সুন্দর একটি বাগানে লাগিয়ে দিলেন। দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আমার পরলোকগমণের খবর তুমি জ্বিনদের কাছে গোপন রেখে দিও, যেন মানুষ একথা বুঝতে পারে যে, জ্বিনরা অদৃশ্যের সংবাদ জানে না। উল্লেখ্য যে, তখনকার জ্বিনরা গর্ব করে বলত, আমরা অদৃশ্যের খবর জানি। ভবিষ্যতের সংবাদও আমাদের জানা আছে। কোন কোন মানুষ তাদের এই দাবী স্বীকারও করে নিত।

দোয়া শেষে সোলায়মান আ. তাঁর নির্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি নামায শুরু করলেন। নামাযরত অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হল। মানুষ ও জ্বিনরা একথা বুঝতেও পারল না। তারা মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখত। তারা ভাবত সোলায়মান আ. গভীরভাবে নামাযে মগ্ন। তারা তাঁর ভয়ে আগের মতই কাজ করে যাচ্ছিল। এভাবে কেটে গেল পুরো একটি বৎসর। তাঁর লাঠিতে ঘুণ অথবা উইপোকা ধরেছিল। ফলে লাঠিটি একসময় ভেঙ্গে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিষ্প্রাণ শরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

উই পোকার বদৌলতে জ্বিনরা মুক্তি পেয়েছিল কঠিন শ্রম থেকে। তাই তারা উই পোকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. এরকম বলেছেন।

ইবনে ইয়াযিদ' সূত্রে ইবনে আবি হাতেম বলেছেন, সোলায়মান আ. আযরাঈল আ.কে বলে রেখেছিলেন, আমার মৃত্যুর সময় অত্যাসন্ন হলে আমাকে জানাবেন। ওই দিন মৃত্যুদূত জানালেন, আপনার মৃত্যুর ক্ষণ সমুপস্থিত। প্রস্তুত হোন। সোলায়মান আ. তখন তাঁর প্রকোষ্ঠের মধ্যে নির্মাণ করালেন আর একটি কাঁচের ঘর। তারপর ওই কাঁচের ঘরে প্রবেশ করে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন এবং নামায আরম্ভ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর ওই অবস্থাতেই তিনি পরলোকগমণ করলেন। কিন্তু লাঠিকে অবলম্বন করে তাঁর শরীর আগের মতই দাঁড়িয়ে রইল। মানুষ ও জ্বিনরা মনে করল তিনি নামায পাঠে ব্যস্ত আছেন।

এদিকে তাঁর লাঠিতে ধরল ঘুণপোকা। ফলে দীর্ঘ এক বছর পর লাঠিটি ভেঙ্গে পড়ল। তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। জনতা তখন কাঁচের ঘর ভেঙ্গে তাঁর দেহ বের করে সৎকার করল যথারীতিভাবে। তারা হিসাব করে দেখল, বছর খানেক আগেই তাঁর পরকাল যাত্রা সম্পন্ন হয়েছিল।

ইমাম বগভী র. বলেন, ইতিহাসবেত্তাগণ বলেছেন, হযরত সোলায়মান আ. সিংহাসনে আরোহণ করেন তের বছর বয়সে। এর চার বছর গত হওয়ার পর তিনি শুরু করেন বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ। চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন তিনি। তারপর তিপ্পান্ন বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত সোলায়মান আ.'র বৈশিষ্ট্যঃ

১. মাত্র তের বছর বয়সে সোলায়মান আ. নবুয়ত ও হুকুমত লাভ করেন।

২. সোলায়মান আ. বহু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। যেমন- ক. সকল পক্ষীকুলের ভাষা বুঝতেন। খ. জ্বিন ও বায়ু তাঁর অনুগত ছিল। গ. তিনি চলার সময় পক্ষীকুল তাঁর উপর সম্মিলিতভাবে ছায়াদান করত। ঘ. বৃক্ষের ভাষাও বুঝতেন তিনি। বৃক্ষের সাথে কথপোকথন করতেন তিনি। ঙ. বিশেষ বিচক্ষণতার ও জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যা দিয়ে তিনি অনেক জটিল বিষয়েও মুহূর্তের মধ্যে সমাধান করতে পারতেন। চ. তাঁর দোয়ায় ডুবন্ত সূর্য পুনঃ উদিত হয়েছিল। ছ. তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। জ. অনেক দূর থেকে সৃষ্টি জীবের কথা শুনতে পেতেন। ঝ. নিজের ব্যবহৃত লাঠির ঠেস দিয়ে মৃত্যুর পরও এক বছর যাবৎ অক্ষত অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলেন। ঞ. বিশাল সম্রাজ্যের অধিকারী ও একজন প্রতাপশালী সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও তিনি অহংকারী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন বিনয়ী ও কৃতজ্ঞ। ট. গোসলখানা ও লোমনাশক মলম সর্বপ্রথম তাঁর আমলেই আবিষ্কার হয়েছিল।[৬৬৮]

পবিত্র কুরআনে ষোল স্থানে তাঁর আলোচনা এসেছে-

সূরা	আয়াত	সংখ্যা
বাকারা	১০২	১
নিসা	১৬৩	১
আনআম	৮৫	১
আম্বিয়া	৭৮, ৭৯ ও ৮১	৩
নমল	১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ৩৬, ৪৪	৭
সাবা	১২	১
ছোয়াদ	৩০, ৩৪	২
	মোট =	১৬ স্থান

৬৬৮. মাওলানা হেফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, পৃ. ৯৯।

২৬. হযরত দানিয়াল আ.

হযরত দানিয়াল আ. সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কোন আলোচনা নেই। তবে হাদীস শরীফে তাঁর নাম ও মু'জিযা সম্পর্কে এসেছে। তিনি নবী ছিলেন নাকি আল্লাহর কোন সাহেবে কারামাত বুযুর্গ ছিলেন তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তবে যালিম বাদশাহ বখতনসরের যামানায় যে দানিয়ালের কথা বলা হয়েছে অধিকাংশের মতে তিনি নবী ছিলেন।

তাঁর জন্ম ও মু'জিযাঃ

হযরত আবু হোরায়রা রা. হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু মুসা আশআরী রা. হযরত দানিয়াল আ.'র হাতে পাওয়া আংটি সম্পর্কে তাঁর শহরের ওলামাগণের নিকট জানতে চাইলেন। ওলামাগণ বললেন, তিনি যে শহরে জন্মলাভ করেছিলেন, সে শহরের বাদশাহকে গণকরা বলল যে, আপনার শহরে আজ রাতে যে ছেলেটি জন্মগ্রহণ করবে সে আপনার বাদশাহী ধ্বংস করে দিবে। বাদশাহ শুনে শপথ করলেন যে, আজ রাতে যে ছেলে জন্মগ্রহণ করবে তাকে হত্যা করা হবে। সে রাতে জন্মগ্রহণ করলেন হযরত দানিয়াল আ.। তাকে তুলে নিয়ে বাঘ-সিংহের বসতি স্থানে নিক্ষেপ করা হল। রাতের বেলায় সিংহ এসে নবজাতক শিশুকে দেখে জিহ্বা দিয়ে চাটতে লাগল। সিংহী এসে শিশুটিকে দুধপান করাতে লাগল। তাঁর মা এসে দেখলেন যে, সিংহ শিশুকে জিহ্বা দিয়ে চেটে চেটে আদর করতে লাগল। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রক্ষা করেছেন এবং তিনি সেই মর্যাদায় পৌঁছেছেন যা তাঁর তকদীরে ছিল।

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেন, ঐ শহরের ওলামাগণ বলেন, হযরত দানিয়াল আ. নিজের ছবি এবং তাঁর শরীর লেহনকারী সিংহদ্বয়ের ছবি অংকন করে তিনি নিজের ব্যবহৃত আংটিতে নকশা করে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে ঐসময় তিনি আল্লাহর যে নিয়ামত ও দয়া প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেটা ভুলে না যায়।[৬৬৯]

৬৬৯. ইবনে কাসীর, ৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বিয়া, খণ্ড-২, পৃ. ৪৪৩ ও আল্লামা দুমাইরী র., ৮০৮হি., হায়াতে হাইওয়ান, খণ্ড-১, পৃ. ৬৬।

আব্দুর রহমান ইবনে আবিয যানাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি আবু মুসা আশআরী রা.'র পুত্র আবু বুরদাহ'র হাতে একটি আংটি দেখেছি, যার মধ্যে অংকিত ছিল দু'টি সিংহ একজন ব্যক্তির শরীর লেহন করছে। আবু বুরদাহ বলেন, এই আংটিটি সেই মৃত ব্যক্তির যার শহরের লোকদের ধারণা মতে তিনি হলেন দানিয়াল আ.। আমার পিতা আবু মুসা আশআরী রা. তাঁকে দাফন করার সময় তাঁর থেকে নিয়েছিলেন।[৬৭০]

হযরত দানিয়াল আ. ও বখতনসর:

বখতনসর বায়তুল মোকাদ্দস ধ্বংস করার পর বাবেল শহরে ফিরে আসল। কিছুদিন পর সে এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখল। কিন্তু কী দেখল তা ভুলে গেল। তখন সে হযরত দানিয়াল আ., হাননিয়া, আযরায়া এবং মীশাঈলকে ডেকে বলল, আমাকে সেই স্বপ্ন সম্পর্কে বল, যা আমি দেখে ভুলে গিয়েছি। তোমরা আমাকে আমার ওই স্বপ্ন সম্পর্কে যদি বলতে না পার, তবে আমি তোমাদের গর্দান কেটে ফেলব। তখনও দানিয়াল আ. ছিলেন অল্প বয়স্ক। তিনি একটু সরে এসে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, যাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সেই স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি গিয়ে বললেন, হে বাদশাহ! আপনি একটি আকৃতি দেখেছেন, যার পায়ের গোড়ালী ছিল মাটির। হাঁটু ও রান ছিল তামার, পেট ছিল রৌপ্যের, বক্ষ ছিল স্বর্ণের। আর গর্দান ও মাথা ছিল লৌহার। বাদশাহ বললেন, হ্যাঁ, তোমার কথা সত্য। যখন আপনি এই স্বপ্ন দেখেছিলেন, তখন ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন। অত:পর আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করেন। ফলে ওই আকৃতিটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এই স্বপ্নটিই আপনি ভুলে গিয়েছেন। বখতনসর বলল, তুমি ঠিক বলেছ। সে জিজ্ঞাসা করল, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি? তিনি বললেন, আপনাকে পৃথিবীর প্রতাপশালী বাদশাহদের রাজত্বের নমুনা দেখানো হয়েছে। কারো রাজত্ব ছিল দুর্বল, কারো রাজত্ব ছিল সৌন্দয্য মণ্ডিত, কারো রাজত্ব ছিল মজবুত সুদৃঢ়। মাটি দুর্বলের আলামত। তামা মাটির চেয়ে মজবুত। তারপর তামার চেয়ে রৌপ্য সুন্দর। এরপর স্বর্ণ রৌপ্যের চেয়ে অধিক সুন্দর। অত:পর লৌহা হল আপনার রাজত্বের নমুনা। কেননা তা পূর্বের সকল রাজত্বের চেয়ে বেশী কঠিন। যে পাথরটি আল্লাহ তায়ালা উপর থেকে নিক্ষেপ করেছেন যার ফলে ওই আকৃতিটি টুকরা টুকরা হয়ে পড়েছিল তা ছিল আল্লাহর কুদরতী শক্তি। যা সকল রাজা ও রাজত্বকে ধ্বংস করে দেবেন কেবল স্থায়ী থাকবে আল্লাহর রাজত্ব ও হুকুম।[৬৭১]

[৬৭০]. প্রাগুক্ত।
[৬৭১]. তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৫, পৃ. ৪৮০, সূত্র: জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৭২৬।

যখন দানিয়াল আ. বখতনসরের স্বপ্নের সঠিক বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিলেন, তখন থেকে বখতনসর তাঁকে নিজের কাছে রাখতেন, তাঁর সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করতেন। কিন্তু বাদশাহ'র দরবারের অন্যান্যরা তাঁকে হিংসা করতে লাগল। তারা সর্বদা চেষ্টা করত বাদশাহকে তাঁর শত্রু বানিয়ে দিতে। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে বাদশাহকে তাঁর শত্রু বানিয়ে দিল। বাদশাহ তাঁর জন্যে গর্ত খনন করার নির্দেশ দিলেন। তারপর সেই গর্তে দানিয়াল আ. সহ মোট ছয়জনকে নিক্ষেপ করলেন। সাথে কিছু হিংস্র জন্তুও গর্তে ছেড়ে দিলেন। বাদশা'র সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলল, চলো এবার আমরা পানাহার করে আসি। তারা পানাহার করে তামাশা দেখতে আসল। দেখল, তাঁরা গর্তের একপাশে বসে রইলেন আর হিংস্র জন্তুগুলো তাঁদের পাশে বসে রইল। তাঁদেরকে একটি আচড় পর্যন্ত দেয়নি।[৬৭২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি হুযাইল থেকে বর্ণিত, বখতনসর দু'টি সিংহ লালন-পালন করে রেখেছিল একটি গর্তে। হযরত দানিয়াল আ.কে বন্দী করে যখন আনা হল, তখন ঐ গর্তে সিংহদ্বয়ের মুখে তাঁকে নিক্ষেপ করা হল। কিন্তু সিংহদ্বয় তাঁকে কিছুই করল না। তিনি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ওই গর্তে ছিলেন। তিনি যখন ক্ষুধার্ত হলেন আল্লাহ তায়ালা সিরিয়ায় অবস্থান রত হযরত আরমিয়া আ.কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, দানিয়ালের জন্য খাবারের ব্যবস্থা কর। তিনি বললেন, হে পরওয়ারদিগার! আমি আছি বায়তুল মুকাদ্দাসে। বর্তমানে দানিয়াল আ. রয়েছেন ইরাকে বাবেল শহরে। আল্লাহ্ তায়ালা ওহী পাঠালেন, আমি যা আদেশ দিয়েছি তুমি তা তৈরী কর। আমি একটি বস্তুকে আদেশ করব যা তোমাকে এবং তোমার তৈরীকৃত খাবার সহ তুলে নিয়ে বাবেলে পৌছিয়ে দেবে।

হযরত আরমিয়া আ. খাবার তৈরী করলেন। আল্লাহ তায়ালা এক ফেরেশতাকে হুকুম দিলেন। ফেরেশতা আরমিয়া আ. ও তাঁর তৈরী খাবার সহ মুহূর্তের মধ্যে বাবেলে পৌছিয়ে দিলেন। হঠাৎ করে আরমিয়া আ. নিজেকে ওই গর্তের পাশে দেখতে পেলেন। হযরত দানিয়াল আ. বললেন, আপনি কে? উত্তরে তিনি বললেন, আমি আরমিয়া। দানিয়াল আ. জিজ্ঞেস করলেন, কেন এসেছেন? তিনি বললেন, আমাকে আপনার প্রভুই পাঠিয়েছেন আপনার জন্য খাবার নিয়ে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার প্রভু কি আমাকে স্মরণ করেছেন। আরমিয়া আ. বললেন, হ্যাঁ। তখন দানিয়াল আ. এই দোয়া পাঠ করলেন−

[৬৭২]. তারীখুল কামেল, পৃ. ২৬৮, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৭।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَا يَنْسَى مَنْ ذَكَرَهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَا يُخَيِّبُ مَنْ رَجَاهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي مَنْ وَثِقَ بِهِ لَمْ يَكِلْهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي يَجْزِي بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي يَجْزِي بِالصَّبْرِ نَجَاةً. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي يَكْشِفُ حُزْنَنَا بَعْدَ كَرْبِنَا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هُوَ ثِقَتُنَا حِينَ يَسُوءُ ظَنُّنَا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هُوَ رَجَاؤُنَا حِينَ تَنْقَطِعُ الْحِيَلُ عَنَّا -

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি সেই ব্যক্তিকে ভুলে না যেই তাঁকে স্মরণ করে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি তাঁর প্রতি আশাবাদীকে জবাব প্রদান করেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যাঁর উপর ভরসাকারীকে যিনি অন্য কারো দিকে মুখাপেক্ষী করেন না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। যিনি নেক কাজের উত্তম প্রতিদান দান করেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি ধৈর্য্যের প্রতিদান জান্নাত দিয়ে প্রদান করেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি মুসিবতের পরে আমাদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি বিশ্বস্ত যখন আমাদের আমলের কারণে আমরা খারাপ ধারণা করি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি তখনও আমাদের জন্য একমাত্র ভরসা হয়, যখন আমাদের সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিপল হয়।[৬৭৩]

বর্ণিত আছে যে, হযরত দানিয়াল আ.কে একটি গভীর কূপে নিক্ষেপ করা হল। জঙ্গলের হিংস্র জীব-জন্তু এসে লেজ নেড়ে নেড়ে অতি আদরের সহিত তার শরীর চাঁটতে লাগল। এ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার এক ফেরেশতা এসে হে দানিয়াল হে দানিয়াল করে ডাকতে লাগল। তিনি উত্তরে বললেন, আপনি কে? ফেরেশতা জবাব দিল আমি আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেশতা। তিনি আমাকে আপনার খেদমতে খাবার নিয়ে প্রেরণ করেছেন। তখন তিনি উপরে উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত দোয়া পাঠ করেন।[৬৭৪]

হযরত দানিয়াল আ.'র উসিলায় বাঘের আক্রমণ থেকে নিরাপদ লাভঃ

ইমাম ইবনুস সুত্তি র. একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী রা. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, যখন তোমরা কোন উপত্যকায় বাঘ-সিংহের ভয় করে থাক, তখন তোমরা এই দোয়াটি পাঠ করবে- أَعُوْذُ بِالدَّانِيَالِ وَبِالْجُبِّ مِنْ شَرِّ الْأَسَدِ হে আল্লাহ্! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি দানিয়াল আ. ও (তাঁর পতিত হওয়া) গর্তের উসিলায় বাঘ-সিংহের অনিষ্ট থেকে।[৬৭৫]

---

৬৭৩. আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বিয়া, খণ্ড-২, পৃ. ৪৪১-৪৪২, দুমাইরী র., ৮০৮হি., হায়াতে হাইওয়ান, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৬৬।

৬৭৪. ইমাম বায়হাকী র., শোয়াবুল ঈমান, সূত্রঃ হায়াতে হাইওয়ান, উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ৬৬।

আল্লামা দুমাইরী র. বলেন, হযরত দানিয়াল আ. জন্মকালে এবং শেষ বয়সে পরীক্ষায় লিপ্ত হয়েছিলেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এই নিয়ামত দান করে সম্মানিত করেছেন যে, তাঁর নাম নিয়ে আশ্রয় চাইলে আল্লাহ তায়ালা তাকে যাবতীয় অনিষ্টকারী হিংস্র জীব-জন্তু থেকে রক্ষা করেন।[৬৭৬]

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. কর্তৃক দানিয়াল আ.'র লাশ দাফনঃ

হযরত আবু বকর ইবনে আবিদ দুনিয়া র. তাঁর গ্রন্থ 'আহকামুল কুবুর' এ- আবুল আশয়াস আহমরী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, হযরত দানিয়াল আ. আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেছিলেন যে, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে যেন উম্মতে মুহাম্মদীর কোন লোকে দাফন করেন। হযরত আবু মুসা আশআরী রা. যখন 'তসতর' বিজয় করলেন তখন তিনি সেখানে একটি সিন্ধুক পেলেন, যার মধ্যে হযরত দানিয়াল আ.'র লাশ মোবারক ছিল। রাসূল ﷺ এরশাদ করেছিলেন, যে ব্যক্তি দানিয়াল আ.'র সংবাদ দিবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। যে ব্যক্তি হযরত দানিয়াল আ.'র লাশ মোবারক সনাক্ত করেছিল তার নাম ছিল হারকুস। হযরত আবু মুসা আশআরী রা. হযরত দানিয়াল আ.'র লাশ মোবারক সম্পর্কে হযরত ওমর রা.কে চিঠি লিখে অবহিত করলেন। হযরত ওমর রা. চিঠির উত্তর পাঠিয়ে বললেন, হযরত দানিয়াল আ.'র লাশকে দাফন করে দিন আর হারকুসকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিন। কারণ নবী করিম ﷺ তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

ইবনে আবিদ দুনিয়া র. হযরত আনবাসা ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু মুসা আশআরী রা. হযরত দানিয়াল আ.'র লাশের সাথে একটি মুসহাফ বা পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি পেয়ালা ছিল, যার মধ্যে ছিল সামান্য মাংস, কিছু দিরহাম এবং হযরত দানিয়াল আ.'র আংটি। হযরত আবু মুসা আশআরী রা. সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করে হযরত ওমর রা.'র নিকট পত্র প্রেরণ করেন। হযরত ওমর রা. উত্তর লিখেন যে, মাসহাফটি আমার নিকট পাঠিয়ে দিন, মাংসের কিছু অংশও আমার নিকট পাঠিয়ে দিন আর মুসলমানদেরকে বলুন, ওই মাংসকে ঔষধ হিসাবে যেন ব্যবহার করে। দিরহাম সমূহ বন্টন করে দিন আর আংটিটি আমি আপনাকে দান করলাম।

ইবনে আবিদ দুনিয়া অন্য সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত আবু মুসা আশআরী রা. যখন ওই লাশ মোবারক পেলেন, তখন তাঁকে বলা হল যে, এটি হযরত দানিয়াল আ.'র লাশ। তখন তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। লাশকে জড়িয়ে

---

৬৭৬. প্রাগুক্ত।

ধরলেন, কোলাকুলি করলেন এবং চুমু খেলেন। তিনি খলীফা হযরত ওমর রা.কে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে চিঠি লিখলেন। তিনি চিঠিতে বললেন, এই লাশের সাথে প্রায় দশ হাজার দিরহামের মত জিনিসপত্র রয়েছে। এইগুলোর বৈশিষ্ট্য হল- কেউ যদি নির্ধারিত স্থান হতে ওই গুলোর কোন একটি তুলে নিত তখন সেখানেই পুনরায় রেখে দিতে হত। কেউ যদি না রাখে তবে সে অসুস্থ হয়ে পড়ত। তিনি চিঠিতে এও লিখেছেন যে, সাথে একটি সিন্দুকও পেয়েছি। হযরত ওমর রা. চিঠি মারফত আদেশ দিলেন যে, বরই পাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে লাশ মোবারককে গোসল দিয়ে, কাফন পরিয়ে গোপনীয়তার সহিত তাঁকে দাফন করে দিন। যাতে তাঁর কবর সম্পর্কে কেউ অবহিত না হয়। আর মাল-সম্পদ সম্পর্কে আদেশ দিলেন যে, ওগুলো বায়তুল মালে জমা করা হোক। সিন্ধুকটি তিনি নিজের কাছে নিয়ে আনলেন আর আংটিটি হযরত আবু মুসা আশআরী রা.কে তিনি দান করে দিয়েছেন।[৬৭৭]

আল্লামা দুমাইরী র. বলেন, হযরত দানিয়াল আ. প্রসিদ্ধ যালিম বাদশাহ্ বখতনসরের সময়কালে জন্মলাভ করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবুয়ত ও হেকমত উভয়টি দান করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এটিও লিখেছেন যে, হযরত দানিয়াল আ.'র কবর মোবারক সুয়েয খালে দেখা গিয়েছে। হযরত আবু মুসা আশআরী রা. কবর তালাশ করে খুঁজে পে''ত সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দানিয়াল আ.'র শরীর মোবারক বের করে এনে পুনরায় কাফন পরিয়ে নামাযে জানাযাহ পড়ে সুয়েয খালেই পুনরায় দাফন করে দিয়ে কবর মোবারকের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করে দেন।[৬৭৮]

২৭. হযরত যাকারিয়া আ.

পবিত্র কুরআনে আলোচিত যাকারিয়া আ. আর তাওরাতে ও সমুদয় সহীফায় আলোচিত যাকারিয়া এক নয়। কেননা, তাওরাতে উল্লেখিত যাকারিয়ার আবির্ভাব হয়েছিল পারস্যরাজ দারাউনের যুগে, যার জন্ম হয়েছিল হযরত ঈসা আ.'র পঁচিশ বছর পূর্বে। অথচ কুরআনে আলোচিত যাকারিয়া আ. ছিলেন হযরত মরিয়ম আ.'র অভিভাবক ও হযরত ইয়াহিয়া আ.'র পিতা। হযরত ঈসা আ. ও হযরত ইয়াহিয়া আ.'র মধ্যস্থলে অন্য কোন নবী ছিল না।

হযরত যাকারিয়া আ.'র পিতার নাম নিয়ে মতানৈক্য আছে। যথা তাঁর নসবনামায় দেখা যায় যাকারিয়া ইবনে উন (ওয়ান) কিংবা ইবনে শবওয়া কিংবা ইবনে লাহুদ অথবা ইবনে বরখিয়া। তবে একথা সবর্জনস্বীকৃত যে, তিনি

৬৭৭. আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি., কাসাসুল আম্বিয়া, খণ্ড-২, পৃ. ৪৪২-৪৪৩।

৬৭৮. আল মাজালিস, কৃত- আল্লামা দাইনূরী র., সূত্র. হায়াতে হাইওয়ান, খণ্ড-১, পৃ. ৬৭।

সোলায়মান ইবনে দাউদ আ.'র বংশধর, আর তাঁর স্ত্রী মরয়মের খালা আল ইয়াশা কিংবা ঈশা ছিল হযরত হারুন আ.'র বংশধর।[৬৭৯]

পবিত্র কুরআনে যাকারিয়া আ.'র নাম ও আলোচনা:

পবিত্র কুরআনে মোট চারটি সূরায় আঠার আয়াতে হযরত যাকারিয়া আ.'র আলোচনা এসেছে। সূরা আলে ইমরানে ৩৭ থেকে ৪১ পর্যন্ত মোট পাঁচ আয়াত। সূরা আনআমে ৮৫ নং আয়াত। সূরা মরয়মে ২ থেকে ১১ নং আয়াত পর্যন্ত মোট দশ আয়াত এবং সূরা আম্বিয়া এ ৮৯ থেকে ৯০ পর্যন্ত মোট দুই আয়াত। তবে এই চারটি সূরায় মোট ছয়টি আয়াতে হযরত যাকারিয়া আ.'র নাম উল্লেখিত হয়েছে। আর তাহল-সূরা আলে ইমরানে ৩৭ ও ৩৮ আয়াত। সূরা আনআমে ৮৫ আয়াত। সূরা মরয়মে ২ ও ৭ আয়াত। সূরা আম্বিয়া এ ৮৯ আয়াত।[৬৮০]

হযরত যাকারিয়া আ.'র জীবনী:

হযরত যাকারিয়া আ.'র জীবনী বিস্তারিতভাবে জানা যায় না। কিন্তু কুরআন ও ইতিহাস গ্রন্থের বর্ণনা মতে এতটুকু দেখা যায় যে, বনী ইস্রাঈলের মধ্যে 'কাহিন' তথা ধর্মযাজক একটি সম্মানতি পদ ছিল। তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সম্মানিত 'কাহিন' ও একজন নবী। নবীর তালিকায় আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ আর যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা, ইলিয়াছ এরা সকল নেককারদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৬৮১]

এখানে কাহিন বলতে ইসলামের প্রথম যুগে আরবের কাহিন বা জ্যোতিষী ছিল, যারা ভবিষ্যতের কথা ও অবস্থা বর্ণনা করত এবং যাদের কথা বিশ্বাস করা কুফরী বলা হয়েছে তা বনী ইস্রাঈলদের এ কাহিন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ কাহিন (ধর্মযাজক) যাদের উপর বায়তুল মোকাদ্দাসের ধর্মীয় কার্যাদি প্রতিপালন করার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এজন্য বিভিন্ন গোত্র হতে পৃথক পৃথক 'কাহিন' নিযুক্ত হত এবং নিজ নিজ গোত্রের নির্ধারিত অনুষ্ঠানাদি পালাক্রমে তাঁরাই পালন করতেন।

হযরত যাকারিয়া আ. হায়কালের অর্থাৎ সাখরায়ে বায়তুল মোকাদ্দাসের পবিত্র রসমাদি তথা প্রথাসমুহ পালন করতেন।[৬৮২]

৬৭৯. ফতহুল বারী শরহে বুখারী, কৃত ইবনে হাজর আসকালানী, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৫ ও তারীখে ইবনে কাসীর, খণ্ড ২, পৃ. ৪৭, সূত্র কাসাসুল কুরআন, কৃত হেফযুর রহমান, খণ্ড ২, পৃ. ২৫১

৬৮০. মাওলানা হেফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, খণ্ড ২, পৃ. ২৫০ ও মাওলানা আহের সুরাটি, ভারত, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪৭২

৬৮১. সূরা আনআম, ৮৫

৬৮২. মাওলানা হেফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, খণ্ড ২, পৃ. ২৫১

অপর এক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, হযরত যাকারিয়া আ. হযরত হারুন আ.'র বংশধর ছিলেন। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে ধুপ জ্বালাবার এবং পবিত্রতম স্থানসমূহের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। শনিবার দিন ও ঈদের উৎসবের সময়ে কোরবানীর সামগ্রীকে জ্বালিয়ে ফেলে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার দায়িত্ব তাঁর উপর ছিল।

হযরত যাকারিয়া আ.'র সময়কাল:

হযরত যাকারিয়া আ.'র সময়কাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী। যেহেতু তিনি হযরত ইয়াহিয়া আ.'র পিতা, ইমরান ইবনে মাসানের ভায়রা এবং ঈসা আ.'র মা মরিয়ম আ.'র খালু ও তাঁর তত্ত্বাবধায়ক। তাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত যাকারিয়া আ., হযরত ইয়াহিয়া আ. ও হযরত ঈসা আ. সমসাময়িক ছিলেন। (ইসলামী বিশ্বকোষ)

হযরত যাকারিয়া আ.'র পেশা:

নিঃসন্দেহে হযরত যাকারিয়া আ. বনী ইস্রাঈলের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদাবান একজন নবী ছিলেন। আল্লাহর নবীগণ কখনো পরনির্ভর বা অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকতে মোটেই পছন্দ করতেন না। তাই দেখা যায় এককে নবী জীবনযাপনের জন্য এককে ধরনের পেশা বেছে নিয়েছিলেন। মানুষ থেকে কিছু গ্রহণ করাকে দাওয়াতী কাজের বিনিময় মনে করা যেতে পারে বলে তারা সবর্দা মানুষের অনুগ্রহ হতে দূরে থাকতেন। আল কুরআনে নবীদের বক্তব্য এসেছে এভাবে-

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. অর্থ: দাওয়াতী কাজের মোকাবেলায় আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাইনা, আমার বিনিময় একমাত্র আল্লাহর নিকট। রাব্বুল আলামীনের নিকট।[৬৮৩]

এই ধারাবাহিকতায় হযরত যাকারিয়া আ.ও নিজের জীবিকার জন্য কাঠমিস্ত্রির পেশা গ্রহন করেছিলেন। মুসলিম, ইবেন মাজাহ, ও মুসনাদে আহমদ শরীফে বর্ণিত আছে যে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, যাকারিয়া আ. ছিলেন কাঠমিস্ত্রি।

উল্লেখ্য যে, হযরত যাকারিয়া আ. ও হযরত ইয়াহিয়া আ. হলেন পিতা ও পুত্র। তাছাড়া হযরত ইয়াহিয়া হলেন হযরত যাকারিয়া আ.'র দোয়া সফল। তাই পবিত্র কুরআনে প্রায় একই আয়াতে উভয়ের আলোচনা একত্রে বর্ণিত

---

৬৮৩. সূরা আশ'শূ'আরা, আয়াত: ১০৯

হয়েছে। ফলে যাকারিয়া আ.'র অনেক ঘটনা হযরত ইয়াহিয়া আ.'র সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। বহু সীরাত গ্রন্থে উভয় নবীকে একই শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত যাকারিয়া আ.'র ইন্তেকাল:

ইসহাক ইবনে বশর স্বীয় কিতাব 'আলমুবতাদা' এ হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ মি'রাজ রজনীতে আসমানে হযরত যাকারিয়া আ.'র সাথে সাক্ষাত করেন। সালাম করে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ইয়াহিয়ার পিতা! আপনি আপনার শাহাদাতের ঘটনাটি আমাকে বলুন। কেন আপনাকে শহীদ করা হয়েছিল? তিনি উত্তর দিলেন, হে আরবের মুহাম্মদ ﷺ! তা আমি আপনাকে বলছি, তা হল- ইয়াহিয়া স্বীয়কালে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সাথে নারীজাতির কোন সম্পর্ক ছিল না। বনী ইস্রাঈলের বাদশা'র রাণী তাঁর প্রতি আসক্ত হল। রাণী বড়ই অশ্লীল ছিল। সে ইয়াহিয়া আ.কে ডেকে পাঠাল। তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইযযত রক্ষা করেছেন। তিনি রাণীর কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে সে তাঁকে শহীদ করার প্রতিজ্ঞা করে বসল। ইস্রাঈলীদের ঈদের দিন ছিল। সেই ঈদে সবলোক অংশগ্রহণ করেছিল। বাদশাহ'র নিয়ম ছিল যে, ঈদের দিন যেই ওয়াদা করত তা পূরণ করত। কোন অবস্থাতেই ওয়াদা খেলাফী করত না। বাদশাহ ঈদের খুশীতে যোগ দেয়ার জন্যে বের হল। রাণী তাকে রাগান্বিত অবস্থায় বিদায় জানাল। বাদশাহ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল এর কারণ কি? ইতিপূর্বে তো এভাবে কখনো বিদায় দেয়া হয়নি। বাদশাহ বলল, আমার কাছে কিছু চাও? আজ যা চাইবে আমি তা দেবো। রাণী বলল, আমি ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়ার রক্ত চাই। বাদশাহ ওয়াদা করল, ঠিক আছে, ইয়াহিয়ার রক্ত তুমি পাবে। রাণী লোক পাঠিয়ে ইয়াহিয়া আ.'কে শহীদ করল। তখন তিনি স্বীয় কক্ষে ইবাদতে দণ্ডায়মান ছিলেন। যাকারিয়া আ. বলেন, তখন আমিও তার পাশে ইবাদতে মগ্ন ছিলাম। যাকারিয়া আ. বলেন, তাঁকে যবেহ করে মাথা ও রক্ত একটি পাত্রে করে রাণীর সামনে পেশ করা হয়েছিল। রাসূল ﷺ বললেন, তখন আপনি কিভাবে ধৈর্য্যধারণ করলেন? যাকারিয়া আ. বললেন, আমি নামায থেকে বের হইনি। তিনি বললেন, যখন যাকারিয়া আ.'র মাথা মোবারক রাণীর সামনে পেশ করা হল তখন বাদশাহ, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সকল দাস-দাসীসহ মাটিতে ধসে গিয়েছিল। এই ঘটনা রাতে সংঘটিত হয়েছিল।

সকালে উঠে যখন বনী ইস্রাঈলরা তাদের বাদশাহ'র পরিণতি দেখল তখন বলতে লাগল, এসব হওয়ার কারণ হল যাকারিয়া আ.'র খোদা অসন্তুষ্ট হয়েছে।

সুতরাং আমাদের বাদশাহ'র ধ্বংসের প্রতিবাদে আমরা সবাই যাকারিয়া আ.'র উপর অসন্তুষ্ট হই এবং তাঁকে হত্যা করি। অত:পর তারা আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমাকে খোঁজার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। এক ব্যক্তি এসে আমাকে এ ব্যাপারে সংবাদ দিলে আমি পলায়ন করলাম। ইবলিস ইস্রাঈলীদের আগে আগে থেকে তাদেরকে পথ পরিদর্শন করতেছে। তারা আমার পিছু নিয়েছে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তাদের হাত থেকে বাঁচতে পারব না, তখন রাস্তায় একটি গাছ পড়ল। গাছটি আমাকে আহবান করে বলল, 'আমার দিকে এসো। আমার দিকে এসো। আমি ওদিকে গেলাম আর গাছটি ফেটে গেল আর আমি তাতে প্রবেশ করলাম। ইত্যবসরে ইবলিস এসে আমার চাদরের আঁচল ধরে রাখল। গাছের উভয় অংশ মিলে গেল কিন্তু আমার চাদরের আঁচল বাইরেই থেকে গেল। ইস্রাঈলীরা আসল। ইবলিস বলল, এই গাছের ভিতর দেখ, চাদরের যে আঁচল দেখা যাচ্ছে তা যাকারিয়া আ.'র চাদর। তিনি স্বীয় যাদু বলে গাছের ভিতর প্রবেশ করেছেন। ইস্রাঈলী বলল, আমরা গাছটিতে আগুন লাগিয়ে দেব। ইবলিস বলল, গাছটিকে আরা দিয়ে ছিড়ে দাও। যাকারিয়া আ. বলল, আমি গাছের সাথে আরা দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলাম।

রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কোন ব্যথা কিংবা কষ্ট অনুভব করেন নি? উত্তরে তিনি বললেন, মোটেও না। ওই ব্যথা ও কষ্ট তো কেবল গাছে পেয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আমার রুহকে সেই গাছের ভিতর রেখে দিয়েছিলেন।[৬৮৪]

২৮. হযরত ইয়াহিয়া আ.

পবিত্র কুরআনে হযরত ইয়াহিয়া আ.'র আলোচনা হযরত যাকারিয়া আ.'র সাথে সূরা আলে ইমরান, সূরা আনআম, সূরা মরয়ম এবং সূরা আম্বিয়াতে এসেছে।

তিনি হযরত যাকারিয়া আ.'র পুত্র এবং তাঁর দোয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নামও স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা রাখেন এবং ইতিপূর্বে এ নামে কারো নাম রাখা হয়নি বলে কুরআনে ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا হে যাকারিয়া নিশ্চয় আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি একটি পুত্র সন্তানের, তার নাম হবে ইয়াহিয়া। ইতিপূর্বে কারো জন্যে এ নাম রাখা হয়নি।[৬৮৫]

[৬৮৪]. আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪ হি., কাসাসুল কুরআন, খণ্ড ২, পৃ. ৪৫৮-৪৫৯

[৬৮৫]. সূরা মরয়ম, আয়াত: ০৭

হযরত ইয়াহিয়া আ. ও হযরত ঈসা আ. প্রায় একই সময়ে মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করেন। সা'লবীর মতে ইয়াহিয়া আ. ঈসা আ.'র ছয়মাসের বড় ছিলেন। তিনি হযরত ঈসা আ. কে প্রথম সত্যায়নকারী এবং তাঁর নবুয়তের সুসংবাদদাতা ছিলেন।

হযরত ইয়াহিয়া আ.'র জন্মকাহিনী:

হযরত যাকারিয়া আ. ছিলেন বায়তুল মোকাদ্দাসের পেশ ইমাম। হযরত মরয়ম আ.'র মাতা হান্না এবং হযরত যাকারিয়া আ.'র স্ত্রী ও ইয়াহিয়া আ.'র মাতা ছিলেন সহোদর বোন। তাছাড়া যাকারিয়া আ. ছিলেন মরয়ম আ.'র খালু। সেই সূত্রে হযরত মরিয়ম আ.'র লালন-পালনের দায়িত্ব দাবি করেছিলেন তিনি। অন্যান্য খাদেমগণও যখন মরয়ম আ.কে লালন পালনের দায়িত্বের নিতে দাবি করল তখন লটারির মাধ্যমে হযরত মরয়মের দায়িত্ব পেলেন হযরত যাকারিয়া আ.। লটারির পদ্ধতি ছিল এরূপ-হযরত মরয়মের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার দাবীদারগণ তাদের তাওরাত লিখার কলমটি উর্দুন নদীর স্রোতে নিক্ষেপ করবে। যার কলম স্রোতে ভেসে যাবে না তিনিই তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হবেন। দেখা গেল সকলের কলম নদীর স্রোতে ভেসে গেল কেবল হযরত যাকারিয়া আ.'র কলম স্থির রইল। এভাবে তিনি খোদায়ী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে হযরত মরয়ম আ.'র তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. অর্থ: আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে, কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে এবং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিলো।[৬৮৬]

হযরত মরয়ম আ.কে তাঁর মা বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমতের জন্য মান্নত করেছিলেন। কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দাসে কোন নারী সেবিকা রাখার নিয়ম ছিল না। তবুও মরয়ম আ.'র মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁকে গ্রহণ করা হল। তবে তাঁর জন্য একটি মেহরাব তথা ইবাদতের একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্মাণ করে তাঁকে সেখানে রাখা হল। মেহরাবে উঠার একটি সিঁড়ি ও দরজা ছিল। তাতে হযরত যাকারিয়া আ. ব্যতিত কেউ যেতে পারতেন না। এর চাবি ছিল হযরত যাকারিয়া আ.'র হাতে।

[৬৮৬]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৪৪

তিনি তাঁর জন্য খাবার নিয়ে যেতেন এবং দেখে আসতেন। যাতায়াতের সময় দেখতেন হযরত মরয়ম আ.'র সামনে বেমৌসুমী ফলমূলের সমাহার। একাধিকবার যখন তিনি তা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন মরয়রকে জিজ্ঞেস করলেন, এসব তুমি কোথায় পেলে? মরয়ম আ. উত্তর দিলেন, তা আল্লাহর নিকট হতে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।

হযরত যাকারিয়া আ.'র কোন সন্তান ছিলনা। তিনি অনুভব করতেন যে, আমি সন্তান হতে বঞ্চিত। কিন্তু এর চেয়ে অধিক চিন্তার ছিল যে, তাঁর পরে সে গোত্রে এমন কোন উপযুক্ত লোক ছিল না যে, তাঁর পরে বনী ইস্রাঈলদের হেদায়তের ও সৎ পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করবে। তাই তিনি মনে মনে চিন্তা ভাবনা করতেন যে, আল্লাহ যদি আমাকে একজন নেককার ও সৎ প্রকৃতির সন্তান দান করতেন, তবে আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারতাম।[৬৮৭]

কিন্তু তাঁর বয়স যেহেতু মতান্তরে ৭৭/৯০/৯৯/১২০ হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। তাঁর স্ত্রীর বয়সও হয়েছিল আটানব্বই বছর। এ বাহ্যিক কারণে তিনি সন্তান লাভের ব্যাপারে এরকম নিরাশই ছিলেন যে, সন্তান আর কবে হচ্ছে? যদিও খোদায়ী শক্তি সামর্থ্যের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাছাড়া এভাবে অসময়ে অস্থানে দান করার খোদায়ী মহিমা ইতোপূর্বে তিনি কখনো প্রত্যক্ষ করেন নি। তাই এই যাবৎ সাহস করে পুত্রের জন্য দোয়া-মুনাজাত করেন নি। কিন্তু তাঁর শালীর মেয়ে হযরত মরয়ম আ.'র সামনে যখন বে-মৌসুমী ফল দেখতে পেলেন এবং জানতে পারলেন যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ আগত তখন তাঁর মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। তখন তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে পবিত্র সন্তানের জন্য দোয়া করলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর দোয়া কবুল হল। আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা তাঁকে ইয়াহিয়া আ.'র সুসংবাদ প্রদান করলেন। সাথে সাথে তাঁর কতিপয় গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও বর্ণনা করেন।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ . هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ . فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ

[৬৮৭]. ফতহুল বারী, শরহে বুখারী

يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ .

অর্থ: অত:পর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন– অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। যখনই যাকায়িা মেহরাবের মধ্যে তাঁর কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন– 'মারইয়াম'! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো? তিনি বলতেন, 'এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন। সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে, আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান কর– নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহ্র নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি সর্দার হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না, তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হবেন।[৬৮৮]

كهيعص . ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا . إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا . قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا . وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا . يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا . يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا .

অর্থ: কাফ–হা–ইয়া–আইন–সাদ। এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি, যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার অস্থি বয়স–ভারাবনত হয়েছে; বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে; হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফলমনোরথ হইনি। আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে নিয়ে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব-বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা! তাকে করুন সন্তোষজনক। হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্হিয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি।[৬৮৯]

[৬৮৮]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৭-৩৯
[৬৮৯]. সূরা মরয়ম, আগাত ১-৭

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ অর্থ: এবং যাকারিয়ার কথা স্মরণ করুন, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস।[৬৯০]

হযরত যাকারিয়া আ.'র বিস্ময় প্রকাশ:

হযরত যাকারিয়া আ.'র পুত্রের সুসংবাদ শুনে আনন্দিত হলেন এবং বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ তিনি বললেন, হে আল্লাহ! কেমন করে আমার পুত্র সন্তান হবে? আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা।[৬৯১]

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا অর্থ: সে বলল: হে আমার পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র হবে অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর আমিও যে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত।[৬৯২]

উক্ত আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত তাঁর বিস্ময়ের এবং কিভাবে পুত্র সন্তান হবে এরূপ প্রশ্ন করার কারণ হল- তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী বর্তমানে বার্ধক্যের যে পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি তা বহাল রেখেই পুত্র দান করা হবে, নাকি এতে কোন পরিবর্তন তথা যৌবনত্ব দান করে কিংবা আমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দূর করে সন্তান দেয়া হবে? জবাবে ফেরেস্তা বললেন, আমি এতটুকু জানি যে, যে অবস্থায় হোক না কেন আপনারা অবশ্যই পুত্র সন্তান লাভ করবেন। অথবা আপনাদের বার্ধক্য অবস্থায়ই সন্তান লাভ করবেন। ফেরেশতা আরো বললেন, قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ এভাবে আল্লাহর যা ইচ্ছা তা তিনি করেন।[৬৯৩]

قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا 'তিনি বলেন, এমনিতেই হবে, আপনার রব বলেন, এটা আমার পক্ষে সহজ, আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না।[৬৯৪]

[৬৯০]. সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৯
[৬৯১]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৪০
[৬৯২]. সূরা মরিয়ম, আয়াত: ৮
[৬৯৩]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৪০
[৬৯৪]. সূরা মরয়ম, আয়াত : ৯

সন্তান লাভের নিদর্শন অন্বেষণ:

হযরত যাকারিয়া আ. পুত্র লাভের সুসংবাদ ও প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর আত্মতৃপ্তির জন্য এবং পুত্র জন্মের পূর্বেই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মশগুল হওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর নিকট কোন একটি নিদর্শন প্রদানের নিবেদন করলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এ নির্দশন দিলেন যে, তিনদিন পর্যন্ত তুমি মানুষের সাথে ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কথা-বার্তা বলতে সমর্থ হবে না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ অর্থ: তিনি বললেন, হে পালনকর্তা! আমার জন্য কিছু নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার জন্য নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলবে না। তবে ইশারা ইঙ্গিতে করতে পারবে এবং তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে আর সকাল–সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।[৬৯৫]

آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا . فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا . অর্থ সে বলল: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন: তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। অত:পর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলল।[৬৯৬]

অধিকাংশ তাফসীরকারকগণ তিনদিন পর্যন্ত কথা বলতে না পারার বিশ্লেষণ করছেন এভাবে- أَعْقَلَ لِسَانَهُ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا عِلَّةٍ وَقَالَ زَيْدُبْنُ أَسْلَمِ مِنْ غَيْرِ خَرَسٍ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُكَلِّمَ قَوْمَهُ إِلَّا إِشَارَةً . তাঁর মুখ রোগ-ব্যাধি ছাড়া তিনদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর যায়েদ ইবনে আসলাম রা. বলেন, তাঁর মুখ বোবা রোগ হতে মুক্ত থেকে তিনদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর মধ্যে এমন ক্ষমতা রইল না যে, ইশারা ও ইঙ্গিত ছাড়া কওমের সাথে কথা বলেন।[৬৯৭]

[৬৯৫]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪১
[৬৯৬]. সূরা মরয়ম, আয়াত, ১০-১১
[৬৯৭]. মাওলানা হেফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, খণ্ড ২, পৃ. ২৬১

ইবনে যায়েদ বলেন, তিনি তাওরাত তিলাওয়াত এবং তাসবীহ পাঠ করতে পারতেন কিন্তু কারো সাথে কথা বলতে পারতেন না।

হযরত যাকারিয়া আ. ছিলেন বায়তুল মোকাদ্দাসে তাঁর ইবাদতের নির্দিষ্ট কক্ষে। নিদর্শন স্বরূপ তাঁর স্বাভাবিক বাক্যালাপ বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি মুখ ও জিহ্বা দিয়ে কারো সাথে কোন কথা বলতে পারছিলেন না। প্রার্থনা কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসলেন তিনি। লোকেরা বায়তুল মোকাদ্দাসের বাইরে অপেক্ষমান ছিল। লোকেরা সবিস্ময়ে দেখল হযরত যাকারিয়া আ.'র চেহারা স্বাভাবিক নয়। তারা তাঁর এ রকম হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি তখন ইশারায় সবাইকে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর তাসবীহ ও পবিত্রতা ঘোষণা করার নির্দেশ দিলেন।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. অত:পর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলল: ।[৬৯৮]

পরবর্তী পর্যায়ে হযরত ইয়াহিয়া আ. জন্মগ্রহণ করেন এবং আল্লাহর ওয়াদা ও সুসংবাদ বাস্তবায়িত হল। অষ্টম দিনে খতনা করা হল। তাঁর পিতার নামানুসারে তাঁর নাম সখরিয়া রাখতে চাইলে মা বললেন, না, তা নয়, বরং তাঁর নাম হবে ইয়াহিয়া।

আত্মীয়স্বজনরা বলল, আপনার গোষ্ঠীর মধ্যে এ নামে তো কাউকে ডাকা হয় না। পরে তারা তাঁর পিতাকে সংকেতের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করল, আপনার ইচ্ছা কী? এর কী নাম রাখা হবে? তিনি একখানা লিপিফলক চেয়ে নিয়ে লিখলেন, এর নাম ইয়াহিয়া। আর তখনই তাঁর মুখ এবং জিহ্বা খুলে গেল এবং কথা বলতে লাগলেন আর প্রভূকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন।[৬৯৯]

হযরত ইয়াহিয়া আ.'র বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী:

পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় হযরত যাকারিয়া আ. পুত্র সন্তানের জন্য প্রার্থনা করার সময় দু'টি গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। একটি ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً পবিত্র সন্তান।[৭০০] অপর স্থানে বলা হয়েছে وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا হে আমার প্রভু! তাকে করিও

[৬৯৮]. সূরা মরয়াম, আয়াত : ১১

[৬৯৯]. মাওলানা তাহের সুরাটি, ভারত, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪৯০

[৭০০]. আলে ইমরান, আয়াত: ৩৮

সন্তোষজনক।[৭০১] অর্থাৎ যার প্রতি আপনি তুষ্ট থাকবেন এবং আপনার বান্দারাও যাকে পছন্দ করবে।

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা মতে, আল্লাহ তায়ালা যাকারিয়া আ.'র এই মিনতিপূর্ণ দোয়া কবুল করেছেন উত্তমরূপে। কারণ পুত্রের সুসংবাদ দেয়ার সময় প্রায় দশ-এগারটি সৎগুণে গুনান্বিত করবার আগাম ঘোষণাও আল্লাহ তায়ালা প্রদান করলেন।

যেমন সূরা আলে ইমরানের আয়াতে বলা হয়েছে- أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى ১. مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. আল্লাহর কালিমা অর্থ: হযরত ঈসা আ.কে সত্যায়নকারী ২. সায়্যিদ তথা মহান নেতা, ৩. হাসূর তথা কামরিপুমুক্ত ৪. নবী, ৫. পূণ্যবানদের অর্ন্তভূক্ত। সূরা মরয়মের আয়াতে বলা হয়েছে- وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম ৬. বিচার বুদ্ধি জ্ঞান ৭. আমার পক্ষ থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা, ৮. সে ছিল মুত্তাকী, ৯. পিতা-মাতার অনুগত ১০. সে ছিলনা উদ্ধত ও অবাধ্য ১১. তার প্রতি শান্তি যে দিন সে জন্মলাভ করে, যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবে।[৭০২]

উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য সমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

এক. سيد সায়্যিদ শব্দের সরল অর্থ সরদার বা নেতা। তাছাড়া, প্রভু, মালিক, অভিজাত, গুণী, মহান, সহনশীল। স্বীয় সম্প্রদায়ের অনাচারবহনকারী, স্বামী, অগ্রবর্তী ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ সকল গুণ হযরত ইয়াহিয়া আ.'র জন্য প্রযোজ্য হতে পারে এবং উপরোল্লেখিত গুণাবলী সমূহের কারণে সমকালীন সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি।

দুই. حصورًا আত্মরুদ্ধ ও অতিশয় সংযমী। যে নারীসঙ্গ হতে নিজেকে বিরত রাখে। কামশক্তি অটুট ও পূর্ণাঙ্গ থাকা সত্ত্বেও নারী সহবাস করে না। বস্তুত: ইয়াহিয়া আ. শৈশব হতেই আল্লাহর প্রতি এমন নিবেদিত ছিলেন যে, কোন প্রকার পার্থিব ভোগ-বিলাসে, আমোদ-ফুর্তি, নারীসঙ্গ তথা বিবাহ এমনকি

[৭০১]. সূরা মরয়ম, আয়াত: ৬

[৭০২]. সূরা মরয়ম, আয়াত:-১২-১৫

শিশু বয়সেও খেলাধুলার প্রতি অনীহা ছিলেন। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কখনও গুনাহের ইচ্ছা করেন নি।

নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, كُلُّ اِبْنِ آدَمَ يَلْقَى اللهَ بِذَنْبٍ قَدْ اَذْنَبَهُ يُعَذِّبُهُ عَلَيْهِ اِن شَاءَ اَوْ يَرْحَمُهُ اِلَّا يَحْيٰى اِبْنَ زَكَرِيَّا فَاِنَّ اللهَ يَقُوْلُ سَيِّدًا وَحَصُوْرًا অর্থ: প্রত্যেক আদম সন্তান আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে এই অবস্থায় যে, সে কোন না কোন গুনাহ করেছে। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে আযাব দিবেন অথবা দয়া করবেন, কিন্তু ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়া ব্যতিত। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে বলেছেন তিনি সরদার ও স্ত্রী-বিরাগী।

উল্লেখ্য যে, ইয়াহিয়া আ.'র অনীহা শুধু বিবাহ বা নারী সঙ্গের ব্যাপারে ছিল না, বরং উত্তম পানাহার, উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ, আরাম-আয়েশ এই সবের কোন কিছুর প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না।

তিন. ونبيا তিনি নবীর তালিকাভুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনিই ছিলেন তাওরাত অনুসারী সর্বশেষ নবী।

চার. من الصالحين তিনি পূণ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

পাঁচ. اتيناه الحكم صبيًا অর্থাৎ শৈশবে আমি তাকে হেকমত দান করেছি। এর দ্বারা অনেকেই তাকে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমরূপে শৈশবে নয় বছর বা সাত বছর বয়সে অথবা তিন বা দুই বছর বয়সেই তাঁকে নবুয়ত দেয়া হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে মুহাক্কেকীনদের মতে الحكمة দ্বারা ইলম, বুদ্ধিমত্তা, সাধনা, সাহসিকতা, যাবতীয় কল্যাণের প্রতি আকর্ষণ এবং এতে যথাসাধ্য সাধনা করবার যোগ্যতা উদ্দেশ্য। কাতাদাহ র. বলেছেন, দুই বা তিন বছর বয়সের সময়ই ইয়াহিয়া আ.'র মধ্যে এই সব যোগ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। তাছাড়া অন্যান্য নবীগণের ব্যতিক্রমভাবে তাঁকে চল্লিশ বছরের পূর্বে নবুয়ত দান করা হয়েছিল। যেহেতু তাঁর শাহাদাত হয়েছিল ত্রিশ বছর বয়সে। সেহেতু তাকে ত্রিশ বছরের পূর্বেই নবুয়ত দান করা হয়েছিল।

মোট কথা তুলনামূলক কম বয়সে ভবিষ্যতে নবুয়ত প্রদানের ভূমিকা ও পূর্ব প্রস্তুতিরূপে তাঁকে শৈশবেই হিকমত ও তাওরাতের ইলম দান করা হয়েছিল।

নবী করিম ﷺ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, বালকরা ইয়াহিয়াকে বলল- চল, আমরা খেলতে যাই। তিনি বললেন, খেলাধুলার জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং চল, আমরা সালাত আদায় করি। এটাই আল্লাহ তায়ালার বাণী واتيناه الحكمة এর মর্ম।

নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, اعطى الفهم والعبادة وهو بين سبع سنين অর্থাৎ সাত বছর বয়সেই তাঁকে বুদ্ধিমত্তা ও ইবাদত (এর অভ্যাস) দান করা হয়েছিল।

ছয়. حنانا এর আভিধানিক অর্থ দয়া, মমতা, হৃদয়ের কোমলতা, বরকত ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম حنان একই ধাতুমূল হতে গঠিত। অর্থাৎ তাঁর প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত এবং তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ, যাতে তিনি তাদেরকে কুফর ও শিরক হতে মুক্ত করেন।

সাত. زكوة এর অর্থ পবিত্রতম। তিনি যাবতীয় পাপ-পংকিলতা থেকে সম্পূর্ণ পুত-পবিত্র ছিলেন। অথবা তাঁর পিতাকে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সাদকা হিসেবে প্রদান করেছিলেন।

আট. تقيا অর্থ মুত্তাকী, পরহেযগার, আল্লাহভীরু। আল্লাহর আদেশাবলী পালন এবং পাপাচার ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জনের মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে ও পূর্ণ আত্মসমর্পণের সাথে অনুগতকারী।

নয় ও দশ. وبرًّا بوالديه পিতা-মাতার অনুগত, এর সংযুক্ত নেতিবাচক গুণ ولم يكن جبارًا عصيًا তিনি উদ্ধত অবাধ্য ছিলেন না। সৃষ্টির প্রতি উদ্ধত আচরণকারী ছিলেন না। আল্লাহর হুকুমের অবাধ্য ছিলেন না। তদ্রুপ পিতা-মাতার প্রতি দুর্ব্যবহারকারী ও তাদের অবাধ্য ছিলেন না।

এগার. وسلم عليه يوم والد ويوم يموت ويوم يبعث حيا সালাম অর্থ নিরাপত্তা। মানব শিশুর জন্মকালে শয়তান তাকে যে নির্যাতন করে তা থেকে ইয়াহিয়া আ. ছিলেন আল্লাহর পক্ষ হতে নিরাপদ। তদ্রুপ মৃত্যুকালে পৃথিবী ত্যাগের কষ্ট ও কবরের আযাব হতে নিরাপত্তা পেয়েছিলেন তিনি। আর কিয়ামতে পুনরুত্থান কালে হাশর ময়দানের ভয়াবহতা ও জাহান্নামের আযাব হতেও তিনি নিরাপত্তা লাভ করবেন। জন্ম, মৃত্যু ও কিয়ামাত পুনরুত্থান এই তিনটি সময় মানুষের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ। এই ভয়াবহতা থেকে আল্লাহ তায়ালা ইয়াহিয়া আ.কে নিরাপত্তা দান করেছেন।[৭০৩]

[৭০৩]. মাওলানা তাহের সূরাটি, (ভারত), কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪৯২-৪৯৫

ইয়াহিয়া আ.'র হৃদয়ের কোমলতা ও প্রচণ্ড আল্লাহ ভীরুতা:

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইয়াহিয়া আ. অত্যন্ত কোমলপ্রাণ ছিলেন এবং প্রচণ্ড আল্লাহ ভীতির কারণে সবর্দা ক্রন্দন করতেন। এমনকি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর গণ্ডদেশে অশ্রুরেখার দাগ বসে গিয়েছিল এবং তাঁর মাড়ি উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

একবার পিতা যাকারিয়া আ. তাঁকে খুঁজবার জন্য প্রান্তরে আসলেন এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখলেন, তিনি একটি কবর খনন করে তার মধ্যে বসে কাঁদছেন। পিতা বললেন, প্রাণপ্রিয় পুত্র! আমরা তোমাকে না দেখে অস্থির আর তুমি এভাবে কেঁদে জীবন কাটাচ্ছ? ইয়াহিয়া আ. বললেন, আব্বাজান! আপনিই তো আমাকে বলেছেন যে, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে এমন এক বিশাল মরুপ্রান্তর রয়েছে যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীদের চোখের অশ্রু ব্যতিত অতিক্রম করা যাবে না এবং জান্নাতে পৌঁছা যাবে না। যাকারিয়া আ. বললেন, পুত্র! কাঁদ এবং উভয়ে একসঙ্গে কাঁদতে লাগলেন।[৭০৪]

ইয়াহিয়া আ.'র নবুয়ত ও নবুয়তী কর্মধারা:

ইহুদীরা তাদের বদ প্রকৃতির ধারায় হযরত ইয়াহিয়া আ.'র নবুয়তের স্বীকৃতি প্রদান করে নি। খ্রিষ্টানরা হযরত যাকারিয়া আ.কে 'যাজক' সাব্যস্ত করে এবং ইয়াহিয়া আ.কে হযরত ঈসা আ.'র অগ্রবর্তী ঘোষক সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনে একাধিক স্থানে তাদের উভয়কে বিশিষ্ট নবীগণের তালিকাভুক্ত রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইয়াহিয়া আ.'র নবুয়তী কর্মধারাকে দু'টি মৌলিক পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। ক. হযরত মুসা আ.'র শরীয়তের পুনরুজ্জীবন তথা তাওরাতের শিক্ষা বিস্তার। يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ 'হে ইয়াহিয়া! দৃঢ়তার সাথে কিতাব (তাওরাত) ধারণ কর।' আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তাওরাত ধারণ করে তা শিক্ষা দেওয়া এবং এর বিধান বাস্তবায়ন করা ছিল তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। তিনিই ছিলেন তাওরাতের অনুসারী বনী ইস্রাঈলীদের জন্য সর্বশেষ নবী।

খ. হযরত ইয়াহিয়া আ.'র নবুয়তী দায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় বিষয় ছিল হযরত ঈসা আ.'র সত্যায়ন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ আয়াতে আল্লাহর কালিমা দ্বারা হযরত ঈসা আ. উদ্দেশ্য।

[৭০৪]. ইবনে কাসীর র., ৭৭৪ হি., আল বিদায়াওয়ান নিহায়া, খণ্ড-২, সূত্র কাসাসুল আম্বিয়া, কৃত তাহের, সুরাটি, ভারত, পৃ. ৪৯৫ ও কাসাসুল কুরআন, কৃত মাওলানা হেফযুর রহমান, উর্দু, খণ্ড-২, পৃ. ২৭০-২৭১ ও ইবনে আসাকের, খণ্ড ৬৪, পৃ. ২০৫, সূত্র. জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৭৫২

মূলত তাওরাত যুগের শেষ ও ইঞ্জিল যুগের সূচনা সন্ধিক্ষণে আগমনের কারণে হযরত ইয়াহিয়া আ. ছিলেন দু'টি যুগের সমন্বয়কারী এবং সে কারণেই তিনি একাধারে তাওরাত অনুসারী বনী ইস্রাঈলের শেষ নবী এবং ইঞ্জিলের বাহক হযরত ঈসা আ.'কে সত্যয়নকারী, তাঁর অগ্রবর্তী পথ প্রস্তুতকারী ও তাঁর বিশিষ্ট দ্বাদশ শিষ্যের (হাওয়ারীর) অন্যতম।[৭০৫]

হযরত ইয়াহিয়া আ.'র মৃত্যু:

হযরত ইয়াহিয়া আ.'র মৃত্যু সম্পর্কে একাধিক ঘটনা বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। এরূপ একটি ঘটনা হযরত যাকারিয়া আ.'র মৃত্যু ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ হযরত ইয়াহিয়া আ. যখন আল্লাহ তায়ালার ধর্মপ্রচার করলেন এবং মানুষকে একথা বলতে লাগলেন যে, আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আল্লাহর একজন পয়গাম্বর আসছে। তখন তাঁর সাথে ইহুদীদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়। ফলে তারা তাঁর বুর্যুগী ও আল্লাহ তায়ালার প্রিয়ভাজন হওয়া মেনে নিতে এবং তাঁর আহবান বরদাশত করতে পারল না। একদিন তারা সকলে একত্রিত হয়ে তাঁর নিকট এল এবং তাঁর সাথে সওয়াল জবাব শুরু করে দিল। লোকজন বলল, তুমি কি মসীহ? তিনি বললেন, না। তারা বলল, তুমি কি সেই নবী? তিনি না বাচক উত্তর দিলেন। তারা বলল, তুমি কি ইলিয়া নবী? তিনি বললেন, না। তারা বলল, তবে তুমি কে যে এরূপ প্রচার করছ এবং আমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছ? তিনি বললেন, আমি অরণ্যে আহবানকারী এক আওয়ায যা সত্যের জন্য ধ্বনিত হয়েছে। এসব কথা শুনে ইহুদীরা উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং তাঁকে শেষ পর্যন্ত আরো কিছু অজুহাত তালাশ করে শহীদ করে ফেলল।[৭০৬]

তৃতীয় ঘটনা ঃ ইবনে আসাকের 'আল মুস্তাকসা ফী ফাযায়েলিল আকসা' নামক গ্রন্থে হযরত মুয়াবিয়া রা.'র মাওলা কাসেম থেকে এক দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। যাতে হযরত ইয়াহিয়া আ.'র মৃত্যুর ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে। দামেশকের বাদশাহ হাদাদ ইবনে হাদার তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিল। অতঃপর তাকে পুণরায় স্ত্রীরূপে ফিরিয়ে আনার জন্য হযরত ইয়াহিয়া আ.' থেকে ফতোয়া চাইল। তিনি বললেন, না, এখন এ স্ত্রী তোমার জন্য হারাম। রাণী তাঁর এ উক্তিতে ভীষণভাবে চটে গেল এবং তাঁকে হত্যা করার পেছনে লেগে গেল। একদা যখন তিনি হেবরুনের মসজিদে নামাযরত ছিলেন,

[৭০৫]. মাওলানা তাহের সূরাটি, ভারত, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪৯৬

[৭০৬]. আল্লামা ইবনে কাসির র. ৭৭৪ হি., আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, খণ্ড ২, পৃ. ৫৩, সূত্র. কাসাসুল কুরআন, কৃত মাওলানা হেফযুর রহমান, খণ্ড ২, পৃ. ২৭১

তখন এক ঘাতক দ্বারা তাঁকে হত্যা করল এবং কাঁচের পাত্রে করে মস্তক ঐ রাণীর সন্মুখে পেশ করল। কিন্তু ছিন্ন মস্তক সে অবস্থায়ও বলতে লাগল-'তুই বাদশাহ'র জন্য হালাল নয়।' এ অবস্থায় আল্লাহর আযাব এসে সে স্ত্রী লোকটিকে হযরত ইয়াহিয়া আ.'র মস্তক মোবারক সহ মাটির নীচে গেড়ে ফেলল। অতঃপর বখতনসর দামেশক জয় করে সত্তর হাজার ইস্রাঈলীকে হত্যা করতঃ রক্ত গঙ্গা বয়ে দিয়ে তাঁর প্রতিশোধ নিয়েছিল।[৭০৭]

চতুর্থ ঘটনা ঃ বাদশাহ'র স্ত্রী হযরত ইয়াহিয়া আ.'র প্রেমে পড়েছিল। রাণী তাঁকে ডেকে পাঠাল কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তার ডাকে সাড়া দিলেন না। রাণী যখন নৈরাশ হয়ে গেল তখন বাহানা করে বাদশাহ'র নিকট ইয়াহিয়া আ.কে হত্যার দাবী করল। বাদশাহ প্রথমে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে পরিশেষে সম্মত হল। এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে তাঁকে হত্যা করিয়ে তাঁর মস্তক ও রক্ত মোবারক একটি পাত্রে করে স্ত্রীর সামনে পেশ করা হল।[৭০৮]

পঞ্চম ঘটনা ঃ বনী ইস্রাঈলের বাদশাহ'র নাম ছিল হিরোদৌস। তার এক ভাতিজি ছিল। সে তার সৌন্দর্যে মোহিত হল। তাদের শরীয়তে ভাতিজিকে বিবাহ করা হারাম ছিল। সে তাকে বিবাহ করার মনস্থ করল। হযরত ইয়াহিয়া আ. এ কাজে তাকে বাধা দিলেন। বাদশাহ প্রতিদিন ওই মহিলার একটি প্রয়োজন পূরণ করত। ইয়াহিয়া আ.'র বাধা দানের খবর যখন ওই মহিলার মায়ের কাছে পৌঁছল সে মেয়েকে বলল, বাদশাহ যখন তোমার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করবে তখন তাকে বলবে ইয়াহিয়া আ.কে হত্যা করুন। বাদশাহ'র কাছে গেলে কথা মত সে বাদশাহ'র নিকট নিবেদন করল- আমি চাই যে, আপনি ইয়াহিয়াকে যবেহ করে দিন। বাদশাহ বলল, এটা অসম্ভব। এটা ছাড়া তুমি অন্য কিছু চাও। মহিলা অন্য কিছু চাওয়া অস্বীকার করল। অবশেষে বাদশাহ ইয়াহিয়া আ.কে ডেকে আনল এবং তাঁর মাথা কেটে একটি পাত্রে রেখে ওই মহিলার নিকট পাঠাল। মহিলা কর্তিত মস্তক দেখে বলল, আজ আমার চক্ষু শীতল হল।' মহিলা ঘরের ছাদে উঠল। সেখান থেকে নীচে পড়ে গেল। নীচে রক্তপিপাসু কুকুর ছিল। কুকুর তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং তাকে খেয়ে ফেলল। সর্বশেষ তার চক্ষু খেয়েছিল, যাতে উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণ করে।[৭০৯]

[৭০৭]. মাওলানা হেফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, খণ্ড ২, পৃ. ২৭১ ও ইবনে আসাকের।
[৭০৮]. ইবনে কাসীর র., ৭৭৪ হি. কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৯৪৪, সূত্র. জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৭৫৩
[৭০৯]. তারীখুল কামেল, খণ্ড ১, পৃ. ৩০২, সূত্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫২

হযরত ইয়াহিয়া আ.'র শাহাদাতের স্থান ও কবর শরীফঃ

হযরত ইয়াহিয়া আ.কে কোথায় শহীদ করা হয়েছিল এই ব্যাপারে সীরাত ও ইতিহাসবিদগণের দু'টি মত রয়েছে। শাম্মার ইবনে আতিয়্যা হতে সুফিয়ান সওরী'র বর্ণনা অনুসারে বায়তুল মোকাদ্দাসের 'হায়কাল' ও কুরবানীর স্থানের মধ্যবর্তী সত্তর জন নবীকে শহীদ করা হয়েছিল এবং ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়া আ. ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অপরদিকে সাঈদ ইবনে মুস্যায়িব র. হতে আবু উবাইদা কাসিম ইবনে সাল্লামের বর্ণনা মতে, তাঁকে দামেশকে শহীদ করা হয়েছিল এবং বখতনসর দামেশক আক্রমণকালে সে ইয়াহিয়ার রক্ত উত্তোলিত হতে দেখে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল এবং ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার কথা স্বীকার করলে বখতনসর তার প্রতিশোধ স্বরূপ সত্তর হাজার ইহুদীকে হত্যা করবার পর ইয়াহিয়া আ.'র রক্ত শান্ত হয়ে বন্ধ হয়েছিল। ইবনে কাসীর র. এই বর্ণনাকে প্রামাণ্য বলেছেন। তবে সেই সঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, তা দ্বারা আতা ও হাসান বসরীর বর্ণনার সমর্থনে বখতনসরের দামেশক অভিযান ঈসা আ.'র সমসাময়িক হওয়া মেনে নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ২) কিন্তু তখন বিষয়টি আবার ইতিহাসের প্রায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের সাথে সংঘাতপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে ইয়াহিয়া আ.'র শাহাদাতের স্থান দামেশকে হওয়ার বিষয়টি ইবনে আসাকেরের সমর্থিত বর্ণনা।

আল্লামা ইবনে কাসীর র. হযরত ইয়াহিয়া আ.'র মস্তক মোবারক সম্পর্কে ইবনে আসাকেরের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন যে, হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াকেদ বলেন, আমি হযরত ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়া আ.'র মস্তক মোবারক দেখেছি। যখন দামেশকে মসজিদ নির্মাণের জন্য খননকালে মসজিদের মেহরাবের নিকটবর্তী পূর্ব পাশে ইয়াহিয়া আ.'র মস্তক বের হয়েছিল। তাঁর মুখমণ্ডল ও চুল মোবারকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসেনি বরং সম্পূর্ণ অক্ষত ও অবিকৃত ছিল। তা এমনভাবে রক্তে রঞ্জিত দেখাচ্ছিল যেন এখনই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। আরো বর্ণিত আছে যে, ওই মস্তক মোবারক 'সাকাসিক্কাহ' নামক স্তম্ভের নীচে দাফন করে দেয়া হয়।[৭১০]

'তাফরীহুল আযকিয়া' নামক গ্রন্থে উক্ত বর্ণনাকে আরো একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যায়েদ ইবনে ওয়াকেদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান দামেশকের জামে মসজিদ নির্মাণের জন্য আমাকে দায়িত্ব দিলেন। আমি তাতে একটি মিনারাহ দেখলাম। আমি ওটা সম্পর্কে ওয়ালীদকে অবহিত করলাম। তিনি উভয় হাতে বাতি নিয়ে এসে মিনারাহ'র নীচে অবতরণ করলেন। সেখানে একটি সিন্ধুক পেলেন। সেটি খুলে

[৭১০]. আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪ হি. কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৯৪৬, সূত্র. জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৭৫৫

দেখলেন, দেখলেন তাতে একটি জামা পরিহিত পাত্র। তাতে ছিল হযরত ইয়াহিয়া আ.'র মস্তক মোবারক। কাপড়ের উপর লিখিত আছে যে, এটি হযরত ইয়াহিয়া আ.'র মস্তক। ওই মস্তক মোবারককে সেখানেই রেখে দেয়া হল এবং ওখানে একটি গম্বুজ নির্মাণ করে দেয়া হল। লোকেরা তাঁর যিয়ারত করত এবং তাঁর থেকে বরকত হাসিল করত। তবে তাঁর শরীর মোবারক দাফন হয়েছিল বায়তুল মোকাদ্দাসে।[৭১১]

২৯. হযরত উযায়ের আ.

হযরত উযায়ের আ.'র নাম পবিত্র কুরআনে মাত্র একবার ব্যবহার হয়েছে। তাহল وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ইহুদীরা উযায়েরকে আল্লাহর পুত্র বলত।[৭১২]

তাঁর নাম উযায়ের, পিতার নাম জাবরুহ। কেউ বলেছেন, শওরীক, কেউ বলেছেন সারওয়াহান। তাঁর সম্পর্কে বিশুদ্ধ কোন রেওয়ায়েত নেই। তবে ইস্রাঈলী দুর্বল রেওয়ায়েত দ্বারা তাঁর জীবনের কিছু অংশ জানা যায়।

বখতনসর যখন বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণ করে তখন উযায়ের আ. ছিলেন ছোট। বখতনসর যেসব বন্দীদেরকে বাবেলে নিয়ে গিয়েছিল উযায়ের আ.ও তাদের মধ্যে ছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হেকমত দান করেন। ফলে তিনি বনী ইস্রাঈলের মধ্যে ফকীহ হিসেবে সাব্যস্ত হলেন। বাবেল শহরেই তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বনী ইস্রাঈলের বন্দী অবস্থা থেকে শুরু করে আযাদী পর্যন্ত অতঃপর বায়তুল মোকাদ্দাস দ্বিতীয়বার আবাদ হওয়া পযর্ন্ত তিনি তাদের সাথেই ছিলেন। তিনি তাঁর সময়কালের তাওরাতের সবচেয়ে বড় আলেম ও হাফেয ছিলেন।[৭১৩]

ইহুদীরা উযায়ের আ.কে আল্লাহর পুত্র বলার কারণঃ

আতিয়্যা আউফির সূত্রে ইমাম বগভী র. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, ইহুদীদের মধ্যে "উযায়ের আল্লাহর পুত্র" এই ধারণাটি সৃষ্টি হয়েছিল এভাবে- হযরত উযায়ের যখন নবী হিসেবে প্রেরিত হলেন, তখন ইহুদীদের কাছে ছিল তাওরাত ও তাবুত। কিন্তু তারা তাওরাতের উপর আমল করত না। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের বক্ষাভ্যন্তর থেকে তাওরাত উঠিয়ে নেন

[৭১১] তাফসীরে আযকিয়া, খণ্ড ২, পৃ. ৭০৮, সূত্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৬
[৭১২] সূরা তাওবা, আয়াত : ৩০
[৭১৩] ইবনে আসাকের, খণ্ড ৪০, পৃ. ৩১৮, দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলাম, খণ্ড ১৩, পৃ. ৩২৮, সূত্র. জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৭১৩

এবং সাথে সাথে তাবুতও উঠিয়ে নেন। এভাবে তাদের স্মৃতিপট থেকে আসমানী কিতাব সম্পূর্ণ মুছে যায়। পুণরায় তাওরাত ও তাবুত ফিরে পাবার আশায় তারা সমবেত হয় হযরত উযায়ের নিকট। তিনি আল্লাহর নিকট রোদনভরা প্রার্থনা পেশ করেন। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবীর প্রার্থনা কবুল করেন এবং ফিরিয়ে দেন তাওরাতকে। সম্পূর্ণ তাওরাত তাঁর স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তখন তিনি ইহুদীদেরকে ডেকে বললেন, হে বনী ইস্রাঈল! আল্লাহ পাক পুণরায় তাওরাত ফিরিয়ে দিয়েছেন। শোন, আমি তাওরাত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করছি। বিস্মৃত তাওরাতের আদ্যোপান্ত পাঠ শুনে ইহুদীরা নির্বাক হয়ে যায়। এর দীর্ঘদিন পর আল্লাহপাক তাবুতও ফিরিয়ে দেন। তাবুতের মধ্যে রক্ষিত ছিল তাওরাত। হযরত উযায়ের কর্তৃক পঠিত তাওরাত ও তাবুতে রক্ষিত তাওরাতের মধ্যে সৌসাদৃশ্য লক্ষ করে ইহুদীরা বিস্মিত হয়ে যায়। এবং বলতে শুরু করে নবী উযায়ের নিশ্চয় আল্লাহর পুত্র। না হলে আল্লাহ তাঁকে এভাবে তাওরাত দান করতেন না।

কালবী বর্ণনা করেন, বনী ইস্রাঈলের উপর বিজয়ী হওয়ার পর সম্রাট বখতনসর তাওরাতের আলেমগণকে হত্যা করে। হযরত উযায়ের ওই সময় ছিলেন শিশু। তাই তাকে হত্যা করা হয়নি। সত্তর অথবা একশত বছর পর বখতনসরের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে বনী ইস্রাঈলরা যখন বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরে আসে, তখন তাওরাত সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছে। ওদিকে এক বস্তিতে হযরত উযায়েরকে একশতবছর মৃত্যুবৎ রেখে দিয়েছিলেন আল্লাহ তায়ালা। এরপর তাঁকে পুর্ণজ্জীবিত করে নবী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন বনী ইস্রাঈলের নিকট। তিনি তাদেরকে বিস্মৃত তাওরাতের শিক্ষা দান করেন। এক ফেরেশতা হযরত উযায়ের আ.কে এক পেয়ালা পানি পান করান। সঙ্গে সঙ্গে সর্ম্পূণ তাওরাত তাঁর স্মৃতিবদ্ধ হয়। তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের নিকটে গিয়ে বললেন, আমি উযায়ের! লোকেরা বলে যদি তুমি উযায়ের হও, তবে আমাদেরকে তাওরাত লিখে দাও। হযরত উযায়ের আ. সম্পূর্ণ তাওরাত লিপিবদ্ধ করেন। কিছুদিন পর এক লোক বলে আমার পিতাকে আমার পিতামহ বলেছিলেন, তাওরাতের একটি অনুলিপি মটকির মধ্যে পুরে পুস্পপল্লবিত একটি আঙ্গুরের গাছের গোড়ায় পুঁতে রাখ। বখতনসর সবকিছু ধ্বংস করে দিলেও যেন ওই তাওরাত সুসংরক্ষিত থাকে। তাই করা হয়েছিল। ওই স্থানটি কোথায় তাও আমার মনে পড়েছে। একথা বলে সে কয়েকজন লোস সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থান থেকে পুঁতে রাখা তাওরাতের অনুলিপিটি উদ্ধার করে আনে। বিস্ময়ের সঙ্গে তারা দেখতে পায় উদ্ধারকৃত তাওরাতের অনুলিপি এবং হযরত উযায়েরের

মাধ্যমে লিপিবদ্ধকৃত তাওরাত অবিকল এক। এই অলৌকিক ঘটনার কারণে তারা বলতে শুরু করল উযায়ের আল্লাহর পুত্র না হলে বিস্মৃত তাওরাত কিছুতেই অবিকল এভাবে আনতে পারতেন না। তখন থেকে ইহুদীরা বলতে থাকে- উযায়ের আল্লাহর পুত্র।[৭১৪] (নাউযুবিল্লাহ)

হযরত উযায়ের আ. মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা:

বায়তুল মুকাদ্দাসে বনী ইস্রাঈল বসবাস করত। যখন তাদের পাপাচার বৃদ্ধি পেল এবঙ সীমালঙ্ঘন হল অবাধ্যতা ও তৎকালীন পয়গম্বরের হেদায়েতের উপর আমল পরিত্যাগ করল। তখন হযরত ঈসা আ.'র প্রায় ছয়শত বছর পূর্বে বখতনসর নামক যালিম বাদশাহ বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করল। তাঁর সাথে ছয় লক্ষ পতাকা ছিল এবং প্রতি পতাকার অধীনে ছিল অসংখ্য সৈন্যবাহিনী। সে বায়তুল মোকাদ্দাসকে ধ্বংস করে দিল। তাওরাত শরীফের পাণ্ডুলিপি জ্বালিয়ে দিল। বনী ইস্রাঈলকে তিনভাগে বিভক্ত করল। একদলকে হত্যা করল। দ্বিতীয় দলকে লাঞ্চিত ও অপদস্থ অবস্থায় সিরিয়ায় রেখেছিল। আর তৃতীয় দলকে বন্দী করে রাখল। ওই বন্দীদের সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ। ওই বন্দীদের নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিল। সেই বন্দীদের মধ্যে হযরত উযায়ের আ. ও দানিয়াল আ.ও ছিলেন। এসময় তাঁরা ছিলেন অল্প বয়স্ক।

অনেকদিন পর তাদের থেকে কিছু সংখ্যককে মুক্তি দিলে তাদের মধ্যে হযরত উযায়ের আ.ও ছিলেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস দিয়ে যখন গমন করছিলেন তখন বায়তুল মোকাদ্দাস ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় ছিল। তিনি পুরো শহরে ঘুরেছেন। কিন্তু কোন মানুষের সন্ধান পেলেন না। তবে সেখানকার বাগানসমূহে বিভিন্ন প্রকারের ফলে বৃক্ষসমূহ ঝুঁকে পড়ল। কারণ খাওয়ার কোন লোক ছিল না। তিনি বাগান থেকে কিছু আঙ্গুর ও আনজীর ছিড়ে খেলেন। কিছু আঙ্গুরের রস বের করে পান করলেন। আর কিছু আঙ্গুরও আনজীর পাত্রে নিয়ে রাখলেন এবং সামান্য আঙ্গুরের রসও সঙ্গে নিয়ে রাখলেন। এলাকা সীমানা পেরিয়ে তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ধ্বংসস্তুপের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, আল্লাহ তায়ালা কীভাবে এটাকে পুণরায় আবাদ করবেন! কীভাবে এই এলাকা আবার জনবসতিতে ভরে উঠবে।

আল্লাহর ইচ্ছে হল যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিজের কুদরতী শক্তি দেখাবেন। তিনি তাঁর গাধাকে সেখানে বেঁধে রাখলেন। আনজীর ও আঙ্গুরের

[৭১৪]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫ হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড ৫, পৃ. ৩১৪-৩১৫

পাত্রটি নিজের মাথার নিকট এবং আঙ্গুর রসের পাত্র অপর দিকে রেখে বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লেন। শোয়ার সাথে সাথেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এবং তাঁর রূহ বের করে নেয়া হল। গাধাটিও মরে গেল। এই ঘটনাটি ঘটেছিল সকাল বেলা।

বখতেনসরকে আল্লাহ তায়ালা নমরুদের ন্যায় একটি মশা দিয়ে ধ্বংস করেছেন। অবশিষ্ট বনী ইস্রাইলরা মুক্তি পেল। সত্তর বছর পর আল্লাহ তায়ালা পারস্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করেন। তিনি তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে ওটাকে পূর্বের চেয়েও অধিক উন্নতভাবে আবাদ করেন। বিচ্ছিন্ন বনী ইস্রাঈলরা পুণরায় সেখানে এসে একত্রিত হয়ে বসবাস আরম্ভ করে দিল।

এভাবে মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে তাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেল। আল্লাহ তায়ালা হযরত উযায়ের আ.'র শরীরকে এমনভাবে অদৃশ্য করে রেখেছেন যে, তাঁকে কোন মানুষ কিংবা কোন হিংস্র জীব-জন্তু এবং কোন পক্ষীকুলও দেখতে পায়নি। যখন তাঁর মৃত্যুর বয়স একশত বছর পূর্ণ হল তখন তাঁকে জীবিত করা হল। প্রথমে তিনি চোখ খুললেন, দেখলেন তার সমস্ত শরীর প্রাণহীন। তারপর তাঁর চোখের সামনেই তাঁর সমস্ত শরীরে প্রাণের সঞ্চার হল। এ ঘটনা হয়েছিল বিকেল বেলা। তখন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে কতক্ষণ ছিলে? তিনি মনে করেছিলেন এটি ঐদিনই যেদিন তিনি শুয়েছিলেন। তাই অনুমান করে বললেন, একদিন বরং এর চেয়েও কিছু কম। তিনি মনে করেছিলেন সকালে ঘুমিয়েছিলেন আর বিকেলে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েছেন। তখন আল্লাহ বললেন, না তুমি একশত বছর অবস্থান করেছ। এখন আমার কুদরতী শক্তির দৃষ্টান্ত দেখ। এত দীর্ঘ সময় অতিক্রম হওয়ার পরও দ্রুত পরিবর্তন ও নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবার ও পানীয় বস্তু নষ্ট হয়নি বরং যেরূপ ছিল সেরূপই রয়ে গেছে। আর গাধা মরে পচেঁ গলে মাটির সাথে মিশে গেছে। কেবল হাড্ডিগুলো শুকিয়ে শুভ্র হয়ে চমকাচ্ছে। এখন দেখ, আমি কিভাবে মুর্দা জিন্দা করব। অদৃশ্য থেকে একটি আওয়ায আসল-হে বিগলিত ও বিক্ষিপ্ত হাড্ডিসমূহ! গোশতের পোশাক পরিয়ে নাও। তৎক্ষণাত হাড্ডিসমূহ জোড়া লেগে গোশতের আবরণে আবৃত হয়ে পূর্ণ শরীর তৈরী হয়ে গেল। দ্বিতীয় আওয়ায আসল, বলা হল, জীবিত হয়ে যাও। সাথে সাথে গাধা জীবিত হয়ে শব্দ করতে লাগল। তিনি নিজের চোখে আল্লাহর কুদরত দেখতে পেলেন আর বললেন, আমি ভালোভাবেই জানি যে, আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। অতঃপর ওই জীবিত গাধার উপরে আরোহণ করে আবাদী এলাকায় গিয়ে দেখলেন যে, সেই ধ্বংসশীল এলাকা এখন আগের চেয়ে অধিক আবাদ এবং জন-মানবে পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর বয়স পূর্বের

চল্লিশ বছরই ছিল যা শোয়ার সময় ছিল। শহরবাসীদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনল না। তিনি অনুমান করে স্বীয় ঘরে পৌঁছলেন। সেখানে একজন অন্ধ, বৃদ্ধা, দুর্বল মহিলার সাক্ষাত পেলেন, যার পা ছিল অচল। সে তাঁরই দাসী ছিল। পূর্বে সে তাঁকে দেখেছিল। তার বয়স হয়েছিল তখন একশত বিশ বছর। উযায়ের আ.'র মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি উযায়েরের ঘর? বৃদ্ধা বলল, হ্যাঁ, আপনি কে, আজ একশত বছর পর উযায়েরের নাম নিচ্ছেন? তিনি হারিয়ে গিয়েছেন একশত বছর হয়েছে। এই বলে বৃদ্ধা অনেক ক্রন্দন করেছে। তিনি বললেন, আমিই উযায়ের। বৃদ্ধা বলল, এটা কিভাবে হতে পারে? তিনি বললেন, আল্লাহ পাক আমাকে একশত বছর মৃত রেখেছেন। তারপর জীবিত করেছেন। বৃদ্ধা বলল, হযরত উযায়ের মকবুলুদ দোয়া ছিলেন। তাঁর দোয়া কবুল হত। আপনি যদি সত্যি সত্যি উযায়ের হয়ে থাকেন, তবে আমার চক্ষু ভাল হওয়ার জন্য দোয়া করুন, যাতে আমি আপনাকে দেখে চিনতে পারি। তিনি দোয়া করলেন। বৃদ্ধার চক্ষু ভাল হয়ে গেল এবং দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ পেল। তারপর তিনি বৃদ্ধার হাত ধরে বললেন, আল্লাহর হুকুমে উঠ। সাথে সাথেই বৃদ্ধার পা ভাল হয়ে গেল এবং সচল হয়ে গেল। বৃদ্ধা তাঁকে দেখেই চিনতে পারল আর বলতে লাগল-সত্যিই আপনি উযায়ের আ.। বৃদ্ধা তাঁকে হাত ধরে বনী ইস্রাঈলের এক সমাবেশে নিয়ে গেল যেখানে হযরত উযায়ের আ.'র সন্তান উপস্থিত ছিল, যার বয়স হয়েছিল একশত আঠার বছর। তাঁর বয়স্ক নাতীও উপস্থিত ছিল। বৃদ্ধা চিৎকার করে বলল, মোবারক হোক, উযায়ের আ. আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছেন। সবাই বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। সে বলল, আমি সেই অন্ধ ও লেংড়া বৃদ্ধা। দেখ, তাঁরই দোয়ায় আমি পূর্ণাঙ্গ ভাল হয়েছি। তিনি বলতেছেন যে, আল্লাহ তাঁকে একশত বছর মৃত রেখে পুণরায় জীবিত করেছেন। লোকেরা উঠে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে লাগল। তাঁর ছেলে বলল, আমার পিতার উভয় স্কন্ধের মধ্যখানে চাঁদের ন্যায় একটি লোমের চিহ্ন ছিল। তিনি জামা খুলে দেখালেন। তা বিদ্যমান ছিল। লোকেরা বলল, উযায়ের আ.'র তাওরাত কিতাব মুখস্থ ছিল। আজকাল তাওরাতের কোন কপি বিদ্যমান নেই। যদি আপনি উযায়ের হয়ে থাকেন, তবে তাওরাত শরীফ আমাদেরকে শুনান। তিনি তাওরাত শরীফ কেবল শুনাননি বরং লিখেও দিয়েছিলেন। সমাবেশে উপস্থিত একজন বলল, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি তিনি তার পিতা থেকে শুনেছেন যে, বখতনসরের বায়তুল মোকাদ্দাস ধ্বংসের সময় গণগ্রেফতার কালে আমার দাদা এক জায়গায় তাওরাত শরীফ দাফন করে রেখেছিলেন। সেই জায়গাটি আমার জানা আছে। চল, তালাশ করি, পেয়ে যেতে পারি। তালাশ করার পর এ তাওরাতের কপিটি পাওয়া গেল। দাফনকৃত তাওরাতের কপির সাথে উযায়ের

আ.'র লিখিত কপিটি মিলিয়ে দেখা হল। তখন দেখা গেল যে, উভয় কপি হুবহু মিল। তখন সবাই নিশ্চিত হল যে, ইনি হযরত উযায়ের আ.। আর ইহুদীরা বলতে লাগল, উযায়ের আল্লাহর পুত্র।[৭১৫]

পবিত্র কুরআনে এ ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে–

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَـٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. অর্থ: তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ্ মরণের পর একে জীবিত করবেন? অত:পর আল্লাহ্ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ' বছর। তারপর তাকে উঠালেন বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল, আমি ছিলাম, একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ' বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে–সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অত:পর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল– আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।[৭১৬]

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত ঘটনাটি কোন নবীর সাথে সম্পৃক্ত তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে তাফসীরকারকগণের মধ্যে। হাকেম, হযরত আলী রা. এবং ইসহাক বিন বশীর, হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, তিনি আরমিয়া আ. ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন হযরত উযায়ের আ.।[৭১৭]

আগুনে অক্ষত থাকা:

বাদশাহ বনুকদনসর হযরত উযায়ের আ.কে বাবেলের গর্ভনর নিযুক্ত করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় পঁচিশ বছর। ইতিপূর্বে বাবেল কুফর

[৭১৫]. তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান, জুমাল, খাযেন ও রুহুল বয়ান, সূত্র. তাফসীরে নঈমী, খণ্ড ১, পৃ. ৭৯-৮২ ও তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড ২, পৃ. ৩৮-৩৯

[৭১৬]. সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৯

[৭১৭]. কাযী ছান'উল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫ হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড ২, পৃ. ৩৬

ও শিরকের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। এই পদটি তাঁর জন্য বড় একটা পরীক্ষা ছিল। বাদশাহ'র আদেশ পালনে তিনি বাধ্য ছিলেন। এ সময় বাদশাহ বনুকুদনসর সেখানে স্বর্ণের তৈরী এক দেবতা বানিয়ে রেখেছিলেন। এটি বাবেলে দণ্ডায়মান অবস্থায় স্থাপন করা হয়েছে। বাদশাহ'র পক্ষ থেকে আদেশ ছিল যে, যখনই ওই দেবতা পূজার ঘন্টা বাজবে তখন সাথে সাথে যাবতীয় কাজকর্ম পরিত্যাগ করে তার পূজা করতে হবে।

তিনি বাবেলে পৌঁছে যখন ওই দেবতা ও পূজা সম্পর্কে অবহিত হলেন, তখন তিনি ওই মন্দ ও পাপাচার রেওয়াজটি চিরতরে বন্ধ করে দেন। এই খবর বাদশাহ'র নিকট পৌঁছলে তিনি তাঁকে দরবারে তলব করলেন। তিনি বাদশাহ'র সামনে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এই সব মূর্তি-দেবতা অনর্থক। তাঁর এই কথা শুনে বাদশাহ অসন্তোষ হলেন। তাঁকে শাস্তি স্বরূপ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডুলে নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন। আদেশ পালিত হল কিন্তু আল্লাহর সাহায্যে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষত ছিলেন। আগুনে তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনি।

তাঁর এই মু'জিযা দেখে বাদশাহ বলে উঠলেন, হযরত উযায়েরের খোদাকে ধন্যবাদ। যিনি ফেরেশতা প্রেরণ করে তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন। আর বাস্তবিকই সেই মহান সত্ত্বা ব্যতিত অন্য কোন মাবুদ নেই। এরপর থেকে বাদশাহ উযায়ের আ.'র বিরুদ্ধে কোন আচরণ করেন নি বরং তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। তিনি তাঁকে পুণরায় বাবেল শহরের গর্ভণর নিযুক্ত করেছেন।[৭১৮]

মৃত্যু :

হযরত উযায়ের আ. প্রায় ৪৫৮ খ্রিষ্টপূর্ব ইন্তেকাল করেছিলেন।[৭১৯] এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল দুইশত বছর।[৭২০] যে এলাকায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ঐ এলাকাকে 'সাবেরাবাদ' বলা হয়।[৭২১] ইবনে আসাকির এর মতানুযায়ী তাঁর কবর শরীফ দামেস্কে।[৭২২]

---

৭১৮. মু'জিযাতে আম্বিয়া, কৃত. আমীর আলী, পৃ. ৫৫১, সূত্র জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৭৩৬
৭১৯. আল্লামা পীর করম শাহ আল আযহারী, জিয়াউল কুরআন, খণ্ড ২, পৃ. ১৯৭, সূত্র. প্রাগুক্ত
৭২০. তাফরীহুল আযকিয়া, খণ্ড ২, পৃ. ৬৭২, সূত্র প্রাগুক্ত
৭২১. ইবনে কাসীর, ৭৭৪ হি. কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৯২০, সূত্র. প্রাগুক্ত
৭২২. ইবনে আসাকির খণ্ড ৪০, পৃ. ৩১৭, সূত্র. প্রাগুক্ত

৩০. হযরত হিযকীল আ.

হযরত হিযকীল আ.'র নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই। তবে সূরা বাকারা'র ২৪৩ নং আয়াতের শানে নুযুল, সাহাবায়ে কিরামে ও মুফাসসিরীনে কেরামগণের মতে উক্ত আয়াতে বর্ণিত ঘটনার সাথে হযরত হিযকীল আ. সম্পৃক্ত ছিলেন। আয়াত খানা হল- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. অর্থঃ হে নবী! আপনি কি দেখেন নি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ তাদেরকে বললেন, তোমরা মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।[৭২৩]

উক্ত আয়াতের শানে নুযুলঃ

একদা হযরত ওমর রা. নামায পড়তেছেন। এসময়ে তাঁর পেছনে দু'জন ইহুদী পরস্পর কথা বলাবলি করতেছে। ওমর রা. নামায শেষে তাদেরকে জিজ্ঞেসা করলেন- তোমরা কি বলাবলি করছিলে? তারা বলল, তোমরা হিযকীল আ. এবং তার মু'জিযা স্বরূপ মৃত জীবিত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়ায় মৃত ব্যক্তিদেরকে জীবিত করে দিয়েছিলেন। হযরত ওমর রা. বললেন, আমরা তো পবিত্র কুরআনে কোথাও হযরত হিযকীল আ.'র নাম ও আলোচনা পাইনি এবং তাঁর দোয়ায় মৃত জীবিত হওয়ার ঘটনাও পাইনি। কেবল হযরত ঈসা আ.ই মৃত জীবিত করেছেন। ইহুদীদ্বয় বলল, কুরআনে কারীমে কি وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ আয়াতটি নেই? যার অর্থ হল-আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে নবী! আমি আপনার নিকট অনেক নবীর ঘটনা বর্ণনা করিনি। তখন হযরত ওমর রা. বললেন, হ্যাঁ আয়াতটি কুরআনে অবশ্যই আছে। তারা বলল, এই হিযকীল আ.ও কুরআনে অবর্ণনীয় নবীগণের অর্ন্তভূক্ত। এরপর হযরত ওমর রা. রাসূল ﷺ'র দরবারে হাজির হলে, তখন উক্ত আয়াত নাযিল হল যাতে হযরত হিযকীল আ.'র ঘটনা বর্ণিত আছে।[৭২৪]

নামঃ হিযকীল, ইব্রানী ভাষায় হিযকী অর্থ কুদরত আর ঈল অর্থ আল্লাহ। সুতরাং হিযকীল অর্থ আল্লাহর কুদরত। আরবীতে এর অর্থ হবে قدرة الله।

---

৭২৩. সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৪৩
৭২৪. আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী র., ৯১১ হি., দুররে মনছুর, সূত্র. তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড ২, পৃঃ ৫৮৬

পিতার নাম বুযী। তাঁর পিতা তাঁর বাল্যকালেই মারা গিয়েছিল। তিনি নবুয়ত প্রাপ্তকালে তাঁর মা অতিশয় বৃদ্ধা ছিলেন বলে তাঁকে (ابن العجوز) ইবনু আজুয তথা বৃদ্ধার সন্তান বলা হত।

তিনি বনী ইস্রাইলের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। হযরত মুসা ও হারুন আ.'র পরে হযরত ইউশা আ. নবুয়তের আসনে আসীন হয়েছিলেন। তাঁর পরে কালেব ইবনে ইউহান্না তাবলিগী দায়িত্ব পালন করেছিলেন যিনি হযরত মুসা আ. বোন মরয়ম বিনতে ইমরানের স্বামী ছিলেন। তবে তিনি নবী ছিলেন না। তারপরে বনী ইস্রাইলের নিকট নবুয়তের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন হযরত হিযকীল আ.।[৭২৫]

আয়াতে বর্ণিত ঘটনাঃ

ওয়াসেত এলাকার দাওয়ারদান নামক স্থানে একদা প্লেগ রোগ বা মহামারী দেখা দিয়েছিল। ধনী লোকেরা শহর ছেড়ে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গরীব অসহায়রা সেখানেই থেকে গেল। আল্লাহর ইচ্ছায় পলায়নকারীরা বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু গরীব আর অবস্থানকারীদের অনেকেই মারা গিয়েছিল। মহামারী চলে গেলে পলায়নকারী ধণাঢ্য ব্যক্তিরা নিরাপদে বাড়ীতে ফিরে আসল। তখন গরীব অবস্থানকারীরা বলল, এরা বড়ই বুদ্ধিমান, পলায়ন করে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করল। ভবিষ্যতে এরূপ মুসিবত আসলে আমরাও পালিয়ে যাব।

ঘটনাক্রমে পরবর্তী বছর পুণরায় সেই এলাকায় মহামারী দেখা দিল। এবার পুরো শহরবাসী পলায়ন করে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এবং দুনিয়াবাসীকে একথা অবগত করাবার জন্য যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না- তাদের কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠালেন। তারা ময়দানের দু'ধারে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করে বললেন, তোমরা মরে যাও। সাথে সাথেই তাদের সবাই একত্রে মরে গেল। আট দিন যাবৎ তাদের লাশসমূহ সেখানে পড়ে রইল। ফলে লাশগুলো ফুলে, গলে চর্তুদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। আশে-পাশের লোকেরা অতিষ্ট হয়ে এসে দেখল যে, অসংখ্য লাশ পঁচে গলে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এতগুলো লাশ কোথায় দাফন করবে? তাই তারা লাশগুলোর চর্তুদিকে দেয়াল দিয়ে একটি বন্ধ কুপের মত করে দিল। যাতে কোন হিংস্র প্রাণী সেখানে পৌছতে না পারে এবং তারাও যেন দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত থাকে। সেখানে তাদের মৃতদেহগুলো পচে গলে গেল এবং হাড়সমূহ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে রইল। দীর্ঘকাল পর বনী ইস্রাইলের নবী হযরত হিযকীল আ. ঘটনাক্রমে সেখান দিয়ে যাওয়ার

[৭২৫]. কাযী হেফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, খন্ড ২, পৃ. ২০

পথে সেই বন্ধ স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে হাড় সমূহ পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহী'র মাধ্যমে তাঁকে তাদের মৃতলোকের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হল। তিনি দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদিগার! তাদের সবাইকে জীবিত করে দিন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন আর বললেন, হে নবী! আপনি এদেরকে আহবান করুন। অতঃপর তিনি হাড়গুলোকে আহবান করলেন-হে হাড়সমূহ! আল্লাহর আদেশে একত্রিত হয়ে যাও। তৎক্ষণাৎ হাড়সমূহ নিজ নিজ স্থানে পূর্ণঃস্থাপিত হল। তিনি আবার আহবান করলেন- হে হাড়সমূহ! আল্লাহর নির্দেশে তোমরা মাংস পরিধান কর এবং রগ ও চামড়া দ্বারা সজ্জিত হও। সাথে সাথে হাড়ের প্রত্যেকটি কঙ্কাল একেকটি পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল। পুণরায় আহবান করলেন- হে মৃত লাশসমূহ! আমার প্রভুর আদেশে উঠে দাঁড়িয়ে যাও। তারা সবাই سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ বলে বলে উঠে দাঁড়িয়ে গেল।

এরা পৃথিবীতে অনেক বছর পর্যন্ত জীবিত ছিল তবে তাদের চেহারা ছিল মুর্দার ন্যায়। তাদের থেকে সন্তান-সন্ততিও জন্মেছিল এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে সামান্য দুর্গন্ধ বিদ্যমান ছিল।[৭২৬]

উল্লেখ্য যে, এ ঘটনায় লোকসংখ্যা কতজন ছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে তাদের সংখ্যা দশ হাজারের চেয়ে বেশী ছিল। কেউ কেউ বলেন ত্রিশ হাজার। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, চল্লিশ হাজার ছিল। হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ র. বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার।[৭২৭]

শিক্ষা ঃ ১. আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ হাজার বছর পূর্বে সংঘটিত ঘটনা স্বচক্ষে দেখেন। যেমন উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে الم تر অর্থ আপনি দেখেন নি? অর্থাৎ আপনি অবশ্যই দেখেছেন। تر শব্দটি অন্তর দ্বারা দেখা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে الم تر এর পরে الى ব্যবহার হওয়ায় নিজের চোখে দেখার অর্থকে শক্তিশালী করে।

২. হযরত হিযকীল আ.'র আহবানে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইস্রাফীল আ.'র ক্ষমতা দান করেছেন। তাঁর সিঙ্গায় ফুৎকারে যেমন লক্ষ কোটি বছরের মুর্দা জীবিত হয়ে যাবে তেমনি হযরত হিযকীল আ.'র আহবানে তাঁরই সম্মুখে মৃত

[৭২৬]. তাফসীরে রুহুল মাআনী, তাফসীরে রুহুল বয়ান এবং তাফসীরে কবীর, সূত্র তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড, ২, পৃ. ৫৮৮-৫৮৯ ও আল্লামা ইবনে কাসীর, ৭৭৪ হি., কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, খণ্ড ২, পৃ. ৩৯২-৩৯৩

[৭২৭]. মুফতি আমেদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১ হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড ২, পৃ. ৫৮৭

জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এভাবে আল্লাহর অনুমতিক্রমে হযরত ইব্রাহীম আ. হযরত ওযাইর আ., হযরত ঈসা আ. এবং আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ অনেক মৃত জীবিত করেছিলেন।

৩. কোথাও মহামারী দেখা দিলে সেখানে না যাওয়া উচিত। আল্লাহ বলেন, لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করিও না। আবার কোথাও মহামারী দেখা দিলে মৃত্যুভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়াও উচিত নয়। কারণ যার মৃত্যু যখন যেখানে যেভাবে নির্ধারিত আছে তখন সেখানে সেভাবেই হবে।

ইমাম বুখারী র. ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা রা. তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি রাসূল ﷺ'কে প্লেগ মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল ﷺ তাঁকে বলেছেন, এ রোগটি মূলত শাস্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল। যে জাতিকে শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য হত তাদের মধ্যে পাঠানো হত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা একে মুমিনদের জন্য রহমতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। আল্লাহর যেসব বান্দা এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়া সত্ত্বেও নিজ এলাকাই ধৈর্য সহকারে বসবাস করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার শুধু সে বিপদই হতে পারে , যা আল্লাহ তার জন্যে লিখে রেখেছেন, তবে এমন ব্যক্তি শহীদের সওয়াব পাবে। রাসূল ﷺ'র বাণী "প্লেগ শাহাদাত এবং প্লেগ আক্রান্ত ব্যক্তি শহীদ"-এর ব্যাখ্যাও তাই।

৪. এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ থেকে পলায়ন করাও হারাম।

৩১. হযরত শাইয়া আ.

পরিচিতি:

হযরত শাইয়া আ.'র নাম ও কোন ঘটনা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে উল্লেখ নেই। তাই তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা নির্ভরশীল।

তাঁর নাম শাইয়া। পিতার নাম আমছিয়া। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, তিনি হযরত যাকারিয়া আ. ও হযরত ইয়াহিয়া আ.'র পূর্ববর্তী নবী ছিলেন। যেসব নবীগণ হযরত ঈসা আ. ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র সুসংবাদ দিয়েছিলেন হযরত শাইয়া ছিলেন তাঁদের অন্তর্ভূক্ত।[৭২৮]

[৭২৮] আল্লামা ইবনে কাসীর, ৭৭৪ হি. কাসাসুল আম্বিয়া, ২খণ্ড, পৃ. ৪৩৩

বনী ঈস্রাঈল থেকে অনেক নবীর আগমন হয়েছিল। তারা তাওরাত কিতাবের আলোকে বনী ইস্রাঈলকে সঠিক পথের দিশা দিতেন। হযরত শাইয়া আ.ও তাঁদের অর্ন্তভূক্ত একজন ছিলেন। ইমাম তাবারীর মতে তিনি সিদ্দিকাহ নামক বাদশাহ'র আমলে নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইবনে কাসীরের মতে তিনি হিযকীয়া নামক বাদশাহ'র শাসনামলে নবুয়ত প্রাপ্ত হন। হিযকীয়া হোক কিংবা সিদ্দীকাহ হোক তাঁর সময় কালের বাদশাহ ছিলেন তাঁর অনুগত। তিনি বাদশাহকে যা আদেশ করতেন তাই করতেন আর যা থেকে নিষেধ করতেন বাদশাহ তা পরিহার করতেন। এ সময় বনী ইস্রাঈলদের অনেক বিপদ সংঘটিত হয়েছিল। বাদশাহ'র পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাবেলের বাদশাহ তখন বায়তুল মোকাদ্দাসে আক্রমণ করল। আক্রমণকারী বাদশাহ'র নাম ছিল সাখারিব। তার সৈন্য বাহিনীতে ছিল ছয় লক্ষ পতাকা। এই আক্রমণ সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী র. বলেন-

বাদশাহ সিদ্দীকাহ ছিলেন ধর্মপ্রাণ। সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি বনী ইসরাঈলদের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে ব্যাবিলনের রাজা সাখারিব বনী ইসরাঈলদের রাজ্য আক্রমণ করলো। ছয় লক্ষ পতাকা নিয়ে সে পৌঁছে গেলো বায়তুল মাকদিসের উপকণ্ঠে। বাদশাহ সিদ্দীকাহ তখন পায়ের ফোঁড়ায় দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিলেন। আল্লাহর নবী হযরত শাইয়া তাঁকে বললেন, হে ইসরাঈলদের সম্রাট! ইরাকরাজ ছয়লক্ষ পতাকা নিয়ে উপনীত হয়েছে বায়তুল মাকদিসের উপকণ্ঠে। তার ভয়ে অনেকে পালিয়েছে। আপনিও হুঁশিয়ার থাকুন। বাদশাহ চিন্তিত হলেন। বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার ও ব্যাবিলনরাজের মধ্যে কী সিদ্ধান্ত হবে, সে সম্পর্কে আপনি কোনো প্রত্যাদেশ পেয়েছেন কি? হযরত শাইয়া বললেন, না। এমতো কথোপকথনের কিছুক্ষণ পরেই প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো। আল্লাহ তায়ালা জানালেন, হে শাইয়া! বাদশাহকে বলো, তাঁর অন্তিম সময় সন্নিকটে। সুতরাং সে যেনো যা অছিয়ত করবার তা করে নেয়। নির্ধারণ করে একজন প্রতিনিধি। হযরত শাইয়া বললেন, সম্রাট! আপনার সম্পর্কে প্রত্যাদেশ পেয়েছি। আল্লাহ জানাচ্ছেন, আপনার পরকাল যাত্রার সময় সমুপস্থিত। সুতরাং আপনার যদি কিছু অছিয়ত করার থাকে, তবে করে দিন। আপনার পরিবারের কাউকে যদি আপনার স্থলাভিষিক্ত করে যান, তবে তাও করতে পারেন। এ কথা শুনে বাদশাহ নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। কেঁদে কেঁদে দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা আল্লাহ! হে মহারাজাধিরাজ! হে সকল সৃষ্টির একমাত্র উপাস্য! তুমি সকল দোষত্রুটি থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র, নিদ্রা বা তন্দ্রা তোমাকে কোনোকালেই কখনোই স্পর্শ করে না। তুমি জানো, আমি বনী ইসরাঈলদের সাম্রাজ্য শাসন করেছি ন্যায়ানুগতার

সঙ্গে। আমার প্রকাশ ও গোপন সকল কিছুই তুমি জানো। তুমি আমার প্রতি তোমার বিশেষ রহমত বর্ষণ করো।

হযরত শাইয়ার নিকটে পুনঃ প্রত্যাদেশ হলো, হে আমার নবী! তুমি সিদ্দিকাহকে বলো, আমি তার প্রার্থনা গ্রহণ করেছি। আরো বলো, ব্যাবিলনরাজের হাত থেকে আমি তাকে ও তার রাজ্যকে রক্ষা করবো। আর আমি তার হায়াত বাড়িয়ে দেব আরো পনোরো বছর। হযরত শাইয়া বাদশাহকে প্রত্যাদেশিত শুভসংবাদটি জানালেন। শুভসংবাদ শ্রবণ করার সাথে সাথে বাদশাহর অন্তর থেকে শত্রুভীতি দূর হয়ে গেলো। তিনি সেজদাবনত হয়ে দোয়া করলেন, হে আমার দয়াময় আল্লাহ! হে আমার মাতা ও পিতার উপাস্য! আমি কেবল তোমাকেই সিজদা করি। তোমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানি। সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা কেবলই তোমার। তুমি যাকে খুশী রাজ্য দান করো, আবার যাকে খুশী করো রাজ্যহারা। সর্বজ্ঞ তুমি। সকলের প্রকাশ্য ও গোপন-সকল কিছুই তোমার জানা। তুমি প্রকাশ, তুমি গোপন। তুমি প্রথম, তুমিই শেষ। বিপর্যস্ত দাসের দোয়া তুমিই তো দয়া করে গ্রহণ করো। তুমি আমার দোয়া কবুল করেছো। পরমতম দয়ার্দ্র বলেই তুমি এমন করলে।

বাদশাহ সেজদা থেকে মাথা ওঠালেন। হযরত শাইয়ার প্রতি আবারে অবর্তীণ হলো প্রত্যাদেশ। বলা হলো, হে নবী শাইয়া! তুমি বাদশাহকে জানিয়ে দাও, সে যেনো তার কোনো পরিচারককে দিয়ে ডুমুরের রস আনিয়ে তার ফোঁড়ায় লাগিয়ে দেয়। এরকম করলে সে নিরাময় লাভ করবে। হযরত শাইয়া প্রত্যাদেশের কথা বাদশাহকে জানালেন। বাদশাহ প্রত্যাদেশানুসারে তাঁর ফোঁড়ায় ডুমুরের রস লাগিয়ে নিরাময় লাভ করলেন। তারপর হযরত শাইয়াকে বললেন, হে আল্লাহর বার্তাবাহক! দয়া করে আল্লাহর নিকট থেকে জেনে নিন, শত্রুদের কী পরিণতি হবে? বাদশাহর এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতে প্রত্যাদেশ হলো, হে আমার প্রিয় নবী! বাদশাহকে বলে দিন, সে শত্রুমুক্ত। আগামী কাল প্রত্যুষে ব্যাবিলনরাজের সকল সৈন্য মারা যাবে। বেঁচে থাকবে কেবল রাজা ও তার পরিবারের পাঁচজন মাত্র। তুমি তাদরেকে বন্দী কোরো।

পরদিন প্রত্যুষে বাদশাহ তার বিশেষ ঘোষকের মাধ্যমে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন যে, হে বনী ইসরাঈল জনতা! তোমরা কে কোথায় আছো, দেখে যাও। আল্লাহ তাঁর দুশমনদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরপর বাদশাহ নিজে চললেন শহরের উপকণ্ঠের দিকে। তাঁকে অনুসরণ করলো পরিষদবর্গ ও বিপুল সংখ্যক জনতা। ইরাকী বাহিনীর অবস্থান স্থলে গিয়ে দেখলেন, মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে সৈন্যদের অসংখ্য মরদেহ। ব্যাবিলনরাজ সাখারীর ও তার পাঁচ সঙ্গীকে

খুঁজতে লাগলো সকলে। কিন্তু তাদেরকে কোথাও পেলো না। আশে-পাশে তল্লাশী শুরু হলো। শেষে তাদেরকে পাওয়া গেল এক পাহাড়ের গুহায়। বখতনসরও ছিল তাদের মধ্যে। তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আনা হলো বাদশাহর সামনে। তাদেরকে দেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বাদশাহ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হলেন। আসরের সময় পর্যন্ত সেজদায় পড়ে রইলেন তিনি। তারপর মাথা উঠিয়ে বললেন, হে ব্যাবিলনরাজ! দেখলে তো, মহান আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করলেন। তিনি সর্বশক্তিধর। দেখলে তো তার প্রমাণ। ব্যাবিলনরাজ বললো, আমি আগেই জানতাম, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। তোমাদের প্রতি বর্ষন করবেন তাঁর বিশেষ দয়া। এ সংবাদ আমাকে দেওয়া হয়েছিলো যাত্রা শুরুর পূর্বেই। কিন্তু এই শুভপরামর্শদাতার কথা আমি মানিনি। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই আজ আমার এই দুর্দশা। এই শোচনীয় পরিণতির কথা জানতে পারলে আমি তো এদিকে অগ্রসরই হতাম না। বাদশাহ বললেন, সকল প্রশংসা ও কৃতিত্ব কেবলই আল্লাহর। তিনি যাকে ধ্বংস করতে চান, সে অবশ্যই ধ্বংস হয়। তোমরা বেঁচে গিয়েছো বলে আবার একথা মনে কোরো না যে, তোমরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র। কখনোই নয়। দুনিয়ার অধিক পাপ অর্জনের জন্য এবং সেই পাপের কারণে আখেরাতে আরো অধিক শাস্তি দানের জন্যেই তোমাদেরকে আপাততঃ অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তোমরা এবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। তোমাদের দেশবাসীকে জানাবে আল্লাহর শাস্তি কত ভয়াবহ। এটাই এখন তোমাদের কাজ। কাজটি জরুরী বিধায় তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলো। নতুবা তোমাদেরকে আমি এই মুহূর্তে হত্যা করতাম। হে ইরাকাধিপতি! একথাটিও উত্তমরূপে অবগত হও যে, তুমি ও তোমার সাথীদের রক্ত আল্লাহ তায়ালার নিকটে কীট-পতঙ্গের রক্তের চেয়েও মূল্যহীন। এরপর বাদশাহর হুকুমে তাদের গলায় শিকল পরানো হলো এবং সত্তর দিন ধরে ঘোরানো হলো বায়তুল মোকাদ্দেসের ও ইলইয়ার চার পাশে। প্রতিদিন তাদেরকে খেতে দেয়া হতো দু'টো করে যবের রুটি। এরকম অপমানের কারণে সাখারীর একদিন বাদশাহকে বললো, আপনি যে দুর্ব্যবহার আমার সঙ্গে করছেন, তার চেয়ে আমার মৃত্যুই ছিলো শ্রেয়ঃ। বাদশাহ সাখারীর ও তার সঙ্গীদের বধ্যভূমিতে পাঠালেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী হযরত শা'ইয়াকে প্রত্যাদেশ করলেন, বাদশাহকে বলো, সে যেনো সাখারীর ও তার অনুচরদেরকে মুক্তি দেয়। সম্মানের সঙ্গে তাদেরকে পাঠিয়ে দেয় তাদের স্বদেশে। তারা গিয়ে তাদের দেশবাসীকে ভয় দেখাবে। হযরত শা'ইয়া বাদশাহকে আল্লাহর এ নির্দেশ জানালেন। বাদশাহ নির্দেশ পালন করলেন। সসম্মানে তাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন ইরাকে।

সাখারীর ও তার সাথীরা দেশে ফিরে গিয়ে লোকদেরকে ডেকে সেনাবাহিনীর দুরবস্থার কথা জানালো। গণক ও জ্যোতির্বিদরা বললো, মহামান্য সম্রাট! আমরা তো আগেই আপনাকে বায়তুল মাকদিস অভিযানে যেতে নিষেধ করেছিলাম। বলেছিলাম, তাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নবী। নবীর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ আসে। আর নবীর অনুসারীরা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত। কিন্তু আপনি আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন নি।

এঘটনার পর সাখারীর বেঁচেছিলো মাত্র সাত বছর। মৃত্যুর পূর্বে সে তার প্রপৌত্র বখতনসরকে তার স্থলাভিষিক্ত করে গেলো। বখতনসরও ছিলো তার পিতামহের একনিষ্ঠ অনুসারী। সে রাজ্য শাসন করেছিলো সতেরো বছর।

ওদিকে বনী ইসরাঈলদের বাদশাহর অন্তিম যাত্রার সময় হয়ে এলো। কিন্তু তার পরকালের যাত্রার আগেই রাজ্য জুড়ে দেখা দিলো বিশৃংখলা। ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হলো বনী ইসরাঈলেরা। শুরু হয়ে গেলো অশান্তি, খুন, খুনের পর খুন। নবী শা'ইয়া তাদেরকে সদুপদেশ দান করলেন। কিন্তু তাঁর কথার প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপই করলো না। আল্লাহ তায়ালা তখন তাঁকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলেন, হে আমার নবী! আপনি বিশৃঙ্খল জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করুন। ওই বক্তৃতাই হবে আমার প্রত্যাদেশ। হযরত শা'ইয়া জনতার দিকে লক্ষ্য রেখে বললেন, হে আকাশ! শোন হে পৃথিবী! অভিনিবেশী হও। আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তিনি তাদেরকে অনুগৃহীত করেছেন তাদেরকে নির্বাচন করেছেন প্রিয়পাত্ররূপে। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর উপরে তাদেরকে দান করেছেন শ্রেষ্ঠত্ব। তারা ছিলো দিশেহারা মেষপালের মতো। ছিলো না তাদের কোনো সদুপদেশ দানকারী ও পথপ্রদর্শক। তারপর আল্লাহ তাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন নবী। এভাবে নবীর মাধ্যমে তাদেরকে একত্রে করেছেন। ফলে অসুস্থজনেরা হয়েছে সুস্থ, বিচ্ছিন্ন জনেরা হয়েছে সম্মিলিত এবং দুর্বলেরা হয়েছে শক্তিমান। এরপরেও তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো না। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসা পরিত্যাগ করে শুরু করলো হানাহানি। এই অনৈক্যের বিষময় প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। অসহায় জনতা হলো আশ্রয়চ্যুত। রক্তরঞ্জিত হলো প্রশান্ত মৃত্তিকা। বলো হে আকাশ ও পৃথিবী! এ দুর্বিপাক চলবে আর কতোকাল? সময় হলে উষ্ট্র ফিরে আসে তার আরোহীর কাছে। চারণ ভূমি থেকে স্বআবাসে ফিরে আসে পশুর পাল। কিন্তু দেখো এই অপরিণামদর্শী বনী ইসরাঈল জনতা কতোই না মূর্খ। তারা এতোটুকুও অনুধাবন করতে পারছে না যে, কেনো এই বিশৃংখলা, কেনো এই হানাহানি, রক্তপাত। হে নীলাকাশ! হে ধরিত্রী! তোমরা তাদেরকে ওই দৃষ্টান্তটির কথা বলো- একটি প্রান্ত

র ছিলো শস্যশূন্য। শুকনো ঘাস ছাড়া আর কিছুই ছিলো না সেখানে। ওই প্রান্তরের মালিক চতুষ্পার্শে দেয়াল নির্মাণ করে প্রান্তরটিকে ঘিরে ফেললেন, প্রাচীরবেষ্টিত ওই প্রান্তরে নির্মাণ করলেন নয়নাভিরাম প্রাসাদ। খনন করলেন হ্রদ। রচনা করলেন বাগান। সে বাগানে রোপন করলেন যয়তুন, আনার, খেজুর ও আরো অনেক ফলের গাছ। আর বাগান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন একজন জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে। যথাসময়ে গাছে গাছে দেখা দিলো ফুল ও মুকুল। কোনো কোনো ফুল ও মুকুল থেকে প্রকাশ পেলো ফল। আর কোনো কোনো ফুল ও মুকুল ঝরে পড়লো অকালে। বাগানের অধিবাসীরা বললো, এ গাছগুলো কোনো কাজের নয়। না হলে এগুলোতে মরা মুকুল ও ঝরা ফুল দেখা দিবে কেনো? এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় হচ্ছে, এসকল কিছু উচ্ছেদ করে ফেলা। সুতরাং ভেঙে ফেলো প্রাসাদ। ভরাট করে ফেলো জলময় হ্রদ। আর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দাও বৃক্ষগুলোকে। পূর্ববৎ শস্যশূন্য প্রান্তরই উত্তম। হে আসমান! হে জমিন! তাদেরকে বলে দাও, ওই সাজানো বাগানের দেয়ালই হচ্ছে সত্য ধর্ম। আর প্রাসাদ হচ্ছে শরিয়ত। হ্রদ বা নহর হচ্ছে আসমানী কিতাব। আর বাগানের রক্ষক হচ্ছে আল্লাহর নবী এবং বাগানের বৃক্ষগুলো তো তোমরাই। মরা মুকুল ও ঝরা ফুল হচ্ছে তোমাদের মন্দ আমল, তোমাদের অপকর্মের পরিণাম। হে বনী ইসরাঈল জনগোষ্ঠী! আমি তো তোমাদের স্বেচ্ছাচারিতার পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করি। উপস্থাপিত দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে সদুপদেশ প্রদান করলাম। তোমরা গাভী, বকরী, ইত্যাদি জবাই করে আমার নৈকট্য অর্জন করতে চাও। কিন্তু মনে রেখো তোমাদের কোরবানীর গোশত আমার নিকটে পৌঁছে না। আমি তো পানাহার থেকে চিরমুক্ত। চির পবিত্র। আমি কেবল বলি, হে উদাসীন জনতা! তাক্বওয়া (সাবধানতা) অবলম্বন করো। যে সকল হত্যা আমি হারাম করেছি, সেগুলো থেকে বিরত থাকো। এভাবে হালাল ও হারামের যথামান্যতার মাধ্যমে আমার প্রসন্নতা লাভে সচেষ্ট হও। কিন্তু তোমরা তো উন্নাসিক। রক্তলোলুপ। তোমাদের হস্ত ও বস্ত্র অবৈধ রক্তে রঞ্জিত। তোমরা আমার গৃহ নির্মাণ করো। নির্মিত গৃহ বা মসজিদের ভিতর ও বাহির পবিত্রও রাখো। কিন্তু তোমাদের অন্তর ও বাহির অপরিচ্ছন্ন, অপবিত্র। তোমরা মসজিদকে সাজিয়েছো সুন্দররূপে। কিন্তু জ্ঞান ও বিবেককে রেখেছো অসুন্দর আচ্ছাদনে। কী ভেবেছো তোমরা? আমি কি মসজিদে থাকি? আমি তো মসজিদ নির্মাণ করতে বলেছি এজন্যে যে, সেখানে সমুন্নত হবে আমার বিধানাবলী। সমুচ্চারিত হবে আমার স্মরণ। বিঘোষিত হবে আমার প্রশংসা ও পবিত্রতা।

তাদের মুখমণ্ডল, হাত,পা ও শরীর। পরিচ্ছদ পরিধান করবে কোমরের উপরে। তাদের রক্ত উৎসর্গীকৃত হবে কেবল আমার জন্য। আর তাদের বক্ষদেশ জাগ্রত থাকবে আমার আকাশজ বাণী বৈভবে। আমার ভয় তাদেরকে প্ররোচিত করবে নিশিজাগরণে। নিভৃত উপাসনায়। আর তাদের দিবাভাগ হবে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর। রণপ্রান্তরে তারা হবে অজেয় শার্দুল সদৃশ। এ সকল কিছু হচ্ছে আমার অনন্য অনুকম্পা। আমি যাকে ইচ্ছা এমতো অনুকম্পা দানে ধন্য করি।

হযরত শা'ইয়া তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলো বনী ইসরাঈল জনতা। একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর উপর। হযরত শা'ইয়া আত্মরক্ষার জন্য একদিকে দৌড় দিলেন। লোকেরা তাড়া করলো তাঁকে। পথিমধ্যে পড়লো একটি বৃক্ষ। বৃক্ষটি বললো, হে আল্লাহর নবী! আমার অভ্যন্তরে আত্মগোপন করুন। বৃক্ষটি দু'ফাঁক হয়ে গেলো। হযরত শা'ইয়া তার ভিতরে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দু ফাঁক হওয়া গাছটি এক হয়ে গেলো। নবী শা'ইয়া বৃক্ষাভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের একটি কোণা রয়ে গেলো বাইরে। সেখানে একটু পরেই এসে পড়লো উন্মত্ত জনতা। শয়তান ছিলো তাদের সঙ্গে। সে বললো, এই গাছের মধ্যেই সে আত্মগোপন করেছে। এই দেখো তার কাপড়ের একাংশ। লোকেরা তখন একটি করাত এনে আড়াআড়িভাবে গাছটিকে চিরে ফেললো। গাছের সঙ্গে হযরত শা'ইয়ার পবিত্র শরীরও হয়ে গেলো দ্বিখণ্ডিত।[৭২৯]

৩২. হযরত আরমিয়া আ.

হযরত আরমিয়া আ.'র নাম পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়নি। তবে তাঁর আমলের বখতনসর নামক যালিম বাদশাহর যুলুম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইস্রাঈলের চার ও পাঁচ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

নামঃ আরমিয়া, পিতার নাম হালকীয়া। ইবনে আব্বাস রা. থেকে দ্বাহহাক র. বলেন, তিনিই হিযর আ.। তবে এ মতটি বিশুদ্ধ নয়। তিনি (আরমিয়া) লাভী ইবনে ইয়াকুব আ.'র বংশধর ছিলেন।[৭৩০]

বায়তুল মোকাদ্দাস ধ্বংসকাহিনীঃ

বখতনসর বায়তুল মোকাদ্দাস ধ্বংস করার পূর্বে বনী ইস্রাঈলদের মধ্যে বহু ধরণের পাপ ও কুকর্ম সংঘটিত হয়েছিল। তাদের বাদশাহ'র নাম ছিল

---

৭২৯. ছানাউল্লাহ পানিপথি র. ১২২৫ হি. তাফসীর মাযহারী, খণ্ড ৭, পৃ. ৩০-৩৭

৭৩০. ইবনে কাসীর র., ৭৭৪ হি. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। খণ্ড ১, অংশ ২, পৃ. ৩৩ সূত্র জামে কাসাসুল আম্বিয়া, উর্দু, পৃ. ৭২০

ইয়াকুনিয়া ইবনে ইউমাকীম। আল্লাহ তায়ালা সেই বাদশাহ'র প্রতি হযরত আরমিয়া আ.কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি বনী ইস্রাঈলকে হেদায়েত করেন। তাদের প্রতি আল্লাহর দয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ইতিপূর্বে তাদের শত্রু বাদশাহ সাখারিবকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করেছিলেন তিনি সে কথাও তাদেরকে মনে করিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না।

এ প্রসঙ্গে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে-

এরপর আল্লাহতায়ালা বনী ইসরাঈলদের বাদশাহ বানালেন নাশিয়া বিন আমওয়াসকে। আর নবুয়ত দান করলেন আরমিয়া বিন হালাকিয়াকে। তিনি ছিলেন হযরত হারুন বিন ইমরানের বংশধর। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, তাঁর উপাধি ছিলো খিজির। আর নাম ছিলো আরমিয়া। একবার তিনি একস্থানে শুকনো ঘাসের উপরে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে উঠতেই দেখা গেলো শুষ্কতৃণ পরিণত হয়েছে সবুজ তৃণশয্যায়। তখন থেকে লোকসমক্ষে তিনি খিজির নামে খ্যাত হয়েছিলেন। নবী আরমিয়াকে দেয়া হলো বাদশাহ নাশিয়ার পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব।

কিছুকাল পরে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীকে প্রত্যাদেশ করলেন, হে আরমিয়া! বনী ইসরাঈল জনতা ভ্রষ্টতার চরমে পৌঁছেছে। আমার নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার পরোয়াই তারা করে না। তুমি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করো। তাদেরকে প্রদত্ত আমার অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দাও। স্মরণ করিয়ে দাও আমার নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ। নবী আরমিয়া বললেন, হে আমার প্রভুপালক! তারা তো সংখ্যাগুরু। আর আমি একা। তারা শক্তিমান। আর আমি শক্তিহীন, নিঃসঙ্গ। সুতরাং তুমি আমাকে সাহায্য করো। আমি জানি তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে আমি দীন, হীন, দুর্বল। আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে আরমিয়া! তুমি কি জানো না যে, সকল হৃদয় ও রসনা আমার কর্তৃত্বাধীন। আমার অভিপ্রায়ানুসারে আপতিত হয় সকলের হৃদয়। আমি তো তোমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। সুতরাং তুমি চিন্তিত কেনো? যাও, এবার কর্তব্যকর্মের দিকে ধাবিত হও।

হযরত আরমিয়া জনসমাবেশে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। কিন্তু কী বলবেন, কিছু ভেবে পেলেন না। সহসা তাঁর হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত হলো একটি প্রত্যাদেশিত ভাষণ। সে ভাষণ উঠে এলো রসনায়। সুন্দর, সুললিত ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তিনি সদুপদেশ দিতে শুরু করলেন। বললেন, আল্লাহর আনুগত্যের কথা। অবাধ্যতার কথা। আনুগত্যের পুরস্কার ও অবাধ্যতার শাস্তির কথা। সবশেষে

আধ্যাত্মিক ঘোরের মধ্যে সরাসরি আল্লাহর জবানীতে বলে উঠলেন, আমার সম্মানের শপথ! আমি বনী ইসরাইলের বিপর্যয়কে প্রবল করে দিবো। তাদের কোনো বিজ্ঞজনই তখন আর পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাবে না। একজন নিষ্ঠুর ও নির্দয় রাজাকে আমি তাদের উপরে বিজয়ী করে দিবো। আর নির্মম আক্রমণের শংকায় আমি শংকাচ্ছাদিত করবো বনী ইসরাঈলদেরকে। ইয়াফেছ গোত্রের জনপদ থেকে আগমন করবে তারা।

উল্লেখ্য যে, বাবেলের অধিবাসীদেরকেই বলা হয় ইয়াফেছ। সম্ভবতঃ তারা ছিলো হযরত নুহের পুত্র ইয়াফেছের বংশধর। তাই তাদের নাম বনী ইয়াফেছ বা ইয়াফেছ। তখন তাদের রাজা ছিলো বখতেনসর।

বখতনসর তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলো বায়তুল মাকদিস অভিমুখে। প্রায় বিনা বাধায় অধিকার করে বসলো বনী ইসরাঈলদের সাম্রাজ্য। হত্যা করলো তাদের অনেককে। ধ্বংস করে দিলো বায়তুল মাকদিস মসজিদ। বখতনসর তার সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিলো, ঢাল ভর্তি করে মাটি এনে ঢেকে দাও মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। সৈন্যেরা নির্দেশ পালন করলো। এরপর সে হুকুম দিলো, রাজ্যের সকল জনতাকে ধরে আনো। সৈন্যরা বেঁচে যাওয়া বনী ইসরাঈলের সকল নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকাকে ধরে এনে হাজির করলো রাজার সামনে। রাজা ক্রীতদাস-দাসীরূপে বাছাই করে নিলো প্রায় ষাট হাজার বালক-বালিকাকে। তারপর গণিমতের মাল বন্টন করে দিলো সৈন্যদের মধ্যে। সৈন্যরা বললো, গণিমত আমরা চাই না। আমরা চাই গোলাম। মহামান্য সম্রাট! সকল গণিমত রেখে দিন আপনার ভাণ্ডারে। আর বালক বালিকা বন্টন করে দিন আমাদের মধ্যে। বখতনসর তাই করলো। প্রত্যেক সৈন্য ভাগে পেলো চারজন করে গোলাম ও বাঁদী। শেষে বখতনসর ঘোষণা করলো, বনী ইসরাইলের এক তৃতীয়াংশ জনতাকে হত্যা করো। এক তৃতীয়াংশ রেখে দাও এই শহরে। আর অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশকে নিয়ে চলো বাবেলে। হুকুম তামিল করা হলো। বাদশাহ নাশিয়াকেও বন্দী করেছিলো বখতনসর। তাকে এবং এক তৃতীয়াংশ বনী ইসরাঈল জনতা যার সংখ্যা ছিলো প্রায় সত্তর হাজার, সঙ্গে নিয়ে বিজয়ীর বেশে বখতেনসর প্রত্যাবর্তন করলো বাবেলে। এই ধ্বংসপর্বটি ছিলো বনী ইসরাঈলদের প্রথম ধ্বংসপর্ব। আলোচ্য আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে 'এরপর ওই দু'টি প্রতিশ্রুতির প্রথমটি যখন এলো, তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার দাসদেরকে, যারা ছিলো অতিশয় শক্তিশালী। এখানে দাসদেরকে প্রেরণ করলাম' অর্থ বখতনসরকে তার বাহিনীসহ প্রেরণ করলাম।

বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হলো নির্বিঘ্নে। একদিন বখতনসর দেখলো এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন। কিন্তু জাগ্রত হওয়ার পর সে আর তার স্বপ্নের বিবরণ মনে রাখতে পারলো না। বন্দী বনী ইসরাঈলদের মধ্যে ছিলেন দানিয়েল, হানানিয়া, আযারিয়া ও মীশাইল। তাঁরা ছিলেন নবীর বংশধর। বখতনসর একথা জানতো। তাই তাঁদেরকে ডেকে আনলো। বললো, তোমরা আমার স্বপ্নের কথা বর্ণনা করো। নবীজাদা চতুষ্টয় বললেন, আপনি আপনার স্বপ্নের বিবরণ দিন। আমরা তার ব্যাখ্যা বলে দিবো। বখতনসর বললো, আমার তো স্মরণ নেই। তোমরাই আমার স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও। যদি না বলো তবে আমি তোমাদের হাত তোমাদের স্কন্ধ থেকে পৃথক করে ফেলবো। নবীজাদাগণ বললেন, ঠিক আছে। তাহলে আমাদেরকে কিছু দিন সময় দিন। এই বলে তাঁরা রাজদরবার থেকে বেরিয়ে এলেন। আল্লাহ তায়ালার দরবারে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা জানালেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাহায্য করলেন। তাঁদের স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত করে দিলেন পুরো বিষয়টি। তাঁরা রাজদরবারে গমন করে রাজাকে বললেন, আপনি স্বপ্নে দেখেছিলেন একটি মূর্তি। মূর্তিটির পা ছিলো মাটির। হাঁটু ও উরুদেশ ছিলো তামার। উদর ছিলো রূপার। বক্ষদেশ সোনার। আর মস্তক ও স্কন্ধদেশ লোহার। বখতেনসর বললো, তোমরা ঠিকই বলেছো। তাঁরা বললেন, আপনি আরো দেখেছিলেন, অকস্মাৎ আকাশ থেকে পতিত হলো একটি পাথর। ওই পাথরের আঘাতে মূর্তিটি টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। আপনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। বখতনসর বললো, তোমরা ঠিকই বলেছো। এবার তবে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলো। তাঁরা বললেন, বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অবস্থা দেখানো হয়েছে আপনাকে। মূর্তিটির মৃত্তিকা নির্মিত অংশের অর্থ দুর্বল সাম্রাজ্য। তাম্র নির্মিত অংশের অর্থ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী আর একটি সাম্রাজ্য। আর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের অংশ হচ্ছে একটি সুবিন্যস্ত ও সুন্দর সাম্রাজ্য। আর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের অংশ হচ্ছে মূর্তিটির লৌহনির্মিত অংশ। এবার আকাশ থেকে পতিত ওই পাথরটির কথা বলি, ওই পাথরটি আল্লাহর গায়েবী শক্তির প্রতীক। আর প্রস্তর-প্রক্ষেপের মাধ্যমে মূর্তিটি চুরমার হয়ে যাওয়ার অর্থ অবশেষে আল্লাহ তায়ালার অদৃশ্য শক্তির আঘাতে সকল রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। টিকে থাকবে আল্লাহর সাম্রাজ্য।

বাবেলবাসীরা একদিন বখতনসরের কাছে গিয়ে বললো, মহামান্য সম্রাট! বনী ইসরাঈলী গোলামদের কারণে আমাদের কিছু সমস্যা হচ্ছে। তারা আমাদের গৃহসীমানায় বসবাস করে। প্রয়োজনীয় কর্ম তাদের দ্বারা সমাধা করতে হয় বলে তারা পেয়েছে পারিবারিক মেলামেশার সুযোগ। তারা সুদর্শন। তাই আমরা

লক্ষ্য করছি, আমাদের স্ত্রীরা তাদের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমাদের আবেদন, তাদেরকে হয় হত্যা করে ফেলুন, না হয় তাড়িয়ে দিন। বখতনসর বললো, এটা তোমাদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। তোমরা নিজেরাই তাদেরকে হত্যা অথবা বিতাড়নের অধিকার সংরক্ষণ করো। কারণ তারা তোমাদের ক্রীতদাস। বন্দী বনী ইসরাঈলেরা রাজার ঘোষণা শুনতে পেয়ে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কামনা করলেন। জানালেন প্রাণ রক্ষার আকুল আবেদন। বললেন, হে আমাদের প্রভু পালনকর্তা! আমরা তো তোমার অবাধ্য নই। সুতরাং অন্যের পাপের কারণে আমরা শাস্তি পাবো কেনো? আমাদেরকে দান করো তোমার বিশেষ রহমত। আল্লাহ তায়ালা তাদের অশ্রুসিক্ত আবেদন গ্রহণ করলেন। অল্প কিছু সংখ্যক নিহত হলেও বেঁচে রইলো সংখ্যাগুরু অংশটি। ওই অংশে ছিলো দানিয়েল, হানানিয়া, আযারিয়া ও মীশাইল।

অবশেষে বখতনসরের ধ্বংসের সময় সমুপস্থিত হলো। দম্ভ প্রদর্শনের মাধ্যমে ধ্বংসকে ডেকে আনলো সে নিজেই। একদিন সে বন্দীদেরকে রাজ দরবারে হাজির করিয়ে বললো, বলো, যে স্থান আমি ধ্বংস করে এসেছি, সে স্থান কেমন? সে রাজ্যের অধিবাসীরাই বা কেমন? বনী ইসরাইলেরা জবাব দিলো, ওই দেশ তো সিরিয়া। নবী-রাসূলগণের জন্মভূমি। সেখানকার বায়তুল মাকদিস হচ্ছে আল্লাহর ঘর। আর সেখানকার অধিবাসীরা নবী-রাসূলগণের বংশধর। তারা বায়তুল মাকদিসের সেবকও। তারা হয়ে পড়েছিলো আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য। তাই আপনার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। সম্মান, প্রতিপত্তি-সব কিছুই আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বেচ্ছাচরণের কারণে আল্লাহ তাদের উপরে আপনাকে বিজয়ী করেন। কিন্তু বিজয়ীবাহিনী এ সম্পর্কে বেখবর। তারা মনে করে তারা বিজয় লাভ করেছে নিজেদের শক্তিবলে। একথা শুনে বখতনসর অতুষ্ট হলো। বললো, তোমরা আমাকে এমন কৌশল শিখিয়ে দাও, যা রপ্ত করে আমি আকাশে আরোহণ করতে পারি। আমি আকাশে যারা আছে, তাদেরকে হত্যা করে সেখানেও আমার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবো। পৃথিবীর রাজত্ব আমি আর চাই না। বনী ইসরাঈলেরা বললো, সম্রাট! এটা তো মানুষের ক্ষমতাবর্হিভূত। বখতনসর বললো, আকাশে ওঠার উপায় তোমাদেরকে বলে দিতেই হবে। অন্যথায় আমি তোমাদেরকে হত্যা করবো। নিরুপায় বনী ইসরাঈলেরা আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থাপন করলো তাদের রোদনসিক্ত নিবেদন। আল্লাহ পাক সদয় হলেন। একটি হন্তারক মশাকে প্রেরণ করলেন তিনি। মশাটি অবলীলায় বখতনসরের নাকের মধ্যে ঢুকে পড়লো তার মস্তকে। তার উপর্যুপরি দংশনে জর্জরিত হতে হতে একসময় মৃত্যু ঘটলো তার।

মুক্ত হলো বনী ইসরাঈল বন্দীরা। তারা ফিরে গেলো সিরিয়ায়। সেখানে গড়তে শুরু করলো নতুন বসতি। সংস্কার করলো বায়তুল মাকদিস। ধীরে ধীরে স্ফীত হতে লাগলো তাদের জনসংখ্যা। শ্রীবৃদ্ধি ঘটলো তাদের জনপদের। যারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিলো, তারাও জড়ো হলো এক জায়গায়।

সবকিছুই হলো। কিন্তু তওরাতের কোনো অনুলিপি কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। সাধারণ জনতার এ নিয়ে তেমন কোনো দুশ্চিন্তা না থাকলেও বিশেষ ব্যক্তিগণ এ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সবচেয়ে বেশী চিন্তাযুক্ত হলেন হযরত উযায়ের। তিনিও ছিলেন বাবেল বন্দীগণের মধ্যে। ছাড়া পেয়ে তিনিও আগমন করেছিলেন সিরিয়ায়। তওরাতের বিরহে তিনি একা একা বসে কাঁদতেন। কখনো চলে যেতেন দূরে অরণ্যের দিকে। একদিন এক লোক তাকে বললেন, আপনি এতো কাঁদেন কেনো? হযরত উযায়ের বললেন, আল্লাহর কিতাবের জন্য। বখতনসরের লোকেরা তওরাত পুড়িয়ে দিয়েছে। এখন তা উদ্ধার করি কী করে। তওরাত বিহনে দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো কিছুই তো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। লোকটি বললো, আপনি যদি সত্যিই তাওরাত চান, তবে তা অবশ্যই পাবেন। আমার পরামর্শ শুনুন। আগামীকাল আপনি রোজা রাখুন। পবিত্র পরিচ্ছদাবৃত হয়ে কাল এখানে আসুন। আমার দেখা পাবেন। তারপর যা বলার বলবো। পরদিন হযরত উযায়ের রোজা রেখে পাক সাফ পোশাক পরে নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলেন। একটু পরেই হাজির হলো লোকটি। তার হাতে ছিলো একটি পানির পাত্র। লোকটি আসলে ছিলে এক ফেরেশতা। আল্লাহ তায়ালাই তাকে পাঠিয়েছিলেন। লোকটি তার পাত্র থেকে কিছু পানি পান করালেন হযরত উযায়েরকে। সঙ্গে সঙ্গে হযরত উযায়েরের বক্ষাভ্যন্তরে মুদ্রিত হয়ে গেলো সম্পূর্ণ তওরাত। তিনি ফিরে এলেন তাঁর জনপদে। বনী ইসরাঈলদের তওরাত পাঠ করে শুনালেন। মুগ্ধ হয়ে গেলো তারা। হযরত উযায়ের হলেন তাদের একান্ত প্রিয়ভাজন। পারস্পরিক প্রীতি ও ভালোবাসার এরকম প্রকাশ ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটেনি। এভাবে অতিবাহিত হলো বেশ কিছুদিন। শেষ হয়ে এলো হযরত উযায়েরের পৃথিবীর আয়ু। নির্ধারিত ক্ষণে তিনি চলে গেলেন তাঁর প্রভু পালনকর্তার একান্ত সন্নিধানে।

আবারো বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো বনী ইসরাঈল জনতা। ক্রমে ক্রমে বিচ্যুত হয়ে পড়তে লাগলো আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ধর্মাদর্শ থেকে। নতুন নতুন নবী প্রেরণ করতে লাগলেন আল্লাহ পাক। কিন্তু তারা নবীগণের সদুপদেশের প্রতি কর্ণপাত করলো না। উপরন্তু তাদেরকে বলতে লাগলো মিথ্যাবাদী, ভণ্ড ইত্যাদি। কোনো কোনো নবীকে আবার হত্যাও করে ফেললো তারা। শেষে এলেন হযরত

জাকারিয়া, হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা। কিন্তু তারা শত্রুতা শুরু করলো ওই ত্রয়ী নবীর সঙ্গেও। হযরত জাকারিয়া পৃথিবীর আয়ু শেষে প্রত্যাবর্তন করলেন তাঁর পরম প্রেমময় প্রভুপালকের সন্নিধানে। কেউ কেউ বলেছেন, বনী ইসরাঈলেরা তাঁকে শহীদ করে দিয়েছিলো।

হযরত ইয়াহইয়াকেও শহীদ করে ফেললো দুর্বৃত্তরা। এরপর শূলে চড়াবার চেষ্টা করলো হযরত ঈসাকে। আল্লাহ পাক তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিলেন। তারপর তাদের উপরে আপতিত করলেন আযাব। বাবেলের নতুন রাজা খারদুশকে প্রবল করে দিলেন তাদের উপর। সে তার সেনাবাহিনী নিয়ে চড়াও হলো বনী ইসরাইলের উপরে। বায়তুল মাকদিসের সন্নিকটে উপস্থিত হলো তারা। ইয়াবুরজাযান নামক এক সেনাপতি তার অধীনস্থ সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে বললো, শোনো হে যোদ্ধাবৃন্দ! আমি আমার প্রভুর নামে এই মর্মে শপথ করেছি যে,বায়তুল মাকদিস অধিকার করতে পারলে আমি সেখানকার সকল অধিবাসীকে হত্যা করবো। প্রবাহিত করবো রক্তের নদী। ক্ষান্ত হবো তখন, যখন হত্যা করার মতো আর কাউকে পাবো না। একথা বলে তার সেনাদলকে নিয়ে এগিয়ে গেলো বায়তুল মাকদিসের কোরবানী খানার দিকে। সবিস্ময়ে দেখলো, সেখান থেকে অনর্গল ধারায় নির্গত হচ্ছে রক্ত। সে জিজ্ঞেস করলো, এ রক্ত কার? এ রক্ত বন্ধ হয় না কেন? বনী ইসরাঈলেরা বললো আটশত বছর ধরে এখানে কোরবানী হয়ে আসছে। সকল কোরবানীই কবুল হয়েছে। কিন্তু কেন যে এ কোরবানী আর কবুল হলো না। ইয়াবুরজাযান বললো, এখন আমরা রাজ্যহারা, প্রত্যাদেশ ও নবুয়্যতের ধারাও এখন রুদ্ধ। তাই মনে হয় আমাদের কোরবানী আর গৃহীত হচ্ছে না। সেনাপতি তাদের কথা বিশ্বাস করলো না। তাদের সাতশত সত্তর জন সমাজপতির প্রতি জারী করলো হত্যার নির্দেশ। সে নির্দেশ প্রতিপালিত হলো অল্পক্ষণের মধ্যে। তবুও কোরবানীগাহের রক্ত বন্ধ হচ্ছে না দেখতে পেয়ে পুণরায় হত্যার নির্দেশ দিলো তাদের সাতশত বালককে। সে নির্দেশও কার্যকর হলো। কিন্তু তবুও কোরবানীগাহের রক্তপ্রবাহ রইলো আগের মতো। সেনাপতি বললো, হে দুর্ভাগার দল? এখনো তোমাদের চৈতন্যোদয় ঘটছে না কেন? কী ভেবেছো তোমরা? সত্য কথা না বলা পযর্ন্ত আমি কি তোমাদেরকে ছেড়ে দিবো? সত্য উদঘাটন না হওয়া পর্যন্ত আমার এ নিধনপর্ব কখনো বন্ধ হবে না। তোমাদের শেষতম ব্যক্তিকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হবো না। সুতরাং এখনো সময় আছে। বাঁচতে যদি চাও, তবে এক্ষুণি সত্য ঘটনা জানাও। বনী ইসরাঈলেরা আর সত্যকে গোপন রাখতে পারলো না। বললো, এই রক্ত এক নবীর। তিনি আমাদের ন্যায়ানুগ হতে বলতেন। মন্দ কর্ম করতে নিষেধ করতেন। বলতেন, পূণ্যের প্রতিফল শান্তি।

আর পাপের প্রতিফল শাস্তি। আমরা তাঁকে বিশ্বাস করিনি। মিথ্যাবাদী বলে গালমন্দ করেছি। প্রত্যাখ্যান করেছি তাঁর সরল পথের আহ্বানকে। শেষে তাঁকে হত্যাও করেছি আমরা। এই কোরবানীগাহেই আমরা ঘটিয়েছি এক হত্যাকাণ্ড। সেনাপতি ইয়াবুরজাযান বললো, কী নাম ছিলো তাঁর? তারা বললো, ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়া। সেনাপতি বললো, এতক্ষণে তোমরা সত্য কথা বললে। এ কথা বলেই সে সেজদায় পতিত হলো। সেজদা থেকে মস্তক উত্তোলন করে বললো, হে সৈন্যদল! শহরের বাইরে চলে যাও। বন্ধ করে দাও শহরের সকল প্রবেশ পথ।

সৈন্যরা চলে গেলো। কোরবানীগাহের প্রবহমান রক্তের দিকে লক্ষ্য করে ইয়াবুরজাযান বললো, হে ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়া! আপনাকে হত্যা করার জন্য যে বিপদ বনী ইসরাঈলদের প্রতি আপতিত হয়েছে এবং যে পরিমাণে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে-তার সকল কিছুই আমাদের স্রষ্টা জানেন। এখন আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তার হুকুমে গাত্রোত্থান করুন। নতুবা আপনার সম্প্রদায়ের কাউকে আমি জীবিত রাখবো না। একথা বলার পর সেনাপতি দেখলো, রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলো। বিস্ময়কর এই দৃশ্যটি দেখে সে হত্যা-পরিকল্পনা স্থগিত করতে মনস্থ করলো। বললো, বনী ইসরাঈলেরা যে আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছে, আমিও তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। এরপর সে বনী ইসরাঈলদের উদ্দেশ্যে বললো, সম্রাট খারদুশ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাদের এ মতো পরিমাণ হত্যা করতে, যাতে করে তোমাদের রক্তপ্রবাহ গিয়ে পৌছে শহরের উপকণ্ঠে অবস্থানরত সেনাছাউনির মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত। তাঁর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা আমার নেই। তাই আমি বলি, তোমরা একটি বৃহৎ গর্ত খনন করো। তারপর তোমাদের সকল গৃহপালিত পশুকে জবাই করে ফেলে দাও গর্তটির মধ্যে। বনী ইসরাঈলেরা তাই করলো। প্রবাহিত হলো রক্তের স্রোত। সে-স্রোত গিয়ে পৌছলো সেনাশিবিরের মধ্যবর্তী স্থানে। এরপর নিহত লোকদের লাশ দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো গর্তটি যাতে মনে হয় গর্তটি পূর্ণ করা হয়েছে কেবল মানুষের লাশে। সম্রাট খারদুশ তার বিশেষ সংবাদবাহককে পাঠিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করলো। সংবাদবাহক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গিয়ে তাকে জানালো, হ্যাঁ! মানুষের লাশ দ্বারা পরিপূর্ণ একটি বিশাল গর্ত থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে সেনাশিবিরের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত। সম্রাট খারদুশ তার সৈন্যদেরকে নিয়ে হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন করলো বাবেলে।

এটাই সে ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি যার দিকে ইঙ্গিত করে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে-"লাতুফসিদুন্না ফীল আরদ্বি মাররাতাইনি' (অবশ্যই তোমরা বিপর্যয়

সৃষ্টি করবে এ ধরাধামে দু'বার) এভাবে বনী ইসরাঈলদের প্রতি আপতিত বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিলো বখতনসরের মাধ্যমে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি কার্যকর হয়েছিলো খারদুশের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, প্রথম বিপর্যয় অপেক্ষা দ্বিতীয় বিপর্যয়টি ছিলো অধিকতর মর্মন্তুদ। আরো উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিপর্যয়ের পর বনী ইসরাঈলেরা আর মাথা তুলতে পারে নি কোনদিন। তাই সহজে সিরিয়া ও বায়তুল মাকদিস অধিকার করে নিয়েছিলো রোমান ও গ্রীকরা।

সময় গড়িয়ে চললো। মানবেতর জীবন যাপন সত্ত্বেও বংশবিস্তার ঘটে চললো বনী ইসরাঈলদের। ব্যাপক বংশবৃদ্ধির ফলে অবশ্য তারা সামাজিক প্রতিপত্তি ফিরে পেলো কিছুটা। কিন্তু হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার আর সম্ভব হলো না। আল্লাহ তায়ালা পুণরায় নানারকম নেয়ামত প্রদান করতে লাগলেন তাদেরকে। কিন্তু তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে হয়ে উঠলো উন্নাসিক, উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী। এভাবে একসময় চলে গেলো আল্লাহ তায়ালার বিধানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তখন আল্লাহ পাক তাদের উপরে বিজয়ী করে দিলেন টিটাস ইবনে আস্ইয়ানাশ রুমীকে। রাজা টিটাস ধ্বংস করে দিলো তাদের জনপদ। বায়তুল মাকদিসের পবিত্র শহর থেকে বিতাড়িত করে দিলো দুর্বিনীত বনী ইসরাঈল জনগোষ্ঠীকে। যারা থাকতে চাইলো, তাদের উপরে ধার্য করলো অপমানজনক কর। এভাবে নিজ ভূমিতে পরবাসী হয়ে গেলো তারা। তাদের এরকম অবমাননাকর অবস্থা বহাল রইলো ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের শাসনকাল পর্যন্ত। তিনিই বহুকাল পর বায়তুল মাকদিসের অবরুদ্ধ মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

কাতাদা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে রাজা জালুতকে বনী ইসরাঈলদের উপর বিজয়ী করে দিয়েছিলেন। সে বহুসংখ্যক বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো এবং প্রায় বিরান করে দিয়েছিলো তাদের জনপদ। হযরত দাউদ নবীর যুগে আবার তাদের ছন্নছাড়া জীবনে এসেছিলো স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য। হৃত রাজ্যের অধিকার পুনরায় ফিরে পেয়েছিলো তারা। কিন্তু ধীরে ধীরে আবারো তারা উঠলো উন্নাসিক ও অবাধ্য। ফলে দ্বিতীয় বার আল্লাহ তাদের উপরে প্রবল করে দিলেন বখতনসরকে। বখতনসর তাদেরকে ঘিরে ফেললো। চালালো ব্যাপক গণহত্যা। বন্দীও করলো অনেককে। শেষে এক সময় আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করলেন। দীর্ঘকাল লাঞ্ছিত ও অনিকেত জীবন যাপনের পর আবারো তারা লাভ করলো মুক্তির আস্বাদ। সম্মান, কর্তৃত্ব-সব কিছুই লাভ করলো তারা। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে আবারো তারা হয়ে উঠলো দুর্বিনীত, দুঃশীল। অবশেষে আল্লাহপাক তাদেরকে শায়েস্তা করলেন আরবী নবী

মোহাম্মদ মোস্তফা ﷺ'র মাধ্যমে। তাদের উপরে অবমাননার এই আয়াতে বলা হয়েছে- 'এবং যখন আপনার প্রভুপালক সংবাদ দিলেন যে, তাদের উপর সব সময় নেতৃত্ব করতে থাকবে কেউ না কেউ এবং তাদের এই শাস্তি ক্রমাগত চলতেই থাকবে।'

সুদ্দী লিখেছেন, একবার বনী ইসরাঈলের এক লোক স্বপ্নে দেখলো, মরুবাসী এক এতিম বালক বায়তুল মাকদিস অধিকার করেছে। সে বাবেল শহরের এক বিধবার পুত্র। নাম বখতনসর। উল্লেখ্য যে, ওই সময় বনী ইসরাঈলদের মধ্যে অনেকে ছিলো সত্যবাদী। তাই তাদের স্বপ্ন সত্য হতো। স্বপ্ন দর্শনকারীও বুঝলো তার স্বপ্ন একদিন ফলবতী হবেই। তাই সে তার সঙ্গী সাথীদেরকে সঙ্গে নিয়ে চললো বাবেল শহরে। খুঁজতে খুঁজতে তারা উপস্থিত হলো বখতনসরের বিধবা মায়ের কাছে। একটু পরেই দেখলো, কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে এগিয়ে আসছে বালক বখতনসর। সে ছিলো তখন কাঠুরিয়া। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রয় করে অত্যন্ত কষ্টে সৃষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতো নিজের ও বিধবা মায়ের। বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়েই বাজারের দিকে যাচ্ছিলো সে। বনী ইসরাঈল পথিকেরা তাকিয়ে ছিলো তার গমন পথের দিকে। পরিশ্রান্ত বখতনসর একটু জিরিয়ে নেয়ার জন্য থামলো। কাঠের বোঝাটি মাটিতে রেখে বসে পড়লো তার উপর। পথিকেরা এগিয়ে গেলো তার দিকে। কুশল বিনিময় করলো তার সঙ্গে। তারপর তাকে তিনটি দিরহাম দিয়ে বললো, যাও, এগুলো দিয়ে কিছু খাবার কিনে নিয়ে এসো। সবাই এক সঙ্গে বসে খাবো। বখতনসর বাজার থেকে কিনে আনলো এক দিরহামের রুটি, এক দিরহামের গোশত এবং এক দিরহামের মদ। এরপর সকলে মিলে রুটি গোশত ভক্ষণের পর পান করলো মদ্য। পরপর তাদের এরকম পানাহার চললো তিন দিন। তারপর বনী ইসরাঈল আগন্তুকেরা বললো, শোনো বখতনসর! আমরা চাই তুমি আমাদেরকে নিরাপত্তা পত্র লিখে দাও। তুমি যদি কোনো দিন রাজা হও, তবে নিরাপত্তাপত্রটি আমাদের কাজে লাগবে। বখতনসর বললো, তোমরা কি আমার সঙ্গে উপহাস করছো? তারা বললো, না, উপহাস নয়। এক সময় তুমি যদি রাজা হও, তবে অসুবিধা কোথায়? আর আমাদেরকে নিরাপত্তানামা দিতেই বা তুমি আপত্তি করছো কেন? বখতনসর আর কথা বাড়ালো না। তাদের চাহিদা মতো নিরাপত্তাপত্র লিখে দিলো সে। তারা বললো, তুমি রাজা হলে তোমার চারপাশে থাকবে অনেক গণ্যমান্য মানুষের ভিড়। তখন আমরা তোমার কাছে পৌঁছবো কেমন করে? বখতনসর বললো, তোমরা তখন একটি লম্বা লাঠির মাথায় নিরাপত্তাপত্রটি বেঁধে লাঠিটি উঁচু করে ধোরো। ওই উঁচু লাঠি আমার চোখে পড়লেই আমি চিনতে পারবো।

কাতাদা বর্ণনা করেছেন, বনী ইসরাঈলদের তৎকালীন বাদশাহ সাহাবাইন হযরত ইয়াহইয়া নবীকে খুবই শ্রদ্ধা করতো। একান্ত আপন মনে করতো তাঁকে। কিন্তু ঘটনাক্রমে বাদশাহ পড়ে গেলো এক মহাবিপদে। তার এক স্ত্রীর আগের স্বামীর কন্যা অথবা তার এক ভগ্নিপুত্রীর প্রেমে পড়ে গেলো সে। হযরত ইবনে আব্বাস নির্দিষ্ট করে বলেছেন ভগ্নিপুত্রীর কথা। বাদশাহ কিছুতেই তার দিক থেকে মন ফিরাতে পারলো না। হযরত ইয়াহইয়াকে ডেকে এ ব্যাপারে শরিয়তের বিধান কী, তা জানতে চাইলো। হযরত ইয়াহইয়া স্পষ্ট জানালেন, এরকম বিবাহ আমাদের শরিয়তে হারাম। তাঁর এই অভিমতের কথা পৌঁছে গেলো মেয়েটির মায়ের কাছে। সে তখন উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কন্যাকে বাদশাহর হাতে তুলে দিয়ে বাদশাহর উপরে প্রভাব বিস্তার করাই ছিলো তার ইচ্ছা।

কিছুদিন পরের ঘটনা। বাদশাহ তার ওই ভগ্নিপুত্রীকে এক মদ্যপানের আসরে নিমন্ত্রণ জানালো। মেয়েটির মা তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে সুবাসিতা ও আভরণ শোভিতা করে বাদশাহর দরবারে প্রেরণ করলো। বার বার বলে দিলো, খবরদার! সহজে ধরা দিয়ো না। বাদশাহকে নিজ হাতে মদ্য পরিবেশন করো। তিনি যখন তোমাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হবেন, তখন বোলো, আমার একটি দাবি আপনাকে পূরণ করতেই হবে। অন্যথায় আপনার আহ্বানে আমি মন থেকে সাড়া দিতে পারবো না। বাদশাহ যখন তোমার দাবির কথা জানতে চাইবেন, তখন বোলো, ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়ার ছিন্ন মস্তক চাই। যতক্ষণ আপনি তা বাসনে করে আমার সামনে উপস্থিত না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার অঙ্কশায়িনী হতে পারবো না। রাজ দরবারে মেয়েটি তার মায়ের নির্দেশ মতো সব কিছুই করলো। তার দাবির কথা শুনে চমকে উঠলো বাদশাহ। বললো, হতভাগী নারী! অন্য কিছু চাও। মেয়েটি বললো, অন্য কিছুই আমি চাই না। চাই ইয়াহইয়ার কর্তিত মস্তক। বাদশাহ তখন তার ভগ্নিপুত্রীর প্রেমে আত্মহারা। তাই তার মনতুষ্টির জন্য হুকুম জারী করলো, এই মুহূর্তে ইয়াহইয়ার মাথা কেটে এনে একটি পাত্রে করে আমার প্রিয়তমার সন্মুখে উপস্থাপন করা হোক। রাজ-নির্দেশ পালিত হলো। হযরত ইয়াহইয়ার কর্তিত মস্তক একটি খোলা বাসনে করে আনা হলো বাদশাহ ও তার প্রিয়তমার সামনে। কর্তিত মস্তক থেকে তখনও ফিনকি দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিলো রক্ত। আর বার বার উচ্চারিত হচ্ছিলো, বাদশাহ! তোমার জন্য এ বিবাহ বৈধ নয়। দিন গেলো। রাত গেলো। পরদিন প্রত্যুষে বাদশাহ হুকুম দিলো, বন্ধ করো এর রক্ত ও আওয়াজ। মাটি নিক্ষেপ করো ছিন্ন মস্তকের উপর। সম্পূর্ণ প্রোথিত করে দাও মাটির নিচে। রাজ

প্রাসাদ থেকে এবার ছিন্ন ও রক্তাক্ত পবিত্র মস্তকটি নিয়ে যাওয়া হলো দূরে বধ্যভূমিতে। কিন্তু তখনও নির্গত হতে লাগলো অবিরল রক্তস্রোত।

বখতনসর তখন ব্যাবেলরাজের প্রধান সেনাপতিরূপে শহরের উপকণ্ঠে তার সেনাবাহিনী নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। সন্ত্রস্ত শহরবাসীরা বন্ধ করে দিলো প্রবেশপথগুলো। দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলো সকলে। বখতনসর ও তার সেনাবাহিনী নিরূপায় হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করাও অসম্ভব হয়ে পড়লো তাদের জন্য। খাদ্য সংকট দেখা দিলো। দেখা দিলো আরো অনেক আনুসঙ্গিক অসুবিধা। বখতনসর অগত্যা ফিরে যেতে মনস্থ করলো। সেনাবাহিনীকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দান করতে যাবে, এমন সময় তার সঙ্গে দেখা করতে এল এক বনী ইসরাঈলী বৃদ্ধ। বললো, সেনাপতি! তুমি কি বিজয়ী না হয়েই ফিরে যেতে চাও? বখতনসর বললো, হ্যাঁ। বৃদ্ধ বললো, আমি একটি উপায় বলে দিতে চাই। যদি আমার কথা মানো, তবে তোমার বিজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমার একটি কথা তোমাকে শুনতে হবে। যখন হত্যাকাণ্ড চালাতে বলবো তখন চালাবে, আর বন্ধ করতে বললে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করবে। বখতনসর বললো, ঠিক আছে, তাই করবো। বৃদ্ধ বললো, তোমার সৈন্যদেরকে চারটি সমান অংশে ভাগ করে শহরের চারদিকে অবস্থান গ্রহণ করতে বলো এবং তাদেরকে নির্দেশ দাও, তারা যেনো সকলে একযোগে উপরের দিকে হাত উঠিয়ে বলে; আমরা ইয়াহইয়া বিন জাকারিয়ার রক্তের বিনিময়ে তোমার কাছে বিজয় চাই। আশা করা যায়, তোমরা এরকম দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়বে সকল প্রাকার। বখতনসর বৃদ্ধের পরামর্শ বাস্তবায়ন করলো। সৈন্যদের দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়লো প্রাকার। বৃদ্ধ বললো, সেনাপতি! সেনাদেরকে সংযত হতে বলো। আর তুমি আস আমার সঙ্গে। এই বলে বৃদ্ধ বখতনসরকে নিয়ে গেলো বধ্যভূমিতে। সেখানে তখনো ফিনকি দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিলো হযরত ইয়াহইয়ার শহীদি খুন। বৃদ্ধ বললো, তুমি গণহত্যা শুরুর নির্দেশ দানের পর লক্ষ্য রেখো এই রক্ত প্রবাহের দিকে। দেখবে গণহত্যার সময় এই রক্ত টগবগ করে ফুটছে। একসময় আবার বন্ধ হয়ে যাবে এই রক্তপ্রবাহ। তখন তুমি গণহত্যা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ো।

বখতনসর গণহত্যার নির্দেশ দিলো। তার সৈন্যরা বনী ইসরাঈলের যাকে সামনে পেলো, তাকেই হত্যা করতে লাগলো। এভাবে সত্তর হাজার লোককে হত্যা করার পর বন্ধ হয়ে গেলো ইয়াহইয়ার রক্তপ্রবাহ। বৃদ্ধ বললেন, সেনাধিনায়ক! এবার সকলকে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে বলো। কোনো নবীকে হত্যা করলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর হন্তারক ও হন্তারকের প্রতি যারা সন্তুষ্ট, তাদেরকে হত্যা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হন না। বখতনসর হত্যাকাণ্ড বন্ধের নির্দেশ দিলো।

সৈন্যরা তাদের তরবারী কোষাবদ্ধ করলো। ওই সময় বখতনসরের সঙ্গে সাক্ষাত করলো তিন ব্যক্তি যারা এক সময় তার নিকট থেকে নিরাপত্তাপত্র লিখে নিয়েছিলো। বখতনসর তাদেরকে চিনতে পারলো এবং নিরাপত্তাপত্রের শর্ত অনুসারে তাদের ও তাদের পরিবার পরিজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলো। অবশেষে বখতনসর বায়তুল মাকদিস মসজিদকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করলো। মৃত জীব-জন্তু ও আবর্জনা দিয়ে ভরে ফেললো বায়তুল মাকদিসের প্রাঙ্গণ। তারপর প্রত্যাবর্তন করলো বাবেলের দিকে। উল্লেখ্য যে, বায়তুল মাকদিসের শহর ধ্বংস করার ক্ষেত্রে রোমানরাও বখতনসরকে প্রভূত সাহায্য করেছিলো। বখতনসর বাবেলে প্রত্যাবর্তনের সময় বনী ইসরাঈলদের কতিপয় সমাজপতিকে সঙ্গে নিয়ে গেলো। তাদের সঙ্গে আরো ছিলেন পরবর্তী সময়ের নবী হযরত দানিয়েল ও অন্য কয়েকজন নবী। তাঁরা তখন বালক। জালুতের মাথাও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো বখতনসর।

বাবেল পৌছে সকলে দেখতে পেলো রাজা সাহাবাইন আর নেই। জনতা তখন বখতনসরকেই নির্বাচিত করলো তাদের রাজারূপে। বাবেলবাসীরা ছিলো অগ্নি উপাসক। বখতনসরও ছিলো তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তৎসত্ত্বেও সে হযরত দানিয়েল ও তাঁর সঙ্গীদেরকে খুবই সম্মান করতো। বিষয়টিকে কেউ কেউ মেনে নিতে পারলো না। তারা একবার রাজাকে একান্তে পেয়ে বললো, মহামান্য রাজন! দানিয়েল ও তার সঙ্গীরা আপনার ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। তারা আমাদের জবাই করা পশুর গোশত ভক্ষণ করাকে বৈধ মনে করে না। রাজা তৎক্ষনাৎ হযরত দানিয়েল ও তাঁর সঙ্গীদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, এরা যা বললো, তা কি ঠিক? হযরত দানিয়েল জবাব দিলেন, আমরা এক আল্লাহর বিশ্বাসী। তাই যারা অংশীদারী, তাদের জবাইকৃত পশুর গোশত আমাদের জন্য হারাম। বখতনসর একথায় অপমানিত বোধ করলো খুব। নির্দেশ দিলো, এই মুহূর্তে একটি গর্ত খনন করে দানিয়েল ও তাঁর সতীর্থদের ওই গর্তে ফেলে দাও। তারপর সেখানে ফেলে একটি হিংস্র বাঘকে। নির্দেশ পালিত হলো। গভীর গর্তে হযরত দানিয়েলের দল ও হিংস্র বাঘটিকে রেখে ফিরে এলো সকলে। হযরত দানিয়েলের সতীর্থদের সংখ্যা ছিলো ছয়জন।

কয়েকদিন পর কৌতূহলী লোকেরা গর্তটির কাছে গেলো। তারা ভেবেছিলো এ কয়দিনে নিশ্চয় বাঘটি হযরত দানিয়েল ও তাঁর দলের লোকদেরকে খেয়ে সাবাড় করেছে। কিন্তু গর্তের পাড়ে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো তারা। দেখলো হযরত দানিয়েল ও তাঁর সঙ্গীরা বহাল তবিয়তে উপবিষ্ট। আর তাঁদের সামনে বিশাল বাঘটি সামনের পা দু'টো মেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। তাদের সঙ্গে সপ্তম এক ব্যক্তিও উপস্থিত। সে আর কেউ নয়, বখতনসর স্বয়ং।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহপাক বখতনসরের চেহারা প্রতি বছর পরিবর্তন করে দিতেন। ওহাব বলেছেন, আল্লাহপাক বখতনসরকে কোনো বছর শকুন আকারে, কোনো বছর ষাঁড় আকারে আবার কোনো বছর বাঘের আকারে রাখতেন। এভাবে তার আকৃতি পরিবর্তন করা হয়েছিলো সাত বছর ধরে। এই পরিবর্তন অবশ্য ছিলো তার শারীরিকভাবে। অন্তর কিন্তু বরাবরই ছিলো তার মানুষের মতো। শেষে আল্লাহ পাক তাকে সাম্রাজ্যাধিকারী করেছিলো এবং শোনা যায় সে শেষকালে আল্লাহর প্রতি ঈমানও এনেছিলো। এ প্রসঙ্গে একবার ওহাবকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি বখতনসর সম্পর্কে আহলে কিতাবদেরকে বিভিন্ন মন্তব্য করতে শুনেছি। তাদের কেউ কেউ বলেছে, বখতনসর ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেছিলো। আবার কেউ কেউ বলেছে, সে তো আল্লাহর দুশমন। সে বায়তুল মুকাদ্দিস ধ্বংস করেছে। পুড়িয়ে দিয়েছে তাওরাত। নবীদেরকে হত্যা করতেও সে কুণ্ঠিত হয়নি। সে ছিলো অভিশপ্ত। তাই তার তওবা কবুল করা হয়নি।

সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন আকৃতি বিকৃত করার পর পুনরায় বখতনসরকে আগের মতো চেহারা দিলেন, তখন তার স্বভাবে আচরণে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। সে হযরত দানিয়েল ও তার সাথীদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলো বিশেষভাবে। এরকম করতে দেখে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা হিংসা করতে লাগলো খুব। তারা ছিলো অগ্নি উপাসক। হিংসাবশতঃ তারা বখতনসরকে বললো, দানিয়েল মদ্যপান করে। সুতরাং সে অতিমাত্রায় প্রস্রাব নিশ্চয়ই করে। উল্লেখ্য যে, অতি মাত্রায় প্রস্রাব করাকে তাদের সমাজে ঘৃণার চোখে দেখা হতো। বখতনসর তাদের কথায় প্ররোচিত হলো। একদিন সে হযরত দানিয়েল আর তার সঙ্গীদের জন্য পাঠালো কিছু উত্তম আহার্য ও মদ। তাঁর বাড়ীর সামনে বসালো প্রহরী। তাকে বললো, খেয়াল রেখো, সর্বপ্রথম যে প্রস্রাব করতে বাইরে বেরুবে, তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। সে যদি বলে আমি বখতনসর তবু তার কথা বিশ্বাস করবে না। বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী। যে প্রথমে বাইরে বের হবে, তাকেই তীর বিদ্ধ করার জন্য আমি নির্দেশপ্রাপ্ত। এই বলে সঙ্গে সঙ্গে তীর বিদ্ধ করবে তাকে। একথা বলেই বখতনসর হযরত দানিয়েলের বাসভবনে হাজির হলো মেহমানরূপে। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থানের পর বখতনসরই বের হলো প্রথমে। প্রহরীকে বললো, আমি কিন্তু বখতনসর। প্রহরী তার কথা বিশ্বাস করলো না। বললো, তুমি মিথ্যাবাদী। এই বলেই তীর নিক্ষেপ করলো সে। তীরবিদ্ধ বখতনসরের মৃত্যু ঘটলো কিছুক্ষণের মধ্যেই।

বাগবী লিখেছেন, ঐতিহাসিকগণ হযরত ইয়াহইয়ার শহীদ হওয়ার পর বখতনসরের বায়তুল মাকদিস অভিযানের কথা লিখেন নি। তাঁরা লিখেছেন বখতনসর বায়তুল মাকদিস অভিযানে বের হয়েছিলো হযরত শা'ইয়াকে শহীদ করার পর। তখন বনী ইসরাঈলদের নবী ছিলেন হযরত আরমিয়া। হযরত আরমিয়া ও হযরত ইয়াহইয়ার আর্বিভাবকালের ব্যবধান ছিলো চারশ' একষট্টি বছর। আর তখন পারস্যরাজ বাহমানের পক্ষ থেকে বাবেল শাসন করতো কীরাশ। ওই সময় দ্বিতীয় বারের মতো বায়তুল মাকদিস পুনঃনির্মিত হয়। ওই পুনঃনির্মাণ সংঘটিত হয়েছিলো বখতনসর কর্তৃক বায়তুল মাকদিস ধ্বংস হওয়ার সত্তর বছর পর। পুনঃনির্মাণের অষ্টাশি বছর পরে বায়তুল মাকদিসের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে শাহ সেকেন্দার। এরপর আনুমানিক তিনশত তেষট্টি বছর বিগত হলে জন্মগ্রহণ করেন হযরত ইয়াহইয়া। বাগবী আরো লিখেছেন, এ সম্পর্কে ইবনে ইসহাকের বর্ণনাটিই সমধিক শুদ্ধ।[৭৩১]

হযরত আরমিয়া আ. মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার ঘটনা:

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সূরা বাকারার ২৫৯ নং أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ الخ আয়াতে বর্ণিত ঘটনাটি কোন নবী সম্পর্কে তা নিয়ে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আলী রা., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা. এবং হযরত কাতাদাহ, সোলায়মান ও হাসান র. প্রমুখের মতে এই ঘটনাটি হযরত উযায়ের আ.'র সাথে সম্পৃক্ত। পক্ষান্তরে, ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদ ও এক বর্ণনা মতে, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা.'র মতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল হযরত আরমিয়া আ.'র সাথে। ইবনে জারির তাবারী ও ইবনে কাসীর র.'র মতে, এই মতটিই অধিক প্রাধান্য।[৭৩২]

দ্বিতীয় মতানুযায়ী মুহাম্মদ বিন ইসহাক, হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত আরমিয়া আ.কে বনী ইস্রাঈলের বাদশাহ নাশিবা বিন আমাওয়াসের সাহায্যার্থে প্রেরণ করলেন। নাশিয়া ছিলেন পূণ্যবান। হযরত আরমিয়া আ. তাঁর নিকট আল্লাহর পয়গাম নিয়ে গেলেন। যখন বনী ইস্রাঈলদের অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গেল, তখন আল্লাহ হযরত আরমিয়া আ.কে ওহীর মাধ্যমে জানালেন যে, বনী ইস্রাইলদেরকে বিপদগ্রস্ত করা হবে। এক যালেমকে তাদের জন্য নির্ধারণ করা হবে। যে তাদের অনেক লোককে ধ্বংস করবে। একথা শুনে হযরত আরমিয়া আ. ব্যতিব্যস্ত হয়ে

[৭৩১]. ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫ হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড ৭, পৃ. ৩৭-৪৯

[৭৩২]. তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড ১, পৃ. ৩১৪, তারীখে ইবনে কাসীর, খণ্ড ২, পৃ. ৪৩-৪৪, সূত্র কাসাসুল কুরআন, কৃত. হেফযুর রহমান, খণ্ড ২, পৃ. ২৩৯

পড়লেন। তখন তাঁকে জানানো হল, যতক্ষণ তুমি নির্দেশ না করবে ততক্ষণ আমি তাদেরকে ধ্বংস করব না। আরমিয়া আ. খুশী হলেন। তিন বৎসর অতিবাহিত হল। বনী ইস্রাঈলদের অবাধ্যতা বেড়েই চলল। ওহী আসতে লাগল কম। বাদশাহ তাদেরকে কয়েকবার তাওবা করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তারা মানল না। তখন বাবেলের বাদশাহ বখতনসর তার সেনাবাহিনী নিয়ে বনী ইস্রাঈলের দিকে রওয়ানা হল। বাদশাহ ভয় পেলেন। হযরত আরমিয়া আ. বললেন, আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি রয়েছে আমার পূর্ণ নির্ভরতা। এরই মধ্যে আল্লাহর আদেশে একজন ফেরেশতা বনী ইস্রাঈলদের মত পোশাক পরে আরমিয়া আ.'র নিকটে এলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি আমার গৃহবাসীদের সম্বন্ধে আপনাকে জানাতে চাই। আমি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করি। তবুও তারা আমার উপর নারাজ। হযরত আরমিয়া আ. বললেন, তুমি ভাল আচরণ করতে থাক। সম্পর্কচ্ছেদ কর না। এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। ফেরেশতা চলে গেলেন। কিছুদিন পর ঐ ফেরেশতা মানুষের পোশাক পরে পুণরায় আগমন করলেন। এবারও তিনি একই অভিযোগ তুললেন এবং জবাবও পেলেন প্রথম বারের মতোই। কয়েকবছর পর বখতনসর বায়তুল মোকাদ্দাসকে ঘিরে ফেলল। হযরত আরমিয়া আ. বায়তুল মোকাদ্দাসের দেয়ালের উপর বসেছিলেন। বনী ইস্রাঈলের বাদশাহ তাঁকে বললেন, আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতির কী হল? হঠাৎ ওই ফেরেশতা এলেন এবং তাঁর গৃহবাসীদের অপ্রশংসা করলেন। হযরত আরমিয়া আ. বললেন, এখন পর্যন্ত তারা মন্দ আচরণ থেকে ফিরল না? ফেরেশতা বললেন, আমি তো এতদিন পর্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করেই এসেছি। কিন্তু এখন তাদের অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে অনেক বেশী। এজন্য আল্লাহর প্রতি আমি অভিমানী হয়ে পড়েছি। আপনার প্রতি নিবেদন, আপনি তাদের জন্য বদদোয়া করুন। হযরত আরমিয়া আ. প্রার্থনা জানালেন, হে আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ! তারা যদি তোমার অসন্তোষভাজন হয়ে থাকে তবে তুমি তাদেরকে ধ্বংস করে দাও।' হঠাৎ জ্বলে উঠল ভয়ংকর বিদ্যুৎ। আর জমিন খুলে দিল সাতটি দরজা। হযরত আরমিয়া আ. আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার প্রতিশ্রুতির কী হল? আওয়ায এল, তাদের উপর আযাব এসে পড়েছে। এই আযাব এসেছে তোমার প্রার্থনার কারণেই। হযরত আরমিয়া আ. তখন বুঝতে পারলেন আগন্তুক ব্যক্তিটি মানুষ নয়, ফেরেশতা। তিনি অরণ্যে চলে গেলেন।

বখতনসর এসে বায়তুল মোকাদ্দাস ধ্বংস করে দিল। তারপর শাম দেশে চলে গেল। সেখান থেকে সে বাবেলে চলে গেলে আরমিয়া আ. তাঁর গাধায় চড়ে জঙ্গল থেকে ফিরে এলেন। ঐ সময় তাঁর থলের মধ্যে ছিল কিছু ইরাকী আঙ্গুর ও ডুমুর। ধ্বংসস্তুপ দেখে তিনি মনে মনে বললেন, মৃত্যুর পর আল্লাহ কেমন করে

আবার জীবন দান করবেন। তিনি তাঁর গাধাটিকে রশি দিয়ে বাঁধলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঢলে পড়লেন গভীর নিদ্রায়। তাঁর নিদ্রা ছিল মৃত্যুর মত। সাঈদ ইবনে মনসুর , হাসান বসরী থেকে এবং ইবনে হাতেম, হযরত কাতাদাহ্ থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর নিদ্রা শুরু হয়েছিল চাশতের সময় থেকে। একশ' বছর পর্যন্ত তিনি মৃত্যুবৎ পড়ে রইলেন। তাঁর গাধা, আঙ্গুর ও ডুমুর তাঁর পাশেই পড়ে থাকল। সত্তর বছর পর আল্লাহ এক ফেরেশতাকে পারস্যের বাদশাহ নোশেকের নিকট পাঠালেন। ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ তোমাকে বায়তুল মোকাদ্দাস ও তার পার্শ্ববর্তী শহর নতুন করে আবাদ করতে আদেশ দিলেন। নোশেক হুকুম পালনে তৎপর হলেন। ওদিকে একটি মশা বখতনসরের মস্তিষ্কে প্রবেশ করল এবং তার জীবনাবসান ঘটাল। বাবেলের ইহুদীরা মুক্তিলাভ করল। তারা ফিরে গেল বায়তুল মোকাদ্দাস ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। নগর নির্মাণের কাজ চলল ত্রিশ বছর ধরে। এ সময় হযরত আরমিয়া পুনর্জীবিত হলেন। সূর্য তখন অস্তমিত প্রায়। আল্লাহ তাঁর নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। তিনি বললেন, আপনি কতক্ষণ ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন? অস্তাচলের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, একদিন। বরং পুরো একদিনও নয়। ফেরেশতা বললেন, আপনি ঘুমিয়েছেন একশ বছর ধরে।

দেখুন, এই হচ্ছে আপনার আঙ্গুর আর এই হচ্ছে ডুমুর। আপনার গাধাটির দিকে তাকান। তিনি তাকালেন। তার গলায় যেমন নতুন রশি বাধা ছিল তেমনি আছে। কেউ কেউ বলেছেন, গাধাটি মরেই গিয়েছিল। অস্থিচর্ম সব মিশে গিয়েছিল মাটিতে। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল হযরত আরমিয়া আ.'র দৃষ্টির সামনে গাধাটি জীবিত হোক। তাই হুকুম হয়েছে তাকাও। গাধাটি মরে মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত আরমিয়া আ.'র শরীর ছিল অক্ষত। নবীদের শরীর অক্ষতই থাকে। হাদিস শরীফে এসেছে, নবীদের শরীর গ্রাস করা জমিনের জন্য হারাম।[৭৩৩]

হযরত মরিয়ম আ.

হযরত মরিয়ম আ. কোন নবী নন তবে হযরত ঈসা আ.'র মা হিসাবে পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা আ.'র সাথে তার নামও উল্লেখ হয়েছে। তাই হযরত ঈসা আ.'র পূর্বে হযরত মরিয়ম আ.'র আলোচনা স্থান পেয়েছে।

জন্মগ্রহণঃ তখন নবী হযরত যাকারিয়া আ.'র যমানা। ঐ সময় বনী ইস্রাঈল বংশোদ্ভূতা হান্না নামের এক পরম পূণ্যবতী রমণী ছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন ইমরান বিন লাখাম। তিনি পরম ধার্মিক এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের সম্মানিত ইমাম ছিলেন। আর তাঁর পিতা লাখাম ছিলেন হযরত সোলায়মান আ.-এর

৭৩৩. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র., ১২২৫ হি., তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড ২, পৃ. ৩৬-৩৮

বংশধর। হান্নার এক বোন ছিলেন, তাঁর নাম ছিল উশা বা আশা বিনতে ফাকুজ। হযরত যাকারিয়া আ.'র স্ত্রী ছিলেন তিনি। হান্না এবং ইমরান দম্পতি বৃদ্ধকাল পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। হান্নার বোন উশাও বন্ধ্যা ছিলেন।

কথিত আছে যে, ইমরানের স্ত্রী হান্না একদিন একটি গাছতলায় উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় ঐ গাছের শাখার দিকে একবার তার দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তিনি দেখলেন যে, একটি পাখীর ডিম্ব হতে একটা বাচ্চা বের হয়ে কিচির-মিচির করে ডাকতে শুরু করল। অমনি পাখীটি তাকে নিজের বুকের তলায় নিয়ে আহার করাতে লাগল। এ দৃশ্য অবলোকন করে হান্নার অন্তরে একটি সন্তানের আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আল্লাহর দরবারে একটি সন্তান লাভের জন্য দোয়া করলেন। শুধু তাই নয়, বাইতুল মুকাদ্দাসে গমন করেও তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন, হে মাবুদ! আপনি দয়াপূর্বক একটি সন্তান দান করুন। পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য এ সন্তান কামনা করি না; বরং তাকে আমরা আপনার পবিত্র মসজিদ বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতেই উৎসর্গ করব।

এ ছিল হান্নার মনের একান্ত আশা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর আশা কবুল করে তাঁর গর্ভে একটি সন্তান দান করলেন। পেটে সন্তান জায়গা নিয়েছে বলে অনুভব করলে তিনি ও তাঁর স্বামী এক নতুন ভাবনায় নিমজ্জিত হলেন। যদি সন্তানটি ছেলে হয় তবে তো উদ্দেশ্য সফলই হবে, কিন্তু যদি মেয়ে হয়, তা হলে মানত কিভাবে পূর্ণ করা যাবে। এ চিন্তায় হান্না আবার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

ভাবনা-চিন্তার অবসান ঘটিয়ে যথাসময়ে বিবি হান্না একটি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন। এতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে আবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো মানত করেছিলাম যে, আমার একটি সন্তান হলে আমি তাকে আপনার পবিত্র মসজিদের খেদমতে নিযুক্ত করব। এখন দেখা যাচ্ছে আমার একটি কন্যাসন্তান হয়েছে। এখন আমি কিভাবে আমার মানত পুরা করব? তখন তাঁকে আল্লাহ সান্ত্বনা দেয়ার জন্য জানিয়ে দিলেন, 'হে হান্না! তুমি দুঃখিত হইও না। আমি তোমাকে যে কন্যা সন্তান দান করেছি, কোন পুরুষ (সন্তান) তাঁর সমতুল্য নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আরও জানিয়ে দিলেন যে, আন্তরিক সৎ উদ্দেশ্যই আমার নিকট গ্রহণীয়। ছেলে বা মেয়ে কোন কথা নয়।' আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে একথা শুনে তিনি পরম শান্ত হৃদয়ে বলে উঠলেন, আমি এ কন্যা সন্তানের নাম রাখলাম মরিয়ম এবং তাঁকে তার ভবিষ্যৎ বংশধরকে বিতাড়িত ইবলীসের ফেৎনা হতে রক্ষা করার জন্য আপনারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অবগত করালেন, তোমার দোয়া আমি কবুল করলাম। তুমি তোমার কন্যাটিকে যাকারিয়ার হাতে সমর্পণ কর। যাকারিয়া আ. ছিলেন তৎকালীন নবী এবং মরিয়মের খালু। হযরত যাকারিয়া আ. এ সময়ে সব সময় বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদেই অবস্থান করতেন।

হযরত মরিয়মের তত্ত্বাবধান, লালন-পালন ও জীবন গঠন:

সে সময়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের তত্তাবধায়ক পদে হযরত যাকারিয়া আ. শুধু একাই নিযুক্ত ছিলেন না; বরং ঐ পদে আরও কতিপয় লোক মোতায়েন ছিলেন। হযরত যাকারিয়া আ. ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

হযরত মরিয়ম যখন ভুমিষ্ঠ হলেন তখন তাঁর পিতা উক্ত মসজিদের প্রাক্তন ইমাম ইমরান জীবিত ছিলেন না; সুতরাং জন্মের পর মরিয়মকে যথাসময়ে তাঁর জননী হান্নাই নিজের মানত অনুসারে বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেলেন। মরিয়ম যেহেতু ঐ মসজিদেরই প্রাক্তন ইমাম ইমরানের কন্যা ছিলেন, তাই তাঁর প্রতি প্রত্যেকেরই একটা স্বাভাবিক স্নেহবাৎসল্য এবং তাঁর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই এ আশা পোষণ করছিলেন যে, মরিয়মের তত্ত্বাবধান ভার নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করে সৌভাগ্যবান হবেন। প্রত্যেকের মনে এরূপ আশা পোষণের ফলে তাঁদের মধ্যে এ নিয়ে মনোমালিন্য, বাক-বিতণ্ডা ও কলহের সূচনা ঘটল।

হযরত যাকারিয়া আ. যেহেতু হযরত মরিয়মের খালু ছিলেন, তাই হযরত মরিয়মের প্রতি তাঁর দাবী অধিক, এ যুক্তি বলে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। কিন্তু অন্যান্যরা তা মানতে রাজী হলেন না। অবশেষে হযরত যাকারিয়া আ. একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন যে, তোমরা যখন মরিয়মকে আমার দায়িত্বে প্রদান করতে সম্মত নও, তখন আস আমরা সকলে কোরার (লটারীর) মাধ্যমে বিষয়টি ফায়সালা করি।

এ প্রস্তাবে সকলে রাজী হলেন। সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, তারা তাদের যে লৌহ-কলম দ্বারা তৌরাত গ্রন্থ লিখেন, সে কলম পানির মধ্যে নিক্ষেপ করবেন। তারপর যার কলম পানির উপরে ভাসতে থাকবে, সে ব্যক্তিই মরিয়মের তত্ত্বাবধানকারী হবেন। অথবা কলমগুলো নিকটস্থ স্রোতবিশিষ্ট জর্দান নদীতে ফেলে দেয়া হবে। এরপর যার কলম পানির উপরে এক জায়গায় স্থির থাকবে কিংবা স্রোতের প্রতিকূলে ভেসে যেতে থাকবে, তিনিই মরিয়মের লালন-পালনের দায়িত্ব লাভ করবেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেকের কলমগুলো পানিতে নিক্ষেপ করা হল। এরপর দেখা গেল, হযরত যাকারিয়া আ.'র কলমটি পানির উপরে একই স্থানে ভেসে

রইল অথবা স্রোতের বিপরীত দিকে ভেসে যেতে লাগল। তখন সর্বসম্মতিক্রমেই হযরত যাকারিয়া আ., হযরত মরিয়মের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করলেন।

হযরত যাকারিয়া আ. হযরত মরিয়মের লালন-পালনের ভার প্রাপ্ত হয়ে একজন ধাত্রী রেখে মরিয়মকে তার দুধপান করার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, শিশু মরিয়মের কোন ধাত্রীর দুধপান করার প্রয়োজনই হয়নি। মসজিদ সংলগ্ন একটি উত্তম ও নিরাপদ কক্ষে মরিয়মের থাকার ব্যবস্থা করা হল। তিনি ঐ কক্ষেই অবস্থান করতেন। হযরত যাকারিয়া আ. যখন কোন কার্যোপলক্ষে বাইরে যেতেন তখন তিনি হযরত মরিয়মকে কক্ষের ভিতরে রেখে বের হয়ে তা তালাবদ্ধ করে যেতেন। আবার ফিরে এসে তিনি নিজের হাতেই কক্ষের দরজা খুলতেন। অন্য কারও উক্ত কক্ষে প্রবেশের অধিকার কিংবা সুযোগ ছিল না। হযরত মরিয়ম উক্ত কক্ষের মধ্যে বসে আল্লাহর ইবাদত করতেন। আর মাঝে মাঝে প্রয়োজন মত তিনি কক্ষ হতে বের হয়ে এসে মসজিদে ঝাড়ু দিতেন এবং কখনও কখনও মসজিদের বিছানা-পত্র বিছায়ে ও ঠিক-ঠাক করে দিতেন। সময় মত মসজিদে বাতিও জ্বালিয়ে দিতেন।

ক্রমান্বয়ে যখন হযরত মরিয়ম আল্লাহর দরবারে গৃহিত হলেন, তখন হতে হযরত যাকারিয়া আ. বাহির হতে ফিরে এসে নিজের হাতে দরজা খুলে মরিয়মের কক্ষে প্রবেশ করে তাঁর সামনে বিভিন্ন রকম অমৌসুমী ফল দেখতে পেতেন। তখন অবাক বিস্ময়ে তিনি হযরত মরিয়মকে জিজ্ঞেস করতেন, মরিয়ম! এসব ফল এবং খাদ্যদ্রব্য তোমার নিকট কোথা হতে কিভাবে আসছে?

তিনি জবাব দিতেন, আল্লাহর অদৃশ্য ও অফুরন্ত খাজাঞ্চীখানা হতে এসেছে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা এভাবেই খাদ্য দিয়ে থাকেন।

হযরত মরিয়মের তত্ত্বাবধানকারী খালু হযরত যাকারিয়া আ. বৃদ্ধকাল পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি নিজে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তার বন্ধ্যা স্ত্রীও বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদেরই মত বার্ধক্যপ্রাপ্ত দম্পতি হযরত মরিয়মের মত সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে দেখে হযরত যাকারিয়া আ.'র মনে মনে আল্লাহর দরবারে অনুরূপ একটি সুসন্তান কামনা করতে লাগলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর দোয়াও কবুল করলেন এবং তাঁর জন্য ইয়াহইয়া নামে এমন এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করলেন যার বৈশিষ্ট্যাবলী আল্লাহ পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দিলেন। যথাঃ ইয়াহইয়া হযরত ঈসা আ.'র নবুয়তের সাহায্য প্রদানকারী ও নেতৃত্বের অধিকারী হবেন। তিনি কাম-বাসনা মুক্ত হবেন। তিনি একজন নবী ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্গত হবেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত যাকারিয়া আ.ও তাঁর ছেলে হযরত ইয়াহইয়া আ.'র জীবনী ইতঃপূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মরিয়ম প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে– إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ . هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ . فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ . قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ . قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ . অর্থ: ইমরানের স্ত্রী যখন বললো– হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত! অত:পর যখন তাকে প্রসব করলো– বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি একে কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুত: কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ্ তা ভালই জানেন। সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি–অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে। অত:পর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন– অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তাঁর কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন–'মারইয়াম'! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো? তিনি বলতেন, 'এসব আল্লাহ্র নিকট থেকে আসে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন। সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান কর– নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। যখন তিনি

কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহ্র নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না, তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হবেন। তিনি বললেন, 'হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে, আমার স্ত্রীও যে বন্ধ্যা। বললেন, আল্লাহ্ এমনিভাবেই যা ইচ্ছা করে থাকেন। তিনি বললেন, হে পালনকর্তা! আমার জন্য কিছু নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার জন্য নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলবে না। তবে ইশারা ইঙ্গিতে করতে পারবে এবং তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে আর সকাল–সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।[৭৩৪]

হযরত মরিয়মের সাথে ফেরেশতাদের কথোপকথন:

হযরত মরিয়ম বাইতুল মুকাদ্দাসে থাকাকালে আল্লাহর ফেরেশতাগণ এসে তাঁর সাথে যে কথাবার্তা বলতেন, তা পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ আছে।

এরপর সে সময় উপস্থিত হল, যখন মরিয়মকে ফেরেশতাগণ এসে বলল, হে মরিয়ম! আল্লাহ পাক তোমাকে (তাঁর কাজের জন্য) মনোনীত করেছেন এবং (সকল অবাঞ্ছিত কুকর্ম হতে) পবিত্রতা দান করেছেন। অতএব, তুমি আল্লাহর অনুগত হও এবং তাঁর সামনে সিজদাহ কর ও রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ . يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ . অর্থ: আর যখন ফেরেশতারা বলল,– হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব–নারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন। হে মারইয়াম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং রুকুকারীদের সাথে সেজদা ও রুকু কর।[৭৩৫]

উল্লিখিত কাজগুলো করার আদেশ হল এজন্য যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত মরিয়মের মধ্যে তাঁর কুদরতের এক বিরাট নির্দশন সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক। তাই ঐসব কাজগুলোর মাধ্যমে হযরত মরিয়মের প্রতিপালকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা ছিল একান্ত বাঞ্ছনীয় কর্তব্য।[৭৩৬]

---

[৭৩৪]. সূরা আলে ইমরান-৩৫-৪১
[৭৩৫]. সূরা আলে ইমরান, ৪২-৪৩
[৭৩৬]. কাসাসুল আম্বিয়া, কৃত মাওলানা তাহের সুরাটি, ভারত, পৃ. ৫২৩-৫২৬।

সন্তান জন্মের ঘটনাবলি:

হযরত মরিয়ম একদিন মেহরাবের মধ্যে পর্দা টানিয়ে ইতেকাফে মগ্ন ছিলেন। এমনি অবস্থায় আল্লাহ তাঁর নিকট এক ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ 'আমি মরিয়মের নিকট নিজের রূহ (অর্থ: ফেরেশতা) প্রেরণ করলাম, আর সে তাঁর সামনে একজন মানুষের রূপে আত্মপ্রকাশ করল।'

অতর্কিতে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ভয়ে ও আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে মরিয়ম বললেন, আমি তোমা হতে দয়াময় আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেছি, তুমি যদি সত্যই কোন খোদাভীরু ব্যক্তি হয়ে থাক তুমি আল্লাহকে ভয় কর। আমার ইজ্জতের প্রতি কোন কলঙ্কারোপ করো না।

কোন এক বর্ণনায় দেখা যায়, ঐ সময় কাফুর নামক একটি অত্যন্ত দুশ্চরিত্র যুবক ছিল। সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সুযোগ মত নারীদের শ্লীলতাহানী ঘটাত। বিবি মরিয়ম কোনদিন সে লোকটিকে দেখেননি, কিন্তু তার নাম ও কুকর্মের কথা শুনেছিলেন। উপস্থিত অতর্কিত ঘটনায় তিনি আগন্তুককে সে কাফুরও তো হতে পারে মনে করে অত বেশি ভয় পেয়েছিলেন এবং ঐরূপ কথা বলেছিলেন। আর তার অন্য কারণও ছিল এ যে, ইতোপূর্বে তাঁর একান্ত নিকটে কখনও এরূপ কোন অপরিচিত পুরুষ উপস্থিত হয়নি। যা হোক, তাঁর বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে আগন্তুক আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, আমি আল্লাহর প্রেরিত জনৈক ফেরেশতা। আমি এজন্য আগমন করেছি যে, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র সন্তান দান করে যাব।

ফেরেশতার কথা শুনে হযরত মরিয়ম বললেন, হে আগন্তুক! তুমি কি এ কথা বলছ? আমার সন্তান হবে কি করে? আমাকে আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। আর আমি তো কোন চরিত্রহীনও নই।

ফেরেশতা বললেন, এমনিভাবে হবে। তোমার আল্লাহ বলেন, এরূপ করা আমার পক্ষে খুবই সহজ। আর আমি তা করব এ উদ্দেশ্যে যে, সে ছেলেকে মানুষের জন্য একটি নির্দশন এবং (আমার) নিজের তরফ হতে এক রহমত (স্বরূপ) এ কাজ অবশ্যই হবে। এরপর যখন ফেরেশতা বললেন, হে মরিয়ম! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তাঁর নিজের এক কালেমায় (বাণীর) সুসংবাদ দিচ্ছেন। তাঁর নাম হবে মাসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম। ইহ পরকাল উভয় জগতে সম্মানিত হবে। তাঁকে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে গণ্য করা হবে। বস্তুতঃ সে একজন সৎ ও সাধু পুরুষ হবে।

হযরত মরিয়ম ফেরেশতার কথা শুনে আল্লাহ তায়ালাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সন্তান হবে কেমন করে? অথচ আমাকে

আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে জবাব আসল ঃ এরূপেই আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তিনি তা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন শুধু বলেন, 'কুন' অর্থ হয়ে যাও তখনই তা হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ . قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ . لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . অর্থ: যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ–মারইয়াম–তনয় ঈসা; দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভূক্ত। যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত হবেন। তিনি বললেন, 'পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি!' বললেন, এ ভাবেই। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়।[৭৩৭]

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا . فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا . قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا . قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا . قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا . قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا . فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا . অর্থ: এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। অত:পর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করল। অত:পর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মারইয়াম বলল: আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহ্ভীরু হও। সে বলল: আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। মারইয়াম বলল: কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন

৭৩৭. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৪৫-৪৭

মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না? সে বলল: এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজসাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। অত:পর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন।[৭৩৮]

হযরত মরিয়মের গর্ভসঞ্চার হওয়ার আর একটি ঘটনা:

কথিত আছে যে, একদিন হযরত মরিয়ম বাসঘরের পূর্বদিকস্থ একস্থানে গোসল করতে গেলেন এবং সেখানে তিনি পর্দা ঝুলিয়ে নিলেন যেন আড়ালে গোসল করতে পারেন। আল্লাহ বলেনঃ

'তারপর ঐ অবস্থায় আমি তাঁর নিকট ফেরেশতা জিব্রাঈল আ.কে প্রেরণ করলাম। সে হস্তপদ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, রূপে ও সৌন্দর্যে এর পূর্ণ মনুষ্যাকৃতি ধারণ করে তার সামনে আত্মপ্রকাশ করল। এতে হযরত মরিয়ম অত্যন্ত ভয় পেয়ে বলল, 'তোমা হতে আমার দয়াময় আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যদি তুমি আল্লাহ তায়ালাকে কিছুমাত্র ভয় কর, তবে এখান হতে দূর হয়ে যাও।

তাঁর কথার জবাবে ফেরেশতা জিব্রাঈল বললেন, 'আমি কোন মানুষ নই যে, তুমি আমাকে ভয় করবে; বরং আমি তোমার প্রভুর প্রেরিত ফেরেশতা। আমি এসেছি এজন্য যে, তোমাকে একটি পুত্রসন্তান দান করে যাব। অর্থাৎ তোমার মুখে বা বক্ষে একটার ফুৎকার করব আর তাতে তোমার গর্ভসঞ্চার হয়ে একটি পুত্রসন্তান জন্মিবে। হযরত মরিয়ম ফেরেশতার কথায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, আশ্চর্য কোন ব্যাপার বৈকি, আমার পুত্র সন্তান হবে। অথচ সন্তান জন্মিবার স্বাভাবিক শর্তসমূহের সর্বপ্রধান শর্ত পুরুষ সহবাসই আমার হয়নি।

ফেরেশতা জিব্রাঈল বললেন, হ্যাঁ, সে পুরুষ সহবাস ছাড়াই তোমার সন্তান জন্মিবে, আর তা আমি বলছি না, তোমার প্রতিপালকই বলছেন। বস্তুতঃ তাঁর পক্ষে এ অতি সহজ কার্য। কোন উপকরণ ব্যতীত এভাবে সন্তান সৃষ্টি করার কারণ এই যে, উক্ত সন্তান লোকদের জন্য আল্লাহ তায়ালার অসীম ক্ষমতার একটি নির্দশন এবং তার সাহায্যে লোকদের সৎপথ পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাঁকে রহমতের কারণস্বরূপ করবেন। মূলকথা, পিতা ব্যতীত এ সন্তানের জন্মলাভ আল্লাহর পক্ষ হতে সুমীমাংসিত বিষয়, এ অবশ্যই হবে।

[৭৩৮]. সূরা মারয়াম, আয়াত : ১৬-২২

হযরত মরিয়মের গর্ভসঞ্চার:

হযরত মরিয়ম ও ফেরেশতা জিব্রাঈলের মধ্যে কথোপকথনের পর জিব্রাঈল হযরত মরিয়মের বক্ষে কিংবা মুখের মধ্যে একটি ফুঁক দিলেন। যার মাধ্যমে তিনি গর্ভধারণ করলেন।

এক বর্ণনায় এরূপ দেখা যায়, আল্লাহ তায়ারা হযরত আদম আ.'র দেহ তৈরি করিয়ে সে নিস্পন্দ দেহে যখন ফুঁক দিলেন, তখন সে জড়দেহ জীবিত হয়ে একটি হাঁচি প্রদান করল। তখন আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈলকে বললেন, তুমি এ হাঁচিটিকে নিজের নিকট রেখে দাও। এরই মাধ্যমে আমি বহুকাল পর মরিয়মের গর্ভসঞ্চার করিয়ে তার পুত্র ঈসার উদ্ভব ঘটাব।

হযরত জিব্রাঈল আ. আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তা নিজের নিকট সযত্নে রেখে দিলেন। দীর্ঘকাল পর যখন হযরত ঈসা আ.'র জন্মক্ষণ অতি নিকটবর্তী হল, তখন আল্লাহর হুকুমে হযরত মরিয়মের কাছে মানুষের বেশে উপস্থিত হয়ে তাঁর মুখে হযরত আদম আ.'র সে হাঁচি প্রবেশ করিয়ে দিলেন, যার ফলে হযরত মরিয়মের গর্ভসঞ্চার হল।[৭৩৯]

খালত ভাই ইউসুফের সাথে গর্ভসঞ্চার সম্পর্কিত কথোপকথন:

হযরত মরিয়মের গর্ভসঞ্চার হয়ে যখন তার কিঞ্চিৎ লক্ষণ বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করল, তখন দু-একটি লোকের সেদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। ফলে খুব অল্পসংখ্যক হলেও কিছু লোক সে খবর জানতে পারল। হযরত মরিয়মের জনৈকা খালার ইউসুফ নামে এক পুত্র ছিল। সে খালাতো বোন হযরত মরিয়মের নিকট ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসেবে কখনও কখনও আগমন করত: কিন্তু সে কখনও হযরত মরিয়মের কক্ষে প্রবেশ করত না; বরং বাইরে পর্দার অপর পাশে বোনের সাথে কথাবার্তা বলে আবার চলে যেত।

হযরত মরিয়মের অন্তঃসত্তা হবার ঘটনাটি যখন তার কানে পৌঁছল, সে অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। যেহেতু সে মাঝে মাঝে উক্ত বোনের নিকট যাতায়াত করত। এ কারণে কোন লোক তাকে অহেতুক জড়িয়ে ফেলতে পারে। এ ছিল তার ভীতি ও ভাবনার হেতু। তবে নিজের সম্পর্কে ভাবনার সাথে সাথে তার মনে এ ভাবনাও দেখা দিল যে, এমন সতী-সাধ্বী মহিলা মরিয়মের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা তো কল্পনাও করা যায় না। অথচ বাস্তবে তা ঘটেছে। কিভাবে কি হল, তা জানতে না পারা পর্যন্ত তার মনের উদ্বেগ দূর হচ্ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত একদিন সে হযরত মরিয়মের নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। সে হযরত

[৭৩৯]. কাসাসুল আম্বিয়া, কৃত মাওলানা তাহের সুরুতি, [illegible] প. ৫২৮

মরিয়মকে বললঃ কিহে মরিয়ম! দীর্ঘদিন নিজের সতীত্ব বজায় রেখে শেষে এ কি কাণ্ড ঘটালে তুমি? যাহোক, যা হবার হয়ে গেছে, এখন বল, কার দ্বারা তুমি এ ব্যাপারটি ঘটালে?

ইউসুফের কথা শুনে হযরত মরিয়ম বললেন, ভাই ইউসুফ! আমি আর কি বলব, তোমার যা ইচ্ছা তাই আমাকে বলে যাও।

ইউসুফ বলল, বোন! আমি একটি কথা বলছি, কথাটি শুনে পর জবাব দিও। চাষী ব্যক্তি জমি কর্ষণ করে বীজ বপন করলেই তবে গাছ জন্মায়? কিন্তু বিনা কর্ষণ ও বিনা বপনে কোথাও গাছ হয়েছে এমন নজির কোথাও কি শুনেছ?

হযরত মরিয়ম জবাব দিলেন, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম যে গাছ সৃষ্টি করেছিলেন তাতে কোন বীজের দরকার হয়নি, শুধু আল্লাহর কুদরতেই সে গাছ জন্মেছিল।

ইউসুফ এ কথার জবাব খুঁজে না পেয়ে যা তার মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল, একই ধরনের সে প্রশ্নটিই করে বসল, মরিয়ম! পিতা ব্যতীত কোথাও মাতার গর্ভ হতে সন্তান জন্মেছে এরূপ কথা কোনদিন শুনেছ?

হযরত মরিয়ম ইউসুফের প্রশ্নের জবাবে বললেন, তুমি পিতা ব্যতীত কোথাও সন্তান হওয়ার কথা শুননি; কিন্তু পিতামাতা দু'জন ব্যতীত যে সন্তান হতে পারে তা শুনেছ কি? হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার কথা স্মরণ কর তো, তাদের কি কোন পিতামাতা ছিল? অথচ তারা দু'জনই পিতামাতা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছিলেন। এ আল্লাহ তায়ালার মহান কুদরতের জ্বলন্ত এক নিদর্শন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

হযরত মরিয়মের মুখে এ অমূল্য বাক্য শুনে ইউসুফ একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। তার মুখে আর কোন কথাই ছিল না। তখন সে মরিয়মের প্রতি যে সন্দেহ পোষণ করেছিল, তা হতে তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইল। এরপর সে হযরত মরিয়মের কাছে নিজের অজ্ঞাত ও ত্রুটি স্বীকার করে জিজ্ঞেস করল, মরিয়ম! তোমার প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং ভক্তি বজার রেখে এবার আমি আমার মনের স্বস্তি ও প্রবোধ লাভের জন্য তোমার নিকট অনুরোধ করছি, কিরূপ ঘটনার মাধ্যমে তোমার ভিতরে এরূপ লক্ষণ প্রকাশ পেল, তা শুনিয়ে আমায় সান্ত্বনা প্রদান কর।

হযরত মরিয়ম তার নিকট আনুপূর্বিক ঘটনাটি ব্যক্ত করলেন। এতে ইউসুফের মনে স্বস্তি ও শান্তি ফিরে পেয়ে হযরত মরিয়মের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করলেন।[৭৪০]

[৭৪০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৮-৫২৯

৩৩. হযরত ঈসা আ.

হযরত মরিয়মের বিহ্বলতা ও হযরত ঈসা আ.'র জন্মগ্রহণঃ

ক্রমে ক্রমে মরিয়মের প্রসব লগ্ন যখন ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি ঐ বেদনার দরুন একটি খেজুর গাছের দিকে অগ্রসর হলেন। ঐ সময় তিনি বেদনায় একেবারে কাতর হয়ে পড়লেন; অধিকন্তু এমন কঠিন সঙ্কটকালে কোন একটি সাথী-সঙ্গিনীও ছিল না। এরূপ সময়ে মনে কিছুটা শান্তি লাভের জন্য যে ধরনের উপকরণাদির উপস্থিত থাকা প্রয়োজন, তাও কিছুই ছিল না। উপরন্তু, সন্তান জন্মলাভজনিত দুর্নামের চিন্তা তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলল এবং তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, হায় খোদা! আমি যদি এ অবস্থার পূর্বেই প্রাণত্যাগ করতে পারতাম, এবং বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে যেতাম, তাই আমার জন্য উত্তম হত।

এমতাবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নিকট ফেরেশতা জিব্রাঈলকে পাঠিয়ে দিলেন। ফেরেশতা জিব্রাঈল আগমন করে হযরত মরিয়মের বর্তমান অবস্থায় প্রেক্ষিতে সরাসরি তাঁর সামনে না এসে আড়ালে থেকে তাঁকে সম্বোধন করে আওয়াজ দিলেন। আওয়াজ শুনে হযরত মরিয়ম বুঝলেন, এ তাঁর নিকট পূর্বে আগত সে ফেরেশতারই আওয়াজ।

ফেরেশতা জিব্রাঈল আ. বললেন, হে মরিয়ম! তুমি তোমার নিঃস্বতা ও দুর্নামের ভয়ে চিন্তিত হইও না। তোমার অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখেই তোমার জন্য দয়াময় প্রভু তোমার নিম্নদিকে একটি ঝর্ণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা দেখে ও যার পানি পান করে তোমার মন প্রফুল্ল হবে। ঐ ঝর্ণার পানি হযরত মরিয়মের তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে খুবই অনুকূল ও প্রয়োজনীয় হয়েছিল। হযরত মরিয়ম খেজুর গাছের নীচে সন্তান প্রসব করলেন। ফেরেশতা জিব্রাঈল আ. আড়ালে অবস্থান করে তাঁকে তৎকালীন উপদেশ প্রদান করতে লাগলেন।

সন্তান প্রসবের মত সঙ্কটকালে সহায়-সম্বলহীনা কঠিন সমস্যায় জর্জরিত হযরত মরিয়মকে আল্লাহ যে জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং ফেরেশতা জিব্রাঈল আ. মারফত তাঁর জন্য যে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, তা হযরত মরিয়মের জন্য যেমনি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল, তেমনি সেগুলো ছিল বিজ্ঞানসম্মত ও হিতকর। যেমন, ঝর্ণার পানি সাধারণতঃ কিছুটা উষ্ণ আর সে সময়ে হযরত মরিয়মের উষ্ণ পানিরই প্রয়োজন ছিল।

তদুপরি খোর্মা-খেজুরে প্রচুর খাদ্যসার থাকে। শরীরের উপর প্রবল ধাক্কা এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষয়ের কালে খোর্মা-খেজুর আহার বিশেষ ফলপ্রদ। তা যথেষ্ট

পরিমাণে রক্ত ও সুস্থতা বৃদ্ধিকারী; অধিকন্তু এটি হৃদপিণ্ড, কোমর এবং গ্রন্থিসমূহকে সবলতা দান করে। বস্তুতঃ ঝর্ণার পানি ও খোর্মা-খেজুর প্রসৃতি হযরত মরিয়মের শরীরের জন্য বিশেষ উপকারে এসেছিল। তাছাড়া এ তাঁর মন-মানসিকতায় স্বাভাবিকতা আনয়ন এবং উৎফুল্লতা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়েছিল।

সন্তান প্রসবের পর ফেরেশতা জিব্রাইল আ. অন্তরালে থেকে নির্দেশ করলেন, মরিয়ম! তুমি ঝর্ণার পানি পান কর ও গাছের খেজুর ভক্ষণ কর। বলাবাহুল্য, হযরত মরিয়ম খেজুর খাবার ইচ্ছা করামাত্র গাছটির মাথা মরিয়মের কোলের কাছে ঝুঁকে পড়ল। যাতে স্বস্থানে বসেই তার পরিপক্ক ফলগুলো তুলে নিতে তাঁর কিছুমাত্র কষ্ট হল না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا . فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا . অর্থ: অত:পর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর–বৃক্ষ–মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন: হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম![৭৪১]

ফেরেশতা জিব্রাঈল আ. হযরত মরিয়মকে আরও একটি উপদেশ প্রদান করলেন, যখন প্রসবের খবর শুনে তোমার নিকট লোকজন আসবে এবং তোমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করবে, তখন তুমি ইশারায় বলে দিও যে, আমি দয়াময় প্রভুর উদ্দেশ্যে এখন মানত রোযা রেখেছি, তাই আমার কথা বলা নিষিদ্ধ। তুমি ইশারায় একথা জানিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত থেকো। মহান আল্লাহ তায়ালা তোমার ঐ সৌভাগ্যবান পুত্রটিকে কুদরত বলে শৈশবেই বাকশক্তি প্রদান করেছেন। যার দ্বারা তোমার অপূর্ব ও অসাধারণ পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়ে যাবে।

ফলতঃ হযরত মরিয়মের অস্বস্তি এবং দুশ্চিন্তামুক্তির ব্যবস্থা এরূপে হয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, তখন হযরত মরিয়ম মূলতঃই রোযা রেখেছিলেন এবং তখনকার শরীয়তে মানত রোযার ভিতরে কথা না বলার একটি বিধানও প্রচলিত ছিল।

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا . يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا . فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ

৭৪১. সূরা মারয়াম-২২-২৩

صَبِيًّا . قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا . অর্থ: অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল: হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারূন–ভগ্নী!, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। অত:পর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল: যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? সন্তান বলল: আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।[৭৪২]

হযরত মরিয়মের প্রতি সমাজের নিন্দাবাদ এবং হযরত ঈসা আ.'র পক্ষ হতে তার জবাব প্রদান:

হযরত মরিয়ম তাঁর শিশু সন্তান ঈসাকে কোলে নিয়ে জনপদে আগমন করলেন। লোকজন যখন দেখল, বিনা বিবাহেই হযরত মরিয়মের সন্তান হয়েছে। তখন তারা কু-ধারণার বশবর্তী হয়ে জিজ্ঞেস করল, হে মরিয়ম! তোমার সন্তান হল কিভাবে? তুমি বড়ই জঘন্য কাজ করেছ। এরূপ জঘন্য কাজ করা সাধারণভাবে সকলের জন্যই নিন্দনীয়; কিন্তু তোমার জন্য এধরনের কাজ জঘন্য ব্যাপার। কেননা তোমার বংশের কেউ কোনদিন এমন জঘন্য কাজ করেনি; অধিকন্তু তোমার পিতা কখনও কোন অপকর্ম করেননি। তিনি এতটুকু মন্দলোক ছিলেন না যে, তাঁর স্বভাবের প্রভাব তোমার মধ্যে সংক্রমিত হবে। তোমার মাতাও কোন অসতী ছিলেন না যে, তার ঘৃণিত স্বভাব তোমার মধ্যে আসবে। তুমি হারুন নবীর বংশীয় মহিলা, তিনিও সৎলোক ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তোমার দ্বারা এ ধরনের মারাত্মক জঘন্য কাজ সংঘটিত হওয়া কল্পনাতীত জঘন্য ব্যাপার।

হযরত মরিয়ম সমাজের লোকদের এসব কথায় কোন জবাব না দিয়ে শুধু ইশারায় জানিয়ে দিলেন, এ বিষয় সম্পর্কে তোমরা শিশুর কাছেই জিজ্ঞেস করে দেখতে পার। মরিয়মের এরূপ কথায় তারা কৌতুহলের বশে শিশুর দোলনার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে শিশু! তুমি কি বলতে পার কে তোমার পিতা?

তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে শিশু হযরত ঈসা আ. যে জবাব দিলেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায় এরূপঃ 'আমি মহান আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং নবী বানিয়েছেন। আর আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে বরকত দান করেছেন। তিনি আমাকে আজীবন নামায আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাকে আমার মাতার অনুগত করেছেন, অবাধ্য

৭৪২. সূরা মারয়াম, আয়াত: ২৭-৩০

পাপাচারী ও নাফরমানী করেন নি। যেদিন আমার জন্ম হয়েছে, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমাকে আবার জীবিত করা হবে, সেদিন পর্যন্ত আমার উপর আল্লাহর প্রদত্ত সালাম তথা নিরাপত্তা বজায় থাকবে।

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا . وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا . অর্থ: সন্তান বলল: আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে।[৭৪৩]

মোটকথা, হযরত নবী ঈসা আ.'র জন্মের পূর্বে তাঁর মাতা মরিয়মকে পুত্র ঈসা আ.'র যে সমস্ত গুণাবলীর কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, সেসব কথা হযরত ঈসা আ. নিজের মুখে উচ্চারণ করে সকলকে শুনিয়ে দিলেন।

বনী ইস্রাঈলগণ শিশু ঈসা আ.'র মুখে এ সমস্ত কথা শুনে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। তারা বুঝল যে, নিশ্চয়ই এ শিশু নবী হবেন। এর মাতার বিরুদ্ধে যে সকল অপবাদ দেয়া হয়েছে, তা অমূলক।[৭৪৪]

হযরত ঈসা আ.'র কর্মজীবনঃ

হযরত মরিয়ম তাঁর হৃদয়ের টুকরা ও চোখের পুতুল শিশু ঈসা আ. কে পরম যত্নে লালন-পালন করতে লাগলেন। যতদিন তিনি দোলনায় পালিত হচ্ছিলেন, ততদিন বনী ইস্রাঈলগণ তাঁর দোলনার কাছে এসে বসে যেতন আর তিনি তাদেরকে তৌরাত পাঠ করে শুনাতেন। যখন তিনি বালেগ হলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসল- হে ঈসা! তুমি বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে থাক।

এ আদেশ মোতাবেক তিনি সেদিন হতে তাদেরকে আল্লাহর পথে চালিত হবার জন্য উপদেশ দিতে শুরু করলেন। বনী ইসাঈলগণ কিন্তু সবকিছু বুঝে শুনে তাঁর দাওয়াত ও উপদেশাবলী প্রত্যাখ্যান করল। তারা বলল, ঈসা! তুমি কি আমাদেরকে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম বাদ দিয়ে তোমার প্রচারিত নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে বল? আমরা স্পষ্টতঃই বুঝেছি, তুমি নবুয়তের দাবী তুলে আমাদের উপর নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইছ; কিন্তু জেনে রেখ আমরা তেমন নির্বোধ নই।

---

[৭৪৩]. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩০-৩১

[৭৪৪]. কাসাসুল আম্বিয়া, কৃত মাওলানা তাহের সুরাটি, (ভারত), পৃ. ৫৩১

হযরত ঈসা আ. তাদের কথা শুনে খুবই দুঃখিত হলেন। তারপর তিনি তাদের নিকট হতে শহর ছেড়ে গ্রামের পথে যাত্রা করলেন। গ্রামে পৌছে তিনি কতকগুলো লোককে কাপড় কাঁচতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কাপড় ধুইছ কেন? বরং তার পূর্বে তোমরা নিজেদের অন্তর পরিষ্কার করে লও।

তারা বলল, হুযুর! কাপড় তো পরিষ্কার করি সাবান দ্বারা, কিন্তু অন্তর কি দিয়ে পরিষ্কার করব? হযরত ঈসা আ. বললেন, তোমরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঈসা আ. রুহুল্লাহ' এ কলেমাটি পাঠ কর। এতেই তোমাদের অন্তর পরিষ্কার হবে।

তারা কলেমাটি পাঠ করে তাদের অন্তর পরিষ্কার করল। এরপর তারা অন্যান্য লোকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে নিজ নিজ অন্তর পরিষ্কার করে নিতে অনুরোধ করল। এ লোকজনই হযরত ঈসা আ. এর হাওয়ারী বা সাহায্যকারী দলে পরিণত হল।

এরপর হযরত ঈসা আ. তথা হতে রওয়ানা হয়ে সমুদ্র তীরবর্তী জেলেদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন যে, তারা মাছ শিকার করছে। তিনি তাদের কাছে নিজের নবুয়তের কথা প্রকাশ করলেন। তারা শুনে বলল, নবীগণ অনেক অনেক অলৌকিক কার্য-কলাপ দেখিয়ে থাকেন। তুমি যদি নবী হয়ে থাক তবে তদ্রূপ কিছু প্রদর্শন করে নবুয়তের প্রমাণ দাও।

তাদের এ কথার জবাবে হযরত ঈসা আ. যা বললেন তা পবিত্র কুরআনের ভাষায় এরূপঃ 'আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দিয়ে পাখী বানিয়ে তাতে ফুঁক দিব। তাতে আল্লাহর হুকুমে তা পাখী হয়ে উড়ে যাবে। আর আল্লাহর হুকুমে আমি জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান করতে পারি, কুষ্ঠ রোগীকে নিরোগ করতে পারি। মৃতকে জীবিত করতে পারি, আর তোমার ঘরে কি খেয়েছ ও কি কি রেখেছ তাও বলে দিতে পারি, যেন, এ তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে যায়। অবশ্য যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর আমার হাতে তৌরাত যা কিছু এসেছে, তা আমি স্বীকার করি এবং তার হারামকৃত কোন কোন জিনিস আমি তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে এসেছি, অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও তাঁর অনুগত হও।

জেলেগণ বলল, হে মরিয়মের ছেলে ঈসা! তোমার প্রভু কি আসমান হতে আমাদের জন্য খানার খাঞ্চা পাঠাতে পারবেন? তিনি বললেন, ঈমান আনতে ইচ্ছুক হও এবং আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় কর।

তারা বলল, আমাদের ইচ্ছা হল, আমরা আসমানের খানা খেয়ে আমাদের মনকে বুঝিয়ে লই। আর তার সাথে জেনে লই যে, তুমি আমাদেরকে সত্য কথাই বলছ এবং আমরা এ বিষয়ে সাক্ষী হয়ে থাকব।

এরপর হযরত ঈসা আ. ময়দানে গিয়ে অনাবৃত মাথায় উর্ধ্বদিকে হাতোত্তলনপূর্বক দোয়া করলেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি মহাজ্ঞানী ও চরম দর্শক। আমার প্রিয় লোকজন যা চাইছে, দয়াপূর্বক তা দান করে বাধিত কর।

তখন ফেরেশতা জিব্রাঈল আ. এসে শুনিয়ে দিলেন, আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, তোমরা যা চেয়েছ, আমি তা তোমাদের জন্য নাযিল করছি। অবশ্য যে অকৃতজ্ঞ হবে তাকে আমি এরূপ শাস্তি প্রদান করব যে, তদ্রুপ শাস্তি কেউ কোনদিনই ভোগ করেনি।

এরপর নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ একখানা খাঞ্চা আসমান হতে অবতীর্ণ হল। তার ঢাকনা তুলে দেখা গেল, তাতে পাঁচখানা রুটি ও একটি বড় ভুনা মাছ রয়েছে। এছাড়া কিছু তরকারী, পাঁচটি আনার, কিছু খোর্মা, কয়েকটি জলপাই, কিছু লবণ ও আরও কতিপয় খাদ্যদ্রব্য রয়েছে।

এ আশ্চর্য ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই চারদিক হতে অসংখ্য লোক এসে তথায় সমবেত হল। তারা সবকিছুই দেখল, কিন্তু কেউ কিছুই আহার করল না। তাদের সন্দেহ হল যে, এটি যাদুঘটিত ব্যাপারও তো হতে পারে। তখন তারা বলল, হে ঈসা! তোমার অলৌকিক ক্ষমতাবলে তুমি এ ভুনা মাছটিকে জীবিত করে দেখাও তো দেখি।

হযরত ঈসা আ. কিছু দোয়া পাঠ করে মাছটির উপরে ফুঁক দিলেন। আল্লাহর হুকুমে তখনই তা জীবিত হয়ে সমবেত লোকেদের মধ্যে এমন প্রবল বেগে লাফিয়ে পড়ল যে, তাতে সঙ্গে সঙ্গে সত্তরজন লোক নিহত হল এবং আহত হল আরও বহুসংখ্যক। হযরত ঈসা আ. মাছটির উপর আবার একটি দম করলেন, তা আবার ভুনা মাছে পরিণত হল।

এরপর হযরত ঈসা আ. উক্ত খাঞ্চা হতে খাদ্য নিয়ে সকলের সামনে খেতে বসলেন। কিছু গরীব ও অক্ষম লোককেও ডেকে তাঁর সাথে আহারে বসালেন। অর্থশালী-ধনী লোকজন শরীক না হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে ঘটনা দেখতে লাগল। যে সকল গরীব লোকেরা তা আহার করল, তারা ধনী হয়ে গেল; আর যারা রোগী ও দুর্বল ছিল তারা সুস্থ ও সবল হল। পরক্ষণেই অনেকেই তা খেতে আরম্ভ করল। সারাদিন ধরে বহুলোক তা আহার করল তারপর খাঞ্চাখানা আকাশে উঠে গেল। যারা ঐ খাদ্য খেল না, পরে তারা খুবই অনুতাপ করল। মহান আল্লাহ তায়ালার মর্জীতে পরদিন আবার উক্ত খাঞ্চাখানা আসমান হতে নেমে আসল। সেদিন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রায় সত্তর হাজার লোক পেট ভরে খানা খেল। কিন্তু খাঞ্চার খাদ্য পূর্বানুরূপই রয়ে গেল। এভাবে পরপর তিনদিন আসমান হতে খানার খাঞ্চা আসা-যাওয়া করল এবং প্রত্যেকেই তৃপ্তি সহকারে আহার করল।

বনী ইস্রাঈলগণ হযরত ঈসা আ.'র এ অলৌকিক ক্ষমতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হল এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই তখনই তাঁর প্রতি ঈমান আনল। যারা ঈমান আনল না তাদের মধ্যে কারও আকৃতি শূকরের মত হয়ে গেল। পক্ষান্তরে, যারা ঈমান আনল, তাদের প্রতি নানাভাবে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে লাগল।[৭৪৫]

হযরত ঈসা আ.'র সহজ-সরল জীবনযাপন:

কথিত আছে যে, হযরত ঈসা আ. জীবনে কখনো আরাম-আয়েশ বা সুখ-শান্তি কামনা করেন নি। খানা-পিনা ও চালচলনে তিনি অত্যন্ত সাদা-সিধা ও সরল জীবনযাপন করতেন। এমনকি বসবাস করার জন্য তিনি একখানা থাকার ঘর পর্যন্ত নির্মাণ করেন নি। তাঁর পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে ছিল শুধু একটি পশমী টুপি ও একটি দীর্ঘ পশমী জামা। তাই পরিধান করে হাতে একখানা লাঠি নিয়ে তিনি ভ্রমণ করে বেড়াতেন। যেখানে রাত্রি হয়ে যেত, পথিপাশেই অবাধে শুয়ে গিয়ে রাত কাটিয়ে দিতেন। সঙ্গে তাঁর শুষ্ক জওয়ের রুটি থাকত, তা আহার করে পানি পান করে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতেন। দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতিই তাঁর সামান্যমাত্র আকর্ষণ ছিল না। ঘটনাক্রমে তাঁর কাছে কোন পার্থিব দ্রব্য এসে পড়লে তাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ না করে বরং বিরস বদনেই থাকতেন। তাঁর অবস্থা দেখে পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যেত যে, দুনিয়াবী ধন-সম্পদকে তিনি নিয়ামতের বদলে বালা বলে মনে করতেন। তাঁর মনে আশংকা বিরাজ করত, পার্থিব যে কোন বস্তুই মানুষকে কম-বেশী দুনিয়ার দিকে আকর্ষন করে। অতএব, পার্থিব কিছু লাভ করে খুশীর বদলে বরং চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন থাকাই যুক্তিযুক্ত।

তিনি জীবনে বিবাহ করেন নি এবং বিবাহের প্রতি তাঁর এতটুকুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। মোটকথা, এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় ঘর বাঁধার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে তিনি একেবারেই অবান্তর মনে করতেন।

তিনি সব সময় চলা-ফেরা করতেন পায়ে হেঁটে। কখনও কোন যানবাহনের আশ্রয় গ্রহণ করতেন না। তিনি খেতেন যমিনে রক্ষিত দস্তরখানে খাদ্য-দ্রব্য রেখে। তাঁর কোন বরতন ছিল না।

একবার তাঁর অনুসারীগণ তাঁর নিকট আরজ করল, হুযুর! চলা-ফেরা করতে আপনার খুবই কষ্ট হচ্ছে। অতএব, আপনি একটি ঘোড়া কিংবা উট ক্রয় করুন। তাদের কথা শুনে তিনি বললেন, আমার তা কিনার সঙ্গতি নেই। তখন তারা

[৭৪৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০-৫৩২

সকলে মিলে তাঁর জন্য একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ঘোড়া কিনে দিল। মনের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদিন তিনি সে ঘোড়ায় চড়ে কোথাও সফর করলেন। পথে ঘোড়ার খাবারাদি যোগাড় করতে তাঁকে আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ হতে বিরত থাকতে হল। তিনি যারপর নাই অস্বস্তি ও অশান্তি অনুভব করলেন।

সফর হতে ফিরে এসেই তিনি যারা তাঁকে ঘোড়াটি কিনে দিয়েছিলেন তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, অশ্বারোহণ সফর করা আমার জন্য সম্ভব নয়। যেহেতু এদ্বারা আমি যতটুকু উপকৃত হব তদপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হব অনেক বেশি। অতএব তোমাদের অশ্ব তোমরাই গ্রহণ কর।

আর একবার তাঁর অনুসারীগণ তাঁকে ধরে বসল যে, তারা তাঁর জন্য একখানা থাকার ঘর তৈরি করে দিবে, কিন্তু তিনি তাতে অসম্মত হয়ে বললেন, থাকার ঘর দ্বারা কি লাভ হবে বল? জীবনের তো কোন নিশ্চয়তা নেই। যদি আমি দীর্ঘদিন জীবিত থাকি তবে তো ঐ ঘর কিছুদিন পরই অসুন্দর এবং অপছন্দনীয় হয়ে যাবে। মন চাইবে নতুন এবং সুন্দর ঘর। এ ঘরের তখন আর কোন মূল্য থাকবে না। আর যদি অকালেই প্রাণত্যাগ করি, তবে তো এ ঘরে তখন বাস করবে অন্য লোকজন। তাঁর অনুসারীগণ তাঁর একথা শুনেও জেদ ধরে থাকল, তারা তাঁর জন্য থাকার ঘর নির্মাণ করেই দিবে। এমতাবস্থায় তিনি একদিন তাঁর ভক্তগণকে নিয়ে এক নদীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর তাদেরকে নদীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, তোমরা যখন আমার জন্য ঘর বানিয়ে দেবার জন্য এতই জেদ ধরছ, তখন ঐ তরঙ্গের উপরে আমার জন্য একখানা ঘর নির্মাণ কর। তারা তাঁর কথা শুনে বলল, হুযুর! পানির তরঙ্গের উপর ঘর নির্মাণ করা কিভাবে সম্ভব? যদিও বা নির্মাণ করলাম, তরঙ্গতে তা স্থায়ী থাকবে না; সুতরাং এ পরিশ্রম একেবারেই বৃথা।

তাদের কথা শুনে হযরত ঈসা আ. বললেন, দুনিয়ার ঘর তৈরি করা ঠিক নদীর তরঙ্গের উপর ঘর তৈরি করারই অনুরূপ। কেননা রোজ কিয়ামতরূপ প্রবল তরঙ্গ যে কোন মুহূর্তে উপস্থিত হতে পারে; সুতরাং এ অনিশ্চিত অবস্থায় বৃথা পরিশ্রম করা জ্ঞানীদের কাজ নয়।[৭৪৬]

একদিন ঈসা আ. তিনজন লোক নিয়ে একদিকে চললেন। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেল দু'খানি স্বর্ণের ইট রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছে। হযরত ঈসা আ.'র সঙ্গীগণ ইট দু'খানি উঠিয়ে নিল। হযরত ঈসা আ. তাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, এ তোমাদের খুবই খারাপ কাজ হল। যে জিনিস তোমরা উঠিয়ে

[৭৪৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪-৫৩৫

নিয়েছ, তার মত জঘন্য বস্তু দ্বিতীয়টি নেই। অতএব, তার প্রতি লালসা না করে তা ফেলে দাও। যদি তোমরা আমার কথা অমান্য কর, তবে এমন হতে পারে যে, এ খারাপ বস্তুর লালসায় তোমাদের জীবন শেষ হতে পারে।

সঙ্গীত্রয় হযরত ঈসা আ.'র উপদেশ রক্ষা না করে ইট দু'খানি রেখেই দিল। এতে হযরত ঈসা আ. অত্যন্ত বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন। লোক তিনটি তখন অন্য পথ ধরল। কিছুক্ষণ পথ চলার পর তাদের ক্ষুধার উদ্রেক হল। তখন তারা পথের পাশে একটি জায়গায় আরাম করতে বসল। ইতোমধ্যে তাদের একজন বাজার হতে কিছু খাবার কিনে আনতে বাজারে গেল। আর অপর দু'জন সেখানে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

সহসা লোক দুটির মনে স্বর্ণের ইটের লালসার প্রাবল্যে এ কু-বাসনার উদয় হল যে, তারা তিনজন লোক, অথচ স্বর্ণের ইট পাওয়া গেল দু'খানা, এ বন্টন করতে গেলে দু'খানা ইটই ভাঙ্গতে হবে। তবে খুবই ভাল হত, যদি তারা দু'জন লোক হত। তা হলে এককেজন আস্ত এককেখানা ইট ভাগে পেত। এ মুহূর্তে শয়তান ইবলীস এসে লোক দুটিকে লোভের তাড়নায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দিল। তাদের মনে পাপ-কামনা প্রবল হল। তারা উভয়ে একমত হয়ে গেল যে, তৃতীয় লোকটি বাজার হতে আসামাত্রই দু'জনে মিলে তাকে মেরে ফেলবে এবং ইট দু'খানা দু'জনেই ভাগ করে নিবে।

অপরদিকে যে লোকটি বাজারে গিয়েছিল সে পথে চিন্তা করতে লাগল, দু'খানা ইট তিনজনে সমান বন্টন করে নেয়া খুবই ঝামেলা। আহা! কতই না ভাল হত, যদি ইট দু'খানাই আমার একার হত। এরূপ চিন্তা করতে করতে লালসা তার মনে পাপকে টেনে আনল। সে বুদ্ধি স্থির করল যে, বাজার হতে যে খাদ্য নিয়ে যাবে তাতে সে বিষ মিশিয়ে সঙ্গীদ্বয়কে খাওয়ায়ে হত্যা করে অনায়াসে দু'খানা ইটেরই মালিক সে একা হতে পারবে। যেই বুদ্ধি, সে কাজ। বাজার হতে কিছু বিষ ক্রয় করে সে খাদ্যের সাথে মিলিয়ে সঙ্গীদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে তারা দু'জনে মিলে তাকে হত্যা করে ফেলল; এরপর আহার করল। আর যায় কোথায়, তা আহার করার সাথে সাথেই বিষের ক্রিয়ার তারা উভয়েই মারা গেল।

এভাবে অতিরিক্ত লোভের ফলে তিনটি লোকই প্রাণ হারাল। আর স্বর্ণের ইট দু'খানা গাছতলায় পড়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর হযরত ঈসা আ. ঘুরতে ঘুরতে ঐ পথেই এসে উপস্থিত হলেন এবং এ দৃশ্য অবলোকন করলেন। তিনি নিজে নিজেই বলতে লাগলেন, প্রতারক

দুনিয়ার কাজই এরূপ। সে তার বন্ধুদের ঠিক এভাবেই প্রথমে নিজের প্রতি আসক্ত করে পরে তাদের প্রাণ হরণ করে।[৭৪৭]

হযরত ঈসা আ. কর্তৃক হযরত নূহ আ.'র মৃত পুত্র শামের নির্জীবন লাভ এবং নছীবীন শহরের বাদশাহর ঈমান গ্রহণঃ

এক প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা আ.'র যমানায় নছীবীন নামক শহরে এক জবরদস্ত কাফের বাদশাহ ছিল। আল্লাহ পাকের তরফ হতে হযরত ঈসা আ.'র প্রতি উক্ত কাফের বাদশাহকে হেদায়াত করার নির্দেশ হল।

তদানুযায়ী হযরত ঈসা আ. নিজের অনুসারীগণকে নিয়ে নছীবীন শহর অভিমুখে রওয়ানা হলেন। যথাসময়ে তিনি উক্ত শহরের নিকটে পৌঁছে তাঁর অনুসারীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে মজবুত ঈমান এবং এমন সাহাবী কে কে আছে, যে রাজ্যের মধ্যে ঢুকে আওয়াজ দিয়ে বলতে পারবে, আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আ. আগমন করেছেন। তোমরা সকলে এসে তাঁর নিকট খাঁটি ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ কর।

ইয়াকুব নামক এক ব্যক্তি এ কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। সাথে সাথে তুমান নামক একব্যক্তি এবং তৎকালীন অন্যতম নবী হযরত শামাউন আ. প্রস্তুত হলেন।

তারা যখন তিনজনে রওয়ানা হল তখন হযরত ঈসা আ. বললেন, ইয়াকুব এখন অবশ্য সকলের আগেই আমার নির্দেশ পালনে প্রস্তুত হল; কিন্তু মনে হচ্ছে, সে আবার আমাকে বাদ দিয়ে যাবে। তবে তুমান সম্পর্কে তদ্রূপ ঘটনা ঘটবে না। যার ফলে তাকে যথেষ্ট বিপদে লিপ্ত হতে হবে।

হযরত ঈসা আ. এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করার পর তারা গন্তব্য জায়গায় রওয়ানা করল এবং নছীবীন শহরের মধ্যে ঢুকে একস্থানে গিয়ে উপনীত হল। সেখানে বসে হযরত শামাউন আ. তাঁর সাথী দু'জনকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা শহরের ভিতরে আরও অগ্রসর হয়ে এখানকার লোকজনকে ডেকে হযরত ঈসা আ.'র আগমনের খবর দাও। আমি এখানে অবস্থান করি। তোমাদের উপরে যদি কোন রকম বিপদ-আপদ উপস্থিত হয়, তা হলে আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করব। তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়ে ইয়াকুব ও তুমান যথাস্থানে পৌঁছে প্রথমে ইয়াকুব সেখানকার লোকদেরকে আওয়াজ দিয়ে বলতে লাগল, হযরত ঈসা রুহুল্লাহ আ. তোমাদেরকে সরল পথ দেখাবার জন্য আগমন করেছেন। তোমরা এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত কর।

---

[৭৪৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫-৫৩৬

বলা-বাহুল্য নছীবীন শহরের কাফের বাদশাহর প্রজাগণও কাফের ছিল; সুতরাং তারা এরূপ আওয়াজ শুনে ছুটে এসে তাদের দু'জনকেই ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে কে এরূপ আওয়াজ দিয়েছে?

ইয়াকুব ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ল এবং নিজের কথা অস্বীকার করে তুমানকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, এ লোকটিই ঐসব কথা বলেছে। আমি কিছু বলিনি। তখন লোকজন তুমানকে ধরে বাদশাহর সামনে নিয়ে হাজির করল।

বাদশাহ তার লোকজনের নিকট খবর শুনে বলল, যে লোকের জন্ম হয়েছে এভাবে, তাকে আবার তুমি রুহুল্লাহ ও আল্লাহর নবী বলছ কোন মুখে? এরূপ কথা আর কখনও বলবে না। আর এরূপ কথা বলে যে অপরাধ করেছ এজন্য অপরাধ স্বীকার করে এখনি তোমাকে তাওবা করতে হবে যে, জীবনে আর কখনও এরূপ কথা বলবে না। তা হলে এখন তোমাকে আমি ক্ষমা করব। আর যদি তা না কর, তবে তোমাকে কঠিন শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

তুমান বাদশাহর কথায় এতটুকুমাত্র ভীত না হয়ে বলল, বাদশাহ! তুমি আমাকে যা ইচ্ছা করতে পার, কিন্তু আমি জীবন থাকতে কখনও এ বিশ্বাস ও কথা হতে তাওবা করব না।

বাদশাহ তুমানের কথায় রাগে অস্থির হয়ে অনুচরদেরকে আদেশ দিল, তার চক্ষুদ্বয় উপড়ে ফেল এবং হাত-পা কেটে তাকে কদর্য স্থানে ফেলে রাখ। সাথে সাথে এ আদেশ পালিত হল।

তুমানের সাথে বাদশাহর এ আচরণের খবর শুনে হযরত শামাউন বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, জাঁহাপনা! আপনি আমাকে হুকুম করলে আমি তুমানের কাছে গিয়ে একটু কথা বলতাম, আর শুনে আসতাম, সে ঈসার কথা কি বলে। এরপর তা আপনাকে এসে জানাতাম।

বাদশাহ বলল, অবাধে যেতে পার। সে তার কতিপয় লোককেও শামাউনের সাথে পাঠিয়ে দিল। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তুমানের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তার নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তুমি সে ঈসাকে আল্লাহর নবী ও রুহুল্লাহ বলছ, তার নিকট কি নির্দশন আছে, যা দেখলে তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে আমার মনের সন্দেহ দূরীভূত হবে?

তুমান বলল, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার গুণে অন্ধ, লেংড়া-লুলা এবং অন্যান্য জটিল রোগী আরোগ্য লাভ করে। তা শুনে হযরত শামাউন বললেন, এসব কাজ তো চিকিৎসকের দ্বারাও হয়ে থাকে। অন্য কোন নিদর্শন থাকলে তার কথা বল।

তুমান বলল, লোকজন ঘরের মধ্যে যা লুকিয়ে রাখে এবং তারা ঘরে বসে যা আহার করে হযরত ঈসা আ. বাইরে বসে তা বলতে পারেন।

হযরত শামাউন বললেন, অভিজ্ঞ নজ্জুম (গণক)গণ নির্ভুল গণনার দ্বারা একাজ করতে পারে। এটি নবুয়তের নিদর্শন নয়। যদি তাঁর নিকট অন্য কোন নিদর্শন থাকে তবে তার কথা বল।

তুমান বলল, হযরত ঈসা আ. মাটির দ্বারা পাখী বানিয়ে ফুঁক দিলে তা জীবিত পাখীর মতই আকাশে উড়ে বেড়াতে পারে ।

হযরত শামাউন বললেন, এ জাতীয় কাজ অনেক যাদুকরদের দ্বারাও সাধিত হয়ে থাকে। এছাড়া তাঁর নিকট যদি অন্য কোন অলৌকিক ক্ষমতা থাকে তবে তার কথা বল।

তুমান বলল, হযরত ঈসা রুহুল্লাহ আ. আল্লাহর হুকুমে মৃত ব্যক্তিতে জীবিত করতে পারেন।

হযরত শামাউন এ সকল কথা শুনে বাদশাহর কাছে গিয়ে বললেন যে, তুমান আমার নিকট হযরত ঈসা আ.'র এ সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতার কথা বলল। এমনকি তিনি নাকি আল্লাহর হুকুমে মৃত ব্যক্তিকেও জীবিত করতে পারেন। যদি একথা সত্য হয় তবে নিশ্চয়ই তিনি যে, আল্লাহর নবী তাতে আর কোন সন্দেহ করা যায় না। কেননা নজ্জুম বা যাদুকরগণ অনেক কিছু করে দেখাতে পারলেও কোন মৃত ব্যক্তিকে তারা জীবিত করে দেখাতে পারে না।

তখন বাদশাহ বলল যে, ঈসাকে তোমরা দরবারে নিয়ে আস। যদি দেখা যায় যে, সত্যই সে মৃতকে জীবিত করতে পারে, তবে নিশ্চয়ই তাঁকে সত্য পয়গাম্বর বলে স্বীকার করে নেব।

হযরত শামাউন তখন হযরত ঈসা আ.'র নিকট গিয়ে তাঁকে নিয়ে বাদশাহর দরবারে রওয়ানা হলেন। পথে তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার যে সকল মু'জেযার কথা বাদশাহর কাছে বলা হয়েছে সেসব কিন্তু অবশ্য তার সামনে পেশ করতে হবে। নতুবা সে আপনাকে ও আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

হযরত ঈসা আ. বললেন, আগে কি নিদর্শন দেখাব, তাই বল। হযরত শামাউন বললেন, বাদশাহ তুমানের চক্ষু উপড়ে ফেলেছে ও তার হস্ত-পদ কর্তন করেছে। সর্বাগ্রে তাকে ভাল করতে হবে। তারপর বাদশাহ যে নিদর্শন দেখতে চায়, তাই প্রদর্শন করতে হবে।

হযরত ঈসা আ. তুমানের নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে তার হাত-পা এবং চোখে নিজের হাত বুলিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার কর্তিত হাত-পা এবং উৎপাটিত চক্ষু সম্পূর্ণরূপে ঠিক হয়ে গেল।

এরপর হযরত ঈসা আ. হযরত শামাউনের সাথে গিয়ে বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। তুমান যে নিদর্শনগুলোর কথা বলেছিলেন, তিনি তা একে একে আল্লাহর অনুগ্রহে বাদশাহ ও তার দরবারের লোকদের সামনে প্রদর্শন করলেন। নছীবীন শহরের অসংখ্য রোগীকে তিনি আল্লাহর হুকুমে পলকের মধ্যে ভাল করে দিলেন।

হযরত সালমান ফারসী রা. কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, এরপর বাদশাহর দরবারের লোকজন হযরত ঈসা আ.কে বলল, এতক্ষণ আমরা যা দেখলাম, এ ধরনের কাজ অনেক দক্ষ যাদুকরও করতে পারে, কিন্তু তারা কোন মৃত মানুষকে পুনর্জীবন দান করতে পারে না। তুমি সেরূপ কাজ করে দেখাতে পারবে কি?

হযরত ঈসা আ. তদুত্তরে বললেন, আল্লাহ তায়ালার হুকুম হলে আমি তাও দেখাতে পারব। তখন তারা সকলে হযরত ঈসা আ.কে নিয়ে একটি বহু পুরাতন কবরস্থানের দিকে চলে গেল। সেখানে প্রাচীনকালের নবী হযরত নূহ আ.'র পুত্র শামের কবর ছিল। ঐ কবরটির কাছে পৌঁছে লোকজন হযরত ঈসা আ. কে বলল, তুমি এ কবরে যাকে দাফন করা হয়েছিল, তাকে জীবিত করে দেখাও।

তখন হযরত ঈসা আ. উক্ত কবরের নিকট গিয়ে প্রথমে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর আল্লাহর দরবারে এরূপ মোনাজাত করলেন, হে সর্বশক্তির মালিক আল্লাহ তায়ালা! তুমি তোমার অফুরন্ত ক্ষমতার দ্বারা এ কবরের মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে সমবেত লোকজনকে তোমার ক্ষমতার নজীর দেখিয়ে দাও। হযরত ঈসা আ. এরূপ মুনাজাত করামাত্র কবরটি বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং তার ভিতর হতে শ্বেত-শ্মশ্রু ও কেশমণ্ডিত একটি লোক উপরে উঠে আসল। এরপর প্রথমে সে হযরত ঈসা আ. কে সালাম করে বললেন, হে লোকজন! তোমরা জেনে রাখ, এ ব্যক্তি আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আ.। তোমার তাঁর উপরে ঈমান এনে সকলে তাঁর অনুসরণ কর। এ লোকটিই ছিল হযরত নূহ আ.'র পুত্র শাম।

হযরত ঈসা আ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে শাম! তোমাদের যমানায় তো কারও চুল-দাড়ি পেকে মৃত্যু পর্যন্ত সাদা রং ধারণ করত না। তবে তোমার চুল-দাড়ি এভাবে সাদা দেখছি কেন? তখন শাম জবাব দিল, হে আল্লাহর নবী! আমি জানতাম যে, রোজ কিয়ামতের সামান্য আগে আপনি দুনিয়ায় আসবেন। কবরে থেকে আপনার আওয়াজ শুনে আমি মনে করলাম যে, রোজ কিয়ামত আসন্ন হয়েছে। আর তাই আপনার আগমন ঘটেছে; সুতরাং হাশরের মাঠের হিসাব-নিকাশের ভয়ে ও আতঙ্কে আমার চুল-দাড়ি সহসা এরূপ ধারণ করেছে।

হযরত ঈসা আ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, শাম! তুমি বলতে পারবে কি কতদিন পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটেছিল? শাম জবাব দিল যে, চার হাজার বছর পূর্বে আমি এ দুনিয়া ছেড়ে গিয়েছিলাম। হযরত ঈসা আ. বললেন, এখন যদি তোমার আবার এ দুনিয়ায় বসবাস করার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা হলে বল, আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করে তোমার জন্য সে ব্যবস্থা করে দেই। শাম বলল, না, হে আল্লাহর নবী! আমি তা চাই না। কেননা দুনিয়া যখন স্থায়ী বাসজায়গা নয়, দু'দিন পরে হলেও আবার এ জায়গা পরিত্যাগ করতে হবে তখন আর কিছুদিনের জন্য এখানে থেকে কি লাভ হবে? তার বদলে আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহর রহমত আমার উপর সর্বদা বহাল ও জারী থাকে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হবার পর শাম আবার তার কবরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কুদরতে কবরটি যেমন ছিল ঠিক তেমন হয়ে গেল।

এ ঘটনা নছীবীন শহরের বাদশাহ এবং তার লোকজন সরাসরি প্রত্যক্ষ করে একযোগে তারা হযরত ঈসা আ.'র উপর ঈমান এনে সত্যধর্মে দীক্ষিত হল।[৭৪৮]

হযরত মরিয়মের মৃত্যুবরণঃ

হযরত মরিয়ম এবং তার পুত্র ঈসা আ. একটি কুটিরে অবস্থান করে কাল-যাপন করছিলেন। একদিন হযরত মরিয়ম পুত্র হযরত ঈসা আ. কে একটি ফলের তালাশে বনে পাঠিয়ে দিলেন। কুটিরে তখন হযরত মরিয়ম একাকিনীই ছিলেন। এমন সময় মালাকুল মওত আযরাঈল আ. তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন।

হযরত মরিয়ম আযরাঈলের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে অত্যন্ত ভয় পেলেন এবং আতঙ্কিতভাবে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন এবং জানতে চাইলেন, তিনি কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন।

ফেরেশতা আযরাঈল আ. জবাব দিলেন, আমি আজরাইল। আমি আল্লাহর নির্দেশে আপনার জান কবজ করার জন্য এখানে এসেছি। আপনার দুনিয়াবী জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। আপনি এখন পরপারে যাবার জন্য প্রস্তুত হউন।

আযরাঈলের কথা শুনে বিমর্ষ বদনে হযরত মরিয়ম বললেন, হে মালাকুল মওত। আপনি কিছুক্ষণের জন্য আমাকে অবকাশ দিন। আমি আমার প্রাণাধিক পুত্রকে একটু বাইরে পাঠিয়েছি, এখান হতে চিরবিদায় গ্রহণকালে তাকে একটু দেখে যেতে চাই। আর বিদায়ের প্রাক্কালে তাকে দু'চারটি উপদেশ বাণী শুনিয়ে যাবার ইচ্ছা। অতএব সে ফিরে আসুক, তারপর আপনি আমার জান কবজ করুন।

৭৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৬-৫৪০

মালাকুত মওত বললেন, হে হযরত ঈসা আ.'র জননী মরিয়ম! আমার এ কাজে এক পলকও দেরি করার সাধ্য নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালার সুনির্দিষ্ট আদেশ এই : প্রত্যেক প্রাণীরই মৃত্যুর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময় আছে। যখন সে সময় এসে উপস্থিত হয়, তখন না সে একমুহূর্তে পশ্চাদপদ হতে পারে, না একমুহূর্ত এগিয়ে যেতে পারে।' আল্লাহ পাকের এ ঘোষণা অনুসারে আপনার জান কবজ করতে হবে।

আযরাঈলের একথা শুনে হযরত মরিয়ম বলে উঠলেন, আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, আল্লাহর আদেশেরও অবাধ্য নই। কিন্তু দুঃখ এই যে, শেষ মুহূর্তে পুত্রকে কিছুই বলে যেতে পারলাম না। যাহোক, আল্লাহ যা কিছুই করেন তা মঙ্গলের জন্যই করে থাকেন।

ফেরেশতা আযরাঈল আ. যথাসময়েই হযরত মরিয়মের জান কবজ করে চলে গেলেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

হযরত মরিয়মের প্রাণহীন দেহ মাটিতে পড়ে রইল। কিছুক্ষণ পর হযরত ঈসা আ. বন হতে ফল-মূল নিয়ে কুটিরে ফিরে এসে দেখলেন, তাঁর জননী শায়িত রয়েছেন। তিনি তাঁকে নিদ্রিত অবস্থায় আছেন ভেবে ডাকতে শুরু করলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাড়া না পেয়ে তিনি তাঁকে নাড়িয়ে দেখলেন, তাঁর পবিত্র রুহ দেহত্যাগ করে চলে গেছে।

হযরত ঈসা আ. তাঁর মাতার এরূপ আকস্মিক পরলোকগমনে প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়ার উপক্রম হলেন। তিনি মাতার জন্য শোকে-দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর করুণ ক্রন্দনে পশু-পাখী কেঁদে আকুল হল। এভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর তিনি কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে মাতার কাফন-দাফন কার্যে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু তাঁরা মাতাপুত্র এমন জায়গায় বসবাস করতেন, যেখানে কোন লোকালয় ছিল না। তখন তিনি কতিপয় লোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিছুদূর চলার পর তাঁর কয়েকজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হল। তারা তাঁর দিকেই আসছিল। তিনি তাদের কাছে মাতার মৃত্যুর কথা বলে তাঁর কাফন-দাফনের ব্যাপারে সাহায্য চাইলেন।

তাঁর কথার জবাবে আগন্তুকগণ বলল, হে আল্লাহর নবী! আমরা মানুষ নই; বরং আল্লাহর ফেরেশতা। আমরা আপনার মাতার এ শেষকৃত্যে আপনাকে সাহায্য করার জন্যই এসেছি। বলাবাহুল্য, ফেরেশতাগণ হযরত মরিয়মের কাফন-দাফনোপযোগী কাপড়, সুগন্ধী ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র বেহেশত হতেই নিয়ে এসেছিল। এরপর হযরত ঈসা আ. আগত ফেরেশতাগণকে নিয়ে তাঁর জননীর কাফন-দাফন সম্পন্ন করলেন।

কাফন-দাফনের পর হযরত ঈসা আ. আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে মাবুদ! তুমি তো আমাকে মৃত মানুষ জীবিত করার ক্ষমতা দিয়েছ। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমার মৃত মাতাকে জীবিত করে তাঁর নিকট দু' একটি কথা জিজ্ঞেস করি।

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এ ব্যাপারে অনুমতি দান করলেন। তখন হযরত ঈসা আ. 'কুম বিইযনিল্লাহ' বলে তাঁর মাতাকে জীবিত করলেন এবং তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার জননী! পৃথিবীতে কোন সময়টি আপনার কাছে সর্বাধিক কষ্টকর বলে মনে হয়েছে? তিনি বললেন, জান কবজের সময়টি আমার কাছে সবচেয়ে কষ্টকর সময় বলে অনুভূত হয়েছে।[৭৪৯]

হযরত ঈসা আ. কে চতুর্থ আসমানে তুলে নেবার ঘটনা:

হযরত ঈসা আ.'র প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থের নাম ইঞ্জীল এবং হযরত মূসা আ.'র প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থের নাম তৌরাত। তৌরাত গ্রন্থে আল্লাহর আদেশ অনুসারে সাপ্তাহিক দিনগুলোর মধ্যে শনিবার দিনটিকে অত্যন্ত মোবারক দিনরূপে গণ্য করা হত এবং ঐদিন দুনিয়ার যে কোন কাজ-কর্ম হারাম করে তা শুধু আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল।

কিন্তু হযরত ঈসা আ.'র যমানায় আল্লাহ তায়ালা ঐ আদেশ রহিত করে হযরত ঈসা আ.এর প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জীল কিতাবে রবিবার দিনটিকে সাপ্তাহিক সেরা দিন হিসেবে নির্ধারিত করা হল এবং এ দিনটিকে পার্থিব কাজ-কর্মের বদলে শুধু আল্লাহর ইবাদত এবং ধর্মীয় কাজ-কর্ম করার জন্য আদেশ দেয়া হল। হযরত ঈসা আ. যখন বনী ইস্রাঈলদের মধ্যে এ আদেশ বাণী প্রচার শুরু করলেন, তখন বনী ইস্রাঈলগণ প্রথমতঃ নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা শুরু করল যে, বনী ইস্রাঈল কওমে কত অসংখ্য নবী আবির্ভূত হলেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই হযরত মূসা আ.'র গ্রন্থ তৌরাতের বিধান অনুযায়ী ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রচার করেছেন। অথচ হযরত ঈসা আ.কে দেখা যাচ্ছে হযরত মূসা আ.'র বিপরীত রীতি-নীতি চালু করতে চাইছেন। এভাবে তিনি আমাদের মূসায়ী ধর্মকে বিলুপ্ত করে ঈসায়ী ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন, এ তাঁর একান্ত ইচ্ছা। আমরা তাঁকে এ ইচ্ছা কিছুতেই সফল করতে দিব না।

এ ধরনের মনোভাব গ্রহণের ফলে বনী ইস্রাঈলগণ হযরত ঈসা আ.'র ঘোর শত্রু হয়ে পড়ল। তারা হযরত ঈসা আ.'র ধর্ম তো মানলই না বরং তাঁকে প্রাণে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল। উপরন্তু হযরত ঈসা আ. প্রচার করলেন যে, আমার পরে অতি শীঘ্রই আর একজন মহা পয়গাম্বর আল্লাহর তরফ হতে আবির্ভূত

[৭৪৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪০-৫৪১

হবেন। যাঁর নাম হচ্ছে আহমদ। অবশ্য পৃথিবীতে তিনি মুহাম্মদ নামে পরিচিত হবেন। তাঁর উপরে যে গ্রন্থ নাযিল হবে তা অভিহিত হবে কোরআন ও ফোরকান নামে। তাঁর উম্মতগণের মধ্যে অসংখ্য লোক ঐ ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ করে রাখবে; অথচ তৌরাত ও ইঞ্জিল গ্রন্থ মুখস্থকারী একটি লোকও পাওয়া যাবে না। হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র প্রচারিত দ্বীনই পৃথিবীতে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।

হযরত ঈসা আ.'র এ প্রচারণা বনী ইস্রাঈলগণ তথা ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা শুনে তাদের ক্ষোভ ও ক্রোধের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেল। তারা মনে করল যে, হযরত ঈসা আ. বিশেষভাবে হযরত মূসার প্রচারিত দ্বীনকে বিলোপ করার উদ্দেশ্যেই এ প্রচারণা চালাচ্ছেন; সুতরাং তারা অবিলম্বেই ঈসা আ.কে হত্যা করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হল। তদানিন্তন বাদশাহও তাদের সাথে একমত হল। তখন ঈসা আ.'র অনুসারীগণ তাঁর নিরাপত্তার জন্য সবর্দা তাঁর সাথে থাকতেন। তাঁরা তাঁকে কোথাও একাকী আদৌ যেতে দিতেন না।

পক্ষান্তরে, আল্লাহ তায়ালা সকলের চোখের আড়াল থেকে হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে এক বিশেষ ফায়সালা করলেন। হযরত ঈসা আ.'র একান্ত বিরোধী কিংবা তাঁর একান্তজনদের কাছেও প্রকাশ পেল না। আল্লাহ পাকের সে ফায়সালার সময় একেবারে আসন্ন হয়ে আসল। একদিন হযরত ঈসা আ. তাঁর সহচর ও অনুসারীগণসহ আইনে-সালুক নামক এক ঘরে অবস্থান করছিলেন। দুশমন ইহুদীগণ মিলিতভাবে ঐ ঘর পরিবেষ্টন করে ফেলল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁকে হত্যা করা।

মহাপ্রভু আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীকে দুশমনের হাত হতে হেফাজত করার লক্ষ্যে ফেরেশতা জিব্রাঈলকে পাঠিয়ে দিলেন। জিব্রাঈল আ. ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করে হযরত ঈসা আ.কে চতুর্থ আসমানে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন।

এদিকে ইহুদীদের সর্দার তাঁকে হত্যা করার জন্য উক্ত ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল। কিন্তু ঘরের সর্বত্র তন্ন তন্ন করে তালাশ করেও কোথাও তাঁকে দেখতে পেল না। অবশেষে সে নিরাশ হয়ে পড়ল; অবশ্য সে তখনও ঘর হতে বাইরে না এসে আরও ভালভাবে তালাশ করে দেখতে লাগল। সর্দারের এত বেশী দেরি দেখে বনী ইস্রাঈলগণ অধৈর্য হয়ে সকলেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। ওদিকে আল্লাহা তায়ালা ঠিক এর পূর্ব মুহূর্তে ইহুদী সর্দারের আকৃতি পরিবর্তন করে তাকে ঠিক হযরত ঈসা আ.'র আকৃতি বিশিষ্ট করে রাখলেন। ইহুদীগণ তাকেই হযরত ঈসা আ. মনে করে পাকড়াও করল এবং নানাভাবে নির্যাতন ও প্রহার আরম্ভ করল। ইহুদী নেতা কিন্তু শপথ করে বলতে লাগল, ওহে! আমি ঈসা নই, আমি তোমাদের নেতা। তোমরা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করো না; কিন্তু কে তার

কথা শুনে? সকলেই তাকে কিল, চড়, লাথি, ঘুষি মারতে লাগল। আর বলতে লাগল, মিথ্যাবাদী! তুমি যদি আমাদের নেতা হয়ে থাক তবে ঈসা যাবে কোথায়? তাকে বের করে দাও। তোমার প্রতারণায় আমরা ভুলব না। বাহানা-ছলনা করে আজ তুমি আমাদের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। আজ তোমাকে আমরা হত্যা করেই ছাড়ব।

কিছুক্ষণ এভাবে লোকটির উপর অকথ্য নির্যাতন চলল। এরপর তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হল। ইহুদীরা মনে করল যে, হযরত ঈসা আ. কেই তারা শূলবিদ্ধ করে হত্যা করল। ·

মূলতঃ আল্লাহ তায়ালা যে তাঁর প্রিয় নবীকে ফেরেশতা জিব্রাঈলের মাধ্যমে সশরীরে চতুর্থ আসমানে তুলে নিয়ে নিরাপদে রেখে দিলেন। অবশ্য যে লোকটিকে হযরত ঈসা আ. মনে করে শূলে চড়িয়ে মারা হল, সেও হযরত ঈসা আ.'র যে কি হল তা জেনে যেতে পারেনি; কিন্তু তার মাধ্যমে যে বনী ইস্রাইলগণ এ কথাটা জেনে নিবে, তাও আর সম্ভব হল না। যেহেতু সে নিজেই হযরত ঈসা আ.'র বদলে মৃত্যুর শিকার হল। এরপর আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে হযরত ঈসা আ. কে জীবিতাবস্থায় দুনিয়া হতে তুলে নেয়ার ঘটনা দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দিলেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ . إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ . অর্থ: তারা (ইহুদীরা ঈসা আ.'র বিরোদ্ধে) নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও গোপন কৌশল করেছিল আল্লাহও সুক্ষ্ম গোপন কৌশল অবলম্বন করেন। অর্থাৎ তাদেরই একজনকে ঈসা আ.'র আকৃতি দিয়ে তাদের দ্বারা হত্যা হয় আর আল্লাহ ঈসা আ. কে জীবিত আসমানে তুলে নেন। আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ বলেছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমার হায়াত পূর্ণ করবো এবং তোমাকে আমার দিকে তুলে নেবো আর কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো।[৭৫০]

আল্লাহ পাক আরো বলেন- وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا . بَلْ رَفَعَهُ

৭৫০. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৪ ও ৫৫

اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا . অর্থ: তারা তাকে না হত্যা করেছে, না শূলীতে চড়িয়েছে বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নান রকম কথা বলে তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া এ বিষয়ে তাদের কোন নিশ্চিত জ্ঞান নেই। নিশ্চয় তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৭৫১]

খ্রীষ্টানগণ হযরত ঈসা আ.'র পরিণতি সম্পর্কে কতিপয় মত পোষণ করে থাকে। যেমন কেউ কেউ বলে যে, হযরত ঈসা আ.'র পবিত্র রূহকে আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে নিজের সান্নিধ্যে তুলে নিয়েছেন। দুশমনগণ শুধুমাত্র তার দেহকেই শূলে চড়িয়েছিল। মূলতঃ তিনি এখনও আসমানে জীবিতাবস্থায় অবস্থান করছেন। অন্যান্যগণ বলে থাকেন, হযরত ঈসা আ. পৃথিবীতে মৃত্যুবরণের মাত্র দু'দিন পরেই পুনর্জীবন লাভ করে আসমানে চলে গেছেন এবং এখনও তিনি সেখানে জীবিত আছেন। আবার তিনি এ পৃথিবীতে আসবেন।

আর ইহুদীদের হযরত ঈসা আ.'র মৃত্যু সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তারা তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ। কেননা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারা যে লোককে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেছিল, সে তো হযরত ঈসা আ.'র আকৃতি বিশিষ্টই ছিল; সুতরাং তাদের কাছে হযরত ঈসা আ.'র মৃত্যু সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। যেহেতু তারা পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস করে না। কোরআনের প্রতি আস্থাশীল হলে কিছুতেই হযরত ঈসা আ.'র শূলবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের কথা মুখে আনত না।

হযরত ঈসা আ.'র দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবন সম্পর্কে হুযুরে পাক ﷺ'র বিভিন্ন হাদীস মারফত অবগত হওয়া যায় যে, দুনিয়ার শেষ যমানায় যখন পাপীষ্ঠ দাজ্জালের আবির্ভাব হবে তার কিছু পরেই হযরত ইমাম মাহদীরও অভ্যুদয় ঘটবে। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করে জোরে শোরে ইসলাম প্রচার করবেন। পক্ষান্তরে, কাফের দাজ্জাল কতকগুলো আশ্চর্যজনক ক্ষমতা ও অদ্ভুত শক্তির দ্বারা সাধারণ লোকদের বিভ্রান্ত করে তাদের ঈমান নষ্ট করতে থাকবে। তার প্রতারণার জাল হতে আত্মরক্ষা করা তখন অনেকের পক্ষেই কঠিন হয়ে পড়বে। মুসলমানদের সবচেয়ে এ সংকটের কথা হযরত ইমাম মাহদীর গোচরে আসলে তিনি দাজ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবেন। ওদিকে দাজ্জালও তার পূর্ণশক্তি নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবে।

৭৫১. সূরা আন নিসা, আয়াত: ১৫৭ ও ১৫৮

ঠিক এ মুহূর্তে আল্লাহ পাকের মর্জী অনুযায়ী হযরত ঈসা আ. চতুর্থ আসমান হতে পৃথিবীতে নেমে আসবেন এবং হযরত ইমাম মাহদীর সাথে মিলিত হবেন। এরপর তাঁরা উভয়ে মিলিত শক্তি নিয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে অবতীর্ণ হবেন। যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করবেন এবং হযরত ঈসা আ.'র হাতেই পাপীষ্ঠ দাজ্জালের খেলা শেষ হয়ে যাবে।

হযরত ঈসা আ. দুনিয়াবী জীবনে প্রথম পর্যায়ে বিবাহ করেন নি বরং অবিবাহিতাবস্থায়ই তাঁকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিয়েছেন।

কিন্তু জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি যখন আবার হযরত ইমাম মাহদীর সমসাময়িককালে পৃথিবীতে আগমন করবেন, তখন তিনি রীতিমত বিবাহ শাদী করে স্বাচ্ছন্দ্যে পারিবারিক জীবনযাপন করবেন। ঐ সময় তিনি চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে থেকে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন। ঐ সময় হযরত ঈসা আ. যতদিন পৃথিবীতে অবস্থান করবেন, নিজে দ্বীন মুহাম্মদী ﷺ'র অনুবর্তী হিসেবে মানুষের মধ্যে ঐ দ্বীনই প্রচার করে দুনিয়ার একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ইসলাম ধর্মকে পৌঁছে দিবেন এবং বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবেন। ঐ সময় এ সকল কাজ তিনি ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে ও সহযোগিতাই সাধন করবেন।[৭৫২]

হযরত ঈসা আ.কে সৃষ্টিকর্তা বলার অযৌক্তিকতাঃ

খ্রীষ্টানদের মধ্যে একটি মতবাদ এই যে, হযরত ঈসা আ. স্বয়ং খোদা। আর এক মতবাদ তিনি খোদার পুত্র। আর এক মতবাদ হল, খোদা, মরিয়ম এবং ঈসা এ তিনজন মিলেই খোদা। অর্থাৎ খোদায়িত্বে এ তিনজনই সমান অংশীদার। এদের যে কোন একজনকে ব্যতীত খোদায়ী শক্তি পূর্ণ হয় না (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক)

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা একান্তই একক। তিনি অনন্ত, অসীম ও মহাশক্তির অধিকারী। তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারও কাছে কোন ব্যাপারেই তিনি সামান্যতম মুখাপেক্ষী নন; বরং তাঁর নিকটেই সকলে সকল প্রকার মুখাপেক্ষী।

মহান পবিত্র কোরআনে কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, নিশ্চয়ই তারা কাফের, যারা বলে থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং মসীহ ইবনে মরিয়ম।

এরূপ উক্তিতে কুফরির কারণ অতি পরিস্কার। কেননা, ঐরূপ উক্তি দ্বারা আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ তথা একত্ববাদে অবিশ্বাস করা হয়।

---

৭৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪১-৫৪৪

হযরত ঈসা আ.'র পাঁচ শতাধিক বছর পর শেষ যমানার নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র নিকট অহী মারফত আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন ঃ

হে নবী! আপনি এ উক্তি রদ করার উদ্দেশ্যে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করুন যে, যদি আল্লাহ তায়ালা নিজে মসীহ ইবনে মরিয়ম হয়, তবে তোমরা বল, যদি আল্লাহ তায়ালা হযরত মসীহ ইবনে মরিয়মকে এবং তাঁর মাতাকে এবং যারা পৃথিবীতে অবস্থান করছে আদের সকলকে মৃত্যুর দ্বারা ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন, তবে এরূপ কেউ কি আছে কি যে, আল্লাহর হাত হতে কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? ফলতঃ তোমরা স্বীকার কর যে, এমন কেউ নেই।

আর একথা অতি সুস্পষ্ট যে, যিনি খোদা হবেন, তাঁর ধ্বংস বা অবসান হওয়া কোনরূপেই সম্ভব নয়; বরং তেমন কথাই উঠে না। আর অন্য কোন শক্তির সামনে তাঁর নতি স্বীকার করা বা অন্যের সাহায্যে তাদের হাত হতে আত্মরক্ষা করারও কোন প্রয়োজন হয় না। কেননা, তিনিই তো সর্বেসর্বা, মহাশক্তির অধিকারী। অন্য যে কোন শক্তি তাঁর সামনে নত, হীন ও দুর্বল: সুতরাং হযরত ঈসা আ. তাঁর বিপক্ষীয় শক্তির হাত হতে আসমানে উঠে নিরাপদ হয়েছেন এবং তা সর্বপ্রধান শক্তি আল্লাহ তায়ালার দয়া ও সাহায্য অবলম্বনে। এর দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে, হযরত ঈসা আ. নিজে আল্লাহ নন বরং যার সাহায্য গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়েছে, তিনিই আল্লাহ।

পবিত্র কোরআনে অন্য স্থানে ইরশাদ হয়েছে–

"আল্লাহ তায়ালা এমন এক সত্ত্বা, যিনি কোন সন্তান-সন্ততি জন্মদান করেন না এবং তিনি নিজেও অপর কারও দ্বারা জন্মগ্রহণ করেন নি। আর তাঁর সমকক্ষ অপর কেউই নেই।"

'সন্তান জন্মদান করা বা নিজে অন্যের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করা' এ দু'অবস্থাতেই সৃষ্টির সহজাত প্রবৃত্তি। স্রষ্টার প্রকৃতি নয়। কেননা স্রষ্টার মহান সত্তা এতে সৃষ্টির প্রকৃতি সম্পন্ন এবং অন্যের অধীন কিংবা অন্যের কাছে ক্ষুদ্র সত্তারূপে পরিণত হয়। অথচ এর কোনটাই স্রষ্টার উপযোগী গুণ বা তাঁর সাদৃশ্যমূলক নয়।

হযরত ঈসা আ. হযরত মরিয়মের পুত্র হয়ে অন্ততঃ কোন কোনদিক দিয়ে তিনি মাতার নিকট নগণ্য এবং তাঁর নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে হযরত ঈসা আ.কে স্রষ্টা বললে বিভিন্ন দিক দিয়ে তাঁর উপরে তাঁর মাতা মরিয়মের স্থান স্বীকার করতে হয়। আর এতে স্পষ্টরূপেই প্রমাণ হয়ে যায় যে, কোন কোন সত্তা এমন আছে যে, তা স্বয়ং স্রষ্টার উপরও সম্মান এবং মর্যাদার দাবীদার। এ

একান্তই হাস্যকর এবং অযৌক্তিক বটে। অন্ততঃ এ একটিমাত্র দিকে লক্ষ্য করলেই কেউ হযরত ঈসা আ.কে স্বয়ং স্রষ্টা বলে উক্তি করতে পারে না।

তারপর আসে হযরত মরিয়মের কথা। তার জীবনালেক্ষ্য যে কোনভাবেই পর্যালোচনা করা যায়, স্রষ্টার উপযোগী প্রকৃতি ও গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনভাবেই তাঁকে স্রষ্টা বলা যায় না, এ অতি সুস্পষ্ট। তারপরও যারা হযরত ঈসা আ. ও হযরত মরিয়মকে খোদা বা খোদার পুত্র ইত্যাদি বলে প্রচার করে, তারা যে কোন রকম যুক্তি-বুদ্ধির তোয়াক্কা করে না সে কথা একেবারেই সত্য।[৭৫৩]

হযরত ঈসা আ.'র মু'জিযা সমূহঃ

হযরত ঈসা আ. জীবনে অনেক অলৌকিক ক্ষমতার নির্দশন দেখিয়ে গেছেন। তার কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করছি।

একদিন হযরত ঈসা আ. ভ্রমণোপলক্ষে একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, এক বৃদ্ধা মহিলা অত্যন্ত বিমর্ষ ও আলু-থালু বেশে একটি কবরের পাশে বসে রোনাজারী করছে। তিনি বৃদ্ধাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমি একটি অনাথা অসহায় অবলা মহিলা। আমার এ পৃথিবীতে একটি পুত্র ব্যতীত অন্য কেউই ছিল না। আমার সে একমাত্র পুত্রটিকে অকালে নিয়ে গেলেন। অথচ সে আমার একমাত্র ভরসা। এ কবরে তাকে দাফন করা হয়েছে। দাফন করা অবধি আমি এখানে বসে কাঁদছি। যতদিন আল্লাহ তায়ালা আমাকেও দুনিয়া হতে তলব না করবেন, ততদিন আমি এখানে বসে কাঁদতেই থাকব।

বৃদ্ধার কথা শুনে হযরত ঈসা আ. বললেন, আচ্ছা, তোমার সে পুত্র যদি আবার জীবিত হয়ে উঠে তবে এখান হতে চলে যাবে কি না?

বৃদ্ধা হযরত ঈসা আ.এ কথা শুনে অত্যন্ত আশ্বস্ত ও উৎফুল্ল হয়ে বলল, তা হলে তো আমি অবশ্যই হৃষ্ট মনে ঘরে প্রত্যাবর্তন করব।

হযরত ঈসা আ. বৃদ্ধার কথা শুনে তখন দু'রাকাত নামায আদায় করে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, হে অমুকের পুত্র! তুমি আল্লাহর হুকুমে জলদি উঠে আস। নবী ঈসা আ.'র আহবানে কবর বিদীর্ণ হয়ে বৃদ্ধার মৃতপুত্র জীবিত হয়ে উঠে আসল এবং বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে কি উদ্দেশ্যে ডেকে তুললেন? আমি কবরে খুবই শান্তিতে কালযাপন করছিলাম। আপনি তাতে বিঘ্ন ঘটালেন কেন?

[৭৫৩]. মাওলানা তাহের সুরাটি (ভারত), কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫২৩-৫৪৫

তখন হযরত ঈসা আ. তার মাতার ঘটনা তাকে শুনিয়ে দিলেন। তা শুনে সে মাতার নিকট নিজের অবস্থা বর্ণনা করল, মাতা শুনে অত্যন্ত খুশি হল। তার শোকের প্রাবল্যও লাঘব হল। তখন বৃদ্ধার পুত্র আবার হযরত ঈসা আ.কে বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, আমি যে অবস্থায় এতদিন কবরে ছিলাম, এখনও যেন সে অবস্থায় থাকতে পারি।

হযরত ঈসা আ. তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এরপর বৃদ্ধার পুত্র মৃত অবস্থায় আবার কবরে প্রবেশ করল।

হযরত ঈসা আ.'র এ অলৌকিক ঘটনা বহু বনী ইস্রাঈল প্রত্যক্ষ করল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা ঈমান গ্রহণ না করে বরং একথা বলে চলে গেল যে, আমরা ঈসার ন্যায় যাদুকরের কথা চোখে দেখা তো দূরের কথা কানে পর্যন্ত শুনিনি।[৭৫৪]

হযরত ঈসা আ. যখন তাঁর নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ মাটি দিয়ে পাখি সৃষ্টি করা, জন্মান্ধ, কুষ্ঠ ও শেত রোগীকে ভাল ও সুস্থ করতে পারি, তোমাদের ঘরে কি খাও আর কি জমা করে রাখ তাও বলতে পারি, এমনকি মৃতকে জীবিতও করতে পারি আল্লাহর হুকুমে- ইত্যাদি মু'জিযার দাবী করলেন তখন তারা বলল, তাহলে আপনি একটি বাদুর সৃষ্টি করে দেখান। বাদুর সৃষ্টি করতে বলার কারণ হল এর এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য পক্ষীকুলের মধ্যে নেই। যেমন- ১. এর মধ্যে হাড্ডি নেই শুধু মাংস ও রক্ত আছে, ২. এর পালক নেই বরং মাংস দিয়ে উড়ে, ৩. এটি ডিম দেয়না বরং বাচ্চা প্রসব করে অথচ সাধারণ পাখি ডিম দিয়ে বাচ্চা ফুটায়, ৪. এর বুকের দুধের স্তন রয়েছে যা দিয়ে বাচ্চাকে দুধ পান করায়, ৫. এর ঠোঁট নেই বরং মুখ আছে, ৬. এদের মুখে দাঁতও রয়েছে যা দিয়ে চিবিয়ে খায় আর হাসে, ৭. এদের ঋতুস্রাবও হয়, ৮. এরা দিনের আলোতে দেখেনা, ৯. রাতের অন্ধকারেও দেখেনা বরং শুধুমাত্র সূর্যোদয়ের এক ঘন্টা পূর্বে ও সূর্যাস্তের পর এক ঘন্টা পর্যন্ত দেখতে পায়।

অতঃপর তিনি বনী ইস্রাঈলদের চোখের সামনে মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে তাতে ফুঁক দিলে আল্লাহর হুকুমে তা পাখি উড়ে যায়।[৭৫৫]

মৃতকে জীবিত করাঃ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ঈসা আ. চারজন মৃতকে জীবিত করেছিলেন। ১. আযর, যিনি তাঁর বন্ধু ছিলেন, ২. এক

[৭৫৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৩-৫৩৪

[৭৫৫]. আল্লামা মাহমুদ আলুসী র., ১২৭০হি., তাফসীরে রূহুল মায়ানী, আরবী বৈরুত, খণ্ড-৩য়, পৃ.১৬৮ ও মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড-৩য়, পারাঃ৩য়, পৃ.৫১৫

বৃদ্ধার ছেলে, ৩. মুহারের চুঙ্গীর ছেলে ও ৪. হযরত নুহ আ.'র ছেলে শামকে যিনি চার হাজার ছয় শত বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। হযরত সাম ব্যতীত বাকী তিনজন অনেক দিন জীবিত ছিলেন এবং তারা সংসারও করেছিলেন।

ঘটনা হল- প্রথম ব্যক্তি আযর তাঁর বন্ধু ছিল। যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ল তখন তার বোন হযরত ঈসা আ. কে সংবাদ দিল যে, আপনার বন্ধু মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তেছে কিন্তু তখন তিনি তিন দিনের দূরত্বে অবস্থান করছিলেন। তিন দিন পর তিনি সেখানে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে আজ তিন দিন হয়ে গেল। তিনি তার বোনকে বললেন, আমাকে বন্ধুর কবরে নিয়ে যাও। তিনি কবরে গিয়ে দোয়া করলে আল্লাহর হুকুমে এবং তাঁর নির্দেশে বন্ধু কবর থেকে জীবিত উঠে গেল। সে দীর্ঘ দিন জীবিত ছিল তাঁর থেকে সন্তান-সন্ততিও জন্মগ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয়ত: বৃদ্ধার ছেলের ঘটনা হল লোকেরা বৃদ্ধার ছেলের জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল আর বৃদ্ধা আঝোর নয়নে কান্নাকাটি করতেছে। বৃদ্ধার কান্না দেখে হযরত ঈসা আ.'র দয়া আসল। তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন সাথে সাথে বৃদ্ধার ছেলের জানাযার খাটের উপর উঠে বসে গেল এবং বহণকারীগণের কাঁধের উপর থেকে নীচে নেমে গেল। অনেক দিন বেঁচে ছিল, সন্তান-সন্ততিও হয়েছিল তার।

তৃতীয় ঘটনা হল- মুহারের চুঙ্গী ছিল হাকেমের পক্ষে জনগণ থেকে কর আদায়কারী। তার কন্যা মরে যাওয়ার একদিন পর হযরত ঈসা আ. দোয়া করলে সে জীবিত হয়ে যায়। সেও অনেক বছর জীবিত ছিল সংসার করেছে সন্তান-সন্ততি হয়েছে। চতুর্থ ঘটনা হল- সাম ইবনে নুহ আ.'র ঘটনা। কেউ কেউ মনে করত হযরত ঈসা আ. যাদেরকে জীবিত করেছিলেন মুলত তারা মৃত ছিলনা। হয়তো মৃত্যুর কাছাকাছি কিংবা রোগে-শোকে মৃতের ন্যায় হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি অনেক পুরাতন একটি কবরস্থানে গেলেন যেখানে চার হাজার ছয়শত বছর পূর্বে মৃত হযরত নুহ আ.'র পুত্র সামা'র কবর ছিল। তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা সাম কে জীবিত করে দেন। তিনি যখন দোয়া করছিলেন তখন সাম কবরে শুনতে পান যে, কে যেন বলতেছেন اجب روح الله। অর্থাৎ রুহুল্লাহ তথা ঈসা আ.'র কথা মান্য কর। এটা শ্রবণ মাত্র তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মনে করলেন কিয়ামত এসে গিয়েছে। এই ভয়ে তার মাথার অর্ধেক চুল সাদা হয়ে গেল। অথচ নুহ আ.'র যুগে মানুষের চুল সাদা হতনা। তিনি উঠে জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত কি সংঘটিত হয়েছে? উত্তরে ঈসা আ. বললেন, না, বরং আমি

তোমাকে ইসমে আজম দিয়ে জীবিত করেছি। তখন তিনি ঈসা আ.'র নিকট আবেদন করলেন যেন পুনরায় তাকে কবরে পাঠিয়ে দেন যাতে দ্বিতীয়বার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগে করতে না হয়। তখন সাথে সাথে তিনি পুণরায় মৃত্যু বরণ করেন।[৭৫৬]

ঘরে লুকিয়ে রাখা খাবারের সংবাদ প্রদান:

হযরত ঈসা আ.'র অন্যতম একটি মু'জিযা হল তিনি অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করতেন। লোকদের বলে দিতেন যে, তোমরা গতকাল কি কি খেয়েছ, আজ কি কি খাবে এবং আগামী বেলার জন্য তোমরা কি কি খাবার তৈরী করে রেখেছ। কেননা নিকটে-দূরে, ওপেনে-গোপনে, আলো অন্ধকারে এমনকি পর্দার আড়ালে কি আছে না আছে সব কিছু তাঁর দৃষ্টি গোচরে ছিল। এতে তাঁর একই সাথে অনেকগুলো মু'জিযার বহিঃপ্রকাশ ঘটত। তাঁর চলার সময় পিছে পিছে অসংখ্য ছেলেরা থাকত। তিনি তাদেরকে বলে দিতেন যে, তোমাদের ঘরে অমুখ খাবার বা নাস্তা তৈরী হয়েছে, তোমাদের মা-বাবা তোমাদের জন্য অমুক জিনিস লুকিয়ে রেখেছে। তারা ঘরে গিয়ে তাদের মা-বাবাকে ঐসব বস্তু খুঁজে দিতে বলত, না দিলে কান্না-কাটি করত। অবশেষে তারা তা বের করে দিতে বাধ্য হত আর জিজ্ঞেস করত- এই সব তথ্য তোমাদেরকে কে দিয়েছে? উত্তরে তারা বলত ঈসা আ. আমাদের এসব বিষয়ে বলে দেন।

অতঃপর অভিভাবকগণ পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করল যে, আমাদের বাচ্চারা এভাবে ঈসা আ.'র সাথে সাথে থাকলে আমাদের ধর্ম ত্যাগ করে ঈসা'র ধর্ম গ্রহণ করে তার অনুসারী হয়ে যাবে। তাই তারা সব বাচ্চাদেরকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখল। বাচ্চাদের অনুপস্থিতি দেখে তাদের খোঁজ নিতে তিনি লোকদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- বাচ্চারা কোথায়? উত্তরে তারা বলল, তারা এখানে নেই। তিনি প্রশ্ন করলেন তবে ঐ ঘরে কারা? তারা বলল, ঐ ঘরে আমাদের শুকর। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা তবে তারা সব শুকর হয়ে গিয়েছে? ফলে বাস্তবই আবদ্ধ সবাই শুকর হয়ে গিয়েছিল।[৭৫৭]

এক লোভীর কাহিনী:

হযরত ঈসা আ. এক সফরে বের হলেন পথে তাঁর সঙ্গে একজন ইহুদীও সঙ্গী হল। সেই ইহুদীর নিকট দু'টি রুটি ছিল পক্ষান্তরে ঈসা আ.'র কাছে একটি

---

৭৫৬. আল্লামা মাহমুদ আলুসী র., তাফসীরে রুহুল মায়ানী, আরবী, বৈরুত, খণ্ড-৩য়, পৃ.১৬৯ ও মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-৩য়, পারা:৩য়, পৃ.৫১৬

৭৫৭. আল্লামা মাহমুদ আলুসী র., ১২৭০হি., তাফসীরে রুহুল মায়ানী, আরবী, বৈরুত, খণ্ড-৩য়, পৃ:১৭০ ও মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র., ১৩৯১হি., তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড-৩য়, পারা:৩য়, পৃ. ৫১৭

রুটি ছিল। ঈসা আ. তাকে বললেন, আস, আমরা উভয় মিলে রুটি খেয়ে নিই। ইহুদী সম্মতি প্রকাশ করল কিন্তু যখন দেখল যে, ঈসা আ.'র নিকট একটি রুটি অথচ তার কাছে দু'টি রুটি। তখন সে মনে মনে আফসোস করতে লাগল- কেন সম্মত হলাম, আমি তো ঠকবো।

অতঃপর যখন খাওয়ার সময় হল তখন ইহুদী একটি রুটি গোপন করে ফেলল এবং একটি রুটি বের করল। ঈসা আ. বললেন, তোমার কাছে তো দু'টি রুটি ছিল আরেকটি কোথায়? ইহুদী বলল, আমার কাছে তো একটি রুটিই ছিল। উভয় খাবার খাওয়ার পর সামনে অগ্রসর হয়ে পথে একজন অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলে ঈসা আ. তার জন্য দোয়া করে তাকে দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ দেন। ইহুদীকে এই মু'জিযা দেখিয়ে তিনি বললেন, তোমাকে সে খোদার শপথ, যিনি আমার দোয়ায় এই অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ দিয়েছেন, সত্যিকরে বল তোমার অপর রুটিটি কোথায়? উত্তরে সে বলল, সেই খোদার শপথ, আমার কাছে একটি রুটিই ছিল।

অতঃপর যখন আরো কিছু অগ্রসর হন তখন পথে একটি হরিণ দেখতে পেলেন। তিনি হরিণকে ডাকলে হরিণ কাছে এসে গেল। তিনি হরিণ যবেহ করে রান্না করে খেয়ে হাড্ডি গুলোকে বললেন, قُمْ بِاذْنِ اللهِ আল্লাহর হুকুমে উঠে যাও। সাথে সাথে হরিণ জীবিত হয়ে চলে গেল। তিনি ইহুদীকে বললেন, তোমাকে সেই খোদার শপথ, যিনি হরিণ খাওয়ায়েছেন এবং পুনরায় জীবিত করে দিয়েছেন, সত্যিকরে বল, তোমার অপর রুটি কোথায়? উত্তরে সে বলল, সেই খোদার শপথ, আমার কাছে মাত্র একটি রুটিই ছিল।

আরো সামনে অগ্রসর হলে তারা একটি জনবসতি এলাকায় পৌঁছলে ঈসা আ. সেখানে অবস্থান করছিলেন। সুযোগ পেয়ে ইহুদী ঈসা আ.'র লাঠি মোবারক চুরি করে নিয়ে গেল এবং এটি দিয়ে মৃতকে জীবিত করবে বলে সে অত্যন্ত খুশী হল। এলাকায় সে ঘোষণা করে দিল যে, কোন মৃতকে জীবিত করতে হলে আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকেরা তাকে তাদের হাকেমের নিকট নিয়ে গেল যিনি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তারা বলল, ইনি অসুস্থ একে ভাল করে দাও। সেই প্রথমে লাঠি দিয়ে হাকেমের মাথায় আঘাত করা মাত্র হাকেম মৃত্যুবরণ করলেন। তারপর সে লোকদের বলল, দেখ, আমি একে কিভাবে জীবিত করি। সে লাঠি দিয়ে লাশের উপর আঘাত করে বলল, قُمْ بِاذْنِ اللهِ আল্লাহর হুকুমে উঠে যাও। কিন্তু লাশ জীবিত হলনা ফলে সে দুঃশ্চিন্তগ্রস্থ হয়ে পড়ল। লোকেরা তাকে হাকেম হত্যার দায়ে ফাঁসী দেয়ার জন্যে নিয়ে গেল।

ইত্যবসরে ঈসা আ. সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং বললেন, তোমাদের হাকেমকে আমি জীবিত করে দেবো, তাকে ছেড়ে দাও। অতঃপর তিনি قُمْ بِاذْنِ اللهِ বলার সাথে সাথে হাকেম জীবিত হয়ে গেলেন আর লোকেরা ইহুদীকে ছেড়ে দিল। তখন ঈসা আ. তাকে বললেন, তোমাকে সেই খোদার শপথ, যিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করেছে, সত্যিকরে বল তোমার দ্বিতীয় রুটিটি কোথায়? সে বলল, আমি সেই খোদার শপথ করে বলছি যিনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন আমার কাছে দ্বিতীয় কোন রুটিই ছিলনা।

তারা উভয়ে কিছুদূর গেলে পথে তিনটি স্বর্ণের ইট পেলেন। ঈসা আ. ইহুদীকে বললেন, একটি আমার, দ্বিতীয়টি তোমার আর তৃতীয়টি হল তার যে তৃতীয় রুটি খেয়েছে। ইহুদী বলল, খোদার কসম, তৃতীয় রুটি আমিই খেয়েছি। অর্থাৎ এতক্ষণে সে সত্যকথা বলল, লোভের বশীভূত হয়ে। ঈসা আ. তিনটি ইটই তাকে দিয়ে বললেন, এখন তুমি আমার সঙ্গ ছেড়ে দাও। সেই ইট তিনটি নিয়ে খুশী মনে চলে যাচ্ছিল কিন্তু পথিমধ্যেই ইট সহ তাকে মাটিতে ধ্বসে ফেলা হয়েছে।[৭৫৮]

সমাপ্ত

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

৭৫৮. আব্দুর রহমান সফুরী র., নুজহাতুল মাজালিস, খণ্ড-২য়, পৃ.২০৭, সূত্রঃ মাওলানা আবুন নুর মুহাম্মদ বশীর, সাচ্চি হেকায়াত, উর্দু, খণ্ড-১ম, পৃ.১১৯,

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল কুরআন
২. সহীহ বুখারী শরীফ-মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী র., ২৫৬হি.।
৩. সহীহ মুসলিম শরীফ- ইমাম মুসলিম র., ২৬১হি.।
৪. জামে তিরমিযী শরীফ- ইমাম তিরমিযী র., ২৭৯হি.।
৫. সুনানে আবু দাউদ- ইমাম আবু দাউদ র., ২৭৫হি.।
৬. মুয়াত্তা ইমাম মালেক- ইমাম মালেক র., ১৭৯হি.।
৭. মিশকাতুল মাসাবীহ- শায়খ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ র.,৭৪৯হি.
৮. মিরকাত শরহে মিশকাত- মোল্লা আলী কারী র., ১০১৪হি.।
৯. মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যা- আল্লামা কাসতুল্লানী র., ৯২৩হি.।
১০. মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক- ইমাম আব্দুর রাজ্জাক র., ২১১হি.।
১১. যুরকানী শরহে মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যা- ইমাম যুরকানী র., ১১২২হি.।
১২. সীরাতে হালভীয়্যা- আলী ইবনে বুরহান উদ্দিন হালভী র., ১৪০৪হি.।
১৩. কাশফুল খেফা- আল্লামা আজলুনী র., ১২৬২হি.।
১৪. আল বিদায়া ওয়ান্নিহায়া- আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি.।
১৫. মাদারেজুন্ নবুয়্যাত- আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী র., ১০৫২হি.।
১৬. আনোয়ারে মুহাম্মদিয়া- আল্লামা ইউসুফ নাবহানী র., ১৩৫০হি.।
১৭. নুযহাতুল মাজালিস- আব্দুর রহমান সফুরী র., ৮৯৪হি.।
১৮. আল মুস্তাদরাক- মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ হাকেম র., ৪০৫হি.।
১৯. আল মু'জামুল আওসাত- ইমাম তিবরানী র., ৩৬০হি.।
২০. মাজমাউয যাওয়ায়েদ- আল্লামা হায়ছামী র., ৮০৭হি.।
২১. তারিখে দামেস্ক আল কুবরা- ইবনে আসাকের র., ৫৭১হি.।
২২. আল খাসায়েসুল কুবরা- ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী র., ৯১১হি.।
২৩. আদ দুর্রুল মন্সুর- জালাল উদ্দিন সুয়ূতী র., ৯১১হি.।
২৪. আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মোস্তফা- ইবনে জওযী র., ৫৭৯হি.।

২৫. তারীখুল খামীস- ইমাম হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ দিয়ারে বকরী র.,
২৬. আসাহহুস সিয়ার-আব্দু রউফ কাদেরী
২৭. তাফসীরে কবীর- ইমাম ফখর উদ্দিন রাযী র., ৬০৬হি.।
২৮. তাফসীরে ইবনে কাসীর- আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি.।
২৯. তাফসীরে মাযহারী- কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী র., ১২২৫হি.।
৩০. বায়হাকী শরীফ- ইমাম বায়হাকী র., ৪৫৮হি.।
৩১. সিফাউস সিকাম-ইমাম তকীউদ্দিন সুবকী র., ৬২৭হি.।
৩২. তাফসীরে নঈমী-মুফতি আহমদ ইয়ারখান নঈমী র., ১৩৯১হি.।
৩৩. তাফসীরে আযিযী- আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী র., ১২৩৯হি.।
৩৪. তাফসীরে রূহুল বয়ান- আল্লামা ইসমাঈল হক্কী র., ১১৩৭হি.।
৩৫. তাফসীরে রূহুল মায়ানী- সৈয়দ মাহমুদ আলুসী র., ১২৭০হি.।
৩৬. তাফসীরে মুয়ালিমুত তানযীল- ইমাম বগভী র., ৫১৬হি.।
৩৭. তাফসীরে খাযেন- আবুল হাসান আলাউদ্দিন আলী র., ৭৪১হি.।
৩৮. হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন- আল্লামা ইউসুফ নাবহানী র., ১৩৫০হি.।
৩৯. কাসাসুল আম্বিয়া- আল্লামা ইবনে কাসীর র., ৭৭৪হি.।
৪০. তাযকারাতুল আম্বিয়া- আমীর আলী
৪১. জামে কাসাসুল আম্বিয়া- আল্লামা যুলফিকার আলী সাকী
৪২. কাসাসুল আম্বিয়া- মাওলানা তাহের সূরাটি।
৪৩. তিবইয়ানুল কুরআন- আল্লামা গোলাম রাসূল সাঈদী র.।
৪৪. কাসাসুল কুরআন- মাওলানা হেফজুর রহমান।
৪৫. বাদায়েউয যহুর- মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আয়াস র.।
৪৬. মা'আরিজুন নবুয়ত- মোল্লা মুঈন আল হারভী র., ৯০৭হি.।
৪৭. মুসনাদে ইমাম আহমদ- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র., ২৪১হি.।
৪৮. বয়াতে হাইওয়ান- আল্লামা দুমাইরী র., ৮০৮হি.।
৪৯. গুনিয়াতুত তালেবীন- আব্দুল কাদের জিলানী র., ৫৬১হি.।
৫০. ইরশাদুস সারী শরহে বুখারী- ইমাম কাসতুল্লানী র., ৯২৩হি.।
৫১. তারীখে তাবারী- ইমাম তাবারী র., ৩১০হি.।

৫২. ইবনে মাজাহ শরীফ- ইমাম ইবনে মাজাহ র., ২৭৩হি.।

৫৩. মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা- ইবনে আবি শায়বা র., ২৩৫হি.।

৫৪. খোলাসাতুল আম্বিয়া- মৌলভী গোলাম নবী।

৫৫. নূর নবী দ.- অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল র.।

৫৬. তাযকারাতুল আম্বিয়া- আব্দুর রাজ্জাক।

৫৭. তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান- আল্লামা নঈম উদ্দিন মোরাদাবাদী র., ১৩৬৭হি.।

৫৮. ফতহুল বারী- আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী র., ৮৫২হি.।

৫৯. তাফরীহুল আযকীয়া-

৬০. তাফসীরে বাহরে মুহীত- আবু হাইয়্যান আন্দুলুসী র., ৭৪৫হি.।

৬১. তাফসীরে কুরতুবী- ইমাম কুরতুবী র., ৬৭১হি.।

৬২. কাসাসুল আম্বিয়া- আল্লামা নাজ্জার।

৬৩. তারীখুল কামেল-ইবনুল আসীর র., ৬৩০হি.।

৬৪. শোয়াবুল ঈমান- ইমাম বায়হাকী র., ৪৫৮হি.।

৬৫. মু'জিযাতে আম্বিয়া- আমীর আলী

৬৬. জিয়াউল কুরআন- আল্লামা করম শাহ্ আযহারী র.।

৬৭. ইসলামের ইতিহাস- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান।

৬৮. বিশ্বনবী- কবি গোলাম মোস্তফা।

৬৯. আল ইতকান- আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী র., ৯১১হি.।

৭০. সাবী- আহমদ ইবনে মুহাম্মদ খালুতী র., ১২৪১হি.।

৭১. নশরুত্তীব- মৌলভী আশরাফ আলী থানভী, ১৩২৬হি.।

৭২. মিলাদুন্নবী- ড. আল্লামা তাহের আল কাদেরী।

৭৩. ইসলামের ইতিহাস- বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ২০০৯ সালের দাখিল নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক।

৭৪. বিষয়ভিত্তিক মু'জিযাতুর রাসূল দ.-হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

Prokashoni